শিশু-ভারতী

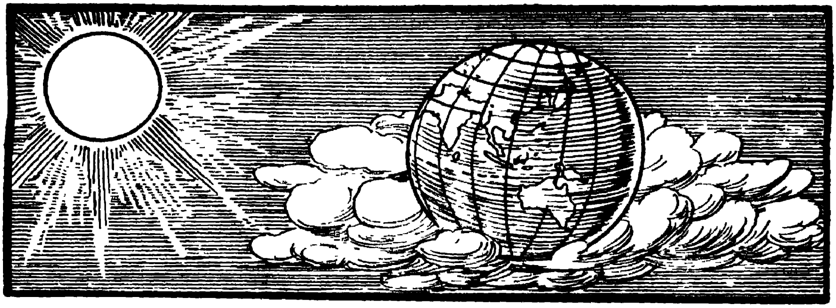
[ছেলেদের বিশ্বকোষ]

সম্পাদক—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

বিষয়-বিভাগ

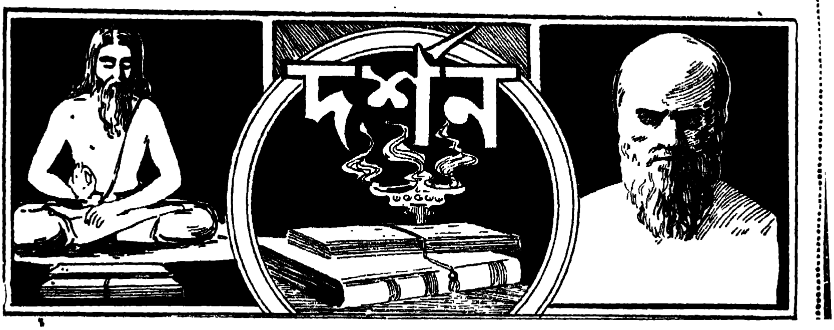
অজ্ঞাতের সন্ধানে
অর্থ-নীতি
অমর-জীবন
আদি মানব
আকাশের কথা
আমাদের দেশ
ইস্‌লামের ইতিহাস
উদ্ভিদ-বিজ্ঞান
কবিতা-চয়ন
কলকারখানা
কি ও কেন ?
ক্রীড়া-জগৎ
গল্প ও কাহিনী
জাতীয় সঙ্গীত
জীব-জগৎ
ডাকঘরের জন্মকথা
দর্শন
দেশবিদেশের কথা
নারী-জগৎ
পৃথিবীর ইতিহাস
পৃথিবীর চিত্রশালা
বাঙ্গলার ইতিহাস
ব্যায়াম-বিধি
বস্ত্র-শিল্প
বিশ্বসাহিত্য
ভারত-কথা
রঞ্জন-শিল্প
সমুদ্র-তত্ত্ব
সাহিত্য
সীবন-শিল্প
সঞ্চয়ন

অষ্টম খণ্ড ৩৬ হইতে ৪০ সংখ্যা, পৃষ্ঠা ২৮০১ হইতে ৩২০০



এখানে সংক্ষিপ্তরূপে অষ্টম খণ্ডের বিষয়-বিন্যাস ও সূচীপত্র দেওয়া হইল। সমুদয় খণ্ড সম্পূর্ণ হইলে স্বতন্ত্ররূপে বিস্তারিত সূচীপত্র (Index) দেওয়া হইবে।

অষ্টম খণ্ডের সূচীপত্র



ইউরোপীয় দর্শনের কথা

[১]

২৩০৩ পৃষ্ঠার পর

দুনিয়া আগুন দিয়ে তৈরী, না জল দিয়ে তৈরী এ তর্কের কোন মীমাংসা সম্ভব নয়। কারণ আগুন থেকেও আমরা গাছপালার সৃষ্টি দেখিনা, আবার সমস্তই যে জলের ভিন্ন ভিন্ন রূপ, তারই বা প্রমাণ কোথায়? মানুষ বদলায়, পৃথিবীর চেহারা বদলায়—সে কথাও যেমন সত্য সমস্ত বদলের মধ্যেও রামকে আমরা রহিম বলে ভুল করিনা, এ কথাও সমানই সত্য। তাই কেবল মাত্র বদল বল্লে আমাদের প্রশ্ন থামেনা—আমরা জানতে চাই যে কি বদলায়; কেবল মাত্র বদলের ধারা থাকবে, অথচ কিছুই বদলাবে না, এ সব হেঁয়ালী আমরা বুঝি না।

এসব প্রশ্ন নিয়ে নতুন এক ধরণের চিন্তা সুরু করলেন সক্রেটিস—তাই তাঁকে দর্শনের জন্মদাতা বলা হয়। মানুষটী দেখতে শুনতে বোধ হয় কদাকারই ছিলেন—অন্ততঃ যে পাথরের মূর্ত্তিকে আমরা তাঁর মূর্ত্তি বলে জানি, তার দিকে তাকালে বিশেষ ভক্তি জাগে না। পণ্ডিতেরা চেহারা সম্বন্ধে একটু উদাসীন বলেই সবাইর বিশ্বাস, কিন্তু সক্রেটিস বোধ হয় পণ্ডিতদেরও হার মানিয়েছেন। টেকো মাথা, গোলগাল এয়া বড়ো মুখ, চোখ দুটী কোটরের মধ্যে আগুনের মত উজ্জ্বল, আর সব চেয়ে বেশী দ্রষ্টব্য তার বিপুল নাক। কিন্তু এই কদাকার আপন ভোলা মানুষটীর মধ্যে সত্যের প্রতি এমন একটা প্রগাঢ় টান ছিল যে আজ পর্য্যন্ত তাঁর নামে পৃথিবীর সমস্ত দেশেই দর্শনের ছাত্রদের মাথা ভক্তিতে নুয়ে আসে।

সক্রেটিসের দর্শন বলে কোন বাঁধা-ধরা কিছু নেই—তিনি নিজেও কোনদিন কাউকে কিছু শেখাতে চেষ্টা করেন নাই। একটা গল্প আছে যে একবার ডেলফীকে জিজ্ঞাসা করা হইল যে গ্রীসদেশে সব চেয়ে বেশী জ্ঞানী কে? দৈববাণীতে উত্তর এল যে সক্রেটিসের মতন জ্ঞানী গ্রীসে দ্বিতীয় নেই। উত্তর শুনে সক্রেটিস তো অবাক, কারণ সব

চেয়ে বড় জ্ঞানী তো দূরের কথা, নিজেকে তিনি পণ্ডিতই মনে করিতেন না। অনেক ভেবে শেষে তিনি ঠিক করলেন যে ডেলফীর কথাই ঠিক, কারণ কেহই বিশেষ কিছু জানে না, অথচ সবাই নিজেকে মস্ত বড় পণ্ডিত ভাবে। তাই সক্রেটিস বল্লেন যে আমি কিছুই জানিনে, অন্ততঃ এ কথাটাতো আমি জানি, অথচ আর কেউ সে কথাও জানে না।

এই সন্দেহ বা প্রশ্নই তাই সক্রেটিসের দর্শনের গোড়ার কথা—সমস্ত দর্শনেরই গোড়ার কথা জিজ্ঞাসা। যে সমস্ত বিশ্বাস আমাদের কাছে ধ্রুব সত্য বলে মনে হয়, তাদের ধ্রুব ভাববার কারণ কি? সত্যই কি আমরা তাদের সত্য বলেই জানি, যদি তাদের আমরা সত্য বলেই জানি, তবে অন্যান্য বিশ্বাসের সঙ্গে তাদের মিল বা সঙ্গতি কতটুকু? নিজেকে জান—নিজের সমস্ত বিশ্বাসের ভিত্তি খুঁজে বেড়াও—এই হ'ল দর্শনের কাজ। আগেকার সব দার্শনিকেরা পৃথিবী কি দিয়ে তৈরী তাই জানবার জন্য ব্যস্ত ছিলেন—সক্রেটিসের লক্ষ্য হ'ল মানুষের মনকে জানা।

কথাটা শুনতে ভারী সোজা, কিন্তু তার মতন শক্ত কাজ বোধ হয় দ্বিতীয় কিছু নেই। ধর, তোমার মতে তোমাদের ক্লাশের কৃষ্ণচন্দ্রের মতন দুষ্ট ছেলে আর দ্বিতীয় নেই, অথচ সে কৃষ্ণচন্দ্রের তো বন্ধুর অভাব নেই, এবং তার বন্ধুরা তাকে ভাল জানে, ভালবাসে বলেই তো তার বন্ধু। তোমার কাছে যে খারাপ, আর একজনের চোখে সেই ভাল। এ নিয়ে একটা মজার গল্প আছে। ডিমের খোসা ভাঙ্গবার সময় মোটা দিক ভাঙ্গা ভাল—না সরু দিক ভাঙ্গা ভাল? তোমরা হয়তো হাসছ, ভাবছ যে এটিও একটা প্রশ্ন? অথচ তাই নিয়ে দুটো দেশে যুদ্ধ বেঁধে গেল—একদল বল্ল যে মোটা দিক ভাঙ্গলে পৃথিবী রসাতলে যাবে, অন্য দল বল্ল যে



সক্রেটিস

সরু দিক ভাঙ্গলে আর পৃথিবীতে ধর্ম্ম থাকবে না। সে যুদ্ধের কাহিনী তোমরা গালিভারের ভ্রমণ-বৃত্তান্তের মধ্যে পাবে।

সক্রেটিস তাই বল্লেন যে আমরা যে কোন কিছু জানি, এই ভুল ধারণাই প্রথম ভাঙ্গতে হবে। যখনি কেউ বলে বা ভাবে যে আমি এটা জানি বা ওটা জানি, তখনি তাকে জিজ্ঞেস করতে হবে—কি সে জানে। আমরা কারু বিষয় বলি যে অমুকে সত্যবাদী, আর একজনের বেলা ভাবি যে সে ধর্ম্মভীরু, কাউকে বলি অসৎ—কিন্তু সত্য কাকে বলে ধর্ম্মের অর্থ কি—এবং অসৎ, দেশ-প্রেমিক এসব কথা বলতে কি বোঝায়,—তা না জানলে আমরা কেবল কলের পুতুলের মতন অন্যের শেখানো বুলি আওড়াতে পারি, কিন্তু সে সমস্ত কথার কোন মূল্য থাকে না।

আগেই বলেছি যে ইউনান দেশ এশিয়া এবং ইউরোপের মধ্যে একটা সাঁকোর মত। এসিয়ার ভাবনা চিন্তা রীতি-নীতির আমেজও সেখানে মিলত, আবার ইয়োরোপের আদব কায়দার ছায়াও সেখানে পরিষ্কার। তার উপর গ্রীকেরা ছিল নাবিক—দুনিয়ার দেশ-বিদেশ ঘুরে নানান দেশের নানান ভাষা, নানান রীতি-নীতি দেখে কোন একটা বিশেষ দেশের রীতি-নীতির প্রতি তাদের শ্রদ্ধা অটুট থাকবে কেমন করে? রীতি-নীতিকে তাই তারা ভাবত লোকাচার আর লোকাচার মানেই হল অনেকে যা করে। কাজেই শেষ পর্য্যন্ত তা হলে এই দাঁড়ায় যে সত্য, ধর্ম্ম, নীতি এ সমস্তের মানে হল যে সকলে যা করে, তাই কর, তা নইলে সমাজ টেঁকে না। কিন্তু এ মানে কি তোমরা কেউ মানবে?

সবাই যা মানে তাই যদি সত্য হয়, তবে অবস্থাটা কেমন দাঁড়ায় ভেবে দেখতো। এককালে সকলে ভাবতো যে পৃথিবীটা চ্যাপ্টা—তাই যদি সত্য হ'ত তবে আজকাল আমরা যে তাকে ভাবি কমলালেবুর মতন গোল, সে ভাবনা সম্ভব হ'ল কেমন করে? এখনো আফ্রিকায়, অষ্ট্রেলিয়ায় বুনো মানুষ আছে, তারা ভাবে যে তাদের দেবতা যখন রাগে দাঁত কিড়মিড় করে, তারই নাম দিই আমরা বিদ্যুৎ এবং বজ্র। তাদের দেশে তো সকলেই সে কথা ভাবে, কিন্তু তাই বলে কি তা সত্য? ভিন্ন ভিন্ন দেশে যদি সত্যের চেহারা বিভিন্ন হয় তবে তাকে সত্য বলেই বা আমরা জানব কেমন করে?

আর একটি উদাহরণ নেওয়া যাক। আমাদের বাঙ্গলা দেশে আজকালকার হিন্দু-সমাজের মতে গরু খাওয়ার মতন পাপ বোধ হয় আর দ্বিতীয় নেই, কিন্তু চলে যাও পৌরাণিক যুগের গ্রীসে—সেখানে গরু কেটে তার মাংস পুড়িয়ে না খেলে যজ্ঞই হত না। এক দেশে এক কালে যা ধর্ম্ম—অন্য দেশে বা অন্য কালে তাই হয়তো অধর্ম্মের খুঁটি।

অথচ এ কথা আমরা মানতে চাইনে। আমাদের প্রত্যেকের মনেই ধারণা আছে যে ধর্ম্ম কাকে বলে আমরা তা যেমন বুঝি, এমন বোধ হয় আর কেউ বোঝে না। অন্য সকলে হয়তো গোঁজামিল দেয়, কিন্তু নিজের বুদ্ধির উপর আমাদের অগাধ বিশ্বাস। তাই প্রতিদিনকার জীবনে কাউকে ধার্ম্মিক, কাউকে সত্যবাদী, কাউকে সচ্চরিত্র বা সৎ বলিতে আমরা বিন্দুমাত্রও দ্বিধা করি না। সক্রেটিস তাই জিজ্ঞাসা করে বসলেন যে এ সমস্ত কথা যে আমরা ব্যবহার করি—তার অর্থ কি আমরা জানি?

কথার মানে খোঁজা বা বিশ্লেষণই তাই সক্রেটিসের দর্শনের প্রথম কথা। তিনি বল্লেন যে সমস্ত কথাই তলিয়ে দেখতে হবে, কেবল মাত্র ভাসাভাসা জ্ঞানের উপরে ভর করে থাকলে চলবে না—তাতে আমরা

নিজেরাও ঠকবো, অপরকে ঠকাবো। অথচ এমন তার বিশ্লেষণ করতে সুরু করলে পদে পদে আমাদের অজ্ঞতা বেরিয়ে পড়ে। তাই গ্রীসের লোক সহজে সক্রেটিসের কথা স্বীকার করতে চায়নি। যখন তাঁর অটুট তর্কে তারা হেরে যেতো, তখন নিজেদের ভুল স্বীকার না করে তারা আরো চটে উঠতো। শেষে অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে এথেন্সের লোক তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনল যে দেশের দেব-দেবী, দেশের সমস্ত সমাজ ব্যবস্থা উল্‌টিয়ে দিতেই সক্রেটিস চান, তাই দেশের ধর্ম্ম, দেশের সমাজ রক্ষার জন্য সক্রেটিসের মৃত্যুই বাঞ্ছনীয়। বিচার হ'ল—বিচার কি আর তাকে বলা চলে?—বিচারে প্রমাণ হল যে সক্রেটিসের তর্ক আর বিশ্লেষণে লোকের ভক্তি বিশ্বাস কমে এসেছে। তখন তাঁকে বলা হল যে তিনি আর ধর্ম্ম বা সমাজ নিয়ে বিচার করতে পারবেন না। সক্রেটিস অস্বীকার করে বল্লেন, যে আমার জীবনে একমাত্র কাজ সত্য কি তারই খোঁজ। ধর্ম্ম, সমাজে অনেক গলদ, অনেক অসত্য রয়েছে, যদি তাদের বিষয় আলোচনা না করি, তবে সত্যকে জানবো কেমন করে? তখন বিচারকেরা আদেশ দিলেন যে বিষ খেয়ে সক্রেটিসকে মরতে হবে—হাসি মুখে সক্রেটিস বিষের বাটি তুলে নিলেন। বল্লেন, সত্য নিয়েই জীবন, তাই সত্যকে যদি খুঁজতে না পাই তবে তার চেয়ে মৃত্যু ভালো।

[২]

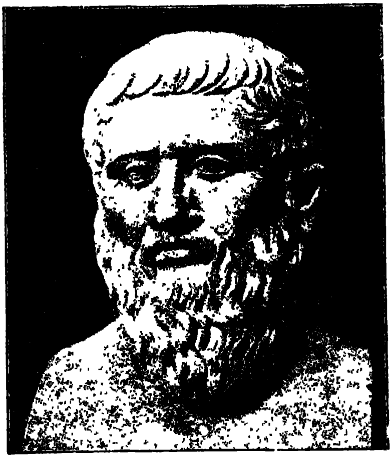
সক্রেটিসের শিষ্য ছিলেন প্লেটো, কিন্তু সক্রেটিসের মতামতে তিনি এত মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন যে প্লেটোর নিজের মতামত যে কি, তা স্থির করা কঠিন ব্যাপার। প্লেটো দর্শনের অনেক সমস্যাই আলোচনা করেছেন, কিন্তু তাঁর সমস্ত আলোচনাই নাটকের ভঙ্গিতে। দু'তিন জন লোক মিলে মিশে আলাপ সুরু করে, হঠাৎ হয়তো কেউ বলে বসল এটা সুন্দর বা ওটা উচিত। তখুনি সক্রেটিস জিজ্ঞাসা করলেন যে সুন্দর মানে কি? উচিত বল্লে কি বোঝায়? অমনি তর্ক সুরু হয়ে গেল, আর প্রত্যেক নিজের মত খোলাসা করতে গিয়ে দেখল যে, সে সব মতামতের ভিত্তি তো কিছু নেইই, এমন কি অনেক ক্ষেত্রে নিজের মতামত যে কি, তা নিজের কাছেও স্পষ্ট নয়। এ সমস্ত তর্কের প্রধান নায়ক সক্রেটিস। তিনি এক এক করে প্রত্যেককে দেখিয়ে দেন যে তার সত্যি কোন মতামত নেই। অবশেষে তাঁর নিজের মত তিনি তাদের কাছে প্রকাশ করেন, তারা সবাই দেখে যে যে কথা তারা বলতে চেষ্টা করেও পারেনি, ঠিক সেই কথাই সক্রেটিস প্রকাশ করে বলেছেন।

সক্রেটিসের মতামত বলেই তাই প্লেটো নিজের সমস্ত কথা প্রকাশ করেছেন, বিশ্লেষণ বা কথা ভেঙ্গে চুরে তার অর্থ কি, সেই বিচারই তাঁরও দর্শনের প্রথম ও প্রধান লক্ষণ। সেই সঙ্গে আরো একটা প্রশ্ন প্লেটোকে ভাবিয়ে তুলেছিল। কেবলমাত্র বদল দিয়ে দুনিয়াকে বোঝা যায় না। সে কথা আমরা আগেই দেখেছি, অথচ জিনিষ যে বদলায় সে কথা অস্বীকার করবারও উপায় নেই। আবার সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড বদলায়, একথারও কোন অর্থ হয় না। কারণ বদল মানে আগে যেটা ছিল না, এখন সেটা হয়েছে, বা আগে যা ছিল, এখন তা নেই। কিন্তু আগে পিছে সমস্তকেই নিয়ে তো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, তাই আগুপিছু সব কিছু যদি আমরা যোগ করি,

তবে এই সব কিছুর আর বদল নেই। তোমাদের ব্যাপারটা হয়ত খুবই গোলমাল ঠেকছে, কিন্তু দর্শনে মাঝে মাঝে গোলমেলে কথা উঠে পড়ে, তাকে বাদ দেওয়া কঠিন, তবে সে গোলমালের মধ্যেও মজা আছে, একবার তার স্বাদ পেলে আর ছাড়তে চাইবে না। একটা মজার গল্প বলি, তা হলেই তোমরা এ গোলমেলে ব্যাপারটা অনেকটা বুঝতে পারবে।

যেনো (Zeno) বলে গ্রীক দার্শনিক ছিলেন, তিনি বলতেন যে কিছুই বদলায় না, বদলাতে পারে না। এমন কি তুমি যদি হেঁটে বেড়াও, তা হলেও তুমি জায়গা বদল করছ না, কারণ—জায়গা বদলাবার তোমার সাধ্য নেই। ধর, তুমি তীর ছুঁড়ে মারলে। এখান থেকে মারলে ১৫ হাত দূরে গিয়ে একটা গাছে তীর বিঁধল, তারটা নিশ্চয়ই জায়গা বদল করেছে? যেনো বল্লেন—কখখনো না। যে কোন মুহূর্তে তীরটা হয়—এক জায়গায় আছে, তা নইলে নেই। যদি সেখানে থাকে, তবে অন্য কোন স্থানে তা নেই। তা ছাড়া এক জায়গায় থাকার মানেই তো স্থির থাকা, কাজেই তীরটা নড়ছেনা। নড়লে তো আর সেখানে থাকত না। আর যেখানে তীর নেই, সেখানে তো নেইই। কাজেই যে কোন মুহূর্তে তীরটা নড়ছে না, এবং ফলে তীরটা কোন সময়েই জায়গা বদল করতে পারে না!!

এ সম্বন্ধে আরো একটা মজার গল্প আছে। একবার এক খরগোস আর এক কাছিমের মধ্যে বাজী হল—কে আগে যেতে পারে? খরগোস বল্লে যে যদি একমাইল দৌড়তে হয়, তবে কাছিম আধ মাইল এগোলে তার পরে খরগোস দৌড়তে সুরু করবে, কাছিম বল্লে যে তা হলে খরগোস কোনদিনই তাকে ধরতে পারবে না। ধর, খরগোস ১২ মিনিটে একমাইল দৌড়ায়, আর কাছিমের লাগে আধ ঘণ্টা তা হলে, ৬ মিনিটে খরগোস আধ মাইল পথ ছুটে এসে দেখল যে ততক্ষণে কাছিম আরো ১/৪ মাইল এগিয়ে গেছে। আড়াই মিনিটে সেটুকু ছুটে এসেও কিন্তু খরগোস কাছিমকে ধরতে পারল না, কারণ ততক্ষণে কাছিম আরো ১/৮ মাইল এগিয়ে গেছে। এক মিনিটে আবার সেটুকু ছুটেও খরগোস কাছিমের নাগাল পেল না, কারণ



প্লেটো

ততক্ষণ কাছিম আরো ১/১৬ মাইল এগিয়ে গেছে—এমনি করে কোনদিনই খরগোস আর কাছিমকে ধরতে পারবে না।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বদলায় না—সে প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে প্লেটো তাই বল্লেন যে পৃথিবী বদলায়ও, বদলায়ও না। তোমরা ভাবছ যে এ ও আবার একটা উত্তর হল? কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে প্লেটোর উত্তরকে

এত সহজে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। তিনি বল্লেন যে বিভিন্ন ইন্দ্রিয় দিয়ে আমরা যা জানি, তা বদলায় এবং বদলাতে বাধ্য, কিন্তু বুদ্ধি দিয়ে তার প্রকৃত স্বভাব জানতে পারলে আর বদলের ভয় থাকে না। ধর দৃষ্টি দিয়ে আমরা জিনিষের রঙ জানি, কিন্তু দৃষ্টি ইন্দ্রিয়, কাজেই জিনিষের রঙের বদল হ'তে বাধ্য। বাস্তবিক পক্ষে হয়ও তাই। ভোরবেলা পাহাড়ের চূড়োর দিকে তাকালে মনে হয় কি সুন্দর গোলাপী রঙের চড়াছড়ি; অথচ দুপুর বেলা সেই পাহাড়ের চূড়োই সাদা তীরের মতন চোখে বিঁধতে থাকে। আবার বাহিরে তার গভীর নীলছায়া আকাশের নীলে মিলিয়ে আসে। তেমনি স্পর্শও ইন্দ্রিয়, তাই স্পর্শ দিয়ে আমরা যা জানি, তাহাও বদলাতে বাধ্য। বরফে খানিকক্ষণ হাত রেখে দাও, তার পরে যদি বেশ গরম জলেও হাত ডোবাও, তাতে জল মোটেই গরম মনে হবে না। অথচ সাধারণ ভাবে সে জলে হাত ডোবালে হাত জ্বলে উঠবে।

ইন্দ্রিয় দিয়ে আমরা যা জানি, তা বদলায়, কিন্তু এত বদলের মধ্যেও গাছকে আগুন, অথবা মানুষকে সমুদ্র বলে ভুল আমরা করিনে। তা সম্ভব হয় কেমন করে বোঝাতে গিয়ে প্লেটো তাই বল্লেন যে বুদ্ধি দিয়ে জিনিষের প্রকৃত স্বরূপ বা স্বভাব জানতে পারলে তার আর অদল-বদল নেই। কাছে থেকে গাছ বড়, দূরে গেলে ছোট, অথচ কাছেই হোক আর দূরেই হোক গাছতো গাছই থাকে। তাই বুদ্ধি দিয়ে গাছের প্রকৃত স্বভাব জানলে আমরা দেখবো যে তার আর বদল নেই—এই প্রকৃত স্বভাব বা স্বরূপ নিয়েই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। বাইরে তার রূপ বা গুণের যতই বদল হোক না কেন, সেগুলি সমস্তই বাহ্যিক, তার প্রকৃত সত্বার বদলও নেই, হ্রাস বৃদ্ধিও নেই। সেই প্রকৃত সত্বারই নাম ব্রহ্ম।

প্লেটোর মতে তাই হীরাক্লীটসে এবং পারমিনাইডিস দু'জনেই খানিকটা ঠিক,



প্লেটোর শিষ্য—আরিস্‌টোটল্‌

খানিকটা ভ্রান্ত। হীরাক্লিটসে ব্রহ্মের কথা ভাবেন নাই, তাই তিনি বল্লেন যে সমস্তই বদলায়, আর পারমিনাইডিস ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য পৃথিবীর কথা খেয়াল করেন নাই বলে তার মতে দুনিয়ার সমস্তই অবিচল—অনড়।



কোর্-আন্

হজরত মোহলায়েল

২৭৪৫ পৃষ্ঠার পর

কেনান নামে হজরৎ শিশের এক পুত্র ছিল। তিনি ও তাঁহার বংশধরগণ বর্ত্তমান প্যালেষ্টাইন প্রদেশে বাস করিতেন বলিয়া তাঁহার নামানুসারে এই প্রদেশের নাম কেনান হইয়াছে। কেনান পিতাপিতামহের ন্যায় অতিশয় ধার্ম্মিক ছিলেন। এই কেনানের এক পুত্র ছিলেন তাঁহার নাম **মোহলায়েল**। তাঁহার এত অনিন্দ্যসুন্দর রূপ ছিল যে, তাঁহার সৌন্দর্য্যসুধা পান করিবার জন্য দূর দূরান্তর হইতে বহু লোক আগমন করিত। **মোহলায়েল** ধার্ম্মিক ছিলেন। তাঁহার দর্শনপ্রার্থী ব্যক্তিগণকে তিনি বলিতেন, "বন্ধুগণ" আমার ক্ষণস্থায়ী সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া আপনারা আমাকে দর্শন করিতে আসেন; একবার ভাবিয়া দেখুন যাঁহার অনন্ত সৌন্দর্য্যের কণামাত্র গ্রহণ করিয়া ফুল সৌন্দর্য্যে ঢলিয়া পড়ে, নদী উথলিয়া উঠে, চন্দ্র-সূর্য্য ধরণী মাতোয়ারা করে, যাঁর অপরূপ সৌন্দর্য্যের প্রতিবিম্ব মাত্র লাভ করিয়া আমি জগতে সুন্দর নামে খ্যাত হইয়াছি, তাঁর সৌন্দর্য্য কত অসীম কত লোভনীয়! আপনারা সেই অনন্ত রূপের সুধা পান করিয়া ধন্য হউন। তিনিই সমস্ত রূপের, সমস্ত গুণের সমস্ত প্রশংসায় অধিকারী। সমস্তই ক্ষণস্থায়ী, শুধু তিনিই চিরস্থায়ী। আপনারা তাঁহারই গুণগান করুন, তাঁহারই উপাসনা করুন।

মোহলায়েল উপদেশে অনেকেরই জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হইল; কিন্তু অজ্ঞ লোকেরা তাঁহার শারীরিক গঠনভঙ্গীতে, তাঁহার অপরূপ সৌন্দর্য্যে এত বিমোহিত হইয়াছিল যে তাঁহার সৌন্দর্য্যসুধা পানের জন্য তাহারা পতঙ্গের ন্যায় ছুটিয়া আসিত। ইহাতে **মোহলায়েল** ত্যক্ত-বিরক্ত হইয়া উঠিলেন এবং নিয়ম করিলেন যে, বিনা উপহারে কাহাকেও দর্শন দিবেন না! রাস্তা চলিবার সময় তিনি সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত করিয়া মুখমণ্ডলের উপর একটি পর্দ্দা নিক্ষেপ করিয়া পথ চলিতেন। তথাপি লোকের আগ্রহ কমিল না। যাহা হউক এই ব্যবস্থায় মোহলায়ের বেশ অর্থাগম হইতে লাগিল। কিন্তু মানুষ মাত্রেই মৃত্যুর অধীন। মোহলায়েলের এই সৌন্দর্য্য লীলায়িত দেহও কালের কঠোর হাত এড়াইতে পারিল না। তিনি জগৎ ছাড়িয়া স্বর্গধামে চলিয়া গেলেন।

মোহলায়েলের মৃত্যুতে তাঁহার পুত্র-পৌত্র-গণের অর্থাগম বন্ধ হইয়া গেল। তাঁহারা মহা চিন্তায় পড়িলেন। অতঃপর স্থিরীকৃত হইল যে তাঁহারা **মোহলায়েলের** অনুরূপ একটী মূর্ত্তি প্রস্তুত করিবেন এবং উহাকে পর্দ্দার আড়ালে রাখিয়া সৌন্দর্য্যপপাসু দর্শকগণের নিকট হইতে উপহার আদায় করিবেন। যুক্তি কার্য্যে পরিণত হইল। আবার অর্থাগম সুরু হইল।

এই সময় জনসমাজে সৌন্দর্য্য-লালসা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। **মোহলায়েলের** মূর্ত্তি দেখিয়া লোকে তাহার অনুকরণে তদপেক্ষা আরও অধিকতর সুন্দর করিয়া মূর্ত্তি তৈয়ার করিতে প্রয়াস পাইল। নানাস্থানে তাঁহার মূর্ত্তি রুচির তারতম্যানুসারে বিভিন্ন আকৃতিতে প্রকাশ পাইতে লাগিল। মানবের এই প্রাথমিক আকাঙ্ক্ষাক্রমে ভাস্কর্য্য শিল্পের উদ্ভব করিল। **মোহলায়েলের** ভক্তবৃন্দ কালক্রমে ঐগুলিতে দেবত্ব অবশেষে ঈশ্বরত্ব আরোপ করিয়া উহারই পূজা করিতে লাগিল। জগতে পৌত্তলিকতার প্রথম সূচনা হইল।

উচ্ছৃঙ্খলতাই জগৎকে ধ্বংসের পথে লইয়া যায়। পক্ষান্তরে সংযমশীলতা ইহাকে উন্নতির পথে চালিত করে। বিশ্রাম, পরিশ্রম, আহার, বিহার প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্যই ব্যবহারের রীতি অনুসারে জীবের উন্নতি বা অবনতি সাধন করে। অগ্নি সংযতভাবে ব্যবহৃত হইলে জগতের মহোপকার সাধন করে; কিন্তু একটু উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় পাইলে, সে মুহূর্ত্ত মধ্যে সৌন্দর্য্যভরা বিশ্বকে ভস্মস্তূপে পরিণত করিয়া ছাড়ে। তদ্রূপ ষড়্‌রিপু সংযতভাবে পরিচালিত হইলে মানুষের মহোপকার সাধন করে; কিন্তু উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় পাইলে উহারা অচিরে জীবের ধ্বংস আনয়ন করে।

ভক্তি মানবের একটী অলঙ্কার। উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় না দিয়া সীমার ভিতরে থাকিয়া ভক্তি প্রদর্শন করিলে তাহা মর্ত্তাকে সত্য সত্যই স্বর্গে পরিণত করিতে পারে। কিন্তু সংযমের অভাবে মনের এই পবিত্রতম বৃত্তিটী কক্ষচ্যুত গ্রহের ন্যায় মনের যাবতীয় বৃত্তিগুলির ধ্বংস আনয়ন করে।

বিশ্বসৃষ্টির পূর্ব্বে সকল স্থানেই অন্ধকারের একচ্ছত্র রাজত্ব ছিল। তারপর আলোকের ব্যবস্থা হইল। তখন আলোকে আঁধারে তুমুল দ্বন্দ্ব বাধিয়া গেল। আলোকের প্রভাবে অন্ধকার ক্ষণিক পরাজিত হইয়া স্থান বিশেষে সঙ্কুচিত ভাবে লুকায়িত থাকে; কিন্তু সুযোগ পাইলেই আবার স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়া থাকে। আধ্যাত্মিক জগতেরও এই একই ব্যবস্থা। মানব জীবনের পূর্ব্বে পশুত্ব মনোরাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি ছিল। তারপর যখন বিবেকের আলোক তথায় স্থাপিত হইল তখন সে সাময়িকভাবে পরাভব স্বীকার করিল বটে কিন্তু সুযোগ পাইলেই আবার নিজ মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া মানসরাজ্যে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করিয়া থাকে।

উচ্ছৃঙ্খলতা পশুত্বেরই নামান্তর। উহা জীবের মৌলিক গুণ। ইহার মৌরশী স্বত্বের মধ্যে বিবেকের পত্তন করিতে হইলে ইহার পশ্চাতে প্রবল রাজশক্তির প্রয়োজন। অপ্রতিহত প্রতাপশালী, বিশ্বজগতের রাজাধিরাজ আল্লাহ্ বিবেককে জয়যুক্ত করিবার জন্য সতত উহার পশ্চাতে দণ্ডায়মান। পশুত্বের প্রাবল্য ঘটিলে আত্মার আলো নিভিয়া যায়। সুতরাং মানব নামধেয় জীব তখন অন্ধকারে যষ্টি ভ্রমে সর্পকে ধারণ করে অমৃত ভ্রমে হলাহল পান করিয়া থাকে। কিন্তু আল্লার ইচ্ছা মানুষকে পূর্ণত্বে উপনীত করা। তাই তিনি মানব-মনের এই প্রগাঢ় অন্ধকারের রাজ্যে বিবেকের বর্ত্তিকা প্রজ্জ্বলিত করিবার জন্য, এবং যাহাতে উহা ক্রমশঃ শক্তিশালী হইয়া, সেই অন্ধকারকে নির্ব্বাসিত করতঃ উহাকে স্বর্গীয় আলোকরশ্মিতে চির-উদ্ভাসিত করে, তজ্জন্য, সেই আলোকের রক্ষকরূপে পয়গম্বর প্রেরণ করেন। এই বিবেক বর্ত্তিকা যাহাতে পশুত্বের কালবৈশাখীর ঝটিকাবর্ত্তে নিভিয়া না যায়, তজ্জন্য তিনি জাতির নিকট আল্লার বাণী প্রচার করেন। কিন্তু সূর্য্যসিংহ অস্তাচল গুহাশায়ী হইলে ধ্বান্তরূপ দন্তিযূথ যেমন নির্ভয়ে জগৎ আক্রমণ করে জগতের এই শিক্ষাগুরুর তিরোধানেও তেমনি আত্মার সেই প্রাথমিক বৃত্তিটি শৃঙ্খলমুক্ত দুর্দ্দান্ত রাক্ষসের ন্যায় আত্মাকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করিয়া বসে।

মোহলায়েলের শিক্ষা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই জাতির মনে এইরূপে পশুত্বের পূর্ণপ্রভাব বিস্তার

লাভ করিল। একেশ্বরবাদের শিক্ষা লোপ পাইল। ঘরে ঘরে পৌত্তলিকতার আসন সুদৃঢ় হইল। কিছু দিন এই ভাবে চলিল। জাতি ক্রমে পৌত্তলিকতার গাঢ় অন্ধকারে আকণ্ঠ-নিমজ্জিত হইয়া নানা প্রকার কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হইল। রিপুগুলি অসংযত অগ্নি-শিখার ন্যায় দাউ দাউ করিয়া জলিয়া উঠিল। মানুষ শুধু বাহ্যতঃ মানুষ রহিল; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সে আবার পশুতে পরিণত হইল।

হজরৎ ইদ্রিছ

জীবের ক্রমোন্নতিই স্রষ্টার অভিপ্সিত। তাই তিনি স্বয়ং চালকরূপে জীবকে নিকৃষ্ট অবস্থা হইতে উৎকৃষ্ট অবস্থায় উন্নীত করিতেছেন। পশুকে মানবের স্তরে উন্নীত করিয়াছেন তিনি কি আবার তাহাকে পশুত্বের স্তরে অবনমিত হইতে দিবেন? তাই যাহাতে মানুষ পুনরায় পশুত্বে পরিণত না হইয়া ক্রমশঃ পূর্ণত্বের দিকে অগ্রসর হয় তজ্জন্য তিনি তাহাদের শিক্ষার নিমিত্ত জাতির শিক্ষকরূপে পয়গম্বরকে প্রেরণ করেন। হজরৎ **মোহ্‌লায়েলের** পর যখন জাতি আল্লাকে ছাড়িয়া পুনরায় মূর্ত্তিপূজা করিতে লাগিল, নানারূপ অধর্ম্ম, অনাচার, কুসংস্কার প্রভৃতির মধ্যে নিমজ্জিত হইল, তখন আবার তাহা-দিগকে পথ দেখাইবার জন্য **মোহলায়েলের** বংশে **আখ্‌নোছ** নামক এক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিলেন।

আখ্‌নোছ অত্যন্ত চিন্তাশীল ও জ্ঞানী ছিলেন। এইজন্য তাঁহাকে **ইদ্রিছ** নামে অভিহিত করা হইত। তিনি অত্যন্ত সৎ ও ধার্ম্মিক ছিলেন। শেলাইয়ের কার্য্য দ্বারা তাঁহার জীবিকানির্ব্বাহ হইত। এই শেলাই অর্থে আজকালকার দর্জ্জিদের মত শেলাই নহে। **হজরৎ ইদ্রিছ** নব-প্রস্তর যুগের মানুষ। তখন সমাজ এতদূর সভ্য হইতে পারে নাই। গাছের ছাল, পাতা, পশুর চামড়া, লোম, পক্ষীর পালক প্রভৃতি পরিধেয় রূপে ব্যবহৃত হইত। তিনি এইগুলির দ্বারা গাত্রাবরণ প্রস্তুত করিতেন, এবং তদ্দ্বারাই জীবিকা অর্জ্জন করিতেন। এবং আধ্যাত্মিক শিক্ষার সঙ্গে এই শিল্প-শিক্ষাও জনসমাজে প্রচার করিতেন।

হজরৎ ইদ্রিছ তাঁহার জাতির অধঃপতন দেখিয়া তাহাদিগকে সত্যধর্ম্মে আহ্বান করিলেন কিন্তু জাতির মন অধঃপতনের চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছে; সুতরাং তাহারা তাঁহার কথায় ক্ষেপিয়া উঠিল; তাঁহার প্রতি নানারূপ অত্যাচার করিতে লাগিল। তথাপি তিনি দমিলেন না। আল্লার আদেশে তিনি পূর্ণউদ্যমে লোকদিগকে আল্লার শিক্ষা দান করিতে লাগিলেন। এইরূপে আবার তিনি বহু লোককে সত্যধর্ম্মে ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ হইলেন; আবার আল্লার শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইল। এইরূপে তিনি আল্লার বাণী প্রচার করিয়া পরিণত বয়সে স্বর্গারোহণ করিলেন। **হজরৎ ইদ্রিছের** সময় মোছলমানের সংখ্যা আরও বর্দ্ধিত হয় বলিয়া তিনিও কাবার ঘরের সংস্কার সাধন করেন।

হজরৎ নূহ্

হজরৎ মোহ্‌লায়েলের মৃত্যুর পর তাঁহার ভক্তবৃন্দ তাঁহার মূর্ত্তি তৈয়ার করিয়া উহাকেই মোহলায়েল জ্ঞানে ভক্তি-অর্ঘ্য প্রদান করিত। হজরৎ ইদ্রিসের শিক্ষায় উহার কথঞ্চিৎ হ্রাস হইল বটে কিন্তু তাঁহার তিরোধানে তাঁহার ভক্তগণও তাঁহার শিক্ষা ভুলিয়া পূর্ব্বপুরুষদের অনুকরণে ইদ্রিছের সাধ মিটাইতে লাগিল। এই ভক্তি ক্রমে উচ্ছৃঙ্খলতায় পরিণত হইল।

শিক্ষার প্রসার তখন হয় নাই। লেখাপড়ার প্রথা সবে মাত্র আবিষ্কৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে; কিন্তু জ্ঞান তখনও বিকাশ লাভ করে নাই। মনের দৃঢ় বিশ্বাসকেই তখনকার লোকে দেবতার আদেশ বা ধর্ম্ম মনে করিত। দর্শন, বিজ্ঞানের, উদ্ভব ও তখন হয় নাই, সুতরাং কার্য্যকারণ জ্ঞানও মানুষের হয় নাই। অতএব প্রকৃতির প্রত্যেক পরিবর্ত্তনকে তাহারা দেবতার লীলা বা ভ্রূকুটি মনে করিত। রামধনুকে তাহারা দেবতার কোপের অস্ত্র মনে করিত; চন্দ্র সূর্য্যের গ্রহণকে অশুভ দেবতার প্রভাব, বজ্রপাত, উল্কাপাত প্রভৃতিকে তাহাদের প্রহরণ ইত্যাদি মনে করিত। ঝড় বৃষ্টি শিলা প্রভৃতির সময় তাহারা মনে করিত দেবতারা রোষ পরবশ হইয়া মেঘের আড়াল হইতে ঐগুলি নিক্ষেপ করিতেছে; দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি

প্রভৃতিকে তাহারা দেবতার কোপ মনে করিত। বাবিলন অতিশয় উর্ব্বরা কৃষিপ্রধান দেশ; নদীর দ্বারা এখানে কৃষির প্রভূত উপকার হইয়া থাকে সুতরাং নদীকে তাহারা দেবতা জ্ঞানে স্তব-স্তুতি করিত। প্লাবনের অভাবে কৃষিকার্য্যের অনিষ্ট হইলে নদীর দেবতাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তাহারা উহাতে পশ্বাদি পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিত। এইরূপে ভক্তির বন্যা যখন বিবেকের বাঁধকে রসাতল করিয়া দুকূল ছাপাইয়া উঠিল তখন মনের যাবতীয় সৎ-প্রবৃত্তিগুলি কোথায় ভাসিয়া গেল! এই অসংযত ভক্তির ফলে, রোগ শোক, বিপদাপদ, অভাব-অনাটনের সময় তাহারা স্বপ্নে দেখিত, ঐগুলির দেবতার নিকট প্রার্থনা বা মানস করিলেই তাহারা মুক্তি পাইবে; সুতরাং এই স্বপ্নকে তাহারা দৈবাদেশ মনে করিয়া ঐ সমস্ত দেবতার কল্পিত মূর্ত্তির নিকট নরবলি, সন্তানবলি পর্য্যন্ত প্রদান করিত। এবং উহাদের স্তব স্তুতি করিত।

তাহারা পূর্ব্বপুরুষদের কাছে শুনিয়াছিল, তাহাদের আদি পিতা আদম ও আদি মাতা হাওয়া স্বর্গের বাগানে, ময়ূরের সহায়তায় সর্প-রূপী শয়তানের প্রলোভনে কোন নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিয়াছিলেন বলিয়া, মর্ত্ত্যধামে তাঁহাদের নির্ব্বাসন হইয়াছিল। এই পূর্ব্বস্মৃতি স্মরণ করিয়া তাহারা আদম, হাওয়া, সর্প, ও ময়ূরের একটী মূর্ত্তি তৈয়ার করিয়া উহার পূজা করিত। অধুনা বাবিলনে এই মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাতে নগ্নদেহ একটী পুরুষ ও একটী স্ত্রী আলুলায়িত কুন্তলে একটী বৃক্ষের নিম্নে দণ্ডায়মান হইয়া উহার ফল-সংগ্রহে হস্ত প্রসারণ করিয়াছেন, সর্প স্ত্রীলোকটীর কাণে কি যেন বলিতেছে! ইদানীং সিন্ধুর অন্তর্গত মহেঞ্জদারোতে এইরূপ মূর্ত্তি বিশিষ্ট একটী সীলমোহর আবিষ্কৃত হইয়াছে (৩৮৭ নং সীল)। বাবিলনীয় সভ্যতাই যে ক্রমে ভারতে প্রসার লাভ করিয়াছিল, ইহার দ্বারা তাহাই সুস্পষ্ট বুঝা যায়।

এইরূপে তাহারা সমস্ত বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাকে ভুলিয়া, তাঁহারই সৃষ্ট প্রকৃতির কোন পদার্থ বা শক্তিকে উপাস্য জ্ঞানে পূজা করিতে লাগিল। কাল ক্রমে উহাদের কল্পিত মূর্ত্তি প্রস্তুত হইল, এবং মানুষের রুচির বিভিন্নতায় ও জ্ঞানের তারতম্যে এই সমস্ত কল্পিত মূর্ত্তি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পরিবারে বিভিন্ন আকৃতি পরিগ্রহ করিল। এবং উহাদের উপাসনা পদ্ধতিও বিভিন্ন প্রকারের হইয়া পড়িল, ইহারই ফলে মানুষে মানুষে ভেদনীতির প্রবর্ত্তন হইল; এক জাতির সহিত অন্য জাতির এক পরিবারের সহিত অন্য পরিবারের, এক ভাইয়ের সহিত অন্য ভাইয়ের মতদ্বৈধ অবশেষে শত্রুতা উপস্থিত হইল। শান্তি পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। সৃষ্টির প্রাক্কালের, স্বর্গীয় দূতগণের সেই সতর্ক বাণী সফল হইতে চলিল।

কিন্তু মানুষের অধঃপতন বিশ্বনিয়ন্তার অভিপ্রেত নহে। তিনি তাহাদিগকে কোন এক সমুন্নত আলোকময় স্থানের সন্ধানে চালিত করিতে স্বতঃই তৎপর।

প্রত্যেক বিষয়েরই সীমা আছে। অবনতিরও সীমা আছে। কোনও বিষয় চরম সীমায় উপস্থিত না হইলে তাহার পরিবর্ত্তন হয় না; ইহাই বিধির বিধান, প্রকৃতির নিয়ম।

জাতি যখন অবনতির দিকে অগ্রসর হইতে থাকে তখন চরম সীমায় না পৌছা পর্য্যন্ত তাহার গতির পরিবর্ত্তন হয় না। মঙ্গলময় আল্লাহ্ এই সময়ের প্রতিক্ষা করিয়া থাকেন। তাই যখন আরব জাতির অধঃপতনে ব্যথিত হইয়া **হজরৎ মোহাম্মদ** তাহাদের মুক্তির জন্য আল্লার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন তখন আল্লাহ্ প্রত্যাদেশের দ্বারা তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া বলিয়াছিলেন, "হে মোহাম্মদ, তুমি ব্যস্ত হইওনা, "যখন আল্লার সাহায্য ও বিজয় আসিবে তখন দেখিবে দলে দলে লোক আল্লার ধর্ম্মে প্রবেশ করিতেছে।" আল্লার এই চিরন্তন বিধান, যুগে যুগে একই ভাবে বলবৎ রহিয়াছে। এইজন্য জাতি যখন অবনতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে তখনই তিনি তাহাদের মুক্তির জন্য একজন শিক্ষক প্রেরণ করিয়াছেন।

হজরৎ ইদ্রিছের পর জাতির অধঃপতন যখন চরম সীমায় উপস্থিত হইল তখন তাঁহারই বংশে 'শোকর' নামে এক সাধু পুরুষ জন্মগ্রহণ করিলেন।

বাল্যকাল হইতেই তিনি অত্যন্ত চিন্তাশীল ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। জাতির এই অধঃপাত দেখিয়া তিনি তাহাদিগকে নানারূপ সদুপদেশ দিলেন, এবং যাবতীয় কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়া আল্লার পথে প্রবেশ করিতে আহ্বান করিলেন। তাহারা তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না; তখন তিনি ব্যথিত অন্তঃকরণে তাহাদের মুক্তির জন্য দিবারাত্র আল্লার কাছে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এই করুণ ক্রন্দনের জন্য পরে তাঁহার নাম হইল 'নূহ্'।

নূহ্ ব্যথিত অন্তঃকরণে দেশবাসিগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "হে আমার দেশবাসিগণ, আমি তোমাদের নিকট আল্লার প্রেরিত নবী। তোমাদিগকে সতর্ক করিয়া দিতেছি, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারও উপাসনা করিও না। তোমাদের এই মহাপাপের প্রতিফল স্বরূপ তোমাদের নির্দ্ধারিত শাস্তির জন্য আমার প্রাণ শিহরিয়া উঠিতেছে।" নূহের বাণী শুনিয়া তাহাদের প্রধানগণ বলিলেন, "হে নূহ্, তুমিও আমাদের মত জন্ম-মৃত্যুর অধীন একজন জীব। যাহারা বর্ব্বর অর্ব্বাচীন, তাহারা তোমার অনুসরণ করিবে। আমরা তোমার মধ্যে আমাদের অপেক্ষা অধিকতর কোন গুণের অস্তিত্ব দেখিতেছি না; বরং তুমি ঘোর মিথ্যাবাদী! তোমার আল্লাহ ইচ্ছা করিলে একজন স্বর্গীয় দূত প্রেরণ করিতে পারিতেন।" নূহ বলিলেন ভ্রাতৃগণ, আমি তোমাদের নিকট হইতে কোন পুরস্কার প্রার্থনা করি না; আমার পুরস্কার আল্লাই দিবেন। আমি দেখিতেছি তোমরা নেহায়েৎ অজ্ঞ। ভ্রাতৃগণ, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি না যে আল্লার ধনভাণ্ডার আমার হাতে আছে; আমি এমন বলিতেছি না যে আমি ভবিষ্যৎবক্তা; অথবা আমি এমনও বলিতেছি না যে আমি একজন স্বর্গের দূত; কিংবা এমন বলিতেছি না যে যাহাদিগকে তোমরা বর্ব্বর অর্ব্বাচীন মনে কর, আল্লাহ তাহাদের মঙ্গল বিধান করিবেন না। আল্লাহ তাহাদের অন্তরের খবর জানেন।" তাহারা বলিল "হে নূহ্, বাদানুবাদ ত অনেক হইল; এখন তুমি যদি সত্য নবী হও, তবে যে শাস্তির কথা তুমি আমাদিগকে বলিলে তাহার বিধান কর।" নূহ্ বলিলেন "যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন, তিনিই ইহার বিধান করিবেন; এবং তোমরা কেহই তাহা হইতে পরিত্রাণ পাইবে না। যদি তোমাদিগকে ধ্বংস করাই আল্লার অভিপ্রায় হয় তবে আমি তোমাদিগকে যে উপদেশ দিতেছি তাহাতে তোমাদের কোন পরিবর্ত্তন হইবে না। কিন্তু তোমরা জানিয়া রাখ, তিনিই তোমাদের প্রভু, তাঁহাতেই তোমরা সকলে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে।" নূহ্ এই ভাবে অহোরাত্র তাঁহার জাতিকে সদুপদেশ দিয়া সত্য পথে আহ্বান করিলেন কিন্তু "চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী।" উপদেশে কোন ফল হইল না দেখিয়া ধর্ম্মপ্রাণ নূহের অন্তঃকরণ আরও ব্যথিত হইয়া উঠিল। তিনি দেশবাসীর পাপের কথা ও তাহাদের শাস্তির কথা স্মরণ করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে আল্লার কাছে তাহাদের মুক্তি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

যুগযুগান্তর ধরিয়া কুসংস্কারে নিমজ্জিত থাকায় লোকের মন জড়বৎ হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং নূহের মুক্তির বাণী তাহার উপরে প্রতিফলিত হইতে পারিল না। লোক ক্ষেপিয়া উঠিল, তাঁহাকে পাগল বলিতে লাগিল; নানারূপ কটূক্তি বর্ষণ করিতে লাগিল। তথাপি তিনি বিরক্ত হইলেন না। নূহের এই ধৃষ্টতায় সকলে তাঁহার ও তাঁহার সঙ্গিগণের উপর নানারূপ অত্যাচার অবশেষে তাহাদিগকে প্রহার করিতে লাগিল! অত্যধিক প্রহারে জর্জ্জরিত হইয়া কখন কখন তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িতেন; আবার সংজ্ঞা লাভ করিয়াই তাহাদের সকল অপরাধ ভুলিয়া তাহাদিগকে এক আল্লার পথে আহ্বান করিতেন। সকলে তাঁহার আহ্বানে বিরক্ত হইয়া একদিন তাঁহার গলায় রজ্জু বদ্ধ করিয়া প্রহার করিতে করিতে মাটির উপর দিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। পথের কঙ্করাঘাতে তাঁহার শরীরের নানা স্থানের মাংস, চর্ম্ম ছিঁড়িয়া গেল, দন্ত উৎপাটিত হইল, অবিরলধারে রক্তপাত হইতে লাগিল; সংজ্ঞা লোপ হইল। কিন্তু আল্লার প্রেমে মগ্ন যাঁহারা, তাঁহারা কি পার্থিব দুঃখ কষ্টে দমিত হন? আরোগ্য লাভ করিয়াই নবীবর আবার লোকদিগকে আল্লার পথে আহ্বান করিতে লাগিলেন।

এবারও তাঁহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল। আপ্রাণ সাধনার ফলে মাত্র ৪০ জন পুরুষ ও ৪০ জন স্ত্রীলোক নূহের উপদেশে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার সত্য সনাতন ইছলামধর্ম্মে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

পয়গম্বরগণ পবিত্রাত্মা। তাঁহারা আল্লার প্রেমের মধুর আস্বাদ পাইয়া জিতেন্দ্রিয়া হইয়াছেন। কিন্তু সকল জিনিষেরই একটা সীমা আছে। পয়গম্বর হইলেও তাঁহরাও ধৈর্য্যের সীমা আছে। বার বার অসহ্য উৎপীড়নে জর্জ্জরিত হইয়া তিনি ধৈর্য্যের সীমা লঙ্ঘন করিলেন। এইবার তিনি অল্লার কাছে নিবেদন করিলেন, "হে আল্লাহ্ আমার জাতি কিছুতেই আমার কথা শুনিল না, আমি আর সহ্য করিতে পারি না। তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর।

প্রার্থনা কবুল হইল। প্রত্যাদেশ হইল "হে নূহ্, আমি তোমার জাতির উপর আমার অভি-সম্পাত স্বরূপ এক মহাপ্লাবনের ব্যবস্থা করিব। তাহাতেই তাহাদের ধ্বংস হইবে। তুমি কাঠের তথ্‌তা দিয়া একটী সুবৃহৎ জাহাজ তৈয়ার কর। তথ্‌তাগুলি পেরক দিয়া আবদ্ধ কবিবে। উহাতে তুমি, তোমার পরিবাববর্গ ও অন্যান্য বিশ্বাসী ব্যক্তিগণ পরিত্রাণ পাইবে। অবিশ্বাসীগণ ডুবিয়া মরিবে।

আদেশানুযায়ী জাহাজের নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হইল। সুদূর মিশরের নীলনদের তীর হইতে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ আনীত হইল; এবং ঐগুলি চিরিয়া তথ্‌তা প্রস্তুত করিয়া সেই তথ্‌তা দিয়া পূর্ব্বোক্ত উপদেশানুযায়ী জাহাজ নিম্মিত হইল। তখন দৈববাণী হইল, "হে, নূহ্, তোমার উনান হইতে যখন জলে উঠিবে তখন জানিবে সেই মহা-প্লাবনের সূচনা হইল। তখন তোমার পরিবারবর্গ ও অন্যান্য বিশ্বাসী ব্যক্তিগণকে লইয়া তুমি জাহাজ আরোহণ করিবে। সঙ্গে প্রত্যেক আবশ্যকদ্রব্যের একজোড়া করিয়া লইবে। অবিশ্বাসীগণ এই মহা প্লাবনে ডুবিয়া মরিবে তুমি আমার ঘরে তোয়াফ (Towaf) করিয়া হজব্রত সম্পাদন কর।"

নূহের জাহাজ তৈয়ারী দেখিয়া তাঁহার প্রতি-বেশীগণ উপহাস করিয়া বলিতে লাগিল "নিশ্চয়ই নূহের মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে; নতুবা সে শুষ্ক ভূমিতে জাহাজ তৈয়ার করিবে কেন?" নূহ্ বলিলেন "ওহে তোমরা আমার উপদেশ না শুনায় আল্লাহ্ তোমাদের শাস্তিবিধানার্থ এক মহাপ্লাবনের ব্যবস্থা করিবেন, তাহাতে অবিশ্বাসী সকলে ডুবিয়া মরিবে। সেই মহাপ্লাবন হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য আল্লার আদেশে আমি এই জাহাজ নির্ম্মাণ করিতেছি"। তখন অধিবাসিগণ বলিতে লাগিল "হে নূহ্, তুমি নেহায়েৎ বোকা। যদি প্লাবন উপস্থিত হয় তবে অত্যুচ্চ পর্ব্বতে আরোহণ করিলেই রক্ষা পাওয়া যাইবে। জাহাজের আবশ্যকতা কি?" নূহ্ বলিলেন "ওহে তোমরা জাননা অত্যুচ্চ পর্ব্বত পর্য্যন্ত এই প্লাবনে ডুবিয়া যাইবে। অবিশ্বাসীদের কেহই পরিত্রাণ পাইবে না।" নূহের কথা শুনিয়া সকলে হাসিয়া উঠিয়াছিল।

জাহাজ নির্ম্মাণ শেষ হইল। নূহ্ আল্লার আদেশানুযায়ী সঙ্গিগণসহ মক্কায় গিয়া হজব্রত সমাপন করিলেন।

একদিন নূহের স্ত্রী রান্না-ঘরে পাক করিতেছিলেন এমন সময়ে উনানে জলের আবিভাব হইল। জ্বলন্ত অগ্নি নিবিয়া গেল। নূহেব স্ত্রী ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া স্বামীকে এই আকস্মিক সংবাদ দিলেন। নূহ বুঝিল আল্লার ইঙ্গিত সফল হইল। সুতবাং তিনি সপরিবারে সত্বর জাহাজে উঠিলেন।

দেখিতে দেখিতে মুষলধারে বারিপাত আরম্ভ হইল; নদনদী উথলিয়া উঠিল। পশ্চিম দিক হইতে উদ্দামগতিতে স্রোত আসিয়া দেশকে রসাতল করিয়া দিল। পদাতিক এবং বৈমানিক সৈন্যেরা যুগপৎ আক্রমণে যেমন শত্রুসৈন্য অচিরাৎ বিধ্বস্ত হয়, পশ্চিমের খরস্রোত এবং আকাশের অবিরাম বারিপাতেও তেমনি দেশ বিধ্বস্ত হইয়া গেল। অত্যুচ্চ পর্ব্বতের চূড়া পর্য্যন্ত গভীর জলে নিমজ্জিত হইল। ৪০ দিন পরে বারিপাত ক্ষান্ত হইল কিন্তু প্লাবনের বিরাট দেহ আর কমে না। দেশে যত জীবজন্তু ছিল তরঙ্গাঘাতে সমস্তই ভাসিয়া গেল। অত্যুচ্চ পর্ব্বত শিখরে উঠিয়াও কেহই পরিত্রাণ পাইল না। নূহের জাহাজ বিরাট পর্ব্বতের ন্যায় ইতস্ততঃ ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল।

ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মতে প্রায় ৮০০০ হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভূমধ্যসাগরের অস্তিত্ব ছিল না। এখন যেখানে ভূমধ্যসাগর অবস্থিত তথায় কয়েকটী মাত্র হ্রদ ছিল। উক্ত পণ্ডিতগণ আরও বলেন নব-প্রস্তর যুগের শেষভাগে হঠাৎ একবার আটলান্টিক মহাসাগরে প্রবল বন্যার আবির্ভাব হয়। বন্যার জল জিব্রাল্টার প্রদেশের উপর দিয়া পূর্ব্বদিকের হ্রদগুলির মধ্যে প্রবলবেগে গড়াইয়া পড়িতে থাকে। ইহার ফলে পূর্ব্ব দিকস্থ কেনান প্রদেশ জলমগ্ন হইয়া বন্যার জল শত শত মাইল ব্যাপিয়া দক্ষিণ ও পূর্ব্ব দিকের দেশগুলিকে ভাসাইয়া দেয়। আটলান্টিকের বন্যার বিশাল স্রোত অবিরাম-গতিতে নীচু হ্রদগুলির মধ্যে গড়াইয়া পড়াতে হ্রদের বাড়ীঘর জনমানব লুপ্ত হইল; হ্রদগুলি একাকার হইয়া ক্রমে স্থানটী সাগরে পরিণত হইল। ইহাই বর্ত্তমানের ভূমধ্যসাগর। এবং এই প্লাবনই **হজরৎ নূহের সেই মহাপ্লাবন**। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন খৃঃ পূঃ প্রায় ৫৬০৩ অব্দে এই প্লাবন হইয়াছিল।

চল্লিশদিন পরে আকাশের বর্ষণ থামিয়া গেল কিন্তু ভূপৃষ্ঠ তখনও জলমগ্ন রহিয়া গেল। গাছপালা বনজঙ্গল, পাহাড়পর্ব্বত সমস্তই জলের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া রহিয়াছে। চারিদিক শুধু জলময়। সূর্য্য জলে উঠে জলেই ডুবিয়া যায়। উত্তাল তরঙ্গের নূহে্‌র জাহাজ আন্দোলিত হইতে হইতে কখন এদিকে কখন ওদিকে ধাবিত হইতে লাগিল।

এইরূপে দিনের পর দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল; ক্রমে জলও কমিতে লাগিল। কোথাও একটা পর্ব্বতের কোথাও একটা বৃক্ষের চূড়া দৃষ্টি-গোচর হইতে লাগিল। হজরৎ নূহ্‌ জাহাজ হইতে অবতরণ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। কোথাও শুষ্কস্থান পাওয়া যায় কিনা জানিবার জন্য তিনি কাককে ছাড়িয়া দিলেন। কাক আর ফিরিয়া আসিল না। তখন কপোতকে ছাড়িয়া দিলেন। কপোত জলপাই বৃক্ষের একটী পাতা ঠোঁটে করিয়া জাহাজে ফিরিয়া আসিল। নূহ্‌ ভাবিলেন বৃক্ষাদি দৃশ্যমান হইয়াছে। আরও অধিকতর নিশ্চিন্ত হইবার জন্য এইবার তিনি কুক্কুটকে ছাড়িয়া দিলেন। কুক্কুট ফিরিয়া আসিল না। তখন তিনি নিশ্চিন্তরূপে বুঝিলেন মাটী শুষ্ক হইয়াছে।

তোমরা এশিয়ার মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখিবে এশিয়ামাইনরের পূর্ব্বপ্রান্তে আর্ম্মেনিয়ার পার্ব্বত্যপ্রদেশ। ইহার দক্ষিণদিকে মেসোপটেমিয়ার উর্ব্বর সমতলভূমি। এই আর্ম্মেনিয়া প্রদেশে আরারট নামে একটী পর্ব্বত আছে। আরব্য ভাষায় উহাকে 'জুদী' পাহাড় বলে। নূহ্‌ জাহাজ হইতে বহির্দ্দেশে দৃষ্টিপাত করিতেই এই জুদী পাহাড়ের চূড়া তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। তখন তিনি জাহাজ সেই দিকে চালিত করিলেন এবং পাহাড়ের সানুদেশে নঙ্গর করিয়া তথায় অবতরণ করিলেন। ক্রমে প্লাবনের জল শুকাইয়া গেল। নূহ্‌ তাঁহার পরিবারবর্গ ও অন্যান্য বিশ্বাসিগণ সহ সেই স্থানে নূতন করিয়া বাসস্থান স্থাপন করিলেন। নূহে্‌র পুত্রগণের মধ্যে হাম শাম ও যাফ্‌ছ বা যাফেৎ (Japhet) নামক পুত্রগণই পিতার অনুগত থাকিয়া পিতৃপ্রদর্শিত ধর্ম্ম পালন করিতেন, সেইজন্য তিনি জাহাজে এই তিন জনকেই সঙ্গে লইয়াছিলেন। প্লাবনের পর দেশ যখন জনমানবহীন হইয়া পড়িল, তখন নূহে্‌র এই তিন পুত্র হইতে আবার মানবজাতির পুনরভ্যুদয় হইল।

দিনের পর দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল; ক্রমে তাঁহাদের বংশও বৃদ্ধি হইতে লাগিল; তখন একস্থানে সকলের বাসস্থান সংকুলন না হওয়ায় হামের বংশধরগণ পূর্ব্বস্থান ত্যাগ করিয়া পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইল। ইহারা বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত পারস্যের নানাস্থানে বাস করিয়াছিল। পশ্চিম পারস্যের অন্তর্গত জাগ্রস পর্ব্বতের গুহা হইতে এই সকল জাতির অনেক অস্ত্রশস্ত্র ও তৈজসপত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। কালক্রমে এই শাখা আরও দক্ষিণ দিকে ছড়াইয়া পড়ে; এবং অবশেষে বেলুচিস্তানের ভিতর দিয়া ভারতে প্রবেশ করতঃ সিন্ধু, গুজরাট প্রভৃতি অঞ্চলে বাস করিতে থাকে। ইহারাই সম্ভবতঃ দ্রাবিড়, কোল, ভীল প্রভৃতি ভারতের আদিম অধিবাসীদের পূর্ব্বপুরুষ।

হামের চতুর্থ পুত্রের নাম কেনান। তিনি পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইয়া ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্ব

উপকূলে বাস করিতে থাকেন। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন এই কেনানের নামানুসারেই এই স্থানের নাম কেনান হইয়াছে। যাহা হউক এছরাইলবংশীয়গণের আগমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইহারা ঐ স্থানের অধিবাসী ছিলেন। ইহারাই ফিনিশিয়া জাতির পূর্ব্বপুরুষ। ক্রমে ইহাদের বংশধরগণ আফ্রিকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়েন— আবিসিনিয়ার অধিবাসীরা এই কেনানের বংশধর বলিয়া প্রসিদ্ধ।

শামের বংশ পূর্ব্বস্থান ত্যাগ করিয়া সিরিয়া প্রদেশে বাস করিতে লাগিলেন। শামের নামানুসারে আরবী সাহিত্যে আজিও এই স্থানকে শামদেশ বলা হয়। এই শামের বংশধরগণকে সেমিটিক জাতি (Semitic race) বলা হয়। ইহারাও ক্রমে কেনানে বিস্তৃত হইয়া পড়িলে তথায় ফিলিষ্টি জাতির উদ্ভব হয় বলিয়া উত্তরকালে গ্রীকগণ এই স্থানকে ফিলিষ্টাই নামে অভিহিত করেন। ইহা হইতেই এখন এই প্রদেশের নাম **প্যালেষ্টাইন** হইয়াছে।

এই সেমিটিক জাতিই আর্ম্মেনিয়ার অন্তর্গত উরুমিয়া ও ভান হ্রদের মধ্যবর্ত্তী মালভূমি এবং সিরিয়ার অন্তর্গত লেবানন পর্ব্বতের উত্তর দিকস্থ উপত্যকার অধিবাসী যাহারা এই শেষোক্ত স্থানে বাস করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে 'এরাম' নামে এক খ্যাতনামা ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন তাঁহার নামানুসারে ঐ স্থানকে 'এরাম' এবং উহার অধিবাসীদিগকে এরামীয় জাতি নামে অভিহিত করা হয়। ইহাদের অধিকাংশই গুহায় বাস করিত। ইদানীং এশিয়ামাইনরের অন্তর্গত 'তরাস' পর্ব্বতের গুহায় বিশেষতঃ অঙ্গোরার নিকটবর্ত্তী বোঘজকোই নামক স্থানে ইহাদের বহু অস্ত্রশস্ত্র ও তৈজসপত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। মেসোপটেমিয়াতেও অনেকগুলি এরামীর রাজ্য ছিল বলিয়া নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। এই 'এরামই' আদও ছামুদ জাতির পূর্ব্ব পুরুষ।

শামের বংশধরগণ ক্রমে ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্ত্তী এশিয়ামাইনর, ফিনিশিয়া, ইথিওপিয়া, লাইবিয়া, কেনান, মিশর প্রভৃতি স্থানে ছড়াইয়া পড়ে। শিলালিপি ও চিত্রাদি হইতে জানা গিয়াছে ইহারা মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতার পূজা করিত। ইহারাই মেসোপটেমিয়ার অন্তর নামক সহরের স্থাপয়িতা এবং আসিরীয় জাতির পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া বিশ্বাস। আরব জাতি এই শামের বংশধর বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

তৃতীয় পুত্র **যাফসের** (Yafas) বংশধরেরা উত্তর ও পূর্ব্বদিকে গমন করিয়া কাম্পিয়ান হ্রদের তীরবর্ত্তী আজরবাইজান, হামদান, গিলাম্ প্রভৃতি স্থানে বাস করিতে লাগিল। কেহ দক্ষিণ দিকে আসিয়া বাবিলনীয়ায় আবার কেহ পারস্যে গমন করিল। যাহারা পারস্যে গমন করিল তাহারা তথাকার পূর্ব্ববর্ত্তী হাম বংশীয়গণকে পরাজিত করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিল। কালক্রমে এই উভয় জাতি এক হইয়া এক শক্তিশালী সুসভ্য জাতিতে পরিণত হইয়াছিল। ইহারাই 'এলামে' এক শক্তিশালী রাজ্য গঠন করিয়াছিল। এই রাজ্যের রাজধানী সুপ্রসিদ্ধ '**সুসা**' নগরী ইহাদেরই কীর্ত্তি। ইহাদেরই বংশধরগণ 'মীদ' ও শক নামে পরিচিত। উত্তর দিকে ইহারা ক্রিমিয়া জার্ম্মানী, গল প্রভৃতি দেশে ছড়াইয়া পড়ে। ইহাদের অন্যতম শাখা আইওনীয় গ্রীক এবং সাইপ্রাস ও রোডাস দ্বীপের অধিবাসী। ইহাদেরই একদল ইটালীর ইট্রাস্কান জাতি এবং স্পেনের টারসিন সহরের অধিবাসী। আরবদেশের বেদুইনরা এবং বাবিলন ও সিনারের অন্যান্য সহরের স্থাপয়িতা বাবিলনের একচ্ছত্র অধিপতি রাজাধিরাজ নমরুদ এই বংশের লোক। ইহারাও পূর্ব্ববর্ত্তী হাম বংশীয়গণের সংস্রবে আসিয়া তাহাদের অনুকরণে মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতার পূজা করিতে লাগিল। এবং বাবিলনীয় পূজা পদ্ধতি ও ক্রমে হামবংশীয়গণের মধ্যে সংক্রামিত হইয়া পড়িল।

প্লাবনের পর নূহ সন্তানসন্ততিগণ সহ দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া তাহাদিগকে এক আল্লার উপাসনা শিক্ষা দিলেন। পূর্ব্বে তিনি কেনান প্রদেশে বাস করিতেন। যে স্থান তাঁহার বাসগৃহ ছিল, যে স্থানে তাঁহার রন্ধনশালা ছিল, যে উনান হইতে প্লাবনের সূচনা দেখা দিয়াছিল সেই স্থানগুলি আজিও নীরব ভাষায় তাঁহার অস্তিত্বের সাক্ষ্য দিতেছে। হজরৎ নূহ ৯৫০ বৎসর জীবিত ছিলেন।



খাসিয়া জাতি

২৭০২ পৃষ্ঠার পর

আসাম প্রদেশটা পুর্ব্ব ভারতের হিমালয়ের পাদদেশ হতে আরম্ভ করে পাহাড় পর্ব্বত এবং বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ। কিন্তু এই সমস্ত শ্বাপদসঙ্কুল গভীর অরণ্যানীর মধ্যে মধ্যে পাহাড়ের বুকে বহুকাল থেকে কতকগুলি আদিম জাতি সভ্যতার অন্তরালে বাস করে আসছে। কুকি বা লুসাই পাহাড়ে যেমন কুকিদের আড্ডা তেমনি নাগা পাহাড়ে নাগাদের, খাসিয়া ও জয়ন্তীয়া পর্ব্বতমালায় খাসিয়া ও সীণ্টেংদের এবং গারো পাহাড়ে গারোদের আড্ডা। এই রকম আসামে আরও গোটা কয়েক আদিম অসভ্য জাতি আছে যেমন দাফ্‌লা, মিকির, আবর।

ইংরাজ শাসনাধীনে খাসিয়া ও জয়ন্তীয়া পাহাড় এক জেলাভুক্ত হয়েছে। এই জেলাটি অতিশয় ক্ষুদ্রায়তন। পরিমাণ ৬,০২৭ বর্গ মাইল মাত্র এবং ইহার মধ্যে প্রায় দুই হাজার গ্রাম আছে। খাসিয়া পাহাড়ের উত্তর দিকে কামরূপ ও নওগাঁ জেলা, দক্ষিণে শ্রীহট্ট, পূর্ব্বে-উত্তর কাছাড়, নাগাপাহাড় ও কপিল নদী এবং পশ্চিমে গারো পর্ব্বত।

ইংরাজী শিক্ষা ও সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের যে সমুদয় অসভ্যজাতি উন্নতি লাভ করেছে, তাদের মধ্যে খাসিয়াদের কথা সকলের আগে বলা যেতে পারে। বিগত ষাট সত্তর বৎসরের মধ্যে এই জাতি আশ্চর্য্য উন্নতিলাভ করেছে। গারো, নাগা, আবর, এই সব জাতিদের মধ্যে সব চেয়ে উন্নত এবং সভ্য হচ্ছে খাসিয়ারা কারণ এরা সভ্য জাতির সংস্পর্শে খুব বেশী রকম এসেছে এবং খৃষ্টান মিশনারিদের শিক্ষা বিস্তারে এরা বর্ত্তমান সভ্যতাকে গ্রহণ করেছে। শিলংয়ের খাসিয়াদের ত তোমরা অনেকেই দেখে থাকবে কেমন সভ্য আর শিক্ষিত, বিশেষতঃ এদের মেয়েরা। শুধু তাই নয় আসামের মধ্যে খাসিয়া মেয়েরা হল সব চেয়ে সুখী এবং স্বাধীনা। খাসিয়া রমণীর দেহ সুগঠিত, ইহাদের দেহ উজ্জ্বল এবং পরিশ্রমোপযোগী। পাহাড়ের উপর থাকে বলে রং ফরসা এবং পীতাভ, নাকটা চাপা হলেও ইহারা দেখতে অনেকটা ইউরোপের জিপ্‌সীদের মত।

খাসিয়া পুরুষরা কিন্তু মেয়েদের তুলনায় তেমন সুন্দর নয়। উচ্চতায় সাধারণ বাঙ্গালীর চেয়েও খাটো। এদের মাথা অল্প চওড়া (Brachy cephalyic) চোখ দুটী ভাসা-ভাসা আর মঙ্গোলীয় জাতির মত ছোট এবং নীচের পাতায় একটী করে ভাঁজ (Epicanthic fold) আছে। পুরুষদের গোঁফ দাড়ী এক রকম ওঠে না বল্লেই হয়। দেহের গঠন শক্ত গোছের হলেও পুরুষরা কাজকর্ম্ম বেশী করেনা কারণ এদের মেয়েরা সব

করে। পয়সা রোজগার করা, গৃহকর্ম্ম করা, বাজার হাট করা সবই প্রায় মেয়েরা করে। এইজন্য এদের মেয়েরা খুব স্বাধীন এবং অগ্রগামী।

আসাম কৃষিপ্রধান দেশ। জলের অভাব নেই বলে এই ভূমিখণ্ড শস্যশ্যামলা ও উর্ব্বর। পাহাড়



খাসিয়াদের গ্রাম

জঙ্গল থাকলেও সমতলভূমির অভাব নেই। সমতলভূমে প্রচুর ভাবে চাষ-বাস হয়। খাসিয়ারাও কৃষিজীবী। পাহাড়ের গায়ে গায়ে এদের ক্ষেত দেখতে পাওয়া যায় কেমন সুন্দর ধাপে ধাপে সবুজ বা সোণার মত ধানগাছের মেলা—প্রথমে জুমিং করে এদের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয়। জুমিং-এর কথা তোমাদের পূর্ব্বে বলেছি এই ধরণের প্রায়ই তোমরা পাহাড়ের দেশে দেখতে পাবে। খাসিয়ারা ধান চাষ ছাড়া পান, সুপারী, কলা, কমলালেবু, কপি, কড়াইশুটি, ওল এই সমস্তেরও চাষ-বাস করে থাকে—এদের প্রধান জীবিকাই হল কৃষিকার্য্য। এ ছাড়া শিকার করে মাছ মাংস খাওয়া ও আছে। প্রায় সব রকম মাংসই এরা খায়।

খাসিয়াদের বিবাহ ভারী মজার—আমাদের সঙ্গে ওদের আচার অনুষ্ঠান একেবারে মেলে না। খাসিয়া বর বিয়ে করে বধূকে নিজের বাড়ী নিয়ে গিয়ে বাস করে না—বরঞ্চ বরকে এসে দিনকতক শ্বশুরঘর করতে হয়। খাসিয়া সামাজিক আইনে এই নিয়ম আসামের প্রায় সব জাতি হতেই বিভিন্ন। এদের পরিবারগুলি মাতৃশাসিত—মায়ের প্রাধান্যই বেশী—বাপের বদলে মা-ই প্রকৃতপক্ষে সংসারের ও সমাজের সব বিষয়ে কর্ত্রী। এই জন্যই খাসিয়া মেয়েরা স্বাধীন, স্বাবলম্বী এবং সর্ব্বময় কর্ত্রী। যতদিন স্ত্রী বাপের বাড়ী থাকে ততদিন তার সব আয় গৃহকর্ত্রী তার মায়ের হাতে আসে এবং তিনিই সব খরচ পত্র করেন।

আজকাল কিন্তু ২।১টী ছেলেমেয়ে হবার পর মেয়েরা কেবল ছোট মেয়েটী বাদে মায়ের বাড়ী ছেড়ে দিয়ে স্বামীকে নিয়ে নিজেরা আলাদা বাসা বেঁধে বাস করে এবং নিজেদের রোজগারে সংসার চালায়।

গৃহের উত্তরাধিকারিণী কনিষ্ঠার কিন্তু অন্যত্র বাসের বিধান নাই কারণ মাতার অবর্ত্তমানে



খাসিয়া গ্রাম্য পুরুষ

তাকেই গৃহদেবতার পূজা থেকে আরম্ভ করে গৃহের কুশলাদি, সম্পত্তি পর্য্যবেক্ষণ প্রভৃতির ভার বহন করতে হয়। কনিষ্ঠা যদি খুব অল্প বয়সের

হয় এবং তাদের মা যদি মারা যান তা হলে তার উপরের উপযুক্তা যে কোন বোন্‌, গৃহের কর্ত্রী হয়ে যতদিন পর্য্যন্ত না কনিষ্ঠা সাবালিকা হয় ততদিন গৃহের ভার গ্রহণ করে।

একটী পুরুষ একবার একটীর বেশী বিবাহ করতে পারে না তবে তার মৃত্যু ঘট্‌লে বা তার সঙ্গে বিচ্ছেদ হ'লে অন্য বিবাহ করতে কোন বাধা নেই। নিজ নিজ বাস গ্রামে এরা বড় একটা বিয়ে করা পছন্দ করে না সেইজন্য ভিন্ন গ্রাম হতেই সম্বন্ধ আসে। অনেক



খাসিয়া সর্দ্দার

সময় কন্যার পিতা নিজের ভাগিনেয়ের সহিত কন্যার বিবাহ দিয়ে কন্যাদায় হতে মুক্ত হয়। বড়লোক খাসিয়া পরিবারে কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহের জন্য ভাবতে হয় না। কারণ মেয়েরা স্বাধীনা যে যার পছন্দ মত স্বামী নির্ব্বাচন করে নেয় পরের হাতে সম্পত্তির শাসন চলে যাবে বলেই অনেক সময় মামা (যে প্রকৃতপক্ষে অভিভাবক) ভগিনীর পুত্রের সঙ্গে নিজ কন্যার বিবাহ দেয়। সে ক্ষেত্রে মাতুলই শ্বশুর হয়ে দাঁড়ায়। নৃতত্ত্ববিদেরা বলেন যে খাসিয়াদের মাতৃকর্তৃত্ব এই প্রকার বিবাহ থেকেই উৎপত্তি লাভ করেছে।

বিবাহবন্ধন হতে ছাড়াছাড়ি হওয়া খাসিয়াদের কাছে কিছু অন্যায় নহে—স্বামী স্ত্রীর উপর অত্যাচার করলে সেই স্বামীর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ করে চলে যায়। স্বামীও আবার স্ত্রীর অন্যায় আচরণ দেখ্‌লে তাকে ত্যাগ করে এবং এইরূপ স্ত্রীর বাপের বাড়ী থেকে স্বামী কিছু অর্থ দাবী করে নেয়।

এবার খাসিয়া বিবাহের অনুষ্ঠান সম্বন্ধে কিছু বলব। বছর বিশ পঁচিশের একটী খাসিয়া ছেলে কোন একটী ১৬।১৭ বৎসরের মেয়ের সঙ্গে মেলা-মেশা করে ঠিক করলে বিয়ে করবে—বাবা, মা এবং মামা এদের জানালে পর তারা মেয়ের বাপের বা মামার কাছে প্রস্তাব পাঠায়—মেয়ের অভিভাবক রাজী হলে সুবিধেমত একটী দিনে ছ'পক্ষের মুরুব্বিরা একত্র হয়, প্রথমে একটী মুরগীর ডিম ভেঙ্গে তার নাড়ীভুঁড়ী পরীক্ষা করে দেখে, এই পরীক্ষা করে ওরা জান্‌তে পারে যে বিয়ে মঙ্গলের হবে কি অমঙ্গলের হবে। কি ভাবে এই বিষয় ঠিক করে তা কিন্তু আমি তোমাদের বল্‌তে পারবো না। যদি অমঙ্গল চিহ্ন দেখা দেয় তা হলে সে বিয়ে নাকচ হয়। মঙ্গল হলে বিয়ের দিন ঠিক করে একটা পাকাপাকি হয়ে যায়।

বিয়ের দিন বর বেশ সুন্দর পোষাক পরে বিয়ে করতে আসে। শালুর পাগড়ী, গায়ে রঙ্গীন কোট, সঙ্গে এল সাজসজ্জা করা বরযাত্রীর দল। বরের অভিভাবক মাতুল বা পিতা কনের অভিভাবকের হস্তে বরকে সমর্পণ করে দিলেন। এদিকে কনেকে সাজিয়ে নিয়ে মেয়েরা আগে থেকেই বসে থাকে। বর যেমনি এল অমনি তাকে নিয়ে গিয়ে সেখানে বসাল—আংটী বদল হল—ছ'পক্ষের গুরুজনেরা উপস্থিত হল, পুরোহিত মন্ত্র পড়তে লাগল। মন্ত্র পড়বার সময় বরকনের পূর্ব্বপুরুষের আত্মার তুষ্টির জন্য মদ্যভাণ্ড হতে তিনবার মদ মাটিতে ফেল্লে। মন্ত্র শেষ হল—কোথা থেকে তিনটি শুষ্ক মাছ আগুনে সেঁকে কুটীরের মাচানের উপর ফেলে দিলে। সব শেষে একটা মুরগী বা শুকর বলি দিয়ে দিয়ে তার মাংস বেঁটে খাওয়া হল

F. 3—36

এইখানেই বিয়ে শেষ হল। বরযাত্রীরা সব যে যার বাড়ীতে ফিরে গেল—বর শ্বশুর বাড়ীতে দিন কয়েকের জন্য রয়ে গেল।

যদিও বধূকে শ্বশুরঘর করতে আসতে হয় না তবুও দিনকতকের জন্য সে শ্বশুর বাড়ী বেড়াতে আসে। তারপর সেই পূর্ব্বের মত মায়ের কাছেই ফিরে আসে। স্বামী মাঝে মাঝে এসে দিনকতক থেকে চলে যায়—দু' একটী ছেলেমেয়ে হবার পর স্ত্রী যদি মায়ের কনিষ্ঠা কন্যা না হয়, অনেক সময় আলাদা বাসা করে স্বামীর সঙ্গে বাস করে। কনিষ্ঠা কন্যার স্বামীকে অন্যত্র বাসা করে স্ত্রীকে নিয়ে যাবার অধিকার নাই—তার ছেলেমেয়েরা মামাদের হাতেই মানুষ হয়।

সন্তান জন্মগ্রহণ করবার পর খাসিয়া পরিবারে একটু আধটু পূজা হয়ে থাকে। গৃহদেবতা, গ্রাম-দেবতা আর বনস্পতির তুষ্টি সাধন কারণ। তারাই ত মঙ্গল অমঙ্গলের হর্ত্তাকর্ত্তা। পরের দিনই ছেলের নামকরণ হয় তারও নানা অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। আত্মীয় স্বজন পাঁচজন জড় হয়েই ছেলে বা মেয়ের নাম দেওয়া হয় তারপর ভোজের পালা। বিবাহ হল, জন্ম হল দুটাই বেশ আনন্দের কিন্তু খাসিয়ারাও ত চিরকাল বাঁচেনা—ষাট সত্তর বৎসর বয়স হলেই সব পরলোকে পালাতে আরম্ভ করে। যে পরিবারে একদিন মৃত্যু ঘট্‌ল সে পরিবারটা শোকে মুষ্‌ড়ে পড়ে।

মৃত দেহটাকে নিয়ে এরা কি করে শোন। মারা যাবার খানিকক্ষণ বাদে শবটীকে গরম জলে স্নান করিয়ে সাদা কাপড়-চোপড় পরিয়ে মাথায় পাগড়ী দিয়ে কাণে মাকড়ী দিয়ে সাজিয়ে গুজিয়ে কুটীরের অঙ্গনে এনে মাদুরের উপর শোয়ায়। তারপর পেটের উপর রাখে একটী ডিম, তাতে বেঁধে দেয় নয়টী রবিশস্য বা ধান। পাশে একটী মোরগ বলি দিয়ে তার একটু অংশ, এক ডিস্ খাবার, এক কলস জল এবং পান শবের উপর রেখে দেয়। খাসিয়ারা মনে করে এই সমস্ত তার পরলোকের পথে কাজে লাগবে।

এই রকম ভাবে তিনদিন বাড়ীতে রেখে-তারপর শ্মশানে এনে উহা দাহ করে। কোন কোন স্থানে গোর দিতেও দেখা গেছে। দাহ হবার পর ভস্ম নিয়ে খাসিয়ারা এক জায়গায় মাটীতে পুঁতে একটী করে প্রস্তর স্তম্ভ (Monolith) নির্ম্মাণ করে। তোমরা আসামে এমন অনেক প্রস্তর স্তম্ভ দেখে থাক্‌বে।

খাসিয়া জাতি যতই সভ্যতা অর্জ্জন করুক না কেন আদিম জাতিদের কুসংস্কারাপন্ন মনের অবস্থা এরা এখনও কাটিয়ে উঠ্‌তে পারেনি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ সাপ নিয়ে এদের একটা ভীতজনিক কুসংস্কারের



বর্ত্তমান খাসিয়া মহিলা

কথা তোমাদের বল্‌ব যাতে অনেক মানুষের প্রাণ নষ্ট হয়েছে।

ওদের বিশ্বাস যে ওদের দেশের দক্ষিণ দিকটায় চেরাপুঞ্জীর নিকটে একটী মস্ত গুহাতে এক সময়ে মস্ত বড় একটা অজগর সাপ থাক্‌ত তার নাম **থেলেন**। সেই সাপটা প্রায়ই লোক-জন, জন্তু-জানোয়ার সব খেয়ে বা মেরে বেড়াত। তার প্রকোপ এমন দুর্দ্দমনীয় ছিল যে কোন লোক তাকে মারতে সাহস করত না। শেষকালে একদিন একটী সাহসী খাসিয়া এক পাল ছাগল নিয়ে এল গুহার কাছে এবং প্রায়ই তাদের বলি দিয়ে মাংস ছড়িয়ে দিয়ে থেলেনকে সন্তুষ্ট করে তার বিশ্বাসভাজন হল। থেলেন নির্ভয়ে লোকটার

উপর সদয় হয়ে মুখ বার করে মাংস খেত। একদিন কিন্তু চালাক লোকটা মাংসের বদলে গরম গরম আগুনের মত এক তাল লোহা দিল ছুড়ে। থেলেন মাংস মনে করে সেটা গিলে ফেলতেই



খ্রীষ্টান খাসিয়া মহিলা

যন্ত্রণায় ছটফট করে মারা গেল। সেই লোকটি সাপের দেহটাকে টুকরো টুকরো করে চতুর্দ্দিকে গ্রামে গ্রামে খাবার জন্য পাঠিয়ে দিল। যে যে গ্রামের লোকেরা সে মাংস খেলে সেখানে সেখানে থেলেনের ভয় চলে গেল কিন্তু ওরা বলে সেই টুকরোগুলোর অল্প একটু অভুক্ত অবস্থায় রয়ে গিয়েছিল--সেই থেকে আবার অসংখ্য সাপের সৃষ্টি হয়েছিল তারাই মাঝে মাঝে যত সব অনিষ্ট করে। সেইজন্য খাসিয়ারা মানুষের রক্ত দিয়ে থেলেনের পূজা করে।

যদি কোথাও কোন গাঁয়ে বা পরিবারে সাপের অত্যাচার আরম্ভ হয়—তাকে সন্তুষ্ট করবার জন্য নিশুতি রাত্রে কোন মানুষকে ফুসলিয়ে নিয়ে এসে বাঁশের নলী দিয়ে তার নাসারন্ধ্র হতে খানিকটা রক্ত বার করে থেলেনের গুহার কাছে দিয়ে আসে। আরও এমন সব তুক্ তাক্ করে যাতে মানুষটি মারা যায়।

খাসিয়াদের এই থেলেন পূজা আমাদের নরবলির মত ভয়ানক দেশাচার যা সরকারকে আইনের দ্বারা বন্ধ করতে হয়েছে। জানা নেই শোনা নেই হঠাৎ নিশীথ রাত্রে খাসিয়াদের হাতে পড়ে থেলেনের উৎসর্গে অনেক নিরীহ বেচারিকে প্রাণ দিতে হয়েছে।

খাসিয়াদের সম্বন্ধে তোমাদের কাছে আরও কয়েকটা কথা বলছি। খাসিয়া পাহাড়ের দৃশ্য অতি সুন্দর। শিলং শৃঙ্গটী খাসিয়া পাহাড়ের মধ্যে সব চেয়ে উঁচু। ইহার উচ্চতা প্রায় সাত হাজার ফুট। খাসিয়াদের পূর্ব্বে বিশ্বাস ছিল যে বনের মধ্যে যে সব গাছপালা আছে, তার ভিতর সব উপদেবতারা বাস করনে। এইজন্য তারা বড় একটা গাছ কাটেনি। সেইজন্যে পাহাড়ের নীচেকার বনের শোভা সকলের মনোরঞ্জন করে। এই বনের ভিতর দিয়ে কত সব ছোট বড় ঝরণার ধারা যে বেগে নীচের দিকে ছুটে চলেছে তার সীমা সংখ্যা নেই। খাসিয়াপাহাড়ে অনেক জলপ্রপাতও রয়েছে। পূর্ব্বে এই পাহাড়ের গায়ে 'মৌসমাই' নামে একটী জলপ্রপাত ছিল, পৃথিবীর যে সব বড় বড় জলপ্রপাত আছে তাদের সঙ্গে ওটির তুলনা করা যেতে পারে, খুব উঁচু পাহাড় থেকে এর জলের ধারা আগে ঝর্‌ঝর্ করে ঝরে পড়ত, কিন্তু ১৮৯৭ সালের ভীষণ ভূমিকম্পের পর থেকে ধারা ক্ষীণ হয়ে গেছে।

খাসিয়ারা কোন্ জাতি এদের সে ইতিহাস জানবার কোন উপায় নেই। চার পাঁচশো বছরের ও

আগে খাসিয়ারা যে খাসিয়া পাহাড় দখল করে আছে এ কথা আমরা ঠিক করে বলতে পারি। পণ্ডিতেরা খাসিয়াদের ভাষা সম্বন্ধে আলোচনা করে ঠিক করেছেন, যে এদের পূর্ব্ব পুরুষেরা চীন দেশের উত্তর পশ্চিম অংশে হংহো আর ইয়াংসিকিয়াং নামে যে দুটী বিখ্যাত নদী রয়েছে, সে নদীর মধ্যবর্ত্তী ভূখণ্ড থেকে এরা আসাম ও ভারতের নানা জায়গায় এসেছে। এই দলের ভিতর মনআনাম (Mon-annam) দলেরাই সকলের আগে এসেছিল। এখনও আনাম ও কম্বোজে এরা বাস কচ্ছে। খাসিয়ারা হচ্ছে এদেরই এক শাখা।

বাঙ্গলা দেশের অর্থাৎ বাঙ্গালীদের সঙ্গে তাদের পরিচয় হয়েছিল ব্যবসায় বাণিজ্য উপলক্ষে। খাসিয়ারা থাকত উঁচু পাহাড়ের গায়ে, সেখানে তেল, লবণ আর সব প্রয়োজনীয় খাবার জিনিস আর কিছুই মিলত না, সেইজন্য তারা নীচে শ্রীহট্ট জেলার লোকদের কাছে চূণের পাথর বিক্রী করতে আসত। এইভাবে সমতলবাসী লোকদের সঙ্গে এদের পরিচয় হয়ে গেলো। তোমরা জান ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাঙ্গলাদেশের দেওয়ানী পেয়েছিলেন। শ্রীহট্ট জেলাও ঐ সঙ্গে তাদের হাতে এসেছিল। ১৭৭৮ সালে একজন ইংরাজ কর্ম্মচারী শ্রীহট্ট জেলার শাসনের ভার পেয়ে ঢাকা থেকে এখানে এসেছিলেন, চূণ পাথরের ব্যবসার সম্পর্কে কথাবার্ত্তা বলবার জন্যে ইনি খাসিয়াদের একজন প্রতিনিধির সঙ্গে আলাপ পরিচয় করেন, তিনি কিন্তু খাসিয়া পাহাড়ে যান নাই। ১৮২৬ সালের পূর্ব্বে কোন ইউরোপীয় খাসিয়া পাহাড়ে যান নাই। তোমাদের কাছে আর ইতিহাসের কথা বলব না, তবে যে কারণেই হউক ১৮২৯ সাল থেকে ১৮৩৫ সাল পর্য্যন্ত ইংরাজদের সঙ্গে খাসিয়াদের লড়াই চলেছিল। ১৮৩৫ সালে খাসিয়া পাহাড়ের শাসনকার্য্য পরিচালনের জন্য একজন পলিটিকেল এজেণ্ট নিযুক্ত হন। কিন্তু জয়ন্তীয়া পাহাড়ে সিণ্টেংগণ সহজে ইংরাজদের অধীনতা মেনে নেয়নি। কয়েক বৎসর রীতিমত ভাবে যুদ্ধ করে তবে এদের বিদ্রোহ দমন করতে হয়েছিল। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে খাসিয়া পাহাড়ে সম্পূর্ণ ভাবে শান্তি সংস্থাপিত হয়েছে। এ সময় হতে খাসিয়া ও সিণ্টেংরা ইংরাজ রাজের অনুগত প্রজা-হয়ে বাস কচ্ছে। পূর্ব্বে চেরাপুঞ্জী ছিল আসামের রাজধানী। সেখানকার প্রবল বৃষ্টির জন্যে ১৮৬৪-৬৫ খৃষ্টাব্দে শিলং আসামের রাজধানী হয়েছে।

ইংরাজ শাসনে এসে এদের অবস্থা সবদিক দিয়েই অনেক কিছু পরিবর্ত্তন হয়েছে। পূর্ব্বে এদের একখানি মাত্র ঘর ছিল। শীতের দেশের লোক হলেও একখানা চেটাইতে শুয়ে, আর একখানা কাঠ মাথায় দিয়ে, সামান্য গায়ে কাপড়



খাসিয়া কুলি

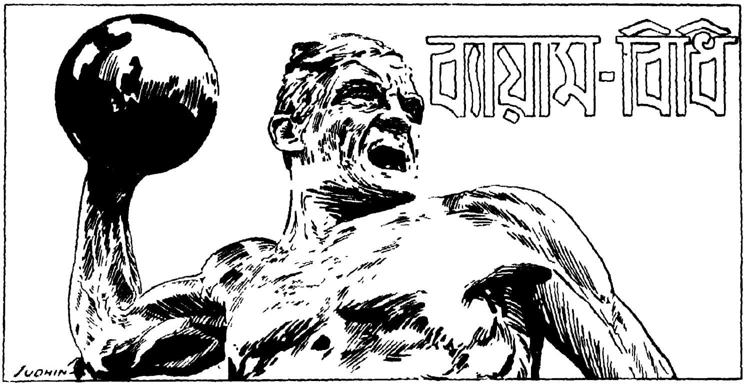
দিয়েই রাত কাটিয়ে দিত। এদের ঘর যে কেমন ছিল সে কথা তোমাদের বলে বোঝান চলে না, যদি কখনও শিলং কিম্বা আসামের কোথাও বেড়াতে যাও, তাহলে ওরকম ঘর দেখতে পাবে। যেখানে পাথর পাওয়া যায় সেখানে তারা পাথর দিয়েই ঘর তৈরী করে। সে ঘরের ভিতর কোন জানালা থাকে না, আর দরজাও থাকে একটী। কাজেই তুমি যদি ওরকম একখানা ঘরের ভিতর ঢুকে পড়, তা হলে হঠাৎ কিছুই চোখে দেখতে পাবে না। বোধ হয় বর্ষা আর শীত এ দুটীর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যেই এরা এই ধরণের ঘর তৈরী করে থাকে। অনেক গ্রামে পাহাড়ের গায়ে ঢাল জায়গায় খাসিয়ারা ঘর বাড়ী তৈরী করে। এই ঘরগুলো হয় অদ্ভুত ধরণের, বাঁশের উঁচু মাচার উপর ঘরগুলি তৈরী করে। এসব ঘরে উঠবার জন্যে বাঁশের সিঁড়ি থাকে। তোমরা দেখলে অবাক হয়ে যাবে এই সকল বাঁশের সিঁড়ি দিয়ে খাসিয়া স্ত্রীলোকেরা অক্লেশে উঠে থাকে। এমন কি খাসিয়াদের ছোট ছোট শিশুরা, কুকুর, বিড়ালেরা পর্য্যন্ত এই সিঁড়ি দিয়ে উঠা নামা করে। দরিদ্র ও অসভ্য খাসিয়ারা বাঁশের ছোট ছোট চোঙ্গায় জল পান করে, আর ২।৩ হাত লম্বা এক একটা বাঁশের চোঙ্গের ভিতরে জল সংগ্রহ করে রাখে।

আজকাল যে সকল খাসিয়ারা খৃষ্টান হয়েছে, তাদের বাড়ী ঘর দেখ্‌তে কিন্তু বেশ ভাল, এদের ঘর তক্তার পাটাতন দিয়ে তৈরী, জানালা আছে, আর ঘরের ভিতর খাট, টেবিল, চেয়ার, ছবি এ সব নানা বিলাতী সাজসরঞ্জাম দেখা যায়। খৃষ্টান মিশনারীদের সংস্পর্শে এসে এদের এ রকম পরিবর্ত্তন হয়েছে। আগে খাসিয়া পুরুষ ও মেয়েরা সামান্য বস্ত্র মাত্র পরে থাকৃত, কোন রকমে একহাত চওড়া দুইহাত লম্বা একখণ্ড মোটা কাপড় কোমরে জড়িয়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখত। কিন্তু এখন যারা সভ্যতার আলোক পেয়েছে, তারা আদিম বেশ ভূষা সব ছেড়ে দিয়েছে। তবে যারা দূরে পাহাড়ের গায়ে থাকে তাদের তেমন কোনও অদল বদল হয়নি। সহরে যারা থাকে তারা নিজ নিজ পছন্দ মত কেউ বা ধুতি পরে কোট গায় দেয়, আবার অনেকেত রীতিমত হ্যাটকোট্‌ পরে সাহেব সাজে।

খাসিয়াদের খাবার সম্বন্ধে পূর্ব্বে কিছু বলেছি। এরা আগে মিষ্টি, ঘি, দুধ, এ সব কিছু খেতে জানত না। এখন এসব খেতে শিখে গেছে, এবং সভ্য খাসিয়ারা ত সকাল বেলা আর বিকেল বেলা নিয়মিত ভাবে চা পান করে থাকে। যে সকল খাসিয়ারা পাহাড়ের উপত্যকায় বাস করে তাদের কাছে ফল মূল অত্যন্ত প্রিয়। আর পাহাড়ের গায়ে নানা প্রকারের ফল জন্মায়। দরিদ্রেরা সেই সব ফল মূল খেয়েই কাটিয়ে দেয়। দিন দিন শিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গে এরা সরকারি কাজ কচ্ছে। অশিক্ষিত সাধারণ খাসিয়ারা কৃষিকার্য্য, মজুরী, ব্যবসায়, ভৃত্যের কাজ, রাজমিস্ত্রীর কাজ, ঘরামীর কাজ করে দিন কাটায়। চূণাপাথরের খনিতে কাজ করে ও অনেক লোক জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করে। খাসিয়া পাহাড়ে ভুটা, গোলআলু এবং নানা রকমের শস্য জন্মে। এ সব পাহাড়ে খুব কমলালেবু জন্মে।

খাসিয়ারা অপরিচিত কোন লোকের নাম ধরে ডাকে না। বয়সে যারা বড় তাদের 'মামা' বা সংক্ষেপে 'মা' বলে ডাকে। সমবয়সী লোকদের বলে 'কাম্পম' অর্থাৎ শালা বা ভগ্নীপতি। ছোটদের আদর করে ডাকবার বেশ একটি সুন্দর শব্দ আছে— সে কথাটি হচ্ছে 'হেপ্‌' (Hep), ইংরেজী Darling এর মত। খাসিয়াদের ভাষায় সাতবারের কোন নাম নেই। তারা বাজারের দিন দিয়ে বারের নাম ঠিক করে। এ হিসাবে আটদিনে খাসিয়াদের সপ্তাহ হয়। সে নাম কেমন বল্‌ছি,—যেমন কাঠ কাটবার দিন, কাপড় কাচবার দিন, এমন আর কি! মাসের নামের কিন্তু বেশ অর্থ আছে, যেমন আষাঢের নাম গভীর মাস, কেন না আষাঢ় মাসে জলের গভীরতা বাড়ে, শ্রাবণ মাস হচ্ছে দুর্গন্ধ মাস,—কেন না তখন গাছের পাতা পচে দুর্গন্ধ হয়।

খাসিয়াদের মধ্যে অনেক উপকথা প্রচলিত ছিল। দিন দিন সে সব লোপ পেয়ে যাচ্ছে।



প্রাচীন ভারত

২৬৮ পৃষ্ঠার পর

প্রাচীন যুগে ভারতবর্ষে দৈহিক-চর্চার ব্যায়াম-বিধি কিরূপ ছিল এইবার সে বিষয়ে আলোচনা করিব। সে সময়ে তিন প্রকার ব্যায়াম রীতি প্রচলিত ছিল দেখা যায়। যোদ্ধা বা ক্ষত্রিয়দের মধ্যে একরকম দৈহিক চর্চার প্রচলন ছিল—তাহাদের ভাল যোদ্ধা হওয়াই একমাত্র লক্ষ্য ছিল। সেজন্য তাহারা ধৈর্য্য ও কষ্টসহিষ্ণুতা বাড়াইবার চেষ্টা করিত, ভাল ঘোড়-সওয়ার হইবার চেষ্টা করিত। যুদ্ধে খ্যাতিলাভ করিবার উদ্দেশ্যে এইরূপ শিক্ষা করিলেও, তাহাদের এইরূপ ব্যায়াম-চর্চ্চাতে সামাজিকতার প্রভাব বিশেষ ছিল না। কারণ, তখন তাহারা সকলে মিলিয়া একত্রে অভ্যাস করিবার পরিবর্ত্তে, এক একজন স্বতন্ত্র-ভাবে ঐ রূপ যুদ্ধ কৌশলাদি শিক্ষার দ্বারা দৈহিক-চর্চ্চা করিত।

কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট ভগবৎ সাধকশ্রেণীর মধ্যে যোগাভ্যাসে ব্যায়াম করিবার প্রথা নিবদ্ধ ছিল। আবার কতকগুলি এইরূপ ব্যায়াম বা শারীরিক প্রক্রিয়া ছিল—তাহা সাধারণতঃ আসন নামে অভিহিত হইত। যেমন পদ্মাসন, বদ্ধযোগাসন, এইরূপ। এই প্রকারের ব্যায়াম একটু জড়বৎ বলিয়া মনে হয়। কারণ, ঐ শ্রেণীর ব্যক্তিগণ অর্থাৎ যোগী ঋষিগণ, ভগবৎচিন্তায় গভীরভাবে নিমগ্ন রহিবার জন্য আসন বা মুদ্রার প্রণালীতে শরীরকে বাহ্যরূপে বিশেষ বিশেষ নির্দ্দিষ্ট ভঙ্গীমায় স্থাপন করিতেন। ইহা ভিন্ন তাঁহাদের অপর কোন উদ্দেশ্য ছিলনা। এতদ্ব্যতীত, আভ্যন্তরীণ শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া দ্বারাও তাঁহারা চিত্ত সংযমের অভ্যাস করিতেন। ইহাতেও যথেষ্ট পরিশ্রম হইত। এই যৌগিকব্যায়াম-প্রণালীর সাহায্যে তাঁহারা অন্তর্ধৌত করিতেন। এই যৌগিক-ব্যায়াম সাহায্যে শরীরের আভ্যন্তরীণ ক্ষমতার বৃদ্ধি সাধন হয়। ইহার দ্বারা যোগীরা তাঁহাদের পাকস্থলী ধৌত করিয়া ও নাসাপান দ্বারা শরীরের আভ্যন্তরীণ প্রণালী নিচয় নিত্য পরিষ্কৃত করিত। এই প্রকার আভ্যন্তরীণ সাধনার ফলে তাঁহাদের দেহ এক অলৌকিক লাবণ্যে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিত।

প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে বাবা লছমন দাস নামে একজন পঞ্জাববাসী বাজীকর হিন্দুযোগশাস্ত্রের এই সকল প্রক্রিয়াসকল বিলাতে লণ্ডন সহরে দেখাইয়াছিলেন। বাবা লছমন দাস যোগী ছিলেন না, তিনি একজন বাজীকর ছিলেন। তাঁহার অদ্ভুত কৌশল দেখিয়া বিলাতের লোকে মুগ্ধ হইয়া যাইত। তোমাদের কাছে তাঁহার জীবনী বেশ কৌতূহল-প্রদ হইবে বলিয়া এখানে তাহার উল্লেখ করিলাম। লছমনের পিতা মাতা কে ছিলেন জানা যায় না। কথিত আছে সিপাহী-বিদ্রোহের সময় তাঁহার দরিদ্র পিতামাতা তাঁহাকে মধ্যভারতের পার্ব্বত্যজাতির নিকট বিক্রয় করে। সে ঐ স্থানে থাকিয়া এসমুদয় যৌগিক ব্যায়াম শিক্ষা করে। তারপর সে কাশীতে আসিয়া ঐ সমুদয় অদ্ভুত কৌশল দেখাইয়া অর্থো-পার্জ্জন করিতে থাকে। সে সময়ে একদিন একজন পার্শী সদাগর পথের ধারে তাঁহাকে কোন একটি যৌগিক ক্রিয়া করিতে দেখিয়া তাঁহাকে বিলাতে লইয়া যান এবং পয়সা উপার্জ্জনের ব্যবস্থা করেন। লণ্ডনে তাঁহাদের যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন হয়। লণ্ডনের যে স্থানে সে এই সব অদ্ভুত ক্রিয়া দেখান হইত, তাহার বাহিরে পাঁচশত পাউণ্ডের একখানি চেক ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছিল,—এবং লেখা হইয়াছিল, যদি কেহ ইহার অনুকরণ করিতে পারে তবে তাহাকে ঐ অর্থ দেওয়া হইবে। তাহার একটি যোগ ক্রিয়া দেখিয়া লণ্ডনের একজন ভদ্রলোক বলিয়াছিলেন—"পাঁচশত কেন, পাঁচ হাজার পাউণ্ড দিলেও কোন ক্ষতি ছিল না, কারণ এ সব যৌগিক ক্রিয়া কেহই করিতে পারিবেন না।" লছমন দাসের কথা বিলাতের 'ষ্ট্রাণ্ড ম্যাগাজিন' পত্রে প্রথম প্রকাশিত হয় পরে ১৩০৬ সালের 'প্রদীপ' পত্রে তাঁহার সম্বন্ধে চিত্রসহ একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার সমুদয় যোগক্রিয়ার কয়েকখানি ছবি স্বতন্ত্র ভাবে ছাপা হইল।

পেশী-শাসন অপেক্ষা স্নায়ু-শাসন, এই ব্যায়ামের অধিক লক্ষ্যের বিষয়। এই ব্যায়াম করিবার ফলে, যোগীরা চিত্তসংযম মনঃসংযোগজনিত পরিশ্রমের জন্য শারীরিক অবসাদ বোধ করিত না।

এই প্রকার ব্যায়াম দ্বারা শরীরের অন্তরতম অংশেরও অতি সুন্দর ভাবে ব্যায়াম হইয়া থাকে।

এখনকার মত সেকালেও কুস্তী বা দ্বৈত-ব্যায়াম করিবার প্রণালীও প্রচলিত ছিল। কুস্তী করিবার পূর্ব্বে প্রাথমিক ব্যায়াম শিক্ষা ও প্রক্রিয়াদি অভ্যাস করিবার কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত, পুরাকালে, অরণ্যবাসী অসভ্য শ্রেণীদের মধ্যে ধর্ম্মসংক্রান্ত একরকম ক্রীড়ার প্রচলন ছিল। ইহা তাহাদের নৃত্য ভিন্ন অপর কিছু নহে। দেবতাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে তাহারা নৃত্য করিত। আবার কখনও কখনও রোগ মুক্তির নিমিত্ত ওঝারা (চিকিৎসকেরা) দেবতার কৃপালাভের আশায় এইরূপ নৃত্য করিত।

প্রাচীনতম যুগে দ্রুত-ধাবন বা দৌড়ান প্রতি-যোগিতার একটি বিশেষ অঙ্গ ছিল। কুস্তী, মুষ্টিযুদ্ধ যে না করিত তাহা নহে। আর, অস্ত্র—নিক্ষেপ, তীর ছোড়া ও সন্তরণ তখন প্রায় সকলেই অভ্যাস করিত। বর্শা-নিক্ষেপও কেহ কেহ অভ্যাস করিত।

বর্ত্তমান যুগ—ভারতবর্ষ

ভারতে পাঠান সাম্রাজ্য-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে, এদেশে পোলো (ইহা ঘোড়ায় চড়িয়া খেলা হয় আর একরকম পোলো আছে, তাহা জলে সাঁতার কাটিয়া খেলা হয়) খেলার প্রচলন হয়। কথিত আছে—সুলতান মামুদ, বক্তিয়ার খালজী, প্রভৃতি সকলেই পোলো খেলিতেন। কুতুবুদ্দিন শাহ পোলো খেলিতে খেলিতে ঘোড়া হইতে পড়িয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাহার আলোচনা পরে যথাস্থানে করিব।

মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট বাবরের পোলো খেলায় খুব অনুরাগ ছিল। তাঁহার সময়ে অতি সমারোহের সহিত দিল্লী ও আগ্রায় পোলো খেলা চলিত।

এই খেলায় আকবর বাদশাহ বিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া অবগত হওয়া যায়। পাঠান ও মোগল রাজত্বের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে উত্তরভারত ও রাজপুতনায় এবং কাশ্মীর, কম্বোজ ও জয়পুরের যোদ্ধবর্গ ও রাজন্যবর্গের মধ্যে ঐ খেলার প্রচলন হয়।

মণিপুরের রাজা পাকুংবা উত্তরভারত ভ্রমণ করিতে আসিয়া গিলগিট ও চিত্রালে এই বীরোচিত ক্রীড়া দেখিয়া মুগ্ধ হন এবং তাঁহার রাজ্যে এই খেলার প্রচলন করেন। ক্রমশঃ মণিপুরের মধ্যে ইহা জাতীয় ক্রীড়ারূপে গৃহীত হয়।

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে মণিপুরের রাজা বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের নিকট কোন কাজের জন্য কলিকাতায় আগমন করেন। সেই সময় তাঁহার অনুচরবর্গ ও সৈন্যসামন্তগণ গড়ের মাঠে পোলো খেলা দেখায়, তাহা দেখিয়া 10th Hussar বৃটিশ রেজিমেণ্টদল, মণিপুরীদের নিকট পোলো খেলা শিক্ষা করে। পরে, ইহাদের দ্বারাই বিলাতে এই খেলা প্রবর্ত্তিত হয়।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে ইংরাজরা প্রথম ভারতবর্ষে 'হকি' ও 'ক্রীকেট' খেলার প্রবর্ত্তন করেন। কিন্তু তখন জনসাধারণের মধ্যে ঐ খেলার তেমন আদর হয় নাই। কেবলমাত্র নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিরাই খেলিত।

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ঐ সকল খেলা স্কুল ও কলেজে প্রবর্ত্তিত হয়। এই সকল ক্রীড়া, স্কুল, কলেজের মধ্যে প্রবর্ত্তন হইলেও, তেমন আশাপ্রদ সুফল পাওয়া যায় নাই। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভেই দৈহিক উন্নতি করিবার জন্য স্কুল ও কলেজে জিম্‌নাষ্টিক শিখাইবার ব্যবস্থা হয়।

১৮৮২ খৃঃ অঃ গভর্ণমেণ্ট একজন এডুকেশন কমিশনার নিযুক্ত করেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে—ভারতীয় খেলাধূলার প্রথা প্রচলন রাখিবার জন্য বিশেষ রকম উৎসাহ দেওয়া এবং ড্রীল ও জিমনাষ্টিক শিখান একান্ত দরকার। তাহার পর এ দেশে খেলাধূলার কিছু উন্নতি হয়।

১৯০২-০৭ পর্য্যন্ত রিপোর্টে দেখা যায়, যে তখনকার ব্যায়াম শিক্ষকেরা ৩০, ৪০ জন ছাত্রকে খেলাধূলায় একসঙ্গে নিযুক্ত করিয়া রাখিবার প্রণালী জানিতেন না। সুতরাং একসঙ্গে মাত্র ২।৩ জন ব্যায়াম শিক্ষা করিতে পাইত।

১৯০৭—১২ খৃঃ অঃ মধ্যে শরীর-বিদ্যা, শিক্ষা দিবার প্রণালীর কিছু উন্নতি হয় বটে কিন্তু উপযুক্ত লোকের অভাবে বিশেষ রকম সুফল পাওয়া যায় নাই। সে সময়কার প্রচলিত ক্রীড়াদির মধ্যে যেন প্রাণ ছিল না। তাই অতি অল্প সংখ্যক ছাত্র এ বিষয়ে আকৃষ্ট হইত। সে সময় স্কুলে অবসর প্রাপ্ত প্রবীণ সৈনিকরা ড্রীল মাষ্টার হিসাবে নিযুক্ত হইত। কিন্তু তাহারা ভারার্পিত কর্ম্মের জন্য অনুরাগ বা উদ্দীপনা দেখাইত না এবং সাধারণের নিকট হইতে সম্মান লাভ করিতে পারিত না।

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে (খৃষ্টীয় যুবক সমিতির Y. M. C. A.) র মতে ব্যায়ামাদি করিবার পূর্ব্ব নিয়ম পরিবর্ত্তিত হয় এবং একা একা ব্যায়াম করিবার পরিবর্ত্তে দলবদ্ধ ভাবে ব্যায়াম করিবার প্রথা প্রচলিত হয়। ভারতগভর্ণমেণ্ট এ দেশীয় অনুষ্ঠানে নূতন প্রণালীতে এই নিয়ম শিক্ষা দিবার জন্য ইহাদের নিকট আমেরিকান ব্যায়াম শিক্ষকের সাহায্যপ্রার্থী হন। তাহাদের নিকট হইতে বহু শিক্ষক ব্যায়ামাদি শিক্ষা দিবার প্রণালী শিখিলেন, তাহার পর প্রাদেশিক অলিম্পিক সমিতি গঠিত হইল। অভিভাবকেরা উৎসাহ দান করিবে ভাবিয়া খেলাধূলায় ছেলেরা কিরূপ ভাবে আনন্দ লাভ করিতে পারে, জনসাধারণের সম্মুখে তাহাই প্রদর্শিত হইতে লাগিল।

গভর্ণমেণ্টের পরিজ্ঞাত অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করিয়া ১৯২০ খৃঃ অঃ মাদ্রাজে স্থাপিত Y. M. C. A তে ব্যায়াম-শিক্ষা দিবার প্রণালী শিক্ষা লাভ করিবার জন্য শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে প্রথম বিশেষ রকম চেষ্টা করা হয়। তথায় যাবতীয় ব্যায়াম-ও ক্রীড়াদির কৌশলপ্রণালী শিক্ষা দেওয়া হয়।

এই শিক্ষা কার্য্যকরী হইয়া উঠিয়াছে এবং দিন দিনই Physical Culture বা শারীরিক উন্নতি বিধান সম্বন্ধে কি রাষ্ট্র, কি সমাজ, সর্ব্বত্রই একটা আন্দোলন ও আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। এখন প্রত্যেক স্কুলে ও কলেজে ব্যায়াম শিক্ষক নিযুক্ত হইতেছেন। এমন কি পূর্ব্বে যাহা অসম্ভব ছিল, তাহাও সম্ভব হইতেছে, এখন মেয়েদের ব্যায়াম শিক্ষার জন্য ও সর্ব্বত্র আগ্রহ বাড়িতেছে। The young womens Christian Association (England) বিলাতের খৃষ্টিয় নারীসমিতি মহিলাদের ব্যায়াম-শিক্ষার জন্য অগ্রণী হইতেন। তাঁহাদের প্রচেষ্টায় ইহা সর্ব্বত্র প্রসারিত হইতেছে।



উদ্ভিদের বুদ্ধি

২৭২৯ পৃষ্ঠার পর

মনু লিখিয়াছেন উদ্ভিদের সুখ-দুঃখ বোধের শক্তি আছে। উদ্ভিদ যে প্রাণী তাহাও তোমরা জান। কিন্তু যদি বলি উদ্ভিদের বুদ্ধিও আছে, সে মানুষকে পর্যাপ্ত ঠকাইয়া তাহাকে দিয়া নিজের কার্য্যোদ্ধার করিয়া লয় তাহা হইলে কি তোমরা বিশ্বাস করিবে? তোমরা কাহাকে বুদ্ধিমান বল? বিপদ উপস্থিত হইলে বিচলিত না হইয়া সহজেই যে সে বিপদ হইতে উদ্ধারের ব্যবস্থা করিতে পারে সেই বুদ্ধিমান। আবার বুদ্ধিমান ছেলেদের মধ্যেও নষ্টামিতে কেহ কেহ সেরা থাকে। দেখা যাক, বিপদে পড়িলে গাছ বুদ্ধির পরিচয় দেয় কি না?

তোমরা সকলেই আরব্যউপন্যাসের গল্প পড়িয়াছ। সিন্ধাবাদ নাবিকের কথা তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে। একবার সে এক বৃদ্ধের পাল্লায় পড়িয়াছিল। তাহার দুরবস্থা দেখিয়া সিন্ধাবাদ তাহাকে কাঁধে করিয়া পার করিতে গিয়া কি প্রাণান্তকর নাকালেই না পড়িয়াছিল!

কতকগুলি লতাগাছের প্রকৃতি উপাখ্যানের সেই বৃদ্ধের মত। ইহাদের দেহ দুর্ব্বল; সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারে না। যদি নীচে মাটিতে পড়িয়া থাকে তবে গোরু ভেড়ার অত্যাচারে ইহাদের প্রাণ ধারণ করাই কঠিন হইয়া পড়ে। কাজেই ইহাদিগকে মাটি ছাড়িয়া আত্মরক্ষার্থে ও রৌদ্র বাতাসের জন্য কাহাকেও আশ্রয় করিয়া উপরে উঠিতেই হইবে। নিকটেই একটা মহীরুহ কিংবা ছোট গাছ আছে। প্রথমে হেলিয়া দুলিয়া ক্ষীণাঙ্গী লতা তাহার কাছে গেল। 'হাতে পায়ে' ধরিয়া কাঁদাকাটি করিয়া তাহার আশ্রয় ভিক্ষা করিল: একে দুর্ব্বলা, তার উপর নিরাশ্রয়া, কাজেই গাছ তাহাকে দয়া করিয়া আশ্রয় দিল। আশ্রয় পাইয়া ইনি তাহাকে অষ্টেপৃষ্ঠে প্রথমে জড়াইয়া ধরিলেন, ক্রমে মাথায় উঠিলেন, তার পর নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ডালপালা ছড়াইলেন, অবশেষে আশ্রয়দাতার আলো, বাতাস দখল করিয়া বাণীগিরি আরম্ভ করিলেন। বুনিয়াদি ঘরের বড় বড় গাছ সে অত্যাচার সহ্য করিতে সক্ষম হইলেও আশ্রয়দাতা যদি দরিদ্র কিংবা মধ্যবিত্তের সন্তান হন তবে তাঁহার দুর্দ্দশার সীমা পরিসীমা থাকে না।

যেখানে নির্ভর যোগ্য সাহায্য পায় না সেখানে দুর্ব্বল গাছ কি করে? মাটির উপর পড়িয়া থাকিয়া সকলের পদদলন সহ্য করিবে? সে হইবে না। শ্রীযুক্ত শশধর রায় মহাশয় এই প্রকার

ছুইটী গাছের ব্যবস্থা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া যাহা লিখিয়াছেন তাহাই এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।—আমার বাড়ীতে কতকগুলি ঝুমকা জবার গাছ বুনিয়াছিলাম। তাহার চারাগুলি প্রত্যেকে এত সরু ও ক্ষীণ ছিল যে একটী নিজের দেহভার কিছুতেই বহন করিতে পারিত না। সুতরাং একটু উঠিয়াই মাটিতে পড়িয়া যাইত। তখন করিল কি? একটী পার্শ্ববর্ত্তী আর একটীর সহিত মন্ত্রণা করিল। উহারা কি উপায়ে পরস্পর কথা কহিল, বলা যায় না। কিন্তু উহারা নিশ্চয় মন্ত্রণা করিয়াছিল এ কথা আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি। নচেৎ ছুইটী পার্শ্ববর্ত্তী সমদুর্দ্দশাগ্রস্থ গাছের চারা পরস্পরের দিকে একটু একটু করিয়া হেলিতে লাগিল কেন? তাহারা পরস্পরকে জড়াইয়া ধরিল কেন? তখন উভয়ের আশ্রয়ে উভয়ে আবার সোজা হইয়া দাঁড়াইল কেন? এই ভাবে উহারা পরস্পরকে জড়াইয়া ধরিয়া ক্রমে ক্রমে বাড়িতে লাগিল। এখন সকলে মিলিত হইয়া প্রায় সাত হাত উচ্চ গুচ্ছ সাজিয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন উহাদের সকল ডালেই লাল ফুল ফুটিয়া কেমন সুন্দর শোভা বিকাশ করিতেছে।

সন্তান উৎপাদন করিয়া বংশ রক্ষা করিতে হইবে। সে জন্য পরাগরেণু ও গর্ভকেশরের সংযোগ হওয়া দরকার। কিন্তু একই ফুলের পরাগরেণু ও গর্ভকেশরের সংযোগ হইলে চলিবে না। সে নিয়ম আভিজাত্যের ভিতর নাই। তা'হলে উপায়? সংযোগ না হইলে কেমন করিয়া সন্তান জন্মিবে? কিন্তু গাছ তো অচলজীব, সে তো নিজে হাঁটিয়া গিয়া এ সংযোগ ঘটাইতে পারে না। তা'হলে উপায় কি? গাছ উপায় ঠিক করিয়া ফেলিল। তাহারা ঠিক করিল এ সংযোগ ঘটাইবার উপযুক্ত ঘটক পতঙ্গ। কিন্তু তাহাকে ভুলাইয়া আনা যায় কি প্রকারে? একবার যখন উপায় ঠিক হইয়াছে তখন ব্যবস্থা করিতেই হইবে, কৌশলে পতঙ্গকে ভুলাইয়া আনিতেই হইবে। সে জন্য গাছ ফুল ফুটাইল। পবনকে দূত করিয়া দিকে দিকে তাহার সৌরভ ছুটাইল, পাপড়ির বর্ণ ও সৌন্দর্য্যের বাহার খুলিল, ইহাতে কাহার না মন ভুলে?

"ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষিরে ভুলাতে—
পাঠাইলে বনে যে কয় জনা
সাজায়ে যতনে ভূষণে রতনে।"
এ যেন তাহাদেরই একজনা।

কিন্তু ইহাতেও ভাবনার অন্ত হইল না, পতঙ্গ ভুলিয়া না হয় একবারই আসিল, কিন্তু দ্বিতীয় বার যদি না আসে? সুতরাং গাছ তাহার ফুলের মধ্যে মধু রাখিল। মধু পতঙ্গের উৎকৃষ্ট খাদ্য। সৌন্দর্য্যের মোহ কাটিলেও খাদ্যের লোভ

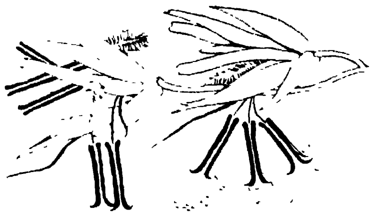


আশ্রয় পাইয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিলেন

কি সামলান যায়! আয়োজন সম্পূর্ণ ও নির্ভুল। ব্যস্! উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। পতঙ্গ আসিল, এক ফুলের পরাগ অন্য ফুলে লইয়া তাহার গর্ভকেশরে সংযোগ করিল। ফুল ফোটা সার্থক হইল। পতঙ্গ এখন আসুক বা না আসুক বিশেষ আসে যায় না। তাই দেখিতে পাই পরাগ সংযোগের পর ফুলের পাপড়ি ঝরিয়া পড়ে, সুবাস উড়িয়া যায়।

ফুল ফোটান সম্বন্ধে গাছ বুদ্ধি ও বিবেচনার আরও পরিচয় দেয়। সৌন্দর্য্য দিনের আলোয়

চোখে পড়ে। কিন্তু রাত্রেও তো অনেক পতঙ্গ বাহির হয়। তাহা ছাড়া গ্রীষ্মের দিনেও তো অনেক গাছ সন্তানোৎপাদন করে। গরমের দিনে, দিনের প্রচণ্ড গরমে বাহির হওয়া যায় না। কিন্তু সন্ধ্যার পর যখন বাতাস বহিতে থাকে তখন অনেকেই হাওয়া খাইতে বাহির হন, খাদ্যান্বেষণও করিতে হয়। সুতরাং বুদ্ধিমান গাছ দিনে ফুল না ফুটাইয়া রাত্রে তাহাদিগকে ফুটাইল। রাত্রে সৌন্দর্য্যের আকর্ষণ নাই, অন্ধকার। তাই ইহারা বুদ্ধি করিয়া ফুলের বর্ণ করিল ধবধবে সাদা, যাহাতে রাত্রের অন্ধকারেও তাহা চোখে পড়ে, আর ফুলগুলিকে গন্ধে করিল ভরপুর। বেলা, রজনীগন্ধা, যূঁই



বায়ু পরাগিত ফুল

হাস্নাহানা, দোলনচাঁপা পরীক্ষা করিলেই তোমরা ইহাদের বুদ্ধির পরিচয় পাইবে।

তোমরা গেঁদা, সূর্য্যমুখী, চন্দ্রমল্লিকা প্রভৃতি ফুলের গাছ নিশ্চয় দেখিয়াছ। ইহাদের যাহাদিগকে সাধারণ কথায়, ফুল বলা হয়, তাহা একটা ফুল নহে অনেকগুলি ফুলের সমষ্টি। ইহাদের ফুলগুলি যদি জবা গোলাপের মত একা একা ফুটিত তবে কেহই ইহাদিগের দিকে ফিরিয়াও চাহিত না—এমনই রূপ রস, সৌন্দর্য্য-বিহীন ইহারা। ইহাদের কি তবে বংশরক্ষা হইবে না? সে তো হইতে পারে না। তখন ইহারা করিল কি জান? দেহের ফুল ধারণ করিবার অংশকে একখানা থালার মত চওড়া করিল, তাহার উপর ফুলগুলিকে সাজাইল। থালার কিনারার ফুলগুলির পাপড়ি বড় করিল। ভিতরের ফুলগুলির পাপড়ি অতি ক্ষুদ্রই রাখিল। ইহাতে সুবিধা হইল এই যে অল্প আয়াস ও খরচাতেই কার্য্যোদ্ধার হইল। বাহিরের হলুদবর্ণের পাপড়িগুলি দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া পতঙ্গ নিকটে আসে ও বসিবার একটা সুন্দর আসন পায়। তাহার উপর চলা ফেরা করিবার সময় এক ফুলের পরাগ অন্য ফুলের গর্ভকেশরে লাগাইয়া দেয়। সুতরাং দেখ, কেমন বুদ্ধি করিয়া গেঁদা, সূর্য্যমুখী গাছ তাহাদের কার্য্য উদ্ধার করিল।

সৌন্দর্য্যে ভুলাইয়া কিংবা সৌরভে মাতাইয়া পতঙ্গ ডাকিয়া আনাকে অনেক গাছ পছন্দ করিল না। তাহারা ইহাকে প্রবঞ্চনা করা মনে করিল। কিন্তু কাহারও সাহায্য তো ইহাদিগকে লইতেই হইবে। অনেক চিন্তা ও বিবেচনার পর ইহারা বাতাসের সাহায্য লওয়া ঠিক করিল। বাতাস রূপ রস গন্ধের ধার ধারে না, সে কাহারও তোয়াক্কা রাখে না। কাজেই ইহারা পাপড়ির বর্ণ বৈচিত্র্য, মধু কিংবা সৌরভের পরিবর্ত্তে পরাগ প্রস্তুত করিল বেশী করিয়া। পরাগধানীর এমন ব্যবস্থা করিল যে বাতাসের সহিত সে ঘুরিতে পারে, আর গর্ভকেশরের মুণ্ডটি করিল গোরুর লেজের মত গোছা গোছা। সুতরাং পরাগ যখন বাতাসে ভাসিয়া যায় তখন তাহাকে ধরিবার ব্যবস্থাটা হইল অতি পরিপাটী। ধান, গম, যব, ভুট্টা, কাশ প্রভৃতি এই জাতীয় গাছ।

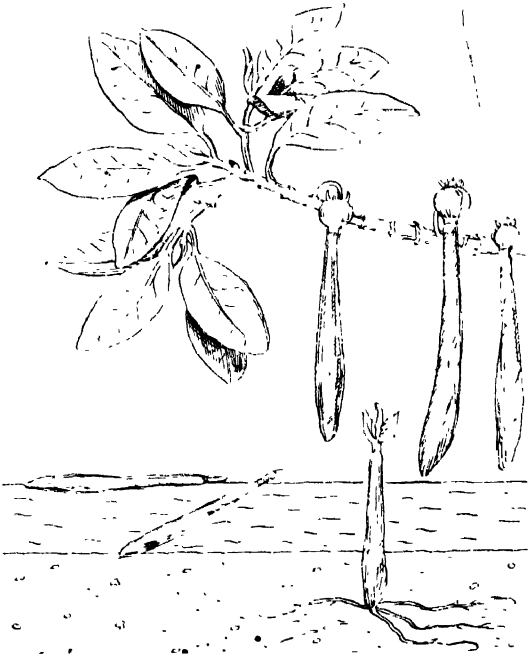
পতঙ্গই বল আর বাতাসই বল, পরাগ-সংযোগের জন্য ইহাদের উপর নির্ভর করা অনেক সময় সুযোগ সাপেক্ষ, অনিশ্চিত। মনে কর বায়ু বহিল না, চঞ্চল পতঙ্গ যথাকালে আসিল না তখন উপায় কি হইবে? কতকগুলি গাছ আছে যাহারা এ ঝুঁকি লইতে চাহিল না সুতরাং ইহারা বীজ দ্বারা বংশরক্ষা করা একেবারেই ছাড়িয়া দিল। ইহারা নিজের দেহেরই অংশ বিশেষে খাদ্য প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া তাহা দ্বারাই বংশরক্ষার ব্যবস্থা করিল। আলু, আদা, কলা, প্রভৃতি এই জাতীয় গাছ। আলুর গায়ে যে সমস্ত 'চোখ' দেখা যায় সেইগুলি হইতেই আলুর নূতন গাছ জন্মে, আর যতদিন গাছ নিজের খাদ্য নিজে সংগ্রহ করিতে না পারে ততদিন আলুর মধ্যে

সঞ্চিত খাদ্য খাইয়া সে বড় হয়। তা'হলেই দেখ আলু কেবল বিচক্ষণই নহে ভবিষ্যৎদর্শীও বটে।

গাছের আত্মরক্ষার কথায় তোমরা জানিয়াছ কি কৌশলে গাছ তাহার শত্রুকে জব্দ করে। পিপড়ার মত সাংঘাতিক 'লোককেও' সে বশ করিয়া নিজের দেহরক্ষী বানাইয়াছে। গাছের বুদ্ধি না থাকিলে এরকম ভাবে আত্মরক্ষা সম্ভব হইত কি?

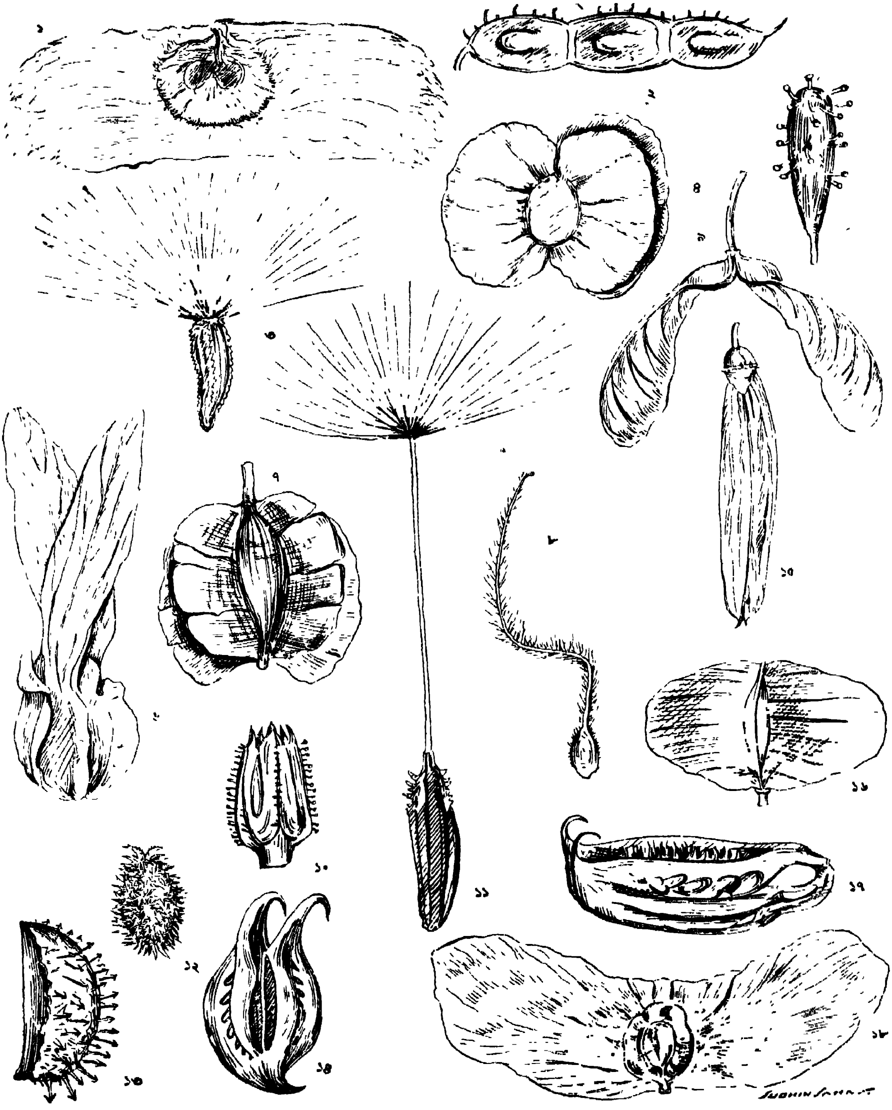
বীজের ভিতর ভবিষ্যৎ সন্তান ভ্রূণ অবস্থায় থাকে। অনুকূল অবস্থায় সে যখন ভূমিষ্ঠ হয় তখন কি খাইয়া সে বাঁচিবে? মানুষের বাচ্চা মায়ের দুধ খাইবে, গাছের বাচ্চা কি খাইবে? এ বিষয়েও গাছের বিবেচনা বড় কম নহে। বীজের মধ্যে সে তাহার বংশধরের জন্য অতি যত্ন সহকারে উপযুক্ত পরিমাণে খাদ্য সঞ্চয় করিয়া রাখে। আমরা তো গাছের ভ্রূণকে হত্যা করিয়া তাহারই জন্য তাহার মায়ের এত যত্নে সঞ্চিত খাদ্য চুরি করিয়া খাই। বুদ্ধিহীনের পক্ষে এত যত্ন করিয়া শিশুর জন্য খাদ্য সংগ্রহ করিয়া রাখা কি সম্ভবপর?

তারপর দেখ, বংশরক্ষা করিলেই তো চলিবে না। তাহার বিস্তারের ব্যবস্থাও করিতে হইবে, কেন? একটা কুকুরের পাঁচটা বাচ্চা হইলে কোনটাই সুস্থ সবল হয় না, একজনের খাবার পাঁচ জনকে ভাগ করিয়া খাইতে হয়। একটা গাছে হাজার হাজার বীজ উৎপন্ন হয়। একটা তামাক গাছ বছরে ৩,০০,০ লক্ষ হইতে ৩,৫০,০০০ হাজার বীজ উৎপাদন করে। ইহাদের মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় যে সকল ভ্রূণ থাকে তাহাদের হাত, পা, পাখা নাই যে বড় হইলে চলিয়া ফিরিয়া নানাস্থান হইতে তাহারা দেহধারণোপযোগী খাদ্য সংগ্রহ করিবে। অথচ তাহাদিগকে মাটি ও বাতাস হইতে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিতেই হইবে। ফল পাকিলে গাছ হইতে খসিয়া ইহারা মাটিতে পড়িবে। একই গাছের গোড়ায় কয়েক বর্গ ফুট জমিতে হাজার হাজার গাছ জন্মিলে খাদ্যদ্রব্য ও আলো বাতাস লইয়া তাহাদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটির ফলে কেহই জীবন সংগ্রামে জয়ী হইবার শক্তি সঞ্চয় করিতে পারে না। দুই এক পুরুষের মধ্যেই সেই গাছের বংশ লোপ পাইবার সম্ভাবনা, কিন্তু বংশ লোপ হউক, কেহ ইহা কামনা করে কি? গাছও করে না। এখানেও গাছ বুদ্ধি খরচ করিয়া নিজের কার্য্য সিদ্ধি করে। কিন্তু কেমন করিয়া?



জলাভূমির গাছের বংশরক্ষা—গাছের নীচে অল্পগভীর নোনা জল

এ বিষয়েও ইহারা অন্যকে ঠকাইয়া, কিংবা লোভ দেখাইয়া নিজের কাজ উদ্ধার করিল। প্রথমে



১। অরোকিসলাম ইণ্ডিকাম ২। মাইমোছা পিউডিকা ৩। সনকাস্ ওলোরেসিয়াস্ ৪। ডোডোনিয়া ভিস্কোসা ৫। বোয়ারহেভিয়া স্কানডেন্স ৬। ডিপ্টেরোকারপাস্ গ্রাণ্ডিফ্লোরাস্ ৭। কমব্রিটাম্ এপিকউলেটাস্ ৮। ক্লিমোটিস ভাইট্যালবা ৯। এসার সিউডো প্লাটেনাস্ ১০। প্লাম্বেগো জেলানিকা ১১। ট্যারাক্সেকাম ডেন্স-লিওনিস্ ১২। জ্যান্থিয়াম্ষ্ট্রামেরিয়াম্ ১৩। ইউরেনা লোবেটা ১৭ ও ১৪। মারটিনিয়া য়্যানিউয়া ১৫। ভেন্টিলেগো অবলংগিফোলিয়া ১৬। টারমিনেন্সিবয়া সাবস্প্যাথিউলেটা ১৮। ম্যাক্রোজামিয়া ম্যাক্রোকারপা। উপরোক্ত

খানিকটা খাদ্য সঙ্গে দিয়া ভ্রূণকে ভাল করিয়া সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিল, কারণ জানা তো নাই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে তাহাকে কতকাল থাকিতে হইবে। ইহার পর বীজকে দূরে পাঠাইতে কাহার সাহায্য তাহাকে লইতে হইবে তাহা ঠিক করিল। যদি বাতাসের সাহায্য লওয়াই ঠিক করে তবে বীজ কিংবা ফলের গায়ে ডানা, ডানা কিংবা শুঁয়া লাগাইল। কাপাস, শিমুল, আকন্দ, সজিনা, শাল, মাধবীলতা, করবী, কুকশিমা প্রভৃতি এই জাতীয় গাছ।

নারিকেল গাছ সমুদ্রের ধারেই সাধারণতঃ বাস করে। নূতন নূতন দ্বীপে নারিকেল গাছই হয় সর্বপ্রথম বাসিন্দা। জলের সাহায্যেই সে বংশবিস্তার ভাল মনে করিল। আর সেইজন্য এমন ব্যবস্থা করিল যে ফল সহজেই জলে ভাসিয়া থাকিতে পারিবে, ভিতরে জল প্রবেশ করিতে পারিবে না, কোন প্রকারে প্রবেশ করিলেও ভ্রূণকে সহজে নষ্ট করিতে পারিবে না। একটি নারিকেল ফল লইয়া তাহাকে জলে ভাসাইয়া তোমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিও।

ইহাদের কেহ কেহ দেহের সৌন্দর্য্য দিয়াও সৌন্দর্য্য পিপাসু মানুষকে বংশবিস্তার বিষয়ে সাহায্য করিতে বাধ্য করিল। শীতকালে তোমাদের বাগানে যে এত মরসুমী ফুল ফোটে, তাহাদের বেশীর ভাগই তো আমাদের দেশের গাছ নহে। এখানে তো গাছের ফুল ও পাতা তোমাদের চোখের তৃপ্তি সাধন করে। কিন্তু ইহাতেই গাছের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল, তাই আজ ভাওলেট, পিঙ্ক, ভারবেনা, ফ্লক্স, কারনেসন, প্রভৃতি ফুল তোমাদের বাগানে দেখা যায়।

কিন্তু বেশীর ভাগ গাছই তাহাদের ফলের মধ্যে পশু-পক্ষী ও মানুষের খাদ্য সঞ্চিত করিয়া তাহাদিগকে প্রলোভিত করে। এবং এ বিষয়ে মানুষের সাহায্যই তাহারা বেশী কামনা করে। আমরা যে এত ফল ও তরিতরকারি খাই তাহার বেশীর ভাগই তো বিদেশ হইতে আমদানী। এখানে তাহার একটি তালিকা দিলাম।

পৈত্রিক বাসস্থান

আফ্রিকা—তেঁতুল, তাল, গিনিঘাস, অড়হড়, তরমুজ, ঢেঁড়েশ।

আমেরিকা—ভুট্টা, টোম্যাটো, গোলআলু, রাঙ্গাআলু, পেঁপে, লঙ্কা, টেপারি, তামাক, পেয়ারা, আনারস, আতা, নোনা, কুইনাইন, মেহগিনি, বকুল, মিঠাকুমড়া চিনাবাদাম, হিজলী বাদাম, কচুরিপানা।

গ্রীস, ইটালী—মসূর, মটর।

চীন- চা, লিচু, কামরাঙ্গা, স্থলপদ্ম, গন্ধরাজ, জবা, কমলালেবু, আক, কাফি ও আঁসফল।

পারস্য, আফগানিস্থান—পালংশাক, ছোলা, পেঁয়াজ, রসুন, খেজুর।

মালয় দ্বীপপুঞ্জ—নারিকেল, পান, সুপারি, ঝিঙ্গা।

মেসোপোটেমিয়া—যব, গম।

যবদ্বীপ সিংহল—তিল, চালকুমড়া, আম।

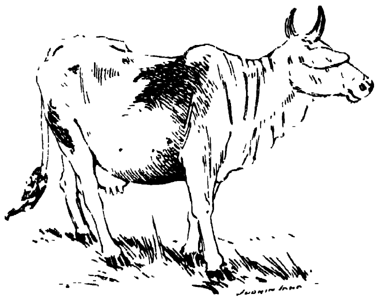
য়ুরোপ—পোস্ত, গোলাপ, বাঁধাকপি।

বেলুচিস্তান—মেদি, ডালিম।

বাতাবিলেবু—কাপ্তেন সাদক যবদ্বীপ হইতে ভারতে আনিয়াছিলেন। বিলিম্বি এখন ভারতীয় হইলেও ইহার জন্মস্থান হইতেছে মালয় দ্বীপপুঞ্জে। তোমরা স্থলপদ্ম ফুলটিকে সকলেই ভালবাস, বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বত্রই স্থলপদ্ম দেখা যায়। কিন্তু এই সুন্দর ফুলটি চীনদেশ হইতে আসিয়াছে।

চট্টগ্রাম ও উড়িষ্যায় বহুল পরিমাণে কাজু বাদাম জন্মে। ইহা আমেরিকা হইতে আমাদের দেশে আসিয়াছে। তোমরা সকলেই বিলাতি আমড়া ভালবাস। সোসাইটি, ফ্রিজি, ফ্রেণ্ডলি প্রভৃতি দ্বীপ হইতেছে ইহাদের জন্মস্থান। লকেট জাপান। বিলাতি মেহেদি, বাগানে ইহার দ্বারা বেড়া দেওয়া হয়। এই মেহেদি ভূমধ্যসাগরের উপকূল এবং আফগানিস্থান ও বেলুচিস্থান হইতে এদেশে আসিয়াছে। আমাপান—এমাজন নদীর তীরে উৎপত্তি। পূর্ব্বে ভারতবর্ষে এবং আমেরিকায় ইহা সর্প-দংশনের ঔষধ স্বরূপ ব্যবহৃত হইত।—গেঁদা ফুল ত যেখানে সেখানে দেখিতে পাও, আফ্রিকা ও ফরাসী দেশ হইতে এই ফুল আমাদের দেশে আসিয়াছে। আইন আকবরি গ্রন্থে সূর্য্যমুখী ফুলের নাম পাওয়া যায়।—মেক্সিকো, পেরু প্রভৃতি স্থান হইতে ভারতে আসিয়াছে। হলদে করবি,

এই ফুল বাঙ্গলায় সর্ব্বত্রই দেখা যায়। মেক্সিকো হইতে ব্রাজিল পর্য্যন্ত স্থানে ইহা স্বাভাবিক ভাবে জন্মে। কর্পূর পাতা আবিসিনিয়া হইতে এদেশে আসিয়াছে। দারুচিনির জন্মস্থান লঙ্কা। লাল



গরুর লেজে ওকড়া

ভেরেণ্ডা রাস্তার পাশে পাশে জন্মে। ১৮৫ খৃষ্টাব্দের পর এদেশে আসিয়াছে, কোথা হইতে আসিয়াছে বলা কঠিন। আখরোট, মালয় দ্বীপ হইতে আসিয়াছে।

এখানকার এই তালিকা হইতে বুঝিতে পারিলে যে এদেশের অনেক তরু-লতা, ফুল ফলই বিদেশ হইতে আসিয়া আমাদের দেশে আসিয়া বসিয়াছেন।

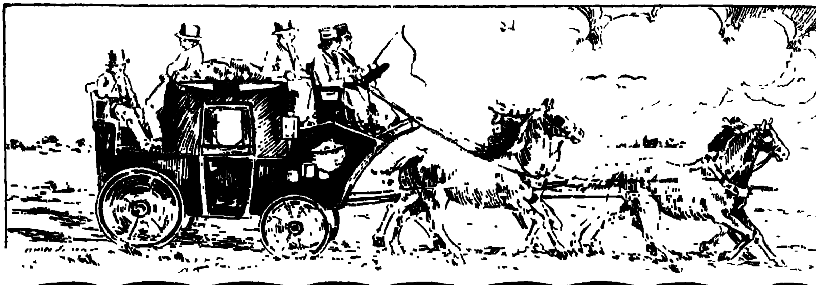
গাছের মধ্যে যাহাদের ফুল ও ফলের সমৃদ্ধি আছে, তাহাদিগকে না হয় সকলে আদর করিয়া, লোভে কিংবা দায়ে পড়িয়া বহন করিল কিন্তু যাহাদের না আছে সৌন্দর্য্য, না আছে শাঁস বা স্বাদ, না আছে বাতাসে উড়িবার ব্যবস্থা, তাহাদের বংশ-রক্ষার উপায় কি হইবে? তাহারা বোকা ছেলে-মেয়েদের মত রাস্তায় বসিয়া কাঁদিবে না, গাছ সে রকম ছেলেমেয়েই নয়। তাহারা এ অবস্থায় কি উপায় করিবে, তাহার জবাব আমি দিব না, তোমরা শীতকালে তোমাদের কাপড় পা পর্য্যন্ত নামাইয়া দিয়া মাঠের ভিতর একবার বেড়াইয়া আসিও, তাহা হইলেই এ সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে।

এখনও কি তোমরা গাছের বুদ্ধি নাই বলিবে? তাহা যদি বল তবে গাছের শিকার করার কৌশল ও ফন্দির কথাটা একবার ভাল করিয়া পড়িও।

উদ্ভিদের ইতিহাস যতই পড়িবে, ততই উদ্ভিদের প্রকৃতি, উদ্ভিদের সহিবার শক্তি, এবং কোন্ উদ্ভিদ কি ভাবে বাঁচে বা মরে, সে সব কথা জানিতে পারিবে। কোনও উদ্ভিদ প্রচণ্ড রৌদ্রে থাকিয়া স্বচ্ছন্দে বাঁচিতে পারে, আবার কোনও উদ্ভিদ সুগভীর কূপ বা ইন্দারার ভিতর ঘোর অন্ধকারের ক্ষীণ আলোকেও বাঁচিয়া থাকে। কত জাতীয় শৈবাল জলের মধ্যে চির জীবন বাস করে, আলোকের অভাবে কোন ক্লেশ পায় না। সমুদ্রের জলে দেড়শত ফুট নিম্নেও উদ্ভিদ জন্মে এবং বাঁচিয়া থাকে। কাজেই তোমরা দেখিতে পাইতেছ যে, উদ্ভিদের বাঁচিবার মধ্যে এবং বংশবৃদ্ধির মধ্যে প্রত্যেকটি বিষয়েই আমরা উদ্ভিদের বুদ্ধির পরিচয় পাইতেছি।



চোর কাঁটার বাহাদুরী



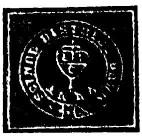
ডাকঘরের জন্মকথা

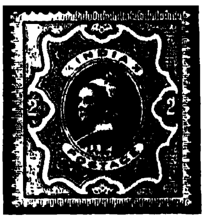
ভারতীয় ডাকঘরের ইতিহাস

২৬৬৬ পৃষ্ঠার পর

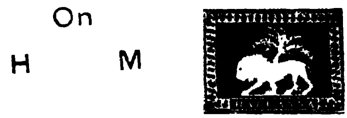
ভারতবর্ষের ডাকঘরের ইতিহাস সম্বন্ধে যাঁহারা সামান্য ভাবেও অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে—বিগত তিরাশী বৎসরের মধ্যে ইহা কিরূপ সুন্দরভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে।

ভারতের ডাক ব্যবস্থার ইতিহাস আলোচনার পক্ষে প্রধান অন্তরায় এই যে—আমাদের পূর্ব্ব-





পুরুষগণের ইতিহাস সংগ্রহের দিকে আলস্য ও ঔদাসীন্য। সেকালের সব কথা জানিবার উপায় নাই। তবে হিন্দু রাজাদের সময় রাজায় রাজায় সংবাদের আদানপ্রদান হইত দূতের দ্বারা। বিবাহের প্রস্তাব লিপিও ঐ ভাবেই পত্র বিনিময় চলিত। সাধারণের মধ্যে বড় একটা পত্র বিনিময় চলিত না। কেননা তখন প্রবাসে যাইবার ত আর বড় একটা প্রয়োজন ছিল না। কাজেই পত্রলিখন বড় একটা চলিত না। কালিদাসের শকুন্তলার পত্রলিখনের চিত্র হয়ত অনেকেই দেখিয়াছ। ধর্ম্ম ও সমাজ সম্পর্কীয় গ্রন্থ হইতে তখনকার অবস্থার একটা মোটামুটি জ্ঞান বা ধারণা করা সম্ভব হইলেও, সেই সময়ে ডাক প্রেরণের কিরূপ বন্দোবস্ত ছিল তাহা লিপিবদ্ধ থাকা দূরের কথা, খ্যাতনামা সম্রাটগণের রাজত্বকালের সময় নিরূপিত হওয়াই প্রমাণ অভাবে দুরূহ এবং অনুসন্ধান সাপেক্ষ হইয়া রহিয়াছে। মুসলমান রাজত্বের পূর্ব্বে ডাক প্রেরণের ব্যবস্থার কোনরূপ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। অবশ্য ইহা হইতে এরূপ অনুমান করা ঠিক হইবে না যে, হিন্দু রাজাদের সময়ে এদেশে ডাক চলাচলের, কিংবা অন্ততঃ রাজকীয় সংবাদাদি প্রেরণের কোনরূপ ব্যবস্থাই ছিল না। রাজ্য ও বাণিজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে, এ-দেশে তখনো সংবাদ সংগ্রহের ও উহা প্রেরণের ব্যবস্থা



যত সামান্য ভাবেই হউক না কেন নিশ্চয়ই এইরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে যে তাহা বিদ্যমান ছিল, নতুবা ভারতের বাহিরে চীন, জাপান, শ্যাম ইত্যাদি

দেশে হিন্দুনৃপতিগণ যে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং ভারতের ব্যবসায়িগণ বহির্বাণিজ্যের বিস্তার করিয়াছিলেন তাহা কখনও সম্ভবপর হইত না।

চন্দ্রগুপ্ত ও তাঁহার পরবর্ত্তী নৃপতিগণের সহিত বিদেশীয় রাজন্যবর্গের যুদ্ধ-বিগ্রহ সন্ধির খবর আমরা ইতিহাসে দেখিতে পাই। যুদ্ধ করিতে হইলেই সংবাদ সংগ্রহ করা প্রয়োজন এবং রাজধানী হইতে যুদ্ধক্ষেত্র যতদূরে অবস্থিত হইবে ততই সংবাদ সংগ্রহ ও প্রেরণের ব্যবস্থা সুশৃঙ্খল হওয়া আবশ্যক। ঐ সময়ে এবং তাহার পূর্ব্বেও ভারতের সহিত পূর্ব্বদিকে মালয়দ্বীপপুঞ্জের ও পশ্চিম দিকে পারস্য, ইটালী প্রভৃতি দেশের বাণিজ্য সম্বন্ধ ছিল। বর্ত্তমান সময়ে ব্যবসায় বাণিজ্য যেমন বেশীর ভাগই ক্রেতা ও বিক্রেতার অগোচরে এবং চিঠিপত্র দ্বারাই হয়, তখন অবশ্য তদ্রূপ ছিল না। অনেক স্থলেই ক্রেতা ও বিক্রেতাকে প্রতিনিধি পাঠাইয়া বা নিজে যাইয়া ক্রয় বিক্রয়ের কাজ করিতে হইত। সর্ব্বদা সকলের পক্ষে যাতায়াত অসুবিধাজনক ছিল বলিয়া ধীরে ধীরে প্রতিবেশীর মারফৎ পত্র দ্বারা সংবাদ আদান প্রদানের ব্যবস্থা হয়। ভারতবর্ষে দেবমন্দিরের জন্য নিত্য আবশ্যকীয় অনেক জিনিষ ডাক বসাইয়া আনিবার ব্যবস্থা ছিল। গুজরাট প্রদেশে সোমনাথ মন্দিরের অধিষ্ঠিত বিগ্রহের স্নানের জন্য বহুদূর হইতে প্রত্যহ গঙ্গাজল আনীত হইত বলিয়া কথিত আছে। কতকাল হইতে এইরূপ প্রথা চলিতেছিল তাহা জানা যায় না। মুসলমানগণ সোমনাথের মন্দির আক্রমণ করায় এই সংবাদটুকু আমরা জানিতে পারি। ইহা ১০২৪ খৃষ্টাব্দের ঘটনা। এইরূপ আরো একটি সংবাদ আমরা এক ইংরাজ সৈনিকের নিকট হইতে পাই। ইহার নাম কর্ণেল ব্রাউটন (Col Broughton)। ইঁহার লেখা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, পুষ্কর হ্রদ হইতে উদয়পুর রাজবাটীতে প্রত্যহ জলও পূজার অন্যান্য উপকরণ আনিবার রীতিমত বন্দোবস্ত ছিল। উল্লিখিত কোন ঘটনাই চিঠিপত্র প্রেরণের ব্যবস্থার কথা নহে সত্য, কিন্তু গাড়ীতে বা রেলে ডাক প্রেরণের বন্দোবস্ত হইবার পূর্ব্বে ইংল্যাণ্ডে বা অন্যান্য দেশে যে উপায়ে লোক দ্বারা ডাক পাঠান হইত আমাদের দেশেও তদ্রূপ ব্যবস্থাই ছিল এই সব বিবরণ হইতে তাহারই আভাষ পাওয়া যায়।

মুসলমান রাজত্বের প্রথম দিকে ভারতের মুসলমান অধিকৃত প্রদেশ সমূহ আফগানিস্থান হইতে শাসিত হইত। অবশ্য তাঁহাদের প্রতিনিধি ভারতবর্ষে থাকিতেন এবং সেইজন্য প্রতিনিধিগণের নিকট হইতে রাজধানীতে সংবাদ প্রেরণের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ ঘটনা লিপিবদ্ধ করা বিষয়ে হিন্দুদের ন্যায় উদাসীন না হইলেও যুদ্ধ-বিগ্রহ ও তাহার জয় পরাজয়ের সংবাদ ভিন্ন অন্য বিষয়ের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা তত দরকারী মনে করিতেন না। ডাক প্রেরণের ব্যবস্থাদি সম্বন্ধে প্রথম সঠিক সংবাদ আমরা মুসলমান পর্য্যটক **ইবন্ বতুতার** ভ্রমণ কাহিনী হইতে জানিতে পাই। তিনি চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি **মহম্মদ তুঘলকের** রাজত্বকালে (১৩২৫-১৩৫১ খৃঃ) এদেশে আসেন এবং তখন রাজকীয় ডাকপ্রেরণের ব্যবস্থা কিরূপ ছিল তাহা লিখিয়া গিয়াছেন :-

'হিন্দুস্থানে অশ্বারোহী ও পদাতিক এই দুই প্রকারের বার্ত্তাবহ ছিল। অশ্বারোহী বার্ত্তাবহ, সুলতানের অশ্বারোহী সৈন্যদল হইতে সংগৃহীত হইত এবং প্রতি চারি মাইল অন্তর তাহাদের বদলি হইত। পদাতিকগণ একমাইল অন্তর অন্তর অবস্থান করিত। প্রত্যেক বাহকের হস্তে একটি দুই হাত পরিমিত লম্বা বেত্রদণ্ড ও তাহার অগ্রভাগে একটি ঘণ্টাবাঁধা থাকিত। এক হস্তে চিঠিপত্রের পুলিন্দা বা থলি ও অপর হস্তে বেত্রদণ্ড ধারণ করিয়া তাহারা এক ঘাটি হইতে অপর ঘাটি পর্য্যন্ত ডাক পৌঁছাইয়া দিত। এই উপায়ে সুলতানের পক্ষে তাড়াতাড়ি সংবাদ পাওয়া সম্ভব হইত।" সেই সময়ে দেশ জঙ্গলাকীর্ণ ছিল এবং বন্য জন্তুর ও চোর ডাকাতের উপদ্রব খুব বেশী ছিল। ঘণ্টা ধ্বনি দ্বারা বন্যজন্তুকে সন্ত্রস্ত করা হইত এবং নিকটবর্ত্তী হরকরা ও গ্রামবাসীদিগকে তাহার আগমনবার্ত্তা জানাইয়া দেওয়া হইত। ডাকহরকরাগণ এখনও ঘণ্টাসংযুক্ত তীক্ষ্ণাগ্র বংশদণ্ড লইয়া ডাক বহন করে।

সেই সময় পাঠান রাজ্য বঙ্গদেশ হইতে গুর্জ্জর (Guzrat) পর্য্যন্ত সমস্ত উত্তর ভারতবর্ষে (একমাত্র

কাশ্মীর ব্যতীত) বিস্তৃত ছিল। এরূপ বিশাল রাজ্যে ডাক চলাচলের এইরূপ সুন্দর সুব্যবস্থা ইহার পূর্ব্বে আর কোন দেশে হয় নাই। হয়ত এই সময়ের অনেক পূর্ব্ব হইতেই এই ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছিল; কারণ দাস রাজবংশের সুলতান ইলতুৎমিসের রাজত্বকালে (১২১১-৩৬ খৃঃ) বাঙ্গলা, সিন্ধু, মালব ও মুলতান দিল্লীর পাঠান সম্রাটের অধীনে আসে। তাহার পর আলাউদ্দীন খালজীর সময়ে (১২৯৬—১৩১৬ খৃঃ) সমস্ত উত্তর ভারতবর্ষে



স্যার চার্লস ষ্টুয়ার্ট উইলসন্ কে, সি, আই, ই
ডাকবিভাগের ডিরেক্টার জেনারেল—১৯০৬-১৯১৩

পাঠান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহাদের রাজত্বকালেও এই সুবৃহৎ রাজ্যের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে রাজকীয় সংবাদাদি প্রেরণের ব্যবস্থা নিশ্চয়ই ছিল, এইরূপ অনুমান করা অসঙ্গত হইবে বলিয়া মনে করি না। কারণ ইবন্‌বতুত্তার বর্ণিত ডাকপ্রেরণের সুব্যবস্থা যে হঠাৎ একদিনে বা এক রাজার আমলে হয় নাই, বরং উহা ক্রমোন্নতির ফল তাহাতে সন্দেহ নাই। দুঃখের বিষয় তাঁহার পূর্ব্বে আর কোন য়ুরোপীয় ভ্রমণকারী উত্তর ভারতবর্ষে আসেন নাই।

ইহার পর শেরশাহের রাজত্বকালে (১৫৪০-৪৫ খৃঃ) ডাকপ্রেরণের ব্যবস্থার সংবাদ পাওয়া যায়। ফিরিস্তা লিখিত ঐতিহাসিক গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে তিনি পূর্ব্ববঙ্গের তৎকালীন রাজধানী ঢাকা জেলার অন্তর্গত সোনারগাঁও হইতে সিন্ধুদেশ (বর্ত্তমান গুজরাট) পর্য্যন্ত দুই হাজার মাইল ব্যাপী এক রাস্তা প্রস্তুত করেন এবং ডাক প্রেরণের জন্য দুইমাইল অন্তর অন্তর দুইজন অশ্বারোহী রাখিবার ব্যবস্থা করেন। শেরশাহের পর সম্রাট আকবরের সময়েও (১৫৫৬—১৬০৫ খৃঃ) তাঁহার ভারতব্যাপী রাজ্যের খবরাখবর প্রেরণের জন্য ঘোড়ার ডাকের বন্দোবস্ত ছিল। উল্লিখিত "ফিরিস্তা" গ্রন্থ হইতে আরও জানা যায় যে, ডাক বহন করিবার জন্য তাঁহার রাজ্যের প্রধান প্রধান রাস্তায় ১০ মাইল অন্তর ঘোড়া বদলাইবার বন্দোবস্ত ছিল এবং চব্বিশ ঘণ্টায় একশত মাইল দূরবর্ত্তী স্থানে সংবাদ পৌঁছান যাইত। এই ব্যবস্থায় আগ্রা হইতে আহম্মদাবাদে পাঁচদিনে ডাক যাইত। ইহা সেকালের পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে; কারণ সেই সময়ে আমাদের আদর্শস্থল ইংল্যাণ্ডের ডাকের ব্যবস্থা অতি শোচনীয় অবস্থায় ছিল।

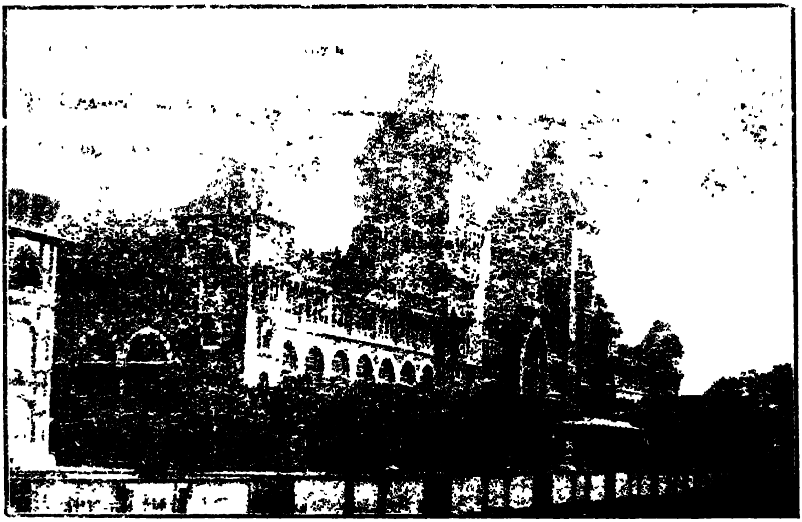
আকবরের সময়ে অশ্বারোহী ব্যতীত পদাতিক ডাকবাহীও ছিল এবং তাহাদের সংখ্যা ছিল প্রায় চারি হাজার। প্রয়োজন অনুসারে তাহাদের সাহায্যে ৭০০ মাইল দূরবর্ত্তী স্থানে পর্য্যন্ত চিঠিপত্র প্রেরিত হইত। এতদ্ব্যতীত অতিশয় জরুরি সংবাদ প্রেরণের জন্য ঘোড়ার ডাকেরই বিশেষ এক রকম বন্দোবস্ত ছিল। এই ব্যবস্থায় সাধারণ ঘোড়ার ডাক অপেক্ষা সংবাদ অধিকতর দ্রুত প্রেরিত হইত। ঐ সময়ে রাজকীয় ডাকের সহিত সর্ব্বসাধারণও তাহাদের চিঠিপত্র পাঠাইতে পারিত বলিয়া অনুমান হয়। তবে বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় যে কোন ব্যক্তির অনায়াসে খুশীমত চিঠিপত্র পাইবার সুযোগ নিশ্চয়ই ছিল না। রাজপরিবারস্থ ব্যক্তিগণ, ঊর্দ্ধতন রাজকর্ম্মচারী বা ঐরূপ

প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি সরকারী ডাকের সাহায্যে চিঠিপত্র প্রেরণ করিতে পারিতেন। ডাক প্রেরণের এই ব্যবস্থা আকবরের রাজত্বের সাথে সাথে লোপ পায় নাই, ইহা সুনিশ্চিত। যদি মোগল রাজত্ব ধ্বংস হইবার পর ভারতবর্ষ পুনরায় খণ্ড খণ্ড বিভক্ত হইয়া না যাইত, তাহা হইলে হয়ত ভারতবর্ষে ডাক প্রেরণের ব্যবস্থাই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইতে পারিত। কারণ ইহার পূর্ব্বে এরূপ বিস্তীর্ণ দেশে এমন সুশৃঙ্খলার সহিত এত অল্প সময়ের ডাক প্রেরণের সুবন্দোবস্ত আর কোথাও হয় নাই। মোগল রাজত্বের পর ভারতবর্ষ যখন আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া গেল তখন আর সমগ্র দেশব্যাপী সংবাদ প্রেরণের ব্যবস্থা রহিল না। অধিকন্তু দেশময় অশান্তি ও অরাজকতা বিরাজ করায় খণ্ডরাজ্যগুলিতেও সংবাদ প্রেরণের ভাল ব্যবস্থা ছিল বলিয়া মনে হয় না। সেই জন্যই ইংরেজগণ যখন ক্রমে ক্রমে এদেশের শাসন-ভার গ্রহণ করিতে লাগিলেন তখন তাহারা ডাক প্রেরণের ভারতব্যাপী কোন বন্দোবস্ত দেখিতে পান নাই।

ইংরাজ রাজত্বের প্রথম অবস্থায় ভারতবর্ষের নিম্নলিখিত স্থানে ডাক প্রেরণের ব্যবস্থার অস্তিত্বের সংবাদ পাওয়া যায়।

বাঙ্গলা দেশে—কলিকাতা হইতে মুর্শিদাবাদ পর্য্যন্ত ডাকের ব্যবস্থা ছিল। এই ডাকে সরকারী চিঠিপত্র ব্যতীত নবাব পরিবারের এবং নবাবের লোকগণও চিঠিপত্র পাঠাইতে পারিত এবং ইহা 'নিজামৎ ডাক' নামে পরিচিত ছিল। এই ডাকে কলিকাতা হইতে মুর্শিদাবাদে চিঠি পৌঁছিতে ৫০-৬০ ঘন্টা সময় লাগিত। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানী সমগ্র দেশে রীতিমত ডাক চলাচলের বন্দোবস্ত করিবার পর ১৮৩৮ সালে এই ডাক বন্ধ হইয়া যায়।

অযোধ্যা প্রদেশে—এই প্রদেশের রাজধানী লক্ষ্ণৌ সহর হইতে রাজ্যের সব প্রধান প্রধান নগরে ডাক পাঠাইবার ব্যবস্থা ছিল। এই



জেনারেল পোষ্ট অফিস—মাদ্রাজ

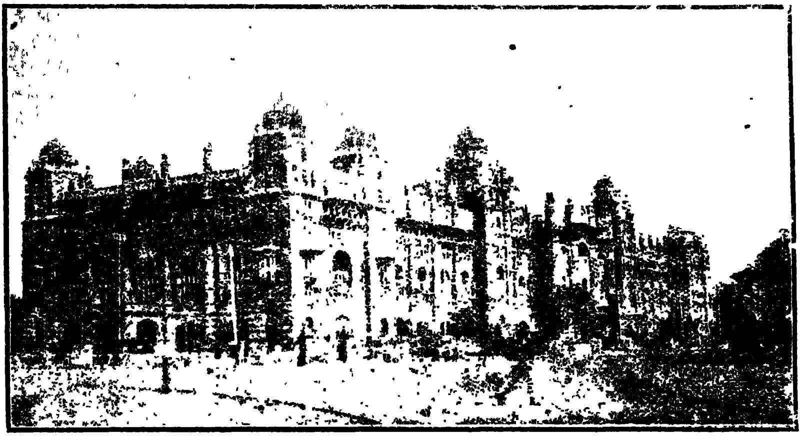
ডাকে সরকারী চিঠিপত্র ভিন্ন বাঙ্গলার 'নিজামৎ ডাকের' মতই সর্ব্বসাধারণের চিঠিপত্র পাঠাইবার অধিকার ছিল না।

মাদ্রাজ প্রদেশে—ব্রিটিশ অধিকৃত স্থান সমূহে ডাক পাঠাইবার কোন বন্দোবস্ত না থাকিলেও মহীশূর রাজ্যের রাজধানী হইতে রাজ্যের সর্ব্বত্র ডাক পাঠাইবার ভাল বন্দোবস্ত ছিল। এই বন্দোবস্ত চিকদেব নামক রাজা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন বলিয়া কর্ণেল উইল্‌কস্ (Col. Wilks) নামক জনৈক ইংরেজ সৈনিকের লিখিত বিবরণ হইতে

মহারাষ্ট্রে—শিবাজীর দেশে কোনরূপ ব্যবস্থা থাকা খুবই সম্ভব, যদিও তাহার উল্লেখ আমরা কোথাও দেখিতে পাই নাই।

ইংরাজ আমলে ডাকের উন্নতি

ইংরেজ আমলে, এদেশের ডাকবিভাগের ক্রমোন্নতির ধারা আলোচনা করা যাক। ইংরেজ এদেশে প্রথমতঃ বাঙ্গলা ও মাদ্রাজ অঞ্চলে রাজ্য বিস্তার করে। এই দুই দূরবর্ত্তী প্রদেশের কর্ত্তৃত্বভার হাতে লইয়া লর্ড ক্লাইভ দেখিলেন যে, নিজেদের



জেনারেল পোষ্ট অফিস—বোম্বাই

জানা যায়। চিকদেব ১৬৭২ সালে রাজ্যলাভ করেন। তাঁহার পরবর্ত্তীকালেও এই ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল।

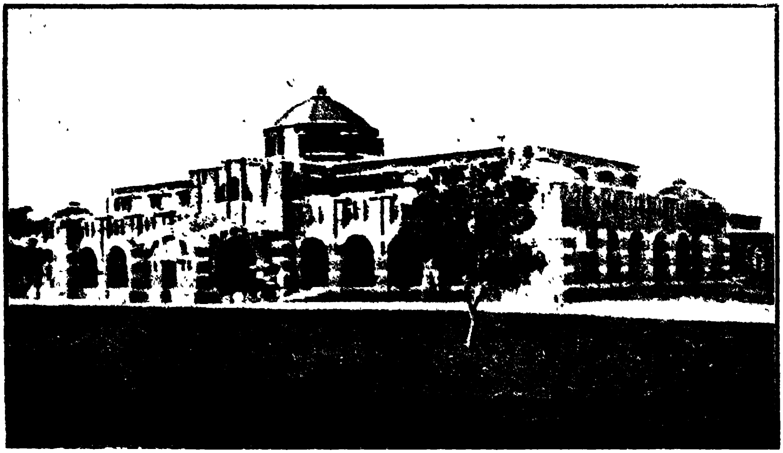
বোম্বাই প্রদেশে-তথাকার ধনী আর্মিম ব্যবসায়ী ও অন্যান্য ব্যবসায়িগণ তাহাদের ব্যবসা সম্পর্কীয় সংবাদ আদান প্রদানের জন্য রাজ সাহায্য ব্যতিরেকে চিঠিপত্র প্রেরণের একটি বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।

উল্লিখিত বিবরণ ভিন্ন ভারতে ব্রিটিশ রাজত্ব প্রতিষ্ঠা কালে আর কোন রাজ্যে ডাক প্রেরণের ব্যবস্থা ছিল কিনা সংবাদ পাওয়া যায় না।

নবলব্ধ ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে প্রত্যেক প্রদেশের প্রধান নগরের মধ্যে সংবাদ আদান প্রদানের বন্দোবস্ত করা একান্ত আবশ্যক। নতুবা দেশীয় ও বিদেশীয় শত্রুদিগের হস্ত হইতে অল্পসংখ্যক ইংরেজের আত্মরক্ষা ও রাজ্যরক্ষা করা কঠিন হইবে। ইহা ভাবিয়া তিনি এদিকে মনোনিবেশ করিলেন। লর্ড ক্লাইভ ব্রিটিশ রাজত্বে এদেশে প্রথম ডাক-বিভাগের সূত্রপাত করেন। তখন জমিদারদিগের সাহায্য ভিন্ন লোকজন পাইবার উপায় ছিল না। নিজ হাতে এই বিভাগের সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করিবার সুবিধা বা ক্ষমতাও তখন কোম্পানীর ছিল না। তাই

তিনি জমিদারদের উপর নিজ নিজ এলাকার ভিতর দিয়া ডাক বহন করিবার লোক যোগাইবার আদেশ দিলেন এবং ডাকবাহীর সংখ্যা হিসাবে খাজনা মকুব দিবার ব্যবস্থা করিলেন। ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে এই সম্বন্ধে প্রথম আদেশ প্রচারিত হয়। উহাতে এইরূপ লেখা ছিল :—'এখন হইতে ডাক পাঠাইবার সমস্ত চিঠি গভর্ণমেণ্ট হাউসে জমা হইবে, পোষ্টমাষ্টার অথবা তাহার সহকারী প্রত্যহ রাত্রে সেখানে উপস্থিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন যায়গার ডাক বাছিয়া তাহা এক এক টি পৃথক থলিতে পুরিয়া কোম্পানীর শীল-মোহর দ্বারা বন্ধ করিবেন। এক আফিসের ডাক অন্য আফিসে খোলা হইবে না এবং প্রত্যেক আফিসের ডাক তথাকার সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মচারী ভিন্ন অন্য কেহ খুলিতে পারিবে না। মফঃস্বল হইতে কলিকাতায় ডাক পাঠাইতেও এই নিয়ম অনুসৃত হইবে।' ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে তখন দেশীয় সর্ব্বসাধারণের চিঠিপত্র পাঠাইবার সুবিধা ছিল না। শুধু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ এই ডাকে তাহাদের চিঠিপত্র পাঠাইতে পারিতেন।

সেই সময়ে দেশীয় রাজন্যবর্গের, ও ফরাসীদের সহিত ইংরাজগণের যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রায় লাগিয়াই ছিল এবং এই সব যুদ্ধ-বিগ্রহের সংবাদ ডাক ভিন্ন কলিকাতায় পাঠাইবার আর অন্য উপায় ছিল না। এ অবস্থায় কোন বিশেষ জরুরি সংবাদ সময়মত না পাইলে বা শত্রুর হাতে পড়িলে গুরুতর ক্ষতি হইতে পারে আশঙ্কা করিয়া এবং মান্দ্রাজ হইতে প্রেরিত কলিকাতার ডাক, পথে প্রায়ই মারা যাইতে দেখিয়া, ইহা নিবারণার্থ ১৭৬৬ সালের জুলাই মাসে দ্বিতীয় আদেশ প্রচারিত হয়। সেই সময়ে মান্দ্রাজ হইতে কলিকাতার ডাক, গঞ্জাম, কটক ও বালেশ্বর হইয়া আসিত। পথে নদী পার হইবার জন্য কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ রীতিমত নৌকার বন্দোবস্ত রাখিতেন। প্রত্যেক প্যাকেটে নম্বর দেওয়া হইত এবং রওনা হইবার তারিখ ও সময় লিখিয়া দেওয়া হইত। নম্বর থাকার দরুণ কোন প্যাকেট খোয়া গেলে তাহা জানা যাইত।



পোষ্ট অফিস—আগ্রা

ওয়ারেন হেষ্টিংস ১৭৭২ সালে গভর্ণর জেনারেল পদে নিযুক্ত হইয়াই ডাক বিভাগের উন্নতির দিকে বিশেষ মনোযোগ দিতে আরম্ভ করেন

এবং তাঁহার কর্তৃত্ব কালে (১৭৭২—১৭৮৫) ডাক প্রেরণের ব্যবস্থার অনেক উন্নতি সাধিত হয়। তিনি সরকারী ডাকের সাথে কর্মচারীদিগের বিনা মাশুলে চিঠিপত্র পাঠাইবার প্রথা রহিত করিয়া দেন, সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বসাধারণের চিঠিপত্র নিবার ব্যবস্থা করেন এবং উভয়বিধ চিঠির জন্ত মাশুল ধার্য্য করিয়া দেন। সেই সময় এই বিভাগের কাজে বড়ই বিশৃঙ্খলা ছিল। রাজ্য ও বাণিজ্য বিস্তার এই দুই দিকে

ডাক অতিরিক্ত ভারী হইলে তাহা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক লোকের পক্ষে বহন করা কঠিন হইত। দ্বিতীয়তঃ দেশের তৎকালীন অবস্থায় অতিরিক্ত লোক সংগ্রহ করাও বড় সহজ ছিল না। এইসব অসুবিধা দূর করিবার জন্তই ওয়ারেন হেষ্টিংস ১৭৭৭ সালে মাষ্টার জেনারেল" পদের সৃষ্টি করেন এবং কতকগুলি নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তন করেন। উহাদের মধ্যে প্রধান কয়েকটির বিষয় নিম্নে উল্লেখ করা হইল



কাঙ্গরা উপত্যকায় ডাক ও যাত্রী এক সঙ্গে বহনকারী মোটর বাস্

সকলের লক্ষ্য থাকায় ডাক বিভাগের উন্নতির দিকে তখন কাহারো তেমন দৃষ্টি পড়ে নাই। তদ্ভিন্ন সেই সময় এই দুই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত উপযুক্ত কোন কর্ম্মচারীও ছিল না। পথে অযথা ডাকের বিলম্ব ঘটিত; অনেক সময় চিঠিপত্র খোলা পাওয়া যাইত। তদুপরি সরকারী ডাকের সঙ্গে কর্ম্মচারী বা অন্তান্তদের যে সব চিঠিপত্র যাইত তাহাদের জন্ত কোন মাশুল গ্রহণ করা হইত না বলিয়া চিঠিপত্রের সংখ্যা ও ওজন অত্যধিক বাড়িয়া ডাক পাঠাইবার ব্যয় অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তখন এখনকার মত রেলে বা জাহাজে ডাক যাইত না। লোক মারফৎ পদব্রজে পাঠান হইত। এই অবস্থায়

ডাক চলাচলের জন্ত ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষকে চারিভাগে বিভক্ত করা হয়:—

(১) কলিকাতা হইতে গঞ্জাম
(২) কলিকাতা হইতে পাটনা
(৩) পাটনা হইতে বারাণসী
(৪) কলিকাতা হইতে ঢাকা

প্রত্যেক বিটের (Stage এর) জন্ত ৩ জন ডাকবাহী, ১ জন মশালধারী ও ১ জন ঢাকী নিযুক্ত ছিল। এই ব্যবস্থা হইতে সেই সময়কার দেশের অবস্থার কিঞ্চিৎ আভাষ পাওয়া যায়। রাস্তাঘাট ছিল না বলিলেই হয়। বনজঙ্গলময় পথে হিংস্র-জন্তুর ও দস্যুতস্করের বিশেষ ভয় ছিল। এই সব

কারণেই ঢাকী, মশালধারী প্রভৃতির বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল।

	মাইল	বিট	হরকরা	মশালধারী	ঢাক
কলিকাতা—গঞ্জাম	৩৫৮	৪২	১২৬	৪২	৪২
কলিকাতা—পাটনা	৩৯৮	৪৮	১৪৬	৪৮	৪৮
পাটনা—বারাণসী	১৬৫	১৯	৫৭	১৯	১৯
কলিকাত'—ঢাকা	১৭৯	২১	৬৩	২১	

এক এক বিট বা stageএর দূরত্ব প্রায় নয় মাইল করিয়াছিল এবং ঘণ্টায় তিন মাইল করিয়া চলিবার নিয়ম ছিল। এক বিট হইতে অন্য বিটে পৌঁছিবার সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইত এবং কয়েক বিট পর পরই ডাক পৌঁছিবার সময় লিখিয়া রাখা হইত। ফলে হরকরাগণ নিরর্থক বিলম্ব করিলে ধরা পড়িত।

ওয়ারেন হেষ্টিংস্এর সময়ে এই বিভাগে কর্ম্মচারীর সংখ্যা নিম্নলিখিতরূপ ছিল :—

	ডেপুটি পোষ্টমাষ্টার	ডাকপিয়ন
মুর্শিদাবাদ	... ১ ...	১০
পাটনা	... ১ ..	১০
বারাণসী	... ১ ...	২
গঞ্জাম	... ১ ...	২
ঢাকা	... ১ ...	২
দিনাজপুর	... ১ ...	২

ইহা ভিন্ন কলিকাতায় একজন ইংরাজ ডেপুটি, ১ জন দেশীয় সহকারী ডেপুটি, ৭ জন সর্টার (sorter) এবং চিঠি বিলি করিবার জন্য ১৫ জন পিয়ন ছিল। সেস্থলে এখন একমাত্র কলিকাতা সহরে চৌদ্দশত কেরাণী, নয়শত ডাকপিয়ন, চারশত প্যাকার এবং চারশত চাপরাশি ও দারোয়ান কাজ করিতেছে।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে ওয়ারেন হেষ্টিংস এর সময়ে জনসাধারণ সরকারী ডাকে মাশুল দিয়া চিঠি পাঠাইবার অধিকার প্রথম প্রাপ্ত হয়। মাশুলের হার প্রতি শত মাইলে চিঠি প্রতি ৵০ দুই আনা নির্দ্দিষ্ট করা হয় এবং এই মাশুল অগ্রিম দিতে হইত।

ইংল্যাণ্ডে কিন্তু তখনও ডাকমাশুল অগ্রিম আদায় করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হয় নাই। বৃটিশ অধিকৃত প্রদেশের বহির্ভূত স্থান হইতে কিংবা ভারতবর্ষের বাহির হইতে সমুদ্র-পথে যে সব চিঠি আসিত তাহাদের মাশুল চিঠি বিলি করিবার সময় আদায় করা হইত এবং মাশুল নির্দ্ধারণ করিবার জন্য ব্রিটিশ ভারতে পৌঁছিবার পর হইতে দূরত্ব গণনা করা হইত কলিকাতার ডাকঘর চিঠি বিলির জন্য ১০ টা হইতে মধ্যাহ্ন ১টা পর্য্যন্ত এবং ডাকের চিঠি গ্রহণ করিবার জন্য অপরাহ্ন ৬টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত খোলা থাকিত। তখনও ডাক টিকেটের প্রচলন না হওয়ায় ডাকমাশুল আদায়ের জন্য পোষ্টাফিসের কর্ম্মচারীদের হাতে চিঠি দিতে হইত। তাই চিঠি ডাকে দিবার জন্যও নির্দ্দিষ্ট সময়ের প্রয়োজন ছিল। টিকেটের প্রচলন না হওয়া পর্য্যন্ত মাশুলের হিসাব রাখিতে হইত; অধিকন্তু প্রেরকের প্রত্যেক চিঠির জন্য রসিদ দেওয়া হইত। ১৮৫৪ সালে ডাক টিকেটের প্রবর্ত্তন হইলে সাধারণ চিঠির জন্য রসিদ দেওয়ার প্রথা উঠিয়া যায়। তখন হইতে চিঠির বাক্সেরও সৃষ্টি হয়। সাধারণ চিঠির জন্য রসিদ দেওয়া বন্ধ হইলেও অতিরিক্ত ফিস্ দিলে রসিদ দেওয়া হইত। ইহাই ভারতে রেজিষ্ট্রেশন প্রথার প্রথম সূচনা। ডাক টিকেট সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে মাশুল আদায় করিবার জন্য দুই আনা মূল্যের এক প্রকার তামার মুদ্রার প্রচলন হইয়াছিল। এই মুদ্রা ডাকমাশুল দেওয়া ভিন্ন অন্য কোন কার্য্যে ব্যবহার করা চলিত না। অবশ্য এই মুদ্রা ব্যতীত সাধারণ পয়সা দ্বারাও মাশুল দেওয়া চলিত। প্রত্যেক পোষ্টাফিসের দৈনিক চিঠির সংখ্যা, তাহার মাশুলের পরিমাণ ও ওজনের হিসাব পোষ্টমাষ্টার জেনারেলের নিকট পাঠাইতে হইত।

১৭৮৪ সালে ওয়ারেন হেষ্টিংস এই বিভাগ সম্বন্ধে পুনরায় কতকগুলি নিয়ম প্রবর্ত্তন করেন এবং সেই বৎসর হইতেই বাঙ্গলার এবং তৎপর বৎসর হইতে মাদ্রাজে এই নব নিয়মাবলী অনুযায়ী কার্য আরম্ভ হয়। ১৭৮৬ সালে মাদ্রাজের জন্য একজন পৃথক পোষ্টমাষ্টারজেনারেল নিযুক্ত হন। ১৭৮৪ সাল মধ্যে বোম্বাই প্রদেশের কতক অঞ্চল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ত্তৃত্বাধীনে আসে এবং মাদ্রাজ বোম্বাই ও কলিকাতার মধ্যে ১৭৮৬ সালে পাক্ষিক ডাক প্রেরণের ব্যবস্থা হয়।

ওয়ারেন হেষ্টিংস্এর পর অনেক বৎসর কাল এই বিভাগের উন্নতির আর কোন সংবাদ পাওয়া

যায় না। এই সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী **টিপু সুলতান ও মারহাঠাদের** সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ও ব্যস্ত থাকায় এদিকে সম্ভবতঃ বিশেষ মনোযোগ দিতে পারেন নাই। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ভারতে ব্রিটীশ সাম্রাজ্য বিস্তারের কার্য্য এক প্রকার শেষ হয়। ১৮১৮ সালে শেষ মারাঠা যুদ্ধের পর পাঞ্জাব ও ব্রহ্ম প্রদেশ ভিন্ন বিশেষ উল্লেখযোগ্য আর কোন স্থান ব্রিটিশ শাসনাধীনে আসে নাই। দেশে শান্তি স্থাপিত হওয়ার পর আবার শাসনকর্ত্তাদের এদিকে দৃষ্টি পড়ে এবং ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে বিশ আইন মূলে ডিষ্ট্রীক্ট পোষ্টঅফিসের সৃষ্টি হয়।

এমন সময় হইতে বহুকাল পর্য্যন্ত "ইম্পিরিয়াল পোষ্টঅফিস" ও "ডিষ্ট্রীক্ট পোষ্টঅফিস" পাশাপাশি বিদ্যমান ছিল। প্রথমোক্ত অফিসগুলি 'পোষ্টমাষ্টার জেনারেলের' এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর অফিসগুলি ডিষ্ট্রীক্ট কালেক্টারের অধীন ছিল। প্রত্যেক জেলার ভিতর এক থানা হইতে অন্য থানায় এবং প্রত্যেক থানা হইতে জেলার সদরে সরকারী ডাক যাইবার জন্যই ডিষ্ট্রীক্ট পোষ্ট অফিসের সৃষ্টি হয়। এই ডাকে সরকারী চিঠিপত্র ভিন্ন অন্য কোন চিঠিপত্র নেওয়া হইত না। ডাক বহনের জন্য স্থানীয় জমিদারদিগকে হরকরা জোগাড় করিয়া দিতে হইত এবং অপরাধ হইলে দণ্ডনীয় হইতে হইত। নানা কারণে ডিষ্ট্রীক্ট পোষ্টঅফিসের কাজ কখন ভাল ভাবে চলিতেছিল না। জমিদারগণকে নিজ খরচে সরকারী ডাক পাঠাইতে হইত, অথচ সেই সঙ্গে নিজেদের এক থানা চিঠি পাঠাইবার উপায় তাহাদের ছিল না, এমন কি ইম্পিরিয়াল পোষ্টঅফিসের মাশুল দিয়াও নহে। নিজেদের চিঠি পাঠাইতে হইলে তাহাদিগকে বহুদূরবর্ত্তী ইম্পিরিয়াল পোষ্টঅফিসের সাহায্য লইতে হইত। এরূপ ব্যবস্থার কাজ কখনো ভালরূপ চলিতে পারে না এবং চলিলও না। তখন ডিষ্ট্রীক্ট পোষ্টে ডাক পাঠাইবার ভার জমিদারদিগের হাত হইতে ক্রমশঃ কালেক্টারদের তত্ত্বাবধানে আনা হইল। তখনও খরচ জমিদারদিগকেই যোগাইতে হইত। কেবল সময়মত ডাক পাঠাইতে না পারিলে সে অপরাধের জন্য দণ্ডিত হইবার যে সম্ভাবনা ছিল তাহা হইতে উহাদিগকে অব্যাহতি দেওয়া হইল। জমিদারগণের দেয় এই করের নাম ছিল ডাকসেস্। ইহা এখন উঠিয়া গিয়াছে। মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশে ডিষ্ট্রীক্ট পোষ্টঅফিসের খরচ, ইম্পিরিয়াল পোষ্টঅফিসের খরচের ন্যায় কোম্পানীই বহন করিত। যুক্তপ্রদেশে, মধ্যপ্রদেশে ও পাঞ্জাবে এই বিভাগের খরচ সরকারী তহবিল ও ডাকসেস্ হইতে ভাগাভাগি করিয়া বহন করা হইত; একমাত্র বাঙ্গলাদেশেই স্থানীয় জমিদারগণের নিকট হইতে ডিষ্ট্রীক্ট পোষ্টঅফিসের সমস্ত খরচ আদায় করা হইত।

ইম্পিরিয়াল ডাকবিভাগ যোগে সর্ব্বসাধারণের চিঠি দিবার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইলেও ১৮৩৭ সাল পর্য্যন্ত তাহারা ইচ্ছা করিলে চিঠিপত্র প্রেরণের ব্যবস্থা স্বতন্ত্রভাবে নিজেরাও করিতে পারিত। এমন কি সরকারী ডাকে চিঠি পাঠাইবার খরচ বেশী পড়ায় অনেক স্থলে বেসরকারী ডাকও চলিত। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এক আইন প্রণয়ন করিয়া তাহার এলাকার মধ্যে এই উপায়ে ডাক প্রেরণ বন্ধ করিয়া দেন। এই আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার পর লোকমারফতে বা নিজ খরচে কোথাও কোনও চিঠিপত্র পাঠাইলে উহার প্রেরক ও বাহক উভয়কেই দণ্ডনীয় হইতে হইত। এই বিসদৃশ নিয়ম ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে প্রত্যাহৃত হয়।

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের পুর্ব্বে ওয়ারেন হেষ্টিংসএর আমলে সরকারী ডাকের সহিত সর্ব্বসাধারণ চিঠি-পত্র পাঠাইবার অধিকার প্রাপ্ত হইলেও উহা অনেকটা অনুগ্রহ সাপেক্ষ ছিল। ১৮৩৭ সালে এই অধিকারকে কোম্পানীর পক্ষে রীতিমত বাধ্যতামূলক করা হয়। কিন্তু এখানে ইহাও বলা আবশ্যক যে সর্ব্বসাধারণের চিঠি পাঠাইবার এই আইনসঙ্গত অধিকার কেবলমাত্র ইম্পিরিয়াল পোষ্টঅফিসের এলাকার মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। ডিষ্ট্রীক্ট পোষ্টঅফিস তখন পর্য্যন্ত কেবল সরকারী ডাক বহন করিত। কিন্তু ইম্পিরিয়াল পোষ্টাফিসের সংখ্যা খুব কম থাকায় বড় বড় সহর ভিন্ন মফঃস্বলের লোকদের ডাক প্রেরণের এ সুবিধা দুর হইল না। এইরূপ ব্যবস্থায় জমিদারদের অসন্তোষের কারণ তেমনি থাকিয়া গেল। কারণ ডিষ্ট্রিক্ট পোষ্টঅফিসের খরচ তাহাদের যোগাইতে হইত অথচ তাহারা এই বিভাগ হইতে কোন উপকার পাইত না। এই সব

অসুবিধার বিষয় অনুসন্ধান করিবার জন্য এক কমিটী বসে এবং তাহার রিপোর্টের ফলে ডিষ্ট্রীক্ট পোষ্টের অধীনস্থ ডাকঘরেও সর্ব্বসাধারণের চিঠিপত্র গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে সেই সময় হইতেই সর্ব্বসাধারণ ডাক বিভাগের পূর্ণ সুযোগ লাভ ও ভোগ করিতে সক্ষম হয়।

প্রথমতঃ ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে যুক্ত প্রদেশে এই ব্যবস্থামত কাজ আরম্ভ হয়। তারপর মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশ ইহা গ্রহণ করে। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলাদেশে এই প্রথা প্রচলিত হয়। ইহার ফলে ডাকে চিঠি পত্রপ্রেরণের ব্যবস্থা দেশময় ছড়াইয়া পড়ে। টাকা পয়সা সংক্রান্ত ব্যাপারে ডিষ্ট্রীক্ট পোষ্টাফিসের কোন সম্পর্ক ছিল না। এই সব পোষ্টাফিস বেয়ারিং বা কম মাশুলের চিঠি ইম্পিরিয়্যাল পোষ্টঅফিসে পাঠাইয়া দিত। সেখানে তাহাদের হিসাব রাখিবার পর উহা গন্তব্য স্থানে প্রেরিত হইত। ইহার প্রধান অসুবিধা এই দাঁড়াইল যে, যে স্থান হইতে চিঠি প্রেরিত হইত এবং যে স্থানে চিঠি বিলি হইত, এই উভয় স্থান পাশাপাশি হইলেও সকল চিঠি পত্রেরই জেলা ঘুরিয়া আসিতে হইত। চিঠি বিলির খরচ নির্ব্বাহ করিবার জন্য প্রত্যেক চিঠির জন্য নির্দ্ধারিত মাশুলের উপর এক পয়সা করিয়া আদায় করা হইত; ইহা 'ডাকপিয়ন' পাইত। ডিষ্ট্রীক্ট পোষ্টঅফিসে চিঠি রেজেষ্টারী করিলে ফিস হইতে এক আনা সেই পোষ্টঅফিসের কর্ম্মচারী পাইত, আর বাকী তিন আনা চিঠির সঙ্গে ইম্পিরিয়্যাল পোষ্টঅফিসে পাঠান হইত। ষ্ট্যাম্প প্রচলিত হইবার পরও যে পর্য্যন্ত এই দুই শ্রেণীর পোষ্টঅফিসের হিসাব একত্র করা না হয়, সেই পর্য্যন্ত ডিষ্ট্রীক্ট পোষ্টাফিসে চিঠি রেজিষ্টারী তাহার ফি নগদ দিতে হইত, ষ্ট্যাম্প করিলে দেওয়া চলিত না।

ডিষ্ট্রীক্ট পোষ্টঅফিস সম্বন্ধে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে যে নিয়মাবলী প্রবর্ত্তিত হয় তাহারই ফলে প্রত্যেক ডিষ্ট্রীক্ট পোষ্টাফিসে চিঠি দিবার জন্য চিঠির বাক্সের (Letter Box এর) ও প্রচলন হয়। ইহার পর হইতে রেজেষ্টারী চিঠি ভিন্ন সব চিঠি এই বাক্সে দিতে হইত এবং ডাক পাঠাইবার পনেরো মিনিট পূর্ব্বে উহা খোলা হইত।

ক্রমে দেখা গেল যে, জেলার কালেক্টারগণ ডাক সম্পর্কীয় ব্যাপারে বড় মনোনিবেশ করিতে পারেন না এবং ইম্পিরিয়্যাল ডাকবিভাগের তুলনায় ডিষ্ট্রীক্ট ডাকবিভাগের কাজ কর্ম্মের তেমন তৎপরতা বা উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে না। তখন আস্তে আস্তে ডিষ্ট্রিক্ট ডাক বিভাগের পরিচালনার ভার ও দায়িত্ব পোষ্ট মাষ্টার জেনারেলের হাতে দেওয়া হয়। তাহার অধীনে গেলেও উভয়বিধ পোষ্টাফিসের হিসাব পত্র ইত্যাদি পৃথকই থাকে। পোষ্টমাষ্টার জেনারেল প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের অধীনে ডিষ্ট্রিক্ট পোষ্টঅফিগুলি পরিচালনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কালক্রমে উভয় বিভাগ এক হইয়া গেল এবং ১৯০৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ডিষ্ট্রিক্ট পোষ্টঅফিসের অস্তিত্ব আর একেবারেই রহিল না।

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে ডাকমাশুল নিম্নলিখিত রূপ নির্দ্ধারিত হয়:—

১ তোলা ওজনের চিঠি—২০ মাইল পর্য্যন্ত ⁄০ আনা

৫০	„	„	৵০	„
১০০	„	„	৶০	„
১৫০	„	„	I০	„
২০০	„	„	I⁄০	„
*	*	*	*	*
১৪০০	„	„	১৲ টাক	

প্রত্যেক অতিরিক্ত তোলার জন্য এই হিসাবে অতিরিক্ত মাশুল লাগিত। কলিকাতা হইতে ১ তোলা ওজনের চিঠি আগ্রা পাঠাইতে ৸০ আনা ও বোম্বাই পাঠাইতে ১৲ টাকা লাগিত। চিঠি ১২ তোলার অধিক হইলে গ্রহণ করা হইত না। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের আইন মূলে পার্শেল পাঠাইবার নিয়মও প্রবর্ত্তিত হয়। প্রথম প্রথম ইহাকে "বাঙ্গি" ডাক বলা হইত। ৬০০ তোলার অতিরিক্ত পার্শেল লওয়া হইত না এবং যে স্থানের রাস্তা ভাল নহে সে স্থানের পার্শেলও গ্রহণ করা হইত না।

পার্শেলের মাশুল নিম্নলিখিত হারে দিতে হইত:—৫০ তোলা ওজনের অনধিক ও ৫০ মাইলের মধ্যে I৵০ আনা; তাহার পর প্রতি ৫০ মাইলের (৩০০ মাইল পর্য্যন্ত) ৶০ আনা; তদূর্দ্ধে প্রতি ১০০ মাইলে (১০০০ মাইল পর্য্যন্ত) ৶০ আনা; ১৪০০ মাইল বা তাহার উর্দ্ধে ৩৲ টাকা।

সংবাদ-পত্রের জন্য পৃথক মাশুল নির্দ্দিষ্ট ছিল। বিলাতী সংবাদ-পত্রের মাশুল দেশীয় সংবাদ-পত্রের অপেক্ষা কম ধার্য্য করা হয়। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে ডেড্‌লেটার অফিসও প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন পর্য্যন্ত ইংল্যাণ্ড ও ভারতের মধ্যে ডাক প্রেরণের ভার ডাক বিভাগ গ্রহণ করে নাই। জাহাজের কাপ্তেনগণ এই সব চিঠি নিজ দায়িত্বে লইয়া যাইত এবং পারিশ্রমিক বাবদ চিঠি প্রতি এক আনা করিয়া গ্রহণ করিত। ইংল্যাণ্ড হইতে যে সমস্ত চিঠি উহারা আনিত তাহা এদেশের বন্দরের ডাকঘরে দিয়া দিত এবং ভারতবর্ষ হইতে যে সকল চিঠি লইয়া যাইত তাহা ইংল্যাণ্ডের বন্দরের ডাকঘরে দিয়া দিত বন্দর হইতে গন্তব্যস্থলে পাঠাইবার মাশুল সেই দেশের নির্দ্ধারিত হার অনুযায়ী আদায় করা হইত।

১৮৩৮ সালের আইন দ্বারা বিশেষ উচ্চপদস্থ কয়েকটি রাজকর্ম্মচারীদিগকে বিনা মাশুলে চিঠিপত্র পাঠাইবার অধিকার দেওয়া হয়। এইসব রাজ-কর্ম্মচারীদিগকে খামের উপর নিজের নাম ধাম লিখিয়া দিতে হইত। এই নিয়ম হইতে এই প্রথার নাম ফ্রাঙ্কিং (Franking) হয়। নিম্নলিখিত রাজ-কর্ম্মচারীগণ উল্লিখিত অধিকার প্রাপ্ত হন।

(১) ভারত-সচিব

(২) ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ

(৩) গবর্ণর জেনারল

(৪) বাঙ্গলা, মাদ্রাজ, বোম্বাই ও সিংহলের গবর্ণর

(৫) তৎকালীন উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশের লেফ-টেনেণ্ট গবর্ণর

(৬) বাঙ্গলা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই হাইকোর্টের প্রধান ও অন্যান্য বিচারপতিগণ

(৭) কলিকাতার বিশপ

(৮) সুপ্রিম কাউন্সিলের সদস্যগণ

(৯) ভারতের নৌ ও সৈন্যবিভাগের কমাণ্ডার-ইন-চিফ বা প্রধান সেনাপতি।

১৮৩৭ সালের আইন প্রচলিত হইবার পর কয়েক বৎসরের মধ্যেই ইহার নানারূপ ত্রুটী পরি-লক্ষিত হইতে লাগিল। প্রথম কথা ডিষ্ট্রীক্ট ইম্পি-রিয়্যাল পোষ্ট অফিসের কার্য্যের দায়িত্ব বিভক্ত হওয়ায় উভয় বিভাগের মধ্যে পুর্ণ সহযোগিতায় কার্য্য হওয়ার পক্ষে নানারূপ অন্তরায় ঘটিতে থাকে। তদুপরি ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে প্রথিতযশা রোল্যাণ্ড হিলের আন্দোলনের ফলে ইংল্যাণ্ডের ডাকবিভাগের আমুল পরিবর্ত্তন ও যুগান্তকারী উন্নতি সাধিত হওয়ায় এদেশেও এক শ্রেণীর লোক এই বিভাগের উন্নতির জন্য আন্দোলন সুরু করেন। সেই জন্য ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় ডাকবিভাগের উন্নতির উপায় নির্দ্ধারণ করিবার জন্য এক কমিশন বসান হয়। ইহার রিপোর্টের ফলে ১৮৫৪ সালে ইংল্যাণ্ডের ১৮৪০ সালের আইনের মূলনীতি অনুসরণ করিয়া এক আইন বিধিবদ্ধ হয় এবং চিঠির মাশুল দূরত্ব অনুসারে ধার্য্য করিবার নিয়ম উঠিয়া গিয়া সকল স্থানের জন্য একটি নির্দ্দিষ্ট মাশুল টিকেট দিয়া অগ্রিম আদায় করিবার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের আইন মূলে ইংরেজ অধিকৃত সমস্ত প্রদেশে ডাকটিকেট প্রচলিত হইবার পুর্ব্বে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে সিন্ধু প্রদেশে বার্টল ফ্রেয়ার সাহেব (Bartle-Frere) সর্ব্ব প্রথম ডাকটিকিটের প্রচলন করিয়া ছিলেন। ১৮৫০ সালের নিয়োজিত কমিশনের সভ্যগণ হিসাব করিয়া দেখান যে একটি চিঠি বহন করিবার খরচ প্রকৃত খরচের এক তৃতীয়াংশ মাত্র। তাহাদের উপদেশ অনুযায়ী ভারত গভর্ণমেণ্ট ১৮৫৪ সালে নিম্নলিখিত হারে মাশুল নির্দ্ধারণ করেন :—

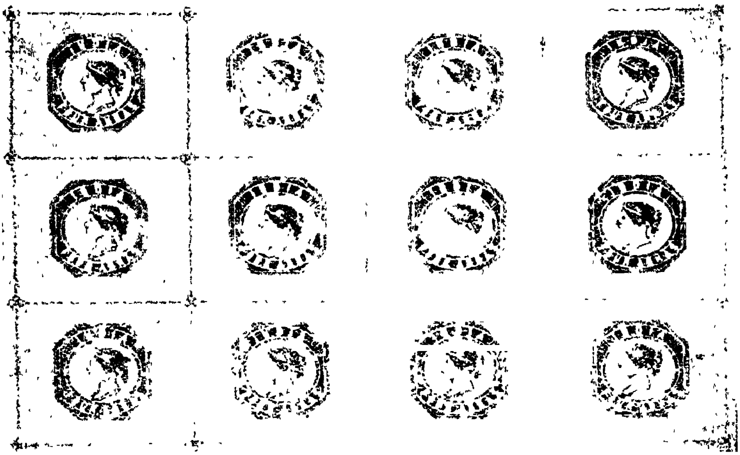
১।৪ তোলা	৬ পাই
১।২ ”	⁄০ আনা
১ ”	৵০ আনা

১৮৫৪ সালের আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার পর টিকিট দ্বারা মাশুল অগ্রিম দিতে হইত একথা পুর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। কেহ অগ্রিম মাশুল না দিলে অর্থাৎ ডাকটিকিট না লাগাইয়া চিঠি ডাকে দিলে দ্বিগুণ মাশুল আদায়ের নিয়ম সেই সময়েই করা হয়। ষ্ট্যাম্পের প্রবর্ত্তন হওয়ার নগদ মাশুল আদা-য়ের হিসাব রাখিবার প্রয়োজন চলিয়া যায় এবং তজ্জন্য অতিরিক্ত লোকের আবশ্যকও আর থাকে না; এবং চিঠির বাক্স স্থাপন করাও সহজ হয়। এ দেশে এই সব নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইবার ১০।১২ বৎসর পূর্ব্ব হইতে ইংল্যাণ্ডে এই নিয়মানুযায়ী কাজকর্ম্ম চলিতে থাকায় এখানে নূতন নিয়মে কাজ চালাইতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। ১৮৫৪

সালের পূর্ব্বে একতোলা ওজনের চিঠি আগ্রা হইতে মাদ্রাজ পাঠাইতে ৸৹-বারো আনা ও বোম্বাই পাঠাইতে ।৵৹ আনা লাগিত। সেইস্থলে এক্ষণে ন্যূনকল্পে অর্দ্ধআনা মাত্র ব্যয় করিয়াও বোম্বাই পর্য্যন্ত চিঠি পাঠান সম্ভব হইল। ইহাতে ডাক-বিভাগের উপকারিতা ও জনপ্রিয়তা কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। ইংল্যাণ্ডের ডাক বিভাগের ইতিহাসে ১৮৪০ সাল এবং রোল্যাণ্ড হিলের নাম যেমন চিরস্মরণীয়, ভারতের ডাকবিভাগের ইতিহাসে ১৮৫৪ সালও তেমনি স্মরণীয়।

চারিজন এসিষ্টাণ্ট পোষ্টমাষ্টার জেনারেলের বেতন বাবদ বরদ্দ আছে ৬০০০৲ হাজার টাকা। জেনারেল পোষ্ট অফিস তখন বর্ত্তমান হাইকোর্টের পার্শ্বে (এক্ষণে ওল্ড পোষ্ট অফিস নামে খ্যাত পল্লীতে) অবস্থিত ছিল। ১৮৬৮ সালে উহা লালদীঘির বর্ত্তমান বাড়ীতে স্থানান্তরিত হয়। চিঠি দিবার জন্য পোষ্টঅফিস ভিন্ন কলিকাতায় আরো ছয়টি পোষ্টঅফিস ছিল। যথা,—

(১) মেছুয়াবাজার
(২) বাগবাজার
(৩) ভবানীপুর



১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের চারি আনা মূল্যের ডাক টিকেট—কলিকাতাতে মুদ্রিত

১৮৫০ সালে যে তদন্ত কমিশন বসে এবং যাহার ফলে ১৮৫৪ সালে ডাকবিভাগে সর্ব্বজনবাঞ্ছিত নীতি প্রবর্ত্তিত হয়, তাহার রিপোর্ট হইতে ডাকবিভাগের তদানিন্তন অবস্থা সম্বন্ধে আমরা নিম্নলিখিতরূপ বিবরণ জানিতে পারি।

তখন পর্য্যন্ত পোষ্টমাষ্টারজেনারেলই কলিকাতার প্রেসিডেন্সি পোষ্টমাষ্টারের কাজ করিতেন। এই পদের বেতন তখন ২০০০৲ হাজার টাকা ছিল। বর্ত্তমানে এই পদের বেতন উর্দ্ধে ৪৫০০৲ টাকা তদুপরি দুইজন ডেপুটি পোষ্টমাষ্টার জেনারেল ও

(৪) খিদিরপুর
(৫) পার্কষ্ট্রীট
(৬) বৈঠকখানা

গঙ্গার ওপারে কোন ডাকঘর না থাকায় হাবড়াব লোককে চিঠি দিবার জন্য কলিকাতায় আসিতে হইত। বর্ত্তমান সময়ে ডেলিভারি পোষ্ট অফিসই কলিকাতায় চব্বিশটি ও হাওড়ায় চারিটি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। জেনারেল পোষ্ট অফিস ভিন্ন অন্য সব অফিস রবিবারে একেবারে বন্ধ থাকিত। অন্যান্য দিন ১১টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত খোলা থাকিত।

১০ টায় ও ৩ টায় এই দুইবার চিঠি বিলি হইত। দেশীয় ভাষায় লিখিত চিঠি ও সহরতলীর চিঠি কেবল তিনটার সময় বিলি হইত। ওয়ারেণ হেষ্টিংসএর সময়ে (১৭৭২—১৭৮৫) কলিকাতায় মাত্র ১৫ জন পিয়ন ছিল। দেশীয় ভাষায় লিখিত চিঠি বিলি করিবার সময় পিয়ন চিঠি প্রতি এক আনা আদায় করিত। ইহা ডাকবিভাগের অনুমোদিত না হইলেও উহা দিতে কেহ বড় আপত্তি করিত না। তখন পর্য্যন্ত অধিকাংশ চিঠি বেয়ারিং থাকিত। ইহাদের মাশুল আদায়ের জন্য পিয়নের প্রত্যেক বাড়ীতে



১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের কলিকাতায় মুদ্রিত অর্দ্ধ আনা মূল্যের ডাক টিকেট

অনেক সময় নষ্ট হইত। সময়ের এই অপব্যয় নিবারণ করিবার উদ্দেশ্যে পিয়নদিগকে একটি করিয়া ঘণ্টা দেওয়া হয়। যে সব গৃহ হইতে মাশুল আদায় করিতে হইবে, সেই সব গৃহে প্রবেশ করিবার সময় পিয়ন ঘণ্টাধ্বনি করিয়া বাড়ীর মালিকদিগকে তাগাদা করিত।

কলিকাতার জেনারেল পোষ্টাফিস ও তাহার অধীনস্থ ৬টি পোষ্টাফিস ভিন্ন বাঙ্গলা দেশে ৭৪টি হেড্ অফিস ও ৭০টি অধীনস্থ অফিস (Subsidiary office) ছিল। অন্যান্য প্রদেশে ও পোষ্ট-অফিসের সংখ্যা অল্পাধিক ঐরূপই ছিল। বর্ত্তমান সময়ে কেবলমাত্র ভারতে প্রায় ৩২,০০০ হাজার পোষ্টঅফিস আছে।

১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে কলিকাতা জেনারেল পোষ্ট অফিস হইতে যে সব সংবাদপত্র মফঃস্বলে পাঠান হয়, তন্মধ্যে বাঙ্গলা ভাষায় মুদ্রিত "সমাচার চন্দ্রিকা" ও "সংবাদ প্রভাকর"এর নাম পাওয়া যায়। 'সমাচার চন্দ্রিকা' ১৯টি ও প্রভাকর মাত্র ১৬খানি ডাকে যাইত বলিয়া জানা যায়। "দি ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া" (বর্ত্তমান Statesman) যাইত ৪৪২টি। ইহার সংখ্যাই ছিল সর্ব্বাপেক্ষা বেশী; তারপর "ইংলিশম্যান" (Englishman) ২১৯টি।

তখন পর্য্যন্ত মাশুলের হিসাব রাখিবার জন্য সমস্ত চিঠি রেজেষ্টারীভুক্ত করা হইত। ইহা অবশ্য বর্ত্তমান রেজিষ্ট্রেশনের অনুরূপ ছিল না, অতিরিক্ত আট আনা ফিস দিলে দায়িত্ব বিশিষ্ট বিশেষ প্রকারে রেজেষ্টারী করা হইত। তখন পর্য্যন্ত বিলাতী ডাক মাসে একবারমাত্র আসিত এবং যদিও তখন কলিকাতায় চারিলক্ষ লোকের বাস ছিল, তথাপি সহরের চিঠি সহরে বিলি করিবার কোন ব্যবস্থা ছিল না। ইহা সত্ত্বেও ১৮৫০

খৃষ্টাব্দে এইরূপ ৪০০ শত চিঠি কলিকাতার ডাকঘরে পাওয়া গিয়াছিল। কলিকাতা ও বোম্বাই সহরে ১৮৬৭ সালে "লোক্যাল ডেলিভারী"র প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়।

১৮৫৪ সালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রত্যেক প্রদেশের ডাক বিভাগের ভার প্রাদেশিক পোষ্টমাষ্টারজেনারেলের উপর থাকায় বিভিন্ন প্রদেশের কার্য্যপ্রণালীর মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতেছিল না এবং তাহাদের মধ্যে সহযোগিতারও অভাব ঘটিয়াছিল। ডিষ্ট্রিক্ট পোষ্টাফিস সম্বন্ধেও বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্নরূপ করেন। কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশে পৃথক প্রেসিডেন্সি পোষ্টমাষ্টার নিযুক্ত হন। অন্য প্রদেশগুলিকে ইহাদেরই এক একটির অধীন করা হয় এবং তাহাদের জন্য চীফ ইন্‌স্পেক্টার নিযুক্ত হয়। এই পদের নামই ভবিষ্যতে পরিবর্ত্তিত হইয়া ডেপুটি পোষ্টমাষ্টার-জেনারেল হইয়াছে।

১৮৫৪ সালে প্রথম **"পোষ্ট্যাল ম্যানুয়েল"** প্রকাশিত হয়। ইহা হইতে জানা যায় যে, প্রেসিডেন্সী পোষ্টাফিস হইতে ৭টা, ১১টা ও ৩টার



মহারাণী ভিক্টোরিয়ার আমলের নানা রকমের ডাকটিকেট

চলিতেছিল। পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, ভারতের অন্য প্রদেশে ডাকটিকেটের প্রচলন হইবার পূর্ব্বেই সিন্ধুপ্রদেশে সর্ব্বপ্রথম ১৮৫২ সালে ডাক টিকেটের সৃষ্টি হয়। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য ১৮৫৪ সালে প্রাদেশিক পোষ্টমাষ্টারজেনারেলদিগের উপর একজন 'ডিরেক্টর জেনারেল' নিযুক্ত হন। ইহাই এখনও ডাক বিভাগের সর্ব্বোচ্চ পদ। রিডল্ সাহেব (Mr. Riddle) প্রেসিডেন্সি পোষ্টমাষ্টারদিগকে পোষ্টমাষ্টারজেনারেলদের কর্তৃত্ব হইতে মুক্ত রাখিয়া তাহাদের উপর নিজ নিজ প্রদেশে আর সব পোষ্টাফিসের তত্ত্বাবধানের ভারার্পণ সময়, এই তিনবার চিঠি বিলি হইত। ১০টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত চিঠি দেওয়া হইত। ইহার পরে চিঠি দিতে হইলে ৷৷০ আনা অতিরিক্ত ফি দিতে হইত। মফঃস্বলের পোষ্টঅফিসে ১০টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত চিঠি দেওয়া হইত। তাহার পর ৷৷০ আনা ফি লাগিত। চিঠির জন্য সার্টিফিকেট অফ্ পোষ্টিং দিবার রীতি ছিল না। কিন্তু পার্শেলের জন্য উহা দেওয়া হইত। এই "ম্যানুয়েল" এ ডাকবিভাগের কর্ম্মচারীদের ভ্রম প্রমাদের জন্য জরিমানার ব্যবস্থা ছিল। কোন্ অপরাধে কত টাকা জরিমানা হইতে পারে তাহার নির্দ্দিষ্ট

করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। একটি ডাকব্যাগ ভুলবশতঃ অন্যস্থানে পাঠাইলে তাহার জন্য তিন টাকা এবং পার্শেল সম্বন্ধে ঐরূপ ভুল হইলে আট আনা জরিমানা নির্দ্দিষ্ট ছিল, যে কর্ম্মচারী ভুল ধরিয়া দিতে পারিত এই জরিমানার টাকা তাহাকে দেওয়া হইত। এই জন্য প্রত্যেক কর্ম্মচারীই অন্যের ভুল ধরিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিত। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে এই নিয়ম উঠাইয়া দেওয়া হয়।

অনেক দিন পর্য্যন্ত সৈনিকদের চিঠির মাশুল সাধারণের চিঠির মাশুল অপেক্ষা কম ছিল। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে এই তারতম্য রহিত করিয়া দেওয়া হয়। কোন চিঠির ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিলে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহার জন্য পৃথক রিডাইরেকশন্ ফি দিতে হইত। পার্শেলের জন্য এখনও পৃথক রিডাইরেকশন্ চার্জ্জ দিতে হয়। ১৮৫৫-৫৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত "এনালস্ অফ বৃটিশ এডমিনিষ্ট্রেসন্ (Annals of British Administration) হইতে জানা যায় যে ঐ সময়ে রেলগাড়ী, উটের গাড়ী, নৌকা, ঘোড়া ও লোক মারফতে ডাক প্রেরণ করা হইত। গরুর গাড়ী ঘণ্টায় ৭ মাইল এবং লোক ৬ মাইল করিয়া চলিত। ডাক-বিভাগে সর্ব্বসমেত ২২৬৪৪ জন কর্ম্মচারী এবং



সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের আমলের ডাকটিকেট

গরুর গাড়ীর জন্য ৪২১৫ জন গাড়োয়ান ছিল। গরুর গাড়ীতে ডাক ভিন্ন অন্য লোক এবং তাহাদের মাল পত্রও যাইতে পারিত। দুরত্ব অনুসারে তাহার জন্য ভাড়া দিতে হইত। গরুর গাড়ী ১৫৬২ মাইল পথ ডাকবহন করিত। ১৮৫৪ সালে—ডাকটিকেট—প্রবর্ত্তন হওয়ার বৎসর মোট ৮৫৭৭০০৲ টাকার ডাকটিকেট বিক্রয় হইয়াছিল। ইহার তিন বৎসর পর এই বিভাগের কর্ম্মচারীর সংখ্যা বাড়িয়া ২৬১৫৮তে দাঁড়ায় এবং টিকিট বিক্রয় হয় ২৪২৪৮৬৩৲ টাকার। ঐ সময়ে লোক দ্বারা ডাক বহন করিতে মাইল প্রতি ২, ৩ পাই,



সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের আমলের ডাকটিকেট

ঘোড়ায় ১১৷৷ ২ পাই, গরুর গাড়ীতে ১৮।১১ পাই এবং নৌকায় ৭৸৴৫ পাই খরচ পড়িত।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রত্যেক প্রদেশের ডাকবিভাগের হিসাব স্বতন্ত্রভাবে রাখা হইত। সেই বৎসর হইতে সমস্ত প্রদেশের হিসাব একত্র করিয়া একজন কর্ম্মচারীর অধীনে আনা হয়। এই অফিসারের পদের নাম প্রথমে "কম্পাইলার অব পোষ্ট অফিস একাউণ্টস (Compiler of Post office accounts) ছিল। এখন ইহার নাম "একাউণ্টেণ্ট জেনারেল অব পোষ্টস্ এণ্ড টেলিগ্রাফস্ (Accountant General of Posts & Telegraphs) হইয়াছে সেই বৎসরই টেলিগ্রাফ বিভাগকে ডাক বিভাগের সহিত যুক্ত করিয়া দেওয়া হয় এবং ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে উহাদের অফিসও একত্র হইয়া যায়। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের পর ১৮৬৬, ১৮৮২, ১৮৯৫, ১৮৯৬, ১৮৯৮, ১৯১২, ১৯২২ খৃষ্টাব্দে ডাকবিভাগ সম্বন্ধে নূতন আইন প্রণয়ন হইলেও এই সব আইন দ্বারা মাশুল পরিবর্ত্তন, পুরাতন ব্যবস্থার দোষত্রুটীর সংশোধন ইত্যাদি কার্য্যই প্রধানতঃ সাধিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন কতকগুলি নূতন কাজের ভারও পোষ্টাফিস গ্রহণ করিয়াছে ; যথা মণিঅর্ডার, ইনসিওরেন্স সেভিংস ব্যাঙ্ক, সৈনিকদের পেন্সনের টাকা দেওয়া কুইনাইন বিক্রয় ইত্যাদির কার্য্য হইতেছে।



ভল্লুক

২৬৩৮ পৃষ্ঠার পর

শ্বেত (Ursus maritimus) ভালুকেরা উত্তর মেরুতে বাস করে, সে কথা তোমাদের বলিয়াছি। সাধারণতঃ এইরূপ জনপ্রবাদ প্রচলিত আছে যে শ্বেত ভালুকেরা খুব হিংস্র প্রাণী। কিন্তু জীব-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা বলেন যে কথাটা একেবারে অসত্য নয়, তবে এ বিষয়ে একটু বাড়াইয়াও বলা হয়।

এখানে একটি গল্প বলিতেছি। একবার এক জাহাজের নাবিকেরা উত্তর মেরুর বরফাবৃত স্থান সমূহে বেড়াইতে বেড়াইতে হঠাৎ একদল শ্বেত ভালুকের কাছে পড়িয়াছিলেন। তাহাদের সঙ্গে অনেক অস্ত্রশস্ত্রও ছিল,—এজন্য তাহারা নিরাপদে জাহাজে ফিরিতে পারিয়াছিলেন। —কিন্তু এদিকে রাত্রিবেলা জাহাজের নাবিকেরা যখন জাহাজের পাটাতনের এ পাশে ওপাশে ঘুমাইয়া আছে, এমন সময় একটি এক বৎসর বয়স্ক শ্বেত ভালুক জাহাজে উঠিয়া যেখানে কুকুরগুলি বিশ্রাম করিতেছিল, সেখানে যাইয়া একটি কুকুরকে লইয়া নীরবে সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া বরফের পথে চলিয়া গেল। পরদিন নাবিকেরা সকাল বেলা উঠিয়া দেখিল যে জাহাজ ভরা রক্তের দাগ, তখন তাহারা বুঝিতে পারিল যে দুষ্ট শ্বেত ভালুক জাহাজের উপরে আসিয়া একটি কুকুর লইয়া গিয়াছে। একটি মাত্র কুকুর খাইয়া যে ভালুক মহাশয়ের ক্ষুধার নিবৃত্তি হইবে না, তাহা জাহাজের লোকেরা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল, এজন্য পরের দিন রাত্রিতে তাহারা বেশ সতর্ক ছিল। পরের দিন ভালুক মহাশয় যেমন জাহাজে আসিয়া হাজির হইলেন, অমনি নাবিকেরা সকলে মিলিয়া ভালুকটাকে তাড়া করিল। ভালুকটা সে সময়ে আর একটা কুকুরকে লইয়া বরফের উপর দিয়া থপ্ থপ করিয়া চলিয়া যাইতেছিল। তখন নাবিকদের সঙ্গে সঙ্গে কুকুরগুলিও চলিল,—এইবার শ্বেত-ভালুকটির সহিত সকলের লড়াই চলিল। একজন নাবিককে ভালুকটা অতি বেগে ছুটিয়া আসিয়া আক্রমণ করিল।—ভালুক দুইটা কুকুর খাইয়া বেশ তাজা হইয়া উঠিয়াছিল এবং আর একটা কুকুরকেও আহত করিয়াছিল। এই ভালুকটা কিছুতেই ভীত হইল না। অনেক কষ্টে ইহাকে মারিতে হইয়াছিল। এই জাতীয় ভালুক সহজে ধরা দেয় না এবং ইহাদের মারাও দুঃসাহসিকতার কাজ।

যাঁহারা সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুদিগকে পোষ মানাইয়া থাকেন, তাঁহারা বলেন যে ভালুকদের



শ্বেত ভালুক



লণ্ডনের চিড়িয়াখানায় শ্বেত ভালুক

পোষ মানান কাজটা বড় সহজ নয়।—শ্বেত ভালুকদের পোষ মানানো ত খুবই কষ্ট। এই ভালুকগুলো



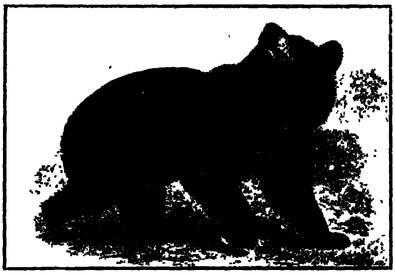
মধুলোভী ভালুক

বোকা আর একগুঁয়ে, এজন্যও পোষ মানাইতে অত্যন্ত বেগ পাইতে হয়।

উত্তর মেরুতে যাঁহারা শ্বেত ভালুক শিকার করিতে যান, তাঁহারা বলেন যে মেরুপ্রদেশের এই শ্বেত ভালুকীদের সন্তানস্নেহ অত্যন্ত প্রবল। ভালুকীর জীবন থাকিতে কোনরূপেই কেহ তাহার সন্তানদিগকে বধ করিতে পারে না।

আমেরিকা এবং মধ্য এশিয়ায় একজাতীয় ভলুক আছে তাহাদের ইংরেজী নাম (The Grisly Bear)। এই জাতীয় ভালুকদের স্বভাব অতি ভীষণ। এই ভালুকদের সামনের থাবাগুলি খুবই বড়। ইহাদের শরীরের তুলনায় কান ছোট। গায়ের বর্ণ পিঙ্গল। কাঁধের দিক্‌কার রোম দীর্ঘ। এই ভালুকেরা হরিণ প্রভৃতি সহজেই শিকার করে। আলাস্কা (Alaska)র ধূসর ভালুকদের চেয়ে এই 'গ্রিস্‌লি' ভালুক আকারে ছোট হয়। গ্রিস্‌লি—বা গ্রিজ্‌লি ভালুকেরা সুযোগ পাইলেই নানাজাতীয় পশু শিকার করে। পশু শিকার করিয়া মাংস খায়। ইহাদের এক একটির ওজন প্রায় ৯০০ হইতে ১০০০ এক হাজার পাউণ্ড পর্য্যন্ত হয়। বিখ্যাত পর্য্যটক স্যার স্যামুয়েল ব্যাকার একবার একটি গ্রিস্‌লি ভালুককে একটা বৃহদাকার বাইসন্ (Bison) কে শিকার করিতে দেখিয়াছেন। এই জাতীয় ভালুকদের প্রধান দোষ এই যে ইহারা একেবারেই মানুষ দেখিতে পারে না। এজন্য ইহাদের শিকার করিতে যত বড় দক্ষ শিকারীই হউক না কেন, তাহাকে বিশেষ বেগ পাইতে হয়। তবে ক্রমাগত মানুষের সংস্পর্শে আসিয়া এবং বর্ত্তমান বন্দুক প্রভৃতি আগ্নেয়াস্ত্রের ভয়ে ইহাদের হিংস্র স্বভাবটা অনেক কমিয়া আসিয়াছে।

আলাস্কাতে আর এক জাতীয় ভালুক আছে ইহাদের এক একটি ভালুক দৈর্ঘ্যে প্রায় ৬½ ফিট হইবে। এই ভালুকদের স্বভাব অনেকটা গ্রিসলি ভালুকের মত। ইহারা গভীর অরণ্য প্রদেশে বাস করে। আলাস্কা প্রদেশে দুই জাতীয় ভালুক দেখা যায়। ইহারা শিকার করিয়া মাংসও যেমন খায় তেমনি ফল, মূল ইত্যাদি ঘাস, পাতা খাইয়াও জীবন ধারণ করে। তিব্বতের নীল ভালুক এবং আমেরিকার কৃষ্ণ ভালুক এক নূতনতর রকমের ভালুক। তিব্ব-



আমেরিকার কৃষ্ণ ভলুক

তীয় ভালুকদের গায়ের রঙ নীলাভ, কিন্তু শরীরে সাদা সাদা রোম থাকে। এই জাতীয় ভালুক সচরাচর কোথাও দেখা যায় না।

আমেরিকার কৃষ্ণ ভল্লুক ও তিব্বতীয় ভালুকের ন্যায় এক বিশেষ জাতীয় ভালুক। এই ভালুকের আকার ছোট। মাথা ক্ষুদ্রাকার। ইহারা কদাচিৎ পাঁচ ফিটের বেশী লম্বা হয়। গায়ের রং দিব্য কালো। পিছনের পা দুইখানি অপেক্ষাকৃত ছোট।

এ সমুদয় ভালুক ছাড়া আরও নানা জাতীয় ছোট বড় ভালুক আছে। ভালুক শিকার করা বড় কঠিন। তোমরা যদি কোন শিকারের বই পড়, তাহা হইলে ভালুক শিকার সম্বন্ধে অনেক গল্প মানুষকেও সহজে তাহারা কোনরূপ উৎপীড়ন করিতে কিংবা আক্রমণ করিতে চাহে না। মানুষ তাহাদিগকে আক্রমণ করে বলিয়াই মানুষকেও তাহারা আক্রমণ করে।

পূর্ণবয়স্ক একটি ভালুকের গায়ে অসাধারণ শক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের সম্মুখের পায়ের একটি থাবা দিয়া ইহারা অনায়াসে একটি হরিণকে মারিয়া ফেলিতে পারে। এবং বহুদূর পর্যন্ত শিকারটিকে বহন করিয়া নিতে পারে।



মদা গ্রিজলী হিংস্র ভালুক

পড়িতে পারিবে। ভালুক শিকার করিতে যাইয়া অনেক সময়েই শিকারীদের ভয়ানক বিপদে পড়িতে হয়।

ভালুকেরা অতি সহজে গাছে চড়ে। কাজেই অনেক সময় গাছে চড়িয়াও শিকারীদের তাড়া করে।

ভালুকেরা মোটামুটি ভাবে বলিতে গেলে বেশ 'ভাল মানুষ'। কেহ যদি তাহাদের বিরক্ত না করে, তাহা হইলে তাহারা নিজের মনে খেলাধুলা করিয়া বেড়ায়, অন্যান্য হিংস্র জন্তুর ন্যায় রক্তপিপাসী নহে।

ভালুকের শরীরের গঠন দেখিয়া অনেকে এইরূপ মনে করেন যে ভালুক বুঝি খুব দ্রুত চলাচল করিতে পারে না, একথা একেবারেই সত্য নহে। ভালুকেরা তাহাদের বিরাট শরীর লইয়া অনায়াসে অত্যন্ত বন-পথ দিয়া অতিদ্রুত চলিয়া যায়। কিন্তু সচরাচর তাহাদের গতি ধীর ও মন্থর।

ভালুকদের অদ্ভুত আকার এবং গতিভঙ্গী দেখিয়া তাহাদিগকে অলস প্রাণী বলিয়া যেন ভুল করিও না। তাহাদের বেশ পরিশ্রম করিয়া খাবার যোগাড় করিতে হয়। ভালুকের গায়ের জোর

অসাধারণ, তাহার বিশাল থাবা, প্রভৃতির সাহায্যে ইহারা অনায়াসেই বড় বড় শিকার করিতে পারে কিন্তু ভালুক তাহা করে না। অনেক সময় দেখা যায় যে একটি ছোট গাছের শিকড় ডাল বা একখানি কাঠ লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে সারাদিন কাটাইয়া দিল। অথচ অদূরেই হয়ত একটা হরিণ চরিয়া বেড়াইতেছে, সেদিকে কোন খেয়ালই নাই। শস্যশ্যামল ক্ষেতের শস্যের দিকে ভালুক মহাশয়দের বেশ একটু সুদৃষ্টি আছে। অনেক সময় ক্ষেত্রের সব ক্ষেত নাশ করিয়া ফেলে।

দলে দলে স্যালমন্ মাছ ধরিবার জন্য বিচরণ করিতে দেখা যায়।

ভালুকদের প্রধান একটা গুণ এই যে ক্ষুধায় একান্ত কাতর না হইলে তাহারা কখনও কোন ছোট বা বড় প্রাণীকে শিকার করিতে যায় না। সময় সময় গৃহপালিত গোরু, ভেড়া প্রভৃতির দিকেও নজর পড়ে। আক্রমণ কালে যদি একবার আক্রমণ ব্যর্থ হয় তাহা হইলে ভালুক তাহার শিকারকে সহজে ছাড়িয়া দেয় না, এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিয়া তাড়া করিতে থাকে। শেষটায় গোরু, ভেড়া প্রভৃতি ক্লান্ত হইয়া পড়ে এবং সহজেই



আলাসকানি ভালুক

মধু খাইবার লোভ ভালুকের বড় বেশী। ইহারা বেশ কৌশল করিয়া মধুর চাক ভাঙ্গিয়া মধু খায়। মৌমাছিরা সহজে তাহাদের কিছুই করিতে পারে না।

আমেরিকার ভালুকদের স্যালমোন্ (salmon) মাছ শিকার করার দিকে বেশ ঝোঁক আছে। জুলাই ও আগষ্ট মাসে ভালুকেরা জলের ধারে বাস করে এবং স্যালমন্ মাছ ধরিয়া খায়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তাহাদের উদর পূর্ত্তি হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহারা পেট ভরিয়া মাছ খায়। ভালুকের এই মাছের লোভ এতবেশী যে ঐ সময়ে ভালুকদের

ভালুকের হাতে প্রাণ হারায়। অন্যান্য জন্তুর ন্যায় ভালুক ও তাহাদের ভুক্তাবশেষ গাছের ডাল বা পাতার আড়ালে লুকাইয়া রাখে। আবার যখন ক্ষুধা পায়, তখন সেই সঞ্চিত খাদ্য সংগ্রহ করিয়া খাইয়া ফেলে।

ভালুক সাধারণতঃ তাহাদের বাসস্থান বদলায় না। একই স্থানে একই জঙ্গলে সচরাচর পরিভ্রমণ করে। আর ঝোপে ঝাড়ের আড়ালে নিরাপদ পর্ব্বত-গুহায় এমন ভাবে তাহারা বিশ্রাম সময়ে লুকাইয়া থাকে যে সহজে তাহাদিগের সন্ধান পাওয়া যায় না।

ভালুকেরা বড় নির্জনতাপ্রিয়। উহারা একাকী থাকিতেই বেশী ভালবাসে। সময় সময় ভালুক-ভালুকী এক সঙ্গে বিচরণ করে, সে সময়ে কোন শত্রু আসিয়া আক্রমণ করিলে এক সঙ্গে তাহার



ভালুক

মুকাবিলা করে। কিন্তু যেমনি শীত ঋতুর আবির্ভাব হয়, তখন প্রত্যেকে স্বতন্ত্র ভাবে নিজ নিজ বাসস্থানে যাইয়া বাস করিতে থাকে। যদি পাহাড়ের গুহা, গাছের কোটর বা কোন স্বাভাবিক গর্ত না পায়, তাহা হইলে নিজেই গর্ত খুঁড়িয়া লইয়া নিদ্রা যায়। কিন্তু এরূপ বাসস্থান ও তাহারা পর্বতের নিভৃত প্রদেশে কিংবা কোনও বৃহৎ বৃক্ষের অন্তরালে নির্দেশ করে, যেন সহজে কাহারও চোখে না পড়ে।

ভালুকী সাধারণতঃ শীতকালে সন্তান প্রসব করে। বাচ্চাগুলি জন্মের পর দেখিতে অতি



ভালুকের দৌড়

বিশ্রী রকমের হয়, না থাকে দাঁত, না থাকে মাথায় রোম, এমন কি চোখও ফোটে না। ওজনে আধ সেরের বেশী হয় না। লম্বাও এক ফুট আন্দাজ হয়। ভালুকী সন্তানের প্রতি অত্যন্ত যত্নবতী হয়। বাচ্চাগুলি তিন চারি মাস বড় না হইলে ভালুকী, ভালুকদের কাছে ঘেঁষিতে দেয় না, কেননা ভালুকের প্রধান দোষ এই যে তাহারা আপনার বাচ্চাদের খাইয়া ফেলিতেও ইতস্ততঃ করে না। ভালুকীর সন্তান শাসন দেখিবার মত, যদি বাচ্চারা তাহার হুকুম না মানে তাহা হইলে সে বাচ্চাদের বেশ একটু কামড় দিয়া, থাবা দিয়া শাসন করে।

আমাদের দিকে হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে ৭,০০০ হইতে ১২,০০০ ফুট উচ্চতে একজাতীয় ভালুক বাস করে, তাহাদের নাম পাণ্ডা বা বিড়াল ভালুক। এই ভালুকের গায়ের রং কতকটা লাল ও বাদামী, লেজ বেশ মোটা। পাণ্ডা ভালুকেরা



হিমালয়ের কৃষ্ণ ভল্লুক

অন্যান্য ভালুকের মত নয়, এরা বেশ দল বাঁধিয়া বিচরণ করে। এই ভালুকেরা উচ্চ পর্বতের উপর বন জঙ্গলের মধ্যে বাস করিতে ভালবাসে। এরা বেশ গাছে চড়িতে পারে এবং গাছে গাছে লুকোচুরি করিয়া বেড়ায়। এরা এমন ভাবে শব্দ করে যে মনে হয় যেন পাখীরা কিচির মিচির করিতেছে। পাণ্ডারা ফল, মূল, ডিম, পোকা মাকড় প্রভৃতি খাইয়া জীবন ধারণ করে। ইহারা দিনের বেলায় ঘুমাইয়া কাটায়, আর রাত্রিবেলা খাদ্যের সন্ধানে ছুটাছুটি করে।



রামানন্দ ও কবীর

২৭৫৬ পৃষ্ঠার পর

আচারী সম্প্রদায়ের চতুর্থ (কারো কারো মতে ৫ম বা ৬ষ্ঠ) গুরু হন রামানন্দ। ১৪০০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি কোনও সময়ে প্রয়াগে দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণ বংশে রামানন্দের জন্ম হয়; তাঁর পিতৃদত্ত নাম ছিল রামদত্ত: গুরুদত্ত নাম রামানন্দ।

গুরু রামানন্দ তাঁর শিষ্যদের নাম রেখেছিলেন "অবধূত" অর্থাৎ সংস্কারমুক্ত। গুরু রামানন্দ বাস্তবিক গুরু নামের যোগ্য; তিনি সত্যদ্রষ্টা পতিত-পাবন ছিলেন এবং গুরু রামানন্দের নীচজাতীয় শিষ্যগণ স্ব স্ব জ্ঞান, ভক্তি ও চরিত্রের দ্বারা ভারত-বর্ষকে পবিত্র ক'রে রেখেছেন। গুরু রামানন্দ এইরূপে ভারতে জাতীয় একতার মূল ভিত্তি স্থাপন ক'রে গেছেন।

রামানন্দের শিষ্যদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত হয়েছিলেন কবীর। কবীরের জন্মসম্বন্ধে নানা কিংবদন্তী আছে। তন্মধ্যে বহুপ্রচলিত জনশ্রুতি এই—কবীর কাশীর এক বিধবা ব্রাহ্মণকন্যার পুত্র। ব্রাহ্মণকন্যা আপনার কলঙ্কচিহ্ন সদ্যজাত পুত্রকে কাশীর লহর তালাব নামক পুষ্করিণীতে একটি পদ্মপাতায় শুইয়ে ভাসিয়ে দেন। প্রভাতে নিমা নাম্নী একটি জোলা-জাতীয়া স্ত্রীলোক ও তাঁর স্বামী নিরু না নুর আলী ঐ স্থান দিয়ে বিবাহের নিমন্ত্রণে যাচ্ছিলেন। নিমা তৃষ্ণার্ত্ত হ'য়ে ঐ সরোবরে জল পান করতে গিয়ে দেখ্‌লেন কমলপত্রে কোন্ কলঙ্কিনীর লজ্জা ও স্নেহ-বেদনার ধন সদ্যজাত শিশু ভাস্‌ছে। শিশুর "সুন্দর সুরত মোহন মুরত কমল-নৈন" (সুন্দর শ্রী মোহন মূর্ত্তি ও কমল-নয়ন) দেখে মুগ্ধ ও স্নেহার্দ্র হ'য়ে নিঃসন্তান নিমা ঐ শিশুকে তুলে নিয়ে স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

১৪৫৫ সংবতে (১৯৮৩ খৃঃ অব্দে) জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের সোমবারে পূর্ণিমা তিথি বর্ষাকালে প্রকট হয়েছিল, তখন মেঘ ডাক্‌ছিল, বিদ্যুৎ চম্‌কাচ্ছিল, বৃষ্টি পড়্‌ছিল, ঝড় হচ্ছিল। এমন সময়ে লহর-পুষ্করিণীর জলে প্রফুল্ল কমলের মধ্যে কবীর-ভানু প্রকাশিত হয়েছিলেন।

লৈহর তালাব-মে কমল খিলে
তাঁহা কবীর-ভান প্রকাশ ভয়ে॥

জোলা-দম্পতী শিশুকে গৃহে এনে নিজেদের পুত্রবৎ পালন করতে লাগ্‌লেন। তাঁরা শিশুর নামকরণের জন্য একজন কাজীকে ডেকে আন্‌লেন।

কাজী এসে কোর্-আন্ শরীফ খুলতেই তাঁর দৃষ্টি পড়ল কবীর শব্দের উপর। শিশু সেই নামেই পরিচিত হলেন।

কবীর আরবী শব্দ ; তার অর্থ মহান্, বৃহৎ বা ব্রহ্ম, পরমেশ্বর।

কাশী হিন্দুপ্রধান স্থান। কবীরের পালক পিতা নিরু সেখের প্রতিবাসী প্রায় সকলেই ছিল হিন্দু। বালক কবীর হিন্দু বালকদের সঙ্গেই খেলা করতেন। তাঁর খেলা ছিল ভগবৎ পূজন ও ভগবানের নাম কীর্ত্তন। হিন্দু বালকদের সংসর্গে তিনি ভগবানের ভারতবর্ষীয় ভাষার নামই কীর্ত্তন করতেন।

কবীর জাতে জোলা ব'লে লোকে তাঁকে উপহাস করত। তার উত্তরে কবীর বলেছিলেন—

কবীর তেরে জাত্‌কো সব-কোই হাসনহার।
বলিহারী ওয়া জাত্‌কো জো সিজয়ে সৃজনহার॥

ওরে কবীর, তোর জাতের জন্যে সবাই তোকে উপহাস করে। বলিহারী ঐ জাতের যে সৃষ্টি-কর্ত্তাকে স্মরণ করে। কারণ ভগবান একজন মহাতাঁতী—

ধরণী আকাশ-কী কারগাহ্ বানায়ী।
চন্দ্র সুরজ দুই নাল চালায়ী॥

ধরণী ও আকাশকে কারখানা বানিয়ে তিনি চন্দ্র সূর্য্য দুই মাকু হরদম চালাচ্ছেন।

কবীর প্রত্যহ একখানি মাত্র বস্ত্র বয়ন করতেন। এবং সেই বস্ত্র বিক্রয় ক'রে যা পেতেন তা থেকে নিজেদের গ্রাসাচ্ছাদনের উপযুক্ত অর্থ রেখে বাকী অর্থ দরিদ্র-সেবায় দান করতেন।

কবীর সহজ ভক্তি ও নির্ম্মুক্ত জ্ঞান লাভ করলেও একজন সংগুরু লাভের জন্য ব্যাকুল হলেন।

ব্রাহ্মণ রামানন্দ স্বচ্ছন্দে মুসলমানকে শিষ্য বলে স্বীকার করেছিলেন একথা মেনে নিতে ছুঁৎমার্গী জাতওয়ালাদের মনে লাগে। তাই তারা গল্প রচনা করেছে যে রামানন্দ কবীরকে মন্ত্রদীক্ষা দিতে অস্বীকার করেন। কবীর অগত্যা গভীর রাত্রে রামানন্দের বাড়ীর দরজায় গিয়ে শুয়ে রইলেন: প্রত্যূষে রামানন্দ গঙ্গাস্নানে যাবার জন্য বাহিরে পা দিতে গিয়ে কবীরের গায়ে পদার্পণ করেন। অজ্ঞাতসারে একজন লোকের গায়ে পা দিয়ে সঙ্কোচে রামানন্দ ব'লে ওঠেন "রাম রাম।" এই গাত্রস্পর্শপূর্ব্বক রাম-নাম উচ্চারণকেই কবীর রামানন্দের মন্ত্রদীক্ষা বলে মেনে নিয়েছিলেন।

কবীর ভগবানকে রাম (আনন্দময), প্রভু, সাঁই (স্বামী), আল্লা, খোদা (স্বধা বা আত্ম-প্রতিষ্ঠ), পুরাসাহেব (অর্থাৎ পূর্ণ ব্রহ্ম), অনগঢ়িয়া দেবা (অগঠিত বা স্বয়ম্ভূ দেবতা) প্রভৃতি নামে উল্লেখ করেছেন। যিনি নামরূপের অতীত, সকল নাম-রূপ তাঁরই ; এ-কথা কবীর বুঝেছিলেন।

তাই কবীর বারংবার বলেছেন—

অলখ ইলাহী এক হ্যায়, নাম ধরায়া দোয়।
রাম রহিমা এক হ্যায়, নাম ধরায়া দোয়।
কৃষ্ণ করীমা এক হ্যায়, নাম ধরায়া দোয়।
কাশী কাবা এক হ্যায়, একৈ রাম রহিম।
ময়দা এক,-পকবান বহু, বৈঠি কবীরা জীম॥

অলখ ইলাহী, রাম রহিম, কৃষ্ণ করিম, কাশী কাবা সব এক,—একেরই দুই নাম। যেমন ময়দা এক, কিন্তু ময়দা দিয়ে বহু পক্বান্ন প্রস্তুত করা হয়, তেমনি। এই কথা জেনে কবীর স্থির হয়ে বসেছেন।

যো খোদায় মস্‌জিদমে বসত্ হ্যায়
আউর মুলুক কেহি কেরা ?
তীরথ মূরত রাম-নিবাসী
বাহর করে কো হেরা ?

যদি খোদা কেবল মস্‌জিদেই বাস করেন, তবে অন্য দেশগুলো কার ? তীর্থের মধ্যে ও মূর্ত্তির মধ্যেই কেবল আনন্দময় বাস করেন ? তবে বাহিরটাকে দেখে কে ?

কবীর লেখাপড়া জানতেন না ; কিন্তু তিনি সহজ জ্ঞানের ও মুক্ত বুদ্ধির বলে গভীর তত্ত্ব শাশ্বত সত্য ও মধুর কবিত্ব প্রকাশ ক'রে গেছেন।

কবীরের সময়ে হিন্দু মুসলমান পরস্পর প্রতি-বেশী হওয়াতে পরস্পরের ধর্ম্মমতের প্রভাব পরস্পরের উপর পড়ছিল। কিন্তু মুসলমান তখন দেশের রাজা, তাঁদের ধর্ম্মবিশ্বাসের ও গোঁড়ামির জোর রাজশক্তির সাহায্যে অত্যন্ত প্রবল। কাজেই আত্মরক্ষার জন্য ব্রাহ্মণগণ আপনাদের আচার ও সামাজিক বিধি দৃঢ়তর নিয়মে বদ্ধ করতে চেষ্টা করছিলেন। এই অতি কঠোর নিয়মের গণ্ডীতে

সমাজের প্রাণ হাঁপিয়ে উঠ্ছিল। এই সময় রামানন্দ ও তাঁর শিষ্যগণ ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত ক'রে সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয় কর্‌বার মহৎ চেষ্টায় ছিলেন।

কবীরের প্রভাব তাঁর সমসাময়িক ও পরবর্ত্তী বহু সাধু ভক্তের জীবনের উপর পড়েছে দেখা যায়। আহমদাবাদের দাদূ সাহেব কবীরের ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে এক কবীর-পন্থার শিষ্য হয়েছিলেন। কাশী-নিবাসী তুলসীদাসের উপরও তাঁর প্রভাব পড়েছিল, কিন্তু তুলসীদাস অধিক হিন্দুভাবাপন্ন ছিলেন। কবীরের মিত্র ছিলেন ভক্তসাধু রহিদাস চামার। বৃন্দাবনবাসিনী মীরাবাঈ কবীরের ভক্তির কথা শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন। গুরু নানক দেশ পর্য্যটনে বাহির হ'য়ে কাশীতে এসে কবীরের অমৃতময়ী বাণী শ্রবণ করেন। শিখদের গ্রন্থসাহেব কবীরের বাণীতে পূর্ণ। গুরু নানকের প্রচারিত শিখধর্ম্মকে কবীরের প্রচারিত ধর্ম্মের ছায়া ও শাখা বলা যেতে পারে। ঐ দুই মহাপুরুষের উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু ও মুসলমানের ধর্ম্মসমন্বয় ও উভয়কে একই ভূমিকায় মিলিত করা এবং একেশ্বরবাদ ও সর্ব্বমানবের একজাতিত্ব প্রচার করা। অযোধ্যার জগজ্জীবন দাস কবীরের ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে সৎনামী সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন। মালব দেশের বাবালাল বাবালালী সম্প্রদায়, বীরভান সাধু সম্প্রদায়, গাজীপুরের শিবনারায়ণ, শিবনারায়ণী সম্প্রদায়, আলোয়ারের চরণদাস চরণদাসী সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা ক'রে কবীরের উদ্দেশ্য অনেক পরিমাণে সিদ্ধ ক'রে গেছেন। এঁদের সকলের উপদেশের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান-ধর্ম্মের সমন্বয় হয়েছে দেখা যায়। এই সব-সাধু মহাত্মাদের চেষ্টাতে উত্তর ভারতের হিন্দু-মুসলমানের গোঁড়ামী ও অন্ধ কুসংস্কার যে কত কমেছে তা' দাক্ষিণাত্যের হিন্দুদের সঙ্গে তুলনা কর্‌লে বুঝ্‌তে পারা যায়।

মনকে নির্ম্মল পবিত্র ঈশ্বরপরায়ণ না ক'রে কেবল বাহ্য অনুষ্ঠান পালনকে কবীর নিন্দা করেছেন।

ব্রাহ্মণ ভয়া তো ক্যা ভয়া, গলে লপটে সুত।
ভক্তি ভাবকা মরম ন জানে য্যায়সা জঙ্গলী ভূত।

ব্রাহ্মণ হলো তো কি হলো, কেবল গলায় সুতাই লেপ্‌টাল ; ভক্তি-ভাবের মর্ম্ম সে জানে না, এমনি সে জঙ্গলী ভূত।

তীরথ-মে তো সব পানী হৈ
হোবৈ নহী কছু হ্বায় দেখা।
প্রতিমা সকল তো জড় হৈ,
বোলে নাহি বোলায় দেখা।

তীর্থ তো কেবল জল, আমি স্নান ক'রে দেখেছি তাতে কোনও ফল হয় না। প্রতিমা-সকল তো জড় মাত্র, ডেকে দেখেছি সাড়া দেয় না।

পুরান কোরান সব বাত হৈ,
যা ঘটকা পরদা খোল দেখা।
অনুভব কী বাত কবীর কহৈঁ
যহ সব হৈ ঝুঠা পোল দেখা॥

পুরান কোরান সব তো কেবল মাত্র কথা, তাদের পর্‌দা খুলে আমি তাদের আসল রূপটি দেখে নিয়েছি। কবীর কেবল অনুভব করার কথা বল্‌ছেন আর সব মিথ্যে ভুল, তা তো অনুসন্ধান ক'রে দেখা গেছে।

মুসলমানেরা কবীরের ব্যঙ্গবিদ্রূপে বিরত ও ক্রুদ্ধ হয়ে রাজার কাছে নালিশ কর্‌লে। তখন দিল্লীর সমাট্ ছিলেন সিকন্দর শা লোদী (১৪৮৮-১৫১৭)। ১৪৯৫ সালে সিকন্দর শা কবীরকে গেরেপ্তার করিয়ে জৌনপুরে দর্‌বারে হাজির কর্‌লেন। কবীর সেখানে উপস্থিত হলেন, কিন্তু রাজাকে সেলাম কর্‌লেন না। তোষামোদকারী সভাসদেরা বল্‌লে—আরে কাফের, রাজা শ্রেষ্ঠ পীর, তাঁকে সেলাম কর্‌ছ না কেন?

তখন কবীর বল্‌লেন—

কবীর তেই পীর হ্যায়, যে জানে পর-পীর।
যে পর-পীর ন জান হী, তে কাফের নো পীর॥

হে কবীর, তিনিই পীর যিনি পরের পীড়া বা বেদনা অনুভব করেন। যে ব্যথিত-বেদন অনুভব কর্‌তে পারে না সে ব্যক্তি কাফের, পীর নহে।

তখন বাদ্‌শাহ্ কবীরকে প্রশ্ন কর্‌লেন—তুমি হিন্দু না মুসলমান? কবীর উত্তর দিলেন—

হিন্দু কহুঁ তো ম্যায় নঁহী, মুসলমান ভী নাহি।
পাঁচ তত্ত্বকা পুতলী গৈবী খেলে মাহি॥

আমি হিন্দুও নই, মুসলমানও নই। পঞ্চভূতাত্মক

পুত্তলিকা আমার মধ্যে অদৃশ্য রহস্যের খেলা খেলে চলেছে।

হিন্দু ধ্যাবৈ দেহরা, মুসলমান হুঁ মসীত।
দাস কবীর তহাঁ ধ্যাবহী জহাঁ দোনকী পরতীত॥

হিন্দু মন্দিরে ঈশ্বরের ধ্যান করে, মুসলমান মস্‌জিদে। দাস কবীর সেইখানে ধ্যান করে যেখানে দুইজনেরই প্রতীতি।

সিকন্দর লোদী শিক্ষিত বুদ্ধিমান্ লোক ছিলেন, তিনি কবীরকে সসম্মানে বিদায় দিলেন

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে গৃহস্থের লক্ষণ দেওয়া হয়েছে—

ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ।
যদ্ যদ্ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তৎ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ॥

কবীর এই লক্ষণান্বিত গৃহস্থ সন্ন্যাসী ছিলেন।

কবীরের স্ত্রীর নাম ছিল লোঈ, তিনি ছিলেন বনখণ্ডী বৈরাগীর পালিতা কন্যা। তাঁদের এক পুত্র ও এক কন্যা ছিলেন।

কবীর হাটে কাপড় বেচে বাড়ী আসছিলেন। সন্ন্যাসী কবীরের ছেলে হয়েছে শুনে তাঁর প্রতি বিরক্ত ব্রাহ্মণ মোল্লা সবাই মিলে হাটের পথে এগিয়ে গিয়ে বিদ্রূপ ক'রে কবীরকে বললে—কবীর তোমার ছেলে হয়েছে। তারা ভেবেছিল এই সংবাদে কবীর লজ্জা পাবেন। কিন্তু ক্ষণকাল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে কবীর প্রসন্নমুখে এই সুন্দর বাণী উচ্চারণ করলেন—

অনহদ মুসাফির পহুনা আয়া ধরো মঙ্গল-থার।
ঘর-আংগন-কী কদর ভঈ হৈ বাহ্ বৈর গুলজার॥

অসীম পথের পথিক অতিথি হয়ে এসেছেন, মঙ্গল-থালা ধ'রে তাঁকে বরণ করি। আজ আমার ঘর ও অঙ্গনের আদর বাড়্‌ল, আজ পথ হলো ফুলের বাগানের মতন উজ্জ্বল শোভাময়।

জনম-মরণ-মেঁ কদম তুম্হারা অবস ভয়া হৈ কাল।
মেরা ঘর-মেঁ ডেরা লগায়া পায়া হৈ হম্ কমাল॥

হে অসীমের মহাযাত্রী আমার পুত্র, জন্ম-মরণে ক্রমান্বয়ে তোমার দুই পদক্ষেপ চলেছে, মহাকাল অবশ হয়ে ক্ষণকালের জন্য তোমাকে স্থির করেছেন। তুমি আমার ঘরে ক্ষণিকের আশ্রয় নিয়েছ। আমি কমাল বা পরিপূর্ণতাকে পেয়েছি।

কমাল পিতার সাধনার ধারা নিজের সাধুজীবনে বহন ক'রে অগ্রসর ক'রে দিয়ে গেছেন। এখন কবীরপন্থীদের সংখ্যা ৩৫০ হাজারের কম নয়।

কমালের পর কবীরের একটি কন্যা জন্মে। কবীর তাঁর নাম রাখেন কমালী।

কমালী একদিন কূপ থেকে জল আন্‌তে গিয়েছিলেন। এক ব্রাহ্মণের জলের কলসীতে কমালীর হাতের জলের ছিটা লাগে। ব্রাহ্মণের কলসী ছুৎ হয়ে যায় এবং ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণ এসে কবীরের কাছে নালিশ করে। কবীর সেই ব্রাহ্মণকে উপদেশ দিলেন—

পণ্ডিত তুম বুঝ পিয় পানী।
তোহে ছুৎ কহাঁ লপটানী?
জা মাটীকে ঘরমে বৈঠে তামে সৃষ্টি সমানী॥

হে পণ্ডিত, তুমি বুঝে সুঝে জল খেও। এই জলে কোথা হ'তে ছুৎ লাগ্‌ল? যে মাটীর ঘরে তুমি বাস করো সেই মাটীর সঙ্গে সকল পৃথিবীর মাটীর তো সংযোগ রয়েছে।

এইরূপে পণ্ডিত ও মোল্লা উভয়কে তিরস্কার ক'রে তিনি সকলকে দেশকালাতীত সত্য সনাতন ধর্ম্ম শিক্ষা দেবার চেষ্টা করেছিলেন এবং দেশের সকল লোককে দেশকালের সংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন নির্ম্মল বুদ্ধিতে সব কিছুকে বিচার করে দেখ্‌তে বলেছিলেন।

হিন্দু কহত হৈ রাম হমারা, মুসলমান রহিমানা।
আপস-মেঁ দোউ লড়ে মরত হৈ, মরম কোই নাই জানা॥

হিন্দু বলে আমার রাম, মুসলমান বলে আমার রহিম; পরস্পর দুজনে লড়াই করে মর্‌ছে, কিন্তু ধর্ম্মের আসল মর্ম্ম কেউ বুঝল না।

কবীর প্রাণের জ্বালা জুড়াবার মতন লোকের সন্ধানে তিব্বত, আফগানিস্থান, তুর্কিস্থান, খোরাসান, বাল্‌খ, বুখারা, ইরাণ বহু দূর দূরান্তর দেশ পর্য্যটন করেন। অবশেষে গোরখপুরের নিকটে হিমালয়ের পাদমূলে মগহর গ্রামে গিয়ে উপনীত হন এবং সেখানেই নির্জ্জনবাসে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত কর্‌বার সঙ্কল্প করেন।

কাশীতে মর্‌লে শিব হয় ব'লে লোকের যেমন ধারণা, তেমনি অন্ধবিশ্বাস আছে যে ব্যাসকাশী ও মগহরে মানুষ মর্‌লে পর-জন্মে গাধা হয়। তাই কবীর কাশী ত্যাগ ক'রে মগহরে বাস কর্‌বেন

স্থির করলে তাঁর শত্রুরা যেমন খুশী হয়েছিল ভক্ত শিষ্যগণ তেমনি দুঃখিত হয়েছিল।

কবীর ভক্তদের এই ব'লে বোঝালেন যে—হাম্ মুফ্ত্ মুক্তি নেহি লেঙ্গে—আমি বিনামূল্যে মুক্তি নেব না। ভগবানের সাধন ভজন না ক'রে কেবল কাশীতে দেহত্যাগ ক'রে স্থানমাহাত্ম্যে মুক্তিলাভ আমি চাই না। যদি ভগবদ্‌ভক্তি থাকে তবে সেই মূল্য দিয়ে আমি মগহর থেকেই মুক্তি আদায় করে নেবো।

মগহরে কিছুদিন বাস করার পর কবীরের দেহ অপটু হয়ে এল। তখন তিনি বুঝলেন যে, তাঁর দেহের বিনাশ আসন্ন হয়ে এসেছে।

কবীর অমনি নদীর তীরে পদ্মশয্যায় শুয়ে শেষ গান গাইলেন—

গাউ গাউরী দুলহনী মঙ্গলচারা।
মেরে গৃহে আয়ে রাজা রাম ভতারা॥

হে কল্যাণীরা সখীগণ, তোমারা আমার বিবাহের মঙ্গলাচার গান কর। আমার ভর্তা রাজা রাম আমার গৃহে এসেছেন।

কবীর নিজের শরীর বস্ত্রাচ্ছাদিত ক'রে বিদেহ হয়ে গেলেন। তারপর সেই দেহের সংকার নিয়ে হিন্দু-মুসলমানে বিবাদ লাগল—হিন্দুরা বলে কবীর ছিলেন হিন্দু, তাঁর দেহ দাহ করতে হবে; মুসলমানেরা বলে কবীর ছিলেন মুসলমান, তাঁর দেহ সমাধিস্থ করতে হবে। কিংবদন্তী আছে যে, বস্ত্রাচ্ছাদন অপসারণ ক'রে দেখা গেল কবীরের দেহ অন্তর্ধান করেছে, কেবল কতকগুলি ফুল প'ড়ে আছে। সেই ফুল ভাগ ক'রে নিয়ে কতকগুলি ফুল হিন্দুগণ কাশীতে নিয়ে গিয়ে দাহ করে এবং বর্তমান কবীর-চৌরা নামক স্থানে সেই ভস্ম সমাধিস্থ করে, এবং অর্দ্ধেক ফুল মুসলমানেরা নিয়ে সেই মগহরে কবর দিয়ে রাখে। সেইজন্য কাশীর কবীর-চৌরা ও মগহর উভয় স্থানই কবীরপন্থীদের তীর্থ হয়ে আছে।

ঐতিহাসিকদের মতে কবীরের জন্ম ১৪৪০ খৃষ্টাব্দে, এবং তাঁর মৃত্যু ১৫১৮ খৃষ্টাব্দে। কবীর জন্মান্তর বিশ্বাস করতেন। তিনি জন্মমৃত্যুকে বলেছেন ঝুলন বা দোলা আর মৃত্যুকে বলেছেন প্রিয় পতির সহিত মিলনের জন্য যাত্রা এবং জীবন হচ্ছে বিরহের অবস্থা। ..

ঈশ্বরের সহিত ভক্তের যোগকে কবীর পতির সহিত সতীর মিলনের সঙ্গে তুলনা করেছেন। সে মিলন শুধু দুজনের; প্রগাঢ় মিলনের আনন্দ অপরকে লিখে ব'লে বুঝান যায় না, এবং সেই আনন্দ-মিলনের কালে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বাইরে প'ড়ে থাকে।

লিখালিখীকী বাত নাহি হৈ, দেখা-দেখিকী বাত।
দুলহা দুলহিন মিলি গয়ে, ফিকি পরী বরাত॥

লেখালেখির কথা নয়, কেবলমাত্র অনুভবগম্য ঐ মিলন—বর আর বধূ মিলে গেল, আর সব-যাত্রীরা সব নগণ্য হয়ে পড়ল।

কবীরের জন্ম-মৃত্যুর ঝুলন কবিতাটি অতি চমৎকার সুন্দর, কিন্তু দীর্ঘ। মূল কবিতাটি শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের "কবীর" নামক অতি উপাদেয় গ্রন্থে পাওয়া যাবে, এবং তার সমগ্র অনুবাদ পাওয়া যাবে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের "মণি-মঞ্জুষা" নামক গ্রন্থে, আমি তারই কয়েকটি কলি এখানে উদ্ধৃত করি—

গ্রহ চন্দ্র তপন জোত বরত হৈ
সুরত রাগ নিরত তার বাজৈ।
নৌবতিয়া ঘুরত হৈ রৈন দিন সুন্নমে
কহৈ কবীর পিউ গগন গাজৈ।
সূর্য্য গ্রহ চন্দ্র তারা রশ্মিধারা বর্ষিছে,
গাহিছে গৃহী প্রেমের সুর, বাজায় তাল বৈরাগী,
শূন্যতলে ধ্বনিছে সদা ঐক্যতান নৌবতে,
কবীর কহে বন্ধু মম গগনে সদা রয় জাগি।

কবীরের কাছে জীবন হচ্ছে মৃত্যুর সাধনা—যাকে Plato বলেছেন—a practice of dying। ভগবানের স্বরূপ সম্বন্ধে কবীরের একটি অমৃতময়ী বাণী উদ্ধৃত ক'রে কবীর পরিচয় শেষ করি—

ঐসা লো নহি তৈসা লো,
মৈঁ কেহি বিধি কহৌঁ গম্ভীরা লো।
ভিতর কহুঁ তো জগময় লাজৈ
বাহর কহুঁ তো ঝুটা লো॥

তিনি এমনও নন তিনি তেমনও নন; কেমন ক'রে আমি সেই গভীর কথা বলবো গো? যদি বলি তিনি অন্তরে আছেন, তবে বিশ্বজগৎ লজ্জা পায়; যদি বলি তিনি বাহিরে তবে যে সে কথাও মিথ্যা হয়।



সিংহল

২৭৯৮ পৃষ্ঠার পর

সিংহলের প্রাচীন রাজধানী—অনুরাধপুর সিংহলের একটি প্রাচীন কীর্ত্তিপূর্ণ স্থান। এখানকার অন্যান্য বিষয়ের পরিচয়ের মধ্যে বৌদ্ধ কীর্ত্তির পরিচয় হইতেছে প্রধান। এখানে যে সমুদয় বৌদ্ধবিহার আছে, তাহারা সাধারণতঃ বুদ্ধালয়, চৈত্য, সঙ্ঘাবাস, ধর্ম্মশালা এবং বোধিদ্রুম এই পাঁচটি ভাগে বিভক্ত। সিংহলী ভাষায় বিহার 'বুধুগে' বা বুদ্ধগৃহ নামে পরিচিত। এই সমুদয় 'বুধুগে' গুলির মধ্যে বুদ্ধদেবের নানা আকারের মূর্ত্তি সংস্থাপিত আছে। অনেক মন্দিরে আবার বুদ্ধদেবের শায়িত প্রকাণ্ড মূর্ত্তি দেখা যায়। প্রাচীর গাত্রে সিদ্ধার্থের জীবন-কাহিনী চিত্রে লিখিত রহিয়াছে। 'বুধুগের' পরে চৈত্য। এমন কোন বিহার নাই, যেখানে চৈত্য না আছে। চৈত্যগুলি এক একটি বিরাট ইষ্টকস্তূপ। এইগুলি ইট ও চুন সুরকিতে গঠিত। দাগোবা অর্থে—চৈত্যস্তূপ। দতু শব্দের অর্থ স্মৃতি চিহ্ন, গর্ভম্ শব্দের অর্থ মন্দির। এই দাগোবাগুলি দেখিতে অনেকটা ঘণ্টার মতন। এইগুলির অভ্যন্তরে পূর্ব্বে ছোট একটি পাত্রে নানা মণিমুক্তার সহিত বুদ্ধদেবের চিতাভস্ম রক্ষিত হইত। আবার অনেকগুলি বুদ্ধদেবের স্মৃতি উদ্দেশ্যে গঠিত হইয়াছে। কোথাও ফাঁক দেখিতে পাওয়া যায় না। একেবারে সম্পূর্ণ নিরেট গাঁথা। এ সকল চৈত্যের মধ্যে বুদ্ধদেবের শরীরের কোন কোন অংশ বা ধাতু রক্ষিত আছে বলিয়া এইগুলির অন্য নাম ধাতুগর্ভ—সিংহলী ভাষায় ইহাদিগকে বলে ডাগোবা বা দাগোবা।

অনুরাধপুরে অনেক বিরাটাকার দাগোবা ছিল। আজ সে সমুদয় বিরাট দাগোবার ইষ্টকস্তূপগুলি শুধু পড়িয়া আছে। যাত্রিগণ পুণ্য লাভার্থে এই দাগোবা প্রদক্ষিণ করিয়া থাকেন। তারপরই হইতেছে সঙ্ঘাবাস। সঙ্ঘাবাসে বিহারের ভিক্ষুকেরা বাস করেন। সিংহলীরা সঙ্ঘাবাসকে বলেন—'পানশালা', বোধ হয় সংস্কৃত পর্ণশালা শব্দের অপভ্রংশ হইবে। ইহার পর ধর্ম্মশালা। ধর্ম্মশালা মণ্ডপের আকারে তৈরী। চারিদিক খোলা। এখানে ধর্ম্মোৎসব হয়। বিহারের পঞ্চম বস্তু হইতেছে বোধিদ্রুম। ইহা অত্যন্ত পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হয়। শাক্যসিংহ এই বৃক্ষের নীচে বুদ্ধত্ব বা দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম বোধিদ্রুম হইয়াছে। অনুরাধপুরের যে বোধিদ্রুমটির চিত্র দেওয়া হইল, কথিত আছে একটি অত্যন্ত প্রাচীন এবং ভারতের সেই আদি

বোধিদ্রুমের শাখা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সেই শাখা হইতে যে বোধিতরু উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা এখানে বৃহদাকার ধারণ করিয়া শাখা-পল্লবে বিস্তৃত হইয়াছে। সেই বোধিতরু দেখিবার জন্য এখানে প্রতি বৎসর বহু যাত্রী সমাগম হইয়া থাকে। অনুরাধপুরে প্রাচীন সিংহলের অনেক কিছু কীর্ত্তি ও ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে অনেক প্রস্তর নির্ম্মিত মন্দির, প্রাসাদ স্তম্ভ, অলিন্দ, খোদিত মূর্ত্তি রহিয়াছে। সিংহলে অনেক দাগোবা (Dagoba) বা ইষ্টক নির্ম্মিত বৃত্তাকার স্তূপ দেখা স্থানে এক সময়ে একটি সুপবিত্র মন্দির ছিল। সহস্র সহস্র ভক্ত তাহাদের ধর্ম্মসংস্থাপকের গৌরব এই পর্ব্বতের পাষাণময় অঙ্কে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য কঠোর পরিশ্রমে তাহা নির্ম্মাণ করিয়াছিল। এই পর্ব্বতের পদতলে কতকগুলি প্রস্তরময় হস্তীদ্বারা পরিবেষ্টিত। তাহার নিকটে যে কত দেবমূর্ত্তি ছিল, তাহা সংখ্যা হয় না; কিন্তু সেগুলি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া কালের কুক্ষিগত হইয়াছে। তথাপি অতীতকালে দিনের পর দিন কত সঙ্গীত-ধ্বনি উত্থিত হইয়াছে; কত ভক্তের কণ্ঠনাদে



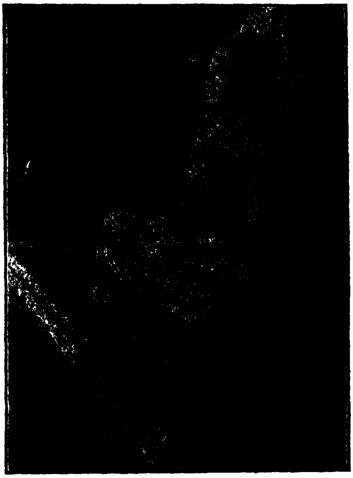
অনুরাধপুরের বোধিদ্রুম

যায়। এইরূপ মন্দির সিংহলের প্রায় সর্ব্বত্রই আছে। ফরাসী পর্য্যটক পীয়েরলোটি তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে অনুরাধপুরের একটি অতি সুন্দর বর্ণনা করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন ;—অনুরাধপুর, দুই হাজার বৎসর আগে যেখানে শিল্প ও ধর্ম্ম আপনাদের অভ্রভেদী কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছিল ত্যাগ ও বিশ্বাসের পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া যাহা সমগ্র প্রাচ্য ভূখণ্ডের শ্রদ্ধা ও সম্মান আকর্ষণ করিয়াছিল, এখন তাহা অতীত গৌরবের সমাধিক্ষেত্র। যে পাহাড়ের উপর আমি এখন দণ্ডায়মান আছি, এই গগনমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইয়াছে, কল্পনানেত্রে দেখিলাম অনুরাধপুরের অসংখ্য মন্দির ও প্রাসাদ-শিখরের সুবর্ণকলস সৌরকরে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, পথে ধনুর্ব্বাণধারী সৈন্যশ্রেণী, হস্তিযূথ, অশ্বরাজি, রথসমূহ ও সহস্র সহস্র লোক প্রতিনিয়তই যাতায়াত করিতেছে। কত ঐন্দ্রজালিক, কত নর্ত্তক ও গায়ক একদিন এই সুন্দর নগরী তাহাদের গীতে, বাদ্যে ও বংশীরবে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু এখন সেখানে নিরবচ্ছিন্ন নীরবতা করিতেছে। চারিদিকে অন্ধকার। চারিদিকে বিজনতা।

১T।

এই সমুদয় প্রাচীন স্থান দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে সিংহলের উপর ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম কত বড় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এখানকার সভ্যতার উপর বৌদ্ধধর্মের প্রভাব সুপরিস্ফুট। সিংহলের স্থাপত্য, সিংহলের ভাস্কর্য্য, সিংহলের স্তূপ, সিংহলের চিত্র সকলের উপরই ভারতীয় প্রভাব বিদ্যমান।

এখানকার অন্যান্য বিহারে অনুরাধপুরের বোধিদ্রুম হইতে শাখা আনিয়া রোপিত হইয়াছে। সিংহলীরা অশ্বত্থগাছ মাত্রকেই অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত দেখিয়া থাকে। এ সকল ছাড়া প্রত্যেক বিহারের



অনুরাধপুরের একটি ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তি

ঘণ্টাস্তম্ভ আছে। দিবারাত্র অনেক সময়েই বিহারে এ সমুদয় ঘণ্টাধ্বনি হয় এবং তাহাতে শ্রমণগণের কার্য্য ইত্যাদির পরিচয় পাওয়া যায়।

রাজা পাণ্ডবাস কৃষিকার্য্যের জন্য তাঁহার রাজধানী অনুরাধপুরে একটি প্রকাণ্ড দীঘি খনন করিয়াছিলেন। তাঁহার পরবর্ত্তী রাজারা এইরূপ আরও অনেক দীঘি খনন করেন। সেই সকল দীঘি ও সরোবরের চিহ্ন এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে কতক বা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

বৌদ্ধধর্ম্ম সিংহলের জাতীয়ধর্ম্ম। এ দেশের অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা বাষট্টি জনই হইতেছে তথাগতের ধর্ম্মাবলম্বী। এ দেশের লোকেরা বিশ্বাস করে যে বুদ্ধদেব কয়েকবার সিংহলেও আসিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্ম ক্ষীণপ্রভ, আর এখানে বৌদ্ধধর্ম্ম জীবিত। 'ধর্ম্ম দেশ না' প্রভৃতি অনুষ্ঠানে সর্ব্বত্র 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি' শুনিতে পাওয়া যায়।

সিংহলের প্রাচীন কীর্ত্তি দেখিতে হইলে অনুরাধপুর দেখিতে হইবে।

পূর্ব্বে কান্দীর কথা বলিয়াছি। কান্দীর দালাদা মালিগাওয়া বা দন্ত বিহারের স্তম্ভের সারি এবং চিত্রাবলি দেখিবার মত বটে। শিল্পাচার্য্যেরা মনে করেন যে—এই সমুদয় চিত্র তৃতীয় শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত অঙ্কিত আছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে।—এইরূপ চিত্রের একটা কারণ আছে, সিংহলের রাজারা বিহারের ও মন্দিরের গায়ে চিত্র অঙ্কিত করা একটা ধর্ম্মের লক্ষণ মনে করিতেন।—সিংহলের বৌদ্ধ বিহারের চিত্রের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এইরূপ। সিংহলের চিত্র-কলাকে মোটামুটি তিনভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম যুগের চিত্র হইতেছে সপ্তম শতাব্দীর সিগিরিয়ার ফ্রেস্কো (Fresco) বা দেয়ালের গায়ের অঙ্কিত চিত্র। দ্বিতীয় যুগের চিত্র হইতেছে পেলানারুয়ার ডেমল মহাসেয়ার দ্বাদশ শতাব্দীর ফ্রেস্কো চিত্র। তৃতীয় যুগের চিত্র হইতেছে অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত বিভিন্ন মন্দিরের চিত্রাবলী।

সিংহলের যে সমুদয় চিত্র আছে, তাহার মধ্যে সিগিরিয়ার চিত্রই হইতেছে সব চেয়ে পুরাতন। সিগিরিয়া বা সিংহগিরি, নাম হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে সিগিরিয়া শৈলের ইটের তৈরী মস্তবড় একটা সিংহমূর্ত্তির সঙ্গে কোন একটা সম্বন্ধ আছে। সিংহের মূর্ত্তিটী কিরূপ ছিল তাহা বলা বড় কঠিন, এখন শুধু প্রকাণ্ড দুইটী থাবা মাত্র বিদ্যমান আছে।

সিগিরিয়া পাহাড়ে সিংহলের একজন রাজা, নাম ছিল তাঁর কাশ্যপ তিনি পিতা ধাতুসেনকে হত্যা করিয়া ভ্রাতার প্রতিশোধের হাত হইতে

রক্ষা পাওয়ার জন্ত একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বাস করিয়াছিলেন।

এই পাহাড়ের উপরি ভাগটা একেবারে সমতল। সেখানে এখন আর প্রাচীন অট্টালিকা নাই, কেবল তার ভিত্তি মাত্র অবশিষ্ট আছে। কষ্টিপাথরের দুইটি সিংহাসন আছে। এক সময়ে যে এ স্থান বেশ জনাকীর্ণ এবং নগরেরই মত কোলাহলে পূর্ণ ছিল তা বেশ বুঝিতে পারা যায়। এই পাহাড়টা প্রায় ৮০০০ আট শত ফিট উচু।

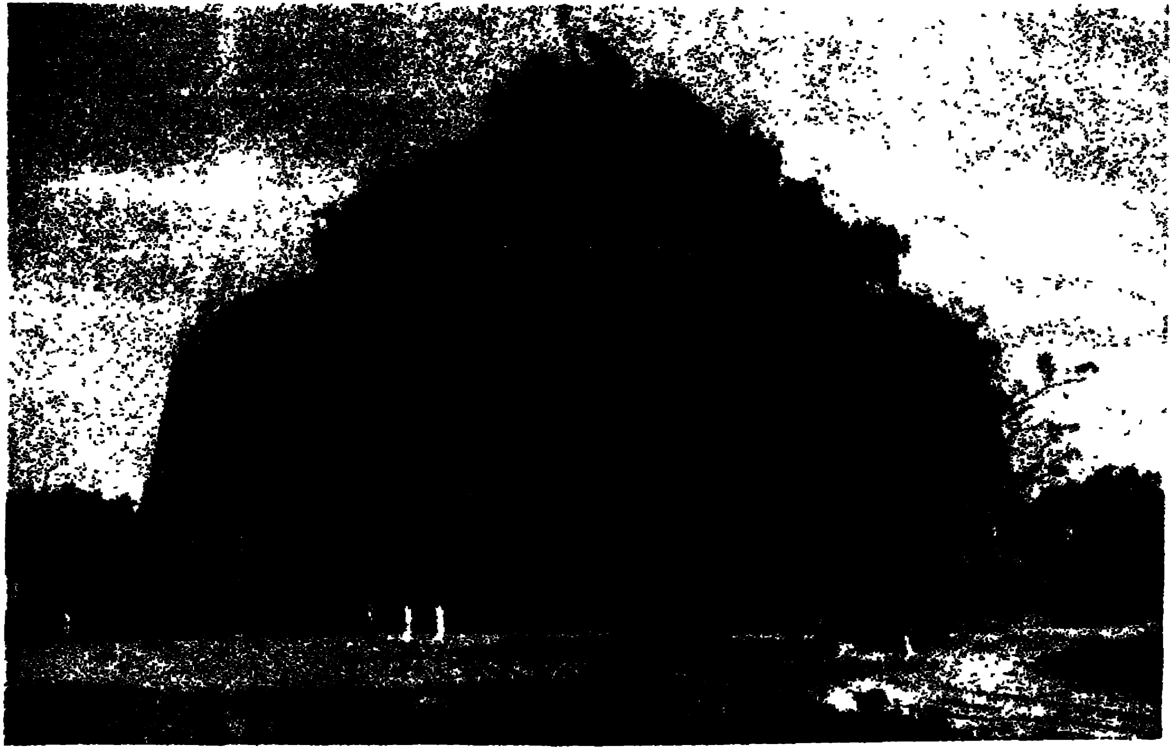
কাজেই রোদ বৃষ্টি ছবিতে পড়তে পারে না। আগে ছবির কাছে ত একেবারেই যাওয়া যেত না। এখন দড়ির মই বেয়ে সেখানে যেতে হয়। কিন্তু এত উচু থেকে দড়ির মই ঝুল্‌ছে যে, উপরে ওঠ্‌বার সময় নীচে তাকালে মাথা ঘুরে যেতে পারে। পাহাড় সেখানে একেবারে দেওয়ালের মত খাড়া নেবে গেছে। যারা মাথা ঠিক রাখতে পারবে না, তাদের এখানে ওঠবার চেষ্টা করা উচিত নয়। কিন্তু একবার উঠ্‌তে পারলে আর ভয় নেই।



সিগিরিয়া পাহাড়ের চিত্র

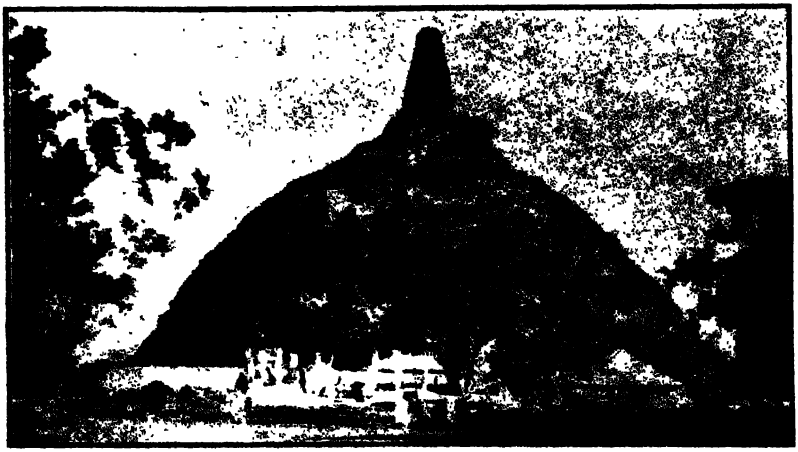
সিগিরিয়ার চিত্রগুলি কালের হাত হইতে আজও যে বাঁচিয়া রহিয়াছে তাহাই আশ্চর্য্য। এক দুর্গম এবং নির্জ্জন স্থানে ছবিগুলি আঁকা। শিল্পী শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত চিত্রগুলি স্বচক্ষে দেখিয়া বলেন—ছবি একটি প্রকোষ্ঠের মধ্যে আঁকা হয়েছিল। বাইরের দেওয়ালটা বহু পূর্ব্বে ধসে গিয়েছে। ছবি যে পাহাড়ের গায়ে আঁকা, তা ভিতরের দিকে হেলান

এখানে মোট ২১টি রমণী মূর্ত্তি আছে। চোখের চাহনি, শরীরের গঠন এবং ভঙ্গিতে খুব বেশীরকমের স্ত্রীসুলভ ভাব। অ্যানাটমি ঠিক এবং খুব সম্ভবতঃ অজন্তার চিত্র অপেক্ষাও বেশী শুদ্ধ। এর থেকে মনে হয়, সিগিরিয়ার চিত্রকরেরা যে নিছক কল্পনার জোরেই ছবি এঁকেছে, তা নয়, নিশ্চয়ই জীবন থেকে অধ্যয়ন করেছে।



মহাথূপ বা মহাস্তূপ, সিংহল। উচ্চতা—২৭০ ফিট, বেড়—২০০০ ফিট।

সিগিরিয়ার সৌন্দর্য্য তার জোরাল এবং সুনির্দ্দিষ্ট রেখায়। শিল্পী যে রেখা টেনে গেছে কোথাও ভয় বা সন্দেহ নাই। ফ্রেস্কোতে একবার ভুল এঁকে ফেলে তা শোধ্‌রাবার উপায় নেই।—সিগিরিয়াতে দু'এক যায়গাতে ভুল ড্রইং রয়েছে, তা বেশ বুঝা যায়। ভুল ড্রইংএর উপর কালো লাইন টেনে শুদ্ধ করা হয়েছে। কাজেই ভুল শুদ্ধ দু'রকমের ড্রইংই একসঙ্গে চোখে পড়ে। অজন্তার রংয়ের প্রাচুর্য্য সিগিরিয়ার রংয়ের দৈন্য গেরিমাটি এবং ফিকে লাল হচ্ছে প্রধান। যেখানে গভীর রংয়ের প্রয়োজন চিত্র রহিয়াছে, সিংহলের অন্য কোথাও প্রাচীন বিহারে, অন্ততঃ যে সব বিহার এখনও বর্ত্তমান আছে, খুব সম্ভবতঃ ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নিদর্শন আর নাই। সাঞ্চি, ভরহুত, অমরাবতী, বরবুদর প্রভৃতি স্থানের পাথরের খোদাই হইতে যে অসম্পূর্ণ বস্তু পাওয়া যায়, তাহাই এখানে রঙীন চিত্রে স্বাভাবিক ভাবে নিপুণ তুলিকার অঙ্কনে সব আখ্যান যথার্থ এবং স্পষ্টভাবে বলিতেছে। ডেমেল মহাসেয়াতে এখনো এমন সকল চিত্র আছে যাহা অজন্তার শ্রেষ্ঠ চিত্র সমূহের প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে।



জেঠওয়ানারমা দাগোবা— অনুরাধপুর

হয়েছে, যেমন, চুল ভ্রূ চোখের তারা ইত্যাদি, সেখানে সবুজ রং ব্যবহার করা হয়েছে। কলম্বোর যাদুঘরে সিগিরিয়া চিত্রের প্রতিলিপি রাখা হয়েছে। নকল মূল চিত্রেরই অনুরূপ হয়েছে।

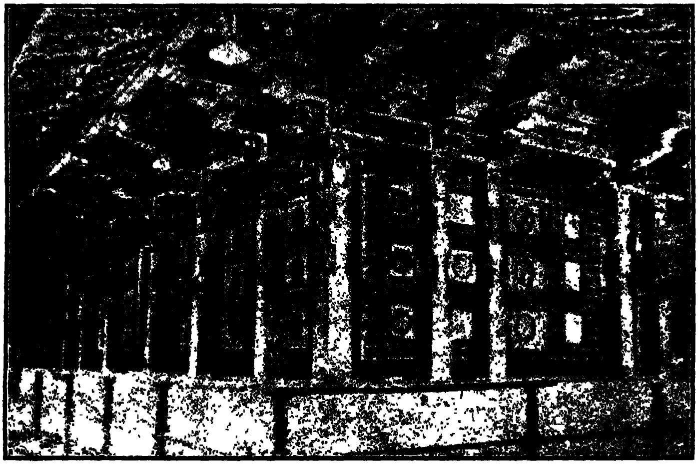
সিগিরিয়ার চিত্রে সপ্তম শতাব্দী হইতে একেবারে দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। সিংহলের পোলানারুয়ার ডেমল মহাসেয়া বিহারে দ্বাদশশতাব্দীর ফ্রেস্কো চিত্র আছে। সরকারি পুরাতত্ত্ব বিভাগের মতে-পোলানারুয়ার মধ্য যুগের এই বিহারে যেমন আশ্চর্য্য রকমের বৌদ্ধ-

অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ চিত্র হইতেছে ডায়ূলা বিহারের চিত্র। এই চিত্র এই সময়কার অন্যান্য বিহারের চিত্র থেকে কিছু পৃথক। কান্দীর রাজা কীর্ত্তিশ্রী অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই বিহার সংস্কৃত ও চিত্রিত করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে এই বিহারের চিত্র কিরূপ ছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। কারণ পুরাতন চিত্র আর নাই, সমস্ত বিহারই নূতন করে আঁকা হয়েছে। ডাম্বুল বা কান্দী অঞ্চলের চিত্রে দাক্ষিণাত্যের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। কান্দীর রাজারা সিংহলের লোক-

ছিলেন না, তাঁহারা দাক্ষিণাত্য প্রদেশ থেকে সিংহলে রাজত্ব করতে এসেছেন। কান্দী বিহারের নাম দালাদা মালিগাওয়া বা দন্তবিহার এ বিহারের কথা বলা হইয়াছে। তা ছাড়া আশগিরিয়া বিহার, মালওয়াও বিহার, গঙ্গারাম বিহার, আদাহন মালুয়া বিহার, লঙ্কা তিলক বিহার। শেষের বিহারটি কান্দী হইতে ছয় মাইল দূরে অবস্থিত, অন্যান্যগুলি সহরের মধ্যেই আছে। চিত্রশিল্প সম্বন্ধে যাঁহারা অভিজ্ঞ সেই সকল পণ্ডিতের মতে সিগিরিয়া পর্ব্বতগাত্রে অথবা ডাম্বোলা পর্ব্বতগুহার চিত্রাবলী যে ভারতীয় চিত্রকলার অন্তর্গত তাহা সুনিশ্চিত।

ওলন্দাজ বা পর্তুগীজ নাম,—যেমন ফার্নাণ্ডো, ডি সিলভা, এইরূপ। আবার অনেক স্থলে দুইটী নাম এক হইয়া গিয়াছে, যেমন—এড্‌উইন গুণবর্দ্ধন! কিংবা জি, লিউইস স্বামী! সিংহলীদের মধ্যে এমন অনেকে আছে যাহারা নিজেদের ভাষায় কথা পর্য্যন্ত বলে না। ইংরাজীই ইহাদের ঘরোয়া ভাষা হইয়া গিয়াছে।

সিংহল দেশের বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থগুলি সিংহলী-হরপে তালপাতার উপরে লৌহ শলাকা দিয়া পালি ভাষায় লিখিত। গণিত, জ্যোতিষ, আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি শাস্ত্র সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। মহাবংশ ছাড়া সিংহলের



কান্দীর দালাদামালিগাওয়া বা দন্তবিহারের স্তম্ভের সারি এবং চিত্রাবলী

এখন সিংহল সম্বন্ধে অন্যান্য কথা শোন।—সিংহলের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি সুন্দর। চারিদিকে নারিকেলের বাগান, চায়ের ক্ষেত, পাহাড় ও নদী এদেশের অতি অনুপম শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে।

সিংহলের সমুদ্রের মুক্তা-সংগ্রহ, লবণ, প্রভৃতি প্রধান।

সিংহলের অধিবাসীরা পর্তুগীজ, ওলন্দাজ এবং ইংরাজের সংস্পর্শে আসিয়া অনেকটা বিলাতী ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। অধিকাংশই ইংরাজরা

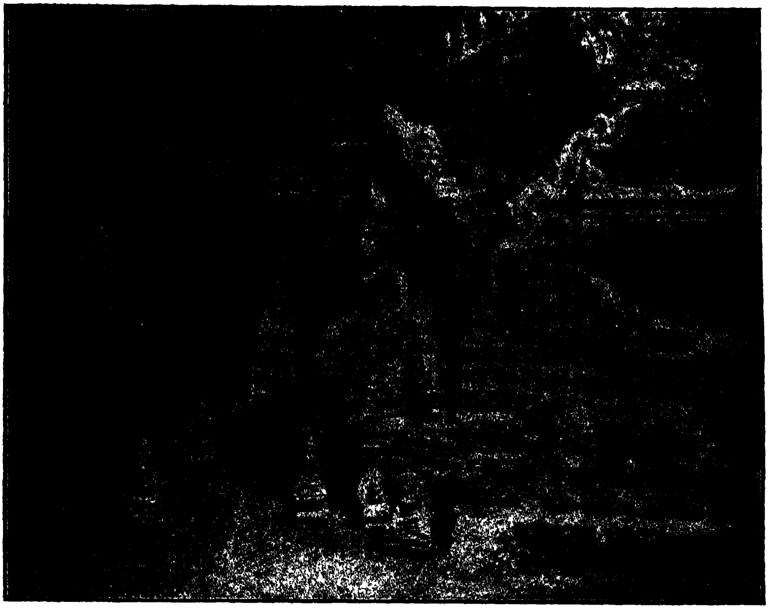
অন্যান্য ইতিহাস সিংহলীভাষায় লেখা। সিংহলী-ভাষায় কি প্রাচীন কালে, কি বর্ত্তমান কালে অনেক গল্প ও উপন্যাস আছে।

সিংহলের পুরুষ ও মেয়েদের কাপড় পরা অনেকটা এক রকম। পুরুষে মেয়েতে কেবল কোট ও জ্যাকেটের প্রভেদ মাত্র। আর সব বিষয়ে কতকটা একই রকমের। পুরুষেরাও মেয়েদের মত চুলের খোপা বাঁধে এবং মাথায় চিরুণী রাখে। মেয়ে পুরুষেরা লুঙ্গি পরে। সিংহলী মেয়েদের

শরীরের গঠন বেশ মোটা-সোটা, গোল-গাল! এ দেশের লোকেরা সাধারণতঃ ভাত, ডাল, তরকারী খায়। ইহারা পান খাইতে খুব ভালবাসে। এ দেশের রান্না নারিকেল তেলে হয়। ইহারা নানা তরকারি একত্রে মিশাইয়া রাঁধে না। শুধু বেগুনের, কি চিচিঙ্গার, কি আলুর তরকারী নারিকেল তেলে ভাজিয়া বা নারিকেলের দুধে সিদ্ধ

ইহারা নানা প্রকারের সুন্দর সুন্দর জিনিষ প্রস্তুত করে।

বৌদ্ধ বিহারগুলিতে ছাত্রদের ও থাকিবার ব্যবস্থা আছে। এই সকল ছাত্রাবাসে একজন করিয়া মহাস্থবির থাকেন। তিনি ছাত্রদের দেখাশুনা করেন ও পড়াশুনার তত্ত্বাবধান করেন।



সিংহলের একটি গুহা-মন্দির

করিয়া খায়। সিংহলীরা নারিকেল খোলা শুকাইয়া তেল প্রস্তুত করিবার জন্য নানাস্থানে রপ্তানী করে। এ দেশের লোকেরা সুনিপুণ শিল্পী,—নারিকেল কাঠ দিয়া ইহারা চেয়ার, বাক্স এবং নানা প্রকারের খেলনা ও সৌখীন দ্রব্য প্রস্তুত করে। সিংহলের হাতীর দাঁতের কাজ, আব্‌লুশ কাঠের কাজ, সোনারূপার কাজ খুব ভাল হয়। কান্দী সহরের পিতলের জিনিষ বিখ্যাত। কচ্ছপের খোলা গলাইয়া

সিংহলে বিদ্যোপকৃতি নামে একটি প্রাচীন সভা আছে। সেখানে সংস্কৃত কাব্য এবং আয়ুর্ব্বেদাদি পড়াইবার ব্যবস্থা আছে।

এখানকার স্কুল, কলেজ প্রভৃতি ভারতীয় আদর্শেই পরিচালিত।

এখানকার শীত, গ্রীষ্ম, কোন ঋতুই প্রবল নয় বলিয়াই বেশ প্রীতিপ্রদ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন,—বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি

মহামনীষিগণ সিংহলে আসিয়া এদেশের সৌন্দর্য্যের শতমুখে প্রশংসা করিয়াছেন। স্বর্গত মহা মহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এখানকার বিদ্যোদয় কলেজে আসিয়া কিছুদিন অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সিংহলের কলেজে, চিত্র-বিদ্যালয়ে, মহিলাদের বিদ্যাপীঠে অনেক বাঙ্গালী পুরুষ ও মহিলা কাজ করিয়াছেন এবং এখনও বাস করিতেছেন।

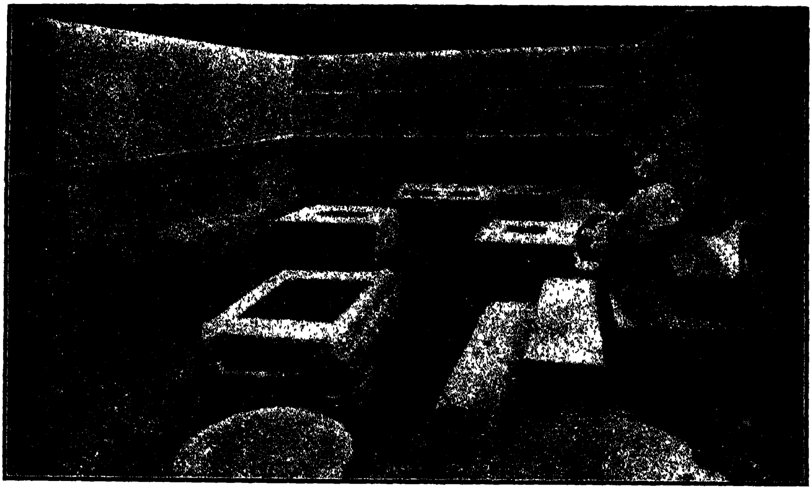
সিংহলের টাকা ভারতের টাকার সমান। ভারতবর্ষে যেমন পয়সা, সেখানে তেমনি সেণ্ট। ১০ সেণ্টে এক দুয়ানি, ২৫ সেণ্টে সিকি, ৫০ সেণ্টে আধুলি।

কলম্বো সহর সম্বন্ধে বিদেশী পর্য্যটকেরা সকলেই এক বাক্যে বলেন যে সহরটি ঠিক্ ছবির মতন। বড় বড় প্রশস্ত রাস্তা, কতক ছাতকরা বা টালি দেওয়া, কতক খোলায় ছাওয়া। সকলের গঠন-প্রণালীই বিলাতী ধরণের।

সিংহলের জাতি—সিংহলের প্রাচীন অধিবাসীরা কোন্ জাতির অন্তর্ভুত তাহা বলা কঠিন। কেহ বলেন ইহারা চীন জাতীয় ছিল, কেহ বলেন দ্রাবিড় জাতীয়। পালি ও সংস্কৃত সাহিত্যে ইহাদিগকে রক্ষ বা রাক্ষস বলা হইয়াছে।

সিংহলের ইতিহাস—তোমরা জান বিজয়সিংহ লঙ্কা বিজয় করিয়া তাঁহার সিংহ উপাধি অনুসারে ইহার নাম সিংহল রাখেন। বিজয়সিংহের কোন সন্তান না হওয়ায় তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র পাণ্ডাবাস সিংহলের রাজা হন। তিনি সিংহলকে পিহিত (উপরের ভাগ), রোহণো (মধ্যভাগ) ও ময়বও (নিম্নভাগ) এই তিনটি ভাগে ভাগ করিয়াছিলেন। পাণ্ডাবাস সিংহলের নানাস্থানে দীঘি-পুষ্করিণী ইত্যাদি খনন করেন। তাঁহার পরবর্ত্তী রাজারাও সিংহলের কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য ঐরূপ অনেক দীঘি ইত্যাদি খনন করিয়াছিলেন। বিজয়সিংহ ও তাঁহার পরবর্ত্তী নৃপতিরা কেহই ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোনও লক্ষ্য করেন নাই।

খৃষ্ট পূর্ব্ব ৩০৭ অব্দে তিস্সনের রাজত্বকালে মগধ রাজকুমার মহিন্দো সিংহলে ধর্ম্ম প্রচার করেন। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের সহিত বৌদ্ধ মন্দিরের উদ্দেশে ভূমিদান-পদ্ধতিও খুব প্রসার লাভ করে। এই



কয়েকটি উষ্ণ প্রস্রবণ—সিংহল

সমস্ত ভূমিতে কৃষিকার্য্যের যাহাতে উন্নতি হয়, সেজন্য দীঘি ইত্যাদি খনিত হইতে থাকে, সে



সিংহলের রুয়াল ভেলিব জলে ডোবা পাথরের হাতী

জন্যই সিংহলের কৃষিকার্য্য এতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছে।

৩০২ খৃষ্টাব্দের রাজা মহাসেনের পর হইতে নিম্নজাতীয় গুলুবংশীয় রাজারা সিংহলে রাজত্ব আরম্ভ করেন। বিজয়সিংহের বংশে ৫১ জন রাজত্ব করেন। গুলুবংশে ৬২ জন রাজা ৩০১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১১৫৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সিংহলে রাজত্ব করেন।

সিংহলেব রাজাদের মধ্যে তিস্‌সের পর প্রক্রমবাহু নৃপতির খ্যাতিই ছিল খুব বেশী। এই নৃপতি ১৩৯৫টি কৃষি-দীঘির সংস্কার করেন। বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতি বিধান করেন এবং কম্বোডিয়া ও অররমন আক্রমণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর সিংহলের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়াছিল। ১২১২ খৃষ্টাব্দে মগদেব অধিনায়কতায় মালাবারীগণ সিংহল অধিকার করেন। ১২৬৬ খৃষ্টাব্দে পালিত প্রক্রমবাহু (তৃতীয়) আবার মালাবারীগণেব নিকট হইতে পুনরুদ্ধার করেন। একবার ১৪০৫ খৃষ্টাব্দে চীনের সৈন্যাধ্যক্ষ চিংহো লঙ্কার বৌদ্ধমন্দিরে উপহার দিতে আগমন করিলে, সিংহলরাজ বিজয় (ষষ্ঠ) তাঁহাকে আক্রমণ করেন। ইহার ফলে কিছুদিন পরে চিংহো বিপুল সৈন্যবাহিনী লইয়া বিজয়বাহুকে পরাজিত করিয়া সপরিবারে তাঁহাকে বন্দী করিয়া চীনদেশে লইয়া গেলে পর চীন সম্রাট তাঁহাকে দেশে পাঠাইয়া দেন।

লঙ্কা-বিজয়ী মালাবারীগণ হিন্দু ছিলেন। এ জন্যই সিংহলে বৌদ্ধ বিহারের সহিত অনেক হিন্দু মন্দির দেখা যায়। এই সমস্ত হিন্দু মন্দিরে গণেশ, নটরাজ শিব এবং সুব্রহ্মণ্যদেব (কার্ত্তিকের) বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রভৃতি দেখা যায়।

১৫০৫ খৃষ্টাব্দে নবম ধর্ম্ম প্রক্রমবাহু যখন দক্ষিণ লঙ্কায় রাজত্ব করেন, সে সময়ে মালাবারীরা জাফ্‌না পটমে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন। পর্তুগীজেরা ১৬১৭ খৃষ্টাব্দে মালাবারীদের হাত হইতে জাফ্‌না রাজধানী অধিকার করেন। ১৬২৭ খৃষ্টাব্দে বিমলধর্ম্ম নৃপতির ভ্রাতা রাজা সেনরাট পর্তুগীজদের পরাজিত করেন। পর্তুগীজেরা এ সময়ে বাটাভিয়ার ওলন্দাজগণের সাহায্য প্রার্থনা করেন।



পোলানারাওয়ার পাহাড়ের গায়ে খোদিত বুদ্ধের বৃহদাকার প্রচার মূর্ত্তি—সিংহল

ওলন্দাজেরা এই সুযোগে এ দেশে আধিপত্য বিস্তার করিবার সুযোগ লাভ করে এবং বাণিজ্য দ্বারা

F. 9—36

ধনরক্ষিন চেষ্টায় মনোযোগী হয়। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে কান্দীর রাজা ওলন্দাজদের তাড়াইবার জন্য ইংরাজ-



উপর হইতে নীচে যথাক্রমে (১) বৌদ্ধ বিহার সম্মুখে শ্রমণ (২) জাফনার ওলন্দাজদের পুরাণ দুর্গ (৩) পেদ্রো পর্ব্বত (৪) সিংহলের চা বাগান

দের সহিত মিলিত হন। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সমস্ত সিংহলদ্বীপ ইংরাজ অধিকারে আসিয়াছে। সিংহলের শাসনভার এখন লণ্ডনের কলোনিয়াল অফিসের সেক্রেটারীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। একজন গভর্ণার এই দেশের শাসনকার্য্য সচিবগণের সহিত পরামর্শ করিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকেন। সিংহলদ্বীপ নয়টী ভাগে বিভক্ত। অনেকদিন যাবত সিংহলীরা পর্তুগীজ, ওলন্দাজ ও ইংরাজদের সহিত মেলামেশার দরুন ইহারা একটু বেশী রকমের ইউরোপীয় ভাবাপন্ন হইয়াছে। সকলেই বেশ পরিষ্কার ইংরাজী বলিতে পারে। সিংহল সম্বন্ধে অনেক বই ইংরাজী, ফরাসী, পর্তুগীজ ও ওলন্দাজ-



সিংহলের ধান চাষ

দের ভাষায় লিখিত আছে। এখানে তাহার কয়েক খানির নাম করিলাম। Turner—Epitome of the History of Ceylon, Skinner, (1798) Fifty years in Ceylon, (1891), Cave, Ruined cities of Ceylon, (1897), The Book of Ceylon (1898), Ferguson's Ceylon in 1903, Muller, Ancient Inscriptions in Ceylon. তোমরা এই সব বই পড়িলে সিংহল সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারিবে।

বাঙ্গালীদের সঙ্গে সিংহলের সংস্রব, সে প্রাচীন কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। প্রাচীন বাঙ্গালা কবিদের যে কোন একখানা পুথি খুলিলেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রীমন্ত সওদাগরের সিংহল-যাত্রার কথা কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে লিখিত আছে। খুল্লনা শ্রীমন্তকে সিংহল-গমনে অনুমতি দিবার সময় বলিতেছেন,—

বাছা যাইবে সিংহল দেশ, পাইবে বড়ই ক্লেশ,
তরণী সরণী বহু দূর।



সিংহলের একটি কুটির

সেকালের বাঙ্গালা দেশের বণিকেরা প্রায়ই সিংহলে বাণিজ্যের জন্য যাইতেন। ইহার দ্বারা বাঙ্গালা-



সিংহলের কৃষক ও তামিলদেশের লোক নাচে
সিংহলের আদিম অধিবাসী

দেশের সহিত সিংলের ঘনিষ্ঠ সংস্রবের কথাটি প্রকাশ পাইতেছে।

সিংহল হইতেছে পূর্ব্ব ও পশ্চিমের সন্ধিস্থল। এজন্য পৃথিবীর নানাদেশের লোক প্রতিদিন এইপথে চলাফেরা করে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের অনেক লোক এখানে বাণিজ্য উপলক্ষে বাস করে, কিন্তু বাঙ্গালীর সংখ্যাই হইতেছে তুলনায় অতি অল্প।

সিংহলের নীচ জাতীয় মেয়েদিগকে রোডিয়া বলিয়া থাকে। ইহারা দেখিতে বেশ সুশ্রী। সিংহলের পুরুষদের প্রথমটায় দেখিলে তাহাদের হীনবীর্য্য বলিয়া মনে হয়। অনেক কাল ধরিয়া পর্তুগীজ, ওলন্দাজ ও ইংরাজ-শাসনে থাকার দরুন ইহাদের পোষাক পরিচ্ছদেরও দিন দিন পরিবর্ত্তন হইতেছে। সিংহলীরা কোট, পেন্টের উপর লুঙ্গি জড়াইতেও ছাড়ে না!

সিংহলের বৃদ্ধদের দেখিতে বেশ ভাল। তাহাদের চেহারার মধ্যে বেশ একটা গাম্ভীর্য্যের ভাব দেখা যায়। এখানে ধর্ম্ম লইয়া কোন দ্বন্দ্ব নাই।

সুবিখ্যাত টারনার সাহেবের দ্বারা সম্পাদিত মহাবংশ বাহির হইবার পূর্ব্বে সিংহলের কোনও ধারাবাহিক ইতিহাস ছিল না। এজন্য অনেকে মনে করিতেন যে সিংহলের কোনও ইতিহাস নাই। মহাবংশ প্রকাশিত হওয়ার পর সেই ভুল ধারণা দূর হইয়াছে। মহাবংশের প্রাচীন খণ্ড রাজা ধাতুসেনের পিতৃব্য মহানামের দ্বারা ৪৫৯ হইতে ৪৭৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে লিখিত হয়। উহাতে খৃষ্ট পূর্ব্ব ৫৪৩ হইতে ৩০১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সিংহলের ইতিহাস লিখিত হইয়াছে। সিংহল বিজয়ী বাঙ্গালী বিজয়সিংহ হইতে আরম্ভ করিয়া মহাসেন পর্য্যন্ত সমস্ত রাজাদের ইতিহাস ইহাতে আছে। মহাসেনের পর হইতে গুলুবংশের রাজত্ব আরম্ভ হয়। মহাবংশ ছাড়া



কলম্বো-বন্দর

আরও অন্যান্য সাময়িক ঘটনাপূর্ণ সিংহলের ইতিহাস ও অনেক আছে।

ভারতবর্ষের টাকা লঙ্কায় চলে না। এখানে পয়সার নাম সেণ্ট। দশ সেণ্টে এক দুয়ানি হয়। পঞ্চাশ সেণ্টে আধুলি। সিংহলের শুল্ক বিভাগের কড়াকড়ি। কোনও জিনিষ যদি লঙ্কায় আসে কিংবা কোন জিনিষ যদি লঙ্কা হইতে বাহিরে যায় তাহা হইলে শুল্ক দিতে হয়। এই শুল্ক হইতেই এখানকার রাজস্বের প্রধান আয়।



বাঙ্গালার কথা

গৌড়ে মাৎস্যন্যায়

২৬৯৭ পৃষ্ঠাব পর

বঙ্গদেশ, বিশেষতঃ তাহাব উত্তবভাগ এককালে যে গৌড়দেশ নামে অভিহিত হইত, সে কথা বলিয়াছি। সেইজন্য তাহার রাজাকে গৌড়েশ্বব বলিত। গৌড় নামে একটী নগর বঙ্গদেশের উত্তবভাগে অবস্থিত ছিল, মালদহ জেলায় এখনও তাহার ধ্বংসাবশেষ আছে। কিন্তু সেই গৌড়নগর কোন্ সময় স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারা যায় না। তবে কোন্ সময় হইতে তাহা বিখ্যাত হইয়াছিল, পরে সে কথা বলিব। সে যাহা হউক, গৌড়দেশের নামেই অনেকদিন হইতে তাহার রাজাকে **গৌড়েশ্বর** বলা হইত। এই গৌড় বা বঙ্গদেশে কোন একটী রাজবংশের বহুদিন ধরিয়া রাজত্ব করার কথা জানা যায় না। এক এক সময়ে এক এক জন পরাক্রান্ত রাজা গৌড়েশ্বর হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার বংশের লোকেরা আর সেইরূপ প্রবল হইতে পারেন নাই। সেইজন্য বাঙ্গলায় ভিন্ন ভিন্ন বাজবংশের বাজত্বের এবং অনেক বিদেশীয় রাজার আক্রমণের কথা জানা যায়। এইরূপে গৌড়দেশে বা বাঙ্গালায় অনেকদিন হইতে অরাজকতা বিবাজ করিতেছিল। এই অবাজকতাকে "মাৎস্যন্যায়" বলা হইয়া থাকে।

"মাৎস্যন্যায়"—অর্থাৎ মাছের রাজ্যের আইন। তথায় বড় মাছ ছোট মাছকে ধরিয়া গিলিয়া ফেলে। আরও বড় মাছ আবার ঐ বড় মাছকে গ্রাস কবে। সাধারণ কথায় আমরা বলি—"জোর যার, মুল্লুক তার" নীতি। দেশের এই অবস্থাকেই ভাল কথায় বলে অরাজকতা!

দেশের এ-রকম দুর্দ্দিনে বাঙ্গালীরা কিন্তু একটা অসাধারণ কার্য্য করিয়া ফেলিল। এতকাল যিনি যেখানে রাজা হইতেছিলেন, দেশের লোক তাঁহাকেই রাজা বলিয়া মানিয়া লইতেছিল, তাঁহাকেই খাজনা জোগাইতে-

ছিল। কিন্তু ইহাতে নূতন নূতন রাজার আবির্ভাব ও থামিতেছিল না, আর তাহাদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটিও থামিতেছিল না। এই সময় **গোপাল** নামে একজন বীরপুরুষ নানা

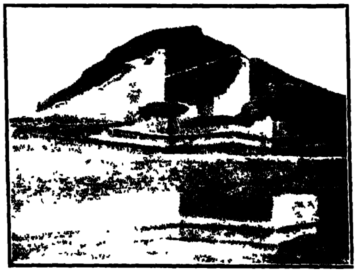


পাহাড়পুর স্তূপের পূর্ব্বদিকের দৃশ্য

বীরত্ব ও মহত্ত্বের কার্য্য করিয়া বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিলেন। দেশের মাতব্বরগণ সকলে যাইয়া এই গোপালকে ধরিলেন। বলিলেন—"তোমাকে সমস্ত দেশের রাজা হইতে হইবে। আমরা আজ এ রাজা, কাল ও রাজা চাহিনা। আমরা সকলে তোমাকেই রাজা বলিয়া মানিব,—অন্য কাহাকেও মানিব না।" গোপাল সম্মত হইয়া বাঙ্গালার সিংহাসনে বসিলেন। দেখিতে দেখিতে বাঙ্গালার অদৃষ্ট ফিরিয়া গেল। অশান্তি, অবিচার, অত্যাচার যে দেশে আগুনের মত দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছিল, সেইদেশে শান্তি ও সুবিচার ফিরিয়া আসিল। একতার অভাবে যে দেশ শ্মশানে পরিণত হইতেছিল, সমস্ত দেশ এক হইয়া গোপালের পিছনে দাঁড়াইতেই সেই বাঙ্গালা আবার সোণার বাঙ্গালা হইতে চলিল। মিলিত বাঙ্গালার বাঙ্গালী রাজার বিক্রমে সমস্ত ভারত কাঁপিয়া উঠিল। গোপাল প্রথমে গৌড় বা বঙ্গদেশের রাজা হইয়া অবশেষে মগধ পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া লইলেন। গোপাল হইতে বাঙ্গালার বিখ্যাত রাজবংশ **পালবংশের** আরম্ভ। এই **পালবংশ** বাঙ্গালায় দীর্ঘ চারিশত বৎসর কাল ধরিয়া রাজত্ব করিয়া গিয়াছে।

গৌড়েশ্বর-ধর্ম্মপাল

বাঙ্গালী মাতব্বরগণ নিজেদের ইচ্ছায় যাহাকে রাজা বলিয়া বাছিয়া লইয়া অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন, সেই গোপালের পুত্র মহারাজাধিরাজ ধর্ম্মপাল ৭৯০ খৃঃ অব্দে বা উহার কাছাকাছি কোন বৎসরে সিংহাসনে আরোহণ করেন। পিতার নিকট হইতে ধর্ম্মপাল বাঙ্গালা ও বিহার, সম্ভবতঃ এই দুই রাজ্যই পাইয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে রাজারা ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করিতে দানপত্র খানা তামার পাতে খুদিয়া লিখিয়া দিতেন। এই দানপত্রগুলিকে তাম্রশাসন বলে। ধর্ম্মপালের এইরূপ একখানা দানপত্রে দেখা যায়, বিহারের পাটলিপুত্র বা বর্ত্তমান পাটনা নগরে তাঁহার রাজধানী ছিল। বস্তুতঃ আদিযুগের পাল রাজগণকে শুধু বাঙ্গালার রাজা বলা



পাহাড়পুর স্তূপের অপরদিকের দৃশ্য

সঙ্গত নহে। তাঁহারা মিলিত বাঙ্গালা ও বিহারের রাজা ছিলেন এবং বিহার ও উত্তর ভারতের সহিত তাঁহাদের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ ছিল।

এই সময় কান্যকুব্জ বা কনোজে ইন্দ্রায়ুধ নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেছিলেন। আবার বর্ত্তমান রাজপুতনার ভিল্লমাল নামক নগরে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিয়া গুর্জ্জর প্রতীহার বংশীয় নাগভট নামক একজন রাজা প্রবল প্রতাপে রাজপুতনা ও মালবদেশ শাসন করিতেছিলেন। এই সময়ে বিন্ধ্যপর্ব্বত ও নর্ম্মদা নদীর দক্ষিণে রাষ্ট্রকূট বংশীয় নৃপতিগণ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইহাদের রাজধানী প্রথমে ছিল নাসিক নগরে পরে উহা মান্যখেত নগরে স্থানান্তরিত হয়। পূর্ব্বভারতের রাজা ধর্ম্মপাল রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয়



পাহাড়পুর স্তূপের উত্তর পশ্চিমদিকের দৃশ্য

গোবিন্দের (নামান্তর পরবল) কন্যা রন্নাদেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

মহাবীর ধর্ম্মপাল রাজা হইয়া প্রথমে নিজের বাঙ্গালা ও বিহার রাজ্যের শাসনব্যবস্থা সুন্দর ও সুশৃঙ্খল করিয়া ফেলিলেন। পরে তিনি বহু সৈন্য লইয়া বিদেশ জয় করিতে বাহির হইলেন। বিহারের পশ্চিমে কাশী প্রদেশ। উহা জয় করিয়া ধর্ম্মপাল গঙ্গাযমুনাসঙ্গমে প্রয়াগ অধিকার করিলেন। তিনি সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইতেছেন দেখিয়া কান্যকুব্জ-রাজ ইন্দ্রায়ুধ প্রমাদ গণিলেন। ধর্ম্মপাল সিংহের মত যাইয়া কান্যকুব্জরাজ্যের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। ভয়ানক যুদ্ধ হইল। ইন্দ্রায়ুধ পরাজিত হইয়া ধর্ম্মপালকে কান্যকুব্জ রাজ্য ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন। মহাসমারোহে কান্যকুব্জের সিংহাসনে নবীন সম্রাট ধর্ম্মপালের অভিষেক হইল।

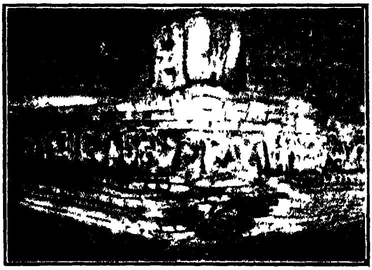
পরাজিত ইন্দ্রায়ুধের এক ভাই ছিল, তাহার নাম চক্রায়ুধ। চক্রায়ুধ এই সময় আসিয়া ধর্ম্মপালের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। বলিলেন, "সম্রাট, আমার পৈত্রিক রাজ্য আমাকে ফিরাইয়া দিন। আমি আপনার অধীন রাজারূপে এই রাজ্য শাসন করিব।" উদারহৃদয় ধর্ম্মপাল চক্রায়ুধের উপর প্রসন্ন হইয়া কান্যকুব্জে ফিরিয়া চক্রায়ুধের অভিষেক করাইলেন। রাজপুতনা ও পঞ্জাবের সমস্ত রাজগণ ধর্ম্মপালের মহত্ত্ব দেখিয়া সাধু! সাধু! বলিয়া ধর্ম্মপালকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

ভিল্লমালের তেজস্বী রাজা নাগভটের কিন্তু ধর্ম্মপালের এই গৌরব সহ্য হইল না। বাঙ্গালাদেশে যখন অরাজকতা ছিল, বাঙ্গলার রাজারা যখন দুর্ব্বল ছিলেন, তখন নাগভটের পিতা বৎসরাজ বাঙ্গালাদেশ আক্রমণ করিয়া তথায় রক্তস্রোত বহাইয়াছিলেন,—বাঙ্গালার দুইটী রাজছত্র কাড়িয়া আনিয়াছিলেন। সেই পদদলিত বাঙ্গালার রাজা আজ সমগ্র পূর্ব্ব ও উত্তরভারতের সম্রাট হইতে চলিলেন, ইহা নাগভটের সহ্য হইল না। নাগভট প্রকাণ্ড বাহিনী লইয়া কান্যকুব্জ আক্রমণ করিলেন, চক্রায়ুধ পরাজিত হইয়া ধর্ম্মপালের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

এইবার নাগভটের সহিত নবীন সম্রাট ধর্ম্মপালের ভীষণ যুদ্ধ উপস্থিত হইল।

পাটলিপুত্রে আত্মরক্ষা সুবিধা হইবে না দেখিয়া ধর্ম্মপাল মুদ্গগিরি বা মুঙ্গেরে হটিয়া আসিলেন। এই মুঙ্গেরে পাহাড় আসিয়া প্রায় গঙ্গার তীর স্পর্শ করিয়াছে। ঐ তীরের উপরে সঙ্কীর্ণ স্থান দিয়া বাঙ্গালা দেশের দিকে রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। এই রাস্তা আটকাইয়া মুঙ্গেরের দুর্গ নির্ম্মিত। মুঙ্গেরে ধর্ম্মপাল নাগভটের গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। এই যুদ্ধেও নাগভট জয় লাভ করিলেন।

ধর্ম্মপালের শ্বশুর তৃতীয় গোবিন্দের নিকট কিন্তু ইতিপূর্ব্বেই খবর পৌঁছিযাছিল



পাহাড়পুরের স্তূপের উত্তর-পূর্ব্ব দিকের দৃশ্য

যে তাঁহার জামাতা পূর্ব্বভারতপতি ধর্ম্মপাল প্রতীহার-রাজ নাগভটের আক্রমণে বিপন্ন। সংবাদ শুনিয়া গোবিন্দ ক্রোধে গর্জ্জিয়া উঠিলেন। গোবিন্দের পিতা ধ্রুব নাগভটের পিতা বৎসরাজকে একবার এমন হারাইয়া দিয়াছিলেন যে, বৎসরাজ মরুভূমিতে যাইয়া আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সেই বৎসরাজের পুত্র নাগভট কিনা আজ গোবিন্দের জামাতা, পূর্ব্ব ও উত্তর ভারতের সম্রাট, ধর্ম্মপালের রাজ্য আক্রমণ করিতে সাহস করে! নাগভটকে আচ্ছা করিয়া শিক্ষা দিবার জন্য গোবিন্দ বহু সুশিক্ষিত সৈন্য লইয়া উত্তরাপথে অগ্রসর হইলেন। নাগভট তখন বড় বিপদে পড়িলেন। সম্মুখে ধর্ম্মপালের সৈন্য। পিছনে রাষ্ট্রকূটরাজ গোবিন্দের সৈন্য। নাগভট এইবার সম্পূর্ণ পরাজিত হইলেন এবং এমন স্থানে যাইয়া লুকাইলেন যে, তাহার কোন আর চিহ্নই পাওয়া গেল না। কৃতজ্ঞ ধর্ম্মপাল চক্রায়ুধকে লইয়া সানন্দে যাইয়া শ্বশুরের পাদ-বন্দনা করিলেন।

এই মহাযুদ্ধে রাষ্ট্রকূট, প্রতীহার ও পাল-সৈন্যগণের গমনাগমনে ও সঙ্ঘর্ষে সমগ্র উত্তরাপথ ও দক্ষিণাপথ আলোড়িত হইয়াছিল। নাগভটের পরাজয়ের পরে ভারত জুড়াইল। ধর্ম্মপাল দীর্ঘকাল ধরিয়া উত্তর ভারতের উপর প্রভুত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে বাঙ্গালা ও বিহারের সমস্ত বিষয়ে অপূর্ব্ব শ্রীবৃদ্ধি হইযাছিল। ধর্ম্মে ধর্ম্মপাল বৌদ্ধ ছিলেন। তাঁহার রাজ্যে গঙ্গার তীরে পাহাড় ছিল, গঙ্গার জল হইতে তাহা খাড়া উপরে উঠিয়াছিল। সেই পাহাড়ের মাথায় ধর্ম্মপাল বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের জন্য একটি প্রকাণ্ড বিহার প্রতিষ্ঠিত করেন। এই বিহারের নাম "বিক্রমশিলা মহাবিহার।" দেখিতে দেখিতে বিদ্যাচর্চ্চার স্থান হিসাবে এই বিহারের প্রতিপত্তি প্রাচীন নালন্দা বিহারকেও ছাড়াইয়া উঠিল। ক্রমশঃ বিক্রমশিলা-মহাবিহার বৌদ্ধপণ্ডিতগণের কেন্দ্রস্থল হইয়া উঠিল। এই বিহার কোথায় ছিল তাহা আজিও ঠিক মত জানা যায় নাই।

সম্প্রতি উত্তরবঙ্গে রাজসাহী জেলার উত্তর-পূর্ব্ব কোণে পাহাড়পুর নামক স্থানে প্রকাণ্ড এক প্রাচীন ভাঙ্গা মন্দির পাওয়া গিয়াছে। উহাতে পুরাণো অক্ষরে লেখা কতকগুলি মাটির শীলমোহর মিলিয়াছে। ঐ শীলমোহরগুলি পড়িয়া বুঝা যায়, পাহাড়-

পুরের মন্দির ও বিহার একসময়ে ধর্ম্মপাল-দেবের সোমপুর মহাবিহার নামে পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল।

ধর্ম্মপাল ধর্ম্মে বৌদ্ধ হইলেও প্রকৃত রাজার মত সকল ধর্ম্মকেই তিনি শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি বলিতেন, যাহার যাহা ধর্ম্ম, নিষ্ঠার সহিত সে তাহাই আচরণ করুক। পালবংশের প্রতিষ্ঠার কিছু পূর্ব্বে আদিশূর বাঙ্গালাদেশে কান্যকুব্জ হইতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন। এই ব্রাহ্মণদের একজনের নাম ছিল ভট্টনারায়ণ। ভট্টনারায়ণের পুত্র আদিগাঞী ওঝাকে দিয়া ধর্ম্মপাল বৈদিক যজ্ঞ করাইয়াছিলেন। ওঝা যজ্ঞের দক্ষিণা-স্বরূপ গঙ্গাতীরে ধামসার নামে একখানা গ্রাম ব্রহ্মোত্তর পাইয়াছিলেন। এইরূপে তিনি বরেন্দ্রীপ্রদেশে অর্থাৎ গঙ্গার উত্তর পাড়ে করঞ্জ নামক একখানা গ্রাম কাশ্যপ গোত্রীয় স্বর্ণরেখা নামক ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মোত্তর দিয়াছিলেন। এই গ্রামের নাম হইতে স্বর্ণরেখার এক শাখা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজে করঞ্জাই নামে পরিচিত হইয়াছে। এই করঞ্জ গ্রাম পাবনা জেলার শাহাজাদপুরের মাইল দশেক দক্ষিণ পূর্ব্বে অবস্থিত। পালরাজগণের মন্ত্রী বংশও বৌদ্ধ ছিল না, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মাবলম্বী এবং শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিল। ধর্ম্মপালের মন্ত্রীর নাম ছিল গর্গ। তিনি অহঙ্কার করিয়া বলিতেন—"দেবরাজ ইন্দ্রের মন্ত্রী বৃহস্পতি ইন্দ্রকে মাত্র পূর্ব্বদিকের রাজা করিতে পারিয়াছিলেন,—সেই রাজ্য ও আবার দৈত্যেরা কাড়িয়া লইয়াছিল। আর আমি পূর্ব্বদিকের অধিপতি ধর্ম্মপালকে পূর্ব্বপশ্চিম উত্তর দক্ষিণ সমস্ত দিকেরই অধিপতি করিয়া দিয়াছি।"

ধর্ম্মপাল ও তাঁহার পুত্র দেবপালের রাজত্বে প্রাচীন নালন্দা মহাবিহার ধীমান ও তাঁহার ছেলে বীতপাল নামে দুইজন সুদক্ষ শিল্পী বাস করিতেন বলিয়া জানা যায়। ইঁহারা পিতাপুত্রে পাথর খুঁদিয়া এবং অষ্ট-ধাতু গলাইয়া এমন চমৎকার দেবদেবীর মূর্ত্তি গড়িতেন যে, তাহা দেখিয়া লোকে অবাক হইয়া যাইত। নালন্দা মহাবিহার মগধের প্রাচীন রাজধানী রাজগৃহের ৬।৭ মাইল উত্তরে এবং পাটনার প্রায় ৩৫ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বে অবস্থিত ছিল। তথায় খুঁড়িয়া এখন মহাবিহারের ভাঙ্গা দালান কোঠা মাটির নীচ হইতে বাহির করা হইয়াছে,—সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য পাথর ও ধাতুর দেব-দেবীর মূর্ত্তিও বাহির হইয়াছে। পাথর কাটিয়া বা ধাতু গলাইয়া মূর্ত্তি গড়ার নাম ভাস্কর্য্যশিল্প। বাঙ্গালা ও বিহারে ভাস্কর্য্য-শিল্প যে একটা কতবড় শিল্পে পরিণত হইয়াছিল, নালন্দার মূর্ত্তিগুলি এবং কলিকাতা, রাজসাহী ও ঢাকার যাদুঘরে রক্ষিত মূর্ত্তির সংগ্রহ দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়।

ধর্ম্মপাল বাঙ্গালী জাতির গৌরব ও প্রভাব যে ভাবে বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, তাহাতে বাঙ্গালী জাতির অতীত ইতিহাস চিরসমুজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। ঐ সময়ে বাঙ্গালীর এই বীর সম্রাটের রাজশক্তি সুদূর উত্তর পশ্চিমের সীমা গান্ধার প্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। ধর্ম্মপাল তাঁহার অসাধারণ বীরত্ব প্রভাবেই উত্তর ভারতের কান্যকুব্জাদি রাজ্য জয় করিতে পারিয়াছিলেন। কাহারও কাহারও মতে ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যদু, অবন্তি, গান্ধার, কীর প্রভৃতি বিভিন্ন রাজ্যের নৃপতিবর্গ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। ধর্ম্মপাল প্রায় বত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।



[খাসিযাদেব মধ্যে সুন্দর সুন্দব রূপকথা প্রচলিত আছে। এই সকল রূপকথার ভিতব দিযা তাহাদের তীয চরিত্রেব অনেকখানি পবিচয় পাওয়া যায। এইখানে দুইটি খাসিয়া রূপকথা প্রকাশ কবা হইল।]

খাসিয়া রূপকথা

পান ও শুপারি

২৭৩৬ পৃষ্ঠার পর

দুই ব্যক্তিব মধ্যে প্রাচীন-কালে খুব বন্ধুত্ব ছিল। তাহাদেব মধ্যে একজন ধনী ও অপর অত্যন্ত দবিদ্র ছিল। দবিদ্র ব্যক্তি সর্ব্বদা ধনীর গৃহে বেড়াইতে যাইত এবং সে তাহার গরীব বন্ধুকে যত্নপূর্ব্বক ভোজন করাইত। একদিন দবিদ্র ব্যক্তি ধনীকে বলিল—"দেখ ভাই, আমি সর্ব্বদা তোমাব বাড়ীতে আসি, তুমি ত' একবারও আমাব গৃহে আস না। ধনী বলিল,—ঠিক্ কথা, আমি ভাই বড়ই অভদ্রতা কবিয়াছি। কি কবি, অনেক কাজ, একেবারে সময নাই। আচ্ছা, এই সপ্তাহে তোমাব বাড়ী বেড়াইতে যাইব।"

ধনী দরিদ্রের বাড়ী বেড়াইতে আসিলে, সে তাহার স্ত্রীর কানে কানে বলিল,—"যাও, শীঘ্র কোথাও হইতে চাবিটি চাউল ও কিছু খাদ্য দ্রব্য ধার করিয়া আন, বন্ধুকে ত খাওয়াইতে হইবে।" স্ত্রী বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়াও কোথাও চাউল সংগ্রহ করিতে পারিল না, কাজেই কিছুকাল পরে সে বিষণ্ণমুখে গৃহে ফিরিয়া আসিল। তখন দরিদ্র ব্যক্তি নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া বলিল,—"হায়রে, আমি চিরদিন বন্ধুব গৃহে ভোজন করিয়া থাকি, কিন্তু একদিন মাত্র তিনি আমার বাটীতে আসিলেন তথাপি তাঁহাকে কিছু খাওয়াইতে পারিলাম না। তবে আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ"—এই বলিয়া সে হৃদয়ে ছুরিকা বিদ্ধ করিযা মরিয়া গেল। তাহার স্ত্রী ইহা দেখিয়া বলিল,—"স্বামী যদি গেলেন, তবে আর আমার বাঁচিয়া কি ফল?" তৎপরে সেই ছুরি লইযা সে আপনার জীবন বিনাশ করিল। ধনী-ব্যক্তি এই সকল প্রত্যক্ষ করিয়া মনে করিল—আমাকে খাওয়াইতে না পাবিয়া আমার এই প্রিয় বন্ধু সপরিবারে মরিয়া গেলেন। তবে আমি হতভাগা কেন আর জীবন ধারণ করি?" সেও ঐ ছুরিকা হৃদয়ে বিদ্ধ করিয়া তাহাদের অনুসরণ করিল।

একদিন রাত্রে এক চোর সেই গ্রামের কোথাও চুরি করিতে না পারিয়া ঐ গৃহ নির্জ্জন দেখিয়া তথায় প্রবেশ করিল। শীতে কাতর ছিল বলিয়া

অগ্নি জ্বালিল এবং তিনজনের মৃতদেহ দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। কিরূপে তাহাদের মৃত্যু হইল ইহা চিন্তা করিতে করিতে এবং ক্লান্ত ছিল বলিয়া অগ্নির উত্তাপে ঘুমাইয়া পড়িল। যখন জাগিল তখন দেখে যে অনেক বেলা হইয়া গিয়াছে। ভাবিল যে—"এখন পলাইতে চেষ্টা করিলে লোকে আমাকে চোর বলিয়া ধরিবে এবং ইহাদিগকে মারিয়াছি বলিয়া বিশ্বাস করিবে। এরূপে অপমানিত হওয়া অপেক্ষা নিজের হাতে মরাই ভাল," এই মনে করিয়া সেও ছুরি দ্বারা আপনার প্রাণ নষ্ট করিল।

পরমেশ্বর উপর হইতে সকল দেখিলেন এবং বলিলেন,—"এরূপ হওয়া কখনই উচিত নহে। দরিদ্র লোকে খাদ্যদ্রব্য দিয়া কাহারও অভ্যর্থনা করিতে পারিবে না। আমি অন্যরূপ জিনিস সৃষ্টি করিতেছি।" এই বলিয়া তিনি ধনীব্যক্তিকে গুপারি, দরিদ্রকে পান, তাহার স্ত্রীকে চূণ এবং চোরকে দোক্তা তামাকে পরিবর্ত্তিত করিলেন। তদবধি পান দিয়া অভ্যাগতদিগকে অভ্যর্থনা করিবার রীতি প্রচলিত হইয়াছে। ধনী ব্যক্তি একাকী ছিল বলিয়া লোকে সর্ব্বাগ্রে গুপারির টুকরা মুখে দিয়া থাকে, দরিদ্র এবং তাহার স্ত্রী একত্রে ছিল বলিয়া পানে চূণ লাগাইয়া খাইয়া থাকে এবং চোর সর্ব্বশেষে আসিয়াছিল বলিয়া লোকে সকলের শেষে দোক্তা আহার করে।

আই-ঈ-আই গাছের গল্প

শিলংয়ের আট দশ মাইল পশ্চিমে একটি পর্ব্বতমালা আছে। এই পর্ব্বতমালা খাসিয়া উপত্যকায় বিখ্যাত। এই পর্ব্বতমালার নাম আই-ঈ-আই এর পাহাড। পাহাড়ে ঢালুর উপর ছোট ছোট গ্রাম ও কর্ষিত ক্ষেত্রগুলি দূর হইতে অতি সুন্দর দেখায়। নিম্নে ইউসিয়ান বহিয়া চলিয়াছে। সূর্য্যের কিরণ পড়িয়া স্বচ্ছ জল রূপার মত দেখাইতেছে। বৃক্ষের ছায়া পড়িয়া তাহাকে আরও সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে।

সেখানকার লোকেরা বলে, যে এই ভূভাগ পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা উর্ব্বর। এখানে বৃহৎ বৃহৎ বন। এই বনের গাছ হইতে উৎকৃষ্ট কাঠ পাওয়া যায়, দেখিতেও বনগুলি সুন্দর। আকাশ হইতে পরীরা আসিয়া এখানে খেলা করে। পুরাকালে অপরূপ বর্ণের পাখীরা এখানে সুরভি পুষ্পের দলের মধ্যে বাসা করিয়া থাকিত।

পাহাড়ের উপরে একটা গাছ জন্মিয়াছিল। এই গাছের নামই আই-ঈ-আই গাছ। প্রকাণ্ড গাছ, বনের অন্যান্য গাছ ইহার কাছে শিশু বলিলেই হয়। মানুষে এ গাছ পূর্ব্বে কখনও দেখে নাই। গাছে ডালপালা পাতা এত, যে তাহা ভেদ করিয়া নীচে সূর্য্যের আলো প্রবেশ করিতে পারে না। গাছের তলায় কিছুই জন্মিতে পারিত না।

এই গাছের কথা সর্ব্বত্র রটিয়া গেল। অনেক দূর হইতে বহুলোক গাছ দেখিতে আসিতে লাগিল। কিন্তু কেহই সাহস করিয়া ইহার গায়ে আঁচড়ও দিতে পারিল না, কারণ সকলেরই ধ্রুব বিশ্বাস, এখানে কোনও দেব দৈত্যের বাস। ঐরূপ করিলে তাঁহার বিরক্তি উৎপন্ন হইবে এবং যে তাহা করিবে, সে সবংশে নির্ম্মূল হইবে।

দিন যায়, মাস যায়, বৎসর যায়, গাছ বাড়িয়া চলে ও যতদূর যায়, ততদূরের গাছ পালা মরিয়া যায়, সেখানে কিছু জন্মে না। কি করা যায়, ব্যাপার ক্রমশঃই ভয়ানক হইয়া দাঁড়াইতে লাগিল, গাছ পৃথিবী ব্যাপিয়া ফেলিতে লাগিল, মানুষ ঘর-বাড়ী উঠাইয়া কোথায় যায়! চাষবাসই বা করে কোথায়? সমস্ত স্থান জঙ্গলে ভরিয়া গেল, তাহার মধ্যে বাঘ ভালুক বাস করিতে লাগিল, পাহাড়ের গুহায় গুহায় দৈত্যেরা বাস করিতে লাগিল।

মানুষের এক দরবার বসিয়া গেল। কি উপায়ে ইহার হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়? বহুক্ষণ ধরিয়া বাক্ বিতণ্ডা, যুক্তি পরামর্শ চলিল। অবশেষে ঠিক্ হইল, একজন সাহসী বলবান লোক যাইয়া গাছ কাটিয়া ফেলিবে, সূর্য্যের আলো পাইয়া ভূমি আবার উর্ব্বরা হইবে, মানুষ পুনরায় নির্ব্বিবাদে বাস করিতে পারিবে। একদল কর্ম্মঠ কাঠুরিয়া শাণিত কুঠার লইয়া বনে প্রবেশ করিল।

তাহারা আই-ঈ-আই গাছের কাছে যাইয়া সকলে এক এক খানা কুড়াল লইল। কতকগুলি ধারাল কুঠার তাহাদের সঙ্গে ছিল। সেগুলি তাহারা একস্থানে রাখিল, কারণ হাতের কুঠারের

ধার কমিয়া গেলে এ কুঠার লওয়া চলিবে। সারাদিন কাজ করিয়াও তাহারা গাছ কাটিয়া ফেলিতে পারিল না। এত কঠিন সে গাছ। গাছের ছাল একটু মাত্র কাটিতে সমর্থ হইল। তাহাদের তখন পর্য্যন্ত কোনও অনিষ্ট হইল না দেখিয়া তাহারা স্থির করিল অনির্দ্দিষ্ট দেবতা বা দৈত্য তাহাদের উপর অসন্তুষ্ট হন নাই। ইহাতে তাহাদের ভয় কমিয়া গেল, ধৈর্য্য ধরিয়া কাজ করিলে সুবিধা হইবে এই ধারণা তাহাদের হইল। পরদিন প্রভাতে আবার তাহারা গাছ কাটিতে আসিল। আসিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে সকলে বিস্মিত, ভীত ও স্তম্ভিত হইয়া গেল। গতকল্য সারাদিন পরিশ্রম করিয়া তাহারা যতটুকু কাটিতে সমর্থ হইয়াছিল, সে সমুদয় পুনরায় ভরিয়া উঠিয়াছে, কেহ যে কখনও কাটিয়াছিল, তাহার কোনই চিহ্ন নাই। কাঠুরিয়াদের অনেকেই ভয়ে গাছের কাছে অগ্রসর হইতে সাহস পাইল না। কিন্তু কি করিবে, কয়েকজন না হয় মরিবে, কিন্তু মানবকুল ত রক্ষা পাইবে; এই চিন্তা করিয়া তাহারা গাছ কাটিতে আরম্ভ করিল ও পূর্ব্বদিনের মত ছাল ও কাঠের একটুকু কাটা হইতেই রাত্রি হইয়া গেল, পরদিন সকাল বেলায় যাইয়া তাহারা দেখে, গাছের পূর্ব্বাবস্থা, কেহ কোনও দিন যে কাটিয়াছে, তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। কাহারও কোন ক্ষতি না হওয়ায় তাহারা গাছ কাটা চালাইবে ইহা স্থির করিল। কাঠুরিয়ারা প্রতি প্রভাতে যায়, সারাদিন গাছ কাটে, পরিশ্রান্ত হইয়া রাত্রিতে ফিরে, আবার প্রভাতে যাইয়া দেখে, আঈ-ই-আই স্থির দাঁড়াইয়া আছে, তাহার গায়ে কাটার কোন চিহ্ন নাই। শেষে কাঠুরিয়াদের বিরক্তি বোধ হইল, পৃথিবীর কপালে যাহাই থাকুক, ইহা তাহাদের সাধ্যাতীত বিবেচনা করিয়া তাহারা নিরস্ত হইবে স্থির করিল।

একদিন দুঃখিত মনে তাহারা বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছে, এমন সময় ধূসর বর্ণের একটি ক্ষুদ্র পাখী তাহাদের কাছে প্রথমে কিচির মিচির করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। অবশেষে সে কথা কহিল। সে কহিল, যে সে তাহাদের সাহায্যের জন্য আসিয়াছে। তাহাদের কোনও চিন্তা নাই। তাহারা ধৈর্য্যধারণ করিয়া কাজ করিলে কাজ সুসিদ্ধ হইবে। ক্ষুদ্র পাখীর এই বাচালতা দেখিয়া সেই হতাশার মধ্যেও কাঠুরিয়ারা না হাসিয়া থাকিতে পারিলনা। পাখীটি ইহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। সে বলিতে লাগিল,—"তোমরা বুদ্ধিমান, তাহা মানি, কিন্তু বুদ্ধিমানের কার্য্য করিতেছ না। পৃথিবীতে আমার অপেক্ষা ছোট পাখী নাই, কিন্তু সেইজন্য কি জঙ্গলের গুপ্তকথা জানিতে পারি না, ইহাই কি যুক্তিযুক্ত কথা। তোমরাও আই-ঈ-ই গাছ কাটিবার পূর্ব্বে জঙ্গলের গুপ্ততত্ত্ব জানিতে পারিবে।"

এইবার কাঠুরিয়াদের মনে বিশ্বাস হইল। তাহারা উঠিয়া তাহাকে নমস্কার করিয়া কি গুপ্ত কারণে তাহাদের এতদিনের সমবেত চেষ্টা বিফল হইতেছে জানিতে সবিনয়ে প্রার্থনা করিল। এইবার পক্ষী কহিল কোনও অলৌকিক শক্তিতে গাছের কর্ত্তিত অংশ পূরিয়া উঠে না। সেই বৃহৎ ব্যাঘ্র "ইউল্লা" আসিয়া রাত্রিতে কর্ত্তিত অংশ চাটিয়া যায়, তাহাতেই উহা ভরিয়া উঠে। সে এই গাছের ছায়ায় সুখে বাস করে। গাছ যাহাতে বাচে, তাহার সেই চেষ্টা। গাছের ছায়ায় অন্ধকারে শীকার ধরিবারও তাহার খুব সুবিধা।

ইহা শুনিয়া কাঠুরিয়াদের প্রাণে আনন্দ ফিরিয়া আসিল। তাহারা নবীন উৎসাহে আবার গাছ কাটিতে আরম্ভ করিল। রাত্রি হইল। এদিন আর তাহারা ধারাল কুড়ালগুলি ফিরাইয়া লইয়া আসিল না। গাছের চারিদিকে কুড়ালের মুখগুলি বাহিরের দিকে খাড়া করিয়া রাখিয়া গেল। রাত্রি বেলায় ঠিক সময় ব্যাঘ্রপ্রবর আসিয়া চাটিতে কুঠারে তাহার জিহ্বা কাটিয়া ঝর ঝর করিয়া রক্ত পড়িতে আরম্ভ করিল, যন্ত্রণায় কাতর হইয়া সে পলায়ন করিল। তারপর 'ইউল্লা' আর কোনও দিন আই-ঈ-আই চাটিতে আসে নাই। কাঠুরিয়ারা ক্রমে ক্রমে গাছ কাটিয়া ফেলিল। পৃথিবী রক্ষা পাইল। সকলে সূর্য্যের মুখ দেখিয়া বাঁচিল। ধনধান্যে পৃথিবী ভরিয়া উঠিল। সকলেই সুখ শান্তিতে বাস করিতে লাগিল। একটা পাখী সমস্ত পৃথিবী রক্ষা করিল। বুদ্ধিতে যে বড়, সেই বড়, বয়সে কিংবা দেখিতে ছোট বড়তে কিবা আসে যায়।



র‍্যাফ্যায়েলের ম্যাডোনার চিত্র

২৪৮৯ পৃষ্ঠার পর

পৃথিবীর সব চেয়ে বড় চিত্রকর কে ছিলেন, এ কথার উত্তর দেওয়া কঠিন। এ সম্বন্ধে নানা জনের নানা মত। তবে এ কথা সত্য যে র‍্যাফ্যায়েলের নাম চিরদিনই পৃথিবীর একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকর হিসাবে অমর হইয়া থাকিবে। র‍্যাফ্যায়েল স্যানজিয়ো (Rapheal Sanzio) ১৪৮৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫২০ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি পেরিওজিনির (Perugino) নিকট প্রথম জীবনে শিক্ষালাভ করেন। দোনাতেলো (Donatello), মাইকেল এঞ্জেলো (Michael Angelo) এবং লেওনার্দো (Leonardo) প্রভৃতি চিত্রকরেরা তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন এবং র‍্যাফ্যায়েলকে পৃথিবীর সব দেশের চিত্রকরেরাই চিত্রগুরু আখ্যা দিয়া আসিতেছেন। তাঁহার চিত্রিত ম্যাডোনা বা মাতৃমূর্ত্তি সে সময়ে ইউরোপের ইতিহাসে শিল্পের এক নূতন অধ্যায় সৃষ্টি করিয়াছিল। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী মাত্রেই র‍্যাফ্যায়েলের অঙ্কিত ম্যাডোনামূর্ত্তি দেখিয়া ভক্তিতে ও আনন্দে বিভোর হইয়াছেন।

র‍্যাফ্যায়েল ইউরবিনো (Urbino) নামক ইতালির একটি বড় সহরে গুড্‌ফ্রাইডের দিনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা গিয়োভানি স্যানজিয়ো (Giovanni Sanzio) একজন চিত্রকর ছিলেন। চিত্র-শিল্পী হিসাবে তাঁহার খ্যাতি যতটা থাকুক না থাকুক, তিনি বেশ বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন, তিনি ছেলে মেয়েদের মানুষ করিয়া তুলিবার জন্য বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন। এবং র‍্যাফ্যায়েলকে ছেলে-বেলাতেই চিত্রাঙ্কন বিষয়ে শিক্ষা দিয়াছিলেন। পিতা, পুত্রের প্রতিভার পরিচয় পাইয়া তাহাকে সে সময়কার প্রসিদ্ধ চিত্র-শিল্পী পেরিউজিনোর নিকট পাঠাইয়াছিলেন। এইরূপে র‍্যাফ্যায়েলের প্রথম শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছিল। এবং ক্রমশঃ তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন।

শিল্পী ও শিল্পসমালোচক শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বলেন—মধ্যযুগে ইতালীতে যে ধর্ম্ম-ভাবের প্রবল তরঙ্গ বহিয়াছিল, সাময়িক শিল্পিগণের চিত্রপটে তাহার আঘাত চিহ্ন অদ্যাপি বিদ্যমান আছে।

সাধারণতঃ র‍্যাফ্যায়েল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী বলিয়াই খ্যাত বটেন, কিন্তু ঐ যুগের অন্যান্য শিল্পীর চিত্রের সহিত ইঁহার পটের তুলনা করিলে ইঁহার গৌরব কিঞ্চিৎ হ্রস্ব হইয়া যায়। তাঁহার সময়ের সকল চিত্রকরই অনেক ধর্ম্মবিষয়ক চিত্র, অনেক ম্যাডোনা

মূর্ত্তি রচনা করিয়াছেন, কিন্তু সেগুলি র‍্যাফ্যায়েলের চিত্রাবলীর ন্যায় শ্রেষ্ঠ নহে। তাঁহার পূর্ব্বের শিল্পিগণ যে ভাবে অঙ্কিত করিয়াছিলেন, র‍্যাফ্যায়েলের চিত্রে সেই একই ভাব অভিন্ন ভাবে বর্ত্তমান। কেবল যাহা প্রচ্ছন্ন ভাবে ছিল, তাহা র‍্যাফ্যায়েলে পরিস্ফুট হইয়াছে। যাহা বীজরূপে ছিল, র‍্যাফ্যায়েলে তাহাই ফলফুলে সুশোভিত হইয়াছে।



মাতৃমূর্ত্তি—প্রথম চিত্র

র‍্যাফ্যায়েলের রচিত ম্যাডোনার চিত্রগুলির ভিত্তি হইতেছে ধর্ম্মবিশ্বাস। ঈশা বা যীশুর জননী ম্যাডোনার আরাধনা পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে দেখা

যায়। কথিত আছে যে সাধু লুক্ ইহার প্রথম প্রবর্ত্তন করেন। মধ্যযুগে ইতালীর চিত্রকর সিমাবু্য মাতৃমূর্ত্তির নূতন কল্পনায় যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন। ক্রমে র‍্যাফ্যায়েলের তুলিকার প্রভাবে ইহার তাহাতে মানবের অবয়ব সত্ত্বেও দেবত্ব বজায় আছে। মুখে কোমলতা অধিক, কমনীয়তা অধিক।

র‍্যাফ্যায়েলের চিত্রের প্রধান গুণ হইতেছে তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণতা। তাঁহার ম্যাডোনা মূর্ত্তির



দ্বিতীয় চিত্র—মাতৃমূর্ত্তি

শ্রেষ্ঠ পরিপুষ্টি হয়। সিমাবু্য যে ম্যাডোনা চিত্রিত করিলেন, তাহা এক নূতন ভাবে অনুপ্রাণিত। ক্রমোন্নতি অনুসারে তিনটি ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। প্রথম বিভাগ পেরিউজিনো নগরে আবাস

কাল। এই সময়ে তিনি শিক্ষানবিশী ছাড়িয়া মৌলিক রচনার প্রথম উদ্যমে ব্যস্ত। এই সময়ের ম্যাডোনা মূর্ত্তি (Peruginoesque madonna) বা পেরিউজিনোর অনুকারিণী মাতৃমূর্ত্তি বলিয়া পরিচিত। দ্বিতীয় বিভাগ, ফ্লোরেন্সে অবস্থান কাল। এই সময়ে র‍্যাফ্যায়েলের স্ফূর্ত্তিও স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য হয়। এ সময়কার চিত্রাবলীর নাম ফ্লোরেন্সীয় ম্যাডোনা। তৃতীয় বিভাগে, পোপের অনুগ্রহে র‍্যাফেএল রোম নগরীতে স্থায়ী বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই সময়ে চিত্রিত মূর্ত্তির নাম রোমীয় ম্যাডোনা দেওয়া হইয়াছে।

পূর্ব্বকার সেণ্টপীটার্সবর্গের বর্ত্তমান লেনেন্‌গ্রেডের চিত্রশালায় রক্ষিত র‍্যাফ্যায়েলের মাতৃমূর্ত্তি রচনার প্রথম আয়াস বলিয়া গণ্য ও সেইজন্য অধিক আদরের সামগ্রী। চিত্রটি তাঁহার শিক্ষাগুরু পেরিউজিনোর চিত্রের অনুকরণ। ১৫০৪ খৃষ্টাব্দে র‍্যাফ্যায়েল ফ্লোরেন্সে গমন করেন। এই সময়ে ফ্লোরেন্স ইতালীর সকল শিল্পের জন্মস্থান, শ্রেষ্ঠ চিত্রকর ও ভাস্করগণের কেন্দ্রস্থল। সুতরাং মাইকেল এঞ্জেলো, লেনার্দো প্রভৃতির চিত্রকলা র‍্যাফ্যায়েলের প্রতিভার উপর ছায়া নিক্ষেপ করিল।

র‍্যাফ্যায়েলের অঙ্কিত ম্যাডোনা গ্রান্দুকা, সিষ্টিন ম্যাডোনা ও ম্যাডোনা দিফলিনো এই তিনটি চিত্রই বিশেষ বিখ্যাত। এখানে চিত্রের পরিচয় দিতেছি।

মাতৃমূর্ত্তি—প্রথম চিত্র

এই চিত্রখানি La Belle Jardiniere নামে বিখ্যাত। সুন্দর শ্যামল মাঠ। ফুলেরা ফুটিয়া হাসিতেছে। যীশু-জননী শিশু যীশুর দিকে সস্নেহ নয়নে চাহিয়া রহিয়াছেন। দেবশিশু যীশু, জননীর জানুর উপর ঈষৎ হেলিয়া মায়ের মুখের দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে চাহিতেছেন। সে দৃষ্টিতে শত মাধুর্য্য সে দৃষ্টিতে শত সৌন্দর্য্য ফুটিয়া আছে। সেণ্ট জন্‌ (St. John) তাহার ক্রুশের উপর ভর রাখিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া সঙ্গী যীশুর দিকে প্রশংসমান দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিতেছেন। একটি উপলবহুলা নদী আঁকিয়া বাঁকিয়া বহিয়া চলিয়াছে। দূরে গিরিশ্রেণী—আরও দূরে একটি সহর দেখা যাইতেছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতুলনীয়। মাঠটিও সমতল নহে। ঢেউয়ের মত উচু নীচু। এখানে ওখানে বিক্ষিপ্ত শিলা রাশি। যীশু জননীও শিলাখণ্ডের উপর বসিয়া আছেন। জননীর মুখে পবিত্রতা, স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি দেবীর ন্যায় প্রতিভাত। অনেকে বলেন যে র‍্যাফ্যায়েল রোম নগরীতে আসিবার পূর্ব্বে সিয়েনার (Sienna) একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির জন্য এই চিত্রখানি অঙ্কিত করিয়াছিলেন। এই বিখ্যাত চিত্রখানি ফ্র্যান্সিস নামে একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক (প্রথম) ক্রয় করিয়াছিলেন। প্যারি নগরীর Louvre চিশালায় এ ছবিখানা রক্ষিত আছে।

দ্বিতীয় চিত্র—মাতৃমূর্ত্তি

এই ম্যাডোনা বা মাতৃমূর্ত্তি The Madonna with the GoldFinch নামে পরিচিত। যীশু-জননী শ্যামল শষ্পাবৃত মাঠে বসিয়াছেন, বাম হাতে একখানি পুস্তক। পুস্তকখানি খোলা। আর মাতৃ-হৃদয়ের পরিপূর্ণ স্নেহদৃষ্টিতে সেণ্ট (St. Joun) জনের দিকে চাহিয়া আছেন। সেণ্ট জন্‌ শিশু যীশুকে একটি GoldFinch (সমুজ্জ্বল বর্ণ গায়ক পক্ষীবিশেষ) পাখী দেখাইতেছেন। যীশু মায়ের হাঁটুর উপর নত হইয়া পাখীটিকে আদর করিতেছেন। ১৫৪৭ খৃষ্টাব্দে এই বিখ্যাত চিত্রখানি নষ্ট হইয়াছিল—পরে উহার সংস্কার করা হইয়াছে।

র‍্যাফ্যায়েল মাতৃমূর্ত্তি অঙ্কিত করিবার সঙ্গে সঙ্গেই বিশেষ যশস্বী হইয়া পড়িতেছিলেন। এ সময়ে সিয়েনা নগরীর ধর্ম্মমন্দির সংলগ্ন লাইব্রেরীর প্রাচীর ও ছাত ইত্যাদি চিত্রিত করিবার জন্য তৃতীয় পোপ পিয়াস (Pope Pius III) বার্ণারদিনো পিণ্টু-রিকিয়ো (Bernardino Pinturichio) নামে একজন চিত্রকরের উপর ভার দিয়াছিলেন। বার্ণারদিনো, র‍্যাফ্যায়েলের প্রতিভার পরিচয় পাইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে তাঁহার সহকারীরূপে নিযুক্ত করেন। এইখানে র‍্যাফ্যায়েল অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। কয়েকটি ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কিত করিয়া সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। ইহাতে সিয়েনোর শিল্পানুরাগী ব্যক্তিগণের দৃষ্টি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইল। সেখানকার ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা তাঁহাকে ভালবাসিতে ও শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন।



মানুষের দুই পাটি দাঁত কেন ?

২৮০০ পৃষ্ঠার পর

জন্তু জানোয়ারের দাতের সংখ্যা বাড়িতে থাকে কিন্তু মানুষের দুই পাটির বেশী দাঁত হয় না, তাহার কারণ মানুষ নরম জিনিষ খায়। এজন্য প্রকৃতি মানুষের জন্য দুই পাটি দাঁতের ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রথমে ছেলেবেলায় দুধে দাঁত ঐ দাঁত হয় মাত্র কুড়িটি, ক্রমশঃ আমরা যেমন বড় হইতে থাকি, আমাদের চোয়াল ও বাড়িয়া যায় তখন আমাদের দাঁতের সংখ্যাও বাড়ে, তখন দুই পাটিতে বত্রিশটি দাঁত হয়।

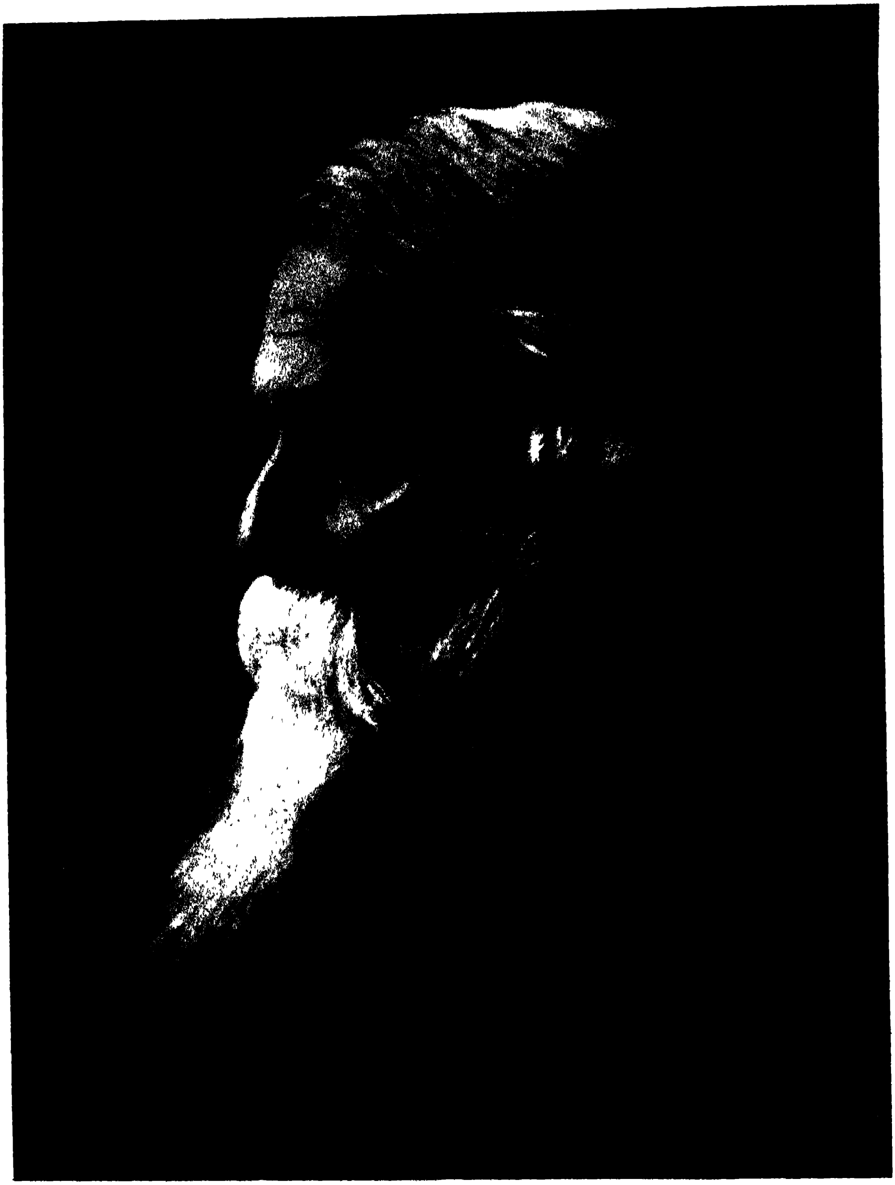
সব চেয়ে পুরাণো সংবাদপত্র কোন্‌টি ?

সে প্রায় দেড়হাজার বৎসর আগে চীনদেশের রাজধানী পিকিং হইতে হাতের লেখা একখানা খবরের কাগজ বাহির হইত, সে কাগজখানার নাম ছিল **সাংপাও** (Tsung Pao) বা **পিকিং-সংবাদ**। এই কাগজখানা এখনও বাঁচিয়া আছে, তবে অবশ্য এর অনেক কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পরিবর্ত্তন যে হইবে সে ত স্বাভাবিকই। **'সাংপাও'**ই পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা পুরাণ কাগজ বলিয়া সম্মান পাইবার যোগ্য।

মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে ইংল্যাণ্ডে ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে ডেনিয়েল ডিফো (Daniel Defo) 'The Review' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। প্রথমে এই কাগজখানি সাপ্তাহিক ছিল, পরে প্রতি সপ্তাহে তিনবার করিয়া প্রকাশিত হইত। ১৭১২ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন হইতে বারোখানি সংবাদপত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। ইংল্যাণ্ডে সব চেয়ে পুরাণো সংবাদপত্র হইতেছে The Morning Post, এ কাগজখানা ১৭৭২ সাল হইতে প্রথম প্রকাশিত হইতেছে। জন্ ওয়ালটার (John Walter) নামে একজন ভদ্রলোক ১৭৮৫ সালে The Times কাগজখানি প্রথম বাহির করেন, তখন উহার নাম ছিল—The London Daily Universal Register.

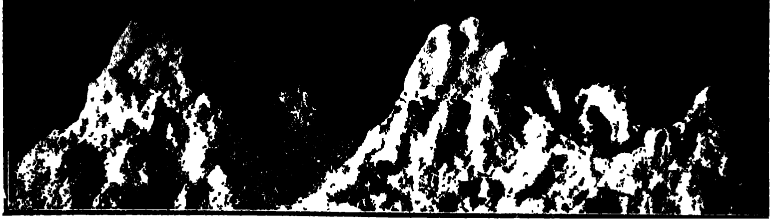
নখের উপর শাদা দাগ হয় কেন ?

কোনও পীড়ার পর নখের উপরে শাদা শাদা দাগ দেখা যায়। এইরূপ দাগ হয় কেন ? ইহার উত্তর অতি সহজ। মানুষের শরীরে রক্তের অভাব হইলেই এইরূপ হয়। নখের কোষ মধ্যে রক্ত চলাচলের অভাবেই এইরূপ হয়। যাহাদের শরীরে রক্তের অল্পতা এবং বিশুদ্ধ রক্তের অভাব তাহাদের নখের গায়েই ঐরূপ শাদা শাদা দাগ দেখা যায়।



শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আকাশের কথা



শুক্র

২৬৭৮ পৃষ্ঠার পর

বুধগ্রহের কথা তোমরা (২৬৭৬ পৃষ্ঠা) পড়িয়াছ। এইবার শুক্র গ্রহের কথা বলিব। বৎসরের কোন কোন সময়ে পশ্চিম আকাশের দিকে যদি লক্ষ্য কর, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে সূর্য্য অস্ত যাইবার একটু পরেই, সন্ধ্যাকালে পশ্চিমাকাশে একটি তারাকে সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকে সন্ধ্যাতারা বা সাঁজের তারা বলে। যখন ইহার জ্যোতিঃ অত্যন্ত দীপ্তিমান্ হইয়া উঠে তখন এই তারাটিকে সূর্য্য অস্ত যাইবার অনেক পূর্ব্বে সময় সময় খালি চোখেও দেখিতে পাওয়া যায়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমরা বেলা দুই তিনটার সময়ও আকাশে খালি চোখে এই সন্ধ্যা-তারাটিকে দেখিতে পাইয়াছি।

আবার কোন কোন সময় একটি উজ্জ্বল তারাকে সূর্য্যোদয়ের একটু আগে পূর্ব্ব গগনে দীপ্তি পাইতে দেখা যায়। ইহাকে বলে শুকতারা, প্রভাতীতারা বা পোয়াতি-তারা। এই 'শুকতারা' ও 'সন্ধ্যাতারা' উভয়েই এক। আমাদের দেশের কবিরা এবং বিদেশী কবিরা অনেকে প্রভাতীতারা এবং সন্ধ্যাতারার উপর সুন্দর সুন্দর কবিতা লিখিয়াছেন। শুকতারা এবং সন্ধ্যাতারাই হইতেছে **শুক্রগ্রহ**। শুক্রগ্রহের ইংরাজি নাম ভিনাস্ (Venus)। বুধের সূর্য্য হইতে দূরত্ব আনুমানিক ৩,৫৯,৫৮,০০০ মাইল। শুক্রের সূর্য্য হইতে গড় দূরত্ব ৬,৭১,৯০,০০০ মাইল। ইহার ব্যাস ৭৪৮০ মাইল এবং আয়তন ও আকার, পৃথিবীর ২৫ ভাগের ২১ ভাগ। বুধগ্রহের পরে শুক্রের ভ্রমণ-পথ। তারপরেই আমাদের পৃথিবীর ভ্রমণ পথ। কাজেই শুক্র গ্রহটি পৃথিবীর খুব কাছেই রহিয়াছে। শুক্র গ্রহের গতি আছে এবং তাহা সূর্য্যের কাছে থাকিয়া কখনো সূর্য্যের আগে চলে, এবং কখনো বা সূর্য্যের পশ্চাতে যায়। যখন সূর্য্যের আগে চলে, তখন তাহা সূর্য্যের আগে উদয় হয়। এজন্য তাহাকে প্রভাতীতারা

বলে। কোন কোন সময় আবার শুকতারাকে সূর্য্যোদয়ের কিয়ৎকাল পরেও আকাশে দেখিতে পাওয়া যায়। তোমরা এ কথাটা বিশেষ ভাবেই জান যে পূর্ব্বাহ্নে ও অপরাহ্নে সূর্য্যের তেজ মধ্যাহ্নের ন্যায় প্রখর হয় না। এজন্য সূর্য্যোদয়ের পরে ও সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে কিছুক্ষণ সূর্য্যালোকের ক্ষীণতা হেতু শুক্র-গ্রহ দিবালোকেও দেখিতে পাওয়া যায়।

শুক্র সময় সময় ঘুরিতে ঘুরিতে পৃথিবী হইতে মাত্র আড়াইকোটি মাইল দূরে আসিয়া উপস্থিত হয়। ঐ সময়ে পৃথিবী হইতে শুক্রের দূরত্ব কতটা তাহা বুঝাইয়া বলিতেছি। চাঁদ পৃথিবী হইতে যত দূরে, শুক্র তখন তাহা অপেক্ষা পৃথিবী হইতে এক শত গুণ দূরে থাকে। জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতেরা শুক্র গ্রহ অন্যান্য গ্রহের তুলনায়, পৃথিবীর এত কাছে আছে বলিয়াই ইহার সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারিয়াছেন।

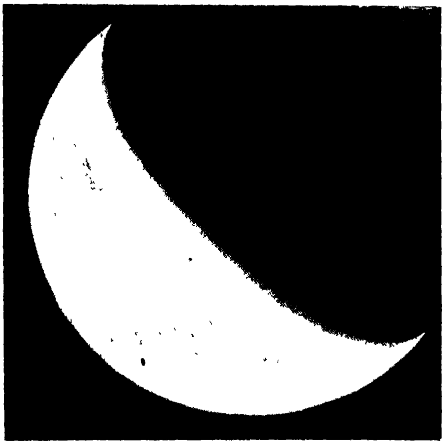
আমাদের দেশে প্রাচীন কালে জ্যোতিষী পণ্ডিতেরা শুক্রের সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতেন, এজন্যই আমরা পুরাণে শুক্রের সম্বন্ধে অনেক সুন্দর সুন্দর গল্প জানিতে পারি। "হরিবংশে" শুক্রের জন্ম সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। নবগ্রহ স্তোত্রে শুক্রের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, 'হিমকুন্দ মৃণালাভ্যাং দৈত্যানাং পরমংগুরু'! বোধ হয় তাঁহারা শুক্র গ্রহের উজ্জ্বল রজত দীপ্তি দেখিয়াই উহাকে হিমকুন্দ মৃণালাভ্যাং বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছিলেন।

পৃথিবী ও শুক্র আকারে ও গঠনে ঠিক যেন দু'টি যমজ বোন। পৃথিবী আকারে শুক্র অপেক্ষা সামান্য একটু বড়। কিন্তু আকারে ও গঠনে অনেকটা একরূপ হইলেও ইহাদের মধ্যে অন্যান্য বিষয়ে বড় বেশী ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায় না। পৃথিবীর চাঁদ আছে, উহা পৃথিবীর একটী উপগ্রহ, কিন্তু শুক্রের কোন চাঁদ আছে বলিয়া আজ পর্য্যন্তও পণ্ডিতেরা কোন সন্ধান পান নাই। সকল গ্রহেরই যে উপগ্রহ আছে, তাহা নহে এবং যে সকল গ্রহের উপগ্রহ আছে, তাহার উপগ্রহের সংখ্যাও যে সমান কিংবা কোন একটা বিধান অনুযায়ী আছে তাহাও বলা চলে না। পৃথিবীর ১, মঙ্গলের ২, বৃহস্পতির ৬, শনির ৮ এইরূপ উপগ্রহ রহিয়াছে। চন্দ্র ছাড়া আর কোন উপগ্রহ-ই খালি চোখে দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহাদের দেখিতে হইলে দূরবীক্ষণের প্রয়োজন হয়। প্রাচীন কালের লোকেরা ত আর দূরবীক্ষণ কি জানিতেন না, এজন্য তাহারা উপগ্রহের সন্ধানও জানিতেন না। আমাদের পৃথিবীর সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতে ৩৬৫ দিন সময় লাগে, কিন্তু শুক্র গ্রহ কেবল সাড়ে সাত মাসে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। কাজেই আমাদের পৃথিবীর ২২৫ দিনে শুক্র সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে।

তারপর আর একটি বিষয়েও শুক্রের সহিত পৃথিবীর মিল নাই। আমাদের পৃথিবী তাহার মেরুদণ্ডের চারিদিকে চব্বিশ ঘণ্টা ঘুরিয়া দিনের পর দিন এবং রাতের পর রাত সৃষ্টি করিয়া আসিতেছে, কিন্তু বুধ গ্রহের মত শুক্রের একটা দিক বা পৃষ্ঠ সূর্য্যের দিকে মুক্ত। সেখানে সূর্য্যের আলো পড়িতেছে কিন্তু অপর পৃষ্ঠে সূর্য্যের আলোক পড়ে না। কাজেই সে দিকটা চির অন্ধকারে ঢাকা, সেখানে চির রাত্রিই জাগিয়া আছে। এজন্যই কি পুরাণকারেরা শুক্রকে 'কাণা শুক্র' করিয়া কাহিনী রচনা করিয়া গিয়াছেন? বুধের ভ্রমণপথের মত শুক্রের ভ্রমণ পথ পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যে অবস্থিত বলিয়া শুক্রের ক্ষয় - বৃদ্ধি হইয়া থাকে। খালি

চোখে শুক্রের এই হ্রাস বৃদ্ধি বুঝিতে পারা যায় না কিন্তু যদি তোমরা দূরবীক্ষণ দিয়া শুক্রকে একবার দেখিয়া লও তাহা হইলে শুক্রের কলার হ্রাস ও বৃদ্ধি দেখিতে পাইবে।

শুক্রের উজ্জ্বলতা যে খুব বেশী তাহা তো তোমরা প্রত্যহই দেখিয়া আসিতেছ। বড় বড় জ্যোতিষেরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন আমরা আকাশে যে সকল খুব উজ্জ্বল নক্ষত্র



শুক্রের কলা

দেখিতে পাই, তাহাদের অন্ততঃ কুড়ি পঁচিশটার ঔজ্জ্বল্য এক করিতে পারিলে শুক্রের উজ্জ্বলতার সমান হইতে পারে। এখন কথা হইতেছে, শুক্রের এত উজ্জ্বলতা কোথা হইতে আসিল? বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, শুক্রের আকাশে বাতাস আছে এবং সেই বাতাসে মেঘ ভাসিয়া যাইতেছে। সেই সাদা মেঘের উপর সূর্য্যের আলো পড়িয়াই শুক্রের এইরূপ দীপ্তিমান্ রূপ হইয়াছে। (How is it that she is so bright? Well strange to say, it is probably because she is always wrapped in thick clouds.) এ বিষয় অবশ্য জ্যোতিষীদের মধ্যে বিভিন্ন রূপ মত ও দেখিতে পাওয়া যায়।

আচ্ছা বল দেখি, শুক্র গ্রহে কি জীব থাকিবার সম্ভাবনা আছে? কোন কোন বৈজ্ঞানিকের মতে, পৃথিবী ভিন্ন অন্য কোন গ্রহ, যদি প্রাণী থাকা সম্ভব হয় তবে মঙ্গল গ্রহ ও শুক্র গ্রহেই জীবের বাসের সম্ভাবনা বেশী। বৈজ্ঞানিক F. W. Hensel বলেন ইতালী প্রভৃতি স্থান হইতে দূরবীক্ষণের সাহায্যে জল ও স্থলের চিহ্ন শুক্র গ্রহে দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা খালি চোখেই চন্দ্রের কলা (Phase) দেখিতে পাই কিন্তু শুক্রগ্রহের কলা পরিবর্ত্তন খালি চোখে দেখিতে পাওয়া যায় না। দূরবীক্ষণের সাহায্যে ইহা দেখিতে হয়। কলা পরিবর্ত্তনের সময় দূরবীক্ষণ দিয়া দেখিলে মনে হয় গ্রহটির কিনারা বন্ধুর। শুক্র গ্রহে পাহাড়পর্ব্বত আছে বলিয়াই খুব সম্ভব এইরূপ হইয়া থাকে। মাঝে মাঝে এক একটা স্থান মঙ্গল গ্রহে বড়ই উজ্জ্বল বলিয়া মনে হয়। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে সেই স্থানগুলি বরফাবৃত বলিয়াই ঐরূপ হইয়া থাকে। শুক্রগ্রহেও এইরূপ বরফাবৃত স্থানের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। বহুদিন পূর্ব্বে বৈজ্ঞানিক বিয়ানচিনি (Bianchini) ইহা লক্ষ্য করিয়া শুক্র গ্রহের উপরিভাগের একখানি মানচিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সিদ্ধান্তগুলি অনেক জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত কর্ত্তৃক সমর্থিত হইয়াছে।

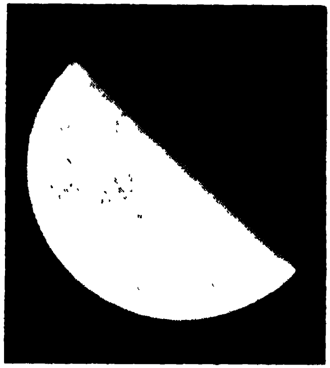
পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা জানা গিয়াছে যে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ন্যায় শুক্রেও বায়ুমণ্ডল আছে। ইহাও স্থির হইয়াছে যে শুক্রের বায়ুমণ্ডল পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের প্রায় দ্বিগুণ।

জ্যোতির্ব্বিদের চোখে শুক্রগ্রহে আর একটি বিষয় ও ধরা পড়িয়াছে। পৃথিবীতে যেমন মেরুপ্রভা (Aurora-Borealis) দেখিতে পাওয়া যায়, শুক্রগ্রহেও তাহা আছে। শুক্র গ্রহের মেরুও সময়ে সময়ে সেই অত্যাশ্চর্য্য আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া দীপ্তিমান হইয়া উঠে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে পৃথিবীর উপগ্রহ চন্দ্রের ন্যায় শুক্রগ্রহের কোন উপগ্রহ নাই। তবে শুক্র গ্রহে যদি কোন জীব থাকে তাহাদের চন্দ্রের অভাব পৃথিবী হইতেই অনেকটা দূর হইতে পারে। শুক্র গ্রহ ও পৃথিবী যখন পরস্পর নিকটবর্ত্তী হয় তখন শুক্র গ্রহের অন্ধকার দিক্‌টি পৃথিবীর দিকে এবং পৃথিবীর আলোকিত দিকটি শুক্র গ্রহের দিকে ফিরিয়া থাকে। পৃথিবী হইতে আলোক প্রতিফলিত হইয়া শুক্র গ্রহে জ্যোৎস্নার সৃষ্টি করে।

শুক্র গ্রহে সমুদ্র এবং বায়ু আছে এবং সেই বায়ুতে জলীয় বাষ্পও আছে, পরীক্ষায় এ সমস্ত জানা গিয়াছে। গ্রহটি সূর্য্য হইতেও তাপ পাইয়া থাকে। সে তাপ পৃথিবী যাহা পায় তাহা অপেক্ষা বেশী হইলেও শুক্র গ্রহে বরফের সন্ধান পাওয়ায় জানা যাইতেছে যে সে তাপ গ্রহটিকে বাসের অনুপযোগী করিয়া তোলে নাই। শুক্র-গ্রহ যদি আর সকল দিকে পৃথিবীর মতই হয় তাহাতে জীবই বা কেন না থাকিবে? মঙ্গল গ্রহে যেমন জীবসম্ভাবনা আছে বলিয়া জ্যোতির্ব্বিদেরা কল্পনা করেন, তেমনই শুক্র-গ্রহে জীবের বাস সম্ভব বলিয়াও তাঁহারা মনে করিয়া আসিতেছেন। মঙ্গলগ্রহ ও শুক্রগ্রহে যদি বুদ্ধিমান্ জীব থাকে, তবে তাহারাও হয়ত মনে করে পৃথিবীতে কি জীবনিবাসের সম্ভাবনা আছে? এবং এইরূপ ভাবনা করা তাহাদের পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

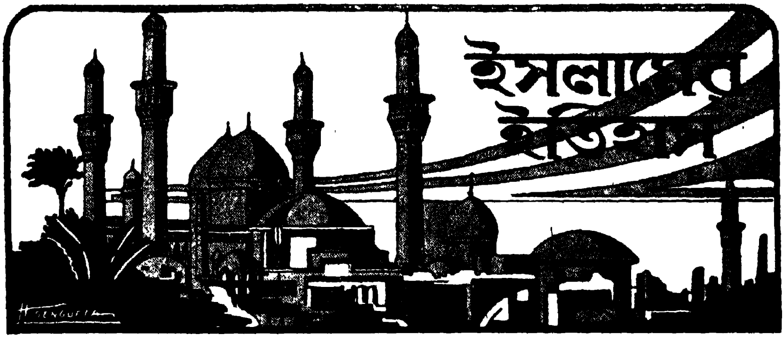
শুক্রগ্রহ ইউরোপীয়দের নিকট নারী রূপে কল্পিত। সৌন্দর্য্যের আদর্শ প্রতিমা। আমাদের পুরাণে শুক্র পুরুষ ও নারী দুই



অর্দ্ধ চন্দ্রাকার শুক্র

রূপেই কল্পিত হইয়াছেন। পুরুষ যেমন— দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য। কনারকের সূর্য্য মন্দিরের মূর্ত্তি মধ্যে শুক্র নারী মূর্ত্তির আকারেও খোদিত রহিয়াছেন।

এমন সময়ও আবার হয় যখন শুক্র ভ্রমণ-পথে ঘুরিতে ঘুরিতে সূর্য্য ও আমাদের এই পৃথিবীর মধ্যে আসিয়া পড়ে, তাহাকে ইংরাজীতে বলে "transits of Venus" বা "শুক্ররবি যুতি।" এ সময়ে শুক্রকে সূর্য্যের দীপ্তিমান্ বুকে এক ক্ষুদ্র কৃষ্ণ বিন্দুর মত দেখায়। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে একবার ইহা ঘটিয়া-ছিল, আবার ২০০৪ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুন হইবে।



কোর্-আন

হজরৎ হুদ

২৮১৪ পৃষ্ঠার পর

হজরৎ নূহের দেহ ত্যাগের পর তাঁহার বংশধরগণ নানা দিকে ছড়াইয়া পড়িলেন। 'এরাম' নামে তাঁহার এক পৌত্র ছিলেন। এরাম প্যালেষ্টাইনের অন্তর্গত লোবান পর্ব্বতের উত্তর দিকস্থ উপত্যকায় বাস করিতেন। ইহার নামানুসারে ঐ স্থানকে পূর্ব্বে এরাম নামে অভিহিত করা হইত। এরামের 'আদ' নামে এক পৌত্র ছিল। এই আদের বংশধরগণ **আদ জাতি** নামে খ্যাত। ইহারা দীর্ঘকায় ও বলিষ্ঠ ছিল। ইহারা পূর্ব্বস্থান ত্যাগ করিয়া বাবিলনের উপর দিয়া আরও দক্ষিণ দিকে, পারস্যোপসাগরের উপকূল বহিয়া অগ্রসর হইয়া আরবের দক্ষিণ উপকূলে **'আলআহকাফে'** (Al-Ahqf) নামক স্থানে বাস করিতে থাকে।

বর্ত্তমান ওমান হইতে হাদ্রামাউথ পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থানটীকেই আলআহকাফ বলা হইত। রাজ্যশাসনে ইহারা বেশ দক্ষ ছিল। শিল্পকার্য্যেও ইহাদের কম খ্যাতি ছিল না ইহারা বৃহৎ ও সুন্দর অট্টালিকায় বাস করিত। ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন ভারতীয় আদিমঅধিবাসীদের সহিত ইহাদের ব্যবসায়-বাণিজ্যের আদান প্রদান চলিত। ভারতবর্ষ হইতে বড় বড় কড়িকাঠ আনাইয়া ইহারা গৃহাদি নির্ম্মাণ করাইয়াছিল। কিন্তু শিল্পকলায় পারদর্শী অর্থ-সম্পদে গর্ব্বীয়ান বা ক্ষমতা বলে বলীয়ান হইলেই তাহাকে সভ্য বলা যায় না। বাইবেলে আছে (God caeated man in His own image "বাস্তবিক এই image অর্থে তাঁহার পার্থিব দেহ বা আকৃতি নহে। তিনি নিরাকার, চিন্ময়, তাহা তোমরা জান। সুতরাং এখানে image অর্থে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট গুণাবলী। বাস্তবিক মানুষের মধ্যে, দয়া, দাক্ষিণ্য, প্রেম, ভক্তি, একতা, ভ্রাতৃত্ব, প্রভৃতি কতকগুলি ঐশ্বরিক গুণ আছে। মানুষ পার্থিব কলাকৌশলে শক্তি সম্পদে বলীয়ান হইলেও এইগুলি গুণের অভাবে তাহাকে মানুষ পদবাচ্য করা যায় না। আদ জাতির মধ্যে ঐ গুণাবলীর একান্ত অভাব হইয়াছিল। অন্যান্য পৌত্তলিক জাতির সংস্রবে আসিয়া ইহারা এক আল্লার উপাসনা ভুলিয়া নানা দেবদেবীর পূজা আরম্ভ করিয়াছিল। **এলাম, বাবিলন** প্রভৃতি স্থান হইতে

ইহারা অনেক প্রতিমূর্ত্তি স্বদেশে আনিয়াছিল। ইহারা মনে করিত বৃষ্টির জন্য একজন, বিপদাপদের জন্য, জীবিকার জন্য একজন, এইরূপ প্রত্যেক বিষয়ের জন্য এক এক পৃথক দেবতা আছেন। তাহারা বৃষ্টির দেবতাকে 'ছাকিয়া' বিপদাপদের দেবতাকে 'হাফিজা' (IIafiga) জীবিকার দেবতাকে 'রাজিকা' এবং রোগশান্তির দেবতাকে 'ছালিমা' বলিত।

হজরৎ ইছার (যীশু খৃষ্ট) জন্মের প্রায় ২৫০০ বৎসর পূর্ব্বে এই আদ বংশে **হজরৎ হুদ আলায়-হেচ্ছালামের** জন্ম হয়, তিনি আল্লার আদেশে এই পথভ্রষ্ট জাতির নিকট ইছলামের সত্যবাণী প্রচার করিলেন। এবং তাহাদিগকে এই সকল কল্পিত দেব দেবীর উপাসনা ছাড়িয়া সমগ্র বিশ্বজগতের সৃষ্টি ও পালনকর্ত্তা এক আল্লার উপাসনা করিতে আহ্বান করিলেন। কেহই তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না। বরং তাঁহাকে নানারূপ বিদ্রূপ ও অত্যাচার করিতে লাগিলেন।

স্বার্থ-ই অনর্থের মূল। কেহ বা জ্ঞানের অভাবে সত্যাসত্য নির্ণয় করিতে অক্ষম হইয়া পূর্ব্বপুরুষদের অনুকরণে অসত্যকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে; আবার কেহ বা লোকলজ্জাভয়ে চিরাচরিত রীতি পরিত্যাগ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন; কেহ বা স্বার্থের দায়ে জেদের বশবর্ত্তী হইয়া নিজের ভ্রান্ত মতকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে। আদ জাতির অবস্থাও তাহাই হইল। আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও হুদের শিক্ষায় আশানুরূপ ফল ফলিল না। সামান্য কয়েকজন মাত্র তাঁহার প্রচারিত ইছলাম কবুল করিল। কিন্তু পৌত্তলিকগণ ইহাতে বিচলিত হইয়া পড়িল। তাহাদেরই ভ্রাতাভগ্নিগণ পিতৃধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া হুদের ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে ইহা তাহাদের সহ্য হইল না সুতরাং স্বার্থের সহিত ধর্ম্মের সংঘর্ষ বাধিল। তাহারা হুদ ও তাঁহার অনুগামিগণের প্রতি নানারূপ অত্যাচার আরম্ভ করিল। 'হুদ' নানারূপে নির্য্যাতিত হইয়া তাঁহার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করিলেন "হে আল্লহ, বহু চেষ্টা করিয়াও আমি আমার জাতিকে তোমার বাঞ্ছিত সরল পথে আনিতে পারিলাম না। তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর।" দৈবাদেশ হইল "হে হুদ, তোমার জাতিকে বল, তাহাদের উপর অচিরে আমার শাস্তি বর্ষিত হইবে।" হুদ তাঁহার জাতির নিকট আল্লার এই সতর্ক-বাণী প্রচার করিলেন, কিন্তু ইহাতে তাহারা তাঁহাকে আরও অধিক বিদ্রূপ করিয়া বলিতে লাগিল "কি হে হুদ, তোমার আল্লাহ কি শাস্তি দিবে শীঘ্র দিতে বল।"

দেশে অনাবৃষ্টি আরম্ভ হইল। একে তাহাদের দেশ মরুময়, তাহাতে আবার ক্রমাগত তিন বৎসর ধরিয়া অনাবৃষ্টিতে দেশে হাহাকার উপস্থিত হইল। হজরৎ হুদ দেশবাসীগণকে বলিলেন, "হে আমার দেশবাসিগণ, তোমাদের উপর আল্লার অভিসম্পাত নামেল হইয়াছে; এখনও যদি আমার বাণী না শুন এখনও যদি তোমাদের কল্পিত দেবদেবীর উপাসনা ছাড়িয়া, সমস্ত বিশ্ব জগতের প্রতিপালক আল্লার উপরে ঈমান না আন, তাঁহার উপাসনা না কর, তাহা হইলে ইহা অপেক্ষাও কঠিনতর শাস্তি নামেল হইবে। হুদের কথায় কেহ কর্ণপাত করিল না।

কাবার ঘর একেশ্বরবাদের বীজক্ষেত্র হইলেও সাময়িক তত্ত্বাবধায়কের অভাবে উহাতে পৌত্তলিকতার আগাছা জন্মিবার যথেষ্ট অবসর পাইয়াছিল। হজরৎ নূহের প্লাবনে কাবার ঘর ভূমিসাৎ হইয়া যায়। তাঁহার বংশধরগণ আর্ম্মেনিয়া হইতে পূর্ব্ব উত্তর ও পশ্চিম দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। দক্ষিণ দিকে কেনান অতিক্রম করিয়া কেহ আর বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই। আবার ওদিকে আরবের মরুভূমির পূর্ব্বপার্শ্বস্থ ইরাক রাজ্যের পশ্চিম সীমা ও অতিক্রম করিবার আবশ্যক হয় নাই। এই নিমিত্ত কাবার ঘরের তত্ত্বাবধানে কেহই মনোযোগ দেয় নাই। বিশেষতঃ তাঁহার তিরোধানের পর তাঁহার বংশধরগণ আবার পৌত্তলিকতার অন্ধকারে ডুবিয়া যায়। সুতরাং কাবার সংস্কার কার্য্যে বহু দিন হইতে কেহই হস্তক্ষেপ করিতে পারে নাই। তথাপি তাহারা পূর্ব্বপুরুষদের আচরণ ভুলিয়া যায় নাই। পূর্ব্বপুরুষদের মত এক আল্লার উপাসনা না করিলেও তাহারা কাবার ঘরকে পবিত্র মন্দির বলিয়াই জানিত; এবং কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তথায় গিয়া তাহাদের দেবতার নিকট প্রার্থনা করিত।

দেশ যখন অনাবৃষ্টিতে উচ্ছন্ন হইবার উপক্রম হইল, তখন আদের বংশের কতিপয় ব্যক্তি মক্কায়

গিয়া বৃষ্টির জন্য তাহাদের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল "হে আমাদের বৃষ্টির দেবতা! হে আমাদের আকাশের দেবতা, আমাদের প্রতি সদয় হও, আমাদের বৃষ্টি দাও।" দেবতার সকাশে এই প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়া তাহারা দেশে ফিরিয়া আসিল।

একদিন হঠাৎ আকাশের উত্তর পশ্চিম কোণে গাঢ় কালমেঘের সূচনা দেখা দিল। সকলেরই মন আজ হর্ষে উৎফুল্ল। বহুদিন পর আজ বৃষ্টিপাত হইবে, আবার দেশ শস্যশ্যামল হইয়া হাসিয়া উঠিবে এই ভাবিয়া আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলেই আনন্দে আপ্লুত হইয়া উঠিল। তাহারা হজরৎ হুদকে বিদ্রূপ করিয়া বলিতে লাগিল, " কি হে হুদ, তুমি না বলিয়াছিলে, আমাদের পূজা পার্ব্বণ, ধর্ম্ম কর্ম্মের জন্য তোমার দেবতা আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া আমাদের উপর এই অনাবৃষ্টিরূপ অভিসম্পাত নামেল করিয়াছে। ঐ দেখ, আমাদের দেবতা বৃষ্টিপাতের জন্য আকাশে মেঘসঞ্চার করিয়াছেন। এখনই বারিপাত হইয়া দেশ শীতল হইবে। তোমার দেবতাই বা কোথায়, তাহার অভিসম্পাতই বা কোথায়?' হজরৎ হুদ বলিলেন, "ওহে দেশ-বাসিগণ, আমার কথা মিথ্যা মনে করিও না। আল্লাহ জগতের সৃষ্টি ও পালনকর্ত্তা ; তিনি তোমাদের জীবন দান করিয়াছেন, তিনিই তাহার রক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারেন ; তিনিই অনাবৃষ্টির মালেক, তিনিই বৃষ্টির মালেক। তোমরা সাবধান হও, নতুবা এখনই মহাশাস্তি নামেল হইবে।" হুদের বাণী শুনিয়া সকলে তাঁহাকে পাগল বলিয়া তাড়াইয়া দিল।

দেখিতে দেখিতে সমস্ত আকাশ ভীষণ কাল মেঘে ঢাকিয়া ফেলিল। আদেরা মনে করিল প্রচুর বারিপাত হইয়া দেশ ভাসিয়া যাইবে। সন্ধ্যা হইয়া আসিল; মেঘ আরও গাঢ় হইয়া শীতল বাতাস বহিতে লাগিল। বহুদিন অনাবৃষ্টিতে দেশ আগুনের মত গরম হইয়াছিল। শীতল বাতাসে দেশ ঠাণ্ডা হইয়া গেল, শরীর জুড়াইল। সকলে পরম সুখে ঘুমাইয়া পড়িল। রাত্রির অন্ধকার ঘনীভূত হইতেই বাতাস ভীষণ আকার ধারণ করিল; ঘর বাড়ী উড়িয়া যাইতে লাগিল। গাছপালা ভাঙ্গিয়া চুরমার হইল; দেশময় এক মহাআতঙ্কের সৃষ্টি হইল। সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইল কিন্তু ঝড়ের বেগ কমিল না। ঘর বাড়ী গাছপালার সহিত কত প্রাণীর জীবন-লীলা সাঙ্গ হইল কে তাহার ইয়ত্তা করে। পরদিনও ঝড় কমিল না। এইরূপে ক্রমাগত সাত দিন ধরিয়া ঝড় প্রবল বেগে বহিল। অষ্টম রাত্রিতে বেগ কিঞ্চিত কমিয়া আসিল। অষ্টম দিন সকাল হইতে প্রকৃতি আবার শান্ত ভাব ধারণ করিল। সাত দিনের প্রবল ঝড়ে দেশের ঘরবাড়ী, গাছপালা, পশুপক্ষী সমস্ত ধ্বংস হইয়া গেল কোথাও জনমানবের চিহ্ন রহিল না।

ঝড়ের প্রারম্ভেই হজরৎ হুদ তাঁহার সঙ্গিগণ লইয়া এক নিভৃত পর্ব্বত গুহায় আশ্রয় লইয়াছিলেন। দেশবাসিগণের মধ্যেও কেহ কেহ পর্ব্বত-গুহায় আশ্রয় লইয়াছিল। ঝড়ের শেষে হুদ ও তাঁহার সঙ্গিগণ পর্ব্বত গুহা হইতে বাহির হইয়া দেখিলেন, জনপদ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে। রাস্তা-ঘাট, বনজঙ্গল আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। অবিশ্বাসিগণের মধ্যে যাহারা পর্ব্বত গুহায় আশ্রয় লইয়া প্রাণে বাঁচিয়াছিল, তাহারা দেশের এবং জাতির দুর্দ্দশা দেখিয়া হুদের আনুগত্য স্বীকার করিল। হজরৎ হুদ তাহাদিগকে বলিলেন "ভ্রাতৃ-গণ, তোমরা আমার উপদেশ না শুনিয়া কল্পিত দেবদেবীর পূজা করিয়াছিলে, এবং তাহাদের নিকট হইতে সাহায্য আশা করিয়াছিলে, কিন্তু এখন বুঝিলে তোমরা মহাভুল করিয়াছ। এই ভুলের জন্য ইহ জীবনে শাস্তিভোগ করিলে, পর জীবনেও ইহা অপেক্ষা ভীষণতর শাস্তিভোগ করিতে হইবে। এখনও সময় আছে "সরল সোজা" পথে চল। ঝড়, বৃষ্টি, মেঘ, বজ্র, ভূমিকম্প, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি রোগ-শোক প্রভৃতির পৃথক দেবতা নাই। এক আল্লাই এই সমস্তের বিধানকর্ত্তা। সুতরাং একমাত্র তাঁহারই উপাসনা করিলে তাঁহারই সাহায্য প্রার্থনা করিলে তাঁহার উপর নির্ভর করিলে মানুষ সকল বিপদ হইতে রক্ষা পায়। অতএব তোমরা এক আল্লার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর ; তিনিই তোমাদিগকে প্রতিপালন করিবেন।" হুদের উপদেশে এইবার তাহাদের জ্ঞানচক্ষু ফুটিল। তাহারা এক আল্লার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া

হজরৎ হুদের সহিত কালাতিপাত করিতে লাগিল।

শাদ্দাদ

আদের বংশে শাদ্দাদ নামে প্রবল পরাক্রান্ত এক রাজা ছিলেন। তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্য। হাতী-ঘোড়া লোক-লস্করের অন্ত ছিল না। মণি-মুক্তা-ভূষিত সুন্দর কারুকার্য্য খচিত বৃহৎ দালান, নানারূপ অস্ত্র-শস্ত্র, প্রভৃতি সম্পদে রাজধানী সুশোভিত এবং শক্তিশালী দুর্গের দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। সুন্দর সুন্দর উপাসনালয়, হাম্মামখানা, রাস্তা-ঘাট প্রভৃতি সভ্য-জনোচিত বহু কীর্ত্তি-কলাপে রাজ্যের সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ ছিল। শাসনকার্য্য বিশেষ দৃঢ়হস্তে পরিচালিত হইত। কিন্তু রাজা অত্যন্ত উৎপীড়ক ও নিষ্ঠুর ছিলেন। শিক্ষার অভাবে দয়া, দাক্ষিণ্য, পরোপকার স্বার্থহীনতা প্রভৃতি মনুষ্যোচিত গুণাবলী তাহাদের মধ্যে অল্পই ছিল। "জোর যার মুলুক তার" ইহাই ছিল নীতি। সুতরাং রাজা, রাজকর্ম্মচারী ও ধনি-ব্যক্তিগণের অত্যাচারে দরিদ্র অবস্থার ব্যক্তিগণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণ দরিদ্র অসহায় ব্যক্তিগণের জীবনকে কীট-পতঙ্গের জীবনের ন্যায় তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন। মহারাজ শাদ্দাদ অত্যন্ত পরাক্রমশালী ছিলেন। বাবিলনের এলাম প্রভৃতি রাজ্যের নৃপতিরা তাঁহার অনুগত মিত্র ছিলেন। অনেকে তাঁহাকে কর পর্য্যন্ত প্রদান করিতেন। তিনি এলাম, বাবিলনীয়া প্রভৃতি স্থান হইতে বহু দেব দেবীর মূর্ত্তি আনিয়া স্বীয় রাজ-ধানীতে রাখিয়াছিলেন। শিল্পকলা বা শাসনাদি কার্য্যে সভ্য হইলেও ধর্ম্মের আলোক তখনও তাঁহাদের মধ্যে প্রবেশ করে নাই। বাবিলন আসি-রীয়া, সিরিয়া, এলাম প্রভৃতি দেশের পৌত্তলিকদের ন্যায় ইহারাও মেঘ, বৃষ্টি, ঝটিকা, ভূমিকম্প প্রভৃতি নৈসর্গিক অবস্থাগুলির জন্য উহাদের একটি করিয়া পৃথক দেবতা কল্পনা করিত এবং তাহাদের তুষ্টির জন্য উহাদের নানারূপ কল্পিত মূর্ত্তি তৈয়ার করিয়া তাহাদের উপাসনা করিত। এই সমস্ত মূর্ত্তির কতকগুলি কাবার ঘরে স্থাপন করিয়া তাহাদের উপাসনা করিত। রাজা শাদ্দাদ নিজেও পৌত্তলিক ছিলেন। রাজধানীতে বৃহৎ বৃহৎ স্বর্ণনির্ম্মিত মূর্ত্তি তৈয়ার করাইয়া উহাদের পূজার জন্য পুরোহিত নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কথিত আছে তাহারা কেনান, বাবিলন প্রভৃতি দেশ হইতে 'ওয়াদ্দ' সুয়া, ইয়াগুছ, ইয়াউক, নাছার প্রভৃতি দেবতার মূর্ত্তিগুলি আনিয়া পূজা করিত।

হজরৎ হুদ এইবার শাদ্দাদের প্রজাদের মধ্যে ইছলাম প্রচার করিতে লাগিলেন। তিনি তাহা-দিগকে কল্পিত মূর্ত্তির উপাসনা ছাড়িয়া এক আল্লার উপাসনা করিতে আহ্বান করিলেন। তাহারা বলিল, "আমরা তোমার কথায় পূর্ব্ব পুরুষদের উপাস্য ত্যগ করিয়া তোমার আল্লার উপাসনা করিব না। তাহা হইলে মহারাজ শাদ্দাদ আমাদিগকে জীবন্ত দাফন করিবে।" তথাপি হজরৎ হুদ তাঁহার প্রচার কার্য্যে নিরুদ্যম হইলেন না; তিনি বার বার তাহাদিগকে অন্যায় কার্য্যের প্রতিফলের কথা স্মরণ করাইয়া আল্লার পথে আহ্বান করিতে লাগিলেন। ক্রমে হুদের কথা শাদ্দাদের কানে পৌঁছিল। শাদ্দাদ তখন ক্ষমতা গর্ব্বে গর্ব্বিত। পার্থিব রাজ্যের একছত্র অধীশ্বর হইয়াও তাঁহার মনের তৃপ্তি হইল না। তিনি তখন আধ্যাত্মিক রাজ্যের একছত্র অধীশ্বর হইবার জন্য লালায়িত হইয়া উঠিলেন। হজরৎ হুদকে রাজধানীতে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "হুদ, তুমি কার ধর্ম্ম প্রচার করিতেছ?"

হুদ– যিনি আপনাকে আমাকে এবং সমস্ত বিশ্ব-জগৎকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি সকলের জন্ম-মৃত্যুর বিধান করেন, যিনি সকলের জীবিকার ব্যবস্থা করেন, যিনি সুখ-সম্পদ ঐশ্বর্য্যের মালেক আমি সেই একমাত্র সর্ব্বশক্তিমান আল্লার ধর্ম্ম প্রচার করিতেছি।

শা– দেখ হুদ, কে তোমার সেই আল্লা? তিনি কোথায় থাকেন? তাঁহাকে তুমি দেখাইতে পার?

হুদ- না, মহারাজ, তাঁহাকে কেহ দেখিতে পান না। তিনি নিরাকার।

শা—যাঁহাকে চক্ষে দেখা যায় না, কোথায়? যাঁহার অস্তিত্ব নাই তাঁহার আবার উপাসনা কিরূপে সম্ভব?

হুদ—আপনারা যে সকল মূর্ত্তির উপাসনা করেন ঐগুলিই কি আপনাদের দেবতা? ইহাদের কি কোন ক্ষমতা আছে? যাহার কোন ক্ষমতা নাই যে নির্জীব জড়পদার্থ, তাহার আবার উপাসনা কিরূপে সম্ভব।

শা—মূর্তিগুলি বাস্তবিক আমাদের উপাস্য নহে। ঐগুলি আমাদের দেবতাদের মূর্ত্তি।

হুদ- আপনারা কি সেই দেবতাদিগকে কখনও দেখিয়াছেন? বাস্তবিক তাহাদের মূর্ত্তি কি অবিকল এই মূর্ত্তিগুলির অনুরূপ?

শা· আমরা দেবতাদিগকে কখনও দেখি নাই। তাহাদের মূর্ত্তি এই মূর্ত্তিগুলির অনুরূপ কি না তাহাও জানি না। তবে তাঁহাদের কার্য্য বা প্রকৃতি অনুযায়ী মূর্ত্তি তৈয়ার করা হইয়া থাকে।

হুদ—মহারাজ, তবেই দেখা যাইতেছে, সকলের উপাস্যই অদৃশ্য। কিন্তু আপনারা এই অদৃশ্য উপাস্যকে দৃষ্টির মধ্যে আনিবার চেষ্টা করিয়া অসীমকে সীমার ভিতরে আনিয়াছেন। উপরন্তু এই সমস্ত কল্পিত মূর্ত্তি ঐ সকল দেবতার মূর্ত্তি হইতে পারে না; উহা আপনাদের মনের খেয়াল মাত্র। সুতরাং আপনাদের উপাসনা-পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক। সুতরাং এই ভ্রান্তি পরিহার করুন। এক আল্লার উপাসনা করুন, তিনি সর্ব্বশক্তিমান, তিনি অনাদি, অনন্ত; তিনি কাহারও সৃষ্ট নহেন বরং সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা। তিনি মৃত্যুর অধীন নহেন অথচ সকলের মৃত্যুর বিধানকর্ত্তা। তিনি মহাবিচারের মালেক। তাঁহার ন্যায়বিচারে পুণ্যবান বেহেস্তে ও পাপী দোজখে গমন করিবে।

শা—ওহে হুদ, যদি জন্ম মৃত্যুর অধিকারী তাহাকে ঈশ্বর বলা যায় তবে আমিই ঈশ্বর। আমার আদেশে চোখের পলকে লক্ষ প্রাণীর জীবন নিঃশেষ হইতে পারে। আবার ইচ্ছা করিলেই তাহাদের প্রাণ রক্ষা করিতে পারি। আমিই সকলের জীবিকার উপায় করিয়া দিই; উহা নষ্ট করিতে পারি। আমি এখনই দোজখে ও বেহস্ত তৈয়ার করিয়া মহাবিচার আরম্ভ করিতে পারি; এবং আমার অনুগত-গণকে বেহস্তে এবং অবাধ্যগণকে দোজখে নিক্ষেপ করিতে পারি।"

এই বলিয়া শাদ্দাদ রাজ্যের উজির, নাজির সকলকে ডাকিয়া বলিলেন—"আজ হইতে রাজ্যের মধ্যে ঘোষণা করিয়া দাও, আমি সকলের ঈশ্বর। সকলে এখন হইতে আমারই উপাসনা করিবে।" অতঃপর রাজ্যের কারিগরদিগকে বলিলেন দেশের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মণিমুক্তার দ্বারা আমাকে এমন একটী সুন্দর প্রাসাদ তৈয়ার করিয়া দেও যাহা হুদের আল্লার বেহস্ত অপেক্ষা বহুগুণে উৎকৃষ্ট হয়।"

আদেশমাত্র কার্য্য আরম্ভ হইল। যেখানে যত মণিমাণিক্য হীরা, জওহরৎ পাওয়া গেল, সংগ্রহ করিয়া অনিন্দ্য সুন্দর একটী প্রাসাদ তৈয়ারী হইল। নির্দ্দিষ্ট দিন রাজা পাত্রমিত্র সমভিব্যাহারে মহাড়ম্বরে সাধের বেহস্ত দেখিতে যাইতেছেন। বেহস্তের দরজায় উপস্থিত হইতে না হইতেই হঠাৎ ভীষণ ভূমিকম্প আরম্ভ হইল। কম্পনের বেগ এত ভীষণ হইল যে, দেখিতে দেখিতে তাঁহার সাধের বেহস্ত মহাশব্দে মৃত্তিকাগর্ভে নিমজ্জিত হইয়া গেল। উজির নাজির, লোক-লস্কর সহ শাদ্দাদ মুহূর্ত্ত মধ্যে ভূতলগর্ভে জীবন্ত সমাধি লাভ করিল। এ সম্বন্ধে এইরূপ একটী গল্প আছে যে—শাদ্দাদ যখন বেহস্তের দরজার কাছে আসিলেন, তখন দেখিতে পাইলেন যে দরজার উপর একজন অচেনা লোক খাড়া হইয়া আছে। তিনি বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কে তুমি? এই বেহস্তের দরজার উপর দাঁড়াইয়া আছ? তোমার আস্পর্দ্ধা ত বড় কম নয় তোমাকে এখনই শূলে চড়াইব।

যিনি দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি আর কেহই নহেন, স্বয়ং—হজরত আজ্‌রাইল 'আলায়হেস্ সালাম।—তিনি শাদ্দাদের কথা শুনিয়া বলিলেন আচ্ছা, শূলে চড়াইও। তবে তোমার প্রাণটা একবার নিয়া নেই।

শাদ্দাদের হৃদয় ভয়ে কাঁপিল! তবে কি সত্য সত্যই আমার জান কব্‌জ্ করিতে আসিয়াছে নাকি?—একি আজ্‌রাইল!

আচ্ছা, প্রাণ নিতে হয় নিও, শুধু একটু বিলম্ব কর, আমার বেহেস্ত একটিবার দেখিয়া নেই!

হুকুম নাই, দোজখে চল্! এই কথা বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ শাদ্দাদের প্রাণ লইয়া অদৃশ্য হইয়া গেলেন। সে সময়ে শাদ্দাদের এক পা ছিল ঘোড়ার রেকাবের উপর আর এক পা ছিল বেহস্তের দরজার চৌকাঠের উপর।

তারপর। পলক মধ্যে বেহস্ত কোথায় মিলাইয়া গেল! হায়রে মানুষের গর্ব্ব!

বর্ত্তমান হাদ্রামাউথের নিকট ইদানিং তাঁহার নিমজ্জিত প্রাসাদের চিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে।

মহারাজ শাদ্দাদের এই শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া তাঁহার প্রজাগণ দলে দলে হুদের ধর্ম্মগ্রহণ করিয়া এক আল্লার উপাসনা করিতে লাগিল।

হজরৎ ছালেহ

আদজাতি তাহাদের পূর্ব্ব বাসভূমি 'এরাম' পরিত্যাগ করিয়া আরব উপদ্বীপের দক্ষিণ উপকূলে বাস করিতেছিল। ইহাদের অন্যতম শাখা আরবের উত্তর ধারে 'আল্-হিজর' নামক স্থানে বাস করিত। ইহাদের মধ্যে 'ছামুদ' নামে এক পরাক্রমশালী ব্যাক্তি ছিলেন। তাঁহার নামানুসারে এই শাখার নাম 'ছামুদ' হইয়াছে। টলেমীর ভূগোলে সিরিয়া ও আরবের মধ্যবর্ত্তী স্থানের 'ছামুদ' জাতির বাস-স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। আরব্যভাষায় এই স্থানকে আলহিজর বলা হয়। কোর-আনে, ছামুদ জাতি এই আলহিজর প্রদেশের অধিবাসী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

আদজাতির প্রায় ২০০ বৎসর পরে ছামুদ জাতির অভ্যুদয় হয়। ইহারা আদজাতির ন্যায় সভ্য ছিল না। এক প্রকার যাযাবর জাতীয় লোক ছিল। অধিকাংশ পর্ব্বতগুহায় বাস করিত। আলহিজর প্রদেশের পর্ব্বতগাত্রের বহু নিদর্শন আজিও তাহাদের অস্তিত্বের জলন্ত প্রমাণ দিতেছে।

ধর্ম্মের সহিত সভ্যতার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সভ্যতার ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মেরও উন্নতি হইয়াছে। সুতরাং যে জাতির ধর্ম্মভাব যত উচ্চ তাহাদের সভ্যতাও তত উন্নত। ছামুদ জাতির জাতীয় জীবনের উপর ইছলামের সঞ্জীবনী কিরণধারা পতিত হইবার অবসর পায় নাই, সুতরাং তাহারা অসভ্যতার লতাগুল্ম অতিক্রম করিয়া সভ্যতার মুক্ত আকাশে পৌঁছিতে পারে নাই। এই নিমিত্ত কুসংস্কারের বদ্ধ হাওয়ায় তাহাদের সমাজ-দেহ স্বাস্থ্যহীন হইয়া পড়িয়াছিল। এই অধঃপাতের সময় তাহাদের মধ্যে তাহাদের আধ্যাত্মিক ব্যাধির চিকিৎসকরূপে **হজরৎ ছালেহ** জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাহাদের শোচনীয় অধঃপতন দেখিয়া ব্যথিত অন্তঃকরণে তাহাদের এই আত্মার মহাব্যাধি নিবা-করণের জন্য তাহাদিগকে তৌহিদের তিক্তবটীকা খাওয়াইবার প্রয়াস পাইলেন; কিন্তু তাহার সাধু চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইল। তৌহিদের এই আপাতবিরস বটীকা তাহারা রোষভরে প্রত্যাখ্যান করিল। কিন্তু দয়াময় মঙ্গলময় আল্লাহ এই পতিত জাতির উদ্ধারের নিমিত্ত তাঁহার হবিবকে অদম্য উৎসাহের সহিত এই পুণ্যকার্য্যে ব্রতী হইতে আদেশ করিলেন। তদনুসারী তিনি তাঁহার জাতিকে সাদরে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "হে আমার দেশবাসিগণ, তোমারা বিপথগামী হইয়াছ। যে আল্লাহ তোমাদের সকলের সৃষ্টি করিয়াছেন যিনি তোমাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য চন্দ্র, সূর্য্য, পর্ব্বত, নদ, নদী, মেঘ, বৃষ্টি, গাছপালা, ফল, ফুল প্রভৃতি নানা পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন, তোমরা সেই সৃষ্টিকর্ত্তাকে ভুলিয়া তাঁহার সেই সৃষ্টপদার্থ গুলিকেই, উপাস্যজ্ঞানে পূজা অর্ঘ্য প্রদান করিয়া থাক। তোমাদের শিক্ষার জন্য সেই সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা মঙ্গলময় আল্লাহ আমাকে পাঠাইয়াছেন। তোমরা জ্ঞানলাভ কর; বিপদে তাঁহারই সাহায্য প্রার্থনা কর; তাঁহারই উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর কর।

অজ্ঞানতার অন্ধকারে বহুকাল অবস্থান করায় 'পশুত্ব' তাহাদের মধ্যে বল্গাবিহীন অশ্বের ন্যায় উচ্ছৃঙ্খল অবস্থাতেই ছিল। সুতরাং দয়া-দাক্ষিণ্য পরোপকার, ভ্রাতৃভাব প্রভৃতি তাহাদের মধ্যে স্থানলাভ করিতে পারে নাই। পক্ষান্তরে—অত্যাচার, অবিচার স্বেচ্ছাচার মিথ্যাকথন, ইত্যাদি ব্যাধিতে তাহাদের অন্তঃকরণ প্রস্তরীভূত হইয়া পড়িয়াছিল। তাই হজরৎ ছালেহের উপদেশ বাণী তাহাদের অন্তঃকরণে প্রতিফলিত হইল না—প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিল। তাহারা উত্তর করিল—"ওহে ছালেহ্, তুমি ঘোর

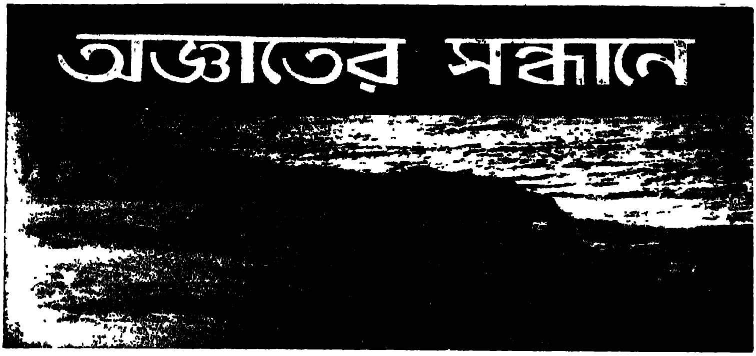
মিথ্যাবাদী, ভণ্ড! আমরা পূর্ব্বপুরুষদের আচরিত ধর্ম্ম কিছুতেই পরিত্যাগ করিব না। তবে তুমি যদি সত্যবাদী হও তবে আমাদিগকে তোমার আল্লার নিদর্শন দেখাও।

হজরৎছালেহ্ একটি উটনী তাহাদিগকে দিয়া বলিলেন,—"এই উটনী আমার আল্লার নিদর্শন। তোমরা ইহার প্রতি কেহ কোন আঘাত বা অত্যাচার করিবে না; ইহাকে স্বাধীনভাবে চরিতে দিবে। যদি কেহ ইহাকে হত্যা কর তবে তোমাদের উপর আল্লার অভিসম্পাত নামেল হইবে।"

আরব দেশে সাধারণতঃ জলের অভাব। ছামুদ জাতির বাসস্থান, আল্‌হিজর নামক প্রদেশটী পর্ব্বতময়, এ স্থানে কূপ, পুষ্করিণী বা কোন জলাশয় নাই। শুধু মধ্যে মধ্যে দুই একটি পার্ব্বত্য ঝরণা দৃষ্টিগোচর হয়। এই ঝরণা হইতেই ছামুদ জাতির জল সরবরাহ হইত। কিন্তু জলের পরিমাণ যথেষ্ট নয় বলিয়া অনেকেই প্রয়োজনমত জল পাইত না। সুতরাং এই জল লইয়া তাহাদের মধ্যে বিষম ঝগড়াবিবাদ এমনকি রক্তারক্তি পর্য্যন্ত হইত। এখন আবার আর এক নূতন বিপদ উপস্থিত হইল। একেত তাহাদেরই জল অকুলন হয় তাহাতে আবার উটনীটী ইচ্ছামত জলপান করাতে অনেকের বিষম বিপদ উপস্থিত হইল। এজন্য হজরৎ ছালেহের নিকট কেহ কেহ অভিযোগ আনয়ন করিল। তিনি ব্যবস্থা করিলেন,—"একদিন উটনী ইচ্ছানুরূপ জলপান করিবে, পরদিন তোমরা সমস্ত জল আবশ্যকমত লইয়া যাইবে।" কিন্তু ইহাতে তাহাদের জলের অভাব মোচন না হইয়া বরং বাড়িয়া গেল। স্বার্থপর চতুর ব্যক্তিরা সুযোগমত আগেই প্রচুর জল লইয়া যাইত; অপেক্ষাকৃত নিরীহ ব্যক্তিরা প্রয়োজনমত জল পাইত না। সুতরাং তাহারা হজরৎ ছালেহের ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট হইতে পারিল না, বরং উটনীকে ঈর্ষার চোখে দেখিতে লাগিল। তাহারা মনে করিল এই উটনীকে হত্যা করিতে পারিলেই তাহাদের বিপদ লঘু হইবে। ক্রমে বিদ্রোহীদের দল পুষ্ট হইতে লাগিল। অবশেষে একদিন তাহারা ষড়যন্ত্র করিয়া উটনীকে হত্যা করিয়া ফেলিল। শুধু ইহাতেই তাহাদের ঈর্ষানল নির্ব্বাপিত হইল না; বরং উহাতে স্বার্থের বায়ু-সংস্পর্শে সহস্র লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করিয়া হজরৎ ছালেহের মস্তক স্পর্শ করিল। তাহারা মনে করিল ছালেহ এবং তাহার অনুগামিগণই সমস্ত অনর্থের মূল। সহরের মধ্যে নয় জন কুচক্রী ছিল। তাহারা ষড়যন্ত্র করিল, সকলে মিলিয়া একযোগে ছালেহ্ ও তাহার পরিবারবর্গকে আক্রমণ করিয়া নিঃশেষ করিবে; তাহা হইলে নির্দ্দিষ্ট কাহারও উপর দোষ বর্ত্তিবে না।

তাহাদের এই দুরভিসন্ধি হজরৎ ছালেহের কর্ণগোচর হইতে বাকী রহিল না। কিন্তু তিনি নিরুপায়! তাঁহার সঙ্গে মাত্র কয়েকজন বিশ্বাসী লোক ছিলেন। সুতরাং দুষ্টদের হাত হইতে জীবন রক্ষা করা তাঁহার অসম্ভব বলিয়া বোধ হইল। অতএব তিনি জীবন-মৃত্যুর মালেক বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লার নিকট প্রার্থনা করিলেন—"হে দয়াময় আল্লাহ্, আমার অজ্ঞ দেশবাসীগণ তোমার প্রতি ঈমান আনিল না; বরং তাহারা আমার ও আমার সঙ্গিগণের প্রাণনাশে উদ্যত হইয়াছে। হে দয়াল! আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম, তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর।"

ছামুদ জাতির পাপ কাণায় কাণায় পূর্ণ হইয়াছিল। সুতরাং তাহাদের শাস্তি অনিবার্য্য হইয়া একদিন হঠাৎ মহাশব্দে বিষম ভূমিকম্প হইল। মৃত্তিকা বিদীর্ণ হইয়া, ভূগর্ভ হইতে কর্দ্দম, বালি নির্গত প্রভৃতি হইতে লাগিল; ঘরবাড়ী, দালান-কোটা কম্পনবেগে ধ্বসিয়া পড়িল। পাহাড়ের গুহাগুলি ভাঙ্গিয়া ছারখার হইয়া গেল। গুহাবাসীরা পাহাড়ের চাপে জীবন্ত সমাধি লাভ করিল। আদজাতির ন্যায় ছামুদ জাতিরও পতন হইল। হজরৎ ছালেহ তাঁহার সঙ্গিগণসহ শামদেশে গমন করিলেন। তথায় জীবনের অবশিষ্টকাল ইছ্‌লাম প্রচার করিয়া পরিণত বয়সে স্বর্গারোহণ করিলেন।



আয়ার ও বার্ক

২৭৮৭ পৃষ্ঠার পর

পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ায় আলবানি (Albany) একটি সুন্দর বন্দর। কিন্তু বর্ষার সময় এ জায়গা তত মনোরম থাকে না। তখন ১৮৪১ খৃঃ অব্দের জুলাই মাস। সেদিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়িতেছিল। রাস্তায় লোক চলাচল না বলিলেই চলে। এমন সময় শব্দ ছাপাইয়া একজন লোকের উচ্চ কণ্ঠস্বর শোনা গেল। দেখিতে দেখিতে সেই কর্দ্দমাক্ত, বৃষ্টি-পিচ্ছল রাস্তা লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। সেই লোকটী যে এতক্ষণ চীৎকার করিতেছিল সে অত্যন্ত বিস্মিত মুখে হাত পা নাড়িয়া দূরের পাহাড়ের দিকে নির্দ্দেশ করিয়া কি যেন কি দেখাইতেছিল।



জন আয়ার

জনতা প্রথমে কিছুই বুঝিতে পারে নাই। যখন বুঝিতে পারিল তখন দলে দলে সকলে পাহাড়ের দিকে ছুটিতে লাগিল। নিকটে পৌঁছিতেই দেখিল দুইজন লোক। একজন অষ্ট্রেলিয়ার অধিবাসী ওয়ালী (Wylie) অন্যজন বিখ্যাত ইংরাজ পর্য্যটক জন আয়ার (John Eyre)।

প্রায় একবৎসর পূর্ব্বে মধ্য অষ্ট্রেলিয়া আবিষ্কারের জন্য আয়ার রওনা হইয়াছিলেন। সে কার্য্যে বিফল হইয়া তিনি দক্ষিণ ও পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যে যাতায়াতের পথ আবিষ্কার করিবেন স্থির করিলেন। পথে বহু মাইল জুড়িয়া কেবল মরুভূমি। তাহার পর বহুদিন আর তাহাদের কোন খোঁজ পাওয়া যায় নাই। এখন এতদিন পরে ইঁহাদের দেখিয়া সকলের মনে হইল যেন মৃত্যুর পরপার হইতে ইঁহারা দুই জন ফিরিয়া আসিয়াছেন।

আয়ার ও ওয়ালিকে চিনিতে পারিয়া সকলে আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল। আনন্দে অনেকের চোখ হইতে জল ঝরিতে লাগিল। আয়ার লিখিয়াছেন—"স্নেহের সম্পর্কিত লোকেরা



বার্ক

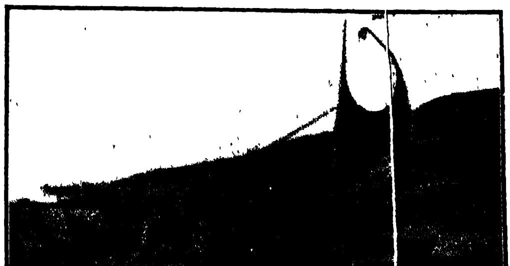
ইহাদের অপেক্ষা অধিক আনন্দ প্রকাশ করিতে পারিত না।"

ওয়ালিকে নিজের আত্মীয়দের নিকট রাখিয়া আয়ার নিজ দেশবাসীরা যে স্থানে বাস করিত সে দিকে রওনা হইলেন। আয়ারকে ইউরোপীয়েরা পরম সমাদরে গ্রহণ করিলেন। অত্যন্ত শান্ত, অবসন্ন, বাতে পঙ্গুপ্রায় অবস্থায় আয়ার ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। তবে তাঁহার যাত্রা ও এত কষ্ট স্বীকার বৃথা হয় নাই। এডিলেড হইতে (Adelaide) কিং জর্জ সাউণ্ডের (King George Sound) একটা পথ তিনি আবিষ্কার করিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার এই অভিযানের ও অভিজ্ঞতার ফল পরবর্তীদের বহু উপকারে আসিয়াছিল। ইহার অপেক্ষাও বড় কথা আয়ার প্রমাণ করিয়া দিলেন যে বিজ্ঞানের উন্নতি কামনায় জীবন দান করাও তুচ্ছ তাই তিনি ভীষণ দুস্তর মরুভূমি পাড়ি দিতেও ভয় পান নাই।

অষ্ট্রেলিয়া আবিষ্কারের ইতিহাসে আয়ারের নাম স্মরণীয়। ষোড়শ শতাব্দীতে পর্ত্তুগীজেরা ইহার অবস্থান সর্ব্বপ্রথম জানিতে পারে। ১৬০৭ খৃঃ অব্দে লুই ডি টরিস (Louis de Torres) নামক একজন স্পেনবাসী অষ্ট্রেলিয়ার উপকূল অতিক্রম করেন এবং নিজের নাম অনুসারে কুইনস্‌ল্যাণ্ড (Queensland) ও নিউগিনি (New Guinea) র মধ্যবর্ত্তী প্রণালীর নাম টরিস প্রণালী রাখেন (Torres Strait)।

ইহার চল্লিশ বৎসর পরে এবেল ট্যাসমান (Abel Tasman) নামক একজন ডাচ টাসম্যানিয়া দ্বীপ আবিষ্কার করেন। ১৬৮৮ খৃঃ অব্দে উইলিয়াম ড্যাম্পিয়ার (William Dampier) নামক ইংরাজ, ইংরাজদের মধ্যে প্রথম অষ্ট্রেলিয়ায় পদার্পণ করেন। ১৭৭০ খৃঃ অব্দে ক্যাপ্টেন কুক পূর্ব্ব উপকূলে বোটানি বের নিকট অবতরণ করেন। বর্ত্তমান সিড্‌নি সহর এই উপসাগরের উপকূলে অবস্থিত। ক্যাপ্টেন কুকের পূর্ব্বে অষ্ট্রেলিয়া সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানিতে পারা যায় নাই।

বহু বৎসর পর্য্যন্ত আফ্রিকার মধ্যপ্রদেশের মত অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যপ্রদেশ সম্বন্ধেও বিশেষ কিছুই জানিতে পারা যায় নাই। উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্ব্বে



অসভ্যদের নৌকা

পশ্চিমে সর্ব্বদিক হইতে যাত্রা করিয়াই অভিযানকারীরা একই কথা বারবার বলিয়াছেন মধ্য-

প্রদেশ জুড়িয়া নিদারুণ মরুভূমি অবস্থিত। সেখানে গাছপালা বা জনমানবের কোন চিহ্ন



আয়ারের অষ্ট্রেলিয়ার অভিযান

নাই। অবশেষে মানবের ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের পুরস্কার মিলিল। মধ্য অষ্ট্রেলিয়ার মরুভূমির পরপারের রহস্যদ্বার উন্মুক্ত হইল। লিহার্ডা (Leichardt, Greogory, Sturt, Oxley, Stuart Wharburton Giles) গ্রেগারি, ষ্টুয়ার্ট, অক্সলে পরে ওয়ারবার্টন, গাইলস্ প্রভৃতির নাম অষ্ট্রেলিয়ার রহস্য উন্মোচনের জন্য প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। এ সম্পর্কেই আয়ার ও বার্কের নাম বিজড়িত। আয়ারের খ্যাতি তাঁহার অসাধারণ সাহসিকতার জন্য পরে বার্কের শোচনীয় মৃত্যুর স্মৃতি সকলের মনে তাঁহার জন্য সকরুণ সহানুভূতি জাগাইয়া রাখিয়াছে।

১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ৫ আগষ্ট মাসে ইয়র্কসায়ারের হর্ণসিয়া (Hornsea) নামক স্থানে আয়ার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা একজন যাজক ছিলেন। শৈশব হইতে দুঃসাহসিক কার্য্য ভাল বাসিতেন বলিয়া তিনি সৈন্য হইবেন স্থির করেন। সৈন্য বিভাগে প্রবেশ করিতে না পারিয়া অবশেষে আয়ার ১৮৩৩ খৃঃ অব্দে অষ্ট্রেলিয়ায় চলিয়া আসেন। এইখানে তাঁহার অষ্ট্রেলিয়ার দুর্গম স্থান আবিষ্কারের একটা আকাঙ্ক্ষা হয়। ১৮৩৯ খৃঃ অব্দে তিনি টরেন্স হ্রদ আবিষ্কার করেন। (Lake Torrens) যখন অষ্ট্রেলিয়ার উত্তরে দুর্গম স্থান আবিষ্কারের জন্য একটা অভিযান যাত্রার আয়োজন চলিতেছিল তখন আয়ার নেতৃপদ চাহিয়া এক আবেদন করেন।



অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসী পুরুষ, নারী ও শিশু

তাঁহার অল্প বয়স এবং সামান্য অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও তাঁহার অনুরোধই রক্ষা করা হয়।

এ যাত্রার ব্যয়ভার জনসাধারণ সামান্য কিছু দিলেও অধিকাংশ আয়ার নিজেই বহন করেন। ১৮৪০ খৃঃ অব্দে মাত্র পঁচিশ বৎসর বয়সে এডিলেড হইতে আয়ার যাত্রা করিলেন। সঙ্গী হইলেন সদা সহাস্যমুখ বলিষ্ঠ কর্ম্মী, যুবক এডোয়ার্ড স্কট। তাছাড়া আরও চারিজন শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক দুইজন দেশীয় বালক, অসংখ্য অশ্ব, মেষ প্রভৃতিও সঙ্গে চলিল। কিছুদূর যাইতেই তৃণাচ্ছাদিত সমতল ক্ষেত্রের পরিবর্তে প্রস্তরময় শুষ্ক ও নীরস ভূমি দেখা দিল। জলের অভাবে ঘোড়া, ভেড়া প্রভৃতির ভয়ানক কষ্ট হইতে লাগিল। এইবার খাদ্য ও পানীয়ের কষ্টের মধ্যেও আয়ারের দূরদর্শীতার ফলে অভিযান অগ্রসর হইতে লাগিল।



আদিম অধিবাসী পাথরের বর্শাফলক তৈরী করিতেছে

কিছুদিন এরূপ চলিবার পরে আয়ার বাধ্য হইয়া খাদ্য ও পানীয় আনিবার জন্য স্কটকে পুনরায় এডিলেডে পাঠাইয়া দিলেন। আয়ারের নিয়ম ছিল জলের সন্ধান পাইলেই জলের নিকট তাঁবু খাটাইতেন ও কিছু লোক সঙ্গে লইয়া অন্য জায়গায় যাইতেন। তিনি জানিতেন এ জায়গা সকলে মিলিয়া ছাড়িয়া গেলে হয়ত পুনরায় জলের খোঁজ পাওয়া কষ্টকর হইবে। এখনও হইত হয়ত অনেকদূর গিয়া পড়িয়াছেন সঙ্গে একটুকরা রুটি কিংবা এক ফোঁটা জলও নাই। তখন আবার নিজের তাঁবুতে ফিরিয়া আসিতেন।

এ রকম ভাবে চলিতে চলিতে একদিন তাঁহারা এক কাঁটা ঝোপে পথ হারাইয়া ফেলেন। তখন রাত্রি হইয়া গিয়াছে, তৃষ্ণায় সকলের ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে। কাঁটা ঝোপের খোঁচা লাগিয়া ঘোড়ার চক্ষু অন্ধ হইবার যোগাড়। উপায়ান্তর না দেখিয়া আয়ার ঘোড়া লইয়া লাফাইয়া পড়িলেন। সামান্য আঘাত লাগিলেও তাঁহারা নিজেদের তাঁবুতে নিরাপদে ফিরিয়া গেলেন। অন্যান্য সকলে তখন উদ্বিগ্ন চিত্তে তাঁহাদের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

মধ্য অষ্ট্রেলিয়ায় প্রবেশ করা নিতান্ত অসাধ্য দেখিয়া আয়ার সে চেষ্টা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন। এ সময়ে আরেকটা কারণে এ পথ ছাড়িয়া অন্যপথে যাইতে হইল। পথে আয়ারের দলের কয়েকজন দেশীয় লোকের সহিত দেখা হয়। আয়ার তাহাদের নিকট জলের সন্ধান জানিতে চাহিলে, তাহারা আয়ারকে তাহা দেখাইয়া দিবে বলিয়া পথ প্রদর্শক হইয়া সঙ্গে চলিতে লাগিল। যাক্‌ বিপদ কাটিয়া গেল – এই ভাবিয়া নিশ্চিন্তমনে আয়ার সমস্ত জল খরচ করিয়া ফেলিলেন। এদিকে আয়ার নিজে জন ব্যাক্সটার, ওয়ালি ও তিনজন দেশীয় লোক ব্যতীত সকলকে এডিলেডে ফিরিয়া যাইতে বলিলেন। স্কটকে ছাড়িয়া দিতে আয়ারের খুবই কষ্ট হইয়াছিল কিন্তু এ ছাড়া আর অন্য উপায় ছিল না।

এইবার আয়ার দেখিলেন দক্ষিণ ও পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যে স্থলপথে যাতায়াতের পথ থাকিতে পারে। কিন্তু একার্য্যেও সফল হইবার সম্ভাবনা অল্প। ব্যাক্সটার (Baxter) কে আয়ার পথের বিপদের কথা সমস্ত খুলিয়া বলিলেন



ওয়ালির অষ্ট্রেলিয়ার ভীষণ মরুযাত্রার পরে এডিলিডে প্রত্যাবর্ত্তন

দেশীয় লোকেরা আয়ারকে সদলবলে সমুদ্রতীরে আনিয়া উপস্থিত করিল। আয়ার ব্যাপার দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। আসলে উভয় পক্ষেই ভুল বোঝা হইয়াছিল। দেশীয়রা ভাবিয়াছিল শ্বেতাঙ্গ জল পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে সমুদ্রতীরে জাহাজ না দেখিয়া নিতান্ত মনঃক্ষুণ্ণ হইল।

ভাগ্যক্রমে সেদিনই আয়ার একটি ঝরণার সন্ধান পাইলেন ; কিন্তু এ পথে আসিয়া আয়ার ভাবিয়া দেখিলেন অকারণ দলের লোকদের বিপন্ন করিয়া কোন লাভ নাই। কাজেই দল ভাঙ্গিয়া দিয়া ব্যাক্সটার ভীত হইলেন না। বরং জীবনপণ করিয়া যাত্রাপথ সুগমের কার্য্যে সহায়তা করিবেন বলিলেন।

জলের অভাবই এ অভিযানে সর্ব্বাপেক্ষা কষ্টকর ছিল। পনেরো দিন না কাটিতেই জলের অভাবে দলের ভয়ানক কষ্ট হইতে লাগিল। একদিকে নিদারুণ পিপাসা, তাহার উপর বালুর ঝড় ও মক্ষিকার দংশনে সকলে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। বহুবার আয়ারের মনে হইয়াছে এই বালুকাপাহাড়ের পথ ছাড়িয়া যাই। এমনও হইয়াছে প্রায় দেড়শ মাইল হাঁটিয়াও জলের সন্ধান মিলে নাই। শ্রান্তিতে ও

তৃষ্ণায় অবসন্ন হইয়া তাঁহারা মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়াছেন।

সঙ্গের ঘোড়াগুলির কষ্ট দেখিয়াও আয়ার অত্যন্ত বিচলিত হইতেন। একবার বহুসন্ধানের পর তাঁহারা একটি ক্ষুদ্র জলাশয়ের সন্ধান পান। পিপাসায় ঘোড়াগুলি সে সমুদয় জল নিঃশেষে পান করিয়া ফেলে আয়ার ও তাঁহার সঙ্গীদলের জন্য একবিন্দু জলও অবশিষ্ট রহিল না। এজন্য আয়ারকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিয়া যথাসাধ্য খাদ্য লইয়া পলায়ন করিল। সেই ভীষণ রাত্রি প্রভাত হইলে আয়ার দেখিলেন—দারুণ মরুভূমির মাঝখানে একজন দেশীয় বালক মাত্র তাঁহার সঙ্গী।

তিনি দেখিলেন আরও ছয়শত মাইল পথ চলিতে হইবে অথচ সঙ্গে কেবল সামান্য কিছু ময়দা কিছু চা, চিনি ও অতি সামান্য জল। আরেক ভয় রহিল সেই দুই পলাতক হত্যাকারীদের সঙ্গের



জটাধারী আদিম অধিবাসী

সদলে প্রায় চারিদিন জল পান না করিয়া থাকিতে হইয়াছিল।

অবশেষে জলের অভাবে তাঁহাদের অবস্থা এমন হইত যে আঠা গাছের (Gum-tree) রস শুষিয়া পান করিতেন। ভোরের শিশিরগুলি ধরিয়া রাখিয়া তাহা দিয়া শুষ্ক কণ্ঠ ভিজাইতে চেষ্টা করিতেন।

ইহার পর আরেক নিদারুণ বিপদ ঘটিল। দুইজন দেশীয় সঙ্গী রাত্রিতে বাক্সটারকে (Baxter) খাবার ফুরাইয়া গেলে তাহারা আবার আসিয়া আক্রমণ করিতে পারে। সত্য সত্যই সেই দুইজন ফিরিয়া ওয়ালিকে সঙ্গী করিতে বহু চেষ্টা করিল কিন্তু ওয়ালি কিছুতেই রাজী না হওয়াতে অবশেষে বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া গেল।

এত বিপদেও আয়ারের ধৈর্য্য অটুট ছিল। মানসিক অদম্য দৃঢ়তার বলে তিনি পথ চলিতে লাগিলেন। একদিকে সূর্য্যের প্রখর উত্তাপ অন্য দিকে খাদ্য ও পানীয়ের অভাব। আহার্য্য কিছুই ছিল

না বলিলেই চলে, কিছু ময়দা ও কখনও সামান্য ঘোড়ার মাংস খাইয়াই জীবন ধারণ করিতে হইত।



আয়ারের দেশীয় ভৃত্য

পথে কখনও পাখী মারিয়া, কখনও কাঁকড়া, অথবা মাছ ধরিয়া মাঝে মাঝে ক্যাঙ্গারু ও অপসাম (Opossum) নামক জন্তু মারিয়া খাইতেন। যাত্রা-পথে বহুদূর অগ্রসর হইবার পরে সৌভাগ্যক্রমে



অষ্ট্রেলিয়ার অদ্ভুত প্রাণী

আয়ারের সঙ্গে একজন তিমিমাছ ব্যবসায়ী ফরাসী জাহাজের দেখা হইল। কাপ্তেন আয়ারের সঙ্গে বন্ধুর মত ব্যবহার করিলেন ও সঙ্গে বহু আহার্য্য ও পানীয় দিলেন। নূতন উৎসাহে আয়ার এবারে যাত্রা করিলেন।

আরও বহু সপ্তাহ কষ্ট সহিবার পর তাহারা কিং জর্জ্জ সাউণ্ড (King George Sound) এর নিকটবর্ত্তী পাহাড়গুলির সম্মুখে আসিয়া পৌছিলেন। ওয়ালি আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। ওয়ালি ও আয়ার তখন শ্রান্তির শেষ সীমায় আসিয়া পৌছিয়াছিলেন। অবশেষে কোন রকমে চলিয়া অনেকটা হামাগুড়ি দিয়া তাঁহারা আলবানি আসিয়া পৌছিল। তাঁহাদের সাদর অভ্যর্থনার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।



সাপের খোরাক-গিরগিটি জাতীয় প্রাণী

আয়ারের ন্যায় ধৈর্য্য, স্থৈর্য্য ও মানসিক দৃঢ়তা ও কষ্টসহিষ্ণু অভিযানকারীদের মধ্যেও বিরল।

১৮৪৫ খৃঃ অব্দে আয়ার তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত "মধ্য অষ্ট্রেলিয়ার আবিষ্কারের ইতিহাস" নামে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। ইহাতেই অভিযান-কারী হিসাবে তাঁহার খ্যাতি রটিয়া যায়। এক বৎসর পরে আয়ার নিউজিল্যাণ্ডের শাসনকর্ত্তা (Lieutenant Governor) নিযুক্ত হন। ইহার পরে তিনি সেণ্ট ভিন্সেট (St. Vincent, Antigua Jamaica) এণ্টিগুয়া ও জ্যামাইকার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। জ্যামাইকায় তিন

বৎসরকাল থাকিবার পর এক নিগ্রো বিদ্রোহ দমনের পরে নিষ্ঠুরতার অভিযোগে বিচারের জন্য আয়ারকে ইংল্যাণ্ডে ফিরিতে হইল। আয়ারের হিতৈষী বন্ধুর অভাব ছিল না। কার্লাইল ও কিংসলের সহায়তায় আয়ার মুক্তি পান ও তাঁহার জন্য পেন্সনের ব্যবস্থা হয়। বহুদিন শান্তিতে কাটাইবার পর ১৯০১ খৃঃ অব্দ ৩০ শে নভেম্বর অতি বৃদ্ধ বয়সে আয়ারের মৃত্যু হয়।

আয়ারের অধ্যবসায় ও সাফল্য দেখিয়া উৎসাহিত হইয়া রবার্ট ওহারা বার্ক (Robort O'hara Burke) নামক একজন আইরিশ যুবক ও মধ্য অষ্ট্রেলিয়ার রহস্য উদ্ঘাটনের উদ্দেশে মেলবোর্ণ (Melbourne) হইতে যাত্রা করেন।

১৮২০ খৃঃ অব্দঃ এক সম্ভ্রান্ত আইরিশ পরিবারে বার্কের জন্ম হয়। যুদ্ধবিদ্যা শিখিয়া ১৮৪০ খৃঃ অব্দে বার্ক অষ্ট্রেলিয়ার সৈন্য বিভাগে যোগদান করেন এবং শীঘ্রই লেফটেনাণ্ট পদে উন্নীত হন।

আটাশ বৎসর বয়সে স্বদেশে ফিরিয়া পুলিশ-বিভাগে যোগদান করেন। এখানে বার্ক এত জনপ্রিয় হইয়াছিলেন যে যখন তিনি ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে অষ্ট্রেলিয়া রওনা হইয়া যান তখন তাঁহার বহু সহকর্মীরা কার্য্য ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার অনুগামী হইয়াছিল। তাঁহাকে সকলে যে অত্যন্ত ভালবাসিত তাহার আরেক প্রমাণ তাঁহার বৃদ্ধা ধাত্রী। এই স্নেহশীলা ধাত্রী বার্ককে অতি শৈশব হইতে মানুষ করিয়া তুলিয়াছিল। বার্ক অষ্ট্রেলিয়ায় চলিয়া গেলে পর এলেন ডোহার্টি (Allen Doherty ধাত্রীর নাম) তাহার কষ্ট উপার্জ্জিত অর্থ হইতে অষ্ট্রেলিয়ায় বার্ককে দেখিতে যাইবার জাহাজ ভাড়ার অর্থ সঞ্চয় করিত। পঁয়ষট্টি (৬৫) বৎসর বয়সে পাথেয় সঞ্চিত হইলে "তাহার প্রিয় প্রভু রবার্টকে মরিবার পূর্ব্বে আরেকবার দেখিবার জন্য সে অষ্ট্রেলিয়ায় যাত্রা করে। দুঃখের বিষয় সে মেলবোর্ণে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই বার্ক অভিযানে গমন করেন।



অসভ্য লোকেরা শীতের রাত্রিতে আগুন পোহাইতেছে

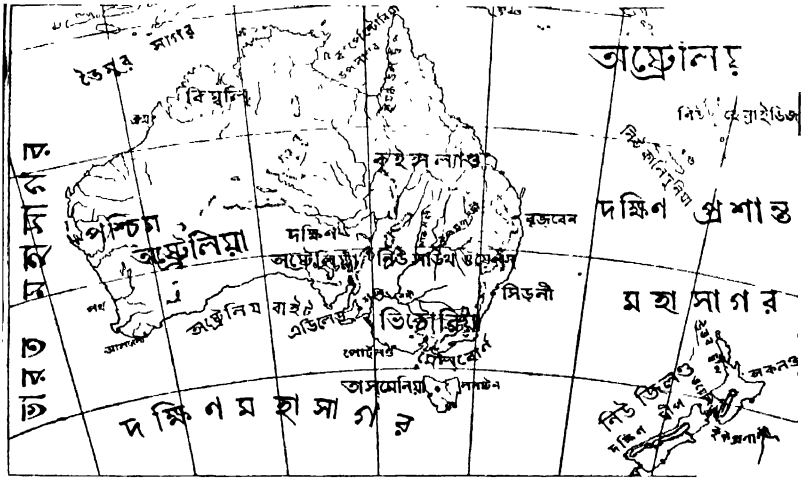
আয়ারের সহিত বার্কের দু'একটি বিষয় আশ্চর্য্য মিল দেখা যায়। উভয়েই যৌবনে সৈনিক জীবন কামনা করিয়াছিলেন এবং অষ্ট্রেলিয়ায় পৌঁছিয়া

উভয়েই শাসন বিভাগে কার্য্য পান (Magistrate)। ইহার পূর্ব্বে বার্ক পুলিশ বিভাগে কাজ করেন। যখন ক্রিমিয়ার যুদ্ধ আরম্ভ হয় (Crimean War) তখন বার্ক কাজ ছাড়িয়া স্বদেশে যাত্রা করেন কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তখন আর সৈন্যদলে যোগ দিবার কোন উপায় ছিল না।

অষ্ট্রেলিয়া হইতে ফিরিলে সমস্ত দেশে দক্ষিণ হইতে উত্তরে যে অভিযান যাত্রার কথা হইতেছিল তাহার নেতৃত্বভার বার্কের উপর ন্যস্ত হইল। ইহাতে বার্কের ক্ষমতার উপর যথেষ্ট সম্মান দেখান হয়। অভিযানের নেতা হইবার বহুপ্রার্থী ছিলেন কিন্তু বার্কই যোগ্য বিবেচিত হইলেন। তরুণ যুবক বার্ক তখন যাত্রার আয়োজনের বিষয়ের সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়া দেখিতে লাগিলেন। ১৮৬০ খৃঃ অব্দের ২০ শে আগষ্ট আশাপূর্ণ হৃদয়ে বার্ক মেলবোর্ণ হইতে যাত্রা করিলেন।

যাত্রাপথে বার্ক ভাবিয়াছিলেন সবই শুভ হইবে কিন্তু বিপদ ভীড় করিয়া আসিয়া দেখা দিল। প্রথমতঃ বার্কের সঙ্গী নির্ব্বাচন ভাল হয় নাই। এগারজন শ্বেতাঙ্গ সঙ্গীর মধ্যে দুইজনের মনের দৃঢ়তা অথবা স্থৈর্য্য মোটেই ছিল না। ইহার ফলে ল্যাণ্ডেলস নামক শ্বেতাঙ্গ সঙ্গী বার্কের নেতৃত্ব মানিতে রাজী হইল না। তখন বার্ক উইলস (John Wills) নামক বিশ্বস্ত সঙ্গীকে ল্যাণ্ডেলসের কার্য্যভার দিলেন। উইলস বিজ্ঞান ও চিকিৎসা-বিদ্যায় বহুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। সমগ্র অভিযানে উইলস সর্ব্বসময় বার্কের সঙ্গী থাকিতেন। বার্কের নামের সহিত উইলসের নাম এ প্রমাণ-সাফল্যের সহিত চিরদিন বিজড়িত থাকিবে।

কিছুদিন চলিবার পর বার্ক নিজের দলকে ভাঙ্গিয়া দুইটী স্বতন্ত্র দলের সৃষ্টি করিলেন। বার্ক নিজে কয়েকজন সঙ্গীকে লইয়া যথাসম্ভব শীঘ্র আসিয়া কুপার ক্রীকে (Cooper's Creek) পৌছিলেন। অন্যদল মালপত্র খাদ্য দ্রব্যাদি লইয়া পশ্চাতে আসিতে লাগিল। ১১ই নভেম্বর সকলে আসিয়া কুপার ক্রীকে পৌছিলেন। এখানে ব্রাহে (Brahe) নামক একজন সঙ্গীকে রসদের ভার দিয়া বার্ক, উইলস, কিং ও গ্রে উত্তর উপকূল অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাহাদের সঙ্গে ভারতবর্ষ হইতে আনীত ছয়টী উট ও একটী অশ্ব ছিল।



প্রথমে সবই ভাল ছিল। জল যথেষ্ট পাওয়া যাইতেছিল এবং প্রথম প্রথম "সবুজ, শস্যশ্যামল"

প্রদেশের ভিতর দিয়াই যাত্রা চলিতেছিল। পথে বুনো হাঁস, পেলিকান, টিয়াপাখী, লালবুকওয়ালা কাকাতুয়া প্রভৃতির সাক্ষাৎ মিলিতেছিল। তাছাড়া পিপড়ের ঢিবি গাম গাছ (Gum-tree) (একরকম আঠার মত রস বাহির হয়) দেখিয়াও অভিযান-কারীদের উৎসাহ ও কৌতূহল হইতেছিল। মাঝে দু'একবার এক আধজন দেশীয় লোকের দেখা পাওয়া গিয়াছিল। শ্বেতাঙ্গদের দেখিয়া ভয়ে তখনি তাহারা দৌড়াইয়া পলায়ন করিল।

ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন আশঙ্কাই ছিল না। কিন্তু এ সময় দৈব প্রতিকূল হইয়া উঠিল। খাদ্যের অভাব ঘটায় বার্ক শীঘ্র কুপার ক্রীকে ফিরিয়া যাইবেন স্থির করিলেন। অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হওয়াতে উটের চলাচল পক্ষে পথ কষ্টকর হইয়া উঠিল। হয়ত সমস্তদিন মাত্র চারি মাইল যাওয়া হইত। মূল্যবান সময় উটের পা চোরাবালি বা পিচ্ছল পথ হইতে তুলিতেই কাটিয়া যাইত। অবশেষে খাদ্য নিঃশেষ হইয়া গেলে অনশনে চলিতে লাগিল। সে—অনাহারে,



রবার্ট বার্কের মৃত্যু

এমন সময় বিপদের প্রথম সূত্রপাত দেখা দিল। দারুণ বৃষ্টি সুরু হইয়া গেল। এ বৃষ্টি আসারের যাত্রাপথে হইলে তাহার অনেক সুবিধা হইত। কিন্তু বার্কের উটের দল ভিজা বালিতে চলিতে পারিল না কাজেই উইলসকে সঙ্গে লইয়া বার্ক আগাইয়া চলিলেন। ১৮৬১ খৃঃ অব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারী সমস্ত প্রদেশটা একবার পাড়ি দিয়া বার্ক উপকূলে আসিয়া পৌছিলেন। যাত্রা সফল হওয়ার অতিরিক্ত আনন্দে আত্মহারা হইয়া বার্ক সঙ্গীদলের সহিত যোগ দিলেন। এ সময় পর্য্যন্ত বার্কের মনে

শ্রান্তিতে প্রাণত্যাগ করিলেন। অন্যান্য সকলে প্রাণপণে মৃত্যুর সহিত যুঝিতে লাগিলেন।

উইলসের ডায়েরীতে লিখিত আছে—"একটা পাখী মারিয়া দেখা গেল কেবল পালক আর থাবা মাত্র সার। আহার্য্য হইবার যোগ্য নহে। তখন নিরাশ হইলাম সামান্য নিরাশ কথাটাতে তখনকার অবসন্ন ক্ষুধাকাতর চিত্তের বেদনা প্রকাশ কিছুই হয় নাই। পরের দিন সামান্য শুকনো ঘোড়ার মাংস খাইয়া অবশেষে বহু আশায় অভিযানকারীরা কুপার-ক্রীকে আসিয়া পৌছিলেন। হায়—সেখানে জনপ্রাণী

কেহই নাই। তখনকার নৈরাশ্য ও বেদনার কথা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

কিছুক্ষণ পরে উইলস দেখিলেন একটা গাছের গায়ে মোটা মোটা অক্ষরে খোদাই ১৮৬১ সালের ২১শে এপ্রিল। আর কিছুই লেখা নাই। একবাক্স শুষ্ক খাদ্যদ্রব্য সন্ধান মিলিল। তিন সপ্তাহ পরে এই প্রথম আহার—তখনকার আনন্দের ও তুলনা দেওয়া যায় না।

আহারের পর কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখিলেন ঠিক সেদিনই সকাল-বেলা দল এ স্থান ত্যাগ করিয়াছে। এমন অবসন্ন অবস্থায় তাহাদের গিয়া ধরিবার শক্তি আর বার্কের ছিল না। কাজেই তিনি হোপলেশ জাহাজে (Mount Hopeless) যাইবেন স্থির করিলেন।

মাত্র দেড়শ মাইল চলিতে হইবে এমন সময় নিদারুণ বিপদ ঘটিল। অবশিষ্ট উটটা চোরাবালিতে প্রাণ হারাইল। অভিযানকারীরা অসহায় অবস্থায় মরুভূমিতে পড়িয়া রহিলেন। দেহে মনে তখন তাহাদের নিদারুণ অবসাদ। সঙ্গে মাত্র একদিনের উপযুক্ত আহার্য্য ও পানীয়।

যদি কোন দৈব উপায়ে প্রাণ রক্ষা পায় এই ভাবিয়া নিজের রোজনামচা, (Diary) নোট বই ইত্যাদি বার্ক যেখানে সেখানে বালিতে পুতিয়া রাখিলেন। মনে তখনও আশা ছিল যদি সৌভাগ্যক্রমে কোন পথিক তাহা দেখিতে পায়। দেশীয়রা মাঝে মাঝে তাহাদের খাদ্য, পানীয় দিত, তবে ইহাদের কোন স্থিরতা ছিল না। আসিয়াই চলিয়া যাইত।

২৮শে জুন তারিখে উইলস্ লিখিয়াছেন—'দেশীয় কাহারও দেখা না পাইলে অনাহার ভাগ্যে আছে। ক্রমশঃ বার্ক ও উইলস এমন দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন যে তাহাদের আর নড়িবার শক্তি রহিল না।

২৯শে জুন বার্ক ও কিং কোন রকমে হাঁটিয়া দেশীয় লোকদের সন্ধানে চলিলেন। উইলস তখন মুমূর্ষু তাহাকে বাঁচাইবার যদি কোন উপায় হয়। তাহার পূর্ব্ব দিন বার্ক লিখিয়াছিলেন "আমি আর চার পাঁচদিন বাঁচিলেও বাঁচিতে পারি।" মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত অবিচলিত সাহস লইয়া সহাস্য মুখে একটিও অভিযোগ না করিয়া বীর বার্ক ইহার দুই তিন দিন পরে প্রাণত্যাগ করিলেন।

ইতিমধ্যে ব্রাহে মেলবোর্ণ পৌছিয়া বার্কের কোন খোজ পাওয়া যাইতেছে না এ সংবাদ দিলেন। দেশীয়দের বিরুদ্ধতাও রোগের আক্রমণ সহ্য করিয়াও ব্রাহে যথাসম্ভব দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিয়াছিলেন। যখন এত দেরী হইতে লাগিল তখন ব্রাহে ভাবিলেন হয়ত বার্ক অন্য পথে ফিরিয়াছেন; সেজন্য ২১শে এপ্রিল ব্রাহে সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিলেন। তখনই বার্কের দলের উদ্ধারের সন্ধানে একদল যাত্রা করিলেন ১৫ই সেপ্টেম্বর তাহারা আসিয়া দেখিলেন ছায়ার ন্যায় মলিন শীর্ণ অবস্থায় প্রায় মুমূর্ষু কিং দেশীয়দের তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে। ৩০শে জুন রবার্ট বার্কের মৃত্যু হইয়াছে।

নিজের জীবন দান করিয়া বার্ক প্রতিজ্ঞা পূরণ করিয়া গিয়াছেন। যাত্রা তাঁহার সফল হইয়াছিল।

আয়ার ও বার্ক অষ্ট্রেলিয়ার দুর্গমস্থান আবিষ্কার করিয়া কত নূতন তথ্য যে আমাদিগকে দিয়া গিয়াছেন, সে সব পড়িলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। আয়ার ও বার্কের এ সব ভ্রমণ কাহিনী পুস্তকাকারেও প্রকাশিত হইয়াছে। তোমরা যদি তাঁহাদের লিখিত এ বইগুলি পড়, তাহা হইলে অনেক নূতন নূতন কথা জানিতে পারিবে। "Journals of Expeditions of Discovery in to Central Australia, by Edward John Eyre (two vols, 1845). 'Burke and the Australian Exploring Expedition of 1160; by Andrew Jackson (1862); and A successful Eploration through Australia, by william wills (1863). তোমরা অবসর মত এ বইগুলি খোঁজ করিয়া পড়িও। তাহা হইলে অষ্ট্রেলিয়ার সম্বন্ধে অনেক কথাই জানিতে পারিবে।

কোন দেশ ও জাতি কখনও উন্নতিলাভ করিতে পারে না এবং দেশে দেশে তাহাদের প্রভাবও বিস্তৃত হইতে পারে না, যদি না সেই সব দেশে আয়ার ও বার্কের ন্যায় বীর পুরুষের জন্ম হয়। আজ অষ্ট্রেলিয়ার শিক্ষা ও সভ্যতায় এত বড় হইয়াছে তাহার মূলে আয়ার ও বার্কের পরিশ্রম ও আত্মোৎসর্গ উল্লেখযোগ্য।



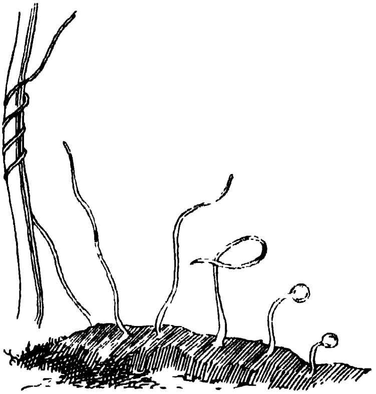
উদ্ভিদের চুরি, ডাকাতি ও খুন

২৮৩০ পৃষ্ঠার পর

মানুষের যেমন একটা সমাজ আছে উদ্ভিদেরও তেমনই একটা সমাজ আছে। মানুষের সমাজে যেমন ভাল মন্দ দুই রকমেরই লোক আছে উদ্ভিদ সমাজেও তেমনই ভাল মন্দ লোক আছে। খবরের কাগজে প্রায় প্রতিদিনই চুরি ডাকাতি ও সঙ্গে সঙ্গে খুনের খবর থাকে, ডাকাতির সঙ্গেই খুন জখম বেশী হইয়া থাকে। জিনিষ পত্র, টাকা কড়ি লুট করিবার সময় বাড়ীর লোকে বাধা দিলেই খুন হয় বেশী। আবার হিংসার উত্তেজনায় কিংবা দাঙ্গা করিয়া একদল আর একদলকে, একজন আর একজনকে খুন করিয়াছে এ দৃষ্টান্তও মানুষের সমাজে বিরল নহে; কিন্তু উদ্ভিদ সমাজে খুন জখম, চুরি ডাকাতি প্রায় সবই হয় খাদ্য সংগ্রহ উপলক্ষ করিয়া। ইহাদের একদল আছে যাহাদের স্বভাবই হইতেছে অন্যের খাদ্য চুরি করিয়া খাওয়া, কিংবা তাহার বুকের উপর বসিয়া জোর করিয়া প্রথমে তাহার সঞ্চিত খাদ্য শোষণ করা, অবশেষে তাহাকে নিঃসহায়ের মত হত্যা করা। আর একদল আছে যাহাদের নিষ্ঠুরতার কথা ঠগীর অত্যাচারের কাহিনীকেও ম্লান করিয়া দেয়। ঠগী যাহার আশ্রয়ে মানুষ হইয়াছে তাহাকে দম আটকাইয়া হত্যা করিয়াছে—এমন বড় একটা শোনা যায় না, কিন্তু ইহারা যাহাকে আশ্রয় করিয়া বর্দ্ধিত হয় তাহাকে ক্রমে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা অষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধিয়া ফেলে, তারপর ক্রমশঃ চাপ দিয়া পিষিয়া একরকম 'গলায় মোচড়' দিয়া দমবন্ধ করিয়া মারিয়া ফেলে। আর একটা বিষয়ে উদ্ভিদ মানুষ হইতে পৃথক। জাতিভেদ প্রথা ইহাদের মধ্যে বড়ই বেশী। আমাদের সমাজে চোরের ছেলের সাধু হইবার, ডাকাত কিংবা খুনীর ছেলের আদর্শ চরিত্র লোক হইবার কোন বাধা নাই, কিন্তু উদ্ভিদ সমাজে চোরের ছেলেকে চোর, ডাকাত এবং খুনীর ছেলেকে ডাকাতি এবং খুন করিয়াই সংসার চালাইতে হইবে। এ স্বভাব তাহাদের বংশগত-রক্তগত-চরিত্রগত। কথায় বলে "স্বভাব যায় না মলে; ইল্লৎ যায় না ধুলে"। উদ্ভিদ সম্বন্ধে প্রবাদ বাক্যটি যত খাটে অন্যের বেলায় তত খাটে না। এই প্রকার অসাধু চরিত্রের উদ্ভিদের কথা তোমাদের সকলেরই পরিচিত **স্বর্ণলতাকে** দিয়াই আরম্ভ করিব।

স্বর্ণলতা লতাগাছ। ইহার কাঁচা সোণার মত দেহের বর্ণ-ই ইহাকে নাম দিয়াছে স্বর্ণলতা। এই সোণার বর্ণ ও দুর্ব্বল দেহের জন্যই স্বর্ণলতার সর্ব্বনেশে স্বভাবের কথা ভুলিয়া অন্যগাছ ইহাকে আশ্রয় দেয়। পৃথিবীর বুকে জন্মগ্রহণ করিলেও,

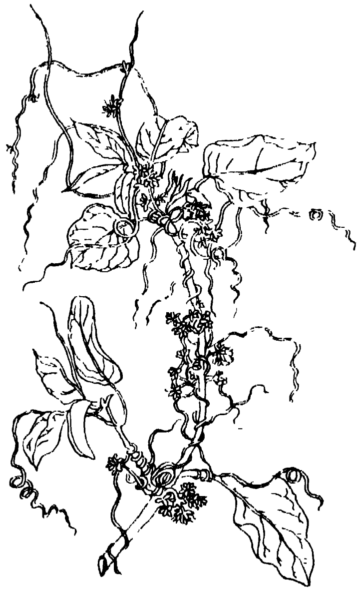
পরে তাহার সহিত আর কোন সম্বন্ধ রাখে না, এমনই অকৃতজ্ঞ, নিমকহারাম সে। বীজ হইতে সে যখন জন্মগ্রহণ করে তখন না থাকে তার শিকড়,



স্বর্ণলতার জন্মগ্রহণ

না থাকে সবুজ পাতা, থাকে কেবল এক টুকরা সোনার বরণ সরু দেহ। সেই দেহ লইয়াই সে একবার এদিক, আবার ওদিক মাথা হেলাইয়া দেখিয়া লয় কোন দিকে তাহার আশ্রয় মিলিবে। আবার যে সে আশ্রয় হইলে চলিবে না, সবুজ পাতাওয়ালা গাছ চাই যে উহার জন্য খাবার তৈয়ার করিতে পারিবে। এ রকম আশ্রয় যদি সহজেই মিলিল স্বর্ণলতা শিশু বাঁচিয়া গেল, আর যদি না মিলিল তবে সে অকালেই মরিল। আমাদের কলেজের বাগানে বেচারা ডুবাণ্টা গাছের উপর ইহাদের এক জনকে আশ্রয় লইতে দেখিয়াছিলাম। তাহার কথাই এখানে বলিতেছি।

ডুবাণ্টা গাছের কাছেই স্বর্ণলতা শিশুটি জন্মিয়াছিল। মাথা নাড়াইয়া নিকটেই ডুবাণ্টা গাছকে সে দেখিতে পাইয়াছিল। আস্তে আস্তে তাহার নিকটে আসিয়া সে নিশ্চয় বলিয়াছিল, বন্ধু, আমি অসহায়, দুর্ব্বল, আমাকে একটু আশ্রয় দেও। ডুবাণ্টা তাহাকে আশ্রয় দিল, আশ্রয় পাইয়া সে তাহাকে জড়াইয়া ধরিল, আহা, কতই না বন্ধুতা! কতই না ভালবাসা! তারপর কি করিল জান? ধীরে ধীরে স্বর্ণলতা তার আশ্রয়দাতা বন্ধুর গা জড়াইয়া উপরে উঠিল। পাছে তাহার স্বভাব ও উদ্দেশ্যের কথা জানিতে পারিয়া ডুবাণ্টা বাতাস কিংবা অন্য কাহারও সাহায্যে তাহাকে দূর করিয়া দেয় সেই জন্য স্বর্ণলতা প্রথমে নিজের দেহ হইতে একপ্রকার মূল বাহির করিয়া আশ্রয়দাতার শরীরের মধ্যে ঢুকাইয়া দিয়া তাহার শরীরের সঙ্গে নিজেকে শক্ত করিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। ইহার পর মাটির সঙ্গে আর সে কোন সম্বন্ধ রাখিল না। ডুবাণ্টা তখন উপায়হীন, তাড়াইবার আর কোন সামর্থ্যই তার এখন নাই। ইতিমধ্যে স্বর্ণলতা তার মাথায় চড়িয়া বসিয়াছে, বুকের ভিতর যেখানে প্রাণধারণের জন্য খাবার ও জল থাকে সেইখানে চোষকমূল পাঠাইয়া



স্বর্ণলতার ডুবাণ্টা আক্রমণ

বন্ধুর (?) খাদ্য ও জল শোষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এ রকম করিয়া ঘাড়ের উপর চাপিয়া বসিয়া খাবার শোষণ করিলে মধ্যবিত্ত বন্ধু আর

কতদিন বাঁচিবে? তার উপর পরের তৈরী খাবার খাইয়া সে এখন দেহের প্রসার করিয়াছে, হাত পা ছড়াইয়া তাহার উপর চাপিয়া বসিয়াছে। কিছু দিন পরে দেখা গেল খাদ্যাভাবে ও স্বর্ণলতার চাপে ডুবাণ্টার প্রাণান্ত হইল। বেচারা অতিথিকে বন্ধুভাবে আশ্রয় দিয়া, খাদ্য দিয়া যতদিন পারিল সেবা করিল, পরে প্রাণ পর্য্যন্ত দিল।

তোমরা বলিবে স্বর্ণলতার শেষ পর্য্যন্ত নিজেরই বা লাভ কি হইল? খাদ্য না পাইয়া তাঁকে তো মরিতে হইল, যেমন কর্ম্ম তেমনই ফল! ভগবান তো আছেন? কিন্তু তাহা হয় না। ইহারই মধ্যে নিজের দেহে ফুল ফুটাইয়া সে বীজ উৎপাদন করিয়াছে। সুতরাং নিজে মরিয়া গেলেও বংশরক্ষার ভাবনা আর তা'র নাই। ইহা ভিন্ন সে জানে কোনও প্রকারে ইহার দেহের এক টুকরা অংশ যদি কাহারও সংসারে প্রবেশ করে তবে সেখানেই সে নিজের আস্তানা গাড়িবে, নতন করিয়া জীবন যাত্রা সুরু করিবে। রক্তবীজের ঝাড় যেন, সহজে ওদের মৃত্যু নাই। যদি কোন গাছের উপর স্বর্ণলতার গাছ দেখিতে পাও তবে উহার দেহ হইতে একটুকরা ছিঁড়িয়া লইয়া কোন গাছের উপর ফেলিয়া দিয়া কিছু দিন বাদে দেখিও সে কি অবস্থায় আছে। স্বর্ণলতার স্বভাবকে তোমরা কি

স্বর্ণলতার সোণার বর্ণ দেহ তোমরা তবুও দেখিতে পাও **'বেণেবউ'** এর সে বালাইও নাই। 'বউ' মানুষের কি বাহির হইতে আছে? তাই তিনি লজ্জায় মাটির নীচে বেগুণ, তামাক, পোস্ত, সর্ষে প্রভৃতি গাছের শিকড়ের মধ্যে প্রায় অশরীরী অবস্থায় বাস করেন। যাহাকে আশ্রয় করেন তাহারই প্রস্তুত খাদ্য গ্রহণ করিয়া কোন রকমে লজ্জা বাঁচাইয়া নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করেন। কিন্তু বংশ রক্ষা করিবার জন্য একটি বেশ মোটা মোটা মঞ্জরী-দণ্ড মাটি ভেদ করাইয়া উপরে পাঠান। অমন যে মাটির মানুষ বউ কিন্তু তার বেগুনি রংএর ফুলগুলি দেখিতে কি সুন্দর! কে বলিবে ইনি পরজীবী, আশ্রয়দাতার দেহে বাস করিয়া তাহারই প্রস্তুত খাদ্য চুরি করিয়া খান? বেগুণ কিংবা তামাকের ক্ষেতে ইহাদিগকে দেখিতে পাইলে যদি অবিলম্বে দূর না কর তবে ফসলের আশা করিও না।

এই রকমই **ইজিনেটিয়া** (Aeginetia) নামে আর একজন লজ্জাবতী আছেন, তিনি খস্‌খস ও অন্যান্য ঘাসের উপর বসিয়া খান। ইঁহার ফুলগুলিও অতি সুন্দর দেখিতে, এ যেন গোবর গাদায় পদ্মফুল।

কিন্তু সুমাত্রা দ্বীপের **র‍্যাফ্লেসিয়া** (Rafflesia) পরজীবী গাছের মধ্যে ফুল ফুটান বিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহার দেহ একগাছি অতি সরু তন্তুর মত। আশ্রয়দাতার শরীরের মধ্যেই ইহারা বাস করে। কিন্তু ফুল ফুটাইবার সময় সেই তন্তু সদৃশ দেহেরই এক অংশ আশ্রয়দাতার দেহ ভেদ করিয়া বাহিরে পাঠায়, আর তাহারই উপর যে ফুল ফোটে আকারে তাহা পৃথিবীর সকল ফুলের চাইতে বড়, তাহার ব্যাস এক মিটারেরও অধিক। একটি ছোট্ট ছেলেকে এই ফুলের উপর অনায়াসে বসাইয়া রাখা যায়।

উপরে যাহাদের কথা বলিলাম তাহারা নিজে-দের প্রাণ বাঁচাইতেই অপরের খাদ্য চুরি, ডাকাতি করিয়া পরিশেষে তাহাকে খুন করে। কিন্তু ইহা-দের মধ্যে কয়েকজন আছে যাহারা অনেকটা সভ্য এবং দরকার হইলে কিছু কিছু খাদ্য আশ্রয়-দাতাকেও সময় সময় দিয়া থাকে। আমাদের দেশে এই জাতীয় গাছকে সাধারণ ভাবে **পরগাছা** বলে। আম, জাম, শিমুল প্রভৃতি গাছের উপর ইহাদিগকে দেখা যায়। যে গাছকে ইহারা আশ্রয় করে তাহার পাতার সহিত ইহাদের পাতা মিশিয়া থাকে বলিয়া অনেক সময় ইহাদিগকে ধরা যায় না, কিন্তু শিমুল প্রভৃতি গাছের পাতা যখন শীতকালে ঝরিয়া যায়, তখন ইহাদিগকে চিনিতে আর কষ্ট হয় না। পৃথিবীর সহিত ইহাদের কোন কালেই কোন সম্বন্ধ নাই। পাখী ফল খাইয়া কিংবা অন্য কোন উপায়ে ইহাদের বীজ কোন গাছের উপর পড়িলেই সেখানে ইহারা জন্মগ্রহণ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে চোষক মূল আশ্রয়দাতার শরীরের মধ্যে ঢুকাইয়া খাদ্যদ্রব্য ও জল আহরণ করে। ইঁহারা পরজীবী হইলেও নিষ্ঠাবতী, স্বপাকে খান, পরের রান্না করা খাদ্য স্পর্শও করেন না। দেহে ইঁহারা

সবুজ পাতা ধারণ করেন, আর যার ঘাড়ে চড়েছেন তার নিকট হইতে জল ও খাদ্য দ্রব্য শোষণ করিয়া সেই পাতায় আনেন ও সূর্য্যের তাপে তাহাকে রান্না করিয়া নিজের খাদ্য নিজে প্রস্তুত করেন ও



শিমুল গাছের উপর পরগাছা

তাহা খাইয়া জীবন ধারণ করেন। শীতকালে পাতা ঝরিয়া গেলে শিমুল গাছের মত আশ্রয়-দাতাকে ইঁহারা দয়াপরবশ হইয়া কিছু কিছু খাদ্য দিয়াও থাকেন, অবশ্য জল এবং কাঁচা খাদ্য-দ্রব্য শিমুল গাছই সরবরাহ করে। ইহাদিগকে তোমরা 'ছিঁচকে চোরের' সহিত তুলনা করিতে পার।

আর একজাতীয় গাছ আছে যাহারা কেবল খুন করার আনন্দেই খুন করে। আর ইহাদের হত্যা করিবার রীতিটি ঠগীদের গলায় ফাঁস পরাইয়া দম আটকাইয়া খুন করিবার রীতির মতই। এই রকম একটি গাছের খবর দিয়াছেন বেটস সাহেব তাঁহার The Naturalist on the River Amazon নামক পুস্তকে। তিনি লিখিয়াছেন সেই দেশে এই গাছগুলিকে Sipo matador অর্থাৎ 'খুনীলতা' (Murderer Liana) বলে। আমাদের দেশের ডুমুরের জ্ঞাতি-ভাই ইহারা। যাহাকে আশ্রয় করিবে তাহাকে কাছে পাইলেই তাহার গা বহিয়া ইহারা উপরে উঠে। প্রথম অবস্থায় ইহার দেহ এমন নমনীয় থাকে যে তাহাকে খানিকটা প্রসারিত করিয়া আশ্রয়দাতার কাণ্ডের একপার্শ্ব জুড়িয়া আঠার মত লাগিয়া থাকিয়া কতকটা উপরে উঠে। এই রকমে একটু উপরে গিয়াই দুইপার্শ্ব হইতে হাতের মত দুইটা অঙ্গ বাহির করিয়া কাণ্ডটিকে বেশ করিয়া সম্পূর্ণ ভাবে জড়াইয়া ধরে। এই রকমে যত উপরে উঠে ততই দুই দিক হইতে হাত বাহির করিয়া আশ্রয়দাতাকে জড়াইয়া ধরিতে থাকে। এইরূপে ক্রমশঃ চারিদিক হইতে বাঁধিয়া ফেলিয়া আস্তে আস্তে তাহাকে চাপিতে আরম্ভ করে। **সিপোমাতাদোর** যতই বড় হয়, ততই পিষিয়া উহার খাদ্য ও জল চলাচলের পথগুলিকে নষ্ট করিয়া ফেলে। এই ভাবে কিছু-

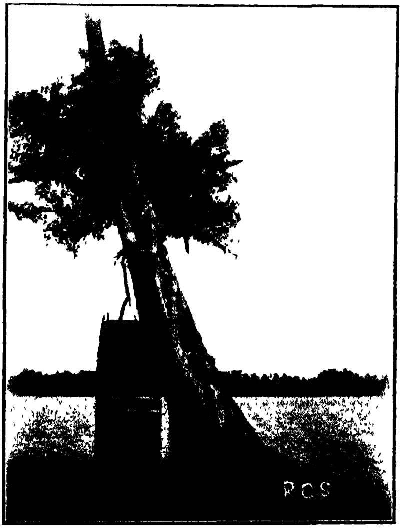


পাতাছাড়া গাছের উপর পরগাছা

দিনের মধ্যেই 'হাড়গোড়' ভাঙ্গিয়া তাহাকে নিঃস্বার্থভাবে হত্যা করে। তখন দেখা যায় **খুনী-লতা** তাহার মৃত আশ্রয়দাতার দেহ জড়াইয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বেটস লেখেন নাই খুনীর মুখে হত্যার আনন্দ দেখিয়াছিলেন কি না?

কিংসলি সাহেব তাঁহার At Last পুস্তিকায় আর একটি ঠগীর বর্ণনা দিয়াছেন। ত্রিনিদাদে তিনি ইহাকে দেখিয়াছিলেন। ইহার নাম **মাতাপোলো** (Matapolo) এবং ইনিও

হত্যাব্যবসায়ী। ইহার বীজ যখন কোন বড় গাছের উপর আশ্রয় পাইয়া অঙ্কুরোৎপাদন করে তখন হইতেই ইহার ঠগীজীবন আরম্ভ হয়। প্রথমে ইহারা আশ্রয়দাতার গা বহিয়া শিকড় নামাইতে আরম্ভ করে। কিংসলি যাহার কথা লিখিয়াছেন সে ৮০ ফিট উঁচুতে বসিয়া জীবন আরম্ভ করিয়াছিল। তারপর নিজে বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আশ্রয়দাতার গা বহিয়া চতুর্দ্দিকে শিকড় নামাইতে সুরু করে। ক্রমে তাহাকে চারিদিক হইতে শিকড় দিয়া ঘিরিয়া ধরে। তারপর সাপ যেমন শিকার ধরিতে পারিলে তাহাকে পেঁচাইয়া চাপ দিয়া হাড়গোড় ভাঙ্গিয়া পিষিয়া মারিয়া ফেলে, ইহারাও আশ্রয়দাতাকে সেই ভাবে হত্যা করে। কিছুদিন পরে দেখা যায় যেখানে ছিল আশ্রয়দাতা



বটগাছের তালগাছ আক্রমণ

যেখানে তাহারই অস্থির উপর দাঁড়াইয়া হাসিতেছে **মাতাপোলো**। অদৃষ্টের কি পরিহাস!

তোমরা ভাবিতেছ ইহারা তো অন্য দেশের গাছ। আমাদের দেশে কি এ রকম গাছ নাই? নিশ্চয়ই আছে এবং তাহাদেরই একজন আমাদের **বট** গাছ। তবে ইহা স্বভাব-খুনে নয়। বট গাছ পাখীর সাহায্যে বংশ বিস্তার করে। পাখী ফল খাইয়া যেখানে বিষ্ঠা ত্যাগ করে সেই খানেই



তালগাছের মৃত্যু-বরণ

বট গাছের ছোট চারা দেখিতে পাইবে আর সেই কারণেই ভাঙ্গা বাড়ীর ছাদে, পুরাতন মন্দির, মসজিদ বা গির্জ্জার মাথায় ইহাদিগকে জন্মিতে দেখা যায়। অনেক গাছের গায়ে বসিয়াও ইহারা জীবনযাত্রা আরম্ভ করে। রাস্তায় ঘাটে খেজুর তাল গাছের উপর ইহাদের দুই একটি শিশুকে দেখিতে পাইবে। এই শেষোক্ত অবস্থাতেই ইহাদিগকে ঠগীর মত ব্যবহার করিতে দেখা যায়।

খেজুর কিংবা তাল গাছের গায়ে তাহার পাতার গোড়াগুলি প্রথম অবস্থায় লাগিয়া থাকে। কালে সেখানে ধূলি বালি জমে। সেইখানে পাখী বট কি অশ্বত্থ গাছের ফল খাইয়া বিষ্ঠা ত্যাগ করিল। কালক্রমে সেখানে জল বাতাস পাইয়া বটের 'বেবি' জন্মগ্রহণ করিল। যতই সে বড় হইতে থাকিল

ততই যাহার কোলে সে মানুষ হইতেছিল তাহার গা বহিয়া মাটির দিকে শিকড় চালাইতে আরম্ভ করিল। ক্রমে সেই শিকড়গুলি তাহাকে 'বেড়া-জালে' ঘিরিল, তারপর ক্রমশঃ তাহাকে পিষিয়া মারিয়া ফেলিল। এই প্রকারে বাল্যের আশ্রয়-দাতাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিয়া তাহারই যায়গায় দাড়াইয়া সাধু বটগাছ, নারায়ণের প্রতীক বটগাছ, বুদ্ধদেবের অভিসংবর্তী বটগাছ, পরোপকার করিতে আরম্ভ করিলেন।

কিন্তু উদ্ভিদের মধ্যে সব চাইতে বড় খুনী কে, জান? ছত্রাক জাতি (Fungi)। ইহাদের বেশীর ভাগই অদৃশ্য আততায়ী। ইহারা স্বজাতিকে খুন করিয়াই শান্ত হয় না, পৃথিবীর সমস্ত জীব জগৎ-বর-কি উদ্ভিদ কি প্রাণী-সকলের শত্রু ইহারা, যাহাকে ধরে তাহার শেষ না করিয়া ইহারা সহজে ছাড়ে না। ইহাদেরই ভয়ে মানুষ সর্বদা সন্ত্রস্ত। চারি বৎসরে মহাযুদ্ধে যত লোক না মরিয়াছিল ইহাদেরই একজনের আক্রমণে এই ভারতবর্ষেই বছের মাসের মধ্যেই তাহার বেশী লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। এর এক সময় মহামারীরূপে উপস্থিত হইয়া গ্রামে সহরে কি অনর্থ ঘটায়, কত লোককে হত্যা করে তাহার খবর তোমরা কিছু কিছু খবরের কাগজে দেখিয়া থাক। কলেরা, টাইফয়েড, নিউমোনিয়া, যক্ষ্মা রোগ ইহাদের আক্রমণেই প্রকাশ পায়। ইহাদের শক্তি অসীম। বড় বড় গাছকে, তুলনায় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ইহারা, হত্যা করিতে দ্বিধা বোধ করে না। অমন যে শক্তিমান মানুষ সেও ইহাদের সঙ্গে সংগ্রামে সহজে জয়ী হইতে পারে না। ইহাদের কথা এখানে বলিব না। পৃথক করিয়া স্থানান্তরে বলিব।

শ্বেত চন্দন তোমরা সকলেই জান। প্রাগৈতি-হাসিক যুগ হইতে চন্দন আমাদের দেশে প্রসাধনের প্রধান উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

> রূপের সাগর রূপের নাগর
> গুরুক চন্দন গায়॥ অন্নদামঙ্গল।

রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের উপর অভিমান করিয়া বলিতেছেন—

> চন্দন চুয়া আদি গন্ধ নানাবিধ
> ভাসাইয়া দেহ সখি যমুনারই জলে।

চন্দন ভিন্ন কোন পূজাই হয় না, ইহাকে উদ্দেশ্য করিয়া আমাদের কবিরা বহু শ্লোক রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাহার দুই একটা এখানে উদ্ধৃত করি-তেছি, কারণ আমার নিজের বড় ভাল লাগিয়াছে—

> কান্তাকেলিং বলয়তু তরুঃ কোঽপি কশ্চিৎপ্রসূনা-
> মত্তানন্দং জনয়তু ফলৈঃ কোঽপি লোকান্ধিনোতু।
> ধন্যাং মন্যে মলয়জমহো যঃ প্রভূতোপতাপং
> সংসারস্য ক্ষতমপনয়ত্যাত্মদেহব্যয়েন॥

কবি বলিতেছেন—কোন বৃক্ষ স্ত্রীলোকদিগের মনো-রঞ্জন করুক, কেহ বা নিজ পুষ্প আনন্দবর্দ্ধন করুক, কেহ বা নিজ নিজ ফল সম্ভার দ্বারা মানবগণের আনন্দদায়ক হউক—কিন্তু হে চন্দন বৃক্ষ! তোমাকেই ধন্য মনে করি, যে হেতু তুমি নিজ শরীর ক্ষয় করিয়াও সংসারের নানাবিধ সন্তাপ অতি শীঘ্র নষ্ট করিয়া থাক।

> বাসঃ শৈলশিলান্তরেষু সহজঃ সঙ্গো ভুজঙ্গৈঃ সহ
> প্রোৎসর্পৎপয়োধিবীচিভিরভূদ্ভূতিসেকক্রিয়া।
> জানীমো ন বয়ং প্রসীদতু ভবান্শ্রীখণ্ড তৎবর্ণ্যতাম
> কস্মাত্তে পরতাপখণ্ডন মহাপাণ্ডিত্যমভ্যাগতম্॥

হে শ্রীখণ্ড! তুমি পর্ব্বতের প্রস্তরখণ্ডের মধ্যে বাস করিয়া থাক, সর্পগণের সহিত তোমার স্বাভাবিক মিলন, চঞ্চল লবণ সমুদ্রের তরঙ্গমালা তোমার উৎপত্তির জন্য জল সেচন করিয়া থাকে। আমরা জানি না; তুমি আমাদিগকে দয়া করিয়া বল তোমার এই পরসন্তাপনিবারক নৈপুণ্য কোথা হইতে লাভ করিলে?

এমন যে চন্দন—সেও চোর। উপরে সে অতি ভাল মানুষ, কিন্তু মাটির নীচে, অন্ধকারে, অন্য গাছের শিকড়ের মধ্যে চোষকমূল চালাইয়া দিয়া খাদ্যের উপকরণ সে সংগ্রহ করে। মানুষের সমাজেও 'দিনে সাধু রাত্রে চোর' এমন লোকের অভাব নাই।



বাইবেলের গল্প

[মহাত্মা যীশুখৃষ্ট তাঁহার শিষ্যদিগকে উপদেশ দিবার সময় অনেক সুন্দর সুন্দর গল্প বলিতেন। এই সব গল্পগুলি বরাবর লোকের মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছে। এই গল্পগুলি সেই হাজার হাজার বছর আগের ছেলেমেয়েরা যেমন আগ্রহের সহিত শুনিয়া আসিয়াছে এখনকার ছেলেমেয়েরা ও তেমনি আগ্রহের সহিত শুনিতেছে। আবার হাজার হাজার বছর পরের ছেলেমেয়েরাও হয়ত শুনিবে। এই গল্পটি বাইবেলের 'হারাণ পুত' গল্প অবলম্বনে লিখিত। লূক ১৫ : ১১-৩২]

অপব্যয়ী পুত্র

২৮১৯ পৃষ্ঠার পর

এক যে ছিলেন বণিক, তিনি ছিলেন বড় ভাল লোক। বড়লোকেরা তাদের গরীব প্রতিবেশীদের উপর বড় অত্যাচার করে থাকে; গ্রামবাসীরা তাদের বড় ভয় করে। কিন্তু এই সদাগর ছিলেন বড় ভাল লোক, সকলে তাঁকে বড় শ্রদ্ধা করত। তিনি ছিলেন গৌরবর্ণ, দীর্ঘকায় পুরুষ। তাঁর প্রশান্ত মুখের দিকে চেয়ে দুঃখী তাদের দুঃখের কথা জানাতে কিছুমাত্র ভয় পেত না। তাঁর করুণাপূর্ণ দৃষ্টি জানিয়ে দিত যে তিনি তাদের সব কষ্ট নিবারণে সচেষ্ট।

সদাগরের বাড়ীর চারিদিকে মস্ত বড় বাগান ছিল। দুটো বড় পুকুরে বাঁধান ঘাট ছিল। বাড়ীর সামনেই ছিল একটা বড় পুকুর—এই পুকুরে সকল সময় কালো ও সাদা রাজহাঁস ভেসে

পুকুরের চারিদিকে ছিল বাগান। বাগানের স্থানে স্থানে প্রস্তর নির্ম্মিত মূর্ত্তি ছিল। বাগানের এক কোণে এক চমৎকার ফোয়ারা ছিল। তার চারপাশে ঝোপের মধ্যে বসবার জন্য সুন্দর

ছিল। আর একটি পুকুর ছিল বাড়ীর পিছন দিকে। সেইটা অন্দর মহলের পুকুর। এই পুকুরের দু'পাশে ছিল দুটা বাগান। একটা দেবালয়ের পূজার ফুলের জন্য আর অপরটা শাকসব্জী ইত্যাদির জন্য। রোজ সকাল-সন্ধ্যায় মন্দিরের পূজা সমাপ্ত হয়ে গেলে সামনের বাগানে গরীব-দুঃখীদের খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। সন্ধ্যাবেলা যখন দেবালয়ের ঘণ্টাতে সওদাগরের বাড়ীর কানন মুখরিত হ'ত, তখন সকলের মনে হ'ত যেন তারা সত্যই ভগবানের কত কাছে আস্‌তে সুযোগ পেয়েছে।

কাজেই গ্রামের লোকেরা যে সদাগরকে খুবই শ্রদ্ধা করত তাতে কোন সন্দেহ ছিল না।

সদাগরের বাড়ী হইতে প্রায় এক মাইল দূরে ছিল তাঁহার ক্ষেত-খামার। ক্ষেতের কাছেই তেপান্তরের মাঠের মত এক মস্তবড় মাঠ ছিল। রোজ ভোর বেলা যখন সূর্য্য উঠি উঠি করে পূর্ব্বদিকের আকাশে আবীর ছড়িয়ে দিয়ে তার আগমন জানিয়ে দেয়, ঠিক সেই সময় সওদাগরের বাড়ী থেকে এক পাল গরু, ভেড়া ও ছাগল বার হয়ে মাঠে চরতে আসতো—চাষ করতে আসতো।

সদাগরের দুই ছেলে ছিল। বড় ছেলে ছিল বেশ শান্ত শিষ্ট। বাবার সঙ্গে বাণিজ্যের কায-কারবার, জমিদারীর কাজ দেখাশোনা করে। জমিদারী ছেড়ে সে কোথাও যেতে চায় না। সব সময় বাবার কাছে থাকতে ভালবাসে। তার ছোট ভাইকেও সে খুব স্নেহ করে। সকালে এক একদিন বড়ছেলে বাবার সঙ্গে জমিদারীর কাগজ পত্র দেখে, আবার এক একদিন মাঠে গিয়ে যারা গরু চরাত, তাদের দেখাশোনা ও গ্রামের লোকদের দেখাশোনা করতো। সন্ধ্যাবেলা সে আবার ছোট ভাইকে নিয়ে বেড়াতে যেত; গ্রামের অন্য ছেলেদের সঙ্গে খেলা করে সময় কাটাতো।

এদিকে সদাগরের ছোট ছেলে তার দাদার মত শান্ত প্রকৃতির ছিল না। সে ভালবাসে সারাদিন হৈ চৈ করে সময় কাটাতে। সে রোজ গ্রামের পাঠশালায় যেত। পড়াশুনা করতে খুব ভালবাসতো। তবে সব থেকে বেশী ভাল লাগত তার ভূগোল পড়তে। সে মনে মনে ঠিক করে-ছিল যে বড় হ'লে অনেক দেশ-বিদেশে বেড়িয়ে আসবে।

এই ভাবে অনেক বছর কেটে গেল। সদাগর বৃদ্ধ হলেন। জমিদারীর কাজ তিনি আগের মত দেখতে পারতেন না। এখন দুই ভাইয়ে মিলে জমি-দারীর দেখাশোনা বেশী করে। একদিন দুই ভাই সন্ধ্যাবেলায় বাগানে বেড়াচ্ছিল। বেড়াতে বেড়াতে তারা পুকুরঘাটে এসে বসলো। উপরে নীল আকাশে ছোট ছোট সাদা মেঘ আনমনে ভেসে যাচ্ছিল। নীড়ে-ফেরা কাক শেষ ডাক দিয়ে দু' ভাইয়ের মাথার উপর উড়ে চলে গেল। সন্ধ্যার শেষ আলো মিলিয়ে গিয়ে যখন পৃথিবী ক্রমে নিস্তব্ধ হয়ে আসে সে সময় দু'ভাইয়ে মিলে তাদের ছোট-বেলার কত মধুর-স্মৃতি-জড়িত গল্প করতে আরম্ভ করলো। এই ভাবে নানা বিষয়ে গল্প করতে অনেকক্ষণ কেটে গেল। হঠাৎ ছোট ভাই বলল, "দাদা, আমি বিদেশে বেড়িয়ে আসতে চাই।" দাদা বললো, "কাজ কি ভাই, এখন বাবা বুড়ো হয়েছেন, তুমি বিদেশে যেও না। বাড়ী থাকতে তোমার কি হয়েছে?" ছোট ভাই কিন্তু কিছুতেই শুনল না সে বললে, "ছোট বেলা থেকে আমি এই বাড়ী ও এই গ্রাম দেখে আসছি কোথাও তো যেতে পারলাম না। এখন আমি বড় হয়েছি, নতুন দেশে বেড়াতে চাই।" বড় ভাই বিরক্ত হ'ল বলল, "কেন ভাই, আমিও তো ছোট বেলা থেকে বাড়ী ছেড়ে কোথাও যাইনি—আমার কিন্তু বিদেশে যাবার এত ইচ্ছে তো কোনদিন হয় নি?" ছোট ভাই বলে, "তুমি দাদা, পুরোনো জিনিষ নিয়ে খুসী থাক, আমার কি দোষ? আমি কিন্তু নতুন চাই।"

একদিন ছোট ভাই তার বাবার কাছে গিয়ে বলল, "বাবা, আমি বড় হয়েছি, সম্পত্তির যে অংশ আমি পাব সেটা আমাকে দিয়ে দাও, আমি বিদেশে যাব।" প্রথমে ছেলের কথা শুনে সদাগর দুঃখিত হলেন, কিন্তু শেষকালে ছেলের কথায় রাজী হয়ে ছোট ছেলেকে তার সম্পত্তির ভাগটা দিয়ে দিলেন।

পরদিন সকাল বেলা সে বাবা ও দাদার কাছে বিদায় নিয়ে যাত্রায় বার হ'ল। নতুন প্রাণ, নতুন আনন্দ, কত উৎসাহ নিয়ে সে অজানা দেশের দিকে চলল। সঙ্গে তার টাকা পয়সা ছিল ঢের কাজেই পথে তার বন্ধুর অভাব হল না। চলতি পথে তার অনেক বন্ধু জুটলো। তাদের সঙ্গে সে সব সময় থাকতো। তারা সকলে মিলে বড় মানুষী করে দু'দিনের মধ্যেই সব টাকা উড়িয়ে দিল। বন্ধুরা অবস্থা বুঝে সব পালিয়ে গেল। সে একা পড়ে মহা বিপদে পড়লে। খাবার পয়সাটুকুও তার ছিল না। কাজেই উপায় না দেখে সে ভিক্ষা করে যা পেত তাই দিয়ে সন্তুষ্ট থাকত। কিন্তু এর থেকেও বেশী বিপদ তার কপালে ছিল। এই ভাবে কয়েক মাস কেটে গেল। তখন সে দেশে এক

মহা দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। সদাগরের ছেলের বুঝি দুঃখের শেষ নেই, সে কি করবে বুঝতে না পেরে এক ধনী ব্যক্তির আশ্রয় ভিক্ষা করলো। সে ধনী ব্যক্তি তাকে শূকর চরাতে মাঠে পাঠিয়ে দিল।



শূকর চরাতে পাঠিয়ে দিল

তখন খিদেতে তার এত কষ্ট হচ্ছিল যে শূকরদের খাবার খেয়ে পেট ভরাতে পারলেও সে খুশী হোত। এমনি করে দিন কাটলো। তারপর একদিন হঠাৎ ভোর বেলা উঠে তার চেতনা হল। সে ভাবল, "আমার বাবার জমিদারিতে কত চাকর আছে, তারা তো পেট ভরে খেতে পাচ্ছে, অথচ আমি তার ছেলে হয়ে খিদেয় মরছি। আমি বাবার কাছেই ফিরে যাব। আবার তার মনে হল, না আমি বাবার কাছে কোন্ মুখে ফিরে যাব? আমি সব টাকা নষ্ট করেছি বাবা নিশ্চয় রাগ করে আমায় তাড়িয়ে দেবে। কাজেই না যাওয়া ভাল; কিন্তু এ-কথা মনে হলেও তার কিছুতেই শান্তি হচ্ছিল না। অনেক ভেবে সে মনে মনে বলল, "না, আমি বাবার কাছেই ফিরে যাব। আমি হাজার দোষ করলেও তিনি আমায় ছেলে বলে কি ক্ষমা করতে পারবেন না? আমি তাঁর পায়ে পড়ে বলবো, 'বাবা, আমি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ও তোমার বিরুদ্ধে পাপ করেছি। তোমার ছেলে বলে পরিচয় দেবার যোগ্য আমি নই। তুমি আমাকে ক্ষমা করে তোমার একজন চাকরের মত আমায় রেখে দাও"। আমি যদি বাবার কাছে যাই তিনি আমায় কখনও তাড়িয়ে দেবেন না। মনে এই স্থির করে সে আবার বেরিয়ে পড়লো। সে কত আশা কত আনন্দ ও [illegible]হ নিয়ে যে পথে বেরিয়েছিল—আজ সে ছিন্ন মলিন বেশে, ভগ্নোৎসাহ ও নিরাশ হয়ে সেই পথে ফিরে চললো।

এদিকে কিন্তু সদাগর তার ছেলের কথা ভোলেননি। তিনি প্রতিদিন পথের দিকে চেয়ে ছেলের আসার আশায় বসে থাকতেন। এইভাবে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কেটে গেল; হারানো ছেলে আর আসে না। চিঠি লিখেও ছোট ছেলে তার নিজের কোন খবর দেয় নি। কিন্তু সদাগর নিরাশ হলেন না, তিনি রাগও ছেলের উপর করলেন না, থেকে থেকে শুধু তার প্রাণ কেঁদে উঠতো ছেলের জন্য। তিনি ভাবতেন, "ছেলে আমার কবে ফিরে আসবে? সে দূর দেশে গিয়ে মারা গিয়েছে কি?

একদিন তিনি বসে আছেন, এমন সময় দেখেন সেই হারানো ছেলে আসছে ছিন্ন মলিন বস্ত্র পরে ধীরে ধীরে ভয়ে ভয়ে আসছে। এতদিন পরে এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে হারানো ছেলেকে পেয়ে পিতার মনে আনন্দের সীমা রইল না। সদাগর দৌড়ে গিয়ে তাকে আলিঙ্গন করে তাকে চুম্বন করলেন।

ছেলে তার বাবার কাছে এমন ব্যবহার আশা করেনি। সে ভেবেছিল তার বাবা তার উপর না



এমন সময় দেখেন হারানো ছেলে আসছে

জানি কত রাগ করবেন। তাই সে কৃতজ্ঞতায় ও অনুতাপে তার দুই চোখ জলে ভরে উঠলো। সে কেঁদে তার বাবার পায়ে পড়ে বলল, "বাবা, ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ও তোমার বিরুদ্ধে আমি পাপ করেছি, তোমার ছেলে বলে পরিচয় দেবার যোগ্য আমি নই। তুমি আমায় ক্ষমা করে তোমার একজন

চাকরের মতই রেখো।" কিন্তু সদাগর চাকরদের আদেশ দিলেন,—শীঘ্র ছেলেকে ভাল কাপড় ও তার হাতে আংটি ও পায়ে জুতো পরিয়ে দাও। আজ আমরা একটা ভোজ দেবো ভোজের আয়োজন কর। কারণ আমার এই ছেলেটি মরে আবার বেঁচেছে এ যে আমার হারানো ছেলে ফিরে পেয়েছি।

এদিকে বড় ভাই এতক্ষণ মাঠে ছিল। সে ছোট ভাইয়ের আগমন সংবাদ এখনও পায়নি। বাড়ী ফিরতেই দূর থেকে গান বাজনার শব্দ শুনতে পেল। কিছু বুঝতে না পেরে সে একজন চাকরকে ডেকে এত গোলমালের কারণ জিজ্ঞেস করলে। চাকরটি বলল "আপনার ছোট ভাই ফিরে এসেছে এবং বাবা তাকে সুস্থ শরীরে পেয়েছেন বলে ভোজের আয়োজন করেছেন।" বড় ভাই এই খবর শুনে রাগ করলো। বাড়ীর মধ্যে না গিয়ে বাইরে পুকুরঘাটে বসে রইল। এইভাবে বসে বসে অনেক কথা ভেবে ছোট ভাইয়ের উপর তার রাগ হ'ল এবং তার মন বিদ্রোহী হয়ে উঠলো। সে ঠিক করলো যে আমোদে যোগ দেবে না।

এই সময় কিন্তু সদাগর বড় ছেলের খোঁজ করছিলেন। তিনি ভাবলেন, "সে ত কোনদিন মাঠে এত দেরী করে না—তার হল কি? এমন সময় সেই চাকরটি এসে জানাল যে বড় বাবু রাগ করেছেন, তাই পুকুর পাড়ে বসে আছেন। এ কথা শুনে বাবার মন ব্যথিত হল, তিনি ছেলের সন্ধানে পুকুর ধারে এসে উপস্থিত হলেন। সদাগর তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "এমন উৎসবের দিনে তুমি কেন রাগ করেছ? চল আমরা ভিতরে যাই।' বড় ভাই তবুও উঠলো না, সে অভিমান ভরে বাবাকে বললো, "এতদিন আমি আপনার কাছে থেকে আপনার সেবা করেছি, আপনার কোন কথা অমান্য করিনি, তবুও আপনি কোনদিন আমার বন্ধুদের সাথে আমোদ করে খাবার জন্য ব্যবস্থা করেননি কিন্তু আজ আপনার ওই দুষ্ট ছেলে আপনার অর্থ বিদেশে গিয়ে সব টাকা পয়সা নষ্ট করেছে, অথচ তার বাড়ী আসতে না আসতে আপনি মস্ত ভোজের আয়োজন করেছেন।

তখন বৃদ্ধ পিতা উত্তরে বললেন—"বাবা, তুমি তো সব সময় আমারই সঙ্গে রয়েছ, আর যা কিছু আমার সবই তো তোমার। আজ কিন্তু আনন্দ করা উচিৎ কারণ তোমার এ ভাই মরে গিয়ে আবার বেঁচে উঠেছে, সে হারিয়ে গিয়েছিল—কিন্তু তাকে আবার ফিরে পেয়েছি।"

ক্রন্দন

[খাসিয়া রূপকথা]

পূর্ব্বকালে হরিণেরা খাসিয়া পাহাড়ের নিকটস্থ সমতল প্রদেশে বাস করিত। একদা এক হরিণ-শিশু তাহার জননীকে বলিল,—"মা, শুনিয়াছি লোকে খাসিয়া পাহাড়ের 'জাঙ্গেউ' 'জাথাং'র (দুই প্রকার গুল্ম) প্রশংসা করিয়া থাকে। আমি একবার গিয়া খাইয়া দেখিব মনে করিতেছি।" মা বলিলেন,—"না বৎস! অতদূরে যাইও না, কি জানি কি বিপদই বা ঘটে। স্বদেশে শর ও নলবন আছে তাহা খাও।" সে উত্তর করিল,—"না মা, কোনও ভয় নাই, আমি সাবধানে যাইব।" যেই সে শিলঙ্গ পাহাড়ের নিকটে গিয়াছে, অমনি মনুষ্য-সন্তানগণ আসিয়া তীরবিদ্ধ করিয়া তাহাকে হত্যা করিল এবং আনন্দে কোলাহল করিয়া লম্ফ প্রদান করিতে লাগিল। তাহার মা এ দুঃসংবাদ শুনিয়া দুঃখে এইরূপে ক্রন্দন করিতে লাগিল, যথা,—

মায়ের বাছা হরিণশিশু, গিয়াছ কোথায়,
যেও না খাসিয়া দেশে বলিনু তোমায়।
নিজদেশে বাস করিতে খাইতে শর নল,
জাঙ্গেউ খাইতে বাছা কোথা গেলি বল?
এখন বল দেখি যাদু, কি হলো আমার,
ভূতল আকাশ আমি দেখি অন্ধকার।
তোমার গায়ে শেল বিঁধিয়ে ক্লেশ দিল কত,
ঐ যে তারা কোলাহল করে ঐ যে নৃত্য।
হায়! হলো যাহা ছিল কপালে আমার,
এ জগতে ন্যায় নাই নাইকো বিচার।"

হরিণ-জননী এইরূপে কাঁদিয়াছিল। ইহারই অনুসরণ করিয়া লোকে কাঁদিতে শিখিয়াছে। পূর্ব্বকালে লোকে কাঁদিতে জানিত না। হা হা হু হু করিয়া নিজ নিজ দুঃখ প্রকাশ করিত। "ক্রন্দন" এইরূপে মানব সমাজে প্রচলিত হইয়াছে।



হর্ষবর্দ্ধন

২৫৭৫ পৃষ্ঠার পর

সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভেই উত্তরাপথের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ সমূহ কিছুকাল সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের অধীনে একত্রে হইয়াছিল। হর্ষবর্দ্ধন অথবা সংক্ষেপে হর্ষ, **অশোক**, **কনিষ্ক** ও **সমুদ্রগুপ্তের** ন্যায় ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে অমর কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন। ইঁহার বিষয় আমরা সাহিত্য ও লিপির সাহায্যে অনেক কিছুই জানিতে পারি। মহাকবি **বাণভট্ট** 'হর্ষচরিত' নামক স্বরচিত গ্রন্থে তাঁহার আংশিক জীবন বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বাণভট্ট হর্ষের সমসাময়িক কবি। অতএব তাঁহার বৃত্তান্ত অবিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়ান-চোয়াং, হর্ষের রাজত্বকালে ভারত-ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ইনিও নিজের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে হর্ষকালীন ভারতের ও স্বয়ং হর্ষের বিষয় অনেক কিছু লিখিয়া গিয়াছেন। কবি ও পরিব্রাজকের গ্রন্থ হইতেই হর্ষের রাজত্বকালের ইতিহাস রচিত হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া কতকগুলি লিপি হইতেও যথেষ্ট উপকরণ পাওয়া যায়।

হর্ষবর্দ্ধনের পিতার নাম ছিল **প্রভাকরবর্দ্ধন**; প্রভাকর ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে স্থানেশ্বরের সিংহাসনে আসীন ছিলেন। ইনি জাতিতে বোধ হয় বৈশ্য ছিলেন কিন্তু সংগ্রামে ছিলেন অজেয়। ইনি পঞ্জাবের বর্ব্বর হুন, রাজপুতানার গুর্জ্জর ও মালব ভারতকে এবং সিন্ধু ও লাট দেশের রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া প্রভূত ক্ষমতা ও যশঃ লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার মাতার নাম ছিল মহাসেনগুপ্তা। ইনি উত্তরকালীন গুপ্তবংশের রাজা মহাসেনগুপ্তের ভগ্নী ছিলেন। গুপ্তবংশের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া প্রভাকরের রাজকীয় প্রভা প্রখরতর হইয়াছিল, সন্দেহ নাই।

৬০৪ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি প্রভাকর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র যুবরাজ **রাজ্যবর্দ্ধনকে** বর্ব্বর হুন জাতির বিরুদ্ধে রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম-সীমান্তে পাঠাইয়াছিলেন। সীমান্তে হূনদের উপদ্রব প্রায় লাগিয়াই থাকিত। ইহাদিগকে দমন করিবার নিমিত্ত প্রায়ই সৈন্যসামন্ত পাঠাইতে হইত। এই সময় রাজ্যবর্দ্ধনের বয়ঃক্রম মাত্র উনবিংশ বৎসর ছিল। তাঁহার ছোট ভাই হর্ষ ছিলেন পঞ্চদশ বৎসরের কিশোর। এই বয়সেই তিনি একজন শ্রেষ্ঠ সৈনিকরূপে পরিগণিত হইতেন। একদল অশ্বারোহী সেনার সহিত তিনিও অগ্রজের পশ্চাতে সীমান্তাভিমুখে গমন করিয়াছিলেন। রাজ্যবর্দ্ধন যখন যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন তখন হর্ষ রণশিবির হইতে দূরে হিমালয়ের অঞ্চলে বনে বনে মৃগয়া করিতেছিলেন।

অকস্মাৎ নীল আকাশ হইতে অশনি-পাতের ন্যায় সংবাদ আসিল যে বৃদ্ধ রাজা প্রভাকর মৃত্যু-

শয্যায় শায়িত। সংবাদ পাইবামাত্র হর্ষ রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন। রাজবৈদ্যদের সমবেত চেষ্টাকে বিফল করিয়া ও প্রজাবর্গকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া প্রভাকর দেহত্যাগ করিলেন। মৃত্যুর সময় হর্ষ পিতার শয্যার পার্শ্বে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার অন্তিম কথাগুলি শ্রবণ করিয়াছিলেন। মুমূর্ষুর শেষ কথাগুলি হইতে মনে হয় যে হয়ত বা তিনি হর্ষকেই রাজ্যভার অর্পণ করিতে চাহিয়াছিলেন। অবশ্য হর্ষ সিংহাসন পাইবার আশাকে স্বপ্নেও মনে স্থান দেন নাই। তিনি অগ্রজকে যারপর নাই শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন।

ইতিমধ্যে রাজ্যবর্দ্ধন হূনদিগকে জয় করিয়া রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি শোকে এতই আত্মহারা হইয়াছিলেন যে স্বীয় অনুজের উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া সন্ন্যাস লইয়া বনে যাইতে মনঃস্থ করিলেন। এই কথা শুনিয়া হর্ষ বড়ই ব্যাকুল হইলেন। যদি এই সময় রাজ্যের উপর ভীষণ বিপত্তি না আসিয়া পড়িত তবে তাঁহার সংকল্প টলিত না।

গৌড়রাজ শশাঙ্ক

তোমাদিগকে পূর্ব্বেই মৌখরি নামক রাজবংশের কথা বলিয়াছি। যদিও প্রথমে মৌখরি রাজগণ মগধে রাজ্যশাসন করিতেন কিন্তু পরে ইঁহারা কান্যকুব্জে রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন। মৌখরি রাজা **গ্রহবর্ম্মা** স্থানেশ্বরের রাজকুমারী সম্রাট হর্ষের ভগ্নী **রাজ্যশ্রীর** পাণি-গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজ্যশ্রীর ন্যায় বিদুষী নারী সে সময়ে ভারতে বড় বেশী ছিল না। তাঁহার ন্যায় শাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য অনেক পুরুষেরও ছিল না। আবার ললিতকলায় তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়া। তিনি হিন্দুনারীর আদর্শস্থানীয়া ছিলেন। রাজ্যশ্রীর পতি গ্রহবর্ম্মা প্রভাকরের মৃত্যুর দিবসেই দুষ্ট মালবরাজ দেবগুপ্তের দ্বারা অকস্মাৎ আক্রান্ত হইয়া প্রাণ হারাইয়াছিলেন। দেবগুপ্ত গ্রহবর্ম্মার প্রাণ লইয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। সে রাজ্যশ্রীকে “চৌরাঙ্গনা”র ন্যায় লৌহ-নিগড়ে আবদ্ধ করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছিল।

এই সংবাদ পাইবামাত্র রাজ্যবর্দ্ধনের ক্রোধবহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি আপাততঃ সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার সংকল্প পরিত্যাগ করিয়া রণসজ্জায় মনোনিবেশ করিলেন এবং দেবগুপ্তকে অনায়াসে সংগ্রামে পরাজিত করিলেন। এ দিকে কিন্তু আর এক ভীষণ বিপদ উপস্থিত হইল। দেবগুপ্তের সহিত গৌড়-রাজ শশাঙ্কের মিত্রতা ছিল। এই শশাঙ্কের আর এক নাম ছিল নরেন্দ্রগুপ্ত এবং ইনি



রাজা হর্ষবর্দ্ধন ও তাঁহার স্বহস্তলিখিত হস্তাক্ষর

যে গুপ্তবংশীয় ছিলেন সে বিষয় কোনও সন্দেহ নাই। ইঁহার রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ নামক স্থানে। কর্ণসুবর্ণ আধুনিক মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙ্গামাটী নামক স্থানের নিকট অবস্থিত ছিল। অতএব শশাঙ্ক ছিলেন বাঙ্গালাদেশের রাজা এবং সেই হেতু স্বভাবতঃই তিনি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। শশাঙ্ক গুপ্তবংশের লুপ্ত গৌরবকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। এই জন্যই

তিনি মালবরাজ দেবগুপ্তের সহিত সখ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। দুই জনেই ছিলেন গুপ্তবংশীয় এবং মনে হয় তাঁহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল পুষ্যভূতি ও মৌখরি বংশের বিনাশ সাধন করিয়া গুপ্তসাম্রাজ্য পুনরায় সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

দেবগুপ্তের পরাজয় ও নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া শশাঙ্ক এক জঘন্য ষড়যন্ত্রের আশ্রয় লইলেন। তিনি রাজ্যবর্দ্ধনকে বন্ধুভাবে নিজ শিবিরে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন এবং সেইখানে একাকী ও একান্ত নির্ভরশীল স্থানেশ্বররাজকে নৃশংসভাবে হত্যা করিলেন।

এই হত্যার বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া হর্ষ ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন এবং জ্যেষ্ঠের পাদ-রজ স্পর্শ করিয়া শপথ করিলেন যে হয় তিনি পরিগণিত দিবসের মধ্যেই পৃথিবীকে 'নিগৌড়' অর্থাৎ গৌড় জন হইতে বঞ্চিত করিবেন নচেৎ অগ্নি প্রবেশ প্রাণত্যাগ করিবেন।

হর্ষের সিংহাসন লাভ

প্রথমে মাতুলপুত্র ভাণ্ডীর সম্মতি অনুসারে ৬০৬ খৃষ্টাব্দে হর্ষ স্থানেশ্বরের শূন্য সিংহাসন আরোহণ করিলেন। গ্রহবর্ম্মার মৃত্যুর পর তিনি কান্যকুব্জের শূন্য সিংহাসন ও মৌখরি সাম্রাজ্যেরও উত্তরাধিকারী হইলেন।

সিংহাসনে আরোহণ করিবার পূর্ব্বেই হর্ষ শুনিয়াছিলেন যে রাজশ্রী কান্যকুব্জের কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া বিন্ধ্যাটবী অভিমুখে কোনও অজ্ঞাত প্রদেশে চলিয়া গিয়াছেন। অতএব তিনি প্রথমে ভগ্নীর অনুসন্ধানে বাহির হইলেন এবং তাঁহাকে এক বৌদ্ধ শ্রমণের তপোবনে এমন সময় খুঁজিয়া বাহির করিলেন যখন তিনি জীবন রক্ষার আশা পরিত্যাগ করিয়া জ্বলন্ত হুতাশনে সহচরীদের সহিত প্রাণ-বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। এ দিকে ভাণ্ডীরাজার আদেশে শশাঙ্কের বিরুদ্ধে সৈন্য লইয়া গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে ভ্রাতৃহন্তা শশাঙ্ক কান্যকুব্জ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় রাজ্যাভিমুখে প্রস্থান করিয়াছিলেন। হর্ষ তাঁহার অনুসরণ করিয়া খুব সম্ভব বাঙ্গালাদেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন কিন্তু এখানে সমুচিত অভ্যর্থনা না পাইয়া তিনি নিজের রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। গঞ্জাম প্রদেশে প্রাপ্ত একটী তাম্রলিপি হইতে জানা যায় যে ৬১৯ খৃষ্টাব্দে শশাঙ্ক 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি ধারণ পূর্ব্বক বীরবিক্রমে অনেক সামন্ত রাজাদের উপর আধিপত্য করিতেছিলেন। আবার ৬৩৭ খৃষ্টাব্দে চৈনিক পরিব্রাজক ইউয়ান-চোয়াং তাঁহাকে অনতিপূর্ব্বকালীন রাজা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন অর্থাৎ তিনি ৬৩৭ খৃষ্টাব্দের অল্প সময় পূর্ব্বেই জীবিত ছিলেন। ফলতঃ শশাঙ্ক ৬১৯ ও ৬৩৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি বীরকেশরী ছিলেন সন্দেহ নাই ; কিন্তু রাজ্যবর্দ্ধনকে গুপ্তভাবে হত্যা করিবার জন্য ঐতিহাসিকের পক্ষপাতশূন্য দৃষ্টিতে তিনি কলঙ্কিত হইয়া থাকিবেন।

হর্ষের রাজ্য শাসন

সিংহাসন আরোহণ করিবার অল্প কাল পরেই হর্ষ তাঁহার পূর্ব্বতম গুপ্তরাজাদের ন্যায় সাম্রাজ্য স্থাপনে মনোনিবেশ করিলেন। এই সময়ে তাঁহার সেনাতে পাঁচ হাজার হস্তী, দশ হাজার অশ্বারোহী ও পঞ্চাশ হাজার পদাতিক ছিল। এই সৈন্যের সাহায্যে তিনি উত্তরাপথের এক বিস্তীর্ণ অংশের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। চৈনিক পরিব্রাজকের কথানুসারে হর্ষ ছয় বৎসর অনবরত সংগ্রামে ব্যাপৃত থাকিয়া 'পঞ্চ-গৌড়' এর উপর আধিপত্য স্থাপিত করিয়াছিলেন। 'পঞ্চ-গৌড় অর্থে সারস্বত (পঞ্জাব), কান্যকুব্জ, গৌড় (বঙ্গদেশ), মিথিলা এবং উৎকল (উড়িষ্যা) বুঝায়। তিনি আরও বলিয়াছেন যে পূর্ব্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের সমস্ত রাজাই তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কেবলমাত্র মহারাষ্ট্রাধিপতি চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী তাঁহার অধীনতা স্বীকার করেন নাই। পঞ্চ-গৌড় বিজয় করিয়া হর্ষ ত্রিশ বৎসর শান্তিপূর্ব্বক রাজত্ব করিয়াছিলেন ও নিজের সেনাকে আরও বিশাল করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বের পরবর্ত্তীকালে তাঁহার সেনাতে ষাট হাজার হস্তী ও একলক্ষ অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। পরিব্রাজকের এই বর্ণনায় কিছু অতিশয়োক্তি আছে সন্দেহ নাই তবে মোটের উপর ইহা সত্য।

হর্ষ প্রথমে শশাঙ্কের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন। ইহার ফল বোধ হয় আশানুরূপ হয় নাই, কারণ শশাঙ্ক ৬১৯ খৃষ্টাব্দে 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করিয়া বঙ্গদেশের বিস্তীর্ণ অংশের উপর শাসন করিতেছিলেন। মনে হয় শশাঙ্কের মৃত্যুর পর হর্ষ তাঁহার বিশাল রাজ্যকে নিজের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কামরূপরাজ **ভাস্কর-বর্ম্মা হর্ষের** মিত্র ছিলেন। তিনি শশাঙ্কের ভয়ে ভীত হইয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন এবং শশাঙ্কের বিরুদ্ধে তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। এই কারণে মনে হয় হয় পুরস্কারস্বরূপ তাঁহাকে শশাঙ্কের ভূতপূর্ব্ব রাজধানী কর্ণসুবর্ণ নামক স্থান উপহার দিয়াছিলেন।

উত্তরাপথের পশ্চিম ভাগে **বলভী রাজ্য** একটী শক্তিশালী রাজ্য ছিল। এই সময় বলভী রাজ্যের সহিত পশ্চিম মালব সম্মিলিত ছিল। বলভীরাজ্যের রাজার **ধ্রুবভট্ট** হর্ষের দ্বারা পরাজিত হইয়া গুর্জ্জররাজ দ্বিতীয় দদ্দের শরণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। গুর্জ্জররাজ মহারাষ্ট্রাধিপতি চালুক্যরাজ পুলকেশী দ্বিতীয়ের মিত্র ছিলেন। তিনি একজন ক্ষুদ্র রাজা ছিলেন তাঁহার পক্ষে হর্ষের শত্রুকে আশ্রয় দান করা অতিশয় সাহসের কার্য্য ছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি প্রবল পরাক্রান্ত চালুক্যরাজের সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়াই এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

হর্ষের দিগ্বিজয়

এইবার হর্ষের বিজয়বাহিনী নর্ম্মদাতীরে পুলকেশী দ্বিতীয়ের সেনার সম্মুখীন হইয়াছিল। বলভীরাজকে আক্রমণ করিয়া হর্ষ পুলকেশীর বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। কারণ বলভীর রাজাও ছিলেন পুলকেশীর মিত্র। হর্ষ ও পুলকেশী উভয়েই বলভী রাজ্যকে স্ব স্ব প্রভাবক্ষেত্রের অন্তর্গত করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। যুদ্ধের দৃষ্টি দিয়া দেখিলে বলভী রাজ্যের (আধুনিক গুজরাত) ভৌগোলিক অবস্থিতি অতিশয় মহত্বপূর্ণ ছিল। কারণ উত্তরাপথের সম্রাটকে দাক্ষিণাত্য আক্রমণ করিতে হইলে গুজরাতের ভিতর দিয়া আসিতে হইত। আবার দক্ষিণাপথেশ্বর যদি উত্তরাপথ আক্রমণ করিতে ইচ্ছা করিতেন তবে গুজরাত ভিন্ন অন্য পথ ছিল না। এই কারণে হর্ষ বলভীরাজকে আক্রমণ করিয়া পুলকেশীর শত্রু হইয়াছিলেন। নর্ম্মদাতীরে হর্ষের সহিত পুলকেশীর ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল। এই যুদ্ধে কিন্তু হর্ষ জয়ী হইতে পারেন নাই। যুদ্ধের কাল ৬৩০ খৃষ্টাব্দে হইতে ৬৩৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ধার্য্য করা যাইতে পারে।

মনে হয় এই যুদ্ধের পর কোনও সময়ে বলভীরাজ হর্ষের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই সন্ধির ফলে হর্ষ তাঁহার সহিত নিজের কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। এইরূপে বলভীরাজ হর্ষের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন।

৬৪৩ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি হর্ষ উড়িষ্যার উদ্ধত রাজার বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন ইহাই বোধ হয় তাঁহার অন্তিম যুদ্ধ।

এই বিজয়ের পরিণাম স্বরূপ হর্ষ কাশ্মীর, কামরূপ এবং পঞ্জাব ও রাজপুতনার কিয়দংশ ব্যতীত সমগ্র উত্তরাপথের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ চালুক্যরাজাদের একাধিক দানপত্রে তাঁহাকে "সকলোত্তরাপথেশ্বর" বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

হর্ষ কান্যকুব্জে নিজের রাজধানী স্থাপিত করিয়াছিলেন। তিনি অতিশয় দক্ষতার সহিত প্রায় চল্লিশ বৎসর রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। রাজ্যের সর্ব্বত্র শৃঙ্খলা স্থাপিত হইয়াছিল। রাজ্যের প্রধান আয় খালসা মহল হইতে পাওয়া যাইত। এই সকল ভূমি হইতে রাজা ফসলের ষষ্ঠ ভাগ করস্বরূপ গ্রহণ করিতেন। অমাত্যবর্গকে বেতনস্বরূপ জায়গীর প্রদান করা হইত। 'বেগার' প্রথা রহিত হইয়াছিল। সকল প্রকার কার্য্যের জন্য পারিশ্রমিক দেওয়া হইত। রাজকর প্রজাদের পক্ষে দুর্ব্বহ ছিল না। রাজা ধার্ম্মিক সংস্থার জন্য মুক্ত হস্তে দান করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। দেশে অপরাধীর সংখ্যা বেশী ছিল না, যদিও পথ ঘাট সকল সময়ে নিরাপদ ছিল না। কখন কখন পথিকেরা লুণ্ঠনকারীর হস্তে নির্য্যাতিত হইতেন। ইউয়ান-চোয়াং অনেকবার দস্যুর হস্তে পড়িয়াছিলেন। মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে চন্দ্রগুপ্ত দ্বিতীয়ের সময়ের সহিত তুলনা করিলে দেশের অবস্থা খুব

সন্তোষজনক ছিল না। রাজদণ্ড অনেক সময়ে কঠোর এমন কি নৃশংস হইত। সামান্য সামান্য অপরাধের জন্য কারাদণ্ড হইত এবং গুরুতর অপরাধের জন্য রাজাজ্ঞায় অপরাধীর নাসিকা, কর্ণ, বা হস্তপদাদি অঙ্গ ছেদন করা হইত। কখন কখন অপরাধীকে নির্ব্বাসন দণ্ড দেওয়া হইত। লঘু অপরাধের জন্য অর্থদণ্ড হইত। অগ্ন্যাদি পরীক্ষার দ্বারা অনেক সময় অপরাধীর অপরাধ নির্ণয় করা হইত।

দেশে বিদ্যার প্রচার চলিতই ছিল। হর্ষ নিজে অনেক প্রকার বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি নাগানন্দ, রত্নাবলী ও প্রিয়দর্শিকা নামক তিনটী নাটক লিখিয়াছিলেন, এই নাটকগুলি এখনও পাওয়া যায়। মহাকবি বাণভট্ট হর্ষের সভার অলঙ্কারস্বরূপ ছিলেন। তাঁহার গদ্যগ্রন্থ কাদম্বরী উচ্চশ্রেণীর রচনা বলিয়া পাশ্চাত্য দেশেও খ্যাতি লাভ করিয়াছে। তাঁহার অপর গদ্যকাব্যের নাম **হর্ষচরিত**। ইহাতে হর্ষের জীবনী আংশিক ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

চীন পরিব্রাজক ইউয়ান-চোয়াং

হর্ষের রাজ্যকালের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ইউয়ান-চোয়াং নামক চৈনিক পরিব্রাজকের ভারতে আগমন। অতি প্রাচীন কাল হইতেই চীন ও ভারতবর্ষের মধ্যে 'সাংস্কৃতিক' (Cultural) সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। চীনের সম্রাটেরা প্রায়ই বৌদ্ধ-ধর্ম্মগ্রন্থ আনয়ন নিমিত্ত ভারতে রাজদূত প্রেরণ করিতেন। আবার ভারতবর্ষ হইতেও পণ্ডিতেরা ধর্ম্মপ্রচারের জন্য চীন দেশে যাইতেন। তোমাদিগকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ৩৯৯ খৃষ্টাব্দে **ফা-হিয়ান** নামক বৌদ্ধ শ্রমণ ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তাহার পর ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে **সং-থুন** নামক চীনদেশীয় ভিক্ষু ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। কিন্তু যে সমস্ত চীন দেশীয় বৌদ্ধ শ্রমণ ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ইউয়ান-চোয়াংই সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত। ইনি বাল্যকালেই শাক্যমুনির শান্তিময় ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। যখন তাঁহার বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসর মাত্র তখনি তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া ভিক্ষুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহার মনে বুদ্ধদেবের পবিত্র জন্মভূমি দেখিবার প্রবল বাসনা জাগিয়াছিল। ভারতবর্ষে যে সময়ে বৌদ্ধ মঠসমূহে অনেক প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন। ইউয়ান-চোয়াং তাঁহাদের চরণপ্রান্তে বসিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে উৎসুক হইয়াছিলেন। তিনি ৬২৯ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। অনেক দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া, হিন্দুকুশ পর্ব্বত লঙ্ঘন করিয়া, তিনি কপিশা (Kafiristan) রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পরে অন্যান্য ক্ষুদ্র পর্ব্বতমালা অতিক্রম করিয়া লমঘান দেশে প্রবেশ করিয়াছিলেন ও কাবুল নদীর অধিত্যকার ভিতর দিয়া পঞ্জাবে প্রবেশ করিয়াছিলেন। পঞ্জাব হইতে তিনি জলন্ধর ও মথুরা হইয়া স্থানেশ্বর রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাহার পর মধ্যদেশের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া তিনি মগধ রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছিলেন। মগধের প্রাচীন নগর পাটলীপুত্র এক্ষণে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। পরিব্রাজক গয়ার নৈরঞ্জন নদী ও মহাবোধি মন্দির দর্শন করিয়া বাল্যকালের স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করিয়াছিলেন। গয়া হইতে পরিব্রাজক নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন। নালন্দায় তখন প্রকৃতই বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ হইতে ও বিদেশের নানা স্থান হইতে জ্ঞানপিপাসু ছাত্রগণ বিদ্যাধ্যয়ন করিতে এখানে আসিতেন। নালন্দার অধ্যক্ষ **শীলভদ্র** ইউয়ান-চোয়াংকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। পরিব্রাজক এখানে সঙ্ঘের সম্মানিত অতিথিরূপে কিছুকাল অতিবাহিত করিয়া পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

মুঙ্গের, চম্পা, রাজমহল, কর্ণসুবর্ণ ও সমতট ইত্যাদি স্থানে ভ্রমণ করিয়া তিনি উড়িষ্যায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। তথা হইতে দাক্ষিণাত্যের **অন্ধ্র, চোল, দ্রাবিড়, মহারাষ্ট্র** ইত্যাদি দেশে পরিভ্রমণ করিয়া তিনি উত্তরাপথের পশ্চিমাঞ্চলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এখানকার **বলভী, মালব, গুর্জ্জর, সিন্ধু,** ইত্যাদি দেশ দেখিয়া তিনি পুনরায় ৬৪২ খৃষ্টাব্দে নালন্দায় ফিরিয়া গিয়াছিলেন। নালন্দায় **শীলভদ্রের** আদেশে বৌদ্ধ সঙ্ঘের সম্মুখে

তিনি মহাযান শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার খ্যাতি এখন সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তিনি এখানে বৌদ্ধ দর্শনের উপর গ্রন্থ রচনা করিয়া নিজের পাণ্ডিত্যের প্রমাণ দিয়াছিলেন। নালন্দা হইতে যাত্রী কামরূপে, তথাকার রাজার সাদর নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া, উপস্থিত হইয়াছিলেন। হর্ষ এই সময় কজুঘির (রাজমহলের নিকট) নামক স্থানে শিবির সংস্থাপন করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। হর্ষ কামরূপরাজ ভাস্করবর্ম্মাকে আদেশ করিলেন যেন তিনি ইউয়ান-চোয়াংকে সঙ্গে লইয়া, অবিলম্বে তাঁহার (হর্ষের) সহিত শিবিরে সাক্ষাৎ করেন। আদেশ পাইয়া ভাস্করবর্ম্মা তাহাই করিলেন। উদারাপথেশ্বরের সহিত সংসারত্যাগী ভুবনবিখ্যাত ভিক্ষুর মিলন অতিশয় মনোরঞ্জক হইয়াছিল সন্দেহ নাই। তাহার পর হর্ষ, ভাস্কর-বর্ম্মা ও পরিব্রাজককে সঙ্গে লইয়া ভাগীরথীর তীরে তীরে কান্যকুব্জে যাইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেইখানে হর্ষ হীনযান হইতে মহাযানের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত মহতী সভা আহ্বান করিয়াছিলেন। এই সভায় চারি সহস্র বৌদ্ধ এবং তিন সহস্র ব্রাহ্মণ ও জৈন ভিক্ষু সমবেত হইয়াছিল। কতিপয় দিবস যাবৎ তাঁহাদের মধ্যে ঘোরতর তর্ক-যুদ্ধ হইয়াছিল। তাহার পর অকস্মাৎ কোনও দুষ্ট বৌদ্ধ বিদ্বেষী তথাকার মঠে অগ্নি প্রয়োগ করিয়া ভস্মসাৎ করিয়া দিয়াছিল এবং একজন গুপ্তঘাতক খড়্গহস্তে রাজাকে আক্রমণ করিয়াছিল। গুপ্ত-ঘাতক তৎক্ষণাৎ ধরা পড়িয়াছিল ও তাহাকে প্রশ্ন করিয়া জানা গিয়াছিল যে ব্রাহ্মণেরা রাজার বৌদ্ধ-দের প্রতি পক্ষপাত সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার প্রাণ লইবার জন্য একটী ষড়যন্ত্র রচনা করিয়াছিল। বিচারে প্রধান প্রধান অপরাধিগণের প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল এবং পাঁচশত ব্রাহ্মণ দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন।

প্রয়াগের মহাদানোৎসব

কান্যকুব্জের ধার্ম্মিক সভার অধিবেশনের পরে প্রয়াগের পুণ্যক্ষেত্রে পঞ্চবার্ষিক দানবিতরণোৎসব হইয়াছিল। এই উৎসবে চৈনিক পরিব্রাজক যোগদান করিয়াছিলেন এবং ইহা হর্ষের রাজ্য-কালের ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক উৎসব ছিল। প্রায় পঞ্চলক্ষ নরনারী ও সমস্ত করদ ভূপাল এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। অনেক অনাথ, দরিদ্র, আতুর দান লইবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিল। তা ছাড়া সহস্র সহস্র বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ব্রাহ্মণ দান গ্রহণার্থ উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই দান বিতরণ পঁচাত্তর দিন পর্য্যন্ত স্থায়ী ছিল। রাজা নিঃস্ব হইয়া রাজকোষের সমস্ত ধন এমন কি দেহের পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারাদি নিঃশেষে বিলাইয়া দিয়াছিলেন। অবশেষে তাঁহার নিকট সেনা ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। প্রয়াগের **মহাদানোৎসব** ৬৪৩ খৃষ্টাব্দে হইয়াছিল। ইহার পর ইউয়ান-চোয়াং অনেক প্রকার বৌদ্ধ মূর্ত্তি এবং বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থ সঙ্গে লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে হর্ষের চিত্তে ধর্ম্মভাব অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তিনি স্বয়ং একজন সাধুর ন্যায় জীবন যাপন করিতেন। রাজ্যের ভিতর জীবহিংসা রাজাজ্ঞায় নিষিদ্ধ হইয়াছিল। কেহ জীবহিংসা করিলে তাহার প্রাণদণ্ড হইত। এই কারণে হর্ষ ব্রাহ্মণদের অপ্রিয় হইয়াছিলেন কারণ ব্রাহ্মণদিগকে যজ্ঞে পশুহিংসা করিতেই হইত। রাজা পথিক, দরিদ্র ও রোগীদের জন্য নানা প্রকা-রের সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে এবং নগরে অন্নসত্র খুলিয়া দিয়াছিলেন। ভিক্ষুদের জন্য শত শত মঠ নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়া-ছিলেন। নালন্দার বৌদ্ধ বিহারে তিনি অজস্র দান করিয়াছিলেন। যদিও তিনি শেষ বয়সে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন তথাপি তিনি হিন্দু ও জৈন ধর্ম্মের উন্নতির জন্য মুক্ত হস্তে ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তিনি অনেক দিন পর্য্যন্ত **শিব, সূর্য্য** ও **বুদ্ধ**—তিনেরি উপাসক ছিলেন। সে সময় দেশে সাধারণতঃ ধার্ম্মিক স্বাধীনতা ছিল যদিও মধ্যে মধ্যে ধার্ম্মিক বিদ্বেষের উদাহরণ পাওয়া যায়। গৌড়রাজ শশাঙ্ক একজন বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন এবং হর্ষ স্বয়ং শেষ বয়সে ব্রাহ্মণ বিদ্বেষী হইয়া পড়িয়াছিলেন।

৪২ বৎসর রাজ্য করিয়া হর্ষ ৬৪৮ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর উত্তর ভারতে ঘোরতর বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল।



বাঙ্গালার কথা

দেবপাল ও সুমাত্রাদ্বীপের রাজা বালপুত্রদেব

২৮৭১ পৃষ্ঠার পর

ধর্ম্মপালের মৃত্যুর পরে তাঁহার উপযুক্ত পুত্র দেবপাল বিহার ও বাঙ্গালার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। দেবপালও পিতার মত বীর ছিলেন। দেবপালের মন্ত্রীর নাম ছিল দর্ভপাণি। দর্ভপাণির বংশধর অহঙ্কার করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে, দর্ভপাণি নিজের নীতি-কৌশলে হিমালয় হইতে বিন্ধ্য পর্ব্বত পর্য্যন্ত এবং পশ্চিমে আরবসাগর হইতে পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত সমস্ত ভূমি দেবপালের অধীন করিয়াছিলেন। ইহা হইতে এই বুঝা যায় যে, মান্যখেতের রাষ্ট্রকূটবংশ এবং ভিল্লমালের গুর্জ্জর-প্রতীহার বংশ, এই দুই বংশের সহিত যুদ্ধ করিয়াই দেবপাল নিজের পৈত্রিক অধিকার বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দেবপালের এক ছোট ভাই ছিল, তাঁহার নাম জয়পাল। এই জয়পাল যুদ্ধ করিয়া কামরূপ (আসাম) ও উড়িষ্যার রাজাদিগকেও হারাইয়া দিয়াছিলেন।

দেবপাল প্রায় চল্লিশ বৎসর কাল রাজত্ব করেন। এই দীর্ঘ রাজত্বের শেষভাগে ভিল্লমালের গুর্জ্জর-প্রতীহার রাজগণ আবার প্রবল হইয়া উঠিলেন। গুর্জ্জর-প্রতীহার-রাজ ভোজ কান্যকুব্জ দখল করিয়া লইলেন এবং পালবংশের অধিকার বাঙ্গালা ও বিহারেই সীমাবদ্ধ হইয়া রহিল। মুদ্গগিরি বা মুঙ্গেরে দেবপালের রাজধানী ছিল।

এই যুগে ভারতমহাসাগরের দ্বীপগুলিতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার হইয়াছিল। সুমাত্রা দ্বীপের নাম ছিল তখন সুবর্ণদ্বীপ। এই সুবর্ণদ্বীপ ও যবদ্বীপ বা বর্ত্তমান জাভা জুড়িয়া তখন একটি রাজ্য ছিল। রাজ্যের নাম ছিল শ্রীবিজয় রাজ্য। এই রাজ্যের রাজবংশের নাম ছিল শৈলেন্দ্র বংশ। দেবপাল যখন বাঙ্গালা ও বিহারে রাজত্ব করিতেছিলেন, তখন সুবর্ণদ্বীপে শৈলেন্দ্রবংশীয় বালপুত্রদেব রাজত্ব করিতেছিলেন। কলিকাতার দিক্ষিণস্থ তাম্র-

লিপ্তি বা—বর্ত্তমান তমলুক,—তখন বাঙ্গালা ও বিহারের প্রধান বন্দর। এই তাম্রলিপ্ত হইতে জাহাজ ছাড়িয়া শত শত ভারতীয় বণিক আরাকানের সহিত, ব্রহ্মদেশের সহিত, সুমাত্রা-জাভা-বলি-দ্বীপের সহিত বাণিজ্য করিতে যাইত। ব্রাহ্মণগণ যাইয়া এই সমস্ত স্থানে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের, ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রের প্রচার করিতেন। সুমাত্রা জাভায় যাহারা বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা দলে দলে বৌদ্ধতীর্থ ও বিহারগুলি দেখিতে বাঙ্গালা ও বিহারে আগমন করিত। তমলুকে তাহারা জাহাজ হইতে নামিত। তাহার পরে কতক বা দল বাঁধিয়া পায়ে হাঁটিয়া,—কতক বা নৌকায় ভাগীরথী ও গঙ্গা বাহিয়া বিহারের দিকে অগ্রসর হইত।

শ্রীবিজয় রাজ্য হইতে দলে দলে এইরূপ তীর্থযাত্রী প্রত্যেক বছর বাঙ্গালা ও বিহারে আসিত। বাঙ্গালাদেশে একে তাহারা বিদেশী, তাহার উপর আবার বাঙ্গালা ও বিহারের লোক তাহাদের কথা বুঝিত না। তাই বাঙ্গালা-বিহারে তীর্থযাত্রায় আসিয়া শ্রীবিজয়ের যাত্রীরা বড় কষ্ট পাইত। শ্রীবিজয়ের রাজা বালপুত্রদেব এই অবস্থা দেখিয়া নালন্দায় এই সকল যাত্রার জন্য এক বিহার নির্ম্মাণ করাইলেন। দেবপালের নিকট তিনি দূত প্রেরণ করিয়া সমস্ত অবস্থা জানাইলেন। দেবপালদেব বালপুত্রদেবের অনুরোধে এক দানপত্র প্রস্তুত করিয়া কয়েকখানি গ্রামের উপস্বত্ব বালপুত্রদেবের এই বিহারের ভিক্ষু ও যাত্রিগণের ভরণপোষণের জন্য দান করিলেন। সমুদ্রের ওপারের রাজার সহিত বাঙ্গালা বিহারের রাজার বন্ধুত্বের নিদর্শন সেই দানপত্রখানা আজ কয়েক বছর হয় নালন্দার প্রাচীন কীর্ত্তি খুঁড়িয়া বাহির করিবার সময় মাটির নীচে পাওয়া গিয়াছে।

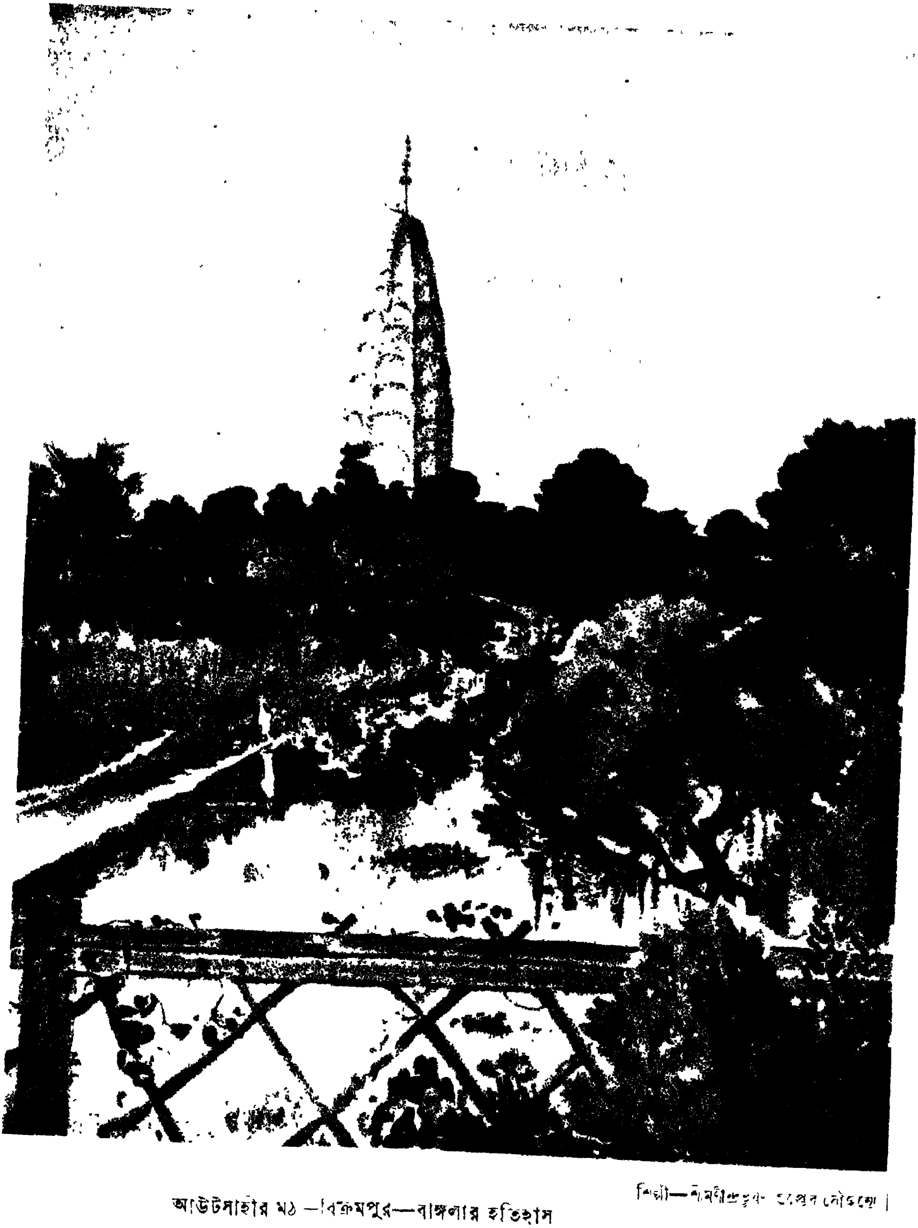
ঊনচল্লিশ বৎসরের অধিককাল রাজত্ব করিয়া দেবপালদেব পরলোকে গমন করেন।

মহীপালের কীর্ত্তি

দেবপালের মৃত্যুর পরে ক্রমেই পালবংশের অবনতি হইতে আরম্ভ হয়। গুর্জ্জর প্রতীহার-রাজগণ প্রবল হইয়া ক্রমশঃ মগধ ও ত্রিহুত,—অবশেষে এমন কি বরেন্দ্র বা উত্তরবঙ্গ পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া লইলেন। রাজসাহী জেলার উত্তর-পূর্ব্ব কোণে পাহাড়-পুরের যে বিহার এককালে ধর্ম্মপাল মহাবিহার বলিয়া বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল, সেই বিহারের ভগ্নস্তূপের মধ্যে পর্য্যন্ত গুর্জ্জর-প্রতীহাররাজ মহেন্দ্রপালের শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে।

প্রথম মহীপালদেব যখন সিংহাসনে বসিলেন তখন উত্তরবঙ্গ আর পালরাজগণের হাতে নাই। দক্ষিণ ও পূর্ব্ববঙ্গ এবং ত্রিপুরা নোয়াখালি জেলায় তখন পালরাজগণের রাজ্য সীমাবদ্ধ। প্রচুর জলপূর্ণ পূর্ব্বদেশে যাইয়া মহীপাল আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু মহাবীর মহীপাল ধীরে ধীরে দুর্ভাগ্যের স্রোত ফিরাইতে সমর্থ হইলেন। মহীপালদেব আপনার পূর্ব্বপুরুষগণের হস্তচ্যুত রাজ্য আবার অধিকার করিয়া লইলেন। তিনি গৌড় অধিকার করিয়া মগধ, এমন কি কাশী পর্য্যন্ত ও আপনার রাজ্য বিস্তার করেন। কিন্তু তাঁহার এই গঠিত রাজ্য আবার বিদেশীয় রাজারাও সময়ে সময়ে আক্রমণ করিতে ত্রুটি করেন নাই।

মহীপালদেব যে সময়ে উত্তর রাঢ়ে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময়ে দাক্ষিণাত্যের রাজা রাজেন্দ্রচোল এদেশ আক্রমণ করেন। দণ্ডভুক্তি প্রদেশের (বর্ত্তমান মেদিনীপুর জেলায়) রাজা ধর্ম্মপাল তাঁহার



আউটসাহীর মঠ—বিক্রমপুর—বাঙ্গলার ইতিহাস

শিল্পী—শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্তের সৌজন্যে।

হস্তে নিহত হন। দক্ষিণ রাঢ়ের (বর্ত্তমান-হাওড়া-হুগলি-বর্দ্ধমান জেলা) রণশূর, বঙ্গ-রাজ্যের গোবিন্দচন্দ্র ও উত্তর রাঢ়ের মহীপাল রাজেন্দ্রচোলের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন।

উত্তর রাঢ়ের অন্তর্গত মুর্শিদাবাদ জেলায় মহীপাল নামে একটি নগরের ধ্বংসাবশেষ আছে। উহাই সে সময়ের মহীপালদেবের রাজধানী ছিল বলিয়া অনুমান হয়। উহার নিকটে সাগরদীঘি নামে একটি বিশাল জলাশয় মহীপালের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। দিনাজপুরের মহীপালদীঘি নামে একটি প্রকাণ্ড দীঘি তাঁহার নাম রক্ষা করিয়া আসিতেছে। কাশীধামে প্রতিষ্ঠিত শিব ও দুর্গার মন্দির এবং তাহার নিকট সারনাথের অশোক স্তূপ, বৌদ্ধ মন্দির ও অশোকস্তম্ভের সংস্কার তাঁহার কীর্ত্তির পরিচয় দেয়। মহীপালদেবের আদেশে কবিবর ক্ষেমীশ্বর বিশ্বামিত্র ও হরিশ্চন্দ্রের কথা লইয়া চণ্ডকৌশিক নামে একখানি সংস্কৃত নাটক রচনা করিয়াছিলেন। তাহাতে মহীপালদেব কর্ণাটগণকে পরাজিত করিয়া কীর্ত্তি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া লিখিত আছে। মহীপাল বায়ান্ন বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার কীর্ত্তি স্মরণ করিয়া অনেক গীত রচিত হইয়াছিল। সে গুলি মহীপালের গীত নামে প্রসিদ্ধ।

'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' প্রণেতা ডাক্তার শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বলেন—বৃন্দাবনদাস চৈতন্যের পূর্ব্বে বঙ্গদেশের অবস্থা কি ছিল, তাহা বলিতে যাইয়া লিখিয়াছেন—

মহীপালের গীত

যোগীপাল গোপীপাল মহীপাল গীত।
ইহা শুনিতে যে লোক আনন্দিত॥

লোকে যখন তখন মহীপালের গীত গাইত। সেই জন্য "ধান ভানিতে মহীপালের গীত" বলিয়া একটা কথা প্রচলিত আছে।

মহীপালের মৃত্যুর ৪।৫ শত বৎসরেও যে গীত বাঙ্গলার ঘরে ঘরে পূর্ণোদ্যমে গীত হইত এবং এখন কিঞ্চিন্ন্যূন সহস্র বৎসর পরেও যাহা একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই, সেই গানের বিষয়ীভূত রাজচরিত্র যে কতটা জনপ্রিয় হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। একটি ক্ষুদ্র মহীপালের গানে আমরা জানিতে পারিয়াছি, লীলা নাম্নী এক ধনাঢ্য বণিক কন্যাকে মহীপাল ভালবাসিতেন। তাহাকে পাওয়ার জন্য কত হিমপূর্ণ রাজ্য খুঁজিয়াছেন, গ্রীষ্মকালে উষ্ণ প্রদেশে গমনাগমন করিয়াছেন। একদিন তিনি শুনিলেন, তাহার নবনির্ম্মিত দীঘিতে স্নান করিবার জন্য সেই সুন্দরী কন্যা আপনা হইতে আসিয়া জলে সাঁতার কাটিতেছে। মহীপাল নিজে জলে নামিয়া তাঁহাকে রাজবাড়ীতে আনিয়াছিলেন। এই সকল গল্পকথার ঐতিহাসিক মূল্য কি তাহা জানিনা। তবে পল্লীগাথা অনেক সময়েই সত্যের একটু ইঙ্গিতকে ভিত্তি করিয়া তাহার উপর কল্পনার সৌধ নির্ম্মাণ করে। (বৃহৎবঙ্গ—২৬২—৬৩)

বৌদ্ধ পণ্ডিত তারনাথের মতে মহীপাল বায়ান্ন বৎসর রাজত্ব করেন। মহীপালের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র নয়পাল সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার সিংহাসনারোহণ নিরাপদে ঘটে নাই। নানারূপ বিদ্রোহ ও অশান্তির মধ্য দিয়া তাঁহাকে সিংহাসনে বসিতে হইয়াছিল।

নয়পালের রাজত্বের ইতিহাস কয়েকটি কারণে বিশেষ প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার একটি হইতেছে বাঙ্গালী পণ্ডিতের প্রাধান্য।



স্মার্ত্ত রঘুনন্দন

২৮৫৬ পৃষ্ঠার পর

যিনি স্মৃতিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, এবং স্মৃতি সম্বন্ধে বই লেখেন, তাঁহাকে স্মার্ত্ত বলে। স্মৃতির বই বলিতে মোটামুটি এই বুঝায় যে, ঐ বইয়ে হিন্দুর সামাজিক ও গার্হস্থ্য জীবন সংক্রান্ত নিয়ম কানুন লেখা আছে। হিন্দুর জীবন ও ধর্ম্ম আবার পরস্পর এত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত যে, জীবনের কথা বলিতে গেলেই ধর্ম্মের কথাও আসিয়া পড়ে। কাজেই স্মৃতির নিয়ম-কানুনগুলি ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং স্মৃতিশাস্ত্রে পূজা, ব্রত প্রভৃতি ধর্ম্মকর্ম্ম সম্বন্ধেও বিধান থাকে। অতি প্রাচীনকালের স্মৃতিতে রাজনীতি, অর্থনীতি সম্বন্ধেও আলোচনা থাকিত, কিন্তু পরবর্ত্তীকালের স্মৃতি হইতে এই সকল বিষয়গুলি উঠিয়া গিয়াছিল। পরবর্ত্তীকালের স্মৃতিতে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লইয়া আলোচনা থাকিত :—দায়ভাগ, অর্থাৎ কাহারও মৃত্যু হইলে তাহার সম্পত্তি কে কে পাইবার অধিকারী এবং তাহা কিরূপ ভাবে ভাগ-বাটোয়ারা হইবে; অশৌচ, অর্থাৎ জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি কারণে অশৌচ হইলে, তাহা কিরূপ ভাবে পালন করিতে হইবে, এবং কিরূপে ও কখন অশৌচ হইতে শুদ্ধিলাভ করিবে; প্রায়শ্চিত্ত, অর্থাৎ শাস্ত্রবিরুদ্ধ কাজ বা পাপ করিলে, কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিলে সমাজে স্থান পাইবে; আহ্নিক, অর্থাৎ সন্ধ্যা, বন্দনা প্রভৃতি প্রতিদিনের ক্রিয়া; সংস্কার, অর্থাৎ নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন, বিবাহ প্রভৃতি দ্বিজ জাতির কর্ত্তব্য শুদ্ধিজনক ব্যাপার; শ্রাদ্ধ, অর্থাৎ পিতৃ-পুরুষদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পিণ্ডাদি দান ও সেই সম্পর্কে অন্যান্য কর্ত্তব্য কাজ; কৃত্য, অর্থাৎ নানা পর্ব্ব ও উৎসব এবং সেই সকল সময়ে কি কি করিতে হয়; প্রতিষ্ঠা, অর্থাৎ মন্দির, দেব-মূর্ত্তি প্রভৃতি কখন কি ভাবে প্রতিষ্ঠা করিতে হয়; দান, অর্থাৎ কখন, কি কি উপলক্ষে ব্রাহ্মণকে দান করিতে হয়, এবং তাহার ফল কি; পূজা, অর্থাৎ দেব-দেবীর পূজা কখন কি ভাবে সম্পন্ন করিতে হয়; কাল, অর্থাৎ কোনও কিছু করিবার শুভ ও প্রশস্ত সময়; বিবাদ, অর্থাৎ দুইপক্ষে বিবাদ উপস্থিত হইলে, তাহা নিষ্পত্তি করিবার আইন; ব্যবহার, অর্থাৎ মামলা মোকদ্দমায় বিচার, সাক্ষ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে নিয়ম-কানুন; ইত্যাদি।

স্মার্ত্ত রঘুনন্দন এই পরবর্ত্তীকালের লোক; এবং প্রধানতঃ তাঁহারই লেখা স্মৃতির বিধান দ্বারা বর্ত্তমান বাঙ্গালার হিন্দুসমাজ চলিতেছে। তাঁহার পদবী ছিল 'বন্দ্যোপাধ্যায়', এবং 'ভট্টাচার্য্য' ছিল তাঁহার

ব্যক্তিগত উপাধি। তিনি কোন্ সালে জন্মিয়াছিলেন, তাহা ঠিক জানা যায়না, তবে তাঁহার সময় সম্বন্ধে মোটামুটি এই স্থির হইয়াছে যে, তিনি ১৫১০ হইতে ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। ইহাতে এই বুঝায় না যে, তিনি ঐ ৫৫ বৎসরই বাঁচিয়াছিলেন। ইহাতে বুঝায় যে, তাঁহার কর্ম্ম-জীবন ঐ সময়ের, বা অনেকটা ঐ সময়ের মধ্যে পতিত হইয়াছিল।

রঘুনন্দনের পিতার নাম ছিল হরিহর ভট্টাচার্য্য। তিনিও খুব সম্ভবতঃ একজন বড় পণ্ডিতই ছিলেন, কিন্তু তাঁহার লেখা বই এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। তবে ফরাসীদেশের জাতীয় গ্রন্থাগারে একখানা বই আছে, তাহার নাম 'শ্রাদ্ধপ্রয়োগ তত্ত্ব', আর তাহার রচয়িতার নাম হরিহর ভট্টাচার্য্য। [Catalogue Sommaire des Manuscrits Sanscrits et Palis de la Bibliotheque Nationale, par A. Cabaton, 1907-8, Paris, p 47, No. 306] একে বইখানি স্মৃতির বই, তার উপর,— যেমন রঘুনন্দনের বইগুলির নাম 'তত্ত্ব' দিয়া, ইহারও সেইরূপ 'তত্ত্ব' দিয়া নাম, এবং তৃতীয়তঃ লেখকের নামটিও আবার হরিহর ভট্টাচার্য্য—এই সকল দেখিয়া মনে হইতেছে, এই বইখানি সম্ভবতঃ রঘুনন্দনের পিতারই লেখা।

রঘুনন্দন থাকিতেন নদীয়ায় বা নবদ্বীপে। তখনকার নদীয়া যেন কতকটা এখনকার কলিকাতা। উহা যেমন প্রকাণ্ড, সুন্দর ও সমৃদ্ধিশালী ছিল, তেমনই বিশ্ববিদ্যালয়-নগর হিসাবে নানাস্থান হইতে বহু ছাত্র ওখানে পড়িতে আসিত। বড় বড় টোল ছিল, খ্যাতনামা বহু পণ্ডিত ছিলেন, কাজেই ছাত্রেরা দলে দলে ওখানে আসিয়া জুটিত, এবং লেখাপড়া শিখিয়া দেশে ফিরিয়া যাইত। কেহ কেহ আবার ঐখানেই থাকিয়া যাইত। রঘুনন্দনেরই সমসাময়িক ছিলেন মহাপ্রভু চৈতন্যদেব, এবং তিনিও নবদ্বীপেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেবের কল্যাণে নবদ্বীপধাম বৈষ্ণবদের তীর্থে পরিণত হইয়াছিল।

এই নবদ্বীপে এক পরিবার ছিল, তাঁহারা বংশানুক্রমে স্মৃতিতে পণ্ডিত। প্রথম শ্রীকর আচার্য্য। তাঁহার পুত্র শ্রীনাথ আচার্য্য চূড়ামণি। আবার শ্রীনাথের পুত্র রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার ভট্টাচার্য্য। ইঁহারা সকলেই খুব পণ্ডিত ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে শ্রীনাথ ত অনেকগুলি স্মৃতির বই ও টীকা লিখিয়া খুবই যশস্বী হইয়াছিলেন। এই শ্রীনাথই ছিলেন আবার রঘুনন্দনের গুরু। রঘুনন্দন তাঁহার বইয়ে স্থানে স্থানে তাঁহার গুরুর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদের দেশে একটা প্রবাদ আছে যে, রঘুনন্দন ও চৈতন্য একত্র নবদ্বীপের শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক বাসুদেব সার্ব্বভৌমের টোলে কিছুদিন পড়িয়াছিলেন। কিন্তু ইহা সত্য কি না বলা কঠিন। যাহা হউক, রঘুনন্দন অতিশয় মেধাবী ছাত্র ছিলেন, আর তাঁহার বুদ্ধিও ছিল অত্যন্ত প্রখর। তিনি যে ভবিষ্যকালে একজন অসামান্য পুরুষ হইবেন, ইহা অনেকেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

১২০০ খৃষ্টাব্দে মুসলমানেরা বাঙ্গালায় আসে, এবং তাহার পর এক শতাব্দী ধরিয়া ক্রমাগত চেষ্টা ও যুদ্ধ বিগ্রহ করিয়া অবশেষে সমস্ত বাঙ্গালা দেশ জয় করিয়া ফেলে। এই তিন চারি শত বৎসর ধরিয়া তাহারা বাঙ্গালার লক্ষ লক্ষ হিন্দুকে ত মুসলমান করিয়াছিলই, উপরন্তু দীর্ঘকাল ধরিয়া মুসলমানের অধিকারে থাকায় দেশের বাকী হিন্দুরও রীতিনীতি, আচার ব্যবহারে স্বভাবতঃই অনেক পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছিল। হিন্দুর ধর্ম্ম ও সামাজিক বন্ধন ক্রমশঃই শিথিল হইয়া আসিতেছিল। রঘুনন্দন বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া বুঝিতে পারিলেন, এ সকল মোটেই শুভ লক্ষণ নয়, এই ভাবে চলিলে, হিন্দুসমাজ আর বেশী দিন টিকিবে না। তাই তিনি মনে মনে ঠিক করিলেন, এ সকলের সংস্কার করিতে হইবে, এবং সময় ও অবস্থাদৃষ্টে কিছু কিছু নূতন ব্যবস্থা দিয়া সমাজকে আবার নূতন করিয়া বাঁধিতে হইবে, বাঙ্গালার হিন্দু জাতি যেন লোপ না পায়, তাহার উপায় করিতেই হইবে।

কিন্তু একাজ ত সোজা কাজ নয়। স্রোত যখন বেগে বহিতে থাকে, তখন তাহাকে আটকানো কি যেমন-তেমন কথা? মুসলমানেরা আসার পর এবং রঘুনন্দনের আগে কোনও কোনও স্মার্ত্ত-পণ্ডিত সমাজ বাঁধিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা তেমন সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। কিন্তু রঘুনন্দন কিছুতেই দমিলেন না, তিনি কাজে নামিয়া

গেলেন। তাঁহার আগে যেখানে যত লোক স্মৃতির বই লিখিয়াছিলেন, তিনি তাহা যোগাড় করিয়া পড়িয়া ফেলিলেন ; তা ছাড়া, বেদ পড়িলেন, পুরাণ পড়িলেন, তন্ত্র পড়িলেন, তারপর নানা দেশে পর্য্যটন করিয়া সে সকল স্থানের রীতি নীতি আচার ব্যবহারগুলি বেশ করিয়া দেখিলেন ও বুঝিলেন, এবং তখন তিনি নিজে লিখিতে আরম্ভ করিলেন।

ক্রমে ক্রমে তিনি আটাশখানি স্মৃতির বই লিখিলেন। প্রত্যেক বইখানির নামে 'তত্ত্ব' আছে, যথা শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে বইখানির নাম শ্রাদ্ধ-তত্ত্ব, ব্যবহার সম্বন্ধে বইয়ের নাম ব্যবহার-তত্ত্ব, এইরূপ। এক সঙ্গে এই আটাশ খানি বই 'অষ্টাবিংশতি-তত্ত্ব' বা 'স্মৃতি-তত্ত্ব' নামে খ্যাত। এই আটাশখানি তত্ত্বের নাম,—মলমাস, দায়ভাগ, সংস্কার, শুদ্ধি, প্রায়শ্চিত্ত, বিবাহ (উদ্বাহ), তিথি, জন্মাষ্টমী, দুর্গোৎসব, ব্যবহার, একাদশী, জলাশয়োৎসর্গ, ছন্দোগ-বৃষোৎসর্গ, যজুঃ-বৃষোৎসর্গ ঋক-বৃষোৎসর্গ, ব্রত, দেবপ্রতিষ্ঠা, দিব্য, জ্যোতিষ, বাস্তুযাগ, দীক্ষা, আহ্নিক, কৃত্য, পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র, সাম শ্রাদ্ধ, যজুঃশ্রাদ্ধ ও শূদ্র-কৃত্য।

রঘুনন্দন যদিও দায়ভাগ সম্বন্ধে নিজেই একখানা অতি পাণ্ডিত্যপূর্ণ তত্ত্ব লিখিয়াছিলেন, তবু জীমূত-বাহনের দায়ভাগের উপর একখানি টীকাও তিনি লিখিয়াছিলেন। জীমূতবাহন রঘুনন্দনের প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বের লোক। আর এই আটাশ খানি প্রধান তত্ত্বে যে সকল জিনিসের আলোচনা বাদ পড়িয়াছিল, তাহার জন্য রঘুনন্দন আরও কয়েকখানি বই লিখিয়াছিলেন, যথা—তীর্থতত্ত্ব, দ্বাদশ যাত্রা-তত্ত্ব, গয়াশ্রাদ্ধ-পদ্ধতি, এবং রাসযাত্রা-পদ্ধতি। রঘুনন্দনের নামে আরও একখানি স্মৃতির বই দেখা যায়, তাহার নাম 'সঙ্কল্প-চন্দ্রিকা।' [R. L. Mitra's Notices of Sanskrit MSS., Vol. I, No 298] 'ত্রিপুষ্কর-শান্তি-তত্ত্ব' নামে তাঁহার যে বই আছে, তাহা একখানা স্বতন্ত্র তত্ত্ব নয়, উহা তাঁহার 'শুদ্ধি-তত্ত্বে'র অংশ বিশেষ।

এই বইগুলির শুধু নামগুলি দেখিলেই বোঝা যায় যে, রঘুনন্দন সেই কালের হিন্দুর সামাজিক ও গার্হস্থ্য জীবনের এবং ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠানের কোনও দিক বাদ দেন নাই, সকল বিষয় ধরিয়া এক একখানা বই লিখিয়াছেন। এতগুলি বই লিখিতে তাঁহার যে কি অমানুষিক পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল, এবং প্রাচীন শাস্ত্রগুলি কেমন তন্ন তন্ন করিয়া পড়িতে হইয়াছিল, ঐগুলি পড়িলে তাহার কতকটা আভাস পাওয়া যায়। আর ঐগুলি পড়িলে, তাঁহার বিচার-শক্তি কিরূপ প্রবল ছিল ও বুদ্ধিমত্তা কিরূপ অসাধারণ ছিল, তাহাও বোঝা যায়। তাঁহার বইগুলিতে সর্ব্বশুদ্ধ ৮৯ জন স্মার্ত্তের মতামত, এবং ২২৬ খানা বই হইতে বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। যেখানে যেখানে তিনি অন্যের সহিত একমত হইতে পারেন নাই, সেইখানেই তিনি যুক্তি ও তর্কের দ্বারা সে সকল মত খণ্ডন করিয়া নিজের মত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। হিন্দুসমাজের কল্যাণ-কামনায়, এবং হিন্দুজাতির পবিত্রতা রক্ষার উদ্দেশ্যে, তিনি এত পরিশ্রম করিয়াছিলেন বলিয়াই সমাজ ও জাতির উপর তিনি অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। লোকে তাঁহাকে অতিশয় সম্মান ও শ্রদ্ধা করিত। তাঁহার বহুসংখ্যক শিষ্য ছিল, তাহারা তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত। তিনি যাহা বলিতেন, তাহারা তাহা বেদবাক্য বলিয়াই মনে করিত। তিনি যাহা করিতেন, তাহাই একমাত্র কর্ত্তব্য মনে করিয়া তাহারা তাহা করিবার চেষ্টা করিত। একদিন তিনি নাকি নদীয়ার গঙ্গার ঘাটে আহ্নিক করিতে গিয়াছিলেন। সঙ্গে কয়েকজন শিষ্যও গিয়াছিল। তিনি যখন আহ্নিক করিতে লাগিলেন, শিষ্যেরাও তখন আহ্নিক করিতে লাগিল। এদিকে আহ্নিক করিতে করিতে দৈবক্রমে রঘুনন্দনের কাপড়ের কাছা খুলিয়া গেল, তিনি তাহা টের পান নাই। কিন্তু শিষ্যেরা তাহা দেখিয়াছিল, এবং দেখিয়া সকলেই চুপে চুপে নিজের নিজের কাছা হাত দিয়া দিয়া খুলিয়া ফেলিয়া, আবার আহ্নিকে মন দিল। আহ্নিক শেষ হইলে, রঘুনন্দন ত দেখিয়া অবাক, সকলেরই কাছা খোলা কেন? তারপর যখন তিনি নিজের কাছা খোলা টের পাইলেন, তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন তাঁহার শিষ্যেরা সকলে কেন কাছা খুলিয়াছিল।

একবার রঘুনন্দন পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে পিণ্ড-দান করিবার জন্য গয়ায় গমন করিয়াছিলেন। তীর্থক্ষেত্রে পাণ্ডাদের অত্যাচার এখনও যেমন,

তখনও কতকটা তেমনই ছিল। রঘুনন্দন পিণ্ডদান করিবার জন্য যখন গয়ার মন্দিরে ঢুকিতে যান, তখন পাণ্ডারা তাঁহার নিকট অত্যন্ত বেশী কর চায়। তিনি বলিলেন, এত বেশী কর আমি দিব না। পাণ্ডারা বলিল, তবে মন্দিরে ঢুকিও না। ইহাতে রঘুনন্দন অত্যন্ত বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া বাহির হইয়া আসেন, এবং গয়াক্ষেত্রে এক ক্রোশের মধ্যে যে কোনও স্থানে পিণ্ড দেওয়া যাইতে পারে এবং তাহাতে শাস্ত্রের বাধা নাই, এই সিদ্ধান্ত করিয়া মন্দির হইতে খানিকটা দূরে গিয়া সেইখানেই পিণ্ড-দান করিতে বসিয়া গেলেন। ওদিকে পাণ্ডারা একটু পরেই জানিতে পারিল যে, ইনি আর কেহ নন, স্বয়ং রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য। তাহারা তখন ভয়ে শিহরিয়া উঠিল, কারণ রঘুনন্দন যদি একবার এই ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিয়া ফেলেন, তবে কে আর আসিয়া তাহাদের মন্দিরে পিণ্ডদান করিবে, আর কেমন করিয়াই বা তাহাদের পেট চলিবে? তাহারা ছুটিয়া রঘুনন্দনের নিকট গিয়া তাঁহাকে মন্দিরে যাইবার জন্য অনেক কাকুতি-মিনতি করিতে লাগিল, এবং তাহারা যে অপরাধ করিয়াছে, তাহার জন্য পুনঃ পুনঃ ক্ষমা চাহিতে লাগিল। অবশেষে রঘুনন্দন দয়া পরবশ হইয়া আবার উঠিয়া সেই মন্দিরে গেলেন, এবং পিণ্ডদান করিয়া আসিলেন। লোকে রঘুনন্দনের শাসনকে এত ভয় করিয়া চলিত।

অন্যান্য প্রদেশের ব্রাহ্মণদের পক্ষে সিদ্ধ চাল, মুসুরির ডাল ও মাছ খাওয়া নিষেধ, কিন্তু বাঙ্গালার ব্রাহ্মণেরা তাহা খাইত। দেশের অবস্থা বুঝিয়া রঘুনন্দন ব্যবস্থা দিলেন যে, উহা খাইলে কোনও দোষ নাই।

বাঙ্গালা দেশে তখন তান্ত্রিক ধর্ম্মের খুব প্রাবল্য ছিল। রঘুনন্দন স্মৃতির মধ্যে যতটা সম্ভব তন্ত্র ঢুকাইয়া দিলেন। সময় সময় তিনি তন্ত্রের প্রমাণ গ্রহণ করিয়া স্মৃতির সমস্যা সমাধান করিয়াছেন। যেমন, যদি কেহ কোনও ব্রাহ্মণকে আক্রমণ করে, তবে তাহাকে কৃচ্ছ্রব্রত পালন করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, ইহা স্মৃতির নির্দ্দেশ। কিন্তু সমস্যা উঠিল, যদি সেই লোক পাঁচজন ব্রাহ্মণকে আক্রমণ করে, তবে কি তাহাকে পাঁচবার ঐ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, না একবার করিলেই চলিবে? রঘুনন্দন তন্ত্রের প্রমাণ গ্রহণ করিয়া ব্যবস্থা দিলেন, একবার করিলেই চলিবে।

বাঙ্গালা দেশে হিন্দু-বিধবারা পূর্ব্বে নির্জ্জলা একাদশী পালন করিতনা, অনেকেই একাদশীতে ফল, মূল, দুগ্ধ প্রভৃতি লঘু আহার করিত কিন্তু রঘুনন্দন ব্যবস্থা দিলেন যে, না—উহা ঠিক নয়, একাদশীতে বালক, বৃদ্ধা সকল বিধবাকেই একেবারে উপবাস করিয়া থাকিতে হইবে। বিধবাদের উপর এতটা কঠোর হওয়াটা রঘুনন্দনের বোধ হয় ভাল হয় নাই।

আর একটা জিনিসের জন্য আধুনিক হিন্দুরা রঘুনন্দনকে গালি দেয়, সেটা সমুদ্র-যাত্রার বিরুদ্ধে তাঁহার বিধান। অথচ কিন্তু রঘুনন্দন সমুদ্র-যাত্রা সম্বন্ধে বাস্তবিক কোনও বিধান দেন নাই, লোকে শুধু শুধু তাঁহাকে দোষ দেয়। [‘প্রবাসী’, ১৩২১, বৈশাখ পৃঃ ৩৪-৩৫ দেখ।] বহু প্রাচীন কাল হইতে বাঙ্গালীরা নিজেদের জাহাজে করিয়া বহু দূর দেশ-দেশান্তরে গিয়া বাণিজ্য করিত; ভারত সমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জে গিয়া বাঙ্গালীরা উপনিবেশ স্থাপন করিয়া সেখানকার সভ্যতাকে কত উন্নত করিয়াছিল; জ্ঞান লাভের আকাঙ্ক্ষায় কত বাঙ্গালী জাহাজে করিয়া সিংহল, জাভা, ব্রহ্ম প্রভৃতি স্থানে গমন করিত; বাঙ্গালীর রণতরী ছিল অপরাজেয়; মহাকবি কালিদাস ত বাঙ্গালীকে বর্ণনাই করিয়াছেন ‘নৌ-সাধনোদ্যত’ বলিয়া; প্রাচীন বাঙ্গালী একরকম নাবিকেরই জাত ছিল। কিন্তু রঘুনন্দনের বিধানে সমুদ্র-যাত্রা বাঙ্গালীর পক্ষে নিষিদ্ধ হইয়া গেল।

রঘুনন্দনের স্মৃতি প্রথমে পশ্চিম বাঙ্গালায় চলিত, পূর্ব্ব বাঙ্গালায় চলিত না। তারপর ক্রমশঃ ক্রমশঃ সারা বাঙ্গালায়ই চলিতে আরম্ভ করিল।

রঘুনন্দনের বিধি-ব্যবস্থার কথা সম্যক্ ভাবে আলোচনা করিলে আমাদের মনে হয় যে, তাঁহার কতকগুলি নিয়ম সত্যই ভালো—দেশ-কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া সেগুলি মানিয়া লইতে কাহারও দ্বিধা জাগিবে না। কিন্তু সর্ব্বত্র সে নিয়ম রঘুনন্দন মানিয়া চলেন নাই। এইজন্য তাঁহার কতকগুলি নিয়ম বাঙ্গালায় ঠিকভাবে মানিয়া চলা হয় না।



ম্যাডাম গ্যাঁয়ো

২৪৭৪ পৃষ্ঠার পর

আড়াই শত বৎসরেরও অনেক আগে ১৬৪৮ অব্দে ফরাসীদেশে মোতার্জি (Motntarje) সহরে এক সম্ভ্রান্ত ধনী পরিবারে একটি কন্যার জন্ম হইল। নাম জান্ মারী বুভিয়ের দ্য লা মত (Jeanne Marie Bouivieres De la Mothe)। তখনকার দিনে ইউরোপের সব দেশে খৃষ্টান সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের আশ্রম থাকিত—ধর্ম্মপ্রাণ যত লোক সব সংসার বিরাগী হইয়া সেইখানে থাকিয়া ধর্ম্মকর্ম্মে কাল কাটাইতেন। এ ছাড়াও সাধারণ গৃহস্থ পরিবারের মেয়েদেরও অনেক সময় শিক্ষা-দীক্ষার জন্য বাল্যকালে ঐ সব আশ্রমে রাখিয়া দেওয়া হইত। জান্ মারীর পিতাও মেয়েটির সকল রকম সুশিক্ষার আশায় তাঁহাকে অতি শৈশবকালেই ঐরকম একটি আশ্রমের সন্ন্যাসিনীদের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া দিলেন।

অনেক বালিকাই এইরূপ আশ্রমে থাকে, তাহাতে আশ্চর্য্যের কিছু নাই। কিন্তু জান্ মারীর মধ্যে একটু বিশেষত্ব ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। দশ বৎসর বয়সের সময়ই তাঁহার কাছে খৃষ্টানদের ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেলখানা এত প্রিয় হইয়া উঠিতে লাগিল যে, তিনি তাহার অনেকখানি একেবারে মুখস্থ করিয়া ফেলিলেন। বারো তেরো বৎসর মাত্র যখন তাঁহার বয়স, তখন হইতেই তিনি মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন, ভগবানের পায়ে নিজেকে একেবারে বিলাইয়া দিবেন, ভগবানের প্রেরণা ছাড়া তাঁহার নিজের কোনও স্বতন্ত্র ইচ্ছা যেন না থাকে। এই সঙ্কল্প সফল করিবার জন্য তিনি কৃচ্ছ্রসাধন পর্য্যন্ত আরম্ভ করিলেন।

এই সময় একদিন তিনি মনে করিলেন, পিতা-মাতাকে ফাঁকি দিয়া এখনই বিধিমত দীক্ষা লইয়া সন্ন্যাসিনী হইবেন। কিন্তু পিতা তাঁহার অভিসন্ধি বুঝিতে পারিলেন। তিনি তখন দেখিলেন, তাঁহার আদরের কন্যাটি সংসার ছাড়িয়া যাইতে চায়, এ তো বড়ই বিপদের কথা। এখন কি করা যায়? ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি জান্ মারীকে সন্ন্যাসিনীদের আশ্রম হইতে বাড়ী আনাইয়া বরাবর প্যারিস নগরীতে চলিয়া আসিলেন।

প্যারিস ফরাসীদের রাজধানী, ইহা ভোগবিলাস ও ঐশ্বর্য্যের নিকেতন। এখানকার চাকচিক্যের মধ্যে থাকিতে থাকিতে মেয়ের মন সংসারের দিকে একটু ঝুঁকিয়া পড়িবেই—এই তাঁহার উদ্দেশ্য। তখন জান্ মারীর বয়স মাত্র পনের। তিনি একদিকে ছিলেন যেমন অপূর্ব্ব সুন্দরী, তেমনই অগাধ ছিল তাঁহার গুণ। দেখিতে দেখিতে প্যারিসের যুবকগণ

তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিলেন। মারীর পিতা ইহাই চাহিতেছিলেন। যখন তাঁহার বয়স ষোলও পূর্ণ হয় নাই এমন সময় তিনি তাঁহার বিবাহ দিলেন মঁসিয়ে গ্যাঁয়ো নামক এক সম্ভ্রান্ত ধনীর সঙ্গে। মঁসিয়ে গ্যাঁয়ো ছিলেন কিছু রুগ্ন এবং বয়সে জান্ মারীর চেয়ে বাইশ বৎসরের বড়।

যাহা হউক জান্ মারী কোনও আপত্তি করিলেন না। বিবাহ হইয়া গেল। তিনি এখন



ম্যাডাম গ্যাঁয়ো

ম্যাডাম গ্যাঁয়ো (Madame Guyon) বলিয়া পরিচিত হইলেন।

কিন্তু বিবাহ করিয়া তিনি সুখী হইতে পারিলেন না। তিনি ছিলেন একান্তভাবে ঈশ্বরগত প্রাণ, আর স্বামী ছিলেন সংসারী মানুষ। মতে একেবারেই মিলিত না। তার উপরে তাঁহার শাশুড়ী ছিলেন বড়ই দুর্দ্দান্ত। বধূর এই ধর্ম্মভাব, সংসারে বিরাগ তিনি দুইচক্ষে দেখিতে পারিতেন না। সুতরাং বিবাহিত জীবনে আসিয়া দুঃখের মধ্যে তাঁহার দিন কাটিতে লাগিল। ম্যাডাম গ্যাঁয়ো দিনরাত্রি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। অন্ধকারের মধ্যে যেন দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন, কোন্ পথে চলিতে হইবে পথ খুঁজিয়া পান্ না। তখনকার দিনে ফরাসীদেশে ও অন্যান্য জায়গায় যত বড় বড় সাধুপুরুষ ছিলেন তাঁহাদের সকলের লিখিত উপদেশগুলি তিনি একমনে পড়িতে লাগিলেন আর নিজের মনে দিনরাত ধ্যান করিতে আরম্ভ করিলেন।

এইরকম আপ্রাণ চেষ্টা ও নিজের মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করিতে করিতে অবশেষে একুশবৎসর বয়সে তিনি প্রথম ঈশ্বরের কৃপালাভ করিলেন। ভগবানের সঙ্গে তাঁহার জীবন যেন এক হইয়া গেল। প্রার্থনার মধ্যে একবার যখন ডুবিয়া যাইতেন, বাহিরের আর কোনও জ্ঞান তখন থাকিত না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এমনই ধ্যানের ভাবে কাটিয়া যাইত; কিন্তু মনের এই চমৎকার অবস্থা যেন বেশীদিন স্থায়ী হইতে চাহে না। অলক্ষ্যে কোথা হইতে মাঝে মাঝে পৃথিবীর টান আসিয়া লাগিত, মন চঞ্চল হইয়া উঠিত, আবার নিজের মনের সঙ্গে নিজের লড়াই চলিত।

এইভাবে সংসারের মধ্যে দিন কাটিতে কাটিতে ম্যাডাম গ্যাঁয়োর আটাশ বৎসর বয়সে মঁসিয়ে গ্যাঁয়ো মারা গেলেন। ম্যাডাম গ্যাঁয়োর সম্বল রহিল দুইটি পুত্র ও একটি শিশুকন্যা। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা হইল, সংসার ছাড়িয়া দিয়া এইবার নিশ্চিন্তমনে একমাত্র ঈশ্বরের আরাধনাতেই নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োগ করেন। কিন্তু বাধা হইল, এই বালকবালিকাগুলি এবা পিতৃহীন, মাতাপিতার সব দায়িত্ব এখন যে একলা তাঁহারই উপরে। তিনি অনেক দিন ধরিয়া ভাবিলেন। একদিকে মায়ের কর্ত্তব্য, আর একদিকে সন্ন্যাসের আকাঙ্ক্ষা: কি করা যায়? অবশেষে পাঁচ বৎসর পরে তিনি স্থির করিলেন, তাঁহাকে সংসার ছাড়িতেই হইবে। জগতে ধর্ম্মপ্রচারের জন্য তাঁহার কাছে ভগবানের ডাক আসিয়াছে, ইহাকে অবহেলা করিতে তিনি আর পারেন না। তিনি ভাবিয়া ঠিক করিলেন,

জেনিভাতে যাইবেন, সেইখানেই তাঁহার ধর্ম্মের কর্ম্মক্ষেত্র হউক। জেনিভার বিশপ দার্‌ঁতোর (D' Aroton) কাছে এই বিষয়ে উপদেশ চাহিলেন; তিনিও সম্মতি দিলেন।

তখন ম্যাডাম গ্যাযো পুত্র দুইটিকে একজন উপযুক্ত অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া পাঁচ-বৎসরের কন্যাটিকে কোলে করিয়া জেনিভার নিকটবর্ত্তী জেক্স (Gex) সহরে আসিয়া পৌছিলেন। দারাতোঁ তাঁহার ধর্ম্মপথে সহায়তা করিবার জন্য লা কোঁব (La Combe) নামক একজন সাধু-পুরুষকে নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

ম্যাডাম গ্যাযো এখানে আসিয়াই সেবাব্রতে লাগিয়া গেলেন। রোগে তাঁহাদের শুশ্রূষা করা, বিপদে সাহায্য করা, শোকে দুঃখে ধর্ম্মের উপদেশ দেওয়া—এই হইল তাঁহার কাজ। কিন্তু ম্যাডাম গ্যাযো একাজে সম্পূর্ণ সন্তোষ পাইলেন না। তাঁহার যেন মনে হইতে লাগিল, ইহার চেয়েও মহত্তর কাজ তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। ধীরে ধীরে তিনি বুঝিতে পারিলেন, কি তাঁহার কাজ। তাঁহার জাতির প্রচলিত ধর্ম্মমতের মধ্যে অনেক কিছু ভুলত্রুটি ও সংস্কার জড় হইয়া উঠিয়াছে, ঈশ্বরকে পাওয়ার পথ বুঝিবা তাহাতে বন্ধ হইয়া যায়। এই ভুলগুলি ভাঙ্গিয়া নূতন আলোতে তাঁহার ধর্ম্মকে সকলের চোখের সামনে ধরিতে হইবে, ঈশ্বরের সাথে যুক্ত হইতে হইলে মনকে যে পথে লইয়া যাইতে হয়, সেই নূতন পথের সন্ধান মানুষকে দিতে হইবে। ইহাই হইল তাঁহার জীবনের সাধনা।

তিনি এইমত প্রচার আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সহকারী লা কোঁব দেখিলেন সত্যই এ মত বড় সুন্দর। তিনিও অল্পকালের মধ্যে ম্যাডাম গ্যাঁযোর মতামত গ্রহণ করিয়া তাহাই প্রচার করিতে লাগিলেন। জেনিভার সমস্ত গোঁড়া রোমান ক্যাথলিকগণ প্রথমে একটু চমকিত, তারপরে সন্ত্রস্ত, তারপরে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। চিরকাল তাঁহারা যাহা জানিয়া ও বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছেন, তাহার উপরে অন্যরকম কথা বলিলে চলিবে কেন? এই নারীর বড় তো স্পর্দ্ধা? এমন কি দারাতোঁ পর্য্যন্ত তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিলেন। ম্যাডাম গ্যাযো অত্যন্ত বিপদে পড়িলেন। ক্রমে উপদ্রবের মাত্রা এত বেশী হইতে লাগিল যে জেক্স সহরে আর থাকাই প্রায় তাঁহার অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল।

সুতরাং এক বৎসরের মধ্যেই অর্থাৎ ১৬৮২ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে তিনি ঐ সহর ছাড়িয়া তোনো (Thoaon) সহরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানেও কিছুদিনের মধ্যে জেক্স সহরের মতই তাঁহার বিরুদ্ধে লোক জুটিল। দারাঁতোঁ আদেশ দিলেন, তাঁহাকে ও লা কোঁবকে এস্থান ছাড়িয়া যাইতে হইবে। অগত্যা বাধ্য হইয়া তাঁহাকে দারাঁতোঁর এলাকা ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতে হইল। কিন্তু কোথায় যাইবেন? গোঁড়া রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টানগণ সর্ব্বত্রই তাঁহার বিরুদ্ধতা করিতে আরম্ভ করিলেন।

চারিবৎসর ধরিয়া তিনি টিউরিন (Turin), গ্রেনোবল (Grenoble), নীস্ (Nice), জেনোয়া (Genoa) প্রভৃতি সহরে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কোথাও তাঁহার স্থান মিলিল না। তাঁহার নূতন ধর্ম্মমতকে কেহ সহ্য করিতে চাহিল না। অবশেষে বন্ধুগণ পরামর্শ দিলেন, প্যারিসে যাওয়াই তাঁহার পক্ষে এখন সর্ব্বাপেক্ষা ভাল।

ম্যাডাম গ্যাযো প্যারিসে আসিলেন। এখানকার সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত ভদ্রলোকগণ তাঁহার মতের ভক্ত হইয়া পড়িলেন। দেখিতে দেখিতে প্যারিসে তাঁহার খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা বাড়িয়া চলিল। কিন্তু হইলে কি হইবে? রোমানক্যাথলিক সমাজের ধর্ম্মগুরু হইলেন রোমে, প্যারিসের লোকেরা এ মত সমর্থন করিলেও তাঁহার অনুমতি না পাইলে কোনও ধর্ম্মমতই চলিতে পারে না। সুতরাং হঠাৎ একদিন দেখা গেল, লা কোঁবের উপরে গ্রেপ্তারের পরোয়ানা আসিয়া হাজির হইয়াছে। তাহার তিনমাস পরে ম্যাডাম গ্যাযোও বন্দিনী হইলেন। তখন তাঁহার বয়স চল্লিশ বৎসর।

বন্দী অবস্থায় আর কোনও কাজই করিবার নাই, তিনি বসিয়া বসিয়া ধর্ম্মগ্রন্থ লিখিতে লাগিলেন।

কিন্তু তাঁহাকে বেশীদিন বন্দী থাকিতে হইল না। মাদাম দ্য মঁ্যাত্তনোঁ (Madamo de

Maintenon) নামক একটি মহিলার ফরাসীরাজার উপর খুব প্রভাব ছিল। ম্যাডাম গ্যাঁয়োর বন্ধু ও ভক্তগণ মাদাম্ ছ ম্যাণ্টনোকে বলিয়া কহিয়া রাজাকে দিয়া তাঁহার মুক্তি দেওয়াইলেন।

ম্যাডাম গ্যাঁয়ো তখন কিছুদিন তাঁহার কন্যার কাছে গিয়া বাস করিলেন। এখানে থাকিয়া আবার আগেকার মত প্রচার করিতে লাগিলেন। আবার কিছুদিনের মধ্যে তাঁহার বিরুদ্ধে আন্দোলন হইতে লাগিল। কয়েকজন বড় বড় ধর্ম্মযাজক তাঁহার বিরুদ্ধে পুস্তক লিখিতে লাগিলেন। তাঁহারা ম্যাডাম গ্যায়োর উপরে এত বেশী ক্ষেপিয়া গিয়াছিলেন যে, শুধু তাঁহার ধর্ম্মমতকে নিন্দা করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, মিথ্যা করিয়া তাঁহার স্বভাবের উপর কুৎসা রটনা করিতে লাগিলেন।

ম্যাডাম গ্যায়োকে বিচার করিবার জন্য এক বিচারসভা বসিল। কয়েকমাস ধরিয়া তাহার অধিবেশন চলিল। কিন্তু তিনি নির্দ্দোষ বলিয়া সাব্যস্ত হইলেন না। আবার তাঁহাকে কারারুদ্ধ করা হইল। এবার দীর্ঘ সাতবৎসর তাঁহাকে ঐভাবে বন্দী থাকিতে হইল।

বন্দী অবস্থায় তাঁহার দিন কেমন করিয়া কাটিত, সে বিষয়ে তিনি তাঁহার আত্মচরিতে অতি সুন্দর ভাবে লিখিয়া গিয়াছেন। ম্যাডাম গ্যায়ো লিখিয়াছেন,—"কারাগারে আমার দিনগুলি অতি শান্তিতে কাটিত। আমাকে যদি আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কারাগারে থাকিতে হইত তাহা হইলেও আমার দুঃখের কোন কারণ ঘটিত না। সেই নির্জ্জন কারাগৃহের মধ্যে আমি আপনার মনে একটির পর একটি ধর্ম্ম-সঙ্গীত রচনা করিয়া যাইতাম। আমার সঙ্গিনী ল্যা গাঁতিয়া (La Guntiere)কে গান রচনার পর শুনাইতাম এবং দুইজনে গাহিয়া গাহিয়া তাহা একেবারে কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতাম। আমার সেখানে গান রচনা করা ছাড়া অন্য কোন কাজ ছিল না। গান গাহিয়া আমি যে আনন্দ লাভ করিতাম তাহা বলিয়া বুঝাইতে পারিব না। আমার কাছে কারাগারের পাষাণ প্রাচীরের প্রত্যেকখানি প্রস্তর ও মণির মত মনে হইত। কোন কষ্ট আমার হয় নাই।"

মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি যে দলিলখানি লিখিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে তাঁহার অপূর্ব্ব বিশ্বাস ও ভক্তি ফুটিয়া বাহির হইয়াছিল। তিনি লিখিয়াছিলেন,—"হে প্রভু! আমি তোমার নিকট হইতে সব পাইয়াছি। এবং আমি তোমাকেই আমার যা কিছু সব অর্পণ করিতেছি। হে দয়াল ঈশ্বর! তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। আমার শরীর, আমার আত্মা, তোমাকে অর্পণ করিতেছি, তুমি তাহা গ্রহণ কর। তুমি ত জান দয়াল, এই পৃথিবীতে তুমি ব্যতীত আমার অন্য কোন কামনা নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই। আমার এই দেহ, মন, আত্মা তোমাকে সমর্পণ করিতেছি। আমার মুক্তি সে যে তোমারই হাতে প্রভু!"

ম্যাডাম গ্যায়ো তাঁহার শিষ্যদিগকে যে সমুদয় উপদেশ দিয়া গিয়াছেন তাহা তাঁহার মহৎ হৃদয়ের ভক্তি ও বিশ্বাসের অপূর্ব্ব প্রতিচ্ছবি।

ঈশ্বর যাঁহাকে ভালবাসেন, তাঁহাকে ভীষণ পরীক্ষার ভিতর দিয়া সত্যের পথে আনয়ন করেন। ম্যাডাম গ্যায়োর জীবনে তাহা আমরা প্রত্যক্ষভাবে দেখিতে পাইলাম। তাঁহার জীবনের সহিত—তাপসীরাবেয়া ও মীরাবাইয়ের কথা তুলনা করা যাইতে পারে। তোমরা এই দুই ধার্ম্মিকা মহিলার জীবনের কথাও 'শিশু-ভারতী'তে পড়িয়াছ।

সাতবৎসর পরে তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হইল। কিন্তু তিনি প্যারিসে থাকিবার অনুমতি পাইলেন না। ব্লোয়াতে (Bloia) নির্ব্বাসিত হইলেন। সেইখানে বাকী সমস্ত জীবন তাঁহাকে কাটাইতে হইল।

কিন্তু তাঁহার কাজের তবু বিরাম ছিল না। দেশের সমস্ত স্থান হইতে সকল শ্রেণীর লোক তাঁহার কাছে ব্লোয়াতে গিয়া সাক্ষাৎ করিতে লাগিল।

এমনিভাবে ধর্ম্মোপদেশ, ধর্ম্মালোচনা ও ধর্ম্ম-প্রচার করিতে করিতে উনসত্তর বৎসর বয়সে ১৭১৭ খৃষ্টাব্দের ৯ই জুন তারিখে তিনি পরলোকে চলিয়া গেলেন। জীবিতকালে তাঁহাকে নির্য্যাতন করিলেও তাঁহার মৃত্যুর পরে আজ পৃথিবীর সব দেশের লোকেরাই ম্যাডাম গ্যাঁয়োর ধর্ম্মমতের শ্রেষ্ঠত্ব ও তাঁহার মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিয়াছে।



মায়া-সভ্যতা

২৫৬০ পৃষ্ঠার পর

পৃথিবীর নানাস্থানে বন-জঙ্গল ও পাহাড়ের অন্তরালে প্রাচীনকালের সভ্যতার নিদর্শন কোথায় কিভাবে, আছে তাহা জানা যায় না। এইখানে একটি প্রাচীন সভ্যতার কথা বলিতেছি। সেই প্রাচীনসভ্যতাটি 'মায়া' (Maya) সভ্যতা নামে পরিচিত।

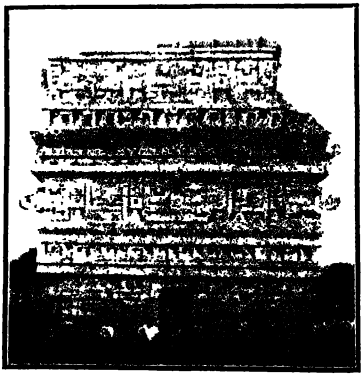
আমেরিকার আদিম অধিবাসীদিগকে সভ্যদেশের লোকেরা অসভ্য বলেন, কিন্তু মাটির ভিতর হইতে



একটি প্রাচীন প্রস্তর স্তম্ভের অংশ

উকাতনের (Yucatan) আদিম অধিবাসীদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে কিরূপ শিক্ষিত ও উন্নত জাতি ছিল, তাহার অনেক কিছু নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। এক সময়ে এই সভ্যতা যে বেশ উন্নত ছিল, তাহারও অনেক কিছু চিহ্ন পাওয়া যাইতেছে।

সেকালের আদিম অধিবাসীরা (American Indian races) বেশীর ভাগই পাহাড়ে বাস করিত। পাহাড়ের উপরে তাহাদের তৈরী ঘর বাড়ীর চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। তাহাদের লিখিত ভাষা ছিল, তাহার অনেক



মায়ার একটি প্রাচীন মন্দির

পাণ্ডুলিপি এবং চিত্রলিপি (Picture Writing) পাওয়া গিয়াছে। তাহা অতি সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক।

এই লেখা যে কেবল পাথরের উপর খোদাই তাহা নহে চামড়ার গায়েও চিত্রিত আছে। এই সব পাণ্ডুলিপির রং খুব উজ্জ্বল, এবং আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইউরোপ ও আমেরিকার ছেলে-

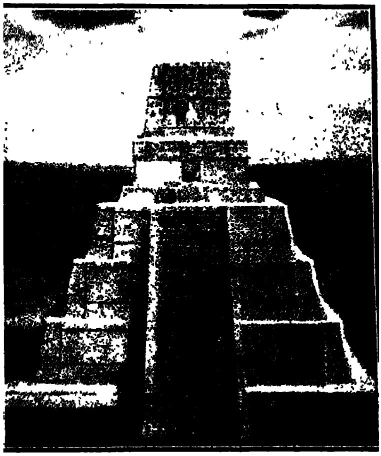


মায়াদের একটি দেবতা

মেয়েদের জন্য আজকাল যেমন পাংলা কাগজ বিক্রয় হয়, এই চামড়া কতকটা সেইরূপ। এই লেখার বিশেষত্ব রহিয়াছে—অনেক লাল ইণ্ডিয়ান (Red Indian) বা আমেরিকার আদিম অধিবাসীরা চিত্রলিপি অর্থাৎ তাহারা কোন জন্তু বা বস্তু বুঝাইতে হইলে তাহার চিত্র আঁকিয়া বুঝাইত। তারপর যদি বিশেষ কোন গুণ বা ভাব বুঝাইতে হইত, তাহা হইলে তাহা বুঝাইবার মত করিয়া ছবি আঁকিত। একদিন যাহারা 'মায়া' সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহাদের এই লিপির সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণের মত এই যে, সেকালের ধর্ম্মযাজকেরা এই লেখনীর দ্বারা তিথি, দিন ও বারের গণনা করিতেন। কেমন আশ্চর্য্য বল দেখি!

'মায়া' সভ্যতা স্থাপত্য-শিল্পের এবং ভাস্কর্য্য-শিল্পের দিক্ দিয়া বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছিল। এ বিষয়ে সবচেয়ে বড় কথা এই যে, প্রাচীন জগতের কোন স্থাপত্যরীতির অনুকরণ ইহাতে নাই। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে মায়ার স্থাপত্যরীতির সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের অনেকটা সাদৃশ্য রহিয়াছে। কিন্তু একটা বিষয় সহজেই চোখে পড়ে, এই সব খোদিত লিপি, মূর্ত্তি ও মন্দির গড়িতে গড়িতে তাহারা যেন হঠাৎ কোন খেয়ালবশে অদ্ভুত রকমের একটা মূর্ত্তি বা অন্য কিছু খোদিত করিয়াছেন। যেমন অনেক খোদিতলিপি দেখিলে মনে হয়, যেন কেহ পাগলামির খেয়ালে ঐরূপ খোদাই করিয়াছে।

উকাতনের ধ্বংসাবশেষ দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, কত বড় একটা সভ্যতা একদিন আমেরিকার এই নিভৃত প্রদেশে গড়িয়া উঠিয়াছিল।



তিকলের একটি প্রাচীন মন্দির

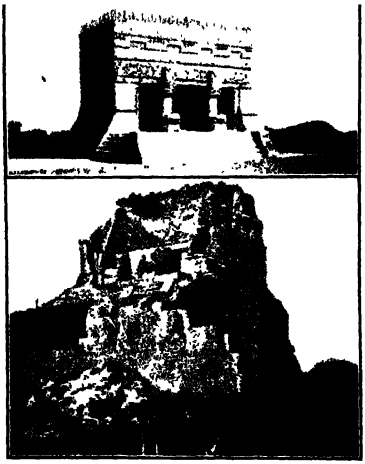
কতদূর পর্য্যন্ত এই সভ্যতার বিস্তার লাভ করিয়াছিল, তাহা জানা যায় না। কিভাবে ইহার ধ্বংস হইল তাহাও আমরা জানি না। আমেরিকার মধ্য-প্রদেশের বনে জঙ্গলের মধ্যে এখনও কত কি লুকাইয়া আছে, তাহা বলা বড় কঠিন। একদিন

হয়ত অনুসন্ধানের দ্বারা সেই সকল অজ্ঞাত দেশের আরও অনেক কিছু আবিষ্কৃত হইবে।



লাল দালান—চিকেন্ ইৎজা

'মায়া'র এই প্রাচীন সভ্যতার সম্বন্ধে ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্বে ইউরোপীয়েরা কিছুই জানিতেন না। এখানকার এ সমুদয় প্রাচীন কীর্ত্তি এমন স্থানে



উপরে 'লাল দালান' সংস্কারের পর
নিম্নে 'বাঘমন্দিরের' চিত্র

অবস্থিত যে, সেখানে সকল লোকের পক্ষে যাওয়াও সম্ভবপর নহে। জলবায়ু অস্বাস্থ্যকর। পিতেন্ (Peten) নামক অঞ্চলে বিদেশীদের যাওয়া এক প্রকার অসম্ভব বলিলেই হয়, কেননা সেখানকার অসভ্য জাতিরা বিদেশী লোক দেখিলেই নানাভাবে তাহাদিগকে নিপীড়িত করে। এখনও এখানকার লোকেরা প্রাচীন দেবতাদের পূজা-অর্চ্চনা করিয়া থাকে। কে জানে এই অজানা দেশের নিভৃত অন্তরালে আরও কত কি আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর



সেকালের উৎসবের পোষাক

পর বৈজ্ঞানিক উপায়ে এখানকার প্রাচীন কীর্ত্তি উদ্ধারের জন্য কোনওরূপ চেষ্টা ও যত্ন হয় নাই। কোপান্ (Copan) নামক স্থানে ঐ খনন কার্য্য চলিয়াছিল।

আমরা এ স্থানের প্রাচীন প্রত্ন-নিদর্শন হইতে প্রাচীন সভ্যতার যে পরিচয় পাই, তাহাতে মনে হয় যে, উৎসব বা পর্ব্ব উপলক্ষে সেকালের লোকেরা

জাঁকজমকের সঙ্গে চলাফেরা করিলেও সাধারণতঃ তাহাদের মধ্যে বিলাসিতা বড একটা ছিল না। কতকগুলি মালাব পাথরেব গুটি, যন্ত্রপাতি, হাঁড়ি-পাতিলের ভাঙ্গা টুক্‌বা—এমন সব সাধারণ জিনিসেব সংখ্যাই বেশী। কিন্তু প্রস্তব খোদিত যে সকল মূর্ত্তি পাওয়া গিযাছে, তাহা হইতে বুঝা যায যে, সে যুগের সম্ভ্রান্ত বা সঙ্গতিশালী ব্যক্তিরা পোষাক



মায়ার পুরোহিতেব দেবতার অর্চ্চনা

পরিচ্ছদের দিক্ দিযা আড়ম্বর বড় একটা কম করিতেন না। খোদিত মূর্ত্তিতে দেখিতে পাওযা যায়—মাথায় অদ্ভুত রকমেব সজ্জা, তাহাতে কতই না পাখীর পালক, কোন কোন মূর্ত্তিতে হাল্কা পাথরের মুখোস, পায়ে স্যাণ্ডেল জুতা, হাতে, বাহুতে, পায়ের গোড়ালির কাছে বিবিধ অলঙ্কার। সব দিক্ দিয়াই দিব্যি ভারিক্কি গোছের ভাব।

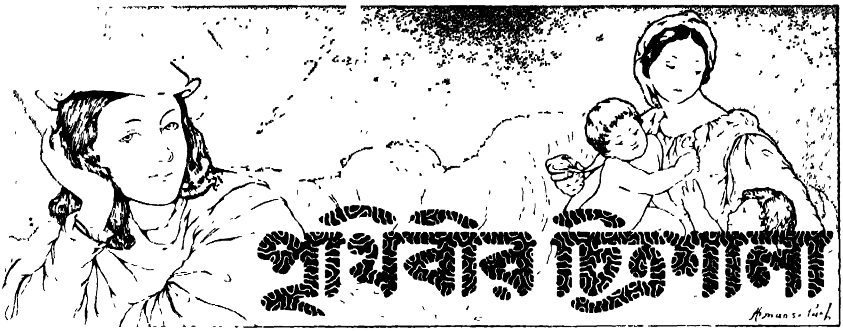
'মায়া' সভ্যতার দিনে শ্রম-শিল্পেব মধ্যে দড়ি তৈরী, ঝুড়ি তৈবী ইত্যাদি ছিল প্রধান।

কত দিন আগে 'মাযা' সভ্যতা প্রসাবলাভ করিযাছিল সে সম্বন্ধে পণ্ডিতেবা একটা দিন তারিখেব হিসাব দিযাছেন। তাঁহাবা বৈজ্ঞানিক ভাবে যে সন-তারিখ নির্ণয কবিযাছেন, তাহাতে মনে হয খৃঃ পূঃ ৫৫ অব্দ হইতে এই প্রাচীন স্থানে সভ্যতাব সূচনা হয। সেই দুই হাজাব বৎসব পূর্ব্বে 'মাযা'ব প্রাচীন শিল্পীবা পাথবের গাযে নিজেদেব খেযাল-খুসী মত মূর্ত্তি অঙ্কিত কবিযাছেন। সে দিক দিযা দেখিলে দেখা যায, জুলিযাস সীজাব যখন ব্রিটেন আক্রমণ কবিবাব জন্য উদ্যোগী হইযাছেন, সে সমযে আমেরিকাব এই অজ্ঞাত দেশে একটি সুন্দব সভ্যতা আপনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত কবিযাছিল।

আমেরিকাব এই সব সভ্যতাব সম্বন্ধে আমাদেব আব একটি কথাও মনে বাখিতে হইবে। মাযা-সভ্যতাব সহিত আমেরিকাব অন্যান্য সভ্যতাব কোনও যোগ ছিল বলিযা মনে কবিবাব কোনও কাবণ নাই। স্পেনীযেবা যখন এদেশে আসেন, তখন তাহাবা দেখিতে পাইলেন যে, কি মেক্সিকো, কি পেরু, কি অন্যান্য প্রদেশেব অধিবাসীরা কেহ কাহাবও সংবাদ জানে না, পবস্পবে পবিচিত নহে। যদিই বা থাকিযা থাকে তাহা জানিবাব উপায এখন আব কিছুই নাই।

মাযাব এই প্রাচীন সভ্যতাব ইতিহাস আলো-চনার দ্বাবা আমবা প্রাচীন কালেব অনেক কিছু অজ্ঞাত তথ্য একদিন হযত জানিতে পাবিব। ঐখানে কোন দিন লৌহেব ব্যবহাব ছিল, তাহা জানা যায না। তবে মনে হয ইহাদেব কাছে তামা বা সোণার কথা অজ্ঞাত ছিল না। ইহাদেব পাথবেব কাজ, মাটিব হাঁড়ি, পাতিল, কাপড বোনা রঞ্জন-শিল্প সম্বন্ধে মোটামুটি বেশ জ্ঞান ছিল। মায়া সভ্যতার যুগে বলি প্রচলিত ছিল। বীজ বপনের সময় কিংবা ফসল কাটার সময় দেবতাব আশীর্ব্বাদ লাভ কবিবার জন্য তাহারা দেবতাব কাছে নববলি দিত।

পুরোহিতেরাই ছিলেন ধর্ম্ম সম্বন্ধে সর্ব্বময় কর্ত্তা। জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহাদের জ্ঞান সেকালেব হিসাবে অসাধারণই ছিল।



র‍্যাফ্যায়েলের অঙ্কিত চিত্রাবলী

২৮৭৯ পৃষ্ঠার পর

র‍্যাফ্যায়েলের মাতৃমূর্ত্তির চিত্রের সঙ্গে সঙ্গে আমরা তাঁহার অঙ্কিত আরও কয়েকখানি শ্রেষ্ঠ চিত্রেরও প্রতিলিপি দিব। তাহা হইলে তোমরা সহজে নিজের চোখ দিয়াই বিচার করিতে পারিবে যে, র‍্যাফায়েল কত বড় শ্রেষ্ঠ চিত্রকর ছিলেন। কত বড় বিরাট কল্পনা ও আদর্শ লইয়া তিনি ছবি আঁকিতেন, আর কত বড় নিষ্ঠা ছিল তাঁহার।

এইবার মাতৃমূর্ত্তির ছবিখানা দেখ। আমাদের বর্ণনার সহিত ছবিখানা মিলাও। তারপর ছবিখানার অপরূপ সৌন্দর্য্য বুঝিতে চেষ্টা কর। নীল আকাশে স্বর্ণবর্ণের মেঘমালা। চারিদিক বেড়িয়া দেবদূতগণ (Angels)। জননী মেরী বাম হাত দিয়া যীশুকে ধরিয়া রহিয়াছেন। যীশু-জননী এবং শিশু যীশু দুইজনেই নত দৃষ্টিতে নীচের দিকে সিগিসমোণ্ডি কেণ্টি (Sigismondi Conti) ও সেণ্ট জেরোমের (St, Jerome) দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। বাঁ দিকে সেণ্টজন্ (St. John, the Baptist) দাড়াইয়া আছেন এবং তাঁহারই সম্মুখে সেণ্ট ফ্র্যান্সিস্ (St. Francis) নতজানু হইয়া উর্দ্ধ দিকে ভক্তিপূর্ণ নয়নে যীশু-জননী ও যীশুর দিকে চাহিয়া আছেন। ছোট একটি দেবদূত ইঁহাদের মাঝখানে একটি খোদিত ফলক হস্তে দাড়াইয়া আছে। উহাতে পূর্ব্বে দাতার নাম খোদিত ছিল।

এই চিত্রখানা প্রায় দুই শতাব্দী কাল পর্য্যন্ত ফুলিগ্নো (Fuligno)র গীর্জ্জার বেদীর পুরোভাগে শোভা পাইত। ফরাসীরা সেখান হইতে ইহাকে প্যারী নগরীতে লইয়া গিয়াছিলেন। সেখানে এই ছবিখানি সংস্কৃত হয়। ১৮১৫ খৃঃ অঃ সন্ধির পর ফরাসীরা এই চিত্রখানি ইতালিতে ফিরাইয়া দেন, কিন্তু এই বিখ্যাত ছবিখানি আর সেখানে রাখা হয় নাই। এখনও উহা ভ্যাটিকানে (Vatican) রহিয়াছে।

চতুর্থ চিত্রখানিতে দেখ, সিংহাসনের উপরে যীশু-জননী মেরী বসিয়া আছেন। তাঁহার হাঁটুর উপর তিনি যীশুকে ধরিয়া আছেন। মেরী তোবিয়াসের (Tobias) দিকে একটু ঝুঁকিয়া রহিয়াছেন। তোবিয়াসের হস্তে একটি মাছ। দেবদূত র‍্যাফ্যা-য়েল তোবিয়াসকে যীশুর নিকট আনয়ন করিয়া-ছেন। দক্ষিণ দিকে বৃদ্ধ সাধু স্যাণ্ট জেরোমি

সিংহাসনের পাশে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার হাতে একখানা বড় বই। তিনি সেই বইখানা পড়িতেছেন। তাঁহার পায়ের তলায় পোষা প্রত্যেকের দৃষ্টি, গতিভঙ্গিমা মনের মধ্যে আনন্দের সৃষ্টি করে। যীশু জননী কুমারী মেরী, স্যান্ট জেরোমি, তোবিয়াস, দেবদূত র‍্যাফ্যায়েল—



মাতৃমূর্ত্তি—তৃতীয় চিত্র

সিংহটি বসিয়া রহিয়াছে। পেছনে একখানি যবনিকা। এই ছবিখানির নাম 'Madona-Di Fuligno।' প্রত্যেকটি মূর্ত্তি একেবারে জীবন্ত। সকলেই যেন একটা চিরন্তন সত্য ও সৌন্দর্য্যের আদর্শে অমর হইয়া রহিয়াছে।

এই চিত্র-শিল্পী আপনার জীবনকে চিত্র-শিল্পের

ধ্যান ও ধারণার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। তিনি যখন যে ছবি আঁকিতেন, সে সৌন্দর্য্যের পরিচয় পাই। তিনি মাতৃমূর্ত্তির প্রত্যেকটি চিত্রে যে দেবভাবের বিকাশ করিয়াছেন,



মাতৃমূর্ত্তি—চতুর্থ চিত্র

সময়ে তাঁহার কাছে বাহিরের যে একটা জগৎ আছে তাহা একেবারেই মনে হইত না। এই জন্যই প্রত্যেকটি চিত্রের মধ্যে আমরা অপার্থিব তাহা যে কত বড় সাধনার ফল, তাহা সহজেই তোমরা বুঝিতে পার।

রাজা সোলোমনের বিচার (The 'Judge-

ছোটদের মেলা



অবাক্ চাহনি



কান্না



খেলার সাথী



সেলাইয়ের কাজ

ment of Soloman)—এই ছবিখানা যে আখ্যানটি লইয়া অঙ্কিত হইয়াছে, সেই গল্পটি তোমরা জান। সেই যে দুইজন স্ত্রীলোক, একটি



রাজা সোলোমনের বিচার

শিশুকে নিজ নিজ সন্তান বলিয়া দাবী করিযাছিল! গল্পটি যদি মনে না থাকে তাহা হইলে 'শিশু-ভারতী' (১৫৬২ পৃষ্ঠা) দেখ।

র‍্যাফ্যায়েল এই ছবিখানার মধ্যে মানুষের মনের ভাব কেমন সুন্দর করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এক বলিষ্ঠকায় যুবক ঘাতক, বাম হস্তে শিশুটিকে উচু করিয়া ধরিয়া তাহাকে দ্বিখণ্ডিত করিবার উদ্যোগ করিযাছে।—যে স্ত্রীলোকটি শিশুটির প্রকৃত জননী নহে, সে হাঁটু

গাড়িয়া বসিয়াছে। আর যে সন্তানের প্রকৃত জননী, সে সন্তানকে রক্ষা করিবার জন্য ব্যাকুল ভাবে উপস্থিত হইয়া ঘাতককে বাধা দিতেছে।

আলেকজান্দ্রিয়ার স্যাণ্ট ক্যাথিরিনের (St. Catherine of Alexandria)—চিত্রখানার দিকে লক্ষ্য কর। স্যাণ্ট ক্যাথিরিনের দক্ষিণ হস্তখানা



স্যাণ্ট ক্যাথিরিন্

রাজা সোলোমন, ঘাতক এবং স্ত্রীলোক দুটির দিকে লক্ষ্য কর। দেখিবে প্রত্যেকটি চিত্র কেমন সজীব। মনে হয় তাহারা যেন কথা বলিতেছে!

তাঁহার বুকের উপর রক্ষিত। মুখমণ্ডলের উপর অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ বিকশিত। পেছনে নদী বহিয়া চলিয়াছে, তীরে শ্যামল তরুবীথি এবং বাড়ী-ঘর।



বনবাস

(২৬০৮ পৃষ্ঠার পর



যেতে আমি পারিনে কি তুমি ভাব্‌চ মনে ?

বাবা যদি রামের মত
পাঠায় আমায় বনে,
যেতে আমি পারিনে কি
তুমি ভাব্‌চ মনে ?

চোদ্দ বছর ক'দিনে হয়
জানিনে মা ঠিক,
দণ্ডকবন আছে কোথায়
ঐ মাঠে কোন্‌ দিক্‌ ?

কিন্তু আমি পারি যেতে
ভয় করিনে তা'তে—
লক্ষ্মণ ভাই যদি আমার
থাকত সাথে সাথে !

বনের মধ্যে গাছের ছায়ায়
বেঁধে নিতাম ঘর,
সামনে দিয়ে বইত নদী
পড়ত বালির চর।

ছোট একটি থাক্‌ত ডিঙ্গি
পারে যেতাম বেয়ে—
হরিণ চরে' বেড়ায় সেথা
কাছে আস্‌ত ধেয়ে।

গাছের পাতা খাইয়ে দিতাম
আমি নিজের হাতে,
লক্ষ্মণ ভাই যদি আমার
থাকত সাথে সাথে।



সামনে দিয়ে বইত নদী পড়ত বালির চর



কত যে গাছ ছেয়ে থাক্‌ত কত রকম ফুলে.

কত যে গাছ ছেয়ে থাকত
কত রকম ফুলে,
মালা গেঁথে পরে নিতেম
জড়িয়ে মাথার চুলে।

নানা রঙের ফলগুলি সব
ভুঁয়ে পড়্‌ত পেকে,
ঝুড়ি ভরে' ভরে' এনে
ঘরে দিতেম রেখে;

খিদে পেলে দুই ভায়েতে
খেতেম পদ্মপাতে,
লক্ষ্মণ ভাই যদি আমার
থাকত সাথে সাথে!



রাখাল ছেলের মত কেবল বাজাই ব'সে বাঁশি

রোদের বেলায় অশথ তলায়
ঘাসের পরে আসি
রাখাল ছেলের মত কেবল
বাজাই বসে' বাঁশি।

ডালের পরে ময়ূর থাকে
পেখম পড়ে ঝুলে,
কাঠবিড়ালী ছুটে বেড়ায়
ল্যাজটি পিঠে তুলে।

কখন্ আমি ঘুমিয়ে যেতেম
দুপুর বেলার তাতে—
লক্ষ্মণ ভাই যদি আমার
থাক্‌ত সাথে সাথে।

সন্ধ্যে বেলায় কুড়িয়ে আনি
শুকোনো ডালপালা,
বনের ধারে বসে' থাকি
আগুন হ'লে জ্বালা।

পাখীরা সব বাসায় ফেরে,
দূরে শেয়াল ডাকে,
সন্ধ্যে তারা দেখা যে যায়
ডালের ফাঁকে ফাঁকে।

মায়ের কথা মনে করি
বসে' আঁধার রাতে,—
লক্ষ্মণ ভাই যদি আমার
থাক্‌ত সাথে সাথে!



সন্ধ্যে বেলায় কুড়িয়ে আনি শুকোনো ডালপালা

ঠাকুরদাদার মত বনে
আছেন ঋষি মুনি
তাঁদের পায়ে প্রণাম করে'
গল্প অনেক শুনি।

রাক্ষসেরে ভয় করিনে
আছে গুহক-মিতা,
রাবণ আমার কি করবে মা
নেই ত আমার সীতা!

হনুমানকে যত্ন করে'
খাওয়াই দুধে ভাতে
লক্ষ্মণ ভাই যদি আমার
থাকত সাথে সাথে!



ঠাকুরদাদার মত বনে আছে ঋষি



মাগো আমায় দে না কেন একটি ছোট ভাই

মাগো আমায় দে না কেন
একটি ছোট ভাই—
দুইজনেতে মিলে মোরা
বনে চলে' যাই।

আমাকে মা শিখিয়ে দিবি
রাম-যাত্রার গান,
মাথায় বেঁধে দিবি চূড়ো,
হাতে ধনুক বাণ।

চিত্রকূটের পাহাড়ে যাই
এমনি বরষাতে,
লক্ষ্মণ ভাই যদি আমার
থাকত সাথে সাথে!



সাঁতারের প্রকার ভেদ

২৫৯০ পৃষ্ঠার পর

সন্তরণ প্রতিযোগীকে যেমন "**ব্যায়ামবীর**" বলা যায় জল-পোলো খেলোয়াড়কে যেমন "খেলোয়াড় বলা যায় তেমনি "শিল্পী" বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এখানে কয়েকটী সাঁতারের বৈচিত্র্যের কথা বর্ণনা করিব।

সাঁতার-জলে খাড়া থাকা

সাঁতার-জলের মধ্যে একস্থানে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবার ইচ্ছা করিলে, এই কৌশল অবলম্বন করিতে হয়।

মাথা ব্যতীত, সমস্ত শরীর নীচের দিকে সোজা হইয়া জলে ডুবিয়া থাকিবে। হাত, কনুই পর্য্যন্ত শরীরের পাশে সোজা থাকিবে। কনুই হইতে বাকী হাত সম্মুখ দিকে আগাইয়া থাকিবে। হাতের তেলো বাটির মত করিয়া ধীরে ধীরে দাঁড়-টানার ভঙ্গীর মত করিতে হইবে। যেমন সাধারণ সাঁতার দেও তেমনি বুকে ভর দিয়া সাঁতারের মত পা দিয়া ধাক্কা মারিতে হইবে, অবশ্য নীচের দিকে। পায়ের গতি খুব ধীরে ধীরে হইবে। হাত পায়ের গতি পরস্পর সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবেই চলিতে থাকিবে।

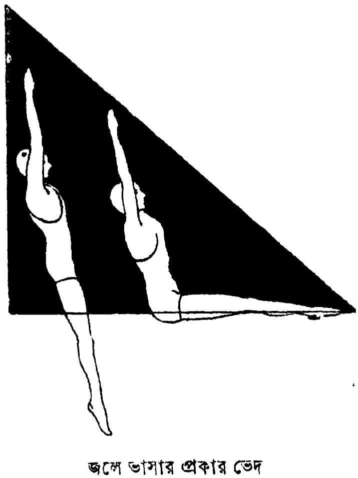
জলে ভাসা

জলে দুই প্রকারে ভাসিয়া থাকা যায়—

(ক) দাঁড়-ভাসা

(খ) চিৎ-ভাসা

(ক) **দাঁড়-ভাসা**—"দাঁড়-ভাসা", "চিৎ-ভাসা" অপেক্ষা সহজ। শরীরকে দণ্ডের মত খাড়া রাখিয়া কান পর্য্যন্ত ডুবাইয়া মাথা পিছন দিকে ঝুলাইয়া দিতে হয়। কেবল নাক ও মুখ জলের উপরে থাকিবে।



জলে ভাসার প্রকার ভেদ

হাতের তেলো নীচের দিকে করিয়া হাত দুইটি দুইপাশে ছড়াইয়া দিতে হইবে ; এবং ক্রমে পায়ের

ধাক্কা দেওয়া কমাইয়া একেবারে বন্ধ করিয়া দিতে হয়। ইহার পর পা দুইটী বেশ শিথিল ভাবে ঝুলাইয়া হাত দিয়া ধীরে ধীরে দাঁড় টানার মত করিবে, তাহা হইলে বেশ সহজেই ভাসিয়া থাকিতে পারিবে।

(খ) **চিৎ-ভাসা**—চিৎ-ভাসায় সমস্ত শরীরকে একখণ্ড তক্তার মত করিয়া চিৎ হইয়া ভাসিতে হইবে। হাত মাথার পিছনে দাঁড়াইয়া সোজা হইয়া পিছন দিকে যাইবে। পদদ্বয় একত্রে সোজা হইয়া থাকিবে। এই ভাবে ভাসমান থাকা সম্পূর্ণ রূপে শরীরের ভারকেন্দ্র ঠিক রাখার উপর নির্ভর করে। হাতের তেলো উপর দিকে করিয়া পিছন দিকে ঘুরাইতে হয়। যথাসম্ভব শ্বাস গ্রহণ করিয়া খুব ধীরে ধীরে নিশ্বাস ছাড়িবে। ইচ্ছা করিলে হাঁটু বাঁকাইতে পারা যায়। পিঠ সর্ব্বদা সম্পূর্ণ সোজা ভাবে রাখিতে হইবে। হাতের অঙ্গুলি উপর ভঙ্গী করিয়া শরীরের ভারকেন্দ্র ঠিক করিয়া লইতে হয়। এটা বেশ মনে রাখিবে।

ডোঙ্গার মত সাঁতার

ডোঙ্গার মত সাঁতার কাটিবার সময় শরীরের ভঙ্গী ডোঙ্গার মত করিতে হইবে। সাঁতার কাটিবার সময় পদদ্বয় জোড়ভাবে অগ্রসর করিয়া কেবলমাত্র অঙ্গুলিগুলি জলের উপরে বাহির করিয়া রাখিতে হইবে। ডোঙ্গার অপর প্রান্তের মত করিয়া জলের উপর মাথা তুলিয়া রাখিতে এবং সমস্ত শরীরটাকে সুন্দর ভাবে বাকাইতে হয়। পিঠটা সবচেয়ে বেশী বাঁকাইতে হইবে। নৌকায় দাঁড় টানার মত করিয়া হাত পায়ের দিকে লইয়া যাইতে হইবে। শরীরের পাশে কিছুক্ষণ করিয়া হাত লাগাইয়া রাখিতে হইবে। এই অবস্থায় আঁকাবাঁকা শরীর দেখিতে ঠিক ডোঙ্গার মত বোধ হয়।



ডোঙ্গার মত সাঁতার

দিকে বাঁকাভাবে বা পাশের দিকে ধীরে ধীরে চালনা করিয়া ভাসিতে পারা যায়।

রোগা ক্ষীণকায়ের মানুষ অপেক্ষা স্থূলকায় মানুষদের পক্ষে চিৎ-ভাসা অধিকতর সহজ হয়। কিন্তু নোনাজলের আপেক্ষিক গুরুত্ব (Specific-Gravity) বেশী বলিয়া সকলের পক্ষেই ভাসা সহজ। আবার সমুদ্রের জলে পায়ের উপর পা রাখিয়া এবং ঘাড়ের নীচে হাত রাখিয়া বেশ স্বচ্ছন্দেই ভাসিতে পারা যায়।

সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, জলে ভাসিতে গেলেই প্রচুর পরিমাণে শ্বাস গ্রহণ করিয়া বুক ফুলাইয়া রাখিতে হয়। একবারে নিশ্চল হইয়া ভাসা সুবিধাজনক হয় না। মধ্যে মধ্যে পা নাড়া-চাড়া করিয়া ও হাতের দ্বারা দাঁড়-টানার মত

হাত ঘুরানো চিৎ সাঁতার

ইহা প্রায়ই চিৎ-সাঁতারের মত। হাত পর পর সম্মুখ হইতে মাথার-উপর দিকে লইয়া যাইবার সময় সোজা করিয়া রাখিতে হইবে। পায়ের দিকে ঊর্দ্ধ অধঃভাবে ধাক্কা দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে।

পা-তোলা সাঁতার

এইরূপ কৌশলে সাঁতার কাটা অপেক্ষাকৃত কঠিন। এইরূপ সাঁতার কাটিবার সময় পাশের দিকে দাঁড় টানার মত করিয়া সাধারণ চিৎ-সাঁতারের মত করিতে হয়। এই প্রকার সাঁতার কাটিবার সময় একটা মাত্র পা জাহাজের মাস্তুলের মত জলের উপরে সোজা ভাবে খাড়া এবং অঙ্গুলিগুলি অগ্রমুখী করিয়া ভাসাইয়া রাখিতে হয়।

উচ্চস্থান হইতে ঝাঁপ দেওয়া

ঝাঁপান দুই প্রকারের -

(১) সাধারণ ভাবে ঝাঁপ দেওয়া।

(২) রকমারী ঝাঁপ দেওয়া।

উচ্চস্থান হইতে জলে সাধারণ ভাবে ঝাঁপাইয়া পড়িবার সময় বেশীদূর হইতে দৌড়িয়া আসিবার কোনও আবশ্যক নাই। কেবলমাত্র সামান্য একটু যেমন চার পাঁচ পা কিছু দূর হইতে দৌড়িয়া আসিলেই চলিবে।

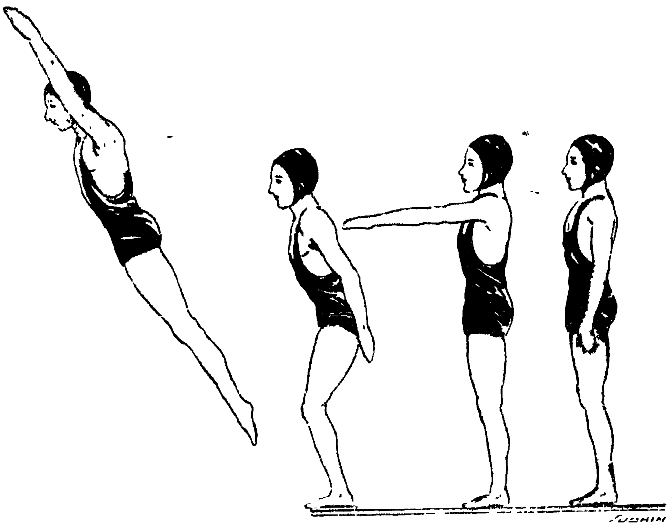
ঝাঁপ দিবার পূর্ব্বে ঠিক্ সামনের দিকে তাকাইয়া সোজা হইয়া দৌড়াইতে হইবে। খুব দৌড়িয়া আসিবার সময় কখনও সম্মুখ দিকে ঝুকিবে না লম্ফ দিয়া উপরে উঠিবার সময় পা আগে না উঠাইয়া সমস্ত শরীরটাই উপরের দিকে উঠাইতে হইবে। এই সময় পদদ্বয় একত্রিত করিয়া ও অঙ্গুলিগুলি অগ্রমুখী করিয়া রাখিতে হইবে।

রকমারী ঝাঁপ দেওয়া

এইস্থানে কয়েকটি রকমারী ঝাঁপাইবার কৌশল বিবৃত হইল—

(ক) উড়ন্ত পাখীর আকারে ঝাঁপ দেওয়া

এই প্রকারে জলে ঝাঁপাইবার সময় সম্মুখে তাকাইয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইতে হইবে।



উচ্চস্থান হইতে ঝাঁপ দেওয়া

হইতে দৌড়িয়া আসাই সম্ভবতঃ ভাল। ঝাঁপাইবার সময় বেশ জোরের সহিত ঝাঁপাইতে হয় এবং সে সময় তক্তার শেষপ্রান্তে আসিয়া হাঁটু ও পায়ের কব্জী একটু বাঁকাইতে হইবে। হাত শরীরের পাশে লম্বমান হইয়া থাকিবে। দৌড়িয়া আসিয়াই তক্তা হইতে জোরে লম্ফ দিয়া উর্দ্ধদিকে উঠিবে। উঠিবার সময় শরীর লোহার মত শক্ত করিয়া রাখিবে। স্প্রীং-বোর্ড হইতে ঝাঁপাইয়া উপরে উঠিতে হইবে। তাহার পর খাড়াভাবে জলে পড়িবে। উপরে উঠিবার সময় হাত সম্মুখ দিয়া উপরে উঠাইয়া পাশে কাঁধের সমান করিয়া ছড়াইয়া রাখিবে। তাহার পর জলের নিকটবর্ত্তী হইলে হাত শরীরের পাশে লাগাইয়া রাখিতে হইবে।

স্প্রীং-বোর্ড হইতে ঝাঁপাইবার সঙ্গে সঙ্গেই অঙ্গুলি অগ্রমুখী করিয়া রাখিতে হইবে।

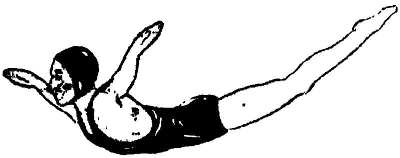
(গ) প্রজাপতি আকারে ঝাঁপ দেওয়া

পূর্ব্বের মত স্প্রীং-বোর্ড হইতে লম্ফ দিয়া হাত ও পা ছড়াইয়া ইংরাজী 'X' অক্ষরের মত করিতে হইবে। তাহার পর, জলের নিকটবর্ত্তী হইলে পা জোর করিয়া ও হাত উপরে তুলিয়া খাড়াভাবে জলে পড়িতে হইবে।

পায়ের অঙ্গুলিগুলি অগ্রমুখী হইয়া থাকিবে। জলে পড়িয়া বেশী নীচে তলাইয়া গেলে, দুই একটি ধাক্কা মারিলেই, জলের উপরে উঠিয়া আসা যায়।

শরীরকে ত্রিকোণ আকার করিয়া ঝাঁপান

এইভাবে ঝাঁপাইতে আরম্ভ করিবার সময় পেট খালি করিতে ও বুক ফুলাইতে হইবে। ঝাঁপাইবার



উড়ন্ত পাখীর আকারে ঝাঁপ দেওয়া

তক্তা হইতে ঝম্প প্রদান করিয়া উপরে উঠিবার সময় কোমর হইতে পদদ্বয় সম্মুখে ছড়াইবে, এবং হাত সম্মুখে আনিয়া পায়ের কব্জীর পাশে রাখিতে হইবে। জলের নিকটবর্ত্তী হইলে হাত পাশে ও শরীর শক্ত করিয়া খাড়াভাবে জলে পড়িবে।

ডাঙ্গায় বসার মত পদদ্বয় সম্মুখে জমির সহিত সমান্তরাল ভাবে ছড়াইতে হইবে। হাত নীচে না নামাইয়া সম্মুখে ছড়াইতে হইবে। পায়ের অঙ্গুলিগুলি অগ্রমুখী হইয়া রহিবে।

গোঁড়ালি তুলিয়া ঝাঁপান

ঝম্প দিবার তক্তা হইতে ঝাঁপাইয়া হাটু উপরে তুলিয়া বুকে ঠেকাইতে হইবে। সেই সময় দুই হাত দিয়া পা ধরিবে, জলের নিকটবর্ত্তী হইলে, হাত পাশে রাখিয়া শরীর শক্ত ও খাড়া করিয়া জলে পড়িবে। পায়ের অঙ্গুলিগুলি অগ্রমুখী, হইয়া রহিবে।

তীরের দিকে মুখ করিয়া ঝাঁপান

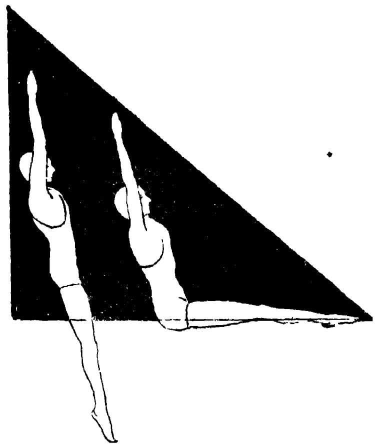
তীরের দিকে মুখ করিয়াও, পূর্ব্ব বর্ণিত সকল প্রকারের ঝাঁপান সম্ভব, ইহা অভ্যাস সাপেক্ষ।

ডুবমারা

ডুবমারিবার কৌশল সাধারণতঃ- (১) সাধারণ ভাবে ডুবমারা। (২) রকমারী ডুবমারা এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। নিম্নে এই দুই প্রকার কৌশল সম্বন্ধে আলোচনা লিপিবদ্ধ হইল।

সাধারণভাবে ডুবমারা

উচ্চস্থান হইতে ডুব মারিতে হইলে নূতন শিক্ষার্থীকে প্রথম প্রথম অপেক্ষাকৃত উচ্চস্থান হইতে



সাঁতারের বিভিন্ন ভঙ্গী

ডুবমারা অভ্যাস করিয়া ক্রমে উচ্চতা বাড়ান উচিত।

ডুব মারিবার পূর্ব্বে লম্ফ দিবার জন্য জলের উপরে তিন হইতে ত্রিশ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ একটি মঞ্চ বা 'টেক-অফ-প্লাটফরম্' করিতে হইবে। সুবিধার জন্য জলের দিকে মুখ করিয়া নানা রকম

উচ্চতায় অনেকগুলি মঞ্চ বা প্লাটফরম্ সাজাইয়া রাখিতে হয়।

ডুবমারা অভ্যাস করিবার জন্য স্থানে স্থানে ১০ ফুট গভীর জল থাকা আবশ্যক। ডুবমারিবার কৌশলকে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে :—

(ক) শরীর সোজা রাখিয়া ডুবমারা

(খ) মাথা নীচের দিকে করিয়া ডুবমারা

(গ) ডিগবাজী দিয়া ডুবমারা

ইহা ছাড়া, দৌড়িয়া আসিয়া এবং দৌড়িয়া না আসিয়া বা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া জোড়াপায়ে ডুবমারা।

(ক) শরীর সোজা রাখিয়া ডুবমারা দৌড়িয়া না আসিয়া শরীর সোজা করিয়া ডুবমারিতে হইলে, মঞ্চ বা স্প্রিং-বোর্ডের শেষ প্রান্তে পা জোড় করিয়া দাঁড়াইবে। হাত গায়ের সঙ্গে পাশে লাগিয়া থাকিবে। কিংবা বুকের সমান ভাঁজ করা থাকিবে। লাফাইবার সময় হাটু একটু বাঁকাইয়া ঝাঁপাইতে হইবে। তাহার পর শরীর সোজা রাখিয়া জলে ডুব দিতে হইবে। জলের দিকে পিঠ করিয়াও ডুব মারা যায়।

দৌড়িয়া আসিয়া ডুব মারিবার সময়, মঞ্চ হইতে লাফাইয়া পূর্ব্বের মত জলে ডুবিবে। জলে ডুবিবার সময় মুখ ও দৃষ্টি সর্ব্বদা সোজাভাবে রহিবে। ইহা সর্ব্বদাই স্মরণ রাখা আবশ্যক।

মাথা নীচের দিকে করিয়া ডুবমারা

মঞ্চ বা স্প্রিং-বোর্ডের শেষ প্রান্তে জোড়পায়ে দাঁড়াইয়া সম্মুখে আসিয়া শরীর সম্মুখে একটু বাঁকাইতে হয়। তাহার পর ঝাঁপাইয়া হাত কানের পাশে লাগাইয়া মাথা নীচের দিকে করিয়া লাফাইয়া পড়িতে হয়।

এইরূপ উল্টা দিকে মুখ করিয়াও ডুবমারা যায়। ডুবমারিবার ঐ সমস্ত কৌশল আবার দৌড়িয়া আসিয়াও করা যায়।

ডিগবাজী দিয়া ডুবমারা

মঞ্চের শেষ প্রান্তে জোড়পায়ে দাঁড়াইয়া ঝাঁপাইয়া উপর দিকে উঠিবার সময়, হাটু বুকে ঠেকাইবার মত করিতে হইবে। তাহার পর সম্মুখের দিকে ডিগ্‌বাজী মারিবার সময় হাত পাশে রাখিয়া সোজা হইয়া সম্মুখ দিকে দৃষ্টি রাখিয়া জলে পড়িবে।

পিছন দিকে ডিগবাজী খাইয়া জলের নিকটে সোজা হইয়া ডুব দেওয়া যায়। আবার দৌড়িয়া আসিয়া সম্মুখ দিকে ডিগবাজী খাইয়া জলের নিকট সোজা হইয়া ডুব দেওয়াও সম্ভব।

রকমারী ডুবমারা প্রণালী :

প্রতিযোগিতাকালে রকমারী ডুবমারার কৌশল ব্যবহৃত হয়। এই কৌশলে ডুব মারিবার জন্য সাধারণতঃ দুই প্রকার মঞ্চ ব্যবহৃত হয়।

(ক) ঈষৎ নমনীয় মঞ্চ (Spring Board)

(খ) দৃঢ় বা স্থির মঞ্চ (Firm Board)

এই উভয়বিধ মঞ্চ হইতে ডুবমারিবার কৌশলগুলি আবার পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।



চিৎ সাঁতার দিয়া মানুষের উদ্ধার

(ক) ঈষৎ নমনীয় মঞ্চ হইতে ডুবমারা—

১। সম্মুখ দিকে অগ্রসর হইবার ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া অগ্রগমন।

২। পশ্চাৎ দিকে অগ্রসর হইবার ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া পশ্চাৎগমন।

৩। সম্মুখ দিকে অগ্রসর হইবার ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া পশ্চাৎগমন।

৪। পশ্চাৎ দিকে অগ্রসর হইবার ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া অগ্রগমন।

৫। পাক দিয়া ডুবমারা।

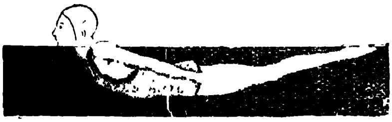
ডুব মারিবার প্রারম্ভে তীরের দিকে মুখ করিয়া এবং ডুব মারিবার সময় সম্মুখ দিকে মুখ করিয়া ডুব মারিতে হয়।

পাক দিয়া ডুবমারা

ডিগ্‌বাজী দিয়াই শরীরকে দীর্ঘ ও বিলম্বিত করিয়া ঘুরাইতে হইবে। সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া পায়ের আঙ্গুল ঘুরাইলে যেমন পাক খায় (Screw movement হয়) ডুব মারিবার সময় ঠিক এইরূপ ভাবে ঘুরপাক দিয়া ডুব মারিতে হইবে।

ময়ূর-পক্ষীর-আকারে নিম্নমুখে হাতে ভর দিয়া পিছন দিকে ডুবমারা

এই কৌশল দেখাইবার সময়, প্রথমে নমনীয় মঞ্চ হাতের উপর ভর কেন্দ্র ঠিক করিয়া লইতে হয়। তাহার পর ডুব দিবার সময় উপর দিকে



পিছন দিকে, হাত রাখিয়া সাতার

এবং বাহিরের দিকে ধাক্কা দিয়া সঙ্গে সঙ্গেই হাত ছাড়িয়া দিয়া ডুব মারিতে হয়।

(খ) স্থির মঞ্চ হইতে ডুবমারা

১। সম্মুখ দিকে অগ্রসর হইবার ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া অগ্রগমন।

২। পশ্চাৎদিকে অগ্রসর হইবার ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া পশ্চাৎ গমন।

৩। সম্মুখ দিকে অগ্রসর হইবার ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া পশ্চাৎগমন।

৪। পশ্চাৎদিকে অগ্রসর হইবার ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া অগ্রগমন।

৫। নিম্নমুখে হাতে ভর দিয়া ময়ূরপক্ষী আকারে দাঁড়াইয়া পিছনে ডুবমারা।

এই উভয়বিধ প্রণালীতে ডুব মারিবার জন্য একই রকম কৌশল অবলম্বিত হয়। এই নিমিত্ত, এইখানে একত্র এই কয় প্রকার কৌশল বিবৃত করা হইল।

সম্মুখদিকে অগ্রসর হইবার ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া অগ্রগমন

এই কৌশলে জলের দিকে মুখ করিয়া ও মাথা নীচের দিকে করিয়া ডুব মারিতে হয়। এইভাবে ডুব মারা দৌড়িয়া আসিয়া ও স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াও করা যায়।

পশ্চাৎদিকে অগ্রসর হইবার ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া পশ্চাৎগমন

এই কৌশলে তীরের দিকে মুখ করিয়া ডুব মারিতে হয়। লাফ দিবার সঙ্গে সঙ্গে হাত উপর দিকে তুলিয়া ডুব মারিতে হয়। লাফাইবার সময় মঞ্চ হইতে গোড়ালী বাহিরে থাকিবে।

সম্মুখদিকে অগ্রসর হইবার ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া পশ্চাৎগমন

এই কৌশল ঠিক সাধারণ দ্বিতীয় প্রণালীতে ডুব দেওয়ার ভঙ্গীতে মঞ্চে দাঁড়াইতে হয়। কিন্তু ডুব



পিছনে হাত রাখিয়া সাঁতারের অনুরূপ ভঙ্গী

মারিবার সঙ্গে সঙ্গেই উল্টা ডিগ্‌বাজী মারিয়া ডুব দিতে হয়।

রকমারী ডুবমারা-প্রকার
উড়ন্ত পাখীর আকারে ডুবমারা

এই রকম ডুব দিবার সময় নমনীয় মঞ্চ হইতে লাফাইয়াও হাত পাশের দিকে ছড়াইয়া কাঁধের নিকট সমকোণ করিতে হইবে।

আবার ঝম্প দিবার সময় দৌড়িয়া আসিয়াও লাফাইয়া ডুব দেওয়া যায়। ঝাঁপাইবার সময় তীরের দিকে মুখ করিয়াও এইরূপ ভাবে ডুবমারা সম্ভব।

শরীরকে ত্রিকোণ আকার করিয়া ডুবমারা জলের দিকে মুখ করিয়া

মঞ্চ হইতে লাফাইয়া উপরে উঠিবার সময় কোমর হইতে শরীরের উর্দ্ধাংশ সম্মুখদিকে একেবারে

বাঁকাইয়া দিতে হইবে। এবং হাত দিয়া পায়ের কব্জী ছুঁইতে হইবে। এই সময় কিন্তু হাঁটু বাঁকাইতে হয় না। মাথা সম্ভবতঃ উপর দিকে তুলিয়া রাখিতে হইবে। হাত ও শরীর সোজা করিয়া এবং মাথা নীচের দিকে করিয়া পূর্ব্বের মত ডুব মারিতে হইবে। আবার লাফাইবার সময় তীরের দিকে মুখ করিয়াও ডুবমারা যায়।

শরীরকে ত্রিকোণ আকার করিয়া ডুবমারা তীরের দিকে মুখ করিয়া

আরম্ভ করিবার সময় নমনীয় মঞ্চের শেষপ্রান্তে তীরের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইতে হইবে। লাফ দিয়া উপরে উঠিবার সময় শরীরের আকার ত্রিকোণ আকার মত করিতে হইবে। জলের নিকটবর্ত্তী হইলে, পূর্ব্বের মত হাত মাথার উপর সোজা করিয়া জলে ডুবিতে হয়।

কোনরূপ অঙ্গচালনা না করিয়া সোজাসুজি ডুবমারা জলের দিকে মুখ করিয়া

হাত মাথার উপর তুলিয়া শরীর শক্ত ও সোজা করিয়া দাঁড়াইতে হইবে। তাহার পর ঝাঁকনা না দিয়া সম্মুখের দিকে হেলিয়া সাধারণ ভাবে ডুব মারিতে হয়।

কোনরূপ অঙ্গচালনা না করিয়া সোজাসুজি ডুবমারা তীরের দিকে মুখ করিয়া

ইহা ঠিক পূর্ব্বের মতই কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবে করিতে হয়।

তীরের দিকে মুখ করিয়া ডুবমারা

এইভাবে ডুব মারিবার সময় নমনীয় মঞ্চের শেষ প্রান্তে তীরের দিকে মুখ করিয়া আরম্ভ করিতে হয়। লাফ দিয়া উপর দিকে উঠিবার সময় হাত পশ্চাৎ দিকে ও উপর দিকে সোজা করিয়া তুলিতে হইবে। এবং জলের নিকটবর্ত্তী হইবার সময় হাত মাথার উপর দিকে তুলিয়া সাধারণ ভাবে ডুব মারিতে হয়।

তীরের দিকে প্রথমে পিঠ ও পরে মুখ করিয়া ডুবমারা

ইহা আরম্ভ করিবার সময় তীরের দিকে মুখ করিয়া ডুবমারার মত কৌশলে মঞ্চের শেষ প্রান্তে দাঁড়াইতে হইবে। ঝাঁপাইবার সময় পিছন দিকে টান দিতে হইবে এবং পা উপর দিকে এবং মুখ জলের দিকে রাখিয়া ডুব দিতে হইবে। ডুব মারিবার সময় পিঠ তীরের দিকে থাকিবে।

ময়ূর চলার মত হাতের উপর ভর দিয়া ডুবমারা

নমনীয় তক্তার শেষ প্রান্তে হাত দিয়া শরীরের ভার কেন্দ্র ঠিক করিতে হইবে। ভার কেন্দ্র ঠিক মত হইলে, শরীর খাড়া করিয়া উপর দিকে দিয়া উঠিতে হইবে। উঠিবার সময় হাত সোজা করিয়া এবং পায়ের অঙ্গুলি অগ্রমুখী করিয়া রাখিতে হইবে। তাহার পর সাধারণ মত ডুব মারিতে হইবে।

হাঁটু ধরিয়া ও ডিগবাজী খাইয়া ডুবমারা

নমনীয় মঞ্চ হইতে ঝাঁপ দিয়া উপরে উঠিবার সময় হাঁটু ভাঙ্গিয়া বুকে ঠেকাইতে হইবে এবং হাঁটুর নীচে হাত দিয়া ধরিতে হইবে। তাহার পর নীচের দিকে নামিবার সঙ্গে সঙ্গে হাত কানের পাশে সোজা রাখিয়া ও মাথা নীচের দিকে করিয়া ডুব দিতে হইবে।

প্রজাপতি আকারে ডুবমারা

নমনীয় মঞ্চ হইতে মাথা নীচের দিকে করিয়া ঝাঁপাইবার সময় হাত ও পা ছড়াইয়া শরীরকে ঠিক ইংরেজী X অক্ষরের মত করিতে হইবে। তাহার পর জলের অনতিপূর্ব্বে হাত ও পা জোড় করিয়া পূর্ব্বের মত ডুব মারিতে হইবে।

উল্টা ডিগবাজী দিয়া ডুবমারা

নমনীয় মঞ্চ বা তক্তা হইতে ঝাঁপ দিবার সময় তীরের দিকে মুখ করিয়া সম্ভবমত পিছন দিকে হেলান দিয়া দাঁড়াইতে হইবে। ঝাঁপ দিবারসময় হাত ও পা উপর দিকে ঝাঁকনা দিয়া ডিগবাজী খাইতে হইবে এবং জলে ডুবিবার সময়, পা আগে জলে ডুবিবে। এই সময়ে হাত মাথার উপর সোজা হইয়া থাকিবে।



সাঁওতাল জাতি

২৭০২ পৃষ্ঠার পর

সে অনেক দিন আগে বাঙ্গালা দেশের অনেক জেলাই অতিশয় জঙ্গলময় দুর্গম প্রদেশ বলিয়া পরিচিত ছিল। সেই সব জঙ্গল পরিষ্কার ও জঙ্গলের হিংস্র জন্তুদের তাড়াইয়া সাঁওতালেরা নানা স্থানে বাস করিতে আরম্ভ করে। ইহাদের বাসের জন্যই বিস্তৃত এক ভূখণ্ডের নাম **সাঁওতাল পরগণা** হইয়াছে। সাঁওতাল পরগণার পরিমাণফল ৪৮০০ বর্গ মাইল। কলিকাতা হইতে ইহার দূরত্ব ১১০ মাইল মাত্র। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে সাঁওতাল বিদ্রোহের পর হইতে ইহাদের শাসন সংরক্ষণ সম্বন্ধে বিশেষ সুব্যবস্থা হইয়াছে। সাঁওতাল পরগণা বলিলেই বুঝায় যে যেস্থানে সাঁওতালদের বাস। অনেকের মতে ইহাদের আদি নিবাস পালামৌ ও রামগড়। এখন বাঙ্গালাদেশের অনেক স্থানেই সাঁওতালদের বাস। তাহাদের মধ্যে বীরভূম ও উত্তর বঙ্গের মালদহ প্রধান।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে বীরভূম জেলায় ৬৯২৪ জন সাঁওতালের বাস ছিল, এক্ষণে সে স্থলে ইহাদের সংখ্যা পঞ্চাশ হাজারের ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে। মালদহে প্রায় বাহাত্তর হাজার।

সাঁওতাল জাতি দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ। ইহারা পাহাড় এবং নদীর পাড়ের নির্জন স্থানে বাস করিতে বড়ই ভালবাসে। ইহাদের স্ত্রী পুরুষ (মেঝিয়ান ও মাঝি) উভয়েই খাটিয়া জীবিকার সংস্থান করিয়া থাকে। সাঁওতালেরা ধনুর্বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী। সাধারণ লোকের ন্যায় বন্য জন্তুকে ভয় করে না। অনেক সাঁওতাল আজকাল 'ভাল চাষী' বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছে। সাঁওতাল ছেলেরা সামান্য সামান্য লেখাপড়া শিখিতেছে। সাঁওতাল বালকেরা স্থানীয় স্কুলে লেখাপড়া করিতেও আরম্ভ করিয়াছে। খৃষ্টান মিশনারীরা সাঁওতালদের শিক্ষার উন্নতির জন্য যেমন মনোযোগ, তেমনি তাহাদিগকে আবার খৃষ্টানও করিতেছেন। দিন দিনই সাঁওতালদের মধ্যে খৃষ্টানের সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে।

ছেলেবেলা হইতেই সাঁওতাল বালকেরা সাহসী হইতে শিক্ষা পায় বলিয়া তাহারা কোন হিংস্র জন্তুর ভয়ে ভীত হয় না। ইহারা প্রকৃতির যে মনোরম স্থানে বাস করে তাহা নিকাইয়া পরিষ্কার করিয়া রাখে কোন স্থল আবর্জনাপূর্ণ করিয়া রাখে না। গৃহের দেওয়াল, দাবি, উঠান প্রভৃতি এমন তক্ তক্ করে যে সহসা সেগুলি দেখিলে শান বলিয়া ভ্রম হয়। অনেকের গৃহের দেয়ালগুলি আবার লাল, কাল, সাদা রঙে চিত্র বিচিত্র থাকে। খড়

পোড়াইয়া কাল এবং লাল সাদা মাটি দিয়া লাল সাদা রঙ করে। জল বেশ শীতল এবং ভাল হয় বলিয়া ইহারা পানীয় জলের কলসী উঠানের একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখে। ইহাদের অনেকেরই ঘরে গরু, বাছুর, মহিষ, মুরগী ও শূকর এবং বসিবার জন্য খাটিয়া ও মাচুলি দেখিতে পাওয়া যায়। কাঁথা, খাটিয়া এবং তালাই ইহারা শুইবার জন্য ব্যবহার করে। ইহারা বালিস একরূপ ব্যবহারই করে না।

সাঁওতালদের স্বাস্থ্য অতিশয় সুন্দর। গঠন ও আকৃতির পারিপাট্যে বলিষ্ঠতার লক্ষণ দেখা যায়।

তবে ছিদ্র মধ্যে কেবল ছোট কাঠ গুঁজিয়া রাখিতে দেখা যায়। মেয়েরা অনেকেই কাঁসার মল এবং হাতে ও বুকে উল্কী পরিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত ইহাদিগকে লাল, নীল, সাদা প্রভৃতি রঙের নানা জাতীয় কাচের মালাও পরিতে দেখা যায়। মেয়েরা চুল পরিষ্কার ভাবে আঁচড়াইয়া আলগা করিয়া গোল পাকাইয়া বাঁধিয়া রাখে এবং তাহাতে বন-ফুল গুঁজিয়া তাহার শোভা বৃদ্ধি করে। মেয়েরা মাথায় ফুল রাখিতে বড়ই ভালবাসে। অনেক সধবা মেয়ের হাত খালি দেখা যায়, তবে সাধারণতঃ



সাঁওতাল পুরুষ ও মেয়েদের নৃত্য

কি স্ত্রী কি পুরুষ ইহাদের প্রত্যেকের অঙ্গ সৌষ্ঠব দর্শকের মন মুগ্ধ করে। সাঁওতাল জাতির মনে কুটিলতা নাই। ইহারা সরল সত্যবাদী ও কষ্ট-সহিষ্ণু। অতিশয় নিরীহ ও অমায়িক প্রকৃতির লোক—হইলেও ইহাদের ক্রোধ রিপুটি বড় কম নহে। ক্রুদ্ধ হইলে কাহারও রক্ষা নাই—তখন ইহারা কোন কথা শুনে না, কাহারও কোন বাধা মানে না। তবে সহজে ইহারা কখনও কাহারও অনিষ্ট করিতে চাহে না।

মেয়েদের হাতে রাঙের, লোহার ও শাঁখের এবং কোন কোন পুরুষদের হাতে ও কানে রাঙের নীরেট বালা পরিতে দেখা যায়। মেয়েদের কানে ছিদ্র রহিলেও তাহাতে কোন গহনা দেখা যায় না,

বিধবারাই শুধু হাতে থাকে। পুরুষদের ভিতর কাহাকেও কাহাকেও মেয়েদের মত লম্বা চুল রাখিতে দেখা যায়। পুরুষদের মধ্যে অনেকেই আবার টিকিও রাখে। ইহাদের মেয়ে ও পুরুষদের মাথার পাশে চুলে কাঠের চিরুণী আটকান থাকে।

মেয়েরা সচরাচর মাথায় কাপড় দেয় না। ইহাদের মেয়েরা সাধারণতঃ দুইটি মোটা কাপড় ব্যবহার করিয়া থাকে। একটি পরে অপরটি গায়ে জড়াইয়া লজ্জা নিবারণ করে। পরিধেয় বস্ত্রটি হাঁটুর অল্প নীচেই থাকে। পুরুষ ও বালকদের অনেকেই নেংটি পরিয়া চলাফেরা করে।

ইহারা মাছ, ভাত, শাক শূকর, মুরগী, হাড়িয়া (গৃহ-প্রস্তুত মদ) কাঠবেড়ালী, ইন্দুর, গোসাপ,

পাখী, জোনার প্রভৃতি খাইয়া থাকে। তবে শূকর, মুরগী, মহুয়া, লালপিপড়াভাজা, কেন্দ, পিয়াল, ও ভেলা ইহাদের অতি প্রিয় খাদ্য।

সন্ধ্যার সময় ইহারা একবার মাত্র রান্না করিয়া মাড়ভাত খায় এবং কতকভাত পরদিনের জন্য জলে ভিজাইয়া রাখিয়া দেয়। এই ভিজাভাতও পরদিন বেলা দশটা এগারটার সময় লবণ ও কিছু শাকসহ খাইয়া থাকে।

ইহাদের **কিস্কু, মুর্মু, হেমরোম, হাঁসদা, মাডি, সোরেন, টুডু, বেসরা, চোঁড়ে, বাস্কে, পাওরিয়াও, সোয়ালে**, বা **সোঁড়ে** এই বারটি গোত্র বা উপাধি আছে। এইগুলির আবার প্রত্যেকের বারটি করিয়া শাখা আছে। সুতরাং ইহাদের একশত চুয়াল্লিশটি উপাধি বা গোত্রের কথা শুনা যায়। ইহাদের ভিতর স্বগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ তবে রাক্ষস বিবাহে তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। অসবর্ণ বিবাহ ইহাদের ভিতর নাই।

সাঁওতালদের ভিতর প্রাজাপত্য, গান্ধর্ব্ব, ও রাক্ষস এই তিন প্রকারের বিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে। ইহাদের মধ্যে বাল্য বিবাহের প্রথা দেখা যায় না। বরের বয়স সাধারণতঃ ১৯।২০ এবং ক'নের বয়স ১৫।১৬ বৎসর না হইলে ইহাদের বিবাহ হয় না। সাঁওতালগণের মধ্যে যাহাদের অবস্থা ভাল তাহাদের ভিতর প্রাজাপত্য বিবাহ প্রথা আছে। সাধারণতঃ গান্ধর্ব্ব বিবাহ হইতে দেখা যায়। বীরভূমের অনেক গ্রামে হাটের ব্যবস্থা আছে সেখানে অনেক সাঁওতাল নারী ও পুরুষ আসিয়া থাকে। মেয়েদের সঙ্গে যে সাঁওতাল থাকে তাহাকে 'যোগমাঝি' বলে। ক'নে হাটে আসিয়া যদি কোন সাঁওতাল যুবককে ভালবসিয়া ফেলে তবে সে তাহার মনের কথা যোগমাঝিকে জানায়। সে আবার বরকে ঐ কথা জ্ঞাপন করে। উভয়ে উভয়কে ভালবাসিলে এ বিষয় তাহাদের অভিভাবককে জানান হয়। তাহারা তাহার পর সমস্ত কথা বার্ত্তা ও দিন স্থির করে। সমস্ত স্থির হইয়া গেলে বরপক্ষ কন্যাপক্ষকে কতকগুলি মুড়ী উপহার দেয়। বিবাহ সাধারণতঃ দিনেই হয়। বিবাহে বরপক্ষ কন্যাপক্ষকে ৬৲ টাকা হইতে ২০।২২৲ টাকা দেয়। যতদিন পর বিবাহ হইবে একটি সূতাকে ঠিক ততটি গিরা দেওয়া হয়। প্রত্যেক দিন একটি করিয়া গিরা খুলিয়া লয় এবং ক্রমে বিবাহের সঠিক দিন আসিয়া পড়ে। তখন বর হরিদ্রাবর্ণ কাপড় পরিয়া সদলবলে মাদল, নাগরা প্রভৃতি বাদ্য ও মদ একটি ঝুড়িতে কিছু কাপড়, সিন্দুর, এবং গহনা সহ কন্যার বাড়ী গমন করে। বরের সঙ্গে কখন কখন তাহার মা, মাসী প্রভৃতি স্ত্রীলোকেরা বরযাত্রী যায়। কন্যাপক্ষরা তাহাদিগকে অতিশয় আদর অভ্যর্থনা করে। বর ভাবী শ্যালকের স্কন্ধে চড়িয়া বরযাত্রীসহ বিবাহ আসরে আসিলে বরপক্ষরা কন্যার চোখে কাজল ও মাথায় সিন্দুর দিবার জন্য বলে। বর ঝুড়িতে করিয়া যে কাপড় আনে সেই কাপড় কন্যাকে পরিতে দেওয়া হয়। কন্যা কাপড় পরিয়া ঐ ঝুড়ির ভিতর বসে। ইহার পর, কন্যাপক্ষ তাহাকে ধরাধরি করিয়া বরের চারিদিকে ঘুরাইয়া তাহার সম্মুখে বসাইয়া দেয়। পরে বর কন্যার সিঁথিতে সিঁদুর দিয়া থাকে। বিবাহের সময় মাদল বাজে ও গীত হয়। বিবাহ শেষে বরযাত্রিগণ ভাত, হাড়িয়া ও শূকরমাংস পরিতৃপ্তি সহকারে ভোজন করে। ভোজে কিছু মহুয়া দিলে তাহার উপর আর কথা নাই। সে ভোজ পাকা ভোজ নামে কথিত হয়।

ভোজের পর বর ক'নের বিদায়ের পালা আরম্ভ হয়। এই সময় কন্যার মা, বাপ, ভাই, ভগিনী আত্মীয় স্বজন কন্যাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কাঁদিতে কাঁদিতে নীচের লিখিত বিদায় গান গাহিয়া থাকে—

'গাতে গাতে লাং তাহে কানা,
অভিগাতে লাং তাহে কানা,
মেৎ এেপেলহ আরসি মেনাঃ,
আলাং এেপেলহ বানুআ,

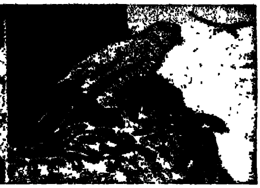
অর্থাৎ আমরা বহুদিন একস্থানে ছিলাম। আমরা তোমাকে ঠিক নিজের প্রাণের মত ভালবাসিতাম। আমাদের মুখ দেখিবার জন্য আরসি আছে; কিন্তু হায়! তোমাকে দেখিবার আর আশা নাই।

ইহার পর, বর শ্বশুর পক্ষকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিয়া বিবাহিতা স্ত্রীর সহিত পুনরায় শ্বশুরবাড়ী আসে এবং তাহাকে রাখিয়া ফিরিয়া যায় ও ইহার প্রায় এক বৎসর পর তাহাকে লইয়া নিজের বাড়ী যায়। এইভাবে গান্ধর্ব্ব বিবাহ সুসম্পন্ন হয়।

প্রাণীরা কি বলে।


হাঁসের প্যাঁক প্যাঁক শব্দ


খেক্‌শেয়ালীর হুক্কা হুয়া


বাজপাখীর কর্কশ স্বর


কাকাতুয়ার কথা বলা


ষাঁড়ের গর্জ্জন


গোবরে পোকার ভন্‌ভনানি

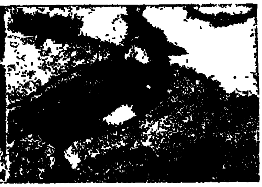

। ছানার কোঁ কোঁ


নাইটিঙ্গেল পাখীর গান


উইচিংড়ের হঁ হঁ


হরিণের চোখের কথা


গিনিপিগের কিচমিচ


কালা ঝুঁটিওয়ালা তিতির পাখীর চিম্‌চিম্


অজানা গায়ক পাখী


ক্যানারী পাখীর মিষ্টি গান


সারস পাখীর পথ চলা

রাক্ষস বিবাহ এই যে, হাটিয়ায়—যদি কোন যুবক সাঁওতাল কোন যুবতীকে ভালবাসে অথচ যুবতী তাহাকে বিবাহ করিতে চাহে না, তখন সাঁওতাল-যুবক কিছু সিন্দুর লইয়া যুবতীর কপাল ও সিঁথিতে দিবার চেষ্টা করে এবং একটু ফাঁক বা সুবিধা পাইলেই সে ঐ যুবতীর কপালও সিঁথিতে সিন্দুর দিয়া চলিয়া যায়। সিন্দুর দেওয়া হইলে যুবতী আর কাহাকেও বিবাহ করিতে পারিবে না বলিয়া এ ব্যাপার তাহার অভিভাবকের কর্ণগোচর হয়। অভিভাবক পরবর্তী হাটে একটি ভগ্ন শাখা হস্তে আসে। ভগ্ন শাখা দেখিলেই হাটের সাঁওতালরা তাহার এইরূপ বিপদের কথা বুঝিতে পারে এবং তাহাকে নানারূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া তাহারা পঞ্চাইত দ্বারা তাহার বিচার বসাইবার ব্যবস্থা করে। পঞ্চাইতের আদেশ মতে যুবককে সভায় হাজির করা হয় এবং যথারীতি বিচার হইয়া দোষী ব্যক্তির জরিমানা হয়। পঞ্চাইতের আদেশ মত যুবক জরিমানা ও নির্দ্ধারিত পণ দিলে কন্যাপক্ষ বরপক্ষকে কন্যা সম্প্রদান করে। যুবক আদেশ অমান্য করিলে তাহারা তাহাকে সমাজচ্যুত করে।

সাঁওতাল জাতির ভিতর স্বাধীনতা লক্ষিত হয়। স্ত্রী-পুরুষ, যুবক-যুবতী অনেক ক্ষেত্রে এক-সময়ে সকলে মিলিয়া খাওয়া-দাওয়া এবং চলাফেরা করে।

অনেক সময় ধারে বিবাহ হইলেও পরে কন্যা-পক্ষকে দেয় পণ দিতে হয়। কিন্তু বর তাহা দিতে না পারিলে অনেক সময় মেয়ে বরকে ছাড়িয়া বাপের বাড়ী ফিরিয়া আসে এবং অন্য স্থানে বিবাহ করে।

কোন ঘরে ছেলে হইলে ইহারা সেই ঘরকে 'নোতাঘর' বা 'কামানঘর' বলে। পুত্র জন্মিলে পাঁচদিনে এবং কন্যা জন্মিলে তিন দিন প্রসূতিকে সুতিকা-গৃহে অবস্থান করিতে হয়। পরে শিশুর মস্তক মুণ্ডন পূর্ব্বক প্রসূতি ও শিশু তেল হলুদ মাখিয়া স্নান করিয়া শুদ্ধী হইলে অপরে তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে। পুত্র হইলে পিতার এবং কন্যা হইলে মাতার নামেই শিশু সন্তানের নাম রাখা হয়। পিতা না থাকিলে গ্রামের সকলে মিলিয়া শিশুর নাম রাখে। অনেক ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠ পুত্রের পিতামহের, জ্যেষ্ঠকন্যার পিতামহীর, দ্বিতীয় পুত্রের মাতামহের এবং দ্বিতীয়া কন্যার মাতামহীর নামে নামকরণ হয়। অপরাপর সন্তানগণকে নিজ আত্মীয়গণের নামে অভিহিত করা হয়।

সাঁওতাল স্ত্রী তাহার স্বামীকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসে। অন্যান্য পুরুষকে ইহারা পিতৃতুল্য জ্ঞান করে। স্ত্রী সহজে তাহার স্বামীকে ছাড়িতে চাহে না। তাহাদের এরূপ প্রগাঢ় ভালবাসা রহিলেও সাঁওতাল জাতির বিবাহ বিচ্ছেদ আছে। যদি পুরুষ তাহার স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে চায় তবে তাহাকে কুড়ি টাকা, আর যদি স্ত্রী তাহার স্বামীকে ছাড়িতে চায়, তবে তাহাকে পণের সমস্ত টাকা স্বামীকে ফিরাইয়া দিতে হয়। কিন্তু উভয় পক্ষের টাকার স্বচ্ছল না থাকায় সাধারণতঃ ইচ্ছা সত্ত্বেও বিবাহ বিচ্ছেদ হইতে পারে না।

সাঁওতালদের স্ত্রী-পুরুষ বালক-বালিকা সকলেই মদ খায়। শুখান চুণ ও তামাক হাতে চটকাইয়া ইহাদের অনেকেই মুখের ভিতর রাখে। ইহারা শুষ্ক তামাকের পাতা শালপাতায় গুটাইয়া চুটি প্রস্তুত করিয়া খায়। অন্য জাতির উচ্ছিষ্ট ইহারা স্পর্শ করে না। এমন কি ইহাদিগকে কোন ভদ্রলোকের বাড়ীতে উচ্ছিষ্ট বাসন মাজিতে দেখা যায় না। ইহারা খুবই একগুঁয়ে জাতি। যা মনে করে তাই করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে। মেয়েরা গুরুজনকে পথে দেখিলেই তাহার সম্মুখে অঞ্জলি পাতিয়া দাঁড়াইয়া তিনবার মাথা নীচু করে।

সূর্য্য সাঁওতাল জাতির একমাত্র উপাস্য দেবতা হইলেও ইহারা অন্যান্য দেবতার পূজা করে। হিন্দুর দেব দেবীর পূজা পার্ব্বণে ইহারা সানন্দে যোগদান পূর্ব্বক নৃত্যগীত করিয়া থাকে। সাঁওতালগণ পৌষ মাসে সোহরাই বা বান্ধনা, ফাল্গুন মাসে সাল-সেই বা বনদেবতা এবং বোঙ্গাবুঙ্গি বা বোঙাবুঙি বা ভূতপেত্নীর পূজা করে। সোহরাই পূজায় কুমারী শূকরকে পরিষ্কার গোয়ালঘরে বাঁধিয়া ভাল-রূপে খাওয়ায়। পরে, তাহাকে বাহিরের উঠানে লইয়া গিয়া শাণিত কুঠার দিয়া বলি দেয় এবং সকল মিলিয়া উহার মাংস খায় ও হাড়িয়া পান করিয়া তৃপ্তি সহকারে ভোজন করে।

ফাল্গুন মাস হইতে ইহারা বৎসর গণনা করে। এবং ২০ সংখ্যার বেশী ইহারা গণিতে পারে না। ইহারা বৈশাখে হোম, জ্যৈষ্ঠে এরোবা সর্দ্দার, আষাঢ়ে হারিয়াও বা ইন্দ্র, ভাদ্রে ছাতা, আশ্বিনে দিবি বা দুর্গা, অগ্রহায়ণে নওবাই বা নবান্ন, পৌষে সহোরাই বা বান্দনা পূজা করিয়া থাকে।

সাঁওতালগণ ভূতকে খুবই বিশ্বাস করে এবং মানে; কিন্তু ভূতের ভয়ে ইহারা কখন কোনদিনে ভীত হয় না। গ্রামে কোন মড়ক উপস্থিত হইলে বা হঠাৎ কোন লোকের মৃত্যু হইলে তাহারা মনে করে যে কোন ডাইনীর দ্বারা এরূপ বিপদ ঘটিয়াছে। এইজন্য তাহারা তাহাদের ভিতর কোন স্ত্রীলোককে ডাইনী ঠিক করিয়া তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলে। পিতামাতা যদি ডাইনী হয় তাহা হইলেও ইহাদের নিকট তাহাদের নিস্তার নাই।

১৯৩১ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারির (Census-Report) বিবরণী হইতে জানা যায় যে ১৯২২ খৃষ্টাব্দে ইহাদের সংখ্যা ছিল ৭১২,০৪০ এবং ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে গড় পরতা শতকরা ১১·৯ হিসাবে বৃদ্ধি পাইয়া উহার সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৭৯৬,৬৪৬। ওরাও (Oraons)দের মতে সাঁওতালরা অনেকে আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়াছে। সাঁওতালদের সংখ্যা এজন্য অনেকটা হ্রাস পাইয়াছে। আবার খৃষ্টান মিশনারীদের দ্বারা অনেক সাঁওতাল খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়াও তাহাদের সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছ। এবং ক্রমে আরও হ্রাস পাইবে। মালদা (Malda) জেলায় প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্ব হইতে সাঁওতালেরা চাষবাস করিবার জন্য আসিতে থাকে। এখন আর তেমন আসে না।

সাঁওতালদের সম্বন্ধে আরও দুই একটি কথা তোমাদের জানা আবশ্যক। কবে কতকাল হইতে সাঁওতালেরা এ দেশে আসিয়া বাস করিতেছে তাহা জানা যায় না। আর্য্যগণ যতদিন ভারতে বাস করিতেছেন, সম্ভবতঃ সাঁওতালেরা তাহারও অনেক পূর্ব্ব হইতে এদেশের অধিবাসী। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে সাঁওতালেরা উত্তর পূর্ব্ব দিক্ দিয়া ভারতে আসিয়াছিল। ইহারা মুণ্ডা জাতির (Munda Tribe) অন্তর্ভুক্ত। সাঁওতালদের এই যে সাঁওতাল নাম, এই নামটিই বা কোথা হইতে আসিল? কে ইহাদিগকে সাঁওতাল নাম দিল সে ইতিহাস জানাও কিন্তু বড় সহজ নহে। আর কোথায় বা তাহাদের আদি নিবাস ছিল তাহাও আমরা জানি না। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, তাহারা বলিবে তাহাদের আদি নিবাস ছিল অতি পূর্ব্ব দেশে। সে পূর্ব্ব দেশ কোথায়, সুর্য্যিমামার দেশেরও অনেক পূর্ব্বে কিনা কেই বা জানে? প্রথম তাহাদের উপনিবেশ কোথায় ছিল তাহা আমরা জানি না। তাহারা বলে, তাহাদের আদি পুরুষ 'পিলচু হাড়াম' ও পিলচু বুড়ির দ্বাদশজন বংশধর হইতে তাহাদের দ্বাদশটি গোত্রের উৎপত্তি হইয়াছে। এ কথা তোমাদের পূর্ব্বে বলিয়াছি। সাঁওতালদের জাতীয় নাম হইতেছে 'হড়্'। হড়্ অর্থে মানুষ। বাঙ্গালীকে সাঁওতালেরা কি বলে জান? বলে দেখু। ব্রাহ্মণেকে বলে—বাবুড়ে, মুসলমানকে 'মুশ্‌লা' বা তুড়ুক। তুড়ুক তুর্কী হইতে নয়ত! পূর্ব্ববঙ্গে তুড়ক সোয়ার' অর্থে অশ্বারোহী সৈন্যদের বুঝাইত।

সাঁওতালি ভাষা সম্বন্ধে এখন দুই একটি কথা শোন। ইহাদের ভাষায়, ইহাদের রূপকথায়, ইহাদের ছেলেভুলানো ছড়ায়, সংস্কৃত ভাষা হইতে অনেক শব্দ আসিয়াছে। তবে যেমন হয় উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সাঁওতালেরা গল্প বলিতে বড় ভালবাসে। সন্ধ্যার পর কুটীরের পাশে আগুন জ্বালিয়া ছেলেমেয়েরা সব জড় হইয়া গ্রাম্য বৃদ্ধদের কাছে গল্প শুনিতে মিলিত হয়। সেই সব গল্পের ভাষা বিশুদ্ধ সাঁওতালী। ইংরাজ রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে নানাজাতীয় লোকের সংস্পর্শে আসিয়া ইহাদের ভাষায় অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। অনেক বিদেশী শব্দ গ্রহণ করিয়াছে। এখানে কয়েকটি সাঁওতালী শব্দ ও তাহার অর্থ দিলাম।

গ্রাম— আতো, ঝরণা—জড়ি, খাল—সড়ো, বন—বির্, জল—দাঃ, নদী—গাডা, মেঘ—রিসিল, সূর্য্য—সিঞ্‌চান্দো, চন্দ্র—নিন্দ্‌ বা চন্দো, আকাশ—সেরমা, সিঞ্‌ ও নিন্দ ইহাদের দেব দেবীর মধ্যে প্রধান।

ইংরাজী ভাষায় সাঁওতালদের সম্বন্ধে অনেক বই আছে। তোমরা যদি সাঁওতালদের রূপকথা

জানিতে চাও, তাহা হইলে এ বইগুলি পড়িতে পার।—Rev. Dr. Campbell প্রণীত Santal Folk Tales, এ বইখানা ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে বাহির হইয়াছে, Rev. O. Bodding D. D. প্রণীত সাঁওতালদের সম্বন্ধে বই ক'খানা খুব ভাল, তাহাতে অনেক রূপকথা, গল্প ও উপাখ্যান আছে। Cecil Henry Bompas প্রণীত Folklore of the Santal Parganas ও একখানা ভাল বই। এ বইখানা ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙ্গালাসাহিত্যেও অনেক সাঁওতালদের গল্প ইত্যাদি লইয়া গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

সাঁওতালদের প্রত্যেক গ্রামে একজন প্রধান বা মোস্তাজির ও একজন সর্দ্দার থাকে। প্রধান গ্রামের সর্ব্বেসর্ব্বা। নূতন প্রজাপত্তন, খাজনা আদায়, সীমা নিষ্পত্তি করণ প্রভৃতি যাবতীয় দেওয়ানী কার্য্য প্রধানই করিয়া থাকে। প্রধানের মৃত্যুর পর তাহার বংশধরেরা উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রধানের পদ প্রাপ্ত হয়। সর্দ্দার ফৌজদারী ঘটিত ব্যাপারে নিযুক্ত থাকে। প্রাথমিক বিচার সর্দ্দারের নিকটেই হয়। প্রধান আদায়ী করের উপর কমিশন ও সর্দ্দার গভর্ণমেণ্ট হইতে বেতন কিংবা জায়গীর পাইয়া থাকে।

যাহাদের অবস্থা ভাল তাহারা শব দাহ করে, অন্যথায় মৃত্তিকা নিম্নে প্রোথিত করিয়া দেয়। ইহারা মৃতের একটু হাড় একটি মাটির ডিবার (চুকা) ভিতর ভরিয়া বাড়ী লইয়া আসে এবং সময় মত তাহা দামোদরে গিয়া দিয়া আসে। মানুষ মরিলে ইহারা হিন্দুদের মত স্নান করে এবং একমাস পর আত্মীয় কুটম্ব স্বজন লইয়া শ্রাদ্ধাদি করিয়া থাকে। দামোদর নদকে ইহারা গঙ্গা বলে। দামোদরের ঘাটে একটি শাল দণ্ডের কতক অংশ প্রোথিত করিয়া তাহার নিকট লোহার খাড়ু এবং চারিটি পয়সা রাখিয়া দেয়। সাঁওতালদের ব্রাহ্মণ, পূজা করিয়া ঐগুলি তুলিয়া লয়। অস্থি দিয়া বাড়ী ফিরিলে বাড়ীর মেয়েরা তেল জল দিয়া পুরুষদের পা ধোয়াইয়া দেয়।

অসুখের সময় ইহারা পাশকরা ডাক্তার কবিরাজের শরণাপন্ন হয় না। তাহারা তাহাদের ওঝা প্রদত্ত টোট্‌কা ঔষধ সেবন করিয়া থাকে এবং আরোগ্য লাভ করিলে তাহার দক্ষিণা দেয়। জ্বর থাকিলেও ইহারা ভাত খায়। নিমোনিয়া প্রভৃতি দুরারোগ্য ব্যাধি ইহারা কি এক বৃক্ষের মূল বাটিয়া খাওয়াইয়া আরোগ্য করে। এইরূপ চিকিৎসা স্বচক্ষে অনেকেই দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ইহারা ঔষধের কথা অপর জাতির নিকট প্রকাশ করিতে চাহে না।

সাঁওতালেরা সহজ, সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপন করে। ইহাদের দালান কোঠা কাহারও নাই। কোনদিন ইহারা যে পাকাবাড়ীতে বাস করিত, তাহাও মনে হয় না, কেন-না তাহা হইলে তাহাদের ভাষায় ইট, চূণ, সুরকি প্রভৃতি শব্দ থাকিত। মাটির দেওয়াল দিয়া উপরে খড়ের চাল বাঁধিয়া ইহারা ইহাদের ঘর তৈরী করে। দরজা, জানালা বা খরখড়ি কোন কিছুই থাকে না। ইহাদের দরজায় আগড় ছাড়া আর কিছুই থাকিত না। সাঁওতালেরা দড়ির খাটে শোয়। ইহারা বালিশ ব্যবহার করে না। বালিশকে ইহারা 'তাকিয়া' কহে।

সাঁওতালেরা চাষবাস করিয়াই জীবন ধারণ করে। ইহারা বেশ ভাল চাষী। মালদা জেলায় এই চাষ বাসের জন্যই তাহারা আসিয়া পরে একেবারে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। গাই, বলদ, মহিষের (কাড়া) সাহায্যে ইহারা চাষ-বাস করে। বাজারে কাঁকুড়, কুমড়া, লাউ প্রভৃতি বিক্রয় করে।

সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যাপার লইয়া ইহারা কোন দিন মাথা ঘামায় নাই বলিয়া ইহাদের ভাষায় ঐ সব সভ্যতা বুঝাইবার শব্দ নাই। তবে যেমন রাজা—রাজ, গ্রামের মণ্ডল—মাঝি, ধনবান্ লোক—কিসাঁড়, গরীব—রেঙ্গেচ্ হড়, সন্তোষ—কুপি, আনন্দ—রৈস্কো. অপরাধ—ঘাট। বাঙ্গালীর সহিত মেলা মেশার দরুণ এবং বাঙ্গালীরা ও সাঁওতালদের সহিত মেলামেশার ফলে বাঙ্গালাভাষায় সাঁওতালী ভাষার অনেক শব্দ প্রচলিত হইয়াছে।



পৃথিবীর ইতিহাস

গ্রীস—এথেন্স্

এথেন্স্—থেমিষ্টোক্লিস, এ্যারিষ্টিডস্ ও সাইমন্

২৮৭৯ পৃষ্ঠার পর

প্লেটীয়ার যুদ্ধের পর এথেন্সের অধিবাসীরা তাহাদের স্ত্রী-পুত্র-পরিবার লইয়া আবার এ্যাটিকায় ফিরিয়া আসিলেন। পারসিকের সহরটি একেবারে ধ্বংস করিয়া গিয়াছিলেন, এইবার পুনরায় তাহার সংস্কার করা আরম্ভ হইল। এথেনীয়েরা এথেন্সের চারিদিক বেড়িয়া একটা খুব উচু প্রাচীর তৈরী করিতে আরম্ভ করিল, এবং উহা এমন মজবুত করিয়া গড়িতে লাগিল যেন ভবিষ্যতে কেহ আর সহজে নগরে প্রবেশ করিতে না পারে। থেমিষ্টোক্লিসের (Themistocles) আদেশ অনুসারে নগরের মধ্যে একটি বিস্তৃত ভূভাগে স্বতন্ত্র ভাবে সুরক্ষিত করিয়া রাখা হইল। এইরূপ রাখার উদ্দেশ্য এই যে আবার যদি কোনও বৈদেশিক আক্রমণ হয়, তাহা হইলে যেন নগরবাসী নরনারীরা শিশুদের সহ নিরাপদে ঐস্থানে অবস্থান করিতে পারেন। এই ভাবে নানা প্রাচীর, বাড়ী ঘর, বন্দর ইত্যাদির যখন পুনর্গঠন চলিতেছিল সে সময়ে ঈজিয়ান নামক স্থানে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিতে থাকে।

মাইকেলের (Mycale) যুদ্ধের পর, এসিয়ামাইনরের অন্তর্ভূক্ত গ্রীক রাজ্যগুলি পারসিকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এথেনস্ ও স্পার্টার সাহায্য লাভ করিয়া তাহারা পারসিকদিগকে এইরূপ ভাবে জব্দ করেন যে অদূর ভবিষ্যতে সহসা পারসিকদের গ্রীসদেশ আক্রমণ করিবার তেমন কোন সম্ভাবনাই রহিল না। এসিয়ামাইনরের গ্রীক্ অধিবাসীদের ইউরোপীয় গ্রীক্দের সঙ্গে যোগাযোগ না রাখিলে পর তাহাদের স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীনভাবে বাস করা যে বড় সহজ নহে, একথা এসিয়ামাইনরের বিভিন্ন রাজ্যের গ্রীকেরা বিশেষ ভাবেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এ জন্যই তাহারা **এ্যারিষ্টিডিসের** (Aristides) নেতৃত্বে **ডেলিয়ান লিগ** (Delian-League) নামে একটি ঐক্যসঙ্ঘ সমিতি গঠন করিয়াছিলেন। এথেন্স্ এই সমিতির প্রধান পরিচালক হইলেন। এথেন্সের রাজকর্ম্মচারীরা সমিতির সুনিয়ন্ত্রিত পরিচালনার জন্য কর আদায়, এবং তাহা সঞ্চিত রাখিবার জন্য ডিলোস্ (Delos) দ্বীপে একটি ধনাগার (Treasury) স্থাপন

করিলেন। এই নূতন মৈত্রীবদ্ধ সাম্রাজ্যের নেতৃত্ব লাভ করিয়া এথেন্সের বিশেষ প্রতিষ্ঠা হইল।

গ্রীসের নেতা সাইমন্ (Cimon)

থেমিষ্টোক্লিস্ ও এ্যারিষ্টিডিসের পরে সাইমন্ এথেন্সের নেতা হইলেন। সাইমনের পিতা মিলটিয়াডিস্ মারাথনের (Marathon) রণক্ষেত্রে অপূর্ব্ব বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সে কথা তোমরা



এ্যারিষ্টিডিস্

জান। সাইমন্—যৌবনে স্থালামিসের যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া গ্রীক্‌দের—এথেনীয়দের প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। এ্যারিষ্টিডিস্ তাঁহাকে যখন দেশের জনগণের নিকট পরিচিত করেন, তখন সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়াছিল। সাইমন্ তাঁহার প্রতিভা-বলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে এথেন্সের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের অর্থাৎ রক্ষণশীল সমাজের প্রধান হইয়াছিলেন। সাইমন্ পিতার রণ-নৈপুণ্য উত্তরাধিকার-সূত্রে লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার উপর (Delian-League) এর নেতৃত্বভার উপযুক্ত লোকের উপরই অর্পিত হইয়াছিল। পারসিকেরা তাঁহার নিকট যেরূপ ভাবে বিপর্য্যস্ত হইয়াছিল, অন্য কোনও গ্রীক্ বীরের নিকট তাহা হয় নাই। তাঁহার নেতৃত্বে গ্রীক্ সৈন্যবাহিনী কৃষ্ণসাগরের (Black sea) তীরবর্ত্তী সমুদয় গ্রীক্ নগরগুলিকে পারসিকদের অধীনতা হইতে মুক্ত করিতে পারিয়াছিল। ফলে এসিয়ার গ্রীস্-অধিবাসীরা এক বিরাট গ্রীক জাতিতে পরিণত হইলেন।

গ্রীকেরা যেমন একটির পর একটি করিয়া যুদ্ধে বিজয়লাভ করিয়া পারসিকদিকের হাত হইতে গ্রীসদিগকে স্বাধীন করিতেছিলেন, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে Delian-League বা ডেলিয়ান সঙ্ঘেরও অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিতেছিল। পূর্ব্বের বিধান অনুযায়ী এথেন্সের জন্য রণতরী ইত্যাদি দেওয়ার পরিবর্ত্তে নগদ টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা হইল। ফল ভালই হইল, এথেনীয়েরা নিজেদের ইচ্ছামত রণতরী নির্ম্মাণ করিয়া রণবহরের শক্তি বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। এইভাবে এথেনীয় রণবহরের এতদূর শক্তি বৃদ্ধি পাইল যে, যদি কেহ সঙ্ঘের গঠনকে অস্বীকার করিতে চাহিত, তাহা হইলে সেই সব নগরের অধিবাসীদিগকে সহজেই শাসন করিতে পারিতেন। এইভাবে ডিলোসের ধনাগার আপনা হইতেই এথেন্সে আসিয়া পড়িল। এথেন্সের এই শক্তিশালী নৌবহরের সৃষ্টি হইয়াছিল ৪৫৪ খৃঃ পূঃ অব্দে।

এদিকে স্পার্টা এবং তাহার পোলোপোনিসিয়ার সহযোগীরা এথেন্সের এইরূপ উন্নতিকে বিদ্বেষের চোখে দেখিতেছিলেন। যতদিন সাইমন এথেন্সের সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন, ততদিন স্পার্টার সহিত কোন রূপ গোলযোগ বা অশান্তির সৃষ্টি হয় নাই। তিনি কোনও প্রভাবশালী প্রতিবেশীর সহিত কলহ করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল,—এথেন্স্ সমুদ্রের উপর একাধিপত্য বিস্তার করিবে, স্পার্টা স্থলভাগে আপনার প্রভুত্ব বিস্তার করুক না কেন, তাহাতে এথেন্সের বাধা দিবার কোনও সঙ্গত কারণ নাই। সাইমন্ একথাটা বিশেষ ভাবেই উপলব্ধি

করিতে পারিয়াছিলেন—যদি এথেন্সের সহিত স্পার্টার কোনওক্রমে যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘটে, তবে এথেন্সের পক্ষে সেই ক্ষতির পরিমাণ বিশেষ গুরুতর হইয়া দাঁড়াইবে এজন্য তিনি সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতেন, যাহাতে এই দুই দেশের মধ্যে কোনরূপ বিদ্রোহ বা অশান্তির কারণ না ঘটে। কিন্তু মানুষের মন ভিন্ন পথে চলে। সকলে একমত হয় না। এক্ষেত্রেও তাহাই হইল। এথেনীয়রা তাঁহার এই নীতি পছন্দ করিলেন না। কাজেই প্রাচীন এথেন্স্ নগরীতে বরাবর যেমন হইত এক্ষেত্রেও তাহাই হইল, সাইমন জনগনের মতানুযায়ী নির্ব্বাসিত (Ostracized) হইলেন। নূতন মানুষ, নূতন মত, আবার এথিনীয় রাষ্ট্রে দেখা দিল।

সাইমন্ নির্ব্বাসিত হইবার অল্প পরেই তাঁহার প্রধান বিরোধী এপিয়ালটিস্ (Ephialtes) নিহত



পেরিক্লিসের প্রতিকৃতি

হইলেন। কে তাঁহাকে হত্যা করিল এবং কি ভাবে তিনি নিহত হইলেন সে কথা কেহই বলিতে পারেন নাই।

পেরিক্লিস্ ও এথেন্স্

এইবার পেরিক্লিস এথেন্সের রাষ্ট্রনায়ক হইলেন। তাঁহার সময়ে এথেন্সের যেমন উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল, তেমন আর কাহারও সময়ে হয় নাই।

এথেন্স নগরীকে তিনি নানা সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া সুশোভিত করিয়াছিলেন। বিদ্যা ও জ্ঞান বিস্তারের জন্য ছিল তাঁহার অসাধারণ



এ্যাথেনা দেবীর মূর্ত্তি

[এই মূর্ত্তিটি এখন নেপলস সহরের জাতীয় যাদুঘরে (National Museum) রক্ষিত আছে]

মনোযোগ। এ সময়ে সাহিত্যের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। কাব্য, সাহিত্য, ললিতকলা, মূর্ত্তি ও মন্দির, চিত্র সব দিক্ দিয়াই হইয়াছিল অসাধারণ

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে এথেনীয়দের মনের বল বড় কম ছিল, তাহারা দেশের প্রকৃত কল্যাণকামী যাহারা তাহাদেরই বিরুদ্ধাচারণ করিতেন এবং সময় সময় পেরিক্লিসের প্রতিও দুর্ব্যবহার করিতে ছাড়েন নাই।

পেরিক্লিসের অধিনায়কতার শেষ ভাগে এথেন্সে এক ভীষণ মহামারী দেখা দিয়াছিল। সহরের অনেক লোক পথ চলিতে চলিতেই মৃত্যু মুখে পতিত হইত। রাজপথ ও বাড়ী ঘরে মৃতদেহের স্তূপ হইয়াছিল। পেরিক্লিস নিজেও এই রোগে মারা যান।



জন্তরা কি বাজনা ভালবাসে ?

২৮৮০ পৃষ্ঠার পর

আমরা সকলেই অনেক সময় লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি যে জন্তু জানোয়ারেরা সঙ্গীতের মধুর সুর লহরী শুনিতে বেশ ভালবাসে। এমন কি তোমরা যে গোরুকে নেহাৎ অপদার্থ মনে কর সেই গোরুও কিন্তু বাঁশীর সুর শুনিতে অত্যন্ত ভালবাসে। তোমরা যদি কখনও লক্ষ্য কর তাহা হইলে দেখিতে পাইবে, যেখানে বেশ মধুর বাজনা বাজিতেছে, সেখানে গোরুরা তাহাদের চোখ দুটি বিস্ফারিত করিয়া সেদিক পানে ছুটিয়া চলিয়াছে। যুদ্ধের সময় সৈন্যদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য রণবাদ্য বাজান হয়। সে বাদ্য শুনিয়া যে কেবল সৈনিকদের প্রাণই উৎফুল্ল হয় তাহা নহে, তাহাদের অশ্বগুলিও বাজনার তালে তালে ছুটিতে থাকে, যেন তাহারাও রণরঙ্গে ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য উৎসুক হইয়া পড়িয়াছে।—আমি নিজে অনেকবার লক্ষ্য করিয়াছি যে বাড়ীতে গান বাজনা হইতেছে আর বাড়ীর পোষা কুকুরটি এমন ভাবে কাঁদিতেছে যে গান বাজনার ওখানটায় রসভঙ্গ হইবার সম্ভব! ইহারা আবার সময় সময় গীতবাদ্য শুনিয়া আনন্দে লেজ নাড়িতে নাড়িতে দৌড়িয়া পলায়ন করে।

পাখীরা সুমধুর স্বর-লহরীর একান্ত ভক্ত। তাহার কারণও আছে। গানের দ্বারাই তাহারা তাহাদের প্রেম বল বা স্নেহ বল তাহা প্রকাশ করে। গায়ক পুরুষ পাখীদের গলার স্বর বেশ সুমিষ্ট হয়। স্ত্রী পাখীদের গলার স্বর কিন্তু একেবারেই মধুর নয়। অনেক সময় ছোট ছোট পাখীদের গান শুনিলে মুগ্ধ হইতে হয়।

শুকপাখী, টিয়াপাখী, ময়না, কাকাতুয়া প্রভৃতি যাহারা পুষিয়াছেন তাঁহারা যদি একটু লক্ষ্য করেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে হারমোনিয়ম, গ্রামোফোন্, পিয়ানো, বেহালা, এস্রাজ প্রভৃতি শুনিতে তাহারা খুবই ভালবাসে।—একজন সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি একটি পারাবতের সঙ্গীতপ্রিয়তার কথার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে যখন তিনি পিয়ানোতে কোন একটি সুর বাজাইতে আরম্ভ করিতেন, তখন জানালার উপর একটি পারাবত উড়িয়া আসিয়া বসিত, যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার বাজনা শেষ না হইত, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেই পারাবতটি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত। রাগিণীটি বাজান শেষ হইলে পাখীটি উড়িয়া যাইত।

এমন কি মাকড়সা পর্য্যন্ত সুস্বর শুনিতে ভালবাসে।—ছাগল, গোরু, ভেড়া প্রভৃতি ছোট বড় জন্তু জানোয়ারেরা সকলেই গান বাজনার ভক্ত।

সাপের সঙ্গীতপ্রিয়তার কথা তোমরা সকলেই জান। পথে ঘাটে প্রায়ই ত সাপুড়িয়াদের দেখিতে পাও, তাহাদের বাজনার সঙ্গে সঙ্গে সাপেরা কেমন ফণা দোলাইয়া দোলাইয়া নাচিতে থাকে।—সাপুড়িয়ারা বাঁশী বাজাইতে থাকে, আর গর্ত্তের ভিতর হইতে সাপ বাহির হইয়া আসে এবং সাপুড়িয়াদের হাতে ধরা দেয়, একথা তোমরা সকলেই জান।

ভালুককে কি ভাবে পথে ঘাটে ভালুকওয়ালারা নাচাইয়া ফিরে তাহা তোমরা প্রতিনিয়তই কি সহরে, কি পল্লীগ্রামে সর্ব্বত্রই দেখিতে পাও, কাজেই ইতর প্রাণীরা যে গীত-বাদ্য ভালবাসে একথা মোটেই অসত্য নহে।

মাছেরা কি চক্ষু বুজাইয়া ঘুমাইতে পারে ?

মাছেরা কেমন করিয়া চোখ বুজিয়া ঘুমাইবে বল? তাহাদের যে চোখের পাতাই নাই! যার চোখের পাতা বলিয়াই কিছু নাই সে আর চোখ বুজিবে কেমন করিয়া? কেবল যে মাছেরাই চোখ মেলিয়া ঘুমায় তাহা নহে। তোমরা যদি কখনও চিড়িয়াখানায় সাপের ঘরে যাও, তাহা হইলে দেখিবে যে ঘুমন্ত সাপের চক্ষু খোলা রহিয়াছে। মানুষেরাও চোখ মেলিয়া ঘুমাইতে পারে, কথাটা ঠিক, কিন্তু চোখ মেলিয়া ঘুমাইবার জন্য যে প্রচেষ্টাটা করিতে হয়, তাহার চেয়ে চোখ বুজিয়া ঘুমানই কিন্তু আমাদের পক্ষে সহজ।

সমুদ্রের জল লবণাক্ত কেন ?

জলে তাপ প্রয়োগ করিলে জল বাষ্পীভূত হইলেও ইহাতে দ্রবীভূত পদার্থ সমূহ পড়িয়া থাকে। সেইজন্য সূর্য্যকিরণে সমুদ্রের জল যখন বাষ্পীভূত হয় তখন উহাতে দ্রবীভূত লবণময় কঠিন পদার্থগুলি সমুদ্রে পড়িয়া থাকে, ঐ বাষ্প উপরে চাপযুক্ত হইয়া ঘনীভূত হয় এবং মেঘে হয়। পরে ঐ মেঘ হইতে জল বৃষ্টির আকারে স্থলভাগের উপর নামিয়া আসে এবং স্থলভাগের উপর দিয়া বহিয়া নদীপথে সমুদ্রে ফিরিয়া আসে। স্থলভাগের উপর দিয়া আসিবার সময় অনেক প্রকার লবণাক্ত পদার্থ উহাতে দ্রবীভূত হয় এবং উহারাও ঐ জলের সহিত সমুদ্রে নীত হয়। এইরূপে জল প্রত্যেকবারে বাষ্পাকারে সমুদ্র হইতে উঠিয়া বৃষ্টির আকারে স্থলভাগের উপর দিয়া সমুদ্রে ফিরিয়া আসিবার সময় কিঞ্চিৎ পরিমাণ লবণময় পদার্থ সমুদ্রে বহন করিয়া আনে এবং ঐ লবণময় পদার্থ সমূহ সমুদ্রে সঞ্চিত হইয়া উহার জলকে ক্রমশঃই লবণাক্ত করিতেছে।

ইংরাজদের প্রথম উপনিবেশ কোনটী ?

উত্তর আমেরিকায় সেণ্ট-লরেন্স উপসাগরের পূর্ব্বতীরে অবস্থিত নিউফাউল্যাণ্ড উপদ্বীপ ইংরাজদের প্রথম উপনিবেশ। ইহা ইতালিয়ান আবিষ্কারক জনক্যাবট্ কর্ত্তৃক ১৪৯৭সালে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইনি ইংল্যাণ্ডের রাজা সপ্তম হেনরী কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া ভারত অনুসন্ধানে সমুদ্র-যাত্রা করিয়া আটলাণ্টিক মহাসাগরের পরপারে অবস্থিত এই উপদ্বীপটাতে আসিয়া পৌছাইয়াছিলেন। পরে ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে ৫ই আগষ্ট তারিখে স্যর হাম্-ফ্রে গিলবার্ট কর্ত্তৃক ইহা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত বলিয়া ঘোষিত হয়।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের তেল মাখাইয়া রৌদ্রে দেয় কেন ?

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের তেল মাখাইয়া রৌদ্রে দিলে উহাদের শরীর সুস্থ ও সবল হয়। সূর্য্যকিরণ সরিষার তৈলের উপর পড়িলে ভিটামিন ডি উৎপন্ন হয়। অস্থি গঠনের জন্য বয়স্কদের পক্ষে ভিটামিন ডি তত বেশী প্রয়োজনীয় না হইলেও শিশুদের পক্ষে ইহা অপরিহার্য্য উপাদান। ইহার দ্বারা অস্থিগুলি যথোপযুক্ত শক্ত ও সবল হয় এবং অভাবে রিকেট্স নামক একপ্রকার উৎকট ব্যাধি জন্মে। ইহাতে অস্থিগুলি শুকাইয়া যায়, হাত পা বাঁকিয়া যায়, শরীরের বৃদ্ধি হয় না ও দেহ খর্ব্বাকৃতি হয়।



পার্থিনন্—এথেনস্



কবি মিল্‌টন

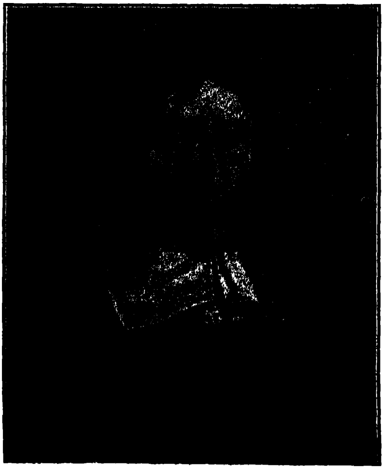
২৭৬১ পৃষ্ঠার পর

তোমরা পূর্ব্বে মার্লো, সেক্সপীয়র ও বেন্‌জনসনের কথা পড়িয়াছ (শিশু-ভারতী, ২১৩২ পৃষ্ঠা)। এইবার তোমাদের কাছে আর একজন প্রসিদ্ধ ইংরেজ কবির কথা বলিতেছি। ইঁহার নাম মিল্টন। তাঁহার রচিত Paradise Lost এর নাম তোমরা হয়ত শুনিয়াছ। শুধু যে Paradise Lost ও Paradise Regained এই দুইখানি কাব্য তিনি লিখিয়াছিলেন তাহা নহে, এই দুইটি ছাড়া আরও কয়েকটি কাব্য গ্রন্থ ও বহু কবিতা তিনি লিখিয়াছেন। তোমাদের কাছে ক্রমে সে সকল কথা বলিব। প্রথমে তাঁহার জীবন-কথা শোন।

মিল্টনের পিতা লণ্ডন নগরে বসবাস করেন। এইখানে ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে ৯ই ডিসেম্বর মিল্টনের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন। তিনি যেমন চরিত্রবান্ তেমনি সাধু প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার গান রচনা করিবার শক্তিও ছিল এবং তাঁহার রচিত সঙ্গীতগুলি কবিত্ব হিসাবেও লোকের কাছে আদরণীয় হইয়াছিল। মিল্টন কাব্য ও সঙ্গীতের আব-হাওয়ায় মানুষ হওয়ায় বাল্যকাল হইতেই তাঁহার প্রাণে কবিতার প্রতি অনুরাগ জন্মে। স্কুলে পড়িবার সময় হইতেই তিনি কবিতা রচনা আরম্ভ করেন। পিতা, পুত্র দুই জনেই বাহিরের লোকের মতামতের দিকে না চাহিয়া মনের আনন্দে গীতে ও গানে আপনাদের ক্ষুদ্র গৃহখানি মুখরিত করিয়া রাখিতেন।

পিতা পুত্রের প্রতিভার কথা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। বালক মিল্টনের যাহাতে লেখাপড়ার দিক্ দিয়া কোনরূপ ত্রুটি না ঘটে সেজন্য তিনি প্রাণপণ যত্ন করিতেন। ১৬২০ খৃষ্টাব্দে বারো বৎসর বয়সে মিল্টন সে সময়কার বিখ্যাত বিদ্যালয় St. Paul's Schoolএ প্রেরিত হন। এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ইংরাজী সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন।

তাঁহার লিখিত একখানা ব্যাকরণে তিনি অনেক প্রাচীন ইংরেজ কবির কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে কবি Spenserএর অনেক কবিতা ছিল। এই শিক্ষকের

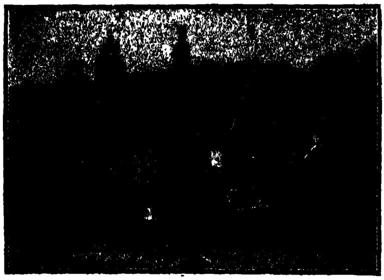


জন মিল্টন

শিক্ষা গুণে এবং পারিবারিক আবেষ্টনীর মধ্য দিয়াই তাঁহার কাব্য প্রতিভার বিকাশ লাভ হইয়াছিল। সেন্টপল স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা মিঃ কলেট (Colet) অন্যান্য পাঠ্য বইয়ের সহিত পূর্ব্বতন খৃষ্টীয় লেখকগণের রচনা ও পাঠ্যতালিকাভুক্ত করিয়াছিলেন। স্কুলে পড়া আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে টমাস্ ইয়ং (Thomas Young) নামে স্কটল্যাণ্ডের অধিবাসী এক ভদ্রলোক মিল্টনের গৃহ-শিক্ষক ছিলেন। এইভাবে ছেলেবেলা হইতেই গৃহে ও বিদ্যালয়ে তাঁহার জীবন একটা সংস্কৃতির মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছিল। মিল্টন ছেলেবেলা হইতেই পড়াশুনা করিতে খুব ভালবাসিতেন, এমনকি তাঁহার বয়স যখন মাত্র বারো সে সময়েও তাঁহাকে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত পড়াশুনা করিতে দেখা যাইত।

১৬২৫ খৃষ্টাব্দে মিল্টন সেন্টপল স্কুল ছাড়িয়া কেম্ব্রিজে ক্রাইষ্ট কলেজে (Christ-College) অধ্যয়ন করিতে চলিয়া যান। স্কুলে পড়িবার সময় মিল্টন ইংরেজীতে ও ল্যাটিনে অনেক কবিতা লেখেন। তাহার মধ্যে Death of a Fair Infant—"একটি সুন্দর শিশুর মৃত্যু" নামক কবিতাটির নাম করা যাইতে পারে।

মিল্টন দেখিতে খুব সুন্দর ছিলেন, এজন্য কলেজের ছেলেরা তাঁহার নাম দিয়াছিল—The Lady of Christ College। ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে মিল্টন এম্-এ উপাধি লাভ করেন। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি সাত বৎসর ছিলেন। এ সময়ে তাঁহার লিখিত At a Solemn Music এবং Nativity Hymn (১৬২৯) প্রকাশিত হয় এবং তাঁহার কবি বলিয়া বিশেষ খ্যাতি হয়।



বাকিংহামসায়ার—মিল্টনের বাড়ী

এ সময়ে মিল্টনের পিতা বাকিংহাম-সায়ারের (Buckinghamshire) অন্তর্ভূক্ত হোরটন্ (Horton) নামক স্থানে বাস করিতেছিলেন। কলেজে অধ্যয়ন শেষ করিয়া

মিল্টন এখানে ছয় বৎসর কাল নিশ্চিন্ত মনে পড়াশুনা ও কাব্য চর্চ্চা করিয়াছিলেন। মিলটনের পিতার ইচ্ছা ছিল তাঁহার পুত্র ধর্ম্মযাজকের পদ গ্রহণ করেন, এজন্য উপযুক্ত



এই ঘরে বসিয়া মিল্টন তাঁহার বিখ্যাত কাব্য Paradise Lost লিখিয়াছেন।

শিক্ষালাভ করিবার জন্য তিনি তাঁহাকে কেম্ব্রিজে পাঠাইয়াছিলেন কিন্তু কিছু দিন পরে মিল্টন ধর্ম্মযাজকের পদগ্রহণ না করাই স্থির করেন। কোন ব্যবসায় অবলম্বন করিবার দিকেই তাঁহার তেমন ঝোঁক দেখা গেল না। আপনার মনে অধ্যয়ন করিয়া ও নৈতিক রীতিনীতির মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া আপনাকে সংযত ও চিন্তাশীল করিয়া তুলিতে লাগিলেন।

মিল্টনের কাছে পৃথিবী ছিল বিচিত্র দর্শন। নীল আকাশ, মেঘের শোভা, বসন্তের ফুল, ফল ও শোভা সম্পদ সকলই নিত্য-নূতন উৎসাহ ও উদ্দীপনা দ্বারা কবিকে তাঁহার কাব্য রচনায় উদ্বোধিত করিয়াছিল।

১৬৩২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার পিতার সহিত Hortonএ বাস করেন। এই ছয় বৎসরের মধ্যে তিনি অনেকগুলি কবিতা লেখেন সে সকলের মধ্যে L'Allegro, Il Penseroso, Arcades, Comus এবং Lycidas প্রভৃতি প্রধান। ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে তিনি কিছুদিনের জন্য দেশ ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন এবং ইতালি, সুইটজারল্যাণ্ড এবং ফ্রান্সে বেড়াইয়াছিলেন। দেশে ফিরিয়া আসিয়া তিনি স্থায়ীভাবে লণ্ডনে বাস করিতে থাকেন। এ সময়ে রিচার্ড পাওয়েল (Richard Powell) নামে একজন ভদ্রলোকের জ্যেষ্ঠা কন্যা মেরীকে (Mary) তিনি বিবাহ করেন। বিবাহের একমাস পরেই মেরি তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া যান কিন্তু কিছুকাল পরে আসিয়া আবার তাঁহার সঙ্গে বাস করিতে থাকেন কিন্তু অল্প কয়েক বৎসর পরেই মেরীর মৃত্যু হয়।

Lycidas প্রকাশিত হইবার পর কবি ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে ইতালি ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইংরেজ কবিদের মধ্যে



প্যারী সহরের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের সভায় মিল্টন তাঁহার রচিত কবিতা পড়িতেছেন

অনেকেই—চসার (Chaucer) হইতে সেলি (Shelley) সকলেই ইতালি হইতে নূতন প্রেরণা আনিয়াছিলেন। মিল্টন প্রায় দেড়বৎসর (পনেরোমাস) বিদেশে ছিলেন।

তাঁহার ইচ্ছা ছিল, ফরাসী দেশ, সুইট্‌জারল্যাণ্ড, গ্রীস ও ইতালি বেড়াইয়া আসেন, কিন্তু ইংলণ্ডের নানা রাষ্ট্রীয় গোলযোগের কথা শুনিয়া তিনি তাড়াতাড়ি দেশে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। মিল্টন স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন—তিনি সে সময়কার রাজনৈতিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছিলেন—আমার দেশের লোকেরা যখন স্বাধীনতা-সংগ্রামে লিপ্ত থাকিবে তখন আমি প্রমোদ-ভ্রমণে ব্যস্ত থাকিব—এ কখনও হইতে পারে না! তাঁহার এই কথা কয়টি কি সুন্দর!

ইহার পর প্রায় কুড়ি বৎসর কাল পর্য্যন্ত মিল্টন কয়েকটি 'সনেট' ছাড়া আর কোন কবিতা রচনা করেন নাই। এ সময় তিনি নানা রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক ব্যাপারে জড়িত হইয়া পড়েন। তিনি ধর্ম্মসংস্কার (Church reform) শিক্ষা, বিবাহ এই সব নানা বিষয়ে প্রবন্ধ লেখেন এবং আলোচনা করেন। সে সকল প্রবন্ধের মধ্যে Reformation of Church Discipline in England ১৬৪১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ১৬৪১-১৬৪২ এর মধ্যে তিনি এই প্রকার পাঁচখানি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। কি ভাবে শিক্ষার উন্নতি হইতে পারে এই দিকে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং শিক্ষা সম্বন্ধে নানারূপ গ্রন্থ ইত্যাদি অধ্যয়ন করিয়া কবি Tractate of Education নামক একটি পুস্তিকা ১৬৪৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই একই বৎসরে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা সম্বন্ধে তাঁহার Areopagitica নামক গদ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তার পরের বৎসর ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার কবিতাগুলি সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল।

তিন চার বৎসর পরে মিল্টন বৈদেশিক রা ব্যাপারে কর্ম্মসচিবের পদ গ্রহণ করেন। তখন নানা বিদেশীয় রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কাগজ পত্র দেখা শোনা, অনুবাদ করা, রাজ্যের বড় বড় রাজনৈতিকদের সংস্রবে আসার ফলে তাঁহার বাস্তবজগৎ সম্বন্ধে সাক্ষাৎভাবে পরিচয় হইয়াছিল। তাঁহার জীবনী লেখকেরা বলেন যে এই কার্য্যদ্বারা তাঁহার বিশেষ উপকার হইয়াছিল—'The idle singer of an empty day'—এমন কথা মিল্টনের সম্বন্ধে বলা চলে না।

রাজনীতি ক্ষেত্রে কাজ লইয়া ব্যস্ত থাকার জন্য মিল্টন প্রায় দীর্ঘ কুড়ি বৎসর



বন্ধু সমাগম

কাল, তাঁহার কবি-প্রতিভার উৎকর্ষ সাধন করিতে পারেন নাই। যদি পররাষ্ট্রীয় ব্যাপারের কার্য্যে তিনি আত্মনিয়োগ না করিতেন, তাহা হইলে হয়ত বা Comus এর ন্যায় আরও কয়েকটি কাব্য এবং Lycidasএর অপেক্ষা ও কবিত্বপূর্ণ কাব্যগীতি লিখিতে পারিতেন। কাজেই সাহিত্য-সমালোচকদের মতে ইংলণ্ডের এমন একজন সাহিত্য-স্রষ্টার প্রতিভা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে নিযুক্ত থাকার ফলে সাহিত্যের দিক্ দিয়া দেশের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। এ সম্বন্ধে অবশ্য অন্যরূপ বলিবারও অনেক কিছু আছে। সে যাহা হউক ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে তিনি রাষ্ট্রীয় ব্যাপার হইতে মুক্ত হইয়া সম্পূর্ণ স্বাধীন ও

স্বতন্ত্র ভাবে সাহিত্যচর্চ্চায় আত্মনিয়োগ করিলেন। এক কথায় এইবার আবার তাঁহার নূতন কবি-জীবনের আরম্ভ হইল।

১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে Paradise Lost বা স্বর্গচ্যুতি তিনি লিখিতে আরম্ভ করেন



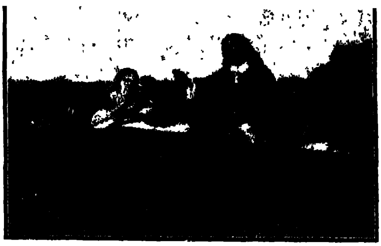
মিল্টন 'Samson Agonistes' রচনা করিতেছেন

এবং ছয় বৎসরে উহা শেষ করেন। ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার এই কাব্যখানি প্রকাশিত হয়। তোমরা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবে যে মিল্টন এই কাব্যখানার জন্য প্রকাশকদের নিকট হইতে মাত্র দশ পাউণ্ড পাইয়াছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার স্ত্রী পাইয়াছিলেন মাত্র আট পাউণ্ড। দেড়-বৎসরে মাত্র ১৩০০ কপি Paradise Lost বিক্রয় হইয়াছিল। ১৬৭১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার Paradise Regained প্রকাশিত হয়। এই বৎসরেই তাঁহার বিখ্যাত নাটক Samson Agonistes প্রকাশিত হইয়াছিল।

মিল্টনের জীবনের শেষভাগ ১৬৬০-৭৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সময় বেশ নিশ্চিন্ত অবসরে অতিবাহিত হইয়াছিল।

১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে মিল্টন তাঁহার কবিতা-বলীর একটি অভিনব সংস্করণ প্রকাশ করেন। তাঁহার মৃত্যুর চারিবৎসর পূর্ব্বের সময়টা তিনি গদ্য রচনাতে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। এ সময়ে তিনি লণ্ডনেই থাকিতেন। তাঁহার সঙ্গে য়ুরোপের বড় বড় কবি, লেখকও রাজনৈতিক এবং প্রতিভাশালী ব্যক্তিরা আসিয়া দেখা সাক্ষাৎ করিতেন। এ-প্রসঙ্গে Dryden এর নাম করা যাইতে পারে। ড্রাইডেন মিল্টনের Paradise Lost কে নাট্যরূপ দিবার জন্য তাঁহার অনুমতি চাহিয়াছিলেন।

চল্লিশ বৎসর বয়স হইতেই মিল্টনের দৃষ্টি শক্তি ক্ষীণ হইতে থাকে এবং পরে তিনি একেবারে অন্ধ হইয়াছিলেন। পারিবারিক জীবনে তিনি বিশেষ সুখী ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। প্রথম ও দ্বিতীয় স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি তৃতীয়বার



অন্ধ মিল্টন—কবিতা বলিয়া যাইতেছেন

বিবাহ করেন। তৃতীয় পরিণয়ে কবি সুখী হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।

মিলটনের প্রথম বিবাহ সুখের হয় নাই। ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ

করেন। এ বিবাহে তিনি সুখী হইয়াছিলেন। তিনি এই স্ত্রীকে যেমন ভালবাসিতেন তেমন প্রীতি ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। মিলটন তাঁহাকে 'Saint' বা তাপসী বলিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। দেড় বৎসরের মধ্যেই এই সাধ্বী রমণীর মৃত্যু হয়। মিল্‌টনের মেয়েরা পিতার মনোভাব বুঝিতে পারিতেন না। সেজন্য তাঁহার মনে শান্তি ছিল না। ক্রমওয়েল (Cromwell)কে তিনি জাতির গৌরব বলিয়া মনে করিতেন, ১৬৫৮ সালে যে বৎসর তিনি "Paradise Lost" রচনা করিতে আরম্ভ করেন, সে বৎসরই ক্রম-ওয়েলের মৃত্যু হয়।

টমাস্ এলউড্ (Thomas Ellwood) নামে তাঁহার এক তরুণ বন্ধু মিলটনকে হোমারের অমর কাব্য পড়িয়া শুনাইতেন। মিলটন তাঁহাকে তাঁহার Paradise Lostএর পাণ্ডুলিপি পড়িতে দিয়াছিলেন। পড়া শেষ হইলে পর, পাণ্ডুলিপি ফিরাইয়া দিবার সময় এলউড্ তাঁহাকে বলিলেন—আপনি স্বর্গচ্যুতির বিষয়েত অনেক কথাই বলিলেন, কিন্তু স্বর্গ প্রাপ্তির কথাত উল্লেখ করিলেন না। কবি সে সময়ে একটি কথাও বলিলেন না। পরের বৎসর যখন তাঁহার দ্বিতীয় মহাকাব্য "Paradise Regained" আরম্ভ করিলেন—যীশু খৃষ্টের প্রলোভন জয়ের বিষয়ের বর্ণনা করিলেন, তখনই এলউডের কথার প্রকৃত উত্তর দেওয়া হইয়াছিল।

মিল্‌টন তাঁহার গদ্য রচনার প্রতি তেমন শ্রদ্ধাবান ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার রচনা দ্বারা ইংরেজী গদ্য সাহিত্যেও তিনি অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।

সে সময়ে পার্লামেণ্টের অনুমতি পত্র ব্যতীত কাহারও কোন পুস্তক, পত্রিকা বা পুস্তিকা প্রকাশ করিবার ক্ষমতা ছিল না। মিল্‌টন মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বলিতেন—পৃথিবীতে অনেক মানুষ একটা বোঝার মত বাঁচিয়া থাকে। কিন্তু একখানি সদ্‌গ্রন্থ চিরন্তন ভাবে জীবিত থাকিয়া জগতের কল্যাণ করে।

মিল্‌টনের চরিত্র দৃঢ় ও নির্ভীক ছিল। ১৬৫২ খৃষ্ট অব্দে যখন তিনি একেবারে অন্ধ হইয়া গেলেন, আরোগ্য হইবার কোন সম্ভাবনাই রহিল না, তখন তাঁহাকে অপরের সাহায্য লইয়া কাজ করিতে হইত। অন্ধ হইয়াও মিল্‌টন ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস বা নিজের মানসিক বল হারাণ নাই। তিনি তাঁহার বন্ধু লেওনার্ড ফিলেরস্ (Leonard Philars)কে যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে তাঁহার সে সময়কার মনের অবস্থা বুঝিতে পারা যায়।

১৬৭৪ খৃষ্টাব্দের ৮ই নভেম্বর তারিখে মিল্‌টনের মৃত্যু হয়। ক্রিপলগেট (Cripple gate) নামক স্থানে জাইলস্ গীর্জ্জার (Giles Church) সমাধি-ক্ষেত্রে তাঁহাকে সমাহিত করা হয়। সেখানে একটি স্মৃতিস্তম্ভ রহিয়াছে। লণ্ডনের সুবিখ্যাত ওয়েষ্ট-মিন্‌ষ্টার এবিতেও (West Minster Abbey) তাঁহার একটি স্মৃতিস্তম্ভ আছে।

মিল্‌টনের জীবন ছিল পবিত্রতার আদর্শ স্বরূপ। কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, চরিত্রবান, দেশপ্রেমিক এবং কবি হিসাবে তাঁহাকে দেশের লোকেরা বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ মিল্‌টনের সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া যথার্থই লিখিয়াছেন—Thy soul was like a star, and dwelt apart—নক্ষত্রের মতই মিল্‌টন তাঁহার জীবনে প্রতি-ভার যে দ্যুতিঃ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন তাহা ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন—পৃথিবীর ধূলা মাটির অনেক উপরে তাঁহার অবস্থান।



ভবদেব ভট্ট

২৯২৫ পৃষ্ঠার পর

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সময়টা বাঙ্গলার অতীত ইতিহাসের সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবময় যুগ। এই যুগে বাঙ্গালাদেশ শিল্প, কলা, সাহিত্য ধর্ম্ম এবং শৌর্য্য-বীর্য্যে উন্নতির চরম শিখরে উঠিয়াছিল। বহু পরাক্রান্ত নরপতি, স্বদেশভক্ত বীরপুরুষ, প্রতিভাশালী কবি ও দার্শনিক, সুনিপুণ শিল্পী এবং ধর্ম্মপ্রাণ মহাপুরুষ এই যুগে এই দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালার ইতিহাসের কিন্তু এখনও শৈশবাবস্থা। আধুনিক পণ্ডিতগণের প্রাণপাত পরিশ্রমে যেটুকু ইতিহাস উদ্ধার হইয়াছে তাহা পর্য্যাপ্ত নয়। অতএব ইতিহাসের অভাবে আমাদের ঐ সকল পূর্ব্বপুরুষদিগের অনেকের, অথবা অধিকাংশেরই বিষয় আমরা প্রায় কিছুই জানি না। জানিবার উপকরণগুলি কালের স্রোতে এবং অত্যাচারীর অমানুষিক নির্ম্মমতার ফলে নষ্ট ও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, জানিব কি করিয়া? কেবল মাত্র যে সকল উপকরণগুলি মৃত্তিকাভ্যন্তরে আত্মগোপন করিয়া, অথবা অত্যাচারীর কবল হইতে দূরে থাকিয়া, কোনরূপে টিকিয়া আছে, সে গুলি অবলম্বন করিয়া জনকয়েকের সম্বন্ধে খানিকটা তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। ইঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই আবার রাজা। রাজা ব্যতীত যে দুই চারি-দশ জনের কথা জানা যায়, তন্মধ্যে ভবদেব ভট্ট অন্যতম।

এই নামে অবশ্য আরও দুই তিন জন পণ্ডিত ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের কথা এখানে বলিতেছি না। যে ভবদেব ভট্টের কথা বলিতেছি, তিনি বাঙ্গালী, এবং একাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অর্থাৎ, সে আজ আট নয় শত পূর্ব্বেকার কথা।

ভবদেব ভট্টের উপাধি দেখিয়াই বুঝা যায়, তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার একজন প্রিয় সুহৃদ ছিলেন, তিনিও 'দ্বিজ' (ব্রাহ্মণ) ছিলেন তাঁহার নাম বাচস্পতি। বাচস্পতি ছিলেন কবি। তিনি ভবদেবের বংশ পরিচয় জ্ঞাপন করিয়া এবং বহুমুখী প্রতিভা ও গুণাবলীর কথা উল্লেখ করিয়া সংস্কৃত ভাষায় তেত্রিশ'টি শ্লোকে একটি 'প্রশস্তি' লিখিয়াছিলেন। 'প্রশস্তি'টি একখানি তিন ফিট্ চওড়া পাথরে একজন শিল্পী পঁচিশ লাইনে উৎকীর্ণ

করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা অধুনা উড়িষ্যা দেশে ভুবনেশ্বরের একটি মন্দিরে সংলগ্ন রহিয়াছে। এই মন্দিরের এই পাথর খানিতে লেখা 'প্রশস্তি' হইতেই ভবদেব ভট্টের কথা প্রধানতঃ জানিতে পারি।

তিনি ছিলেন সাবর্ণ-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। তাঁহার এক পূর্ব্বপুরুষ জনৈক রাজার নিকট হইতে পশ্চিম বঙ্গের রাঢ়দেশে সিদ্ধল নামে একটি গ্রাম প্রাপ্ত হন। সেই ব্যক্তির বংশে মহাদেব, ভবদেব ও অট্টহাস নামে তিন পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। এই (প্রথম) ভবদেব বিদ্যা ও বুদ্ধিতে গণ্যমান্য হইয়া গৌড়ের কোনও রাজার নিকট হইতে হস্তিনীভট্ট নামে একটি গ্রাম প্রাপ্ত হন, এবং তাঁহার আটটি পুত্র জন্মে। জ্যেষ্ঠ রথাঙ্গ। রথাঙ্গের পুত্র অত্যঙ্গ, এবং তাঁহার পুত্র আদিদেব। আদিদেবও বড় পণ্ডিত ছিলেন, এবং তিনি পূর্ব্ববঙ্গের এক রাজার মন্ত্রী হইয়াছিলেন। আদিদেবের পুত্র গোবর্দ্ধন। তিনি বন্দ্যঘটী-কুলোদ্ভবা (অর্থাৎ বন্দ্যোপাধ্যায় বংশীয়) সাঙ্গোকা নামে এক গুণবতী ও ধর্ম্মশীলা মহিলাকে বিবাহ করেন। এই গোবর্দ্ধন ও সাঙ্গোকার পুত্রই মহাপণ্ডিত (দ্বিতীয়) ভবদেব।

ভট্ট ভবদেব যে কেবল একটি বিদ্যায় পারদর্শী বা একটি শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন, তাহা নয়। তাঁহার পাণ্ডিত্য ছিল নানা বিষয়ে। তৎকালে বাঙ্গালায় ও বিহারে বৌদ্ধদিগের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের মূলনীতিগুলি ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের মূলনীতির বিরোধী। তা ছাড়া, বুদ্ধদেবের পবিত্রধর্ম্ম এই সময় অনেকটা বিকৃতও হইয়া উঠিয়াছিল। সাধারণ বৌদ্ধগণ অনেকে ধর্ম্মের দোহাই দিয়া দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া উঠিয়াছিল। বৌদ্ধদিগকে হিন্দুরা 'পাষণ্ড' বলিয়া অভিহিত করিত। কিন্তু উহাদের দুর্নীতিকে বাধা দিয়া দেশকে রক্ষা করা ত প্রয়োজন। বাধা দিতে হইলেও যাহারা তৎকালীন ধর্ম্মাচার্য্য ছিলেন, তাঁহাদিগকে তর্ক-যুদ্ধে পরাস্ত করিতে হইবে। আবার তর্ক করিতে হইলে নিজের শাস্ত্রে যেরূপ প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি থাকা দরকার, অপর পক্ষের শাস্ত্রেও সেইরূপ ব্যুৎপত্তি না থাকিলে চলে না। কাজেই 'পাষণ্ড'দিগকে দমন করিবার জন্য, এবং বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ভবদেব ভট্টকে যত্ন পূর্ব্বক বৌদ্ধশাস্ত্রগুলি পড়িতে হইয়াছিল।

তা ছাড়া, ভবদেব হিন্দুদের সংহিতা, তন্ত্র, গণিত (অঙ্ক), জ্যোতির্বিদ্যা, হোরাশাস্ত্র (ঠিকুজী কোষ্ঠী সংক্রান্ত শাস্ত্র) ইত্যাদিতেও পারদর্শী ছিলেন। হোরাশাস্ত্র সম্বন্ধে তিনি একখানা পুস্তকও লিখিয়াছিলেন, কিন্তু সে পুস্তক এখন পাওয়া যায় না। স্মৃতিশাস্ত্রে তাঁহার পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ। স্মৃতিতে 'প্রায়শ্চিত্ত নিরূপণ' নামে তিনি একখানি গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। এই পুস্তক অনুসারে রাঢ়ী শ্রেণীর সামবেদীয় ব্রাহ্মণদের ব্রহ্মবধ প্রভৃতি নানা পাপ কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত নিরূপিত হইয়া থাকে। প্রকৃত পক্ষে, ভবদেব ভট্ট ও গুণবিষ্ণু নামে আর একজন পণ্ডিতের নিয়ম মানিয়া রাঢ়ের ব্রাহ্মণদিগের বৈদিক ক্রিয়া কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

মীমাংসা দর্শনেও ভবদেব ভট্টের প্রভূত পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁহার ন্যূনাধিক তিন শতাব্দী পূর্ব্বে ভারতবর্ষে সুপ্রসিদ্ধ মীমাংসক কুমারিলভট্টের আবির্ভাব হইয়াছিল। তিনি এমন বৌদ্ধ বিদ্বেষী ছিলেন যে, বৌদ্ধ পাষণ্ডগণের মস্তকগুলি তিনি উদূখলে চূর্ণ করিতে চাহিয়াছিলেন। কুমারিল মীমাংসা শাস্ত্রে একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহার নাম 'তন্ত্র-বার্ত্তিক'। ভবদেব ভট্ট এই তন্ত্র-বার্ত্তিকে'র একখানি পাণ্ডিত্যপূর্ণ টীকা লিখিয়াছিলেন, তাহার নাম 'তৌতাতিত-মত-তিলকম্' কারণ কুমারিলের অপর এক পরিচয় ছিল 'তৌতাতিত' নামে। এই টীকাখানি এখনও আছে।

এ সকল ব্যতীত, তিনি সকল কবিকলা, আগম ও অর্থশাস্ত্রেও ব্যুৎপন্ন ছিলেন। আর, আয়ুর্ব্বেদেও তিনি ছিলেন অভিজ্ঞ। সে কালে চিকিৎসা-ব্যবসায়ী ছাড়া অন্যান্য ব্রাহ্মণগণও আয়ুর্ব্বেদ চর্চ্চা করিতেন, ইহা তাহার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এরূপ প্রমাণ আরও ঢের আছে।

ভবদেব ভট্টের জ্ঞান-স্পৃহা কত প্রবল ছিল তাহা এত গুলি বিভিন্ন শাস্ত্রে তাঁহার পারদর্শিতা দেখিয়াই বুঝা যায়। কিন্তু তিনি কেবল মহাপণ্ডিতই ছিলেন না, পদমর্য্যাদায়ও তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট পুরুষ। তাঁহার পিতামহ আদিদেব যেমন ছিলেন পূর্ব্ববঙ্গের একজন রাজার মন্ত্রী, তিনি নিজেও ছিলেন পূর্ব্ববঙ্গের একজন পরাক্রান্ত রাজার মন্ত্রী।

সেই রাজার নাম হরিবর্ম্মদেব। ভবদেব 'প্রশস্তি'তে আছে, ভবদেবের মন্ত্রণা প্রভাবে হরিবর্ম্মদেব বহুদিন রাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন, এবং হরিবর্ম্মের অজ্ঞাতনামা পুত্রের রাজ্যও সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল।

হিন্দু স্মৃতি-শাস্ত্র অনুসারে অবশ্য রাজনীতিচর্চ্চা ব্রাহ্মণের ঠিক ধর্ম্ম নয়; কিন্তু অনেক ব্রাহ্মণই দেশের দুর্দ্দিনে দেশের কল্যাণের নিমিত্ত অথবা অর্থ ও প্রতিপত্তির মোহে রাজনীতির চর্চ্চা করিয়া গিয়াছেন। অনেক রাজবংশ জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিল, অনেক ব্রাহ্মণ সিংহাসনে উপবেশন না করিয়া মন্ত্রীত্ব করিয়া গিয়াছেন।

ভবদেব ভট্ট শুধু হরিবর্ম্মা ও তাঁহার পুত্রের পার্শ্বে বসিয়া তাঁহাদের রাজনীতি সম্বন্ধে মন্ত্রণা দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, 'প্রশস্তি'তে আছে, তিনি আয়ুর্ব্বেদ, আগম, অর্থশাস্ত্র প্রভৃতির ন্যায় অস্ত্র-বেদেও অদ্বিতীয় ছিলেন। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হইয়াও তিনি বড় একজন যোদ্ধা ছিলেন। প্রয়োজন হইলে, দেশের অথবা নিজের জন্য অস্ত্রও ধরিতে পারিতেন। এই গুণ বা প্রবৃত্তি ভবদেব বোধ হয় তাঁহার পিতার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কারণ ঐ 'প্রশস্তি'তে লেখা আছে যে, গোবর্দ্ধনও বীরস্থলীতে বিক্রম প্রকাশ করিতেন, অর্থাৎ যুদ্ধ বিগ্রহ করিতে জানিতেন।

এত উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াও এবং এত বড় পণ্ডিত হইয়াও, ভবদেব কিন্তু তাঁহার দেশের জনসাধারণের প্রতি কর্ত্তব্য বিস্মৃত হন নাই। রাঢ়দেশে জলাভাব। শ্রমমগ্ন পান্থদিগের সেখানে জলাভাবে বড়ই কষ্ট হয়। ইহা দেখিয়া ভবদেবের মন ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের কষ্ট যদি কতক পরিমাণেও মোচন হয়, এই উদ্দেশ্যে ভবদেব রাঢ় দেশে এক বৃহৎ জলাশয় খনন করাইয়া দিয়াছিলেন। পরের উপকার করিবার প্রবৃত্তি না জন্মিলে, সেই শিক্ষার দীক্ষার কিছুমাত্র সার্থকতা নাই। ভবদেব সত্যসত্যই পণ্ডিত ছিলেন, ইহাতে সংশয় কি?

তাঁহার অপর এক কীর্ত্তি, একটি মন্দির। এই মন্দির তৈয়ারি করাইয়া, তিনি তন্মধ্যে অনন্ত, নারায়ণ (বাসুদেব) ও নৃসিংহ এই তিন বৈষ্ণব দেব-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এবং মন্দিরের সম্মুখেও একটি বাপী বা জলাশয় খনন করাইয়া দিয়াছিলেন।

ভুবনেশ্বরে যে মন্দিরে ভবদেবের 'প্রশস্তি'খানি এখন সংলগ্ন রহিয়াছে, সেই মন্দিরেও এইরূপ তিনটি দেবমূর্ত্তি আছে। ভুবনেশ্বরে এইটি ছাড়া আর বৈষ্ণব মন্দির নাই। মন্দিরটি সুন্দর, এবং উহা স্থাপত্য অলঙ্কারে ও হাতী, ঘোড়া, সাপ প্রভৃতি জীবজন্তুর মূর্ত্তিতে পূর্ণ। মন্দিরের সম্মুখে একটি জলাশয়ও আছে, তাহার নাম 'বিন্দুসরোবর'।

এতদিন লোকের ধারণা ছিল, এই মন্দিরই ভবদেবের তৈয়ারী মন্দির। কিন্তু সম্প্রতি প্রকাশ পাইয়াছে যে 'প্রশস্তি'টির সহিত ঐ মন্দিরের কোনই সম্পর্ক নাই। প্রশস্তিটি আসলে ছিল অজয় নদীর ধারে অজয়গড় নামক স্থানে। জনৈক সাহেব ঐ স্থান হইতে 'প্রশস্তি'টি লইয়া যান, এবং কিছুদিন পূর্ব্বে ঘটনাচক্রে এবং ভ্রমবশতঃ ভুবনেশ্বরের ঐ মন্দিরে সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ভবদেব ভট্টের নির্ম্মিত আসল মন্দিরটি ছিল রাঢ়দেশে, সম্ভবতঃ অজয়গড়ের কাছাকাছি কোনও জায়গায়।

ভবদেব ভট্টের আর এক নাম ছিল 'বালবলভী ভুজঙ্গ' কিন্তু এই নামের প্রকৃত অর্থ কি, তাহা এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই। না হউক, বাঙ্গালাদেশে যুগে যুগে যত সুসন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ভবদেব ভট্ট তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

আমরা ভবদেব ভট্টের জীবনী হইতেও 'প্রশস্তি' হইতে সেকালের বাঙ্গালাদেশের অবস্থা অনেকটা জানিতে পারি। বাঙ্গালাদেশের প্রাচীন ইতিহাস জানিতে হইলে তোমাদের পক্ষে এই সকল মহাপুরুষদের জীবনী বেশ ভাল ভাবে পড়া উচিত।

বাঙ্গালাদেশে বর্ম্ম বংশীয়েরা যে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের তাম্রফলক হইতে জানা যায়। বর্ম্ম বংশীয়েরা বেশ প্রবল পরাক্রান্ত নৃপতি ছিলেন। কাজেই ভবদেব ভট্ট যে একজন অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহ। অসাধারণ ছিলেন বলিয়াই হরিবর্ম্মদেবের ন্যায় নৃপতির মন্ত্রীত্ব করিয়া যশোলাভ করিতে পারিয়াছিলেন।



গ্রীস—এথেনস্

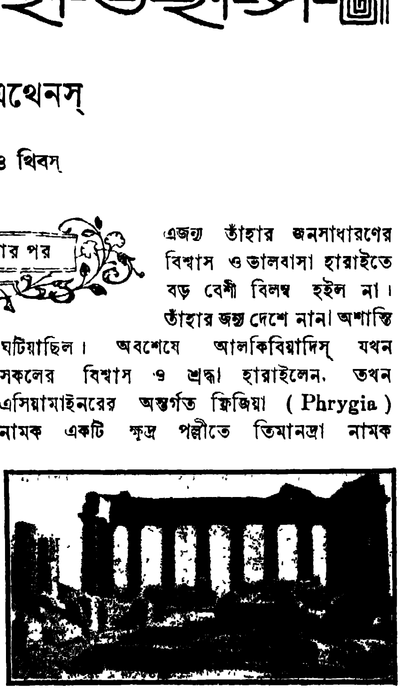
স্পার্টা ও থিবস্

২২৫৮ পৃষ্ঠার পর

পেরিক্লিসকে যখন মৃত্যু সময়ে বন্ধুরা তাঁহার কার্য্যাবলির জন্য সুখ্যাতি করিতেছিলেন, তখন তিনি ক্ষীণ স্বরে কহিয়াছিলেন—এই টুকুই আমার বিশেষ আনন্দ যে আমি এমন কোন কাজ কবি নাই যেজন্য এথেনীয়রা দুঃখ করিতে পারেন।

পেরিক্লিসের মৃত্যুর পর এথেনস ও (Athens) স্পার্টাব মধ্যে যুদ্ধ আবম্ভ হইল। এ সময়ে এথেনস্ ও স্পার্টা দুইটিই ছিল প্রধান রাজ্য, ইহাদের পবস্পরের হিংসা ও বিদ্বেষের জন্যই এইরূপ অশান্তির সৃষ্টি হইল। এক ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল, এই যুদ্ধ আটাশ বৎসরকাল পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। ইতিহাসে এই যুদ্ধ **পেলোপোনিসিয়ার** যুদ্ধ নামে পরিচিত।

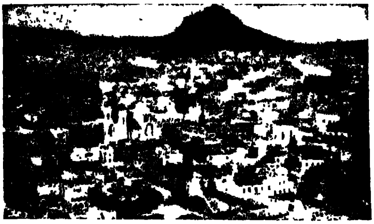
এথেনসের এই যুদ্ধ-বিগ্রহেব সময় একজন সুশ্রী যুবক বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ কবেন, তাঁহার নাম আলকিবিয়াদিস্ (Alcibiades) (৪৫০—৪০৪ খৃঃ পূঃ)। আলকিবিয়াদিস্কে এথিনীয়বা অত্যন্ত ভালবাসিতেন। এইজন্য অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি অসাধারণ ক্ষমতাশালী হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু লোকটি ছিলেন লোভী এবং অব্যবস্থিতচিত্তের, এজন্য তাঁহার জনসাধারণের বিশ্বাস ও ভালবাসা হারাইতে বড় বেশী বিলম্ব হইল না। তাঁহার জন্য দেশে নানা অশান্তি ঘটিয়াছিল। অবশেষে আলকিবিয়াদিস্ যখন সকলের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা হারাইলেন, তখন এসিয়ামাইনরের অন্তর্গত ফ্রিজিয়া (Phrygia) নামক একটি ক্ষুদ্র পল্লীতে তিমানদ্রা নামক



এথেনিয়াম্—এথেনা দেবীর মন্দির

একজন মহিলার বাড়ীতে (Temandra) বাস করিতে লাগিলেন। হতভাগ্য আলকিবিয়াদিসের শত্রুগণ তাঁহাকে মারিবার জন্য ফ্রিজিয়াতে একদল হত্যাকারী পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা তিনি যে ঘরে

বাস করিতেন সেই ঘরে আগুন জ্বালাইয়া দিল। সাহসী আলকিয়াবিয়াদিস তরবারি হস্তে শত্রুদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য বাহিরে ছুটিয়া আসিলেন, শত্রুপক্ষীয়েরা কাছে আসিল না, দূর হইতে লক্ষ্য



সাধারণ দৃশ্য—এথেনস্

করিয়া তাহার গায়ে বল্লম ছুড়িয়া মারিল। কিয়াবিয়াদিসের মৃত্যু হইল। তিমানদ্রা তাঁহার সমাধি দিল।

পেলোপোনিসিয়ার যুদ্ধে এথেনসের ভীষণ ক্ষতি হইয়াছিল। স্পার্টার লোকেরা বিজয়ের পর এথেনস নগরের প্রাচীর বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিল। এই ভাবে যখন নানা ধ্বংসের লীলা চলিতেছিল, সে সময়ে বিজয়ী স্পার্টার লোকেরা গীতে-গানে চারিদিক মুখরিত করিয়া তুলিয়াছিল। ধ্বংসের এই শোচনীয় লীলার মধ্যে তাহারা আনন্দের নানা কৌতুকপ্রদ আমোদ করিবার ব্যবস্থা করিয়া হৃদয়হীনতার পরিচয় দিতে এতটুকু কুণ্ঠিত হয় নাই।

এইবার এথেন্সের শাসনভার লইলেন ত্রিশজন (Thirty Tyrants) স্পার্টার সৈন্যাধ্যক্ষ। ইঁহারা মাত্র তিন বৎসর কাল প্রভুত্ব করেন। থ্যাসিবুলাস্ (Thrasybulus) নামে একজন স্বদেশ-প্রেমিক এথেনীয় স্পার্টার সহিত লড়াই করিয়া পুনরায় স্বাধীনতা লাভের জন্য সকলকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। যুদ্ধ হইল। যুদ্ধে বিজয় লাভ করার ফলে—দেশ সেই ত্রিশজন উৎপীড়ক শাসনকর্ত্তার হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিল। দেশের লোকেরা সেকালের রীতি অনুযায়ী জলপাই গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া একটি মালা তৈরী করিয়া থ্যাসিবুলাস্কে উপহার দিলেন। সে যুগে বীরের পক্ষে এর চেয়ে বড় সম্মান আর ছিল না। এথেনস্ আবার নানা দিক্ দিয়া সম্পদশালী হইয়া উঠিল। এবং সেই সুখৈশ্বর্য্য, সম্পদ ও স্বাধীনতা ৪০৩ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। ৩৯০ খৃঃ পূঃ অব্দে থ্যাসিবুলাস্ এথেনীয় নৌবহর লইয়া ঈজিয়ানের দিকে গিয়াছিলেন, কিন্তু এ্যাসপেনডাসের (Aspendus) লোকদের হাতে নিহত হইলেন।

থিব্‌সের যুদ্ধ

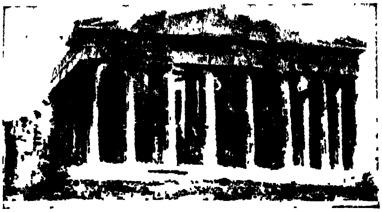
এই ঘটনার কিছু পরে গ্রীসদেশে থিবস্‌নগরী প্রসিদ্ধি লাভ করে। থিবস্ ছিল বোয়েসিয়া রাজ্যের (Boetia) রাজধানী। স্পার্টার সহিত থিবসের যুদ্ধ বাধিয়া গেল। যুদ্ধ বাধিবার কারণ ফিবিদাস্ (Phoebidas) নামে স্পার্টার একজন সেনাপতি থিবসের অধিকারভুক্ত ক্যাডমিয়া (Cadmaea) নামে একটি দুর্গ অন্যায় ভাবে অধিকার করেন।



এগোরার তোরণ—এথেনস্

থিবেরা উহা ফিরিয়া পাইবার জন্য দাবী করেন, কিন্তু স্পার্টানরা ঐ দুর্গটি বিশেষ ভাবে সুরক্ষিত করিলেন এবং কোনরূপেই থিবস্‌দের কথায় কর্ণপাত করিলেন না।

পেলোপিডাস্ (Pelopidas ৩৬৪ খৃঃ পূঃ) নামে থিবসে একজন স্বদেশ প্রাণ যুবক ছিলেন, তাঁহার পণ হইল, যেমন করিয়া হউক স্পার্টার দখল হইতে এই দুর্গ কাড়িয়া লইতেই হইবে।



পার্থিনন—এথেনস্

এই জন্য সে এক অতি সুন্দর ফন্দী আঁটিল। তাঁহার বিশ্বস্ত ও সাহসী একাদশজন বন্ধু বীর—রণসাজে সজ্জিত হইলেন, তাহারা বর্ম্মের দ্বারা পৃষ্ঠ ও বক্ষঃস্থল আবৃত করিল প্রত্যেকের হস্তে তরবারি এবং সূক্ষ্মাগ্র সুতীক্ষ্ণ বল্লম শোভা পাইল। এই রূপ রণ সজ্জার উপর তাহারা স্ত্রীলোকের ছদ্মবেশে সজ্জিত হইয়া ক্যাডমিয়া দুর্গ পুনরাধিকার করিবার জন্য অগ্রসর হইল—কেহ তাহাদিগকে সন্দেহ করিল না, তাহারা নির্ব্বিবাদে দুর্গের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিল।

সে ছিল এক উৎসবের দিন। স্পার্টার শাসন-কর্ত্তারা এবং অন্যান্য রাজকর্ম্মচারীরা উৎসবে মত্ত ছিলেন। স্পার্টার সৈন্যাধ্যক্ষ আর্কিয়াস্ (Archias) উৎসব গৃহের মধ্যস্থিত টেবিলের সম্মুখ ভাগে বসিয়া ছিলেন। আর তাঁহার বন্ধুগণ ছিলেন প্রমোদে মত্ত। এই যে গৃহের মধ্যে পেলোপিডাস্ এবং তাঁহার সহিত আরও এগার জন নারীবেশে সজ্জিত মোট বারোজন লোক প্রবেশ করিল, সেদিকে কেহ কোন লক্ষ্যই করিলেন না।

উৎসব যখন পূর্ণভাবে চলিতে আরম্ভ করিল যখন স্পাটান্‌রা প্রমোদ-বিহ্বল, সে সময়ে সহসা সেই নারীবেশধারী বীরপুরুষেরা ছদ্মবেশ খুলিয়া ফেলিলেন, উৎসবের প্রদীপ্ত আলোক-বর্ত্তিকা এথেনীয় বীরদের বক্ষঃস্থলের বর্ম্মের উপর পড়িয়া ঝকমক্ করিয়া উঠিল। দ্বাদশজন বীরের হস্তস্থিত মুক্ত তরবারি পলক মধ্যে স্পার্টার এই প্রমোদমত্ত বীরবৃন্দের উপর ভীষণভাবে নিক্ষিপ্ত হইল। আর্কিয়াস্ এবং তাঁহার সঙ্গীরা পলকমধ্যে নিহত হইলেন। এইভাবে থিবিয়রা আবাব তাহাদের দুর্গ ফিরিয়া পাইল। স্পার্টা এই আক্রমণ এই গুপ্তহত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য থিবসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। গ্রীসের অন্যান্য রাজ্য ও স্পার্টার সাহায্যের জন্য অগ্রসর হইল। অনেকেই ভাবিয়াছিলেন, বুঝি আর রক্ষা নাই, থিবসের পরাজয় সুনিশ্চিত!

সে সময় থিবসে একজন বিখ্যাত বীর ও সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন, তাঁহার নাম **এপামিনোনডাস** (Epaminondas)। সেকালে এপামিনোনডাসের ন্যায় সাহসী, রণনিপুণ এবং দক্ষ সেনাপতি সমগ্র গ্রীসেও বেশী ছিল না। যেমন ছিলেন তিনি যোদ্ধা তেমনি ছিলেন স্বদেশহিতৈষী এবং ধার্ম্মিক ব্যক্তি। গল্প আছে যে জীবনে তিনি একদিনের জন্যও একটি মিথ্যাকথা বলেন নাই। এইরূপ সত্যবাদী মানুষ যে কতবড় মহৎ তাহা তোমরা সহজেই বুঝিতে পার।

এমন যে ভালমানুষ তাহার আবার কি কোন শত্রু থাকিতে পারে, এরূপ কথা তোমরা মনে করিতে পার, কিন্তু একথা কি সব সময়েই সত্য হয়! ভাল মানুষেরও শত্রু থাকে। এপামিনোন-ডাসেরও শত্রু ছিল। থিবের অনেকেই তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতেন। আবার দেশের মধ্যে

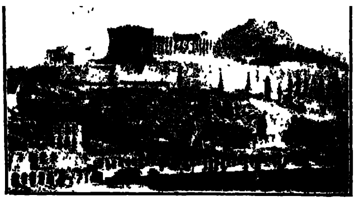


থিশিয়াম্

যাঁহারা ছিলেন প্রকৃত গুণগ্রাহী, তাঁহারা এই সাধু ও বীরপুরুষকে করিতেন পরম শ্রদ্ধা। যাহারা তাঁহার শত্রু ছিল, তাহারা এপামিনোনডাসের প্রাণ-দণ্ড যাহাতে হইতে পারে, সেইরূপ অতি ঘৃণ্য

এবং নীচ ষড়যন্ত্র করিতেও ইতস্ততঃ করেন নাই। কেন জান? কেন না তিনি সৈন্যদিগের উপর তাঁহার আধিপত্যটা বিধিমত সময়ের ও বেশী সময়ের জন্য রাখিয়াছিলেন। কিন্তু এই বীরপুরুষের মনে একমাত্র সাধু সঙ্কল্প ছিল তাঁহার স্বদেশ থিবস্‌কে ধ্বংসের পথ হইতে রক্ষা করা। কাজেই বিচারসভা বসিলে পর বিচারকেরা এপামিনোনডাসের মহৎ উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া তাঁহার প্রতি প্রাণদণ্ডের বিধান করিলেন না।

মানুষ যখন হিংসা ও বিদ্বেষের দ্বারা পরিচালিত হয়, তখন তাহার হৃদয় হইতে যাহা কিছু সদ্‌গুণ তাহা সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হয়। এই ক্ষেত্রেও হীনমনা থিবসের লোকেরা তাহাই করিল। স্বদেশের ত্রাণকর্ত্তা এই মহাপুরুষকে তাহারা



এথেনসের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ

ঝাড়ুদারদের সর্দ্দাররূপে নিযুক্ত করিলেন। এপামিনোনডাস ইহাতে দুঃখিত হইলেন না। তাঁহার মনে হইয়াছিল ইহারা আমাকে অপমান করিতে যাইয়া নিজেরাই অপমানিত হইতেছে। যে মানুষ মহৎ তাহার কাছে ছোট বড় বলিয়াত আর কোন কাজ থাকে না। ছোট কাজ হেয় কাজও মহৎ ব্যক্তির সংস্পর্শে সুন্দর ও শোভন হইয়া উঠে। এপামিনেনাডাস্ প্রফুল্ল চিত্তে এই হেয় কাজ গ্রহণ করিলেন। থিবের লোকেরা দেখিত যাঁহাকে তাহারা অপমান করিতে চাহিয়াছে, তিনি সেই অপমানের মধ্য দিয়াও তাঁহার মস্তক উন্নত করিয়া রহিয়াছেন। তাহারা দেখিত, প্রসন্ন মনে এই মহৎ ব্যক্তি রাজপথের জঞ্জাল পরিস্কার করিতেছেন। তাঁহার মুখে হাসি লাগিয়াই আছে!

যুদ্ধ তখনও শেষ হয় নাই। এপামিনোনডাস্‌কে ছাড়া যুদ্ধ বিজয় যে অসম্ভব। একদিন যিনি দেশবাসীর নির্দ্দয় আচরণে ঝাড়ু হাতে লইয়াছিলেন—আবার সেই দেশবাসীর অনুরোধেই তাঁহাকে উন্মুক্ত কৃপাণহস্তে রণরঙ্গে ঝাপাইয়া পড়িতে হইল। দেশের লোকেরা তাঁহাকে সৈন্যবাহিনীর সর্ব্বময় কর্ত্তা করিয়া দিলেন। পূর্ব্বের চেয়ে ও অধিকতর ক্ষমতা স্বেচ্ছায়ই তাঁহাকে দেওয়া হইল।

এপামিনোনডাস যতদিন থিবের সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন, ততদিন থিবস্ গ্রীসের সর্ব্বপ্রধান প্রভাবশালী রাজ্য ছিল। ম্যানটিনিয়ার (Mantinea) যুদ্ধই স্পার্টানদের সঙ্গে তাঁহার শেষ যুদ্ধ। এই যুদ্ধে থিবসের দারুণ ক্ষতি হইল। এপামিনোনডাস্ যখন একটি ব্যূহ রচনা করিয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন, সে সময়ে একজন স্পার্টার সৈনিক তাঁহার বুকে একটা বর্শা ছুড়িয়া মারিয়াছিল।

তবু যুদ্ধের বিরতি হইল না। আহত এপামিনোনডাস্‌কে ঘিরিয়া স্পার্টান ও থিবেরা যুদ্ধ করিতে লাগিল। এপামিনোনডাসের অনুগত সৈনিকেরা তাঁহাকে বহন করিয়া শিবিরে লইয়া আসিল।

এপামিনোনডাসের বক্ষস্থলে বর্শাটা বিদ্ধ অবস্থায়ই ছিল। কেন না চিকিৎসকেরা এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে বর্শাটা বুক ইহতে টানিয়া তুলিবার সময়ই তাঁহার মৃত্যু হইবে। এপামিনোনডাসের অসহ্য যন্ত্রণা হইতেছিল। সেই অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে তিনি যুদ্ধের ফলাফল জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া পড়িয়াছিলেন—কি হইল—জয়ত!

এমন সময়ে একজন দূত আসিয়া সংবাদ দিল—থিবীয়রা সম্পূর্ণরূপে স্পার্টার উপর বিজয়লাভ করিয়াছে। স্পার্টার সৈন্যরা অতি দ্রুত পলায়ন করিতেছে! থিবীয়েরা এই যুদ্ধে গৌরবজনক বিজয় লাভ করিয়াছেন। এপামিনোনডাস এই কথা শুনিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন—তবে আর কেন? এই বলিয়া নিজের হাতে বুকের ভিতর হইতে বর্শাটা টানিয়া তুলিলেন, ঝলকে ঝলকে রক্ত বাহির হইয়া স্রোতের মত বেগে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। এপামিনোনডাস্ মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িলেন। এই ঘটনা ঘটিয়াছিল আনুমানিক ৩৬৩ খৃঃ পূঃ অব্দে।

এপামিনোনডাসের পর থীবিয়রা কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় তাহাদের গৌরব রক্ষা করিতে পারে নাই।



লঙ্কাকাণ্ড

[বাঙ্গালার রূপকথা]

২৯১২ পৃষ্ঠার পর

এক গ্রামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিত, তাঁহার ছিল একটিমাত্র ছেলে আর স্ত্রী। ব্রাহ্মণ ছিল বড় গরীব অতি কষ্টে তাহার দিন চলিত। সারা দিন রাত পরিশ্রম করিয়া যা কিছু সামান্য উপার্জ্জন হইত তাহা দিয়া কোন রকমে দু'বেলা দু'টি খাবার জুটিত মাত্র।

ব্রাহ্মণের ছেলেটির বয়স যখন পাঁচ ছয় বছরের হইল, তখন তাহাকে গ্রামের পাঠশালায় লেখাপড়া শিখিবার জন্য পাঠান হইয়াছিল। কিন্তু তার পড়াশুনার দিকে মন ছিল না, সে দিন রাত শুধু খেলিয়া বেড়াইত আর দুষ্টুমি করিত। ব্রাহ্মণ এজন্য তাহাকে তাড়া করিতেন, কিন্তু যার লেখাপড়ায় একেবারেই মন নাই, তাহাকে সুধু সুধু তাড়া করিলে কি হইবে? কোন ফলই হইল না।

ব্রাহ্মণ পড়িলেন মহামুস্কিলে। তাইত কি করা যায়? এ দিকে ছেলের বয়স বাড়িল, এখন ছেলে না বলিয়া যুবক বলিলেই হয়! অনেক ভাবনা চিন্তার পর তিনি তাহাকে জ্যোতিষ শিখিতে দিলেন। জ্যোতিষ শিখিবার দিকে ছেলেটার কিছুদিন বেশ ঝোঁক দেখা গেল, মনে হইল বুঝি বা সে জ্যোতিষ শিখিয়া মস্ত বড় পণ্ডিত হইবে! কিন্তু দিন কয়েক পরে সে ফিরিয়া আসিল! না, জ্যোতিষ তাহার ভাল লাগিল না। তবে মোটামুটি সে জ্যোতিষের কিছু কিছু শিখিয়াছিল।

ব্রাহ্মণ ছেলের উপর খুব রাগিয়া গেলেন, বলিলেন,—বাপু! আর আমি তোমাকে এই বৃদ্ধ বয়সে কষ্ট করে বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াতে পারব না! দিন রাত খেটে খেটে আমার শুধু হাড়মাস সার হয়েছে, তুমি তোমার পথ দেখ।—একথা বলিয়া তিনি তাঁহার সেই মূর্খ পুত্রকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিলেন।

দুরন্ত হইলে কি হইবে, ব্রাহ্মণ যুবকের যা কিছু বিক্রম সবই ছিল এই গ্রামের মধ্যে। সে পূর্ব্বে আর কোন দিন গ্রামের বাহিরে যায় নাই। কাজেই সে কোথায় কোন্ পথে কোন্ দিকে যাইবে, তাহার কিছুই ঠিক্ করিতে পারিল না।

সে গ্রামের বাহির হইয়া পথ চলা সুরু করিল, যে দিকে দুই চোখ যায়! মাঠের পর মাঠ, বনের

পর বন, কত চষা ক্ষেত, কত খাল, বিল, নদ-নদী কত গভীর গহন পার হইয়া সে অত্যন্ত ক্লান্ত ও শ্রান্ত হইয়া এক গ্রামে আসিয়া পৌছিল। গ্রামের পাশে একখানি বাড়ী। দুপুর রোদে পরিশ্রান্ত ব্রাহ্মণ যুবক সেই বাড়ীর বাহিরের একখানি ঘরের বারান্দায় চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

বাড়ীর কর্ত্তা বাহিরে আসিতেই ব্রাহ্মণকে দেখিতে পাইলেন এবং ভক্তিভরে তাড়াতাড়ি তাহার হাত পা ধোয়ার জল দিলেন এবং তাহার রান্না-বান্নার ব্যবস্থা করিবার জন্য বাড়ীর ভিতর

গান গাইছ ঠাকুর? ব্রাহ্মণ কহিল—এই একটা রামায়ণের গান। শোন ঠাকুর আমার কাছে, রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডের একখানি পুঁথি আছে, সেখান হ'তে যদি কিছু গান গাও, তবে বেশ হয় কিন্তু? কি বল! 'বেশত', কিন্তু তুমি বাছা কি লঙ্কাকাণ্ডের গানই শুনতে চাও, না লঙ্কাকাণ্ড দেখতে চাও; বলত কি চাও? বুড়ী ভাবে গদ্ গদ্ হইয়া বলিল—কি বল ঠাকুর! আমার কি এমন বরাত জোর যে নিজের চোখে লঙ্কাকাণ্ড দেখ্‌বো! দেবতা কি তেমন দয়া করবেন? আহা! সে



অগ্নিতে পুড়িয়া পড়ে বড় বড় ঘর

নন। এদিকে ব্রাহ্মণ বিশ্রাম করিবার হইয়া বেশ আরামে তামাক টানিয়া যতটা খেয়ে কাছেই একটি পুকুর, টল টল বাড়ে। তেল ফেললে পেরমায়ু বাড়ে সত্যি? বেশ

হাঁ ঠাকুর সত্যি! বুড়ীর মুখে যেমন সে ঐ কথা শুনিল অমনি গাছের একটা ডাল ভাঙ্গিয়া লইয়া তাহার দ্বারা বুড়ীর যে তিনটী হাঁড়ী ভরা তেল ছিল, সেই তিনটী হাঁড়ী ভাঙ্গিয়া ফেলিল। একেবারে ঘাটের সিঁড়ি বাহিয়া তেলের বন্যা ছুটিল।

বুড়ী ভয়ানক রাগিল। হতভাগা বামুন, মরণ হয়না তোমার! আমার তেলের বাড়ীর ভিতর হইতে

সে কথা ছেড়ে দাও। তুমি একবার হাঁ কি না স্বধু এই কথাই বল না গা?

বুড়ী ব্রাহ্মণের পায়ের ধুলো লইয়া বলিল—হাঁ ঠাকুর! আমি লঙ্কাকাণ্ডই দেখবো। আমার সাত কহিল,—ভাই আমাকে একটু মাদের গাঁয়ে এসেছ, পান খেয়ে এখনি ফিরে আস্‌ছি।

সে পানওয়ালার কাছে যাইয়া কহিল—দেখ ভেইয়া আমাকে তোর বহুৎ ভাল বুঝলে ভেইয়া স্বগন্ধি দু' টা পান খানেকো দেও।

পানওয়ালা গেল ভয়ানক রাগিয়া, সে কহিল—দু' কড়ি দিয়ে এসেছ পান কিনতে? শোন এক কাজ করো ঠাকুর, যদি কারো পান খেয়ে ঠোঁট রাঙ্গা করেছে দেখতে পাও, তাহলে তার মুখে

দুই

এদিকে ব্রাহ্মণ খুব ভাল করিয়া রান্না বান্না করিয়া পেট ভরিয়া খাওয়া দাওয়া করিল। তারপর সে বানরের ল্যাজে যত রাজ্যের ছেঁড়া নেকড়া, খর কুটো সব জড় করিয়া সেগুলিকে তৈলসিক্ত করিয়া খুব শক্ত করিয়া বাঁধিয়া দিল। পরে সে বানরের ল্যাজে ধরাইয়া দিল আগুন।

বেচারী বানর! সে আগুনের জ্বালায় যন্ত্রণায় একেবারে পাগলের মত হইয়া লাফালাফি ছুটাছুটি করিতে করিতে গ্রামের কুঁড়ে ঘর গুলির খড়ে ছাওয়া চালে চালে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল! দেখিতে দেখিতে গ্রামের ঘরে ঘরে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। আর ব্রাহ্মণ একটু দূরে মাঠের মধ্যে নিরাপদ স্থানে যাইয়া এক বট গাছের তলায় বসিয়া লঙ্কাকাণ্ডের গান সুরু করিল :—

এইরূপে দুর্জ্জয় বানর কোটি কোটি।
সন্ধ্যাকালে লক্ষ লক্ষ জ্বালিল দেউটি॥
একেক বানর লয় দুই দুই মশাল।
অগ্নি দিয়া পোড়ায় লঙ্কার প্রতি চাল॥
অগ্নিতে পুড়িয়া পড়ে বড় বড় ঘর।
পরিত্রাহি ডাক ছাড়ে লঙ্কার ভিতর॥

আগুনের শিখা লক্ লক্ করিয়া জ্বলিতেছে ঘর, বাড়ী পুড়িতেছে ধোঁয়ায় চারিদিক অন্ধকার করিয়া ফেলিতেছে, গ্রামের লোকে হাহাকার করিতেছে। ব্রাহ্মণও মহাআনন্দে ক্রমশঃ দাঁড়াইয়া তখনও নাচিতে নাচিতে লঙ্কাকাণ্ড গাহিতে লাগিল।

সেই গ্রামের বাড়ী ঘর ত সব পুড়িয়া ছারখার হইয়া গেল। গ্রামের লোকেরা এক যায়গায় জড় হইয়া খোঁজ লইতে আরম্ভ করিল, কি ভাবে কেমন করিয়া এই সর্ব্বনাশ হইল বুড়ীত ভাব-নাই ... ব্রাহ্মণ তাহাকে এম...

কি করেছ? সারাখানি গ্রাম পুড়িয়ে ছারখার করে দিলে আবার বল্‌ছো কি করেছি।

'—কোন অন্যায় করিনিত, বুড়ী লঙ্কাকাণ্ড দেখতে চেয়েছিল, তাকে লঙ্কাকাণ্ড দেখিয়ে দিলুম। লঙ্কাকাণ্ড ত লঙ্কাকাণ্ডই হ'বে। সে আর অমনি হয় না।

গ্রামের লোকেরা দেখিল এই ব্রাহ্মণের সঙ্গে মিছামিছি তর্ক করিয়া কোন লাভ নাই। তাহারা ঠাকুরকে শক্ত করিয়া ধরিয়া বলিল—"চল ঠাকুর আমাদের সঙ্গে তোমায় রাজবাড়ী যেতে হবে!"

ব্রাহ্মণ হাসিয়া কহিল—সে ত ভালকথা। চল। গ্রামের লোকেরা ব্রাহ্মণকে লইয়া রাজবাড়ীর দিকে চলিল।

তিন

গ্রাম হইতে রাজধানী অনেক দূরে। সকলে চলিতে চলিতে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ব্রাহ্মণ যাইতে যাইতে পথে একটি কড়ি কুড়াইয়া পাইয়াছিল। সেটি সে আঁচলে বাঁধিয়া লইল অনেক পথ চলিবার পরে তাহারা সকলে ... আমবাগানের কাছে আসিয়া বিশ্রাম করিতে বা... সেখানে ছিল একটি পুকুর। পুকুরের উঁচু... ছিল আমবাগান, বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া বহি... কাজেই গ্রামের লোকদের এ যায়গাটি বেশ ...জনক মনে হইয়াছিল, এজন্য কেহ শুই... বসিয়া, কেহ অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় থাকি... করিতে লাগিল। এমন সময়ে ব্রা... মোড়লকে কহিল—ভাই, আমাকে ... দাও, আমি পুকুরের জলে নেয়ে আসি।

মাত্র আছে, কড়ির দামে যতটুকু তেল হয় তাই দাও না।

বুড়ি দেখিল ব্রাহ্মণের কাছে সত্য সত্যই একটি কড়ি ছাড়া আর কিছুই নেই, কাজেই সে সামান্য একটু তেল দিল, ঐ তেল টুকু দিবার সময় তার অনেকটাই তেল মাটিতে পড়িয়া গেল। ব্রাহ্মণ করুণ সুরে কহিল, তাইত বুড়ী দিদি! অনেকটা তেল যে মাটিতে ফেলে দিলে।

তা ফেলেছি, বেশ করেছি।

জান, ঠাকুর তেল ফেললে কি হয়?

কি হয় বুড়ী দিদি?



এক কড়ির তেল দেওনা?

যতটা তেল মাটিতে পড়ে, ততটা পরমায়ু বাড়ে। তেল ফেললে পেরমায়ু বাড়ে সত্যি?

হাঁ ঠাকুর সত্যি! বুড়ীর মুখে যেমন সে ঐ কথা শুনিল অমনি গাছের একটা ডাল ভাঙ্গিয়া লইয়া তাহার দ্বারা বুড়ীর যে তিনটী হাঁড়ী ভরা তেল ছিল, সেই তিনটী হাঁড়ী ভাঙ্গিয়া ফেলিল। একেবারে ঘাটের সিঁড়ি বাহিয়া তেলের বন্যা ছুটিল।

বুড়ী ভয়ানক রাগিল। হতভাগা বামুন, মরণ হয়না তোমার! আমার তেলের হাঁড়ী ভাঙ্গলে কেন?

ব্রাহ্মণ নির্ভীক ভাবে কহিল—সামান্য একটু তেল পড়ায় তুমি বলেছিলে বুড়ী দিদি, তেল পড়লে পেরমায়ু বাড়ে। ব্রাহ্মণ হাসিয়া কহিল—তাইত তেলের হাঁড়ি ভাঙ্গলুম। অনেক তেল পড়েছে—বুঝলে বুড়ী দিদি অনেক অনেক পেরমায়ু বাড়বে তোমার।

—তোমার রাগ করাটা কিন্তু ঠিক্ হল না বুড়ী দি!

বুড়ী হাত-পা নাডাচাড়া দিয়া মুখ ভেঙ্গচাইয়া রাগে গর্‌গর্ করিতে করিতে কহিল,—রেখে দে তোর পেরমায়ু। পোড়ারমুখো বামুন—চল্ রাজবাড়ী। তোকে আচ্ছা সাজা দেওয়াব আজ।

কিছুই যেন সে অন্যায় করে নাই, বামুন তেমনি নির্ব্বিকার ভাব দেখাইয়া কহিল—বেশত চল না।

এইবার দলটী বেশ ভারি হইল। আবার তাহারা পথ চলা সুরু করিল।

চার

চলিতে চলিতে পথের এক ধারে দুইটী কড়ি পড়িয়া আছে দেখিতে পাইয়া ব্রাহ্মণ এই-বারও তাহা সংগ্রহ করিয়া লইল। অনেকটা পথ চলিয়া তাহারা একটা গ্রামের কাছে আসিল। ব্রাহ্মণ দেখিল, সেখানে একটা হিন্দুস্থানী পানওয়ালা পান বেচিতেছে। ব্রাহ্মণ সঙ্গীদের কহিল,—ভাই আমাকে একটু ছেড়ে দাও, আমি পান খেয়ে এখনি ফিরে আস্‌ছি।

সে পানওয়ালার কাছে যাইয়া কহিল—দেখ ভেইয়া আমাকে তোর বহুৎ ভাল বুঝলে ভেইয়া সুগন্ধি দু'টা পান খানেকো দেও।

পানওয়ালা গেল ভয়ানক রাগিয়া, সে কহিল—দু' কড়ি দিয়ে এসেছ পান কিনতে? শোন এক কাজ করো ঠাকুর, যদি কারো পান খেয়ে ঠোঁট রাঙ্গা করেছে দেখতে পাও, তাহলে তার মুখে

মুখ ঘসে এস বুঝলে—এদিকে পানওয়ালা নিজেই পান খেয়ে দিব্যি ঠোঁট রাঙ্গা করিয়া বসিয়াছিল। ব্রাহ্মণ তাহার দোকানে উঠিয়া সব জিনিষ পত্র পান তৈরীর সাজ-সরঞ্জাম ওলট পালট করিয়া মুখ ঘসিতে অগ্রসর হইল—

—একি! ঠাকুর! একি করলে!—

তুমি যেমন বলেছিলে তাই করতে চাইছি—

—তবে রে দুষ্ট বামুন চল রাজার বাড়ী যাই, তোমার বিচার হবে, আচ্ছা সাজা দেওয়াব।

এইবার সেই গ্রামের লোকেরা, তেলওয়ালী বুড়ী আর এই হিন্দুস্থানী পানওয়ালা তিনদল ব্রাহ্মণকে লইয়া রাজবাড়ীতে চলিল।

পাঁচ

এই দলটী যখন আসিয়া রাজবাড়ী পৌঁছিল, তখন প্রায় বেলা শেষ হইয়া আসিয়াছে। রাজা মহাশয় দরবার ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছিলেন। কিন্তু দূর হইতে একদল বিচারপ্রার্থী আসিয়াছে দেখিয়া আবার আসন গ্রহণ করিলেন। তিনদলের নালিশ শুনিয়া রাজা বামুনকে শূলে দেওয়ার আদেশ দিলেন। সন্ধ্যা হইয়াছিল, কাজেই বামুনকে সে দিন আর শূলে দেওয়া হইল না। রাত্রির মত তাহাকে শূলদণ্ডের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিবার জন্য প্রহরীদের হুকুম দিলেন। প্রহরীরা রাজার হুকুমে ব্রাহ্মণকে শূলদণ্ডের সহিত বাঁধিয়া রাখিয়া আসিল।

ব্রাহ্মণের এইবার মনে মনে একটু অনুতাপ হইল। তাইত, কেনই বা আমি লঙ্কাকাণ্ড দেখাতে গেলাম, কেনই বা বুড়ীর তেলের হাঁড়ি ভাঙ্গলাম আর কেনই বা পানওয়ালার দোকান নষ্ট করলাম। এইবার তার ফল ভোগ করব। অদৃষ্টে যা লেখা আছে তাই হবে।

সেদিন ছিল জ্যোছনা রাত্রি। চারিদিক বেশ পরিষ্কার দেখা যাইতেছিল। এমন সময় সে পথ দিয়ে একজন কুজো লোক যাইতেছিল। ব্রাহ্মণ তাহাকে দেখিয়া আনন্দে চীৎকার করিয়া বলিল,—কুজো ভাই, কুজো ভাই, একটা কথা শুনে যাও।

কুজো লোকটী কাছে আসিলে ব্রাহ্মণ কহিল—দেখত ভাই একবার আমার পিঠটায় হাত দিয়ে, আমার কুজটা কি এখনও আছে; না মিলিয়ে গেছে?

কুজো ব্রাহ্মণের পিঠটায় বেশ ভাল করিয়া হাত দিয়া দেখিয়া কহিল, না ভাই কুজের ত কোন চিহ্ন নেই, একেবারে সব সমান। তখন ব্রাহ্মণ মহানন্দে কহিল, তাই রক্ষা পেলাম। কি বলবো ভাই তোমায়, আমার পিঠের উপর ছিল মস্ত বড় একটি কুজ। কিন্তু কি আশ্চর্য্যের কথা, যেমন



—একি ঠাকুর! এ কি করলে?

এই শূলদণ্ডের সঙ্গে কুজটাকে বেধে দিলাম, ব্যাস্ একেবারে বেমালুম হয়ে গেল!

কুজো লোকটী আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, বল কি?

আর বলাবলি নেই ভাই, হাতে হাতে ফল।

তখন কুজো বলিল—তবে ভাই আমাকে এই শূলের সঙ্গে বেঁধে দাও। আমি এই কুজের জ্বালায় অস্থির হয়ে পড়েছি। কোথাও যেতে পারিনে। লোকে ঠাট্টা করে। কি যে কষ্ট তুমিত জান তাই। যদি কুজটা তোমার মত একেবারে সেরে যায়, তবে কিন্তু বেশ হবে, কি বল?

ব্রাহ্মণ বলিল—তা হলে আমার বাঁধন খুলে ফেল।

কুজো ব্রাহ্মণের বাঁধন খুলিয়া ফেলিল।

তখন ব্রাহ্মণ কুজোকে বেশ শক্ত করিয়া শূলদণ্ডের সহিত বাঁধিয়া দিয়া একেবারে ভোঁ দৌড়।

দৌড়াইতে দৌড়াইতে ব্রাহ্মণ এক মালিনীর বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। মালিনীকে সে কহিল—তুমি আমার মাসী। আমি তোমার অনেক উপকার করব—বড় মানুষ বানিয়ে দেবো। আমি সুধু তোমার কাছে আশ্রয় চাই। আর একটা প্রতিশ্রুতি আমায় দিতে হবে কারুর কাছে আমার কোন কথা বল্‌তে পাবে না। তুমি রোজ রাজধানীর সব সংবাদ আমায় এনে দেবে।

মালিনী কহিল—আচ্ছা বাবা। সে ভাবনা তোমার নেই। তুমি নিশ্চিন্ত মনে এখানে থাক।

ছয়

পরের দিন রাজা ও তাহার সভাসদদল মন্ত্রী, কোতোয়াল এরা সব মশানে শূলদণ্ডের কাছে আসিয়া দেখিলেন ব্রাহ্মণের বদলে সেখানে এক কুজো বাঁধা রহিয়াছে। রাজা ও তাহার সঙ্গের লোকেরা ত অবাক্। একি, আশ্চর্য্য ঘটনা?

রাজা, কুজোকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি কি করে এখানে এলে?

কুজো যেমন যেমন ঘটিয়াছিল, সেই সব কথা বলিল। রাজা বলিলেন—সাবাস্! এত যে সে চতুর লোক নয়! ভয়ানক দুষ্ট লোক! তিনি কোতোয়ালকে বলিলেন—যেমন করে পার, এ লোকটাকে ধর। কোতোয়াল কহিল, নিশ্চয় সে এখানে রয়েছে। রাজ্য ছেড়ে ত আর পালায়নি! আমি দুই দিনের ভিতর তাকে ধরে এনে হাজির করবো মহারাজ।—বেচারা কুজোকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল।

মালিনী নিত্য রাজবাড়ীতে ফুল যোগাইত। সে রাজবাড়ীর ভিতর হইতে সব কথা জানিয়া আসিল আর সে মশানের পথে ফিরিবার সময় যে সব কথা শুনিয়া আসিয়াছিল তাড়াতাড়ি বাড়ী আসিয়া সে সব কথা ব্রাহ্মণকে বলিল। এদিকে ব্রাহ্মণ মালিনীর কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া আরও জানিতে পারিল যে কোতোয়ালের একটী মেয়ে আছে, কিন্তু সেই মেয়ের স্বামী নিরুদ্দেশ। ব্রাহ্মণের মাথায় তখনি এক বুদ্ধি খেলিয়া গেল সে কোতোয়ালের বাড়ীর একজন দাসীকে দিয়া সংবাদ পাঠাইল যে নিরুদ্দিষ্ট জামাতা আসিয়াছে।

এই সংবাদ শুনিয়া কোতোয়ালের বাড়ীর মেয়েদের সকলের মনেই খুব আনন্দ হইল। খানিক পরে সেই দাসী, ব্রাহ্মণবেশী জামাতাকে নিতে আসিলে, সে বলিয়া পাঠাইল যে আমার শরীর ভাল নাই খাওয়া দাওয়ার কোন ব্যবস্থা করিতে হইবে না, আমি যাইয়াই শুইয়া থাকিব।

রাত্রি হইলে ব্রাহ্মণ কোতোয়ালের বাড়ী যাইয়া বরাবর শোবার ঘরে চলিয়া গেল এবং সেখানে যাইয়া প্রদীপটী নিবাইয়া দিয়া কোতোয়ালের মেয়েকে কহিল—তাইত আজ কাল বড় চোরের বাড়াবাড়ি হয়েছে, তোমার গায়ের অলঙ্কারগুলি আমার কাছে দাও, আমি নিরাপদ স্থানে রেখে দি।

সরলা বালিকা কোনও সন্দেহ না করিয়া তাহাই করিল। তারপর কোতোয়ালের মেয়ে যখন গাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত, তখন ব্রাহ্মণ সেই অলঙ্কারের পুট্‌লিটী নিয়া চুপি চুপি সে বাড়ীর বাহির হইল এবং রাস্তা দিয়া এক ভোঁ দৌড়ে একেবারে মালিনীর বাড়ী আসিয়া মালিনীর হাতে গহনার পুট্‌লিটী দিয়া বলিল—এইবার কোতোয়াল আমায় ধরবার জন্য ছুটবে, বুঝতেই পার মাসী চুরীর খবরটা ত আর গোপন থাকবে না।

পরের দিন সকাল বেলা, কোতোয়াল বাড়ী আসিয়া সব কথা শুনিল। সে তৎক্ষণাৎ রাজার কাছে গিয়া সব কথা বলিল। রাজা শুনিয়া বলিলেন—যে ভাবে যে করেই পার এই দুষ্ট লোকটাকে ধর।

কোতোয়াল চারিদিকে প্রহরী পাঠাইয়া দিল, যদি এমন চতুর চোরকে ধরা যায়। যে ভাবে যেখানেই পার, তাকে ধরা চাই, এই আদেশে রাজধানী জুড়িয়া সাড়া পড়িয়া গেল।

শোন এইবার বামুনের কথা! সে গলায় রুদ্রাক্ষের মালা পড়িল, মাথার চুলে ভস্ম মাখিল, কপালে রক্ত চন্দনের ফোঁটা দিল, লালবর্ণের কাপড় পরিল এবং এক হাতে একটা ত্রিশূল এবং অপর হাতে একটা চিমটা ও বাঘছাল পরিয়া—চলিল কোতোয়ালের বাড়ী।

কোতোয়ালের বাড়ী আসিয়া ঘন ঘন বম্ বম্ হর হর শব্দ করিতে লাগিল। কোতোয়ালের বাড়ীর মেয়েরা সাধুকে দেখিয়া তাহাকে খুব যত্নের সহিত বসিবার ব্যবস্থা করিয়া দিল। বাড়ীর মেয়েরা, একজনের পর একজন আসিয়া তাহাকে প্রণাম করিতে লাগিল। কেহ চাহিল রোগ আরোগ্যের জন্য কবচ। কেহ বা চাহিল ঔষধ এসব কত কি যে বলিয়া উঠা কঠিন। কোতোয়ালের স্ত্রী এবং তাহার এক ভাইয়ের স্ত্রীও সে দলে ছিল।

কোতোয়ালের স্ত্রী আর তাহার ভাইয়ের স্ত্রীর মাথার চুলগুলি যেমন ছিল ছোট, আর তেমন ছিল পাকা, একেবারে সাদা হইয়া গিয়াছিল। তাহারা দুইজনে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিয়া কহিল—ঠাকুর, আপনি আমাদের মাথার চুলের কি কোন একটা ব্যবস্থা করিতে পারেন?

সন্ন্যাসী কহিলেন—হর হর বম্ বম্ আমি গুরুর কৃপায় কি না জানি বলত? তোমরা এক কাজ কর, ঐ যে তোমাদের বাড়ীর কাছে বাগানের ভিতরকার পুকুরটা দেখতে পাচ্ছ, তোমাদের মাথা মুড়িয়ে সে পুকুরের জলে ডুব দিলে পর অমনি অতি চমৎকার কালো চুল গজাবে, সে চুল একেবারে হাঁটু পর্য্যন্ত ঝুলে পড়বে।

এ কথা শুনিয়া দুইজন স্ত্রীলোকই আনন্দে চীৎকার করিয়া কহিল—বল কি ঠাকুর! বল কি ঠাকুর! সত্যি তাই হবে?

হবে না! এ বাবা বদ্যিনাথের বর!

যেমন বলা, অমনি তারা দুইজনে মাথা নেড়া করিয়া ফেলিল এবং পরে বলিল, চল ঠাকুর সে পুকুরের কাছে। সাধুও বম্ বম্ শব্দ করিতে করিতে তাহাদের সঙ্গে চলিল। এবং পুকুর পাড়ে যাইয়া একটা পূজা করিয়া বিড় বিড় করিয়া কতকগুলি মন্ত্র পড়িতে লাগিল তার কি ছাই কোন অর্থ আছে? সাধু পড়িতে লাগিল—ওঁ দক্ষিণাকালিং ফট ফটাং মাথায় চুল উঠাং ইদং চক্রং লিখিত্বাং ফট ফটাং এই মন্ত্র পড়িয়া তাহাদের মাথায় জপ করিয়া ব্রাহ্মণ বলিল—এইবার পুকুরের জলে নাম। পুকুরের জলে নামিলে পর, সাধু কহিল, দেখ যে যত বেশীক্ষণ, জলের ভিতর মাথা ডুবিয়ে রাখতে পারবে তার মাথায় তত বেশী চুল গজাবে বুঝেছ ত?

তাহারা মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

কোতোয়ালের স্ত্রী ও তাহার ভাজ দুইজন সাধুর আজ্ঞা পালন করিল। এদিকে যেমন তারা জলের ভিতর মাথা ডুবাইয়াছে, সেই সুযোগে সাধু একদৌড়ে মালিনীর বাড়ী যাইয়া হাজির হইল।

স্ত্রীলোক দুটি যতক্ষণ সম্ভব জলের ভিতর মাথা ডুবাইয়াছিল, পরে মাথা তুলিয়া দেখিল মাথায় একগাছিও চুল গজায় নাই,—সারা মাথায় জোঁক কিলবিল করিতেছে। সে কি যন্ত্রণা! সারা মাথা বহিয়া গা বহিয়া রক্ত ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। তাহারা কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ী যাইয়া হাজির হইল। আর নিজেদের নির্বুদ্ধিতার জন্য ধিক্কার দিতে লাগিল।

সাত

রাত্রিবেলা কোতোয়াল বাড়ী ফিরিয়া সব কথা শুনিয়া একেবারে হতভম্ব হইয়া পড়িল। লোকটাত চালাক ও কম ধূর্ত্ত নয়, একেবারে তার বাড়ীতেই কিনা এমনধারা অত্যাচার। বাঘের বাড়ী ঘোগের বাসা। কোতোয়াল তৎক্ষণাৎ যাইয়া রাজাকে তাহার সে দিনকার দুঃখের কথা বলিলেন। রাজা শুনিয়া বলিলেন এ যেমন তেমন লোক নয় একে ধরিতে হইলে জ্যোতিষীর পরামর্শ নিতে হবে।

রাজবাড়ীর জ্যোতিষী আসিলেন। রাজার কথায় জ্যোতিষী বলিলেন—সে লোকটা এখন মালিনীর বাড়ী বসে পাশা খেলছে।

সেখানে কয়জন লোক আছে?

জ্যোতিষী বলিলেন—চারজন।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—সে কি ভাবে কোন্ দিকে বসে আছে?

আজ্ঞে পশ্চিম দিকের কোণে।

ব্যস্! আর যায় কোথায়? জ্যোতিষীকে রাজা বসাইয়া রাখিলেন। কোতোয়াল দলবল লইয়া চোর ধরিতে গেল। তোমরা জান যে সেই ব্রাহ্মণ কিছু জ্যোতিষী জানিত, সে গণনা করিয়া দেখিল যে তাহার আর রক্ষা নাই। চতুর ব্রাহ্মণ যেখানে বসিয়াছিল, সেই ঠাঁই বদল করিয়া আর এক কোণে যাইয়া বসিল।

কোতোয়াল যাহাকে ধরিয়া আনিল সে রাজার এক মন্ত্রীর ছেলে। কাজেই জ্যোতিষীর বিদ্যা আর

ফলিল না। এই ভাবে আরও তিনবার জ্যোতিষী গণনা করিলেন কিন্তু তিনবারই হইল তাহার ভুল। তখন রাজা জ্যোতিষীকে গালমন্দ দিয়া রাজবাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিলেন।

রাজা মহাভাবনায় পড়িলেন। তাইত! একটা সামান্য লোক একেবারে রাজধানীর সকলকে নাকাল করিয়া তুলিতেছে। আশ্চর্য্যত! তিনি মনে মনে স্থির করিলেন—নিজেই চোর ধরিতে যাইবেন। কিন্তু কথাটা কাহাকেও বলিলেন না। সে রাত্রিতে রাজা ঢাল তলোয়ার লইয়া ঘোড়ায়-চড়িয়া রাজবেশে চোর ধরিতে বাহির হইলেন।

আট

গভীর রাত্রি। রাজপথে বাহির হইয়া কোথাও একটি জনপ্রাণীকেও দেখিতে পাইলেন না। শেষ-



বেল গাছের তলায় একজন সন্ন্যাসী

টায় বেড়াইতে বেড়াইতে তিনি রাজধানীর বাহিরে আসিলেন। দেখিলেন মাঠের মধ্যে রাস্তার পাশে একটা আলো জ্বলিতেছে। রাজা কাছে যাইয়া দেখিলেন কতকগুলি বেলগাছের নীচে একজন সন্ন্যাসী বসিয়া আছেন, তাঁহার সারা গায়ে ভস্ম মাখা, পা পর্য্যন্ত জটা লোটাইয়া পড়িয়াছে, সামনে একটা অগ্নিকুণ্ড, সেই অগ্নিকুণ্ডের পাশে কতকগুলি দেবমূর্ত্তি সেইগুলি তিনি পূজা করিতেছেন।

রাজার সন্ন্যাসীকে দেখিয়া ভক্তি হইল। সত্যি কথাইত! সাধু-সন্ন্যাসীরাত আর মিথ্যাকথা বলিবেন না। তাই ঘোড়া হইতে নামিয়া সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—সন্ন্যাসী ঠাকুর! এই পথে কি আপনি কোন লোককে যেতে দেখেছেন? সন্ন্যাসী কহিলেন—হাঁ মহারাজ—! আমি জানি যে সম্প্রতি আপনার রাজধানীতে একটা লোক বড় উৎপাত কচ্ছে! আমি সবই জানি, মহারাজ।

আপনি কি তাকে দেখেছেন?

আমি, না? কি করে দেখব? ধ্যানে সব জান্‌তে পারি কি না!

তা হলে সেই চোরটাকে কি ধরা অসম্ভব?

অসম্ভব কেন? আপনি তাকে ধরতে পারবেন। ঐ যে পশ্চিম দিকে তালগাছ দু'টো দেখা যাচ্ছে, সে ঐ গাঁয়ের দিকে গিয়েছে। এখনি যান, দেরী করবেন না। রাজা আর একটিও কথা না বলিয়া অমনি ঘোড়ার পিঠে চাপিয়া সেই অজানা গাঁয়ের দিকে ছুটিলেন। কোথায় সে চোর? রাজা ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন—কোথায় ঠাকুর? ওদিকেত কোন লোককে দেখতে পেলুম না! সন্ন্যাসী কহিল, তাইত, তুমিও চলে গেলে মহারাজ, আবার তাকে দেখলাম ঐ পূব মুখো ঐ যে দূরে বিলের জল রূপার মত নাচছে, সেই দিকে যেতে! এবার তাকে ধরতে পারবে।

রাজা আবার সে দিকে ঘোড়া ছুটাইলেন। কিন্তু কোথায় সে চোর? রাজা ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, ঠাকুর, কোথাও কাকে ত দেখতে পেলুম না। আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

সন্ন্যাসী কহিল—কি করবে বল, আমি এখন তোমার রাজধানীতে বাস কচ্ছি তাই, নইলে আমার কি এ সকলের দিকে লক্ষ্য করা উচিত। তবে দেখ একটা কাজ করলে মন্দ হয় না।

রাজা বলিলেন—কি কাজ।

তেমন কিছু নয়, আমি চোরটাকে ধরতে যেতে পারি, যদি তুমি এখানে বসে থাক। আমার দেবতার কোন ক্ষতি না হয়। রাজা অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, হাসিয়া বলিলেন—কি করতে হবে বলুন।

তুমি আমার পোষাক নাও, আর আমি তোমার পোষাক পরে অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে যাই, তা হ'লেই চোর ধরা যাবে। রাজার শরীরের অবস্থা তখন এমন শোচনীয় হইয়াছিল যে তিনি আর কোনও আপত্তি করিলেন না। রাজা হইলেন সন্ন্যাসী, আর সন্ন্যাসী হইলেন রাজা। সন্ন্যাসী রাজা হইয়াই তাঁহার ঘোড়া ছুটাইয়া দিলেন রাজধানীর দিকে।

নয়

রাজাকে দেখিয়া রাজবাড়ীর প্রহরীরা তাঁহাকে নমস্কার করিয়া পথ ছাড়িয়া দিল। সন্ন্যাসী রাজা কোন কথা না বলিয়া বরাবর রাজবাড়ীতে চলিয়া গেলেন এবং রাণীর ঘরে যাইয়া দেখিলেন, রাণী ঘুমাইয়া আছেন। তাড়াতাড়ি রাণীকে ডাকিয়া রাজপুত্রবেশী সাধু বলিল—শোন রাণী! রাজধানীতে বড় চোরের উপদ্রব হয়েছে, তোমার গায়ের অলঙ্কারগুলি দাও দেখি! রাণী আধ ঘুম আধ জাগরণের মধ্যে ব্যাকুল ভাবে তাড়াতাড়ি অলঙ্কারগুলি গা হইতে খুলিয়া ছদ্মবেশী রাজার হাতে দিলেন। রাণীর অলঙ্কারগুলি হাতে করিয়া সন্ন্যাসী তোরণের কাছে আসিয়া প্রহরীদের বলিলেন—সাবধান! আজ কাকেও রাজবাড়ীর ভিতর ঢুকতে দিবে না। যদি কেউ আসে তাকে হাজতে রেখে দিবে। আমার হুকুম—কাল সকালে হাজির করো।

প্রহরীরা মাথা নত করিয়া কহিল—যে আদেশ মহারাজ! দুষ্ট ব্রাহ্মণ মালিনীর বাড়ীর কাছে আসিয়া ঘোড়াটিকে ছাড়িয়া দিলেন। আর রাণীর গায়ের অলঙ্কারগুলি মালিনীর হাতে দিলেন। মালিনীত আনন্দে অস্থির।

এদিকে রাজামহাশয় অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিয়াও যখন দেখিলেন সন্ন্যাসী ফিরিতেছেন না। তখন তাঁহার মনে কেমন সন্দেহ হইল, তিনি রাজবাড়ীর দিকে চলিলেন।

রাজা যেমন ফটকের কাছে আসিয়াছেন, অমনি প্রহরী বলিল—কে তুমি?

রাজা বলিলেন—আমি রাজা!

প্রহরী তাহাকে শক্ত করিয়া ধরিয়া কহিল, হাঁ, রাজা না বাদশা। ওরে বেটাকে হাজতে নিয়ে রাখ্। তারপর কহিল এই ত রাজামহাশয় খানিকক্ষণ আগে রাজপুরী থেকে বেরিয়ে গেলেন।

প্রধান প্রহরীর আদেশে সকলে ধর-পাকড় করিয়া রাজাকে হাজতে বন্দী করিয়া রাখিল।



এই ত খানিকক্ষণ আগে রাজামহাশয় চলে গেলেন

রাজা ত অবাক্! তবে কি সেই সন্ন্যাসী ঠাকুরের এই কাজ!

ছদ্মবেশী রাজা হুকুম দিয়াছিল যে পরদিন বন্দীকে বিচারের জন্য দরবারে আনিতে হইবে। তাই প্রধান প্রহরী হাজতের দরজা খুলিয়া দেখিল, কাল রাত্রিতে যাহাকে তাহারা বন্দী করিয়াছে, তিনি সত্যি রাজা! তখন সে রাজার পায়ের তলায় পড়িয়া ক্ষমা চাহিল।

রাজা তখন প্রহরীর কাছে আদ্যোপান্ত সব কথা শুনিলেন। রাণীর কাছে জিজ্ঞাসা করিতে

তিনি বলিলেন—কেন মহারাজ, তুমিইত এসে চোরের ভয়ের জন্য আমার অলঙ্কারগুলো সামলে রাখবে বলে, আমার কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিলে। তখন রাজার কোন কথাই বুঝিতে বাকী রহিল না। কি কৌশলী এ চোর।

পর দিন রাজা ঢোল পিটাইয়া রাজধানীতে প্রচার করিয়া দিলেন—যে ব্যক্তি এই চোরকে ধরিতে পারিবে, তাকে তিনি অর্দ্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যার সঙ্গে বিয়ে দিবেন।

ব্রাহ্মণযুবক যখন এসংবাদ শুনিল, তখন সে রাজদরবারে আসিয়া রাজাকে নমস্কার করিয়া



—রাজা না বাদশা!

কহিল,—মহারাজ! আপনি যদি আদেশ দেন, তবে আমি সে চোরকে ধরে দিতে পারি।

রাজা খুসী হইয়া বলিলেন—সে বেশ কথা আমিত ঢোল দিয়েই সে কথা জানিয়ে দিয়েছি। বেশ ত ধরে দাও।

তখন ব্রাহ্মণ যুবক হাসিয়া কহিল—মহারাজ! আমিই সেই চোর।

কি তার প্রমাণ?

তখন ব্রাহ্মণ একে একে সব কাহিনী রাজার নিকট বলিল।

রাজা ব্রাহ্মণের মুখে আনুপূর্ব্বিক সব কথা শুনিয়া বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন। তিনি তাহার চতুরতায় ও বুদ্ধির প্রখরতার জন্য ধন্যবাদ দিলেন এবং এক শুভদিনে রাজকন্যার সহিত এই ব্রাহ্মণের বিবাহ হইয়া গেল। তাহার ভাগ্যে মিলিল অর্দ্ধেক রাজত্ব। রাজবাড়ীতে যে কত ধূম ধাম হইল সে ত বুঝিতেই পার। তোমাদের ও নিমন্ত্রণ হইয়াছিল কি না, সে খবর আমি তা আর রাখিনা! বল দেখি এ কেমন লঙ্কাকাণ্ড।

বুদ্ধিমান রাজপুত্র

(কথাসরিৎসাগর)

এক দেশের রাজার ছেলে বিন্ধ্য পর্ব্বত বেড়াইতে বেড়াইতে দুইজন অসুরকে মল্লযুদ্ধ করিতে দেখিলেন। তিনি তাহাদের মল্লযুদ্ধ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা তাহাদের সম্মুখস্থিত একটি **লাঠি**, এক **যোড়া জুতা** এবং **একটি পাত্র** দেখাইয়া বলিল আমাদের মধ্যে যে জয়ী হইবে—সে এই তিনটি জিনিষের অধিকারী হইবে। রাজপুত্র আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, এ-সব জিনিষের এমন কি গুণ আছে যেজন্য তোমাদের এইরূপ লড়াই বাঁধিয়াছে। তখন তাহারা উত্তরে জানাইল এই জুতা পায়ে দিলে, আকাশে উড়িতে পারা যায়। আর লাঠির গুণ হইতেছে, ইহার কাছে যাহা চাহিবে তাহাই পাইবে। আর এই ভাণ্ড হইতেছে অক্ষয়-ভাণ্ডার। ইহার কাছে যে কোনরূপ খাদ্য চাহিবে, তাহাই পাইবে। রাজপুত্র অমনি লাঠি ধরিলেন, ভাণ্ডটি হাতে লইলেন এবং জুতা পায়ে দিয়া অদৃশ্য হইলেন। এ-দিকে অসুরেরা তাহাদের মল্লযুদ্ধ লইয়া ব্যস্ত—বুদ্ধিমান রাজপুত্র যে কখন তিনটি জিনিষ লইয়া চলিয়া গেলেন—সে-দিকে কেহ লক্ষ্যও করিল না।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলিল, তারপর দুইজনে বিশেষ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়া যখন বিশ্রাম করিতে বসিল, তখন তাহাদের দুজনেরই যে স্থানে জিনিষ তিনটি রাখা হইয়াছিল, সে দিকে লক্ষ্য পড়িল,—কিন্তু কোথায়? লাঠি, জুতা, পাত্র কিছুই নাই!—তখন দুইজনে বুঝিতে পারিল যে, রাজপুত্র ঐ তিনটি জিনিষ লইয়া পলায়ন করিয়াছেন। তখন দুই অসুরের দ্বন্দ্ব চলিয়া গেল দুইজনে বন্ধুভাবে মিলিত হইয়া রাজপুত্রের খোঁজে ছুটিতে লাগিল, কিন্তু রাজপুত্রকে তাহারা কোথায় পাইবে? আজিও কিন্তু সেই অসুর দুইজন রাজার ছেলেকে ধরিবার জন্য ছুটিয়া চলিয়াছে।



টাকার পরিমাণবাদ

২৭৬৬ পৃষ্ঠার পর

'টাকাকড়ি' বলিলে কি বুঝায় তাহা আমরা 'টাকার কথা' আলোচনা প্রসঙ্গে দেখিয়াছি। এবারে টাকার মুল্য বলিলে কি বুঝায় দেখা যাক্। ধর তোমার কাছে আছে 'মুড়ি' ও তোমার খেলার সাথী মধুর কাছে আছে 'ছোলাভাজা'। তোমাদের উভয়েরই মনে হইল যে মুড়ির সঙ্গে ছোলাভাজা খাইতে বড় মজা লাগে; সুতরাং একটা আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করিলে। মধু তোমায় একসের মুড়ির বদলে এক ছটাক ছোলা ভাজা দিতে প্রস্তুত অর্থাৎ কথাটা এই দাঁড়াইল যে তোমার একসের মুড়ির মুল্য এক ছটাক ছোলা। অতএব বুঝিতেছ যে মুল্য নিরূপণের সময় পণ্যের সহিত (যেমন মুড়ি) পণ্যের (যেমন ছোলা ভাজা) বিনিময়ের তুলনা করা হয়। তেমনি একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ টাকার বদলে যে পরিমাণ অন্যান্য পণ্য পাওয়া যায় সেটাই হল টাকা কড়ির মুল্য। অর্থাৎ এক পয়সায় যদি এক ছটাক ছোলা ভাজা কি একসের মুড়ি পাওয়া যায় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে একটা পয়সার মুল্য এক ছটাক ছোলা ভাজা বা এক সের মুড়ি। অর্থাৎ পণ্য ক্রয় করিবার শক্তিই টাকার মুল্য।

বাজার যাওয়ার অভ্যাস যদি তোমার থাকে তাহা হইলে হয়ত লক্ষ্য করিয়া থাকিবে যে জিনিষ-পত্রের দর কোনদিন বা চড়া আবার কোনদিন বা মন্দা যায়। দোকানীকে প্রশ্ন করিলে সে তোমায় বলিবে 'আজ মোটেই আমদানী নেই বাবু' বা আজ মাল বাজারে বড় বেশী আমদানী হয়েছে,' কিংবা আজ যে লগনশা। ইহার অর্থ এই যে পণ্যের যোগান ও চাহিদার উপর পণ্যের মুল্য নির্ভর করে। ঠিক্ তেমনি টাকা কড়ির মুল্যও-টান যোগানের উপর নির্ভর করে। টাকা কড়ির পরিমান যদি বাড়ান যায় তবে উহার মুল্য কমে আর পরিমাণ যদি কমান যায় তবে উহার মুল্য বাড়ে। মজুত করে রাখা টাকা বাদে যে-টাকা পণ্য খরিদ করিবার জন্য খাটে তাহাই হইল "চল্‌তি টাকা"। এই চল্‌তি টাকা কড়িরা সংখ্যা ডবল করিলে পণ্যের দর ডবল হইবে এবং চল্‌তি টাকার পরিমান অর্দ্ধেক করিলে পণ্যে দরও অর্দ্ধেক হইবে! মনে কর একটা সমাজে চল্‌তি টাকার পরিমাণ মোট ২০০টী টাকা এবং বিক্রেয় পণ্য দ্রব্যের পরিমাণ মাত্র ৫০টী। তাহা হইলে প্রত্যেকটী পণ্যের দর দাঁড়ায় চার টাকা

এখন এই ২০০৲ টাকাকে (চলতি টাকা) বাড়াইয়া যদি ৪০০৲ টাকা (অর্থাৎ দ্বিগুণ) করা যায় অথচ পণ্যের পরিমাণ সেই ৫০টাই থাকে তাহা হইলে প্রত্যেকটি পণ্যের দর ৪৲ টাকার বদলে ৮৲ টাকা হইবে অর্থাৎ টাকার পরিমাণ ডবল করা হইয়াছে বলিয়া পণ্যের দরও ডবল হইবে। তাই ধনবিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতরা বলেন "আর সব অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন না হইয়া টাকার পরিমাণ যদি ডবল বাড়িয়া যায়, তাহা হইলে উহার মূল্য ঠিক্ অর্দ্ধেক হইবে। অর্থাৎ জিনিষ পত্রের দর আগের চেয়ে ঠিক দ্বিগুণ বাড়িবে। তেমনি টাকার পরিমাণ যদি অর্দ্ধেক হয়, এবং অন্যান্য অবস্থার যদি কোন পরিবর্ত্তন না ঘটে, তাহা হইলে টাকা কড়ির মূল্য ঠিক্ ডবল হইবে, অর্থাৎ জিনিষ পত্রের দর আগের চেয়ে ঠিক্ অর্দ্ধেক হইবে।" টাকা কড়ির বিশেষত্ব এই যে টাকার পরিমাণের বাড়া-কমার ঠিক্ অনুপাতে উহার মূল্য কমে বাড়ে। গম কি ধান, কি অন্য কোন পণ্যের পরিমাণ দ্বিগুণ বাড়াইলে যে পণ্যটির মূল্য ঠিক্ অর্দ্ধেক হইবে এমন্ বলা সুকঠিন, হয় ত কিছু বেশী হইবে নয় ত কিছু কমও হইতে পারে। কিন্তু টাকার বেলায় তাহা ঠিক্ অর্দ্ধেক হইবে। মোটামুটী ইহাই হইল "টাকার পরিমাণবাদ" বা "Quantity theory of money"।

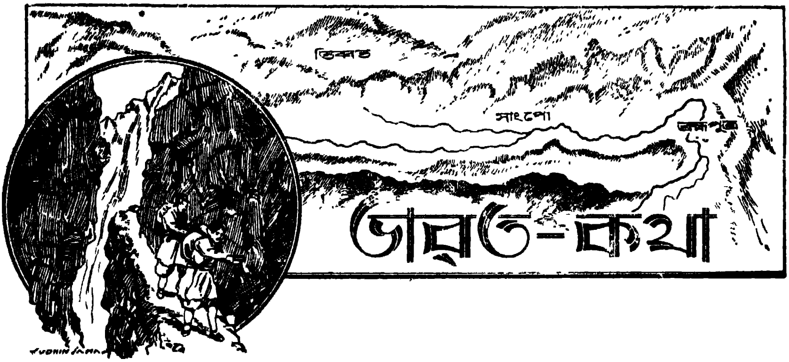
কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে টাকার এই পরিমাণবাদ খাটানো সহজ নহে। কেননা চলতি টাকার পরিমাণ কি বা কতগুলি পণ্য বিনিময়ের জন্য আছে তাহা নির্দ্ধারণ করা শক্ত। প্রত্যহ বিভিন্ন শিল্পে নানা পণ্য উৎপন্ন হইতেছে, ইহার কোন কোনটা সোজাসুজি আমাদের ভোগে লাগে, আবার কোনটা বা অপর একটা পণ্য উৎপাদনের জন্য ব্যবহার হয়। বিক্রেয় পণ্য বলিলে শুধু এই গুলিকে বুঝায় না। জমি-জমা ষ্টক শেয়ার, সেকেণ্ড হ্যাণ্ড মালও অন্যান্য পণ্যের মত বিনিময় হইয়া থাকে। শিল্পজাত পণ্যগুলি বিনিময় করার জন্যই উৎপন্ন করা হয়; সুতরাং সে গুলির পরিমাণ পূর্ব্ব হইতে আঁচ করা খুব কঠিন নয়। কিন্তু কত সেকেণ্ডহ্যাণ্ড মাল বাজারে আসিবে, কি কতগুলি জমি একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিক্রয় হইবে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। কেননা যে সময় লোকে ফট্কা খেলায় মাতিয়া উঠে তখন এক-একটা শেয়ার ষ্টক বা জমি-জমা কত হাত ঘুরিয়া আসে তাহার ঠিক্ নাই। এখন যদি চলতি টাকার মোটা অংশ এইসব ষ্টক-শেয়ার জমি-জমা কেনা বেচায় নিয়োজিত হয়, তাহা হইলে চলতি পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য ঐ অত পরিমাণ টাকা খাঁকতি পড়িবে। এরূপ ক্ষেত্রে বিক্রেয় পণ্যের দর কিরূপ বাড়িবে-কমিবে বলা শক্ত। সুতরাং টাকার পরিমাণবাদটী যত সহজ মনে হইয়াছিল, কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে কাজে লাগান তত সহজ নয়।

চলতি টাকাকড়ি বলিলেও যে কি বুঝায় তাহা নির্দ্দেশ করাও সহজ নহে। কেননা আমরা 'টাকার কথা' আলোচনা প্রসঙ্গে দেখিয়াছি যে, এ যুগে কেবলমাত্র ধাতুমুদ্রাই টাকার হিসাবে চলে না, ব্যাঙ্ক বা সরকারী নোটও টাকা হিসাবে চলে। ইহাছাড়া সব সময়েই ব্যাঙ্কে বহু টাকা লোকে গচ্ছিত রাখে; ব্যাঙ্কের হাতের এই গচ্ছিত টাকার পরিমাণ অনবরত বাড়ে-কমে, পরিচালক-গণের নির্দ্দেশ অনুসারে। আমানৎকারীরা যে টাকা ব্যাঙ্কে আমানৎ রাখে, ব্যাঙ্ক সেই টাকাই ধার দেয় এবং গচ্ছিত টাকাকে ভিত্তি করিয়া কত টাকা যে ব্যাঙ্ক ধার দিবে তাহাও নির্দ্দিষ্ট থাকে না। এই ব্যবস্থাকে ধনবিজ্ঞানের পারি-ভাষিকে **"ক্রেডিট্ ব্যবস্থা"** বলে। অবশ্য আমানতের তুলনায় কত টাকা তহবিলে নগদ রাখা হইবে, সে বিষয়ে পূর্ব্ব হইতে প্রত্যেক আমানৎ ব্যাঙ্কের একটা নির্দ্দেশ থাকে; কিন্তু এক-একটা এমন সময় আসে যে, ব্যাঙ্ক এই নির্দ্দেশ মানিয়া চলিতে পারে না, তখন সব নির্দ্দেশ উপেক্ষা করিয়া নোট ছাড়িতে ব্যস্ত হয়। অতএব বোঝা যাইতেছে যে চলতি টাকার পরিমাণ হিসাব করাও শক্ত। অধিকন্তু একই টাকা হাত হইতে হাতে ঘুরিয়া বহুবার কেনা-বেচার কার্য্য সম্পন্ন করে। একটা টাকা যদি বিশ জনের হাত বদলাইয়া বিশবার বেচা-কেনার কার্য্য করে, তবে বলিতে হয় যে, ঐ একটা টাকাই বিশটা টাকার কাজ করিয়াছে; সুতরাং

কতটাকা টাকা কেনা-বেচায় খাটিয়াছে ধরিতে হইলে মোট টাকার পরিমাণ কতবার হাতফের করিয়াছে তাহাও ধরিতে হইবে। কার্য্যক্ষেত্রে হাতফেরের গতি (বা 'Velocity of Circulation') নির্ণয় করাও শক্ত।

আজকালকার সভ্যসমাজে টাকার কথা ধরিলে প্রধানতঃ ব্যাঙ্ক আমানতের কথাই মনে আসে; এবং টাকা হাতফেরের গতি নির্ণয় করিতে গেলে দেখা দরকার কত তাড়াতাড়ি ব্যাঙ্ক-আমানৎ হাত পাল্টাইতেছে। চেক কাটিয়াই সাধারণতঃ আমানতী টাকা উঠান হয়। সুতরাং ব্যাঙ্কের মোট আমানতের পরিমাণের সহিত চেক্ লেখার পরিমাণের সম্বন্ধটা দেখিয়াই হাতফেরের মাত্রা বোঝা যায়। তবু ইহাও খুব সন্তোষজনক উপায় নহে। কেননা মোট চেকের হিসাব আমরা পাই, জয়েণ্টষ্টক ব্যাঙ্কগুলির 'ক্লিয়ারিং হিসাব হইতে। কিন্তু একটা ব্যাঙ্কের চেকের টাকা যখন অপর একটা ব্যাঙ্কের খাতায় জমা হইবে তখনই চেকটি ক্লিয়ারিং হিসাবে জমা হইবে। অর্থাৎ লয়েডস্ ব্যাঙ্কের আমানৎকারী যখন সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের আমানৎকারীকে একটা চেক্ দিবে তখনই তাহা ক্লিয়ারিং হিসাবভূক্ত হইবে, কিন্তু যদি 'মণি' ও 'হরি'র একই ব্যাঙ্কে (যেমন ভবানীপুর ব্যাঙ্কে) হিসাব থাকে, এবং মণি হরির নামে চেক্ দেয় তবে তাহা ক্লিয়ারিং হিসাবে পাওয়া যাইবে না। অধিকন্তু ক্লিয়ারিং অ্যাকাউণ্ট (Clearing account) দেখিয়া বুঝিবার উপায় নাই যে টাকাটা সত্যসত্যই পণ্য খরিদ বেচার জন্যই লেখা হইয়াছে, না, শেয়ার ষ্টক ইত্যাদি লইয়া ফট্‌কা খেলায় খেসারৎ দিতে লাগিয়াছে। অধিকন্তু ব্যবসা-বাণিজ্য ভাল চলিলে টাকা দ্রুত হাতফের করে। এই সব আলোচনা হইতে বুঝিতেছ যে **'পরিমাণ তত্ত্ব'**টা কাজে লাগান বড় শক্ত। টাকার পরিমাণ, পণ্যের পরিমাণ, হাতফের সবগুলির উপর সমান ভাবে দৃষ্টি রাখিতে হয়। যদি টাকার পরিমাণ দ্বিগুণ হয় আর হাতফের মাত্রা অর্দ্ধেক হয় ও পণ্যের পরিমাণ একই থাকে তবে পণ্যের দরের কোন পরিবর্ত্তন হয় না। ধর কোন সমাজে মাত্র ৫০টী টাকা আছে এবং সেগুলি বৎসরে ২০ বার হাতফের করে; তাহা হইলে সেই সমাজে প্রতি বৎসর (৫০×২০)= ১০০০৲ টাকা মোট খরচা হয়। এখন ধর সেই সমাজে মোটে ১০০ টন কয়লা আছে; তাহা হইলে কয়লার দর দাঁড়াইল টন প্রতি ১০৲ টাকা। এখন যদি কোন কারণে টাকার পরিমাণ দ্বিগুণিত হয় (অর্থাৎ ৫০৲ হয় ১০০৲) এবং হাত ফের হয় অর্দ্ধেক (অর্থাৎ ১০-বার বছরে) এবং কয়লার পরিমাণ একই থাকে (অর্থাৎ ১০০ টনই থাকে) তাহা হইলেই কয়লার দর সেই টন প্রতি ১০৲ টাকাই হইবে ([illegible] = ১০)। সুতরাং টাকার পরিমাণ দ্বিগুণিত করিলেই যে পণ্যের দর দ্বিগুণিত হইবে এমন কোন কথা নাই। আসলে টাকার পরিমাণ পণ্যের দর পরিবর্ত্তন সাধন করিবার তিনটী কারণের একটী কারণ এইজন্যই পরিমাণ-তত্ত্বটী বিবৃত করিবার সময় অন্যান্য অবস্থার পরিবর্ত্তন না ঘটে, ইত্যাদি কথার প্রয়োগ করা হইয়াছে।

মূল্য শব্দটী আপেক্ষিক অর্থাৎ একের তুলনায় কতকম বা বেশী। সুতরাং একটি পণ্যের মূল্য বাড়িয়াছে দেখিলে বুঝিতে হইবে যে, অপর কোন পণ্যের মূল্য কমিয়াছে; উভয়ের মূল্য একমাসে বাড়িতে বা কমিতে পারে না। মনে কর, ১ মণ চিনির বদলে ২ মণ ময়দা পাওয়া যায়; তাহা হইলে ১ মণ চিনির মূল্য ২ মণ ময়দা দাঁড়ায়। কিন্তু এখন যদি কোন কারণে ১ মণ চিনির বদলে ৪ মণ ময়দা পাওয়া যায়, তাহা হইলে চিনির মূল্য বাড়িল বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ময়দার মূল্য কমিয়া গেল, অতএব বুঝিতে পারিতেছ যে, সকল পণ্যের "মূল্য" একসময়ে বাড়িয়া যাইতে পারে না বা কমিয়া যাইতে পারে না। কিন্তু সকল পণ্যের "দর" একই সময়ে বাড়িতে বা কমিতে পারে। মনে কর; পূর্ব্বে ১ টাকায় ১ মণ চিনি ও ২ মণ ময়দা পাওয়া যাইত; এখন ৩৲ টাকায় ১ মণ চিনি ও ২ মণ ময়দা পাওয়া যায়। এখানে চিনি ও ময়দার পরস্পরের মূল্য কমে নাই; কিন্তু পূর্ব্বে ১৲ টাকায় যে পরিমাণ চিনি ও ময়দা পাওয়া যাইত, এখন সেই পরিমাণ ঐ পণ্যগুলি পাইবার জন্যে ৩৲ টাকা দিতে হয়। সুতরাং চিনি ও ময়দার মূল্য বাড়ে নাই বটে, কিন্তু দর বাড়িয়াছে।



ব্রহ্মপুত্রের উৎস সন্ধানে

২৯১২ পৃষ্ঠার পর

ব্রহ্মপুত্র ভারতের একটি শ্রেষ্ঠ নদ বা নদী। তিব্বতের দুর্গম পার্ব্বত্যপ্রদেশে ইহার জন্ম। সে দেশে এই নদীর নাম সাং-পো বা "স্যাম্পো" (Tsang-Po)। সাং-পো তিব্বতের পর্ব্বতশ্রেণীর গায়ে গায়ে অধিত্যকা ও উপত্যকা প্রদেশ দিয়া বহিয়া আসিয়াছে। কোথা হইতে এই নদীর উৎপত্তি? আর কোথায় সে যাইয়া মিশিয়াছে তাহা অনেক দিন পর্য্যন্ত মানুষের অজানা ছিল। অনেকের এইরূপ বিশ্বাস ছিল যে এই সাং-পো নদী তিব্বতের রাজধানী লাশা সহরের পাশ দিয়া প্রবাহিত হইয়া শেষটায় দক্ষিণ দিকে আসিয়া ব্রহ্মপুত্র নাম ধারণ করিয়াছে।—১৯০৪ সালের আগষ্ট মাসের আগে কোন শ্বেতাঙ্গ লাশা নগরীতে পদার্পণ করেন নাই। কাজেই এই নদীর উৎস-সন্ধানে কোনও সাদা মানুষ উহার পূর্ব্বে যাইতে পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ! যদি সাং-পো আর ব্রহ্মপুত্র নদ-অভিন্ন হয়, তবে নিশ্চয়ই কোন উচ্চগিরিশৃঙ্গ হইতে জলপ্রপাতের আকারে ইহার পতন সম্ভব। কিন্তু কোথায় সেই উৎপত্তি স্থান? কোথায় সেই প্রপাত?

সে কালের লোকেরা ধারণাই করিতে পারিতেন না যে ব্রহ্মপুত্র নদ—সমুদ্র-সমতা হইতে ১৬০০০ ফিট উচ্চ মানস-সরোবরের কাছাকাছি জন্মগ্রহণ করিয়া সেই উচ্চতা প্রায় সমান ভাবে তিব্বতের শেষ সীমা পর্য্যন্ত রক্ষা করিয়া আসিতেছে। সেই আসাম সীমান্তে নামিয়া আসিবার সময় ১০০০ ফিট উচ্চতায় নামিয়া আসিতে পারে এইরূপ কেহ এমনকি সেকালের বৈজ্ঞানিকেরাও এইরূপ কল্পনা কবিতে পারেন নাই।

মানুষের মনে নদ, নদী পাহাড় পর্ব্বত সম্বন্ধে স্বাভাবিক ভাবে নানা কল্পনা আসে। ব্রহ্মপুত্র নদ সম্বন্ধে ও যে ঐরূপ কত কল্পনাই মানুষ না করিয়া আসিয়াছে। এই নদ সম্বন্ধেও তেমনি নানা কল্পনা নানা অদ্ভুত অদ্ভুত কাহিনী প্রচলিত ছিল। সেকালে কোন ইংরাজ নিষিদ্ধ দেশে যাইতে পারিত না। যদিই বা কেহ ছদ্মবেশে যাইতে চেষ্টা করিত তাহা হইলে তাহাকে তিব্বতীয় ভাষা না শিখিলে চলিতে পারিত না। আর তিব্বতীয় ভাষা শিক্ষা করাও ত বড় সহজ নহে। কিন্তু যাহাদের মনে দুর্জ্জয়কে জয় করিবার আকাঙ্ক্ষা

জাগিয়া উঠে তাহাদিগকে কি কেহ নিরস্ত করিতে পারে ?

ভারতীয় জরিপ বিভাগের (Indian Survey-Department) কাপ্তেন হারমনের (Captain Harman) মনে ব্রহ্মপুত্র নদের উৎস-সন্ধানের ইচ্ছা হইল। তিনি দার্জ্জিলিং আসিলেন। সেখানে নেমসিং (Neem Singh) নামে একজন সিকিমিকে কি ভাবে সেক্সটাণ্ট যন্ত্র (Sextant) এবং দিগ্‌দর্শন যন্ত্র (Compass) ব্যবহার করিতে হয়, সে শিক্ষা দিলেন। কি ভাবে মানচিত্র দেখিতে হয়, মানচিত্র তৈয়ারি করিতে হয় পর্ব্বতের উচ্চতার পরিমাণ করিতে হয় এ সব বিষয়ে কাপ্তেন হারম্যান, নেমসিংকে শিক্ষা দিলেন। নেমসিংয়ের পূর্ব্বে তিনি কিযাণসিং নামক একজনকেও এ বিষয়ে উদ্যোগী করিয়াছিলেন। কিন্তু একা একজনের পক্ষে ত জরিপের কাজ করা চলে না, দু'জন না হইলে চলাফেরার সুবিধা হয় না, কাজও দ্রুত অগ্রসর হয় না। সে সময়ে দার্জ্জিলিং বাজারে কিন্‌থাপ (Kinthup) নামে একজন দর্জী ছিল। সে এই অনুসন্ধান কার্য্যে নেমসিংয়ের সঙ্গী হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। সিকিমি কিন্‌থাপ লোকটী বেঁটে খাটো রকমের ছিল, চোখ দুটি ছিল বেশ তীক্ষ্ণ, কপালটা বেশ চওড়া আর তাহার মাথায় ছিল একরাশ চুল। তাহাকে দেখিলে মনে হইত যে হাঁ, এ কাজের মানুষ, একে কোন কাজের ভার দিলে সে কাজের জন্য আর ভাবিতে হইবে না—আর এযেন Explorer বা অজানার সন্ধানী হইয়াই জন্মিয়াছে।

১৮৭৮ সালের একদিন সকালবেলা নেমসিং ও কিন্‌থাপ—অজানা পার্ব্বত্যপথে সাংপো নদীর উৎস সন্ধানে যাত্রা করিল। তাহারা দারুণ শীতের মধ্যে পার্ব্বত্যপ্রদেশের প্রায় ১২,০০ ফিট উচ্চ পথ ধরিয়া স্যাম্পো নদীর গতি পথ ধরিয়া ক্রমশঃই অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহাদের হাতে ছিল জপমালা। পা বাড়াইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহারা জপের গুটিতে হাত দিত। এক কথায় জপের মালা গণিতে গণিতে তাহারা পথ চলিতেছিল। আমাদের এই দুইজন অভিযানকারী পথে পথে জরিপ করিতে করিতে অবশেষে গয়লা (Gnyala) নামক একটি স্থানে আসিয়া পৌঁছিল। এই জায়গাটি ছিল ঘন বনে ঢাকা। এই অধিত্যকার আশে পাশে তুষারাবৃত উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এইখান হইতে স্যাম্পো নদীর গতি উত্তর দিকে প্রবাহিত হয়। ১৮৭৯ সালের জানুয়ারী মাসে নেমসিংও কিন্‌থাপ গয়লা হইতে দার্জ্জিলিং ফিরিয়া আসিল। তাহারা আসিয়া বলিল,—স্যাম্পোনদী আসামের প্রান্তভাগ হইতে লম্বা দক্ষিণাভিমুখী হইয়া ভারতবর্ষে আসিয়া পড়িয়াছে। সেকালের জরিপ বিভাগের কর্ত্তারা এবং বৈজ্ঞানিকেরা তাহাদের কথায় বিশ্বাস করিলেন না।



কিন্‌থাপ গুহার ভিতরে কাষ্ঠখণ্ড রাখিয়া দিতেছে

তোমাদের কাছে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে কিন্‌থাপের শিরায় শিরায় প্রবাহিত ছিল দুর্জ্জয়কে জয় করিবার মত উষ্ণ রক্তধারা। কোন বিপদেই তাহার মন ভাঙ্গিয়া পড়িত না। মৃত্যু-ভয় তাহার ছিল না, অজানাকে জয় করিবার দুর্জ্জয় শক্তি তাহাকে

কিছুতেই পিছু হটাইত না। সে নেমসিংয়ের কাছে জরিপ করিতে শিখিয়াছিল। কিন্থাপ আবার স্যাম্পো নদীর উৎস সন্ধানে যাত্রা করিল। এইবার তাহার সহযাত্রী হইল একজন চীন দেশীয় শ্রমণ বা লামা। এই লামা পূর্ব্বে তিব্বতের এক বৌদ্ধ বিহারে ছিল, দৈবক্রমে ভারতীয় জরীপ বিভাগে আসিয়া পড়ে। কিন্থাপকে এইবার বলা হইয়াছিল যে সে যেন নির্ভীকভাবে স্যাম্পো নদীর গতিপথের অনুসরণ করিয়া কেবলি অগ্রসর হইতে থাকে। যদি সে নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে ভারতে ফিরিয়া না আসে, তবে সে যেন প্রত্যহ ৫০ খানি করিয়া ৫০০ খানি কাঠের টুকরা নদীর স্রোতের মধ্যে ফেলিয়া দেয়. জরীপ বিভাগের লোকেরা নীচের দিকে সেই সব কাষ্ঠ খণ্ডের দিকে লক্ষ্য রাখিবে। এবং তখন তাহারা বুঝিতে পারিবে যে কিন্থাপ বাঁচিয়া আছে কিনা।

তোমরা জান যে বৌদ্ধ লামাদের তিব্বতের কোথাও যাইতে বাধা নাই. আর লাশাত তাঁহাদের তীর্থস্থান। কাজেই এইবার কিংথাপ নিঃশঙ্ক চিত্তে চৈনিক লামার সহযাত্রীরূপে স্যাম্পো নদীর উৎস সন্ধানে চলিল। তাহার পিঠে ছিল একটি থলিতে কাঠের বোঝা। তিব্বতের লোকেরা তীর্থযাত্রীদের খুব সমাদর করে। কাজেই এ যাত্রায় তাহাকে কোন তিব্বতীয়ই সন্দেহের চক্ষে দেখিল না। কিন্তু এই চীনা লামাটির মনে অজানার সন্ধানের কোন ব্যাকুলতাই ছিল না। সে কোন একটি গ্রামে যাইয়া পৌছিলে বেশ ভালভাবে থাকিবার খাইবার এবং শোবার ব্যবস্থার জন্যই ব্যাকুল হইত। যে গ্রামে এইরূপ বাস ব্যবস্থা মিলিত, সেই গ্রাম হইতে চৈনিক লামা এক পা ও বাড়াইতে চাহিত না। চার মাস চলিয়া গেল, লামা বেচারা কিন্থাপকে মহা বিপদে ফেলিল, সে কিছুতেই নড়িতে চাহে না! কোন রকমে লামাকে যৎকিঞ্চিৎ নগদ মুদ্রা দিয়া প্রলুব্ধ করিয়া আবার যাত্রা-পথে অগ্রসর হইতে পারিয়াছিল।

তাহারা চলিতে লাগিল, কখনও কোনও গুহার মধ্যে ঘুমাইতে হইত, কখনও ভিক্ষা করিয়া খাদ্য-সংগ্রহ করিতে হইত, কখনও অনাহারে দিন কাটিত। এই ভাবে তাহারা পেমকোই-চাং (Pemkoi-chung) নামক একটি জায়গায় আসিল। লাশা সহর এখান হইতে ৩২০ মাইল দূর। শেষ পঁচিশ মাইল পথ ছিল অত্যন্ত দুর্গম—খাড়া পাহাড়, সে পাহাড়ে শিলাস্তুপের পর শিলাস্তুপ, কোন দিকে উঠিবার কোন পথ নাই। কোন রকমে তাহারা একটা খাড়া পাহাড়ের উপর উঠিল, সেখান হইতে তাহারা দেখিতে পাইল প্রায় ৩০০০ ফিট নীচ দিয়া গম্ভীর গর্জ্জন করিতে করিতে স্যাম্পো নদী বহিয়া চলিয়াছে। জলের কি ভয়ঙ্কর বেগ!

পেম্কোই-চাংয়ে আসিয়া কিন্থাপ দেখিতে পাইল যে স্যাম্পো নদী এখান হইতে দুইটি শাখায় বিভক্ত হইয়া চলিয়াছে। বৌদ্ধমঠ হইতে নদী অনেকটা দূর দিয়া বহিয়া চলিয়াছে। ঐ বিহারটিতে সাত আট জন লামা বাস করিতেন। কিংথাপের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে এইভাবে সাংপো নদী বহিয়া যাইয়া একটি জলপ্রপাতের আকারে নিম্নে পড়িয়াছে। প্রপাতের নীচে একটি হ্রদের মত জলাশয়। সম্ভবতঃ জলপ্রপাতের উচ্চতা প্রায় ১৫০ শত ফিট হইবে। এই পেম্কোইচাংয়ের কাছাকাছি দুর্ভেদ্য পর্ব্বতের বুক দিয়া সাংপো একটি ক্যানিয়নের (canyon) অন্তরালে অদৃশ্য হইয়াছে। কাজেহ এমন কাহারও সাধ্য নাই যে ঐ নদীর আর অনুসরণ করিতে পারে। এখান হইতে লামা ও কিংথাপ অনেকদূর পর্য্যন্ত নীচের দিকে নামিয়া আবার একটা পথের সন্ধান করিয়া লইলেন। এইবার তাহারা যে গ্রামে আসিল, সেখানে আসিয়া চীনা লামাটি বেশ চালাকি করিলেন. তিনি তাহাকে জোঙ্গ-পোন্ (dzong pon) বা গ্রামের সর্দ্দারের নিকট দাসরূপে বিক্রয় করিয়া সে গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। কিংথাপ বুঝিতে পারিল সে গ্রামের সর্দ্দার তাহাকে সন্দেহের চোখে দেখিতেছে। ইতিমধ্যে তাহার পিস্তলটি এবং একটি কম্পাস (Compass) অন্যান্য কিছু কিছু আস্বাব কাড়িয়া লইয়াছিল। এ জন্য সে ভয়ে ভয়ে তাহার কাছে অন্য যে একটি দিকদর্শন যন্ত্র ছিল, তাহা লুকাইয়া রাখিল। এ ঘটনা ঘটিয়াছিল ১৮৮১ সালে। অতি কষ্টে কৌশল করিয়া সে এই গ্রামের সর্দ্দারের হাত হইতে উদ্ধার পাইয়াছিল।

এই ভাবে সে চলিতে চলিতে মার্পুং (Marpung) নামক গ্রামে আসিয়া পৌছিল। এদিককার প্রাকৃতিক দৃশ্য ছিল অতি চমৎকার। অদূরে তুষার-মণ্ডিত ধবল গিরিশ্রেণী। অধিত্যকাপ্রদেশে ধানের ক্ষেত, পিচফলের বাগান। আর একটি সুন্দর পর্ব্বত-শৃঙ্গের উপরে ছিল বৌদ্ধ মঠটি।

তারপরে কি হইল, সে কথা তোমাদিগকে কিংথাপের নিজের ভাষায় শুনাইতেছি, "আমি এখানে শুনিলাম যে আমাকে ধরিয়া নেওয়ার জন্য জোঙ্গ-পোন্ পঞ্চাশজন লোক পাঠাইয়াছে। আমি এই মঠের লামাকে তিনবার নমস্কার করিয়া জোংপোংর কথা বলিলাম। লামা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার বাপ মা বাঁচিয়া আছে কি না এবং আমি কোথায় যাইতেছি। আমি বলিলাম, তীর্থ করিবার উদ্দেশ্যে লাশা চলিয়াছি। আমার বাপ মা কেহই বাঁচিয়া নাই। তারপর আমি লামার কাছে মিনতি জানাইলাম যে তিনি যেন আমাকে জংপোংর লোকের কাছে প্রত্যর্পণ না করেন।

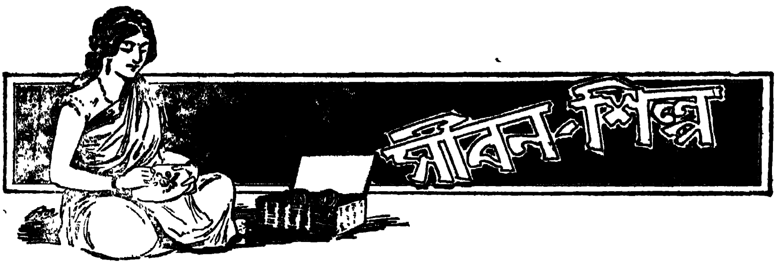
জংপোংর লোকেরা আমার এখানে আসিবার পাঁচ দিন পরে আমাকে লইবার জন্য আসিয়াছিল। কিন্তু লামা তাঁহাকে আমার মূল্য বাবদ ৫০ পঞ্চাশ টাকা পাঠাইয়া দিলেন। কাজেই আর কোনও গোল হয় নাই। আমি সাড়ে চার মাস লামার কাছে ছিলাম। পরে এক মাসের ছুটি লইয়া তীর্থ দর্শনে অর্থাৎ নদীর উৎস সন্ধানে বাহির হইয়া পড়িলাম।

কিংথাপ আবার অন্য একটি বিহারে আসিল। এইখানে কাষ্ঠগুলি খণ্ড খণ্ড করিয়া সাংপো নদীর জলে ফেলিয়া দিল। সেই কাঠের টুক্‌রা গুলি ভাসিতে ভাসিতে আসামের পথে বাঙ্গলা দেশে আসিয়াছিল! কিন্তু সেইগুলির দিকে কে লক্ষ্য করিবে? কাপ্তেন হরম্যান তখন মারা গিয়াছিলেন।

কিংথাপ এইবার লাশা গিয়াছিল। সেখান হইতে জরীপ বিভাগের কর্ত্তাদের নিকট পিস্তল এবং কম্পাস হারাইবার কথা লিখিয়া জানাইয়াছিল।

লাশা হইতে সে মার্পুং ফিরিয়া আসিয়া সেই ত্রাণকারী লামার কাছে কিছুদিন ছিল, তিনি তাঁহাকে মুক্তি দিলেন। যাত্রা-পথে সে দর্জির কাজ করিয়া নিজের খাদ্য সংস্থান করিয়াছিল। ১৮৮৪ সালে কিংথাপ দার্জ্জিলিং ফিরিয়া আসিয়াছিল।

কিংথাপ ইংরাজী জানিত না ও লেখাপড়া বিশেষ কিছু জানিত না। সে মুখে মুখে তাহার ভ্রমণ কাহিনী ও আবিষ্কারের কথা বলিয়া যাইত। কিংথাপ তিন বৎসর কাল যে পাহাড়, পর্ব্বত ও উপত্যকা ও বন জঙ্গল দেখিয়া আসিয়াছিল সে সব কথা সে বলিয়া যাইত। এবং অপরে তাহা লিখিয়া লইত। তাঁহার কথা বৈজ্ঞানিকেরা প্রথম বিশ্বাস করিতেন না, এমনকি জরিপ বিভাগের কর্ত্তারাও তাহার বর্ণিত বিষয়ে সন্দিহান ছিলেন। ১৯১১ সালে সার্ভে ডিপার্টমেণ্ট কিংথাপের বৃত্তান্ত প্রকাশ করেন। তাহার এই অভিযানের কাহিনী জরীপ বিভাগেব একজন কর্ম্মচারী ইংরাজীতে অনুবাদ করেন। কিংথাপ যে চারি বৎসর কাল এই অভিযানে ব্যস্ত ছিলেন, সে সময়কার সবকথা, সর্বদিন সে লিখিয়া লইতে পারে নাই। কিংথাপের পর জরীপ বিভাগের পেমবারটন্ (Pemberton) ও ট্রেনচার্ড (Mr. Trenchard) সাহেব ও সাংপো নদীর উৎস সন্ধানে অভিযান করিয়াছিলেন। তাঁহারা অতিকষ্টে দুরারোহ পর্ব্বতে শৃঙ্গে আরোহণ করিয়া সাংপো নদীর সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন। এই ভীষণ পথে বৎসরে পনের দিনের বেশী চলাচলের সুযোগ থাকে না। দিহাং (Dihang) অভিযানে বেলী (Bailey) ও মুর্শেদ (Mr. Moorshed) পূর্ব্ব মুখে যাত্রা করিয়া ২৫,৪০০ ফিট উচু একটি অজানা পর্ব্বতশৃঙ্গ আবিষ্কার করেন। তাঁহারা পূর্ব্বদিকে যাইতে যাইতে অন্য একটী তুষারমণ্ডিত পর্ব্বতশ্রেণী ও দেখিতে পাইয়াছিলেন। কিংথাপ সে পথে অগ্রসর হইতে পারেন নাই। বেলী এবং মুর্শেদ সেইদিকে অগ্রসর হইতে ব্যর্থকাম হইয়াছিলেন। তাঁহারা উত্তর দিকের পথ ধরিলেন এবং দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বতশ্রেণীকে বেষ্টন করিয়া পশ্চিম দিকে সাংপো নদীর সন্ধান করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। সেখান হইতে তাঁহারা গিয়াছিলেন দক্ষিণ দিকে সে এক অজ্ঞাত বনপ্রদেশে। তাঁহাদের এ অভিযানে অভিনবত্ব ছিল।



উলের বুনন্

২৬৯১ পৃষ্ঠার পর

বুনন কার্য্য শিখিতে হইলে উল এবং বুনিবার দুইটি বা চারিটি কাঁটা ইহাই প্রয়োজন হয়। প্রথম বুনন্ শিক্ষার সময়ে এমন রঙের উল লইয়া কাজ করা উচিত যাহাতে বোনার ঘরগুলি সহজে দেখা যায়। খুব গাঢ় রঙের বা কাল রঙের উল লইয়া কাজ করিলে ভূল ভ্রান্তি সহজে ধরা যায় না। এই জন্য ফিকা রঙের উল লইয়া কাজ করা দরকার।

সাধারণ পোষাক বুনিতে যে সব কাঁটাগুলির এক মুখ ছুঁচালো অপর মুখে বল দেওয়া থাকে সেইগুলি ব্যবহার করা হয়। খুব সরু দুই মুখ ছুঁচালো কাঁটাগুলি চার কাঠি লইয়া বোনার সময় ব্যবহার হয়।

উলের বল তৈয়ারী করিবার সময় খুব ঢিলা ভাবে উল জড়াইতে হয়। কারণ শক্ত করিয়া বল করিলে উলের নমনীয়তা নষ্ট হইয়া যায়।

উল যেরূপ মোটা হইবে কাঁটাও সেইরূপ নির্ব্বাচন করিতে হয়। খুব মোটা উলে সরু কাঁটা লইয়া কাজ করিলে বোনা ঠাস ও শক্ত হয়। তেমনি আবার মোটা কাঁটায় খুব সরু উল লইয়া কাজ করিলে বোনা অত্যন্ত জাল জাল হয়। এই জন্য ৩ তারের উলে ১১।১২ নম্বরের কাঁটা এবং ৪ তারের উলে ৯।১০ নম্বরের কাঁটা লইয়া কাজ আরম্ভ করিলে এই ঠাস বা ঢিলা বুননের সমাধান হয়।

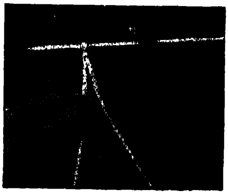
কাহারও কাহারও বোনার সময় উল খুব টান দিয়া লইয়া বোনার অভ্যাস থাকে; তাহাতে কাঠি বা উল যেমনই হউক বোনা খুব ঠাস মত হয়। আবার কাহারও কাহারও বোনার সময় উল খুব ঢিলা রাখিয়া বোনার অভ্যাস থাকে, তাহাতেও উল ও কাঠি যেমনই হউক বোনা খুব ঢিলা হয়। এই জন্য বুননের সময় এমন একটা টান ঠিক করিয়া লইয়া বোনা উচিত যাহাতে বোনা খুব ঢিলা বা ঠাস না হয়। এই ঢিলা বা ঠাস বুননে পোষাকের কিছু গুণাগুণ থাকে। বেশী ঢিলা বুনন হইলে তৈয়ারী পোষাক কাটিলে সব দিক দিয়া লম্বা হইতে থাকে এবং শীঘ্র ছিঁড়িয়া যায়। আর ঠাস বুনন হইলে তৈয়ারী পোষাক কাচিলে ছোট হইয়া যায় এবং বুননের সময় যে মাপের লেখা দেখিয়া বোনা হয় তাহা অপেক্ষা জামা ছোট তৈয়ার হয়। সুতরাং পোষাক তৈয়ারী করিতে মাঝামাঝি রকমের উলের বুননের টান দিয়া বোনা উচিত যাহাতে ঠাস বা ঢিলা বুননের দোষ কার্য্যক্ষেত্রে কম হয়। এইজন্য উল ও কাঁটা পূর্ব্বের হিসাবমত লইয়া কাজ করিলে বোনা ঠাস বা ঢিলা হইবে। সাধারণতঃ তোলা বা বোনা ঘরগুলি যেন সহজ ভাবে কাঁটায় জড়াইয়া থাকে এবং তাহার মধ্য দিয়া বোনার কাঠি সহজে যাতায়াত করিতে পারে ইহাই দেখা উচিত।

আমার মতে ১১নম্বরের কাঁটায় ও ৩ তারের উলে প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ১০৮ ঘর হইলে ঠাস বা ঢিলা বুননের সমাধান হইবে। প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে এই ঘরের হিসাব ঠিক করিতে হইলে ১১ নম্বরের কাঁটায় ৩ তারের উলে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে পুরা দুই ইঞ্চি করিয়া ঘর বোন। এই বুননের সময় এক সারি সোজা এক সারি উল্টা এই বিছা বুননই বুনিবে; অন্য কোনরূপ নমুনা ব্যবহার করিবেনা। বোনা হইলে ঐ ঘরগুলি গুণিয়া তাহাকে চার দিয়া ভাগ দিলে প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে কত ঘর লইল তাহা জানা যাইবে। উপরি উক্ত মাপ লইবার সময় বুননে কোনরূপ টান দিবে না। স্বাভাবিক ভাবে পাতিয়া মাপ লইবে। যদি দেখ এই হিসাব হইতে ঘর বেশী হইতেছে তবে বোনা টান হইয়াছে আর যদি দেখ ঘর কম হইতেছে তবে বোনা ঢিলা হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

দুই কাঁটায় ঘর তোলার নিয়ম—

প্রথমে পাঁচ-ছয় আঙ্গুল উল বাদ দিয়া একটি ফাঁস তৈয়ারী কর এবং ফাঁসটিকে একটি কাঠিতে পরাইয়া দাও।

ফাঁস সমেত ঐ কাঠি বাঁ হাত দিয়া ধর। ডান হাতে অপর একটি কাঠি লইয়া তাহার মুখ বাঁ হাতের কাঠির ফাঁসের মধ্যে বাঁ দিক হইতে ডান দিকে পরাইয়া দাও।



১নং ছবি

প্রথম ফাঁসের সময় যেটুকু উল বেশী আছে তাহাকেও বাঁ হাতের আঙ্গুল দিয়া চাপিয়া রাখ, এখন ডান হাতের কাঠির মাথায় উল ঘুরাইয়া দাও।

এইবার ডান হাতের কাঠির মাথায় যে উল জড়ান আছে সেই উল সমেত কাঠিকে বাঁ হাতের কাঠির ফাঁসের মধ্য দিয়া বাহির করিয়া লও।

ডান হাতের কাঠিতে যে ফাঁসটি আসল তাহাকে আবার বাঁ হাতের কাঠিতে পরাইয়া দাও।

দ্বিতীয় ঘরটি যে ভাবে তৈয়ারি করা হইল সেই ভাবে পর পর যত ঘর প্রয়োজন তুলিয়া লও।

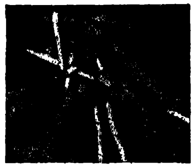


২নং

তলার ধার সমান করা—ঘর তোলার পর প্রথম যখন বোনা আরম্ভ করিবে তখন প্রথম ১ সারি কাঠির পিছনের দিকের সূতা লইয়া বুনিয়া লইবে। ইহাতে বোনা জিনিষের তলার ধার সমান হইবে

বোনার ধার সমান করা

প্রত্যেক সারি বুনিবার আগে প্রথম ঘরকে বাঁ হাতের কাঠি হইতে ডান হাতের কাঠিতে না বুনিয়া তুলিয়া লইতে হয়। যদি পূর্ব্ব সারির শেষ ঘরটি সোজা বোনা থাকে তবে পরের সারি আরম্ভের সময় প্রথম ঘরটির মধ্যে উল্টা বানার মত কাঁটা পরাইয়া তুলিয়া লইতে হয় এবং শেষ ঘর উল্টা বোনা থাকিলে পরের সারির প্রথম ঘরকে সোজা বোনার ন্যায় কাঁটা পরাইয়া তুলিয়া লইতে হয়। এই ভাবে বুনিলে বোনার পাশের ধার সমান হইবে।



৩নং

চার কাঁটায় ঘর তোলা ও বোনার নিয়ম

যত ঘর প্রয়োজন তাহাকে প্রথমে তিন ভাগে ভাগ করিয়া লও। তাহার পর দুই কাটিতে যে ভাবে ঘর তুলিতে বলা হইয়াছে সেই ভাবে ঐ তিন ভাগের এক ভাগ ঘর একটি কাঠিতে তুলিয়া লও। প্রথম ভাগের ঘর শেষ পর্য্যন্ত বোনা হইবে প্রথম কাঁটাকে আলাদা করিয়া দাও। এখন দ্বিতীয়া কাঁটার উপর তৃতীয় কাঁটা লইয়া আরও এক ভাগ ঘর তুলিয়া দাও। এইবার দ্বিতীয় কাঁটাকে

উদ্ভিদের বৈচিত্র্য



১। জোড়া কলাগাছ   ৩। ৩৮৪টী কলায় একটী ছড়া

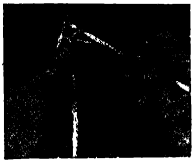
৪। একটী নারিকেল হইতে দুইটী চারা   ৫। জোড়া কাঁঠাল   ৬। একটী বোটায় তিনটি ডাব

৭। ১৫" লম্বা মর্ত্তমান কলা   ৮। অদ্ভুত পেঁপে   ৯। অদ্ভুত লঙ্কা   ১০। জোড়া পটল

১১। অদ্ভুত পেঁপে   ১২। ৩ থাক কলায় একটী ছড়া

[শ্রীহরিহর শেঠের সৌজন্যে

পূর্ব্বের ন্যায় আলাদা করিয়া দাও। তাহার পর তৃতীয় কাঁটার উপর চতুর্থ কাঁটার সাহায্যে শেষ ভাগের ঘরগুলি তুলিয়া লও। ঘর তোলা শেষ হইলে এই ভাবে বুনিতে আরম্ভ কর—প্রথম কাঠির প্রথম ঘরকে তৃতীয় কাঠির শেষ ঘরের কাছে আনিয়া ত্রিভুজের আকারে তিনটি কাঁটাকে রাখ।—(ছবি—৫) এখন আবার প্রথম কাঠির উপর হইতে বুনিতে আরম্ভ কর। তাহা হইলে তিন কাঠির বোনা মিলিয়া গোল হইয়া বোনা হইতে থাকিবে।

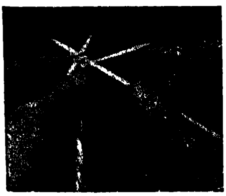


৪ নং

যখন প্রথম কাঁটাকে তৃতীয় কাঁটার কাছে আনিয়া জোড় দিবে তখন বিশেষ করিয়া দেখিয়া লইবে ঘরগুলি যেন কোথাও পাক খাইয়া না গিয়া থাকে।

চার কাঠিতে ঘর তোলার সময় খুব ঢিলা ভাবে ঘর তুলিতে হয়, কারণ পরবর্ত্তী সারি ঘর তোমার সারি হইতে বোনায় ঢিলা হয় এইজন্য উভয় সারির সামঞ্জস্যের জন্য ঢিলা ভাবে ঘর তোলা উচিত।

ঘর তোলার পর ইহাতে যে কোন নমুনা ইচ্ছা বোনা যাইতে পারে। ইহাতে সব সময়ই সোজা দিক হইতে বুনিতে হয়। এইজন্য উল্টা পিঠের বুননের সময়ও উল্টা না বুনিয়া সোজাই বোনা হয়। চার কাঠি দিয়া সাধারণতঃ মোজা বোনা হয়। তবে ইচ্ছা করিলে ইহা দ্বারা টুপি, জামা, থলে ইত্যাদিও বোনা চলে। তাহাতে পাশে জোড় দিবার প্রয়োজন হয় না। বাজারে এক রকম গোল কাঠি পাওয়া যায় তাহা দিয়া চার কাঠির মতই বোনা হয়।



৫ নং

চার কাঠির বুনান—তিনটি কাঠির সব ঘর গুলির উপর বোনা হইলে তবে একসারি পুরা হইল বুঝিতে হইবে। একসারি শেষ হইল তাহা সহজে বুঝিবার জন্য ঘর তোলার সময় বাড়তি সূতাকে চিহ্ন করিয়া রাখিতে হয়। ঐ বেণী সূতা প্রথম কাঠির ডান হাতের দিকে এবং তৃতীয় কাঠির বাঁ হাতের দিকে থাকে।

প্রতি ঘরে প্রত্যেকটি কাঠি আরম্ভের সময় প্রথম তিন চারিটির ঘর বেশ টান দিয়া বুনিতে হয় কারণ প্রতিবার ঐ জায়গায় ঢিলা হইলে জিনিষটি বড় হইয়া যায় এবং ঐ সব যায়গায় বোনা জাল জাল মত দেখায় ও ঐ সব স্থান শীঘ্র ছিঁড়িয়া যায়।

সোজা বোনার নিয়ম

যত ঘর প্রয়োজন প্রথমে তুলিয়া লও। তাহার পর ঘর তোলা সমেত কাঁটা বাঁ হাত দিয়া ধর এবং ডান হাতে অপর একটি কাঠি লও। এখন ডান হাতের কাঁটায় ঘর তোলার মত একটি ফাঁস পূর্ব্ব নিয়মে বাহির করিয়া লইয়া তাহাকে ডান হাতের কাঁটায় থাকিতে দাও এবং বাঁ হাতের কাঁটায় যে ঘরের মধ্য হইতে ফাঁস বাহির করা হইল তাহাকে বাঁ হাতের কাঠি হইেত ফেলিয়া দাও। এই ভাবে পর পর বুনিয়া যাও যতক্ষণ বাঁ হাতের কাঠির সমস্ত ঘর ডান হাতের কাঠিতে না চলিয়া আসে। সোজা বোনার সময় বোনার উল সর্ব্বদা কাঠির পিছনের দিকে থাকে। ঘর সমেত কাঁটা বাঁ হাতে এবং বোনার কাঁটা ডান হাতে ধরিতে হয়।



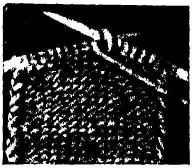
৬ নং

উল্টা বোনার নিয়ম

যতঘর প্রয়োজন তুলিয়া লও। উল্টা বোনার সময় বোনার উল কাঠির সামনের দিকে থাকে। ডান হাতের কাঁটার মুখ বাঁ হাতের কাঁটায়

ঘরের মধ্যে ডান দিক হইতে বাঁ দিকে পরাইয়া দাও।

এইবার সামনের দিকে যে উলের বল আছে তাহা হইতে ডান হাতের কাঠির মুখে উল ঘুরাইয়া দাও (ছবি-৭) দেখ। তাহার পর সুতা সমেত ডান হাতের কাঁটাকে উল্টা ভাবে বাঁ কাঠির ফাঁসের মধ্যে দিয়া বাহির করিয়া দাও। ডান হাতের কাঁটায় যে ফাঁস হইল তাহাকে ডান হাতের কাঁটায় থাকিতে দাও



৭ নং

এবং বাঁ হাতের কাঁটার যে ঘরে বোনা হইল সেই ঘরকে বাঁ হাতের কাঠি হইতে ফেলিয়া দাও এই ভাবে পর পর বুনিয়া যাও।

জোড়া বোনার নিয়ম

সোজা বা উল্টা যে কোন বুননের সময় ইহার ব্যবহার হয়। দুই ঘরের মধ্যে একসঙ্গে ডান হাতের কাঠিকে সোজা বোনার ধরণে পরাইয়া এক সঙ্গেই দুই ঘর বুনিয়া লইতে হয়। এই ভাবে বোনাকে জোড়া বলা হয়। দুই ঘরের মধ্যে উল্টা বোনার ধরণে কাঠি পরাইয়া লইয়া বুনিতে হইলে তাহাকে উল্টা-জোড়া বলা হয়।

সামনে সুতার নিয়ম

সোজা বোনার সময় এই সামনে সুতা করিতে হইলে তখন বোনার উল কাঠির পিছনের দিকে থাকে, তাহাকে দুই কাঠির মধ্য দিয়া সামনে আন এবং ডান হাতের কাঠির উপর দিয়া ঘুরাইয়া লইয়া গিয়া তবে সোজা বোন। যদি উল্টা বোনার সময় এই সামনে সুতা করিতে হয় তখন বোনার উল, কাঠির সামনের দিকে থাকে। তাহাকে দুই কাঠির মধ্যে দিয়া পিছনের দিকে লও এবং উল্টা বুনিবার জন্য ডান হাতে কাঠির উপর দিয়া ঘুরাইয়া সামনে আনিয়া বোন। উপরিউক্ত নির্দ্দেশ সৌখীন নমুনা করিতেই বেশী ব্যবহার হয়।

ঘর বন্ধ করার নিয়ম

যথা প্রয়োজন বোনা হইয়া গেলে কাঠির সমস্ত ঘর গুলিকে নিম্নলিখিত রূপে আটকাইয়া দিতে হয়। নচেৎ সব বোনা খুলিয়া আসে। ইহাকে ঘর বন্ধ করা বলা হয়। ঘর বন্ধ করা—২সোজা * প্রথম বোনা ঘরকে দ্বিতীয় বোনা ঘরের উপর দিয়া ডিঙ্গাইয়া ফেলিয়া দাও। এখন কাঠিতে একটি ফাঁস বাকী রহিল আবার ১ ঘর সোজা বোন * পুনরাবৃত্তি করিয়া যাও। সর্ব্বশেষের ঘরটির মধ্যে দিয়া উলের বলকে বাহির করিয়া লও তবে ঐ ঘরটিও বন্ধ হইয়া যাইবে। ঘর বন্ধ করার সময় খুব সতর্ক হইয়া ঘর বন্ধ করা দরকার কারণ একটিও ঘর যদি বাদ পড়িয়া যায় তবে সমস্ত বোনা খুলিয়া আইসে। ঘর বন্ধ বেশ ঢিলাভাবে করা



৮ নং

উচিত নতুবা সমস্ত বোনা কুঁচকাইয়া যায় এবং টান পড়িলেই ছিঁড়িয়া যায়।

সাঙ্কেতিক চিহ্ন

পুনরাবৃত্তির চিহ্ন—*............* ইহার মানে এই যে এই দুইটি তারকা চিহ্নের মধ্যের লেখাটি একবার বোনা হইয়া গেলে, আবার তারকা চিহ্ন হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বিতীয় তারকা চিহ্ন পর্য্যন্ত কাজ শেষ করিবে। এইরূপে পর পর পুনরাবৃত্তি করিয়া যাইতে হইবে যতক্ষণ না অন্য কাজের জন্য নির্দ্দেশ পাও।

পুনরাবৃত্তির চিহ্ন—(............) এইরূপ বন্ধনীর মধ্যে যাহা লেখা থাকিবে তাহার ঠিক পরেই লিখিত সংখ্যা অনুযায়ী তাহা পর পর ততবার পুনরাবৃত্তি করিতে হইবে।

উলশিল্পীদের কাছে অত্যন্ত প্রচলিত বলিয়া অনেক সময় উল অর্থে সুতা এবং কাঁটা অর্থে কাঠি ব্যবহার করিয়াছি। আশাকরি ইহা বুঝিতে কাহারও অসুবিধা হইবে না।



ছত্রাক

(Fungi)

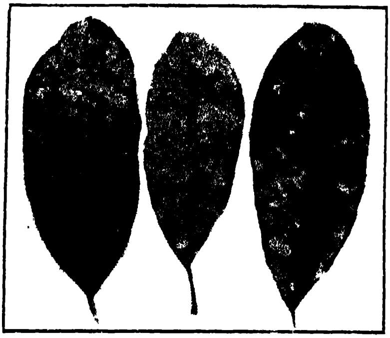
২৯০৮ পৃষ্ঠার পর

বর্ষাকালে ও তাহার অব্যহতি পরেই গোচারণ ভূমি, পচা কাঠ বাঁশ পাতা, খড় গোবর প্রভৃতির উপর ব্যাঙের ছাতা ও তাদেরই জ্ঞাতি ভাইদের জন্মিতে দেখা যায়। পচা ফল, তরি-তরকারি, ভিজা চামড়া, রুটির উপর 'ছাতা' (mould) ধরে, এমন কি ইহাদেরই কেহ মানুষের দেহ আক্রমণ করিয়া দক্র রোগের সৃষ্টি করে। ইহারা যে উদ্ভিদ সে কথা না বলিয়া দিলে তোমরা জানিবে কি করিয়া? সাধারণ গাছপালার মত ইহাদের তো ডাল পাতা, ফুল ফল কিছুই হইতে দেখা যায় না। কিন্তু তাহা হইলেও ইহারা উদ্ভিদ, এবং নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদ। অন্য গাছ পালা হইতে ইহারা দুই বিষয়ে পৃথক, সেইজন্য ইহাদের অঙ্গ সংস্থানও পৃথক। ইহারা হয় **পরজীবী** (Parasi.es), আর না হয় **মৃতজীবী** (Saprophy.es)। বীজ বা ফল দিয়া ইহারা বংশ রক্ষা কিংবা বিস্তার করে না, কাজেই ইহারা **অবীজ** বর্গের অন্তর্গত। ইহারা একপ্রকার বাজরেণু (spore) দ্বারা বংশ রক্ষা ও বিস্তার করে। বাজরেণুগুলি এত ক্ষুদ্র যে অনেক সময় উহাদিগকে খালি চোখে দেখাই যায় না। আমাদের চারিদিকে বাতাসে সর্ব্বদাই ইহারা ভাসিয়া আছে। সুযোগ ও সুবিধা পাইলেই বাসা বাঁধিয়া ইহারা আত্মপ্রকাশ করে। একটুকরা পাউরুটি ভিজাইয়া কোন খানে ফেলিয়া রাখিও। দুই তিন দিন পরেই দেখিবে তাহার উপর 'ছাতা' পড়িয়াছে। প্রথম অবস্থায় ছাতাকে শাদা তুলার মত দেখিতে হয়। পরে সমস্ত ছাতা কাল হইয়া যায়।



ভিজা পাউরুটির উপর মিউকর ছাতার আত্মপ্রকাশ

ভিজা পাউরুটির উপর তুলোর মত যে দেহ প্রকাশ পায় তাহা তুলার আঁইশের মতই এক



ছাতা দ্বারা আক্রান্ত পাতার উপর দাগ

প্রকার অতি সূক্ষ্ম তন্তু দ্বারা গঠিত। ছত্রাকের সম্পূর্ণ দেহকে মাইসিলিয়ম (mycelium), এবং সূক্ষ্ম তন্তুকে অনুসূত্র (hyphae) বলে। বীজরেণু নানাপ্রকার বীজরেণু-স্থলীর (fructifications) মধ্যে উৎপন্ন হয়। আমরা সচরাচর ব্যাঙের ছাতা কিংবা অন্যান্য ছত্রাক যাহা দেখিতে পাই সেগুলি নানা প্রকারের বীজরেণু স্থলী।

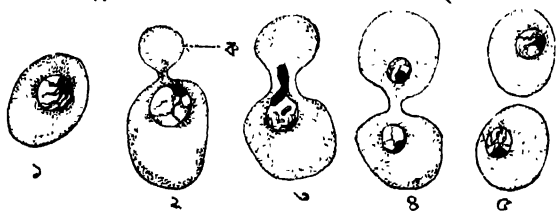
ইহাদের মধ্যে যাহারা পরজীবী তাহারা জীবন্ত উদ্ভিদের শিকড়, কাণ্ড, পাতা প্রভৃতিকে আক্রমণ করে এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই পাতার ভিতর দিয়া শরীরে প্রবেশ করিয়া অবশেষে তাহার প্রাণান্ত ঘটায়। এই রকমে আক্রান্ত গাছের পাতার উপর প্রথমে নানাপ্রকার দাগ দেখা যায়, ক্রমশঃ পাতার বর্ণান্তর ঘটে, তারপর উদ্ভিদের শরীর আক্রমণ করে। ইহারা প্রতি বৎসর যব, গম, বার্লি, ধান প্রভৃতি গাছের প্রভূত অনিষ্ট সাধন করে। আমরা শুধু চোখে যাহাদের দেখিতে পাই তাহাদেরই সহিত তোমাদের একটা মোটামুটি পরিচয় করাইব।

দেহের গঠন-জটিলতার উপর ছত্রাক গোত্রকে চারিটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা হয়, যথা—

(১) **আরচিমাইসিটিস** Archimycetes)—ইহাদের দেহ মাত্র খানিকটা সচল প্রোটোপ্লাজম বা প্রাণবস্তু দ্বারা গঠিত। ইহাদের দেহে কোন প্রকার কোষ-প্রাচীর (cell-wall) থাকে না।

(২) **ফাইকোমাইসিটিস** (Phycomycetes)—ইহাদের দেহ অনুসূত্র দ্বারা গঠিত। অনুসূত্রগুলির মধ্যে কোন পর্দা থাকে না। ইহারাই তরিতরকারীর মহাশত্রু। ভিজা রুটির উপর ছাতা-রূপে যে আত্মপ্রকাশ করে সেই মিউকর (mucor) এই শ্রেণীর অন্তর্গত। আলুকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহারাই পচাইয়া থাকে।

(৩) **এস্‌কোমাইসিটিস** (Ascomycetes)—ইহাদের দেহের অনুসূত্রগুলি পর্দাদ্বারা বহু প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। এই শ্রেণীর অন্তর্গত ঈস্‌টের (yeast)



ঈস্‌ট ও তাহার বংশবৃদ্ধি



পচা গোবরের উপর পিজাইজা ছাতা

সঙ্গে তোমাদের সাক্ষাৎ পরিচয় আছে। ঈস্‌টের দেহ মাত্র একটি কোষ দ্বারা নির্মিত। তাদের

রস গাঁজিয়া তাড়ি হয় ঈস্টের প্রভাবে। পাউরুটি ঈস্টে না হইলে ভাল ফোলে না, ঈস্টে ভাইটামিন



মরচেলা নামক এস্কোমাইসিটিস ছাতা

প্রচুর থাকায় ঔষধ ও খাদ্য হিসাবেও ইহার ব্যবহার আছে যথেষ্ট। ইহাদের বীজরেণু-স্থলীকে এস্কস (ascus) বলে; এবং বীজ-রেণুকে বলে এস্কো-রেণু (ascospore)—পচা গোবরের উপর ইহাদেরই একজনের ছোট ছোট বাটির মত বীজরেণু-স্থলী দেখিতে পাইবে।

(৪) **ব্যাসিডিওমাইসিটিস** (Basidio-mycete)—ব্যাঙের ছাতা এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহাদের বীজরেণুকে ব্যাসিডিও-রেণু (basidiospore) বলে। ইহারা কাঠ প্রভৃতির মহাশত্রু। ব্যাসিডিওমাইসিটিকে সাধারণ ভাবে নিম্নলিখিত ১১টি প্রধান বংশে ভাগ করা হয়।

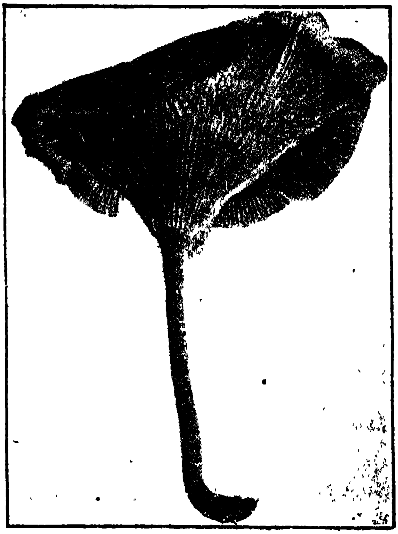
(১) এগারিকস্ বংশ
(Agaricaceae)

ইহারাই ব্যাঙের ছাতা নামে পরিচিত। ইহাদিগকে যে কেন এই নামে অভিহিত করা হয় জানি না, কিন্তু ব্যাঙের সাথে ইহাদের কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়া আজও প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। ব্যাঙ জলে থাকে, ইহারাও ভিজা যায়গায় জন্মে, আর দেখিতেও অনেকটা ছাতার মতই, তাই বোধ হয় কেহ ইহার নামকরণ



ফ্লামুলা নামক ব্যাঙের ছাতা

করিয়াছিল ব্যাঙের ছাতা। কিন্তু বৃষ্টির সময় জলচারী ব্যাঙ বৃষ্টি হইতে নিজের মাথা বাঁচাইবার



লেন্টাইনস্ নামক ব্যাঙের ছাতা

জন্য ইহাকে ছাতা হিসাবে ব্যবহার করিয়াছিল, বা করে কি না তাহার গবেষণা আজও কেহ করেন

নাই। তোমরা যদি পার করিও। ইহাদের সহিত মানুষের খাদ্য খাদকের সম্বন্ধ আছে। সেজন্য মানুষ,



হেক্সাগোনা নামক পলিপোর

বিশেষতঃ পশ্চিমের মানুষ, ইহার চাষও করিয়া থাকে। তাই ইহাদের কথা স্বতন্ত্রভাবে পরে আলোচনা করিব। ব্যাঙের ছাতার টুপির তলদেশে ফলক বা গিল (gill) থাকে।

(২) পলিপোরস বংশ

(Polyporaceae)

ইহাদিগকে মরা গাছ, পচা কাঠ প্রভৃতির উপর প্রচুর দেখিতে পাইবে। ইহাদের বীজরেণু-স্থলী অনেকটা ব্রাকেটের মত দেখিতে। কেহ নরম বা কোমল, কেহ শক্ত, আবার কেহ চামড়ার মত; ইহাদের আকারেও যথেষ্ট পার্থক্য। কিন্তু সকলের তলদেশেই নানা প্রকারের অসংখ্য কূপ বা রন্ধ্র (pore) দেখিতে পাইবে। "পলি" (poly) অর্থে "বহু" এবং পোর (pore) অর্থে "রন্ধ্র" বা কূপ। সেই জন্যই ইহাদের সাধারণ নাম পলিপোর। এই ছিদ্রগুলির মধ্যে অসংখ্য বীজরেণু উৎপন্ন হয়, উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইলেই উহারা বংশ বিস্তার করে। ইহারা এক হইতে বহু বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিতে পারে, অবশ্য যদি খাদ্য ফুরাইয়া না যায়। কাঠের ইহাদের মত মহাশত্রু আর কেহ নাই। কাঠের অনিষ্টকারী উই কিংবা পোকা এবিষয়ে ইহাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না। ইহাদের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য দামী কাঠকে ঔষধ ব্যবহারে ইহাদের আক্রমণ ব্যর্থ করা হয়।

(৩) হিড্‌নম বংশ

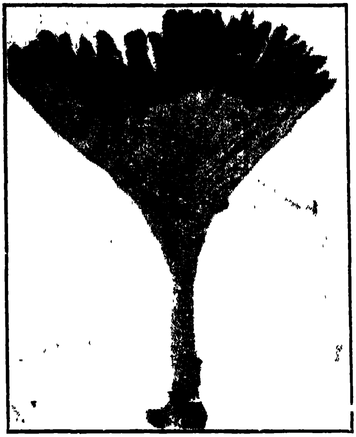
(Hydnaceae)

ইহারাও কাঠের মহাশত্রু। ইহারা দেখিতে অনেকটা পলিপোরস ছত্রাকের মত। কিন্তু বীজরেণু-স্থলীর তলদেশে রন্ধ্রের পরিবর্ত্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য দন্ত (teeth) থাকে। এই দন্তই ইহাদের বৈশিষ্ট্য। প্রত্যেকটি দন্তের গাত্র হইতে বহু বীজরেণু



হিড্‌নম

উৎপন্ন হয়। ইহারা জীবিত কিংবা মৃত গাছ, কাহাকেও রেহাই দেয় না, মানুষ কিন্তু ইহাদের



থিলিফোরা

কয়েকজনকেও তাহার আহার্য্য হিসাবে ব্যবহার করে।

(৪) থিলিফোরা বংশ

(Thelephoraceae)

ইহাদের মধ্যে অনেক প্রকার জাতিভেদ আছে। ইহাদের আকৃতিও নানা প্রকারের। ইহাদিগকে সাধারণতঃ গাছের ডাল, কাঠ, বাঁশ প্রভৃতির উপর ঢেউতোলা বা পাতলা ছালের মত দেখিতে পাইবে। কখনও বা ইহাদের কেহ কেহ ব্রাকেটের, কিংবা বাটি বা ফানেলের আকারও ধারণ করে। ইহাদের ফলক (gill) রন্ধ্র (pore) কিংবা দাঁত (teeth) থাকে না। বীজরেণু ইহাদের সমতল গাত্র হইতে উৎপন্ন হয়। ইহারা জীবিত ও মৃত গাছের প্রভূত অনিষ্ট সাধন করে। মানুষ কিন্তু ইহাদেরও কয়েকজনকে আহার্য্য হিসাবে ব্যবহার করে।

(৫) ক্ল্যাভেরিয়া বংশ

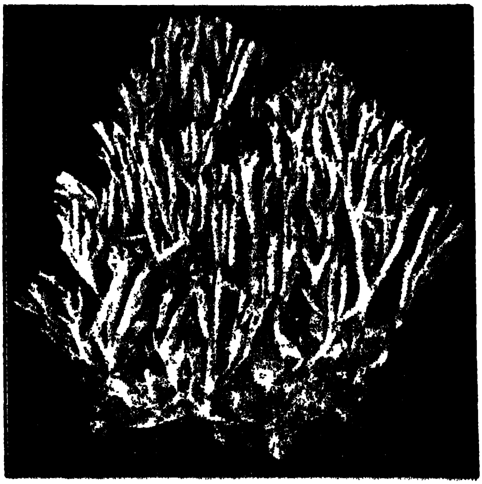
(Clavaria)

ইহারা অতি ক্ষুদ্র ও কোমল। উন্মুক্ত প্রান্তর, গভীর অরণ্য, উদ্যান প্রভৃতি ইহাদের বাসস্থান। পচা পাতা কিংবা পচা কাঠের উপরও ইহাদিগকে জন্মিতে দেখা যায়। আমি ইহাদের একজনকে নর্দ্দামার পিটের (pit) মধ্যে লোহার উপর জন্মিতে দেখিয়াছিলাম। ইহাদের গুচ্ছাকারে সজ্জিত দেহ দেখিতে অতি সুন্দর এবং ছোট ছোট কোরাল (coral) গুচ্ছের মত। ইহারা নানা বর্ণের হইতে পারে। ইহাদেরও কেহ কেহ মানুষের আহার্য্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

(৬) ট্রেমেল্লা বংশ

(Tremellinaceae)

ইহারা নানা আকারের হইতে পারে। কেহ বা বাটির ন্যায় কেহ বা মানুষের কানের মত। ইহাদের দেহ সাধারণতঃ জিলেটিনের মত।



ক্ল্যাভেরিয়া

জল পাইলেই ফুলিয়া উঠে এবং চট্‌চটে ও যুক্ত হয়, কিন্তু শুকাইয়া গেলে শৃঙ্গের ন্যায়

(horny) হইয়া যায়। ইহাদের সাধারণ নাম কান-চটা। পচা কাঠ গাছের গুঁড়ি, বাঁশের বেড়া



ট্রেমেল্লা

প্রভৃতির উপর বর্ষাকালে ইহাদিগকে খুঁজিলেই পাইবে।

(৭) ফ্যালাস বংশ
(Phallaceae)

বর্ষাকালে বৃষ্টি যখন রাতদিনই লাগিয়া আছে সেই সময় দুই একদিনের জন্য ইহাদিগকে দেখিতে পাইবে। ইহারা দেখিতে অতি সুন্দর, এবং পচা

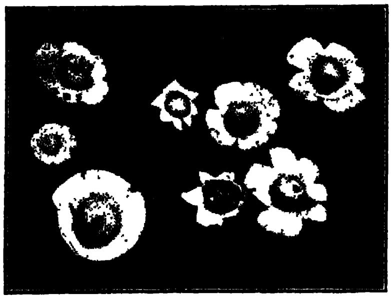


ট্রেমেল্লা বংশের অরিকিউলেউলেরিয়া

কাঠ, পাতা প্রভৃতির মধ্য হইতে হঠাৎ আত্ম-প্রকাশ করে। আকারে অনেকটা ব্যাঙের ছাতার মত হইলেও ইহাদের টুপির নীচে ফলক বা গিল থাকে না। এই টুপির গায়ে বীজরেণুগুলি এক প্রকার পিচ্ছিল জলীয় পদার্থে ভাসিয়া থাকে। বৃষ্টির জলে ধুইয়া সেগুলি মাটিতে পড়িয়া কালে নূতন উদ্ভিদের সৃষ্টি করে। ইহাদেরই কয়েকটা অবগুণ্ঠনের ছবি এখানে দেওয়া হইল। কচুর ফুল ফুটিলে যেমন একটা দুর্গন্ধ বাহির হয়, ইহাদের আবির্ভাব হইলে একটা অস্বাভাবিক দুর্গন্ধের জন্য না দেখিয়াই ইহাদের অস্তিত্ব ঠিক পাওয়া যায়।

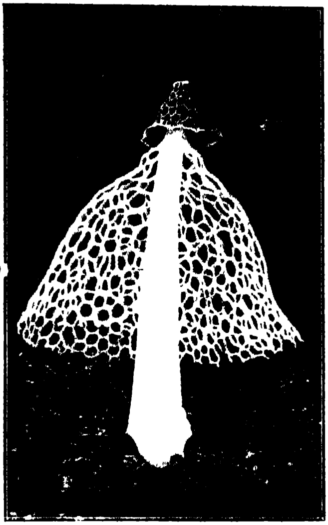
(৮,৯) লাইকোপার্ডন ও স্‌ক্লেরোডার্মা বংশ
(Lycoperdaceae & Sclerodermaceae)

পচা কাঠের উপর ইহাদিগকে বড় একটা দেখা যায় না। ইহাদিগকে যদি দেখিতে চাও তবে গোচারণ ভূমিতে খোঁজ করিও। ইহারা দেখিতে



লাইকোপার্ডনবংশের গিয়াস্টার

গোলাকার ও শ্বেতবর্ণ। প্রথমাবস্থায় ইহাদের দুইটি আবরণ থাকে। একটু বড় হইলেই বহিরা-বারণটি টুকরা টুকরা হইয়া অন্তরাবরণের উপর লাগিয়া থাকিয়া কাঁটার মত দেখায়। কখনও কখনও বা ছেঁড়া বহিরাবরণটি দেখিতে খাঁজকাটা



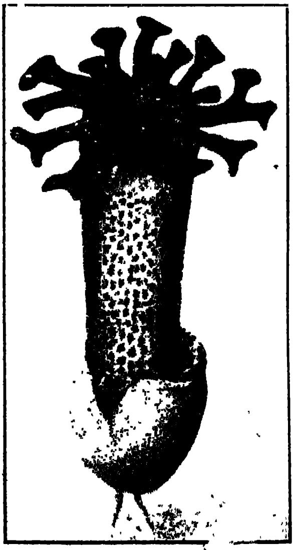
১



৩



৪





ফ্যালাস বংশের কয়েকজন—১। ডিকটিওফোরা ২। কল্‌চব্রেনেরা ৩। অ্যাসেরি ৪। ক্ল্যাথ্‌রাসে ৫। সিমব্রম

একটি বাটির ন্যায় হয়, আর তাহার ভিতর থাকে গোলাকার বলটি। বলটি পরিপক্ক হইলে লাইকো-পার্ডনএর অন্তরাবরণের উপরিভাগে একটি ছিদ্র দেখা দেয় এবং এসরস্লোডার মতো উহা ফাটিয়া যায়। সেই ছিদ্র বা ফাটলের ভিতর দিয়া ধূলার মত বীজরেণু সজোরে বহির্গত হয়। ইহাদিগকে বাঙ্গলায় 'ভুকুণ্ডা' বলে। ইহাদের প্রায় সকলেই মানুষের আহার্য্যরূপে ব্যবহৃত হয়।



লাইকোপার্ডন

(১০) হাইমেনোগেস্‌টার বংশ

(Hymenogastraceae)

ইহারাও বর্ষাকালেই দেখা দেয়। কিন্তু সহজে ইহাদিগকে খুঁজিয়া পাইবে না। গাছের গোড়া, আর না হয় মাঠে ঘাটে মাটি খুঁড়িয়া ইহাদিগকে বাহির করিতে হয়। মাটির নীচে, অনেক সময় অনেকখানি নীচে, ইহারা জন্মে; আবার সময় সময় দেহের খানিকটা মাটির উপরও ইহাদের কেহ কেহ পাঠাইয়া থাকে। তোমরা ভাবিতে পার যাহাকে দেখা যায় না, তাহাকে অনিশ্চিত ভাবে খুঁজিব কোথায়? সে জন্য ভাবনা নাই। ইহারা জন্মিলেই মহাপুরুষদের আবির্ভাবের মত একটা অস্বাভাবিক কিছু হইবেই। সেই অস্বাভাবিক ঘটনা হইতেছে ইহাদের গায়ের পচা পনিরের, তুলসীর, আর না হয় বাদামের গন্ধ। এই গন্ধই ইহাদের অস্তিত্ব জানাইয়া দেয়। গন্ধ অনুসরণ করিয়া মাটি খুঁড়িলেই ইহাদের গোলাকার দেহ দেখিতে পাইবে। দেহ কখনও কখনও সম্পূর্ণ গোলাকার না হইয়া অন্য প্রকারেরও হইতে পারে। আবার কাহারও কাহারও মসৃণ গাত্র হইতে সরু শিকড়ের মত অঙ্গ বাহির হইয়াছে দেখা যায়।

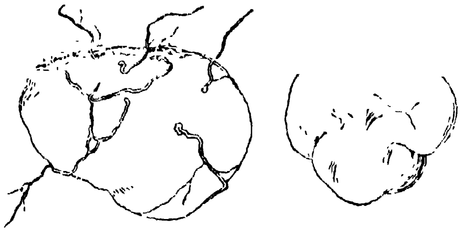
ইহাদের আবরণ কখনও ছিন্ন হয় না, কাজেই হয় ইহাদের দেহ মাটির ভিতর পচিয়া, আর না হয় কুকুর, কাঠবিড়ালী, শূকর ইহাদের গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া মাটী খুঁড়িয়া খাওয়ার জন্য ইহাদিগকে ছিঁড়িয়া বাহির করিবার সময় ইহাদের বীজরেণু মাটীর সহিত মিশিয়া যায়। পরে অনুকূল অবস্থায়

নূতন গাছের উৎপত্তি হয়। ইহারাও একপ্রকার ভুঁকুণ্ডা।

(১১) নিডিউলেরিয়া বংশ

(Nidularaceae)

ইহারা আকারে ক্ষুদ্র হইলেও দেখিতে অতি সুন্দর; ডিম সুদ্ধ একটী পাখীর বাসার মত।

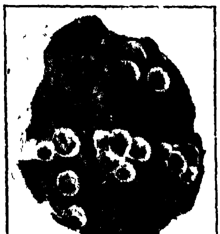


হাইমেনোগেস্টার

ইংরাজীতে সেই জন্যই ইহাদিগকে Bird's nest Fungi বলে। বাসাটি দেখিতে কখনও বাটীর ন্যায়, কখনও বা ফানেলের ন্যায়; আর ডিমের মত অংশগুলির ভিতরই অসংখ্য বীজরেণু উৎপন্ন হয়। ইহাদিগকে মাটি, পচা কাঠ, পচা সার প্রভৃতির উপর দেখিতে পাইবে।



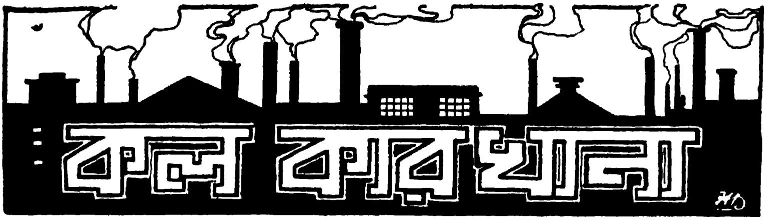
নিডিউলেরিয়া বংশের মায়াথাস



নিডিউলেরিয়া বংশের ক্রুসিবিউলম

অতি অল্পকথায় ছত্রাকের কিছু পরিচয় তোমরা পাইলে। নিজেরা চেষ্টা করিয়া ইহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিও। মানুষের উপর ইহাদের প্রভাব বড় কম নহে। তাহার আহার্য্য ছাড়াও তাহার ভাষায় কিংবা সাহিত্যে তোমরা ইহাদের পরিচয় পাইবে। Mushroom growth' উপমা যখন তখন তোমরা শুনিতে পাইবে। কথাটা ছত্রাকের, বিশেষ করিয়া ব্যাঙের ছাতার, আশ্চর্য্য রকম বৃদ্ধি পাইবার ক্ষমতা হইতে আসিয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে ২।৩ ঘণ্টায় ইহারা ৬''—৮'' ইঞ্চি বৃদ্ধি পাইয়াছে। আবার এক একটা পলিপোর ছত্রাক (Polyporus squamosus) জন্ম হইতে তিন সপ্তাহের মধ্যে ১৭ সের পর্য্যন্ত ওজনে হইয়াছে দেখা গিয়াছে। আমেরিকায় Lycoperdon bovista নামক একটী ভুঁকুণ্ডা ছত্রাক ৫' ফুট ৪'' ইঞ্চি ব্যাস এবং ১৫½ ফুট পরিধি লাভ করিয়াছিল। আমাদের দেশে অবশ্য এত বড় ছত্রাক আজ পর্য্যন্ত আবিস্কৃত হয় নাই।

বৃদ্ধির সময় ইহাদের শক্তিও বড় কম হয় না। বেসিঙ্গষ্টক সহরে ২১''×২১'' ইঞ্চি একখানি প্রস্তর খণ্ড পাকা সানের সহিত সিমেণ্ট দ্বারা সংযুক্ত অবস্থায় দুইটী বেঙের ছাতা উহাকে ভাঙ্গিয়া জমি হইতে ১½'' ইঞ্চি ঠেলিয়া উঠাইয়াছিল। বুঝিয়া দেখ কত শক্তি থাকিলে সেটা সম্ভব হইতে পারে। ইহারা যেমন শীঘ্র বৃদ্ধি পায় তেমনই শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়। ছত্রাকের ইতিহাস কেমন মনোরম দেখিলে ত !



বস্ত্র-শিল্প

কাপড়ের কল

২২৩৯ পৃষ্ঠার পর

তোমাদের যখন শীত বোধ হয় তখন তোমরা গায়ে রেপার, জামা, এই সকল গরম কাপড় পর। তার কারণ, পশমী, রেশমী, সূতী এই সকল বস্ত্র ব্যবহার করিয়া, আমরা শীত গ্রীষ্মের হাত হইতে দেহ রক্ষা করি। ঋতুভেদে বস্ত্রাদির ব্যবহারেরও পরিবর্ত্তন করিতে হয়। মানুষ যখন প্রথম পৃথিবীতে সৃষ্টি হইল, সেই অতি আদিম যুগের কথা বলিতেছি তখন মানুষ কি করিত জান? তাহারা গাছের বাকল পরিত, বন্য পশুর গায়ের ছাল গায়ে জড়াইয়া শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষার উপদ্রব হইতে আত্মরক্ষা করিত। যেমন দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, মানুষ সভ্য হইতে আরম্ভ করিল, চাষবাস করিতে শিখিল, আগুন জ্বালিতে শিখিল, তখন তাহারা শিল্প, বাণিজ্য এবং কৃষির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ ধান গম প্রভৃতির মত তুলার চাষও যে দরকারী তাহাও বুঝিতে পারিল, সেই সময়ে কার্পাস গাছ হইতে যে তুলা হয় তাহাও আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। এই ভাবে তুলা হইতে কিরূপে সূতা বাহির করিতে হয় তাহা আবিষ্কার করিতেও দেরী হইল না। ক্রমে মানুষ ঐ সব সূতা হইতে তাঁতের সাহায্যে কাপড় প্রস্তুত করিতে শিখিল। তখন আর তাহাদের দেহ গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীত প্রভৃতি ঋতুর হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য ভাবিতে হইল না।

তোমাদের কাছে খুব প্রাচীন কথা বিস্তারিত ভাবে বলিবার আবশ্যক নাই। শুধু তোমাদের নানা দেশ-বিদেশে এবং বাঙ্গালাদেশে এক সময়ে বস্ত্র-শিল্পের কতদূর উন্নতি হইয়াছিল সেই কথা বলিতেছি। তোমরা ঢাকার নাম শুনিয়াছ, এক সময়ে ঢাকা বাঙ্গালাদেশের রাজধানী ছিল, ঢাকার কাপড় এখনও দেশবিখ্যাত, কিন্তু তিন চারিশত বৎসর পূর্ব্বে ঢাকার মস্‌লিন্ ভারতের গৌরবের সামগ্রী ছিল। ঢাকার প্রাচীন অধিবাসী বসাকেরা সে সময়ে মস্‌লিন্ নামে যে সূক্ষ্ম শাদা বস্ত্র প্রস্তুত করিতেন, তাহা এক সময়ে পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছে। সে কালের সভ্য রাজ্য মাত্রেই এই বস্ত্র আদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছে এবং সর্ব্বত্র উহা সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে।

ভারতবর্ষে যখন মুসলমানেরা রাজা ছিলেন তখন ঢাকায় মসলিন্ বস্ত্রের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল, মুসলমান নবাব ও বাদশাহের পোষাক তৈয়ারীর জন্য কিংবা দিল্লীর রাজসভা বা দরবার সাজাইবার জন্যই ঢাকাই মসলিন্ আদরের সহিত গৃহীত হইত। তোমরা মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের কথা ইতিহাসে পড়িয়াছ, তাঁহার বেগম বা সাম্রাজ্ঞী নূরজাহানের

নামও জান। নূরজাহান, ঢাকাই মস্‌লিনের অত্যন্ত আদর করিতেন। তাঁহার যত্নে এই ব্যবসায়ের এতদূর শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল যে তখনকার তিন গজ লম্বা ও একগজ চওড়া একখণ্ড খুব পাতলা মসলিন্ বা মলমলখাস চারশো টাকায় বিক্রী হইত।

ঢাকার মস্‌লিনের সূক্ষ্মতা সম্বন্ধে অনেক গল্প আছে। শুনা যায় সেকালের একখানি এক গজ



কার্পাস

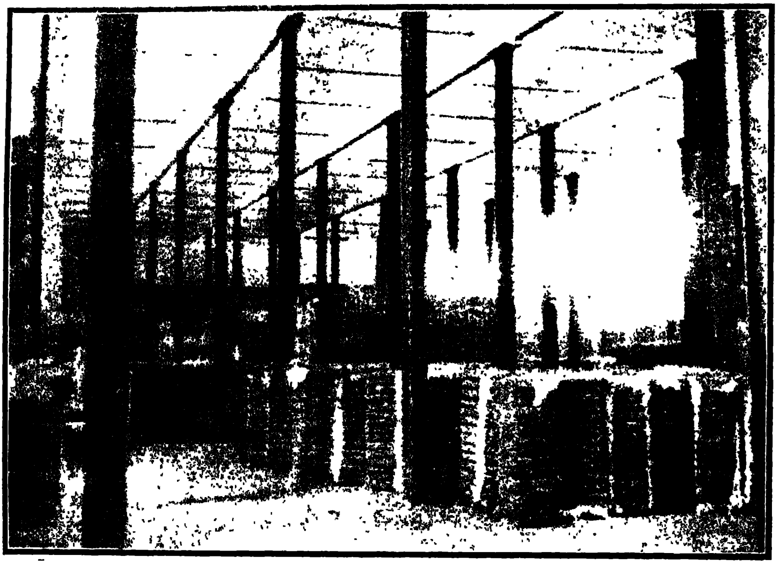
প্রস্থ বিশ হাত লম্বা ভাল মস্‌লিনের থান লম্বাদিকে অনায়াসে একটী আংটীর মধ্যে গলিয়া যাইত। ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে ট্রাভারনিয়ার নামক বিখ্যাত ভ্রমণকারী বলিয়া গিয়াছেন যে, একদা পারস্য-রাজের দূত ভারতবর্ষ হইতে ফিরিয়া যাইবার সময় উটপক্ষীর ডিম্বাকৃতি একটি মুক্তাখচিত নারিকেল খোলের ভিতর ত্রিশগজ লম্বা একটি পাগড়ীর থান পুরিয়া পারস্যরাজকে উপহার দিবার জন্য লইয়া গিয়াছিলেন। ত্রিশ হাত দীর্ঘ ২ হাত প্রস্থ একখণ্ড মস্‌লিন্ ওজনে ৪।৫ তোলা হইত এবং তাহা ৪০০৲।৫০০৲ টাকায় বিক্রয় হইত।

মুসলমানদিগের রাজত্বকালে যে ঢাকাই মস্‌লিনের অধিক উন্নতি হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে বস্ত্রের প্রচলিত নামগুলিই বিশেষ প্রমাণ। "সওগাতি" অর্থাৎ সওগাৎ দিবার উপযুক্ত, "শরবতী (বোধ হয় শরবৎ শব্দ হইতে উৎপন্ন), "মল্‌মল্‌খাস" অর্থাৎ খাস মল্‌মল্ বা রাজার ব্যবহারের উপযুক্ত মল্‌মল্, "আব-রোআন" অর্থাৎ প্রবাহিত জল, "সব-নম্" বা সান্ধ্যশিশির এবং "বাফৎ-হাওয়া" বা হাওয়া সঙ্গতি, ঝুনা, সরকার আলি, রং, বদনখাসা, আলবল্লা, তনজেব, তরন্দাম, নয়নসুখ, সরকন্দ কাপড় ইত্যাদি নামগুলি কবিত্বপূর্ণ। এ সকলগুলিই মুসলমানগণের প্রদত্ত বলিয়া বোধ হয়। আবরুয়া নদীবক্ষে বা শিশির-সিক্ত স্থানে বিছাইয়া দিলে ঐ জল ও শিশিরের সহিত ইহা এমনি মিশাইয়া যায় যে হঠাৎ আর উহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না অথবা গায়ে একখানি কাপড় থাকিলে তাহার মধ্য দিয়া বেশ বাতাস প্রবেশ করিতে পারে। এইরূপ সূক্ষ্মতা হেতুই বোধহয় নামদাতাগণ এই বস্ত্রকে কখন জল, কখন শিশির এবং কখনও বা বায়ুর সহিত তুলনা করিয়া গিয়াছেন।

একজন ইংরাজ ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন—The muslins of Dacca were once held in the highest esteem. The East India Company imported great quantities of calicoes and muslins, which in England came to be regarded as necesssary for articles of apparel. In 1621 about fifty thousand pieces of cotton cloth were brought by the Company to this Country and sold at a pound a piece. The finest qualities—the muslins from Dacca—were described as 'woven air' or 'woven wind'. These became invisible when spread upon the grass and subjected to the dews.

মুসলমানদিগের রাজ্যনাশের সঙ্গে সঙ্গে এবং ইংরেজদিগের রাজ্য গ্রহণের কয়েক বৎসর পর

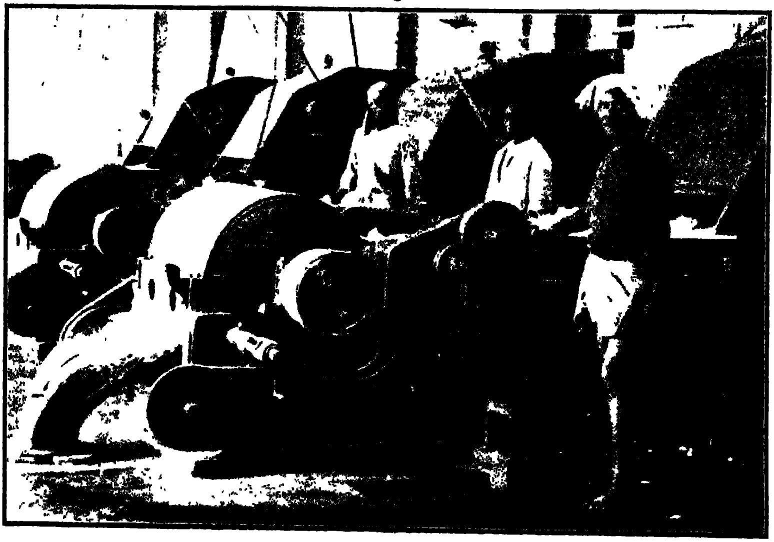
হইতে ভারতের এই সুন্দর বস্ত্র ব্যবসায় দিন দিন লোপ পাইয়া আসিতেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে যখন ঈষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির হাতে এ দেশের শাসনভার ন্যস্ত ছিল তখন তাঁহাদের অধীনে বঙ্গদেশের যে যে স্থানে ভাল কাপড় তৈয়ার হইয়া থাকে সেই সেই স্থানে দুই-একটা করিয়া কুঠী ছিল ঐ সকল কুঠীতে দেশীয় শিল্পীগণ কর্ম্ম করিয়া নানা প্রকার বস্ত্র প্রস্তুত করিত। ঈষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি প্রায় পঁচিশ লক্ষ টাকার শুদ্ধ ঢাকাই বস্ত্র-মস্‌লিন্, জামদানী প্রভৃতি ক্রয় করিতেন। যাহা হউক এ সুখের অবস্থা বড় অধিক দিন ছিল না, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই অবস্থা অনেক অবনত হইয়া পড়ে। ১৮০৭ সালে ১১ লক্ষ ৫৬ হাজার ১ শত টাকার কাপড় বিক্রয় হয় মাত্র, এখন সেই অবস্থা দিন দিন আরও এত অবনত হইয়াছে যে, আজকাল বোধ হয় বৎসরে আন্দাজ ৩ লক্ষ টাকার অধিক



তুলোর বস্তা

তাঁহাদের কারখানা সমূহে প্রস্তুত সমস্ত কাপড় এবং দেশের অন্যান্য কারিকরদিগের হস্তনির্ম্মিত বস্ত্রাদি সংগ্রহ করিয়া ব্যবসা করিতেন এবং বিস্তর কাপড় জাহাজে করিয়া আপনাদের দেশে লইয়া গিয়া তদ্দারা অনেক ধন সঞ্চয় করিতেন। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ঢাকার সূক্ষ্ম মসলিন বস্ত্র ইউরোপের গৃহে গৃহে আদরের সহিত গৃহীত হইত। এই সময়ে এখানকার বস্ত্র এতদূর প্রচলিত ছিল যে ঈষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি ও আরব-সওদাগরগণ তখন বৎসরে কাপড়ও বিক্রয় হয় না। সম্ভবতঃ ইহারও অনেক কম বিক্রয় হয়।

ঢাকার বুটা তোলা মস্‌লিন্ 'কাসিদা' নামে পরিচিত। এক সময়ে কাসিদা আরবদেশীয় বণিকেরা পারস্য, তুরস্ক প্রভৃতি দেশে রপ্তানী করিত ঐ সব দেশে কাসিদা সৈন্যদের পাগড়ী রূপে ব্যবহৃত হইত। কাসিদা প্রায় ৫০।৬০ প্রকারের প্রস্তুত হইত। নবাবী আমলে এক এক খানা রেশমী কাসিদা চার পাঁচ শত টাকায় বিক্রয় হইত। কেবল সূতা দ্বারা



তূলা পেঁজা



তূলার চাদর

যে কাসিদা প্রস্তুত হয়, তাহা চিকন নামে অভিহিত হয়। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে কাসিদার মূল্য ৫০৲ টাকা হইতে ৮০৲ টাকা ছিল। ঐ সনে (১৮৪০ সালে) ১২০০০০ খণ্ড কাসিদা ঢাকা হইতে রপ্তানী হইয়াছিল। উহার ৫৯ বৎসর পরে ১৮৯৯ সালে ৯০০০০৲ টাকার কাসিদা ঢাকা হইতে রপ্তানী হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে ঢাকা হইতে প্রায় দুই লক্ষ টাকার কাসিদা রপ্তানী হইয়া থাকে। এক এক খানা



তুলোর বোঁয়া পরিষ্কার করা এবং ভিন্ন করা হইতেছে

কাসিদার মূল্য ৮৲ টাকা হইতে ৫০৲ টাকা। ঢাকা সহরের উপকণ্ঠে সানেরা বিলিশ্বর, মাণ্ডাইল, নাগর প্রভৃতি স্থানের মুসলমান স্ত্রীলোকেরা কাসিদার কাজ করেন।

এখন আমাদের দেশে বিলাতী কলের কাপড় এতই প্রচলিত হইয়াছে যে, দেশীয় বস্ত্র আর কেহ কিনিতে চায় না। আবার ভাল রকম দেশীয় বস্ত্র যাহা কিছু এখন তৈয়ার হয় সে সমুদয়ই প্রায় বিলাতী সূতায় তৈয়ারী হইয়া থাকে। ইহা দেখিয়া এ কালের অনেকেই মনে করিয়া থাকেন যে, আমাদের দেশের লোকেরা হয়ত কখন সূক্ষ্ম সূতা প্রস্তুত করিতে শিক্ষা করে নাই। ইহা ভুল কথা। হইতে পারে আমাদের ন্যায় আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের হাড়ে হাড়ে যখন বিলাতী সভ্যতা প্রবেশ করে নাই—যখন এ দেশের লোক মাত্রেই শুদ্ধ ধুতি চাদর পরিয়া বাবু সাজিত—চোগা, চাপকান, পিরাণ, কোট, পেণ্টলুন প্রভৃতি যখন এদেশে প্রচলিত ছিল না—তখনকার চলনসই দেশী বস্ত্রের জন্য যে সকল দেশী সূতা ব্যবহার করা হইত তাহা আজকালকার বিলাতী সূতার ন্যায় সূক্ষ্ম হইত না। ইহা সত্য কথা, কিন্তু ইহা আবার আরও সত্য কথা যে, এদেশে ঢাকাই মস্‌লিনের ন্যায় বহুমূল্য বস্ত্রের জন্য যে দেশী সূতা বহুকাল হইতে আজ পর্য্যন্তও তৈয়ার হইতেছে তাহা আবার জগতের অপর কোন জাতি প্রস্তুত করিতে পারে না। ঢাকার আশে-পাশে তন্তুবায়শ্রেণীর অশিক্ষিতা রমণীগণ

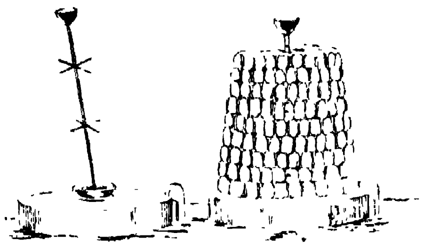
ঢাকার মসলিন্ প্রস্তুত করিবার যন্ত্র ও তাহাদের নাম



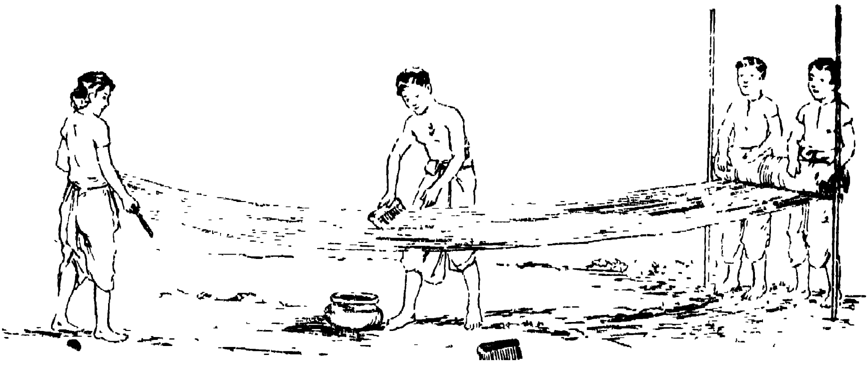
সূতা পাকা



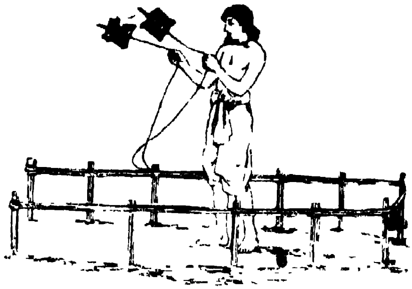
ফেটি বাঁধা



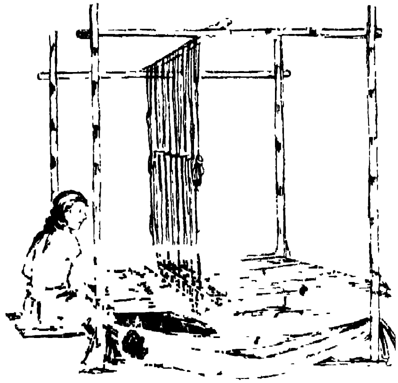
দুইটি তাঁত — বাঁ দিকে খালি তাঁত, অপরটিতে সাজান কাপড়



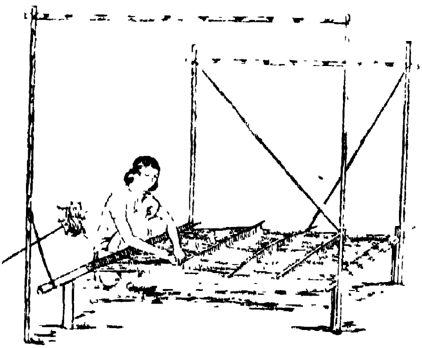
ধোয়া মসলিনের স্থানভ্রষ্ট সূতাগুলিকে দোরস্ত করা হইতেছে



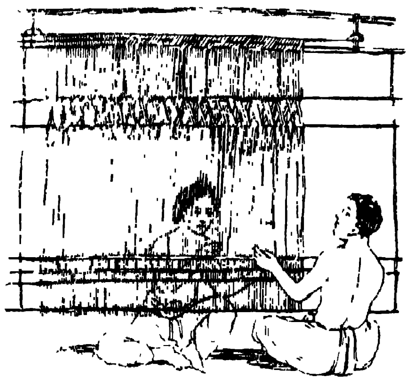
টানা তৈয়ারী



কাপড় বুনিবার পূর্বে সূতা জমির উপর
বিছাইয়া রাখিয়াছে



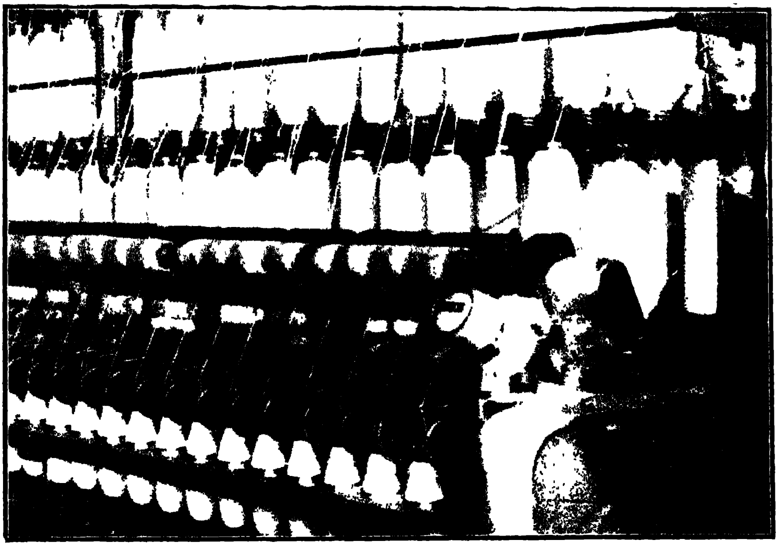
তাঁহারা ঘরের মধ্যে তাঁত খাটাইয়া তাঁত বুনিতেছে



সানা বিন্ধন

আস্‌না তুলা হইতে দেশীয় পদ্ধতি অনুসারে যে সূক্ষ্মতম সূতা প্রস্তুত করিয়া থাকেন তাহার নিকট ইংরেজের কলে প্রস্তুত খুব ভাল সূতাও দাঁড়াইতে পারে না। ইহা হইতে আমাদের আহ্লাদের বিষয় আর কি আছে? ইংরেজেরা ইহা শিক্ষা করিবার জন্য কত অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, কত বৎসর ধরিয়া পরীক্ষা করিয়াছেন, বড় বড় মেলার সময় এ দেশের সূতা লইয়া গিয়া ইউরোপীয় নানা প্রকার সূক্ষ্ম সূতার সহিত তুলনা করিয়া কাহার কিরূপ পাক, কোন্ সূতা কত সরু ইত্যাদি সমস্ত বিষয় অনুবীক্ষণ লইয়া ভাল করিয়া শিক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু তাঁহাদের সে সকল চেষ্টা বিফল হইয়াছে। তুলা হইতে সূতা ও সূতা হইতে কাপড় প্রস্তুত করিতে সর্ব্বশুদ্ধ ১২৬ রকম ছোট বড় দেশীয় যন্ত্র আবশ্যক। এই সকল যন্ত্র দড়ি, বাঁশ, বাখারি, বেত, লোহা ও শরকাটি প্রভৃতি যৎসামান্য সামগ্রীতেই তৈয়ারী হইয়া থাকে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ইহারা সামান্য হইলেও আজ পর্য্যন্ত ইংরেজদিগের কলের তাঁত এদেশের তাঁতকে হারাইতে পারে নাই।

পূর্ব্বে বলা গিয়াছে যে, আগেকার ন্যায় আজকালের ঢাকাই মসলিন বেশী দামী হয় না। কিন্তু এখনও যাহা আছে তাহারই বা তুলনা কোথায়? এখনকার এক তোলা আসনা তুলার সূতার মূল্য সূক্ষ্ম ভেদে ৭৲ টাকা হইতে ১৮৲ টাকা। মসলিনের জন্য এক রতি ওজনের সূতা সচরাচর ১৪০ হইতে ১৭৫ হাত পর্য্যন্ত লম্বা হইয়া থাকে। আবশ্যক হইলে ইহা অপেক্ষাও সরু করা যাইতে পারে। আধসের তুলা হইতে ১২৫ ক্রোশেরও অধিক লম্বা সূতা বাহির করা হইয়াছে। মহিলাদের কোমল হস্তে কেমন করিয়া সূতা তৈয়ার হয় তাহা এখানে বলা হইল।

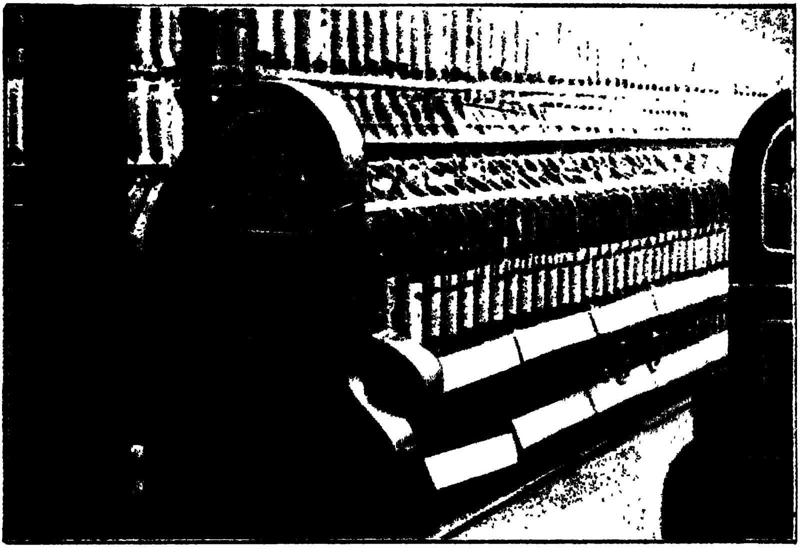


সূতার নালী তৈয়ারী হইতেছে

প্রথমতঃ খানিকটা তুলা লইয়া তাহাতে পাতার কুঁচি মাটি প্রভৃতি যাহা কিছু জড়িত থাকে তাহা

খুব যত্ন করিয়া বাছিতে হয়। তারপর বোয়াল মাছের চোয়ালের দন্তপাটি দ্বারা তুলাটুকু আস্তে আস্তে আঁচড়ন হয়। বোয়াল মাছের দাঁতগুলি ছোট, ঘন ঘন ও একটু বাঁকা। ইহাতে বেশ চিরুণীর মত কাজ করে। তুলা আঁচড়ান হইলে একখানি পাতলা চাল্‌তা কাঠের তক্তার উপর বিছাইয়া তাহার উপর দিকে একটি সরু লোহার শলা এরূপ ভাবে একবার এদিক একবার ওদিক করিয়া চালান মত ছোট ছোট গালা মাখান শর কাটিতে জড়াইতে হয় ও সর্ব্বশেষে ঐ কাটিগুলিকে কুঁচিয়া মাছের কোমল ও মসৃণ ছালে ঢাকিয়া রাখা হয়। এক একটি গালাব কাটি জড়ানো তূলাকে "পুণী" বলে ইহাদিগকে ঢাকিয়া রাখিলে সূতা কাটিবার সময় কোন রকম ময়লা ধরে না।

তূলা হইতে কেমন করিয়া সূতা কাটিতে হয় তাহা প্রথম চিত্রে দেখান গেল। ত্রিশ বৎসরের



সরু সূতার নালী

হয় যে, বীচি না ভাঙ্গিয়া কেবল তাহা হইতে তূলা আলাদা হইয়া পড়ে। এই তূলাকে ছোট ধনুকযন্ত্রে ধুনিতে হয়। এই ধনুর জন্য তাঁত, মুগা, রেশম, কলার সূতা অথবা বেতের সূতা ব্যবহার করা হইয়া থাকে। তূলা ধুনা হইলে একটি মোটা রকম কাঠের দণ্ডে উহা আলগা করিয়া জড়াইয়া অবশেষে দণ্ডটী মধ্য হইতে টানিয়া বাহির করিয়া তূলা-পিণ্ডকে দুই খানা তক্তার মধ্যে ফেলিয়া চাপিতে হয়। তারপর এই তূলাকে আবার পেন কলমের অল্প বয়স্কা স্ত্রীলোকগণই সূক্ষ্ম সূতা কাটিয়া থাকেন। শুষ্ক বায়ু ও উত্তাপের সময় তূলার আঁইস টানিতে গেলে ছিঁড়িয়া যায়, এজন্য শীতকালে সকালে সূর্য্যোদয়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব হইতে এবং অপরাহ্নে ৩|৪টা হইতে সূর্য্যাস্তের আধ ঘণ্টা পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভাল সূতা কাটিবার উপযুক্ত সময়। কিন্তু অধিক দামী সূতা সূর্য্য উদয়ের পূর্ব্বে ঘাসের উপর শিশির থাকিতে প্রস্তুত করা হয়। কখন কখন বায়ুর শুষ্কতা নিবারণের একটি সহজ উপায় অবলম্বন করা হইয়া

থাকে। একটা প্রশস্ত জলপাত্র নিম্নদেশে রাখিয়া তাহার উপর সুতা রাখা হয়। তাহা হইলে জল হইতে যে বাষ্প উঠে তাহা দ্বারা তুলাকে কতকটা নরম রাখে। সুতা কাটিবার জন্য এই কয়েকটি দ্রব্যের আবশ্যক। ১ম "পুনী", ইহার কথা উপরে বলা গিয়াছে। দ্বিতীয় মোটা সুঁচের মত একটি ১০ হইতে ১৪ ইঞ্চি লম্বা লোহার "টেকো"। ইহার নীচের দিকে একটু উপরে একটি মাটীর

দ্বিতীয় চিত্রে নাটাইয়ে করিয়া সুতার ফেটি বান্ধা, তৃতীয় চিত্রে কাপড়ের টানার জন্য সুতা তৈয়ারী করা ও চতুর্থ চিত্রে সানার ভিতর সুতা পরাণ প্রভৃতি দেখান গেল।

এইবার তোমাদের কাছে ছবিগুলির পরিচয় দিতেছি। স্ত্রীলোকদের উপর সুতা কাটার ভার ছিল। তাহারা সুতা কাটিয়া তাঁতীদের দিলে পর তাঁতীরা তাহা হইতে কেমন করিয়া নলী



সুতার সুক্ষ্মতম অবস্থা

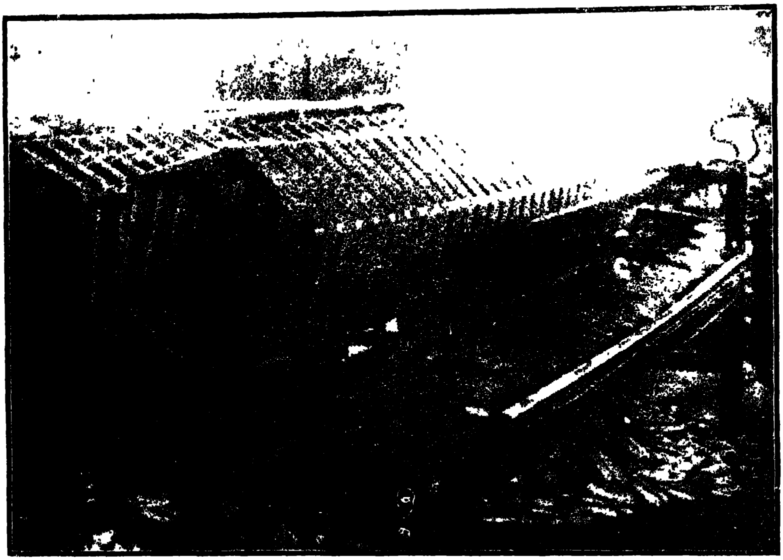
গোলাকার বর্তুল বা চক্র থাকে। এরূপ ভাবে জিনিষ তলায় না থাকিলে টেকোটি কখনই একবার মাত্র হাতে করিয়া ঘুরাইয়া দিলে কিয়ৎকাল উহা আপনা আপনি ঘুরিত না। (৩য়) এক খণ্ড শাক। ইহার উপর দিকটা মাটির দ্বারা ঢাকা। টেকো ঘুরাইবার সময় এই শাঁকের উপর তাহার নিম্ন ভাগটা রাখা হয়। (৪র্থ) ছোট একটা পাথর বাটি, এই বাটাতে খড়ির গুড়া থাকে। হাত যাহাতে তেলা না হয় তজ্জন্য বারবার এই খড়ির গুড়া হাতে লাগান হয়।

পাকায়, ফেটি বাঁধে তাহাই চিত্রে দেখান হইয়াছে। নল শব্দ হইতে—নলী হইয়াছে। নলী পাকান অর্থে কতকগুলি ফাঁপা কঞ্চি কাঠি ৪ ইঞ্চি আন্দাজ টুক্‌রার আকারে করিয়া তাহাতে এক এক ফেটির সুতা জড়ান হয়। এইরূপ সুতা জড়ান এক একটি নলকেই নলী বলে। নলীর গর্ভে একটি সরু কাঠি পুরিয়া ঐ কাঠির দুই প্রান্ত একখান চেরা বাখারির অগ্রভাগে লাগাইয়া দিলে গাড়ীর চাকার মত নলটি ঘুরিতে থাকে। যে বাখারিতে নলটি লাগাইয়া দেওয়া হয় উহা তাঁতী বাঁ পায়ের

দিয়া চাপিয়া ধরে। তাঁতীর ডান হাতে একখানা ফেটি জড়াইবার নাটাই থাকে; নাটাইয়ের বাঁটের নিম্নভাগটি একখণ্ড নারিকেল খোলের মধ্যে ঘুরিতে ঐ খোলাটি তাঁতির ডান পায়ের আঙ্গুলের ঠেসে স্থির থাকে। একটি নলীর সমস্ত সূতা নাটাইয়ে জড়াইয়া লইলে উহা নাটাই হইতে উঠাইয়া ছোট ছোট ফেটি বাঁধা হয়।

টানা ও পোড়েনের সূতা ঠিক এক সময়ে বা এক নিয়মে তৈয়ার করা হয় না, পোড়েনের সূতা যেমন কাপড় বুনিবার দুইদিন পূর্ব্বে তৈয়ার করিলে চলে, টানার সূতা সেরূপ নয়।

টানা ও পোড়েনের সূতা ঠিক এক সময়ে বা একই নিয়মে তৈয়ার করা হয় না, পোড়েনের সূতা যেমন কাপড় বুনিবার দুইদিন পূর্ব্বে তৈয়ার



সূতোর লাছি

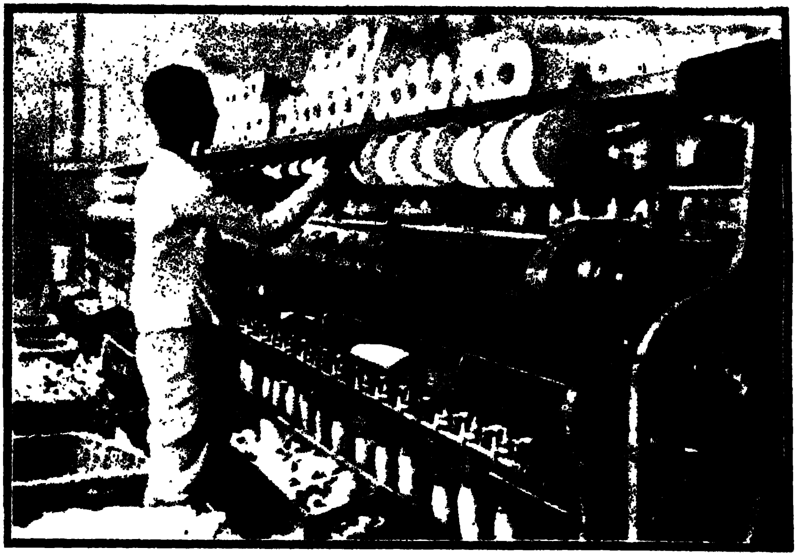
সমস্ত সূতাকে প্রধানতঃ টানা ও পোড়েন এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। টানা অপেক্ষা পোড়েনের সূতা সূক্ষ্ম হওয়া দরকার। এই পোড়েনের সূতা আবার তিনরূপ বাছাই করা হয়। ভাল সূতাগুলি ডান হাতের দিকে, মাঝারি গুলি বাম হাতের দিকে এবং খেলো বা মোটাগুলি মাঝখানে দেওয়া হয়। আমাদের দেশী কাপড় মাত্রেই যে মুখপাতের দিকে ভাল ও পিছনের দিকে খারাপ কেন হয় তাহা বোধ হয় তোমরা বুঝিতে পারিলে। এখন বোধ হয় এই বিষয়টি বেশ বুঝিতে পার।

করিলেই চলে, টানার সূতা সেরূপ নয়। ইহা তৈয়ার করিতে অনেক সময় দরকার, এই সূতা তৈয়ারির কথা বিস্তৃতরূপে বলিতে গেলে অনেক কথা লিখিতে হয়। আমরা মোটামুটি এই পর্য্যন্ত বলিতেছি যে, টানার সূতা তিন দিন জলে ভিজাইতে হয়। চতুর্থ দিনে সূতাকে বেশ করিয়া ধুইয়া ২য় চিত্রে প্রদর্শিত নিয়মানুসারে ফেটি বান্ধিয়া জলে ভিজাইতে হয় এবং দুইটা কাটির দ্বারা ঐ ফেটির সূতাটুকু খুব পাক দিয়া জড়াইয়া রৌদ্রে শুকান হয়। তারপর সূতাগুলিকে আবার দুই দিনের জন্য কয়লার গুড়া বা

ভুষা মিশ্রিত জলে ডুবাইয়া রাখা হয় ও দুই দিনের পর পরিষ্কার জলে ধুইয়া ছায়ায় শুষ্ক করিতে হয়, এই সময় সুতাকে আবার একবার নাটাইয়ে পাকাইয়া আবার এক রাত্রির মত জলে ভিজাইতে হয় ও পরদিন খইয়ের মাড়ের সহিত খানিকটা পরিষ্কার চূণ ও জল মিশাইয়া এক রকম মণ্ড তৈয়ার করিয়া সুতাগুলিকে উত্তমরূপে মাখান হয়। তারপর ঐ মণ্ড মাখা সুতাকে নাটাইয়ে জড়াইয়া

"চারখানা" কাপড় তৈয়ার করিতে হইলে একটু স্বতন্ত্র নিয়মের দরকার। সাদা কাপড়ের জন্য যেমন একগাছি মাত্র সুতা পাট করা হয়; তাহা না করিয়া ডুরের জন্য দুইগাছি সুতা ও চারখানার জন্য চারগাছি সুতা একত্রে জড়ান ও উপরোক্ত নিয়মে পাইট করা আবশ্যক।

আজকাল আমাদের দেশীয় চলনসই বস্ত্র মাত্রেই প্রায় বিলাতী কাপড় অপেক্ষা কেন যে অধিক



সুতোর চিজ্ বা চাকৃতি

রৌদ্রে শুকাইতে হয়। একগাছি সুতা পরিলে পাছে পরস্পরে জড়াইয়া যায় এই জন্য মাড় দেওয়া সুতা নাটাইয়ে জড়াইবার সময় খুব সাবধান হওয়া দরকার। যেন এক এক ফের সুতা আলাদা আলাদা থাকে। মাড় মাখা সুতা বেশ শুকাইয়া গেলে আর একবার মাত্র নাটাইয়ে পাকাইয়া লইলেই টানার সুতা তৈয়ার হয়। কিন্তু আমরা যে সুতার কথা বলিলাম ইহা কেবল শাদা থান বুনিবার জন্যই দরকার হয়। "ডুরে" কিম্বা

টেঁকে তাহার প্রধান কারণ আমাদের দেশের তাঁতীরা সুতাকে রীতিমত পাইট করে বলিয়া, ঢাকাই মসলিনের সুতার যেমন পাইট দরকার তেমন পাইট অবশ্য আর কোন কাপড়ের জন্য দরকার করে না তথাচ একথা ঠিক যে আমাদের দেশে যেরূপ যত্ন করিয়া বার বার সুতা পাকান হয় ও তাহাতে মাড় মাখাইয়া শক্ত করা হয়, সেরূপ না করিলে দেশী কাপড় কখনই টেঁকসই হইত না। আবার দেখ, সুতা বেশ করিয়া পাইট

করিলে শুধু যে তাহা শক্ত হয় তাহা নয় কিন্তু সরুও হইয়া থাকে। ঢাকাই তাঁতীরা এতদূর ওস্তাদ যে ৩০০ নম্বর বিলাতী সুতাকে পাইট করিয়া ঠিক ৪০০ নম্বরের সুতার মত করিয়া দিতে পারে। যে কাপড়ের সুতা ধোপে কম ফোলে বা ফাঁপিয়া উঠে তাহাই অধিক দিন স্থায়ী হয়। আমাদের দেশী তাঁতীরা যে সুতা তৈয়ারী করে তাহা বেশ পাক খায় বলিয়া ধোপে এলাইয়া যায় না। ইহাই করিয়া মাড় মাখাইয়া ছায়ায় শুষ্ক করিলেই হইল। এইরূপে পোড়েনের সূতা একেবারে তৈয়ার না করিয়া প্রত্যহ একদিনের বুনিবার মত খানিকটা করিয়া সুতা প্রস্তুত করিয়া লইত। টানার সুতা তৈয়ার হইলে পর এক প্রশস্ত যায়গায় গিয়া উহা বিস্তার করিয়া তাঁতীরা কাপড়ের থান যত বড় হইবে সেই মাপ অনুসারে দুইসারি গোঁজ পুঁতিয়া তাহাদের গায়ে লম্বাভাবে সুতা বিছাইতে থাকে। দুইটি



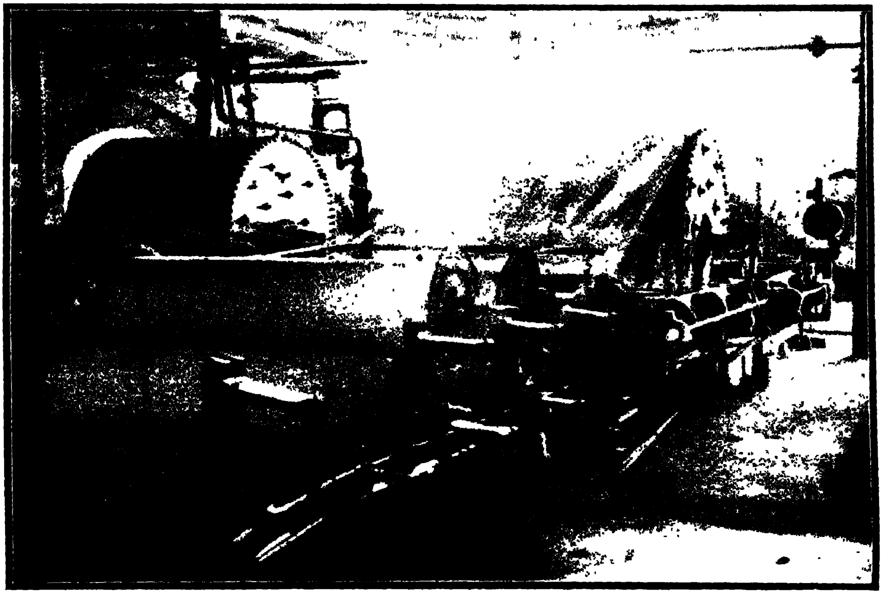
তাঁতের ব্যবহারের জন্য টানা সুতার পূর্ব্বাবস্থা

আমাদের দেশী কাপড়ের বেশী টেকসই হইবার সর্ব্বপ্রধান কারণ।

পোড়েনের সুতা কাপড় বুনিবার দুইদিন পূর্ব্বে তৈয়ার করিলেই কেন চলে জান? কারণ টানার সুতার মত পোড়েনের সুতা একবারে তৈয়ার করা দরকার করে না। ইহার পাইট ও অনেক কম এমন কি ইহাতে যে মাড় লাগান হয় তাহাও অল্প। একদিন বুনিবার মত খানিকটা সুতা লইয়া ২৪ ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া পরে নাটাইয়ে পাকাইয়া ও অল্প লাইন সমান্তরাল হওয়া আবশ্যক অর্থাৎ একলাইন হইতে অপর লাইনের ফাঁক, কোথাও কম বেশী হয় না যেন সব জায়গায় সমান হয়। এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বোনা হইত। টানার সুতা বিছান হইলেই উহা সানায় চড়ান হয়। সানায় যতগুলি খাজ থাকে সেই মত সানার নাম দেওয়া হয়। অর্থাৎ কোন্ সানায় ২৮০০ খাজ থাকিলে তাহাকে ২৮ শর সানা, ২৬০০ খাজ থাকিলে তাহাকে ২৬ শর সানা বলা হয়। এইরূপ নামগুলিও কিন্তু শুনিতে বেশ!

এইভাবে সমস্ত ঠিকঠাক হইলে কাপড় বুনিতে আরম্ভ করা হয়। তাঁতীরা কেমন করিয়া তাঁত খাটায় তাহা ছবিতে দেখিতে পাইবে। সেকালের ইংরাজ-ভ্রমণকারীরা তাঁহাদের ভ্রমণ-কাহিনীতে ঢাকার মসলিন বোনা নিজের চোখে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়াছেন—'ভারতবাসীরা যে সকল যন্ত্রের সাহায্যে এই সূক্ষ্ম কাপড় বুনিয়া থাকে ইউরোপীয়দিগের কদাকার অঙ্গুলিতে সে সকলের সাহায্যে মোটা ক্যানভাস কাপড়ও তৈয়ার করিতে পারে কি না সন্দেহ।" গ্রীষ্মের সময় তাঁতীরা মসলিন কাপড় বুনিতে পারিত না। উৎকৃষ্ট কাপড় মাত্রেই সকালে বৈকাল বুনা হয়। আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র এই তিন মাসই খুব ভাল মস্‌লিন বুনিবার উপযুক্ত সময়।

ঢাকার মস্‌লিন কাপড় ধোয়াও ভারি সহজ ছিল না। এই কাপড় দশ বারো বার ভাটিতে চড়ান আবশ্যক। মস্‌লিন কাপড় প্রতি রাত্রে ভাটি করিয়া পরদিন উহা ক্ষার জল মাখাইয়া রৌদ্রে শুকানো হইত। এই ভাবে দশ পনের দিন কাটিয়া গেলে শেষ ভাটির পরে কাপড়গুলি পরিষ্কার জলে ধোয়া হইত। সে সময় জলের সহিত লেবুর রস মিশান দরকার ছিল। থান প্রতি একটি করিয়া বড় লেবুর রস ব্যবহৃত হইত। শাদা কাপড়ের জন্য যেমন লেবু, তেমনি কার্পাস ও মুগা (রেশম) মিশ্রিত কাপড় সমূহের জন্য লেবুর রস ও চিনি ব্যবহার করা হইত, চিনিতে নাকি কাপড়ের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করিত। জুলাই হইতে নভেম্বর এই কয় মাস মস্‌লিন ধুইবার উপযুক্ত সময়। যে কাপড় যতবার ভাটি করা হইত, তাহা সেই পরিমাণে শাদা ও পরিষ্কার হইত। এইজন্য ১০০ থান কাপড় ধুইতে ও পাট করিতে ৩০৲ টাকা হইতে কখন কখন ১৬০৲ টাকা পর্য্যন্ত ব্যয় হইত।

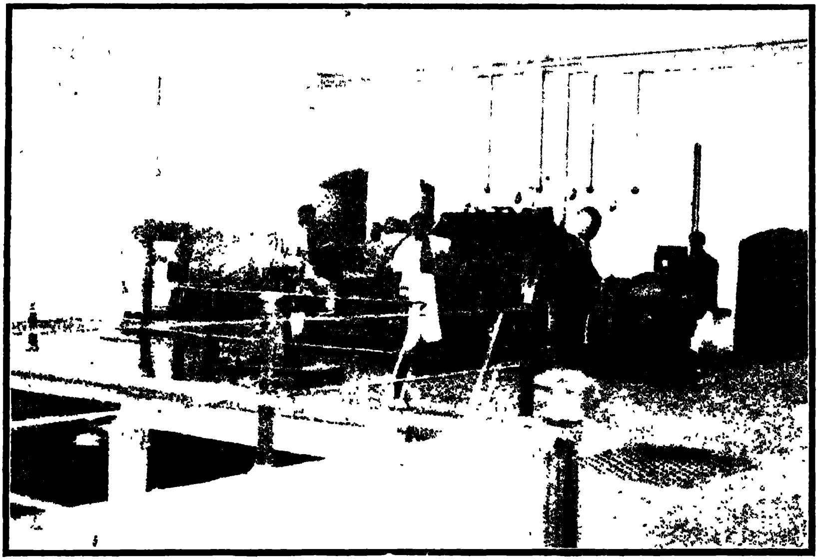


মাড় দেওয়ার কল

পাটে আছড়াইবার সময় মস্‌লিনের সূক্ষ্মতর সুতাগুলি অনেক সময় স্থানে স্থানে এলোমেলো হইয়া পড়ে। কাপড় ধোয়া হইলে সেই স্থানভ্রষ্ট সুতাগুলিকে কেমন করিয়া দোরস্ত করা হয়, তাহাই চিত্রে দেখান হইয়াছে। একদিকে জমির দুটি খোঁপার সহিত সংলগ্ন একটি "নরদ" বা দণ্ডে দুই জনে কাপড়ের থানটি গুটাইয়া ধরিয়া আছে অপর দিকে আর একজন ঐ থানের খানিকটা বিস্তার করিয়াছে। মধ্যস্থলে চতুর্থ ব্যক্তি যেখানে যেখানে উহা সুতা হেলা গুছা হইয়া গিয়াছে তাহা ঠিক্ করিয়া দিতেছে।

মস্‌লিন পাটে আছড়াইবার সময় তাহার অনেক সুতা ছিঁড়িয়াও নষ্ট হইয়া যায়। রিফুগারেরা সেই সেই সুতার পরিবর্তে নূতন সুতা লাগাইয়া দেয়। ঢাকার মুসলমানেরা রিফুগারিতে বিশেষ দক্ষ। একজন সুদক্ষ রিফুগার ২০ গজ লম্বা একটি সূক্ষ্ম মস্‌লিন থান হইতে একগাছি ছেঁড়া বা মোটা সুতা বাহির করিয়া তাহার স্থানে ঠিক্ সেইরূপ লম্বা আর একগাছি ভাল ও সূক্ষ্ম সুতা পরাইয়া দিতে পারিত। ঢাকায় সেকালে এইরূপ অনেক দক্ষ রিফুওয়ালা ছিল।

ঢাকার মসলিন কি ভাবে তৈয়ারী হইত সেকথা বলিলাম। এখন মসলিন সম্বন্ধে আরও কয়েকটি কথা বলিতেছি। বিচিত্র কারুকার্য্য-খচিত মসলিনের নাম জামদানী। জামদানী নানা প্রকারের প্রস্তুত হইত। যথা—কারেলা তোড়াদার, বুটিদার, তেরছা, জলবার, পান্নাহাজরা, চাওয়াল, দুবলীজাল, মেল ইত্যাদি। এক এক খানি জামদানী ২৫০৲ হইতে ৪৫০৲ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইত। এখনও ২০০৲ দুইশত টাকা মূল্যের কয়েকখানা জামদানী বস্ত্র প্রতি বৎসর ত্রিপুরার মহারাজ ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত পরিবারের জন্য প্রস্তুত হয়। সম্রাট ঔরঙ্গজেবের জন্য ২৫০৲ টাকায় এক একখানা জামদানী প্রস্তুত হইত। ঢাকার নায়েব নাজিম মহম্মদ রেজাখাঁর

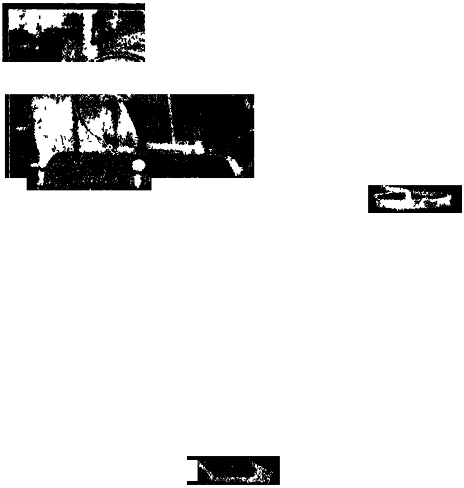


কাপড়ের কলের এঞ্জিন ঘর

জন্য প্রত্যেক থান ৪৫০৲ টাকা করিয়া পড়িত। ১৮৮৪ সনে ৩৫০০০৲ টাকার ১৮৮৬ সনে ৪৫০০০৲ টাকার ১৮৮৭ সনে ২৮৭০০০৲ টাকার বস্ত্র প্রস্তুত হইয়াছিল। নাস্তি, ডেমরা, সিদ্ধিগঞ্জ, কাচপুর, ধামরাই প্রভৃতি স্থানেও জামদানি প্রস্তুত হয়। ঐ সকল স্থানের প্রস্তুত বস্ত্র সহরে প্রস্তুত বস্ত্র অপেক্ষা স্বল্প মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে।

রপ্তানি হইত। ১৭৮৭ সন পর্য্যন্ত ইউরোপ ও অন্যান্য স্থানে এইরূপ সমভাবে মসলিনের ব্যবসায় চলিয়াছিল। ইহার পর হইতেই ঢাকার বস্ত্রশিল্পের অবনতি হইতে আরম্ভ হয়।

১৮০২ সনে কলের সূতা আমদানি হয়। এই সূতার আমদানীর সঙ্গে সঙ্গে মসলিনের আদরও কমিতে থাকে। ঐ বৎসর মাত্র পাঁচলক্ষ থানা



কাপড়ের কলের একটি অংশের

মসলিনের নানা রকম ছিট ও প্রস্তুত হইত। ঐ সকল ছিট নন্দনসাহি, আনাবদানা, কবোতার-খোপ, সাকুতা, পাছাদার, কুণ্ডিদার নামে পরিচিত ছিল।

১৬৬৬—৭০ খৃষ্টাব্দে ঢাকাই মসলিন সর্ব্বপ্রথম ইউরোপেও ইংল্যাণ্ডে পরিচিত হয়। সেই সময় হইতে ফরাসী, ইংরাজ ও দিনেমারগণ ঢাকায় কুঠি স্থাপন করিয়া মসলিনের ব্যবসায় করিতে আরম্ভ করেন। ঢাকার সেই উন্নত সময়ে ঢাকা হইতে বৎসরে ক্রোড় টাকার মসলিন এক ইউরোপেই মসলিন ইংল্যাণ্ডে রপ্তানী হয়। ১৮২০ সনে কোন কোন ভারতীয় বস্ত্র ইংল্যাণ্ডে রপ্তানী হইবার নিষেধ আজ্ঞা প্রচারিত হয় এবং ১৮০১ সনে ঢাকাই মসলিনের উপর শতকরা ১৫৲ টাকা শুল্ক নির্দ্ধারিত হয়। এইরূপ অবস্থায় ১৮০৭ সনে মাত্র ৮½ লক্ষ টাকার মসলিন বস্ত্র ইউরোপে রপ্তানী হয় এবং ১৮১৩ সনে ৩½ লক্ষ টাকার মসলিন ইউরোপে যায়। ইহার পর ১৮১৭ সনে ঢাকার ইংরেজ-বাণিজ্য কুঠি উঠিয়া গেলে, ঢাকাই বস্ত্রের রপ্তানী একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। ১৮২১ সনে বিলাতী

চিকন সূতার আমদানী হইতে আরম্ভ হইলে দেশী সূতাও অচল হইয়া পড়ে। ১৮২৫ সনে মিঃ হাসকিসেন বস্ত্রের মাশুল ১০৲ টাকা হ্রাস করেন। কিন্তু এই অনুগ্রহে কোন ফল হইল না! ১৮২৮ সন হইতে বিলাতী সূতায় মস্‌লিন প্রস্তুত হইতে লাগিল।

১৮৩৮ সালে একখানা ৯ তোলা ১৬০০ গ্রেণ ওজনের মসলিন ১০ পাউণ্ড তখনকার ১০০৲ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যে বিক্রয় হইয়াছে। ১৮৯০ সনে যাহারা বিলাতী সূতায় সাধারণ রকম মসলিন প্রস্তুত করিতে পারেন, ঢাকাতে সেইরূপ ৫০০ ঘর ব্যবসায়ী ছিল। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে নবাব আবদুলগণি বাহাদুর প্রিন্স-অব-ওয়েলসকে উপহার দেওয়ার জন্য যে তিনখানা মসলিন প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, সেই তিনখানা সর্ব্ব-বিষয়ে প্রাচীন মস্‌লিনের আদর্শানুরূপ হইয়াছিল। এই তিনখানার ওজন ৯॥ তোলা মাত্র হইয়াছিল। আকারে এক একখানা ২০ গজ লম্বা ও ১ গজ প্রস্থ ছিল।



কলে প্রস্তুত কাপড়ের প্রদর্শনা

ঢাকাই মসলিন বলিয়া যাহা পরিচিত, তাহা যে কেবল ঢাকাতেই প্রস্তুত হইত তাহা নহে। ঢাকা জেলার বিভিন্ন স্থানে—মসলিন প্রস্তুতের আড়ং ছিল। ঢাকা জেলার মধ্যে সোণারগাঁও, তাঁতবন্দি, ডেমরা, কাপাসিয়া, বাজিতপুর, মুড়াপাড়া, বালিয়াপাড়া, ডঙ্গলবাড়ী, কাটাখালি, আবদুল্লাপুর, কলাকোপা, ডামালপুর প্রভৃতি স্থানে কার্পাস শিল্পের আড়ং ছিল। ১৬৮৫ খৃষ্টাব্দে ভ্রমণকারী রালফ্ ফিচ্ সোণারগাঁয়ে মসলিনের আড়ং দর্শন করেন।

দিল্লীর বাদশাহের বস্ত্র সরবরাহ জন্য তাঁতীরা নিষ্কর তালুক পাইত এবং বিদেশে রপ্তানীর জন্য বিদেশীয় বণিকদিগের নিকট হইতে অগ্রিম দাদন পাইত। অনেক সময় এই দাদন লইয়া তাঁতীদিগের উপর অযথা অত্যাচার হইত। অনেক ব্যবসায়ীও রাজকর্ম্মচারী ৫০০৲ টাকার মালের জন্য ১০০৲ টাকা মাত্র মূল্য প্রদান করিতেন। অথবা এইরূপ দাদন গচ্ছিত রাখিতে চেষ্টা করিতেন। তাঁতীরা

দাদন না লইলে তাহাদিগকে কারারুদ্ধ করিয়া ঐ দাদন গচ্ছিত করা হইত।

কোম্পানীর বণিকেরাও এইরূপ অসহনীয় অত্যাচার করিয়া দাদনের টাকা গ্রহণ করাইতে চেষ্টা করিত। এইরূপ অত্যাচারে দাদন লইয়া অনেকে সর্ব্বস্বান্ত হইত। পাঁচশত টাকার মাল একশত টাকায় দিতে বাধ্য হইত। ঐ সময় বহু তাঁতী নিজ নিজ বৃদ্ধাঙ্গুলী কর্ত্তন করিয়া তন্তুধাবনের

পাট্টা, জোব, শাড়ী, হাম্মাম, গাজিও ঢাকাই ধূতি গোলাবতন, উড়ানি প্রভৃতি বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। ঢাকার গোলাবতন বস্ত্র প্রসিদ্ধ। বালিয়াটি, ধামরাই, আলতুল্লাপুর প্রভৃতি স্থানের কৃষক-তাঁতীরাও তাহা প্রস্তুত করে।

ঢাকার মস্‌লিনের কথা শুনিলে। ঠিক্ এইরূপ ভাবে সপ্তগ্রাম, শান্তিপুর, ফরাশডাঙ্গা, হুগলী, শ্রীরামপুর প্রভৃতি স্থানের তাঁতীরা অতি সুন্দর



কারখানার দৃশ্য

অক্ষমতা জানাইয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিল। অনেক শ্রেষ্ঠ শিল্পীও ঐ সময় বৃদ্ধাঙ্গুলী কর্ত্তন করিয়া চির-কালের জন্য মসলিনের ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া-ছিল। [They have been treated also with such injustice that instances have been known of their cutting of their thumbs to prevent their being forced to wind silk. W. Bolts, 1772]

ঢাকায় মস্‌লিন ব্যতীত,—বাফতা, বুন্নি, এক-

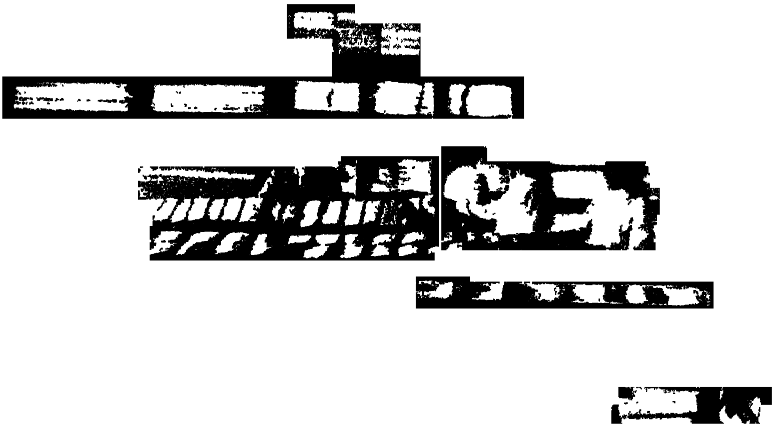
বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিতে পারিত। শান্তিপুরের মস্‌লিনও বিখ্যাত ছিল। সেখানে নানা প্রকার ধূতিও শাড়ী প্রস্তুত হইত। শান্তিপুরের ডুরে শাড়ী বিশেষ রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ইংরাজেরা ও ইউরোপীয় বণিকেরা অনেক টাকার কাপড় ক্রয় করিয়া লইয়া যাইতেন। এখনও যে ঢাকা ও অন্যান্য স্থানের তাঁতীরা উত্তম বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিতে না পারে তাহা নহে, তবে দিন দিনই বাজারে তাহার চাহিদা কমিয়া আসিতেছে। তাই তাঁতীরাও নিজ নিজ

জাতীয় ব্যবসায় ছাড়িয়া দিতেছে।—কি করিবে? কলের সঙ্গে কি আর প্রতিযোগিতা চলে।

—তারপর একদিন আসিল যেদিন কল আসিয়া উপস্থিত হইল।—এমন যে কাপড় বুনা বস্ত্র-শিল্প তাহাও কল কাড়িয়া লইল। মানুষের চেয়ে ও কল অতি সুন্দর ভাবে বুনিতে আরম্ভ করিল! কি তার দ্রুত কাজ করিবার ক্ষমতা—!

এখন বাজারে বস্ত্রের কোন অভাব নাই; কত সুন্দর রঙ-বেরঙের বস্ত্র হইতেছে, কত রকমের এখন অবশ্য অনেকটা কম হয়, বিলাতী কোম্পানী পাট কিনিয়া বিলাতে চালান দিত এবং সেখানে কলের সাহায্যে কাপড়, চট ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া আবার আমাদের দেশে বিক্রয়ের জন্য পাঠাইয়া দিত। তুলা হইতে ভাল ভাল কাপড় ও অন্যান্য জিনিষ প্রস্তুত হয়, এজন্যই আমেরিকা, জাপান, মিশর, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে এত কল-কারখানা দেখিতে পাওয়া যায়।

আমেরিকা ও মিশরের তুলা অতি চমৎকার।



নানাপ্রকারের কাপড়ের সজ্জা

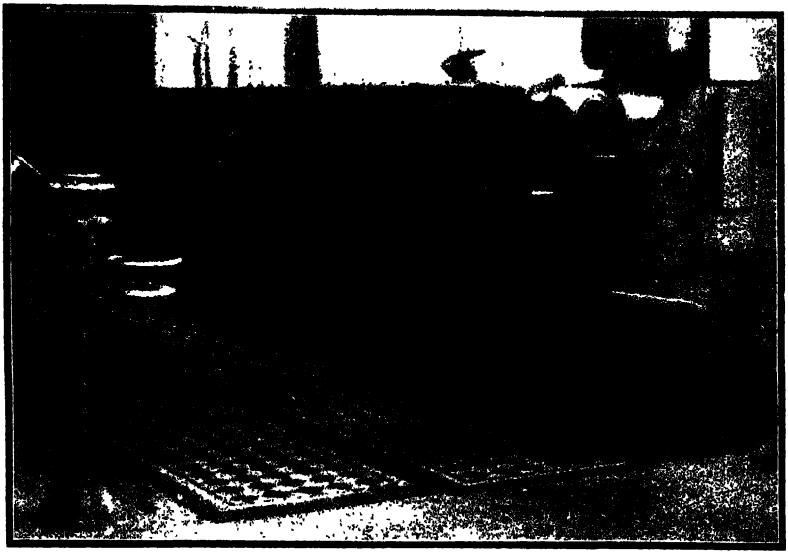
পাড় হইতেছে। মস্‌লিনের কথা পড়িতে পড়িতে তোমরা বুঝিতে পারিয়াছ যে কাপড় বুনা ব্যাপারটা কি! হাতের তাঁতে যেমন টানা পোড়েন—কলেরও তেমনি ব্যবস্থা।

কাপড়ের কল উদ্ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে বিলাতে তুলার বীজ বাছা হইতে আরম্ভ করিয়া কাপড় তৈরী করা পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যাপার কলের দ্বারা করা হয়। বাঙ্গালাদেশে প্রচুর পরিমাণে পাট জন্মিত বিশেষ করিয়া মিশরের তুলার গুচ্ছগুলি বেশ লম্বা বলিয়া উৎকৃষ্ট কাপড় হয়। ঐ তুলা আমেরিকায় খুব বেশী পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

তুলা, তোলা হইলে পর গাঁট বাঁধিয়া কার-খানায় পাঠাইয়া দেওয়া হয়। কলে ঐগুলি পরিষ্কার করিয়া আরও ধপ্‌ধপে সুন্দর করিয়া ফেলে।—তারপর দর্জির মত লম্বা করিয়া পাশা-পাশি করিয়া রাখে ক্রমে ববিন্ (Bob-bin) বা

ছোট ছোট কাঠের টুকরায় জড়ান হয়। তোমরা যদি কাপড়ের কল দেখিতে যাও, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে অসংখ্য সুতার ঢিপি কলের উপর সাজান রহিয়াছে।

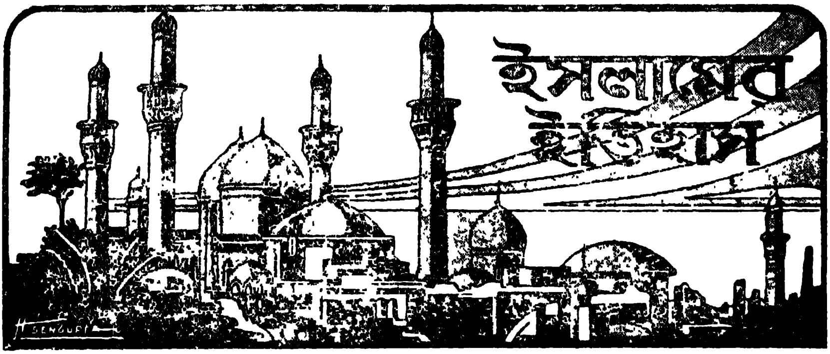
এই ববিন্ বা তুলার ঢিপি হইতে বাহির হইয়া হাজার হাজার নলে একসঙ্গে একই ভাবে পাক খায়। তারপর সেগুলি উত্তমরূপে পাক খাইয়া সুতায় পরিণত হয়। যে যন্ত্রে পাক খাইয়া যন্ত্র দ্বারাও সুতা শুকান হইয়া থাকে। এইরূপ প্রক্রিয়ার দ্বারা জল শুষিয়া গেলে পর যখন রোলার খোলা হয়, তখন দেখিতে পাওয়া যায় যে একখানা সাদা ধব্ ধবে চাদর হইয়া পড়িয়া আছে। তখন ঐ সময় কারখানায় আনিয়া তাঁতের উপরে চড়াইয়া দেয়। যেমন চড়াইয়া দেয় অমনি বিদ্যুৎ বেগে লোহার ছোট বড় রকমারি তক্তা ভোঁ ভোঁ করিয়া চলিতে থাকে। এই ভাবে বোনা হইবার



এঞ্জিন ঘরের একটি দৃশ্য

সুতা প্রস্তুত হয় তাহার নাম Spinning mule. এই ভাবে সুতা প্রস্তুত হইয়া গেলে সেগুলি ক্রমে আবার কলে জড়ান হয়—এই কলে জড়ান সুতাকেই আমরা রিলের সুতা বলি।—এই ভাবে বাহির হইলে পর বড় একটি রোলারে লুচির ন্যায় বেলিয়া যায়। পরে সেই রোলার গরম জলের ট্যাঙ্কের ভিতর দিয়া নীত হয়। সেখান হইতে পুনরায় সুতাগুলি ফ্ল্যানেল-জড়ান রোলারের ভিতর দিয়া চলিয়া যায়। কখনও কখনও হাপরের ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে তাঁতের সামনে একটি রোলারে আসিয়া সব কাপড় জড় হয়। এই ভাবে কাপড় প্রস্তুত হইলে পর, পরিদর্শকেরা কাপড়ের দোষ গুণ পরীক্ষা করিবার পর কলে চাপ দিয়া গাঁট প্রস্তুত করা হয় এবং নানা দেশ বিদেশে চালান দেয়।

ভারতবর্ষের নানা স্থানে কাপড়ের কল আছে। বাঙ্গলাদেশেও এখন কয়েকটি কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে এবং দিন দিন আরও নূতন কল হইবে। কাপড়ের কলের বিভিন্ন বিভাগের ছবি দেওয়া হইল।



হজরত ইব্রাহিম



২৮৯১ পৃষ্ঠার পর

পূর্ব্বে বলিয়াছি হজরত নূহের তিন পুত্র হাম, শাম, ও এয়াফস্। এই এয়াফসের বংশের এক শাখা আর্ম্মেনিয়ার পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইয়া কাস্পিয়ান হ্রদের তীরবর্ত্তী আজর বাইজান এবং হামদান. গীলান প্রভৃতি স্থানে, অপর শাখা দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়া এলাম, আসীরিয়া ব্যাবিলোনিয়া প্রভৃতি স্থানে ছড়াইয়া পড়েন।

হজরত নূহের প্লাবনের প্রায় ১৭০০ বৎসর পরে খৃঃ পূঃ প্রায় ২৫০০।২০০০ বৎসরের মধ্যে এয়াফসের বংশের এই ব্যাবিলনীয় শাখায় **নমরুদ** নামে এক ক্ষণজন্মা পুরুষের জন্ম হয়।

সে সময়ে মানবসভ্যতার সূতিকা-গৃহ মিশর, ব্যাবিলন, এলাম প্রভৃতি রাজ্যগুলি উত্থান পতনের তরঙ্গাঘাতে হাবুডুবু খাইতেছিল। সেই সময় নমরুদ স্বীয় ক্ষমতাবলে ব্যাবিলনে এক ক্ষমতাশালী রাজ্য গঠন করিয়া ক্রমে পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যগুলির উপর আধিপত্য বিস্তার করেন। ব্যাবিলন, এরাক, অক্কাদ শীনার প্রভৃতি দেশের উপব তখন এলামের পূর্ণ আধিপত্য বিস্তৃত ছিল। তিনি প্রথমতঃ ব্যাবিলন, এরাক প্রভৃতি দেশকে এলামের প্রভাব হইতে মুক্ত করেন। তৎপরে আরও উত্তর দিকে অগ্রসর হইয়া তাইগ্রীস নদীর পশ্চিম তীরস্থ অসুর নামক দেশটি জয় করেন এবং তথায় নীনেভ, কালাহ্ প্রভৃতি সহবের পত্তন করেন। উত্তরকালে এই নীনেভ সহরটি শক্তিশালী আসীরিয়া সাম্রাজ্যের রাজধানীতে পরিণত হয়। ব্যাবিলন এবং শীনরেও তিনি অনেকগুলি সহর স্থাপন করেন। ব্যাবিলনে তাঁহার বহু কীর্ত্তিচিহ্ন বিদ্যমান ছিল। মসুলের বিপরীত দিকে তাইগ্রাস নদীর পূর্ব্বতীরে এখনও তাঁহার বিশাল রাজপ্রাসাদের নিদর্শন রহিয়াছে।

তখন শিক্ষার অবাধ প্রচলন হয় নাই। চিত্রলেখার সাহায্যে লোক মনের ভাব প্রকাশ করিত। সুতরাং পূর্ব্বপুরুষদের শিক্ষা জাতীয় জ্ঞান-ভাণ্ডারে সঞ্চিত হইবার পূর্ণ সুযোগ পায় নাই। এতদ্ব্যতীত বহুদিন যাবত কোন পয়গম্বরের আবির্ভাব না হওয়ায় জাতির মধ্য হইতে সৎশিক্ষা একেবারে তিরোহিত হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং ইস্‌লামের শিক্ষাও এক প্রকার বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল; তৎপরিবর্ত্তে পৌত্তলিকতার অবাধগতি সর্ব্বত্র প্রসারিত হইয়া পড়িয়াছিল। চন্দ্র সূর্য্য গ্রহগুলিকে তাহারা এক একটি

দেবতা মনে করিত। ঐগুলির উদয়াস্ত ও গতি-বিধির প্রতি তাহারা লক্ষ্য রাখিত। উহাদের গতিবিধির ও অবস্থানের সহিত পার্থিব ঘটনার দুই চারিটি সামঞ্জস্য বা বৈষম্য লক্ষ্য করিয়া তাহারা ক্রমে এক একটী সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে লাগিল। এই সকল কাজের জন্য মন্দিরের পুরোহিতেরাই অধিক সময় ব্যয় করিতে পারিতেন। ইহারাই ক্রমে গ্রহের ফলাফল এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অনেক সময় তাহাদের এই সিদ্ধান্ত সফল হইয়া যাইত বলিয়া ক্রমে তাহারা ভবিষ্যৎ বক্তারূপে জনসমাজে আদৃত হইতে লাগিলেন। ইহাতে যুগপৎ জ্যোতিষ শাস্ত্রের ও আকাশপূজার উদ্ভব হইল।

তখন জ্ঞানের প্রসার হয় নাই। কার্য্যকারণ সম্ভব অসম্ভব জ্ঞান মানুষের ছিল না। সুতরাং দুই চারিটী ভবিষ্যৎ বাণী সফল হইতে দেখিলেই ভাবী অমঙ্গলের আক্রমণ হইতে সতর্ক হইবার নিমিত্ত ও ভবিষ্যৎ ফলাফল অবগত হইতে লোকে স্বতঃই ব্যাগ্র হইয়া উঠিত। জীবনের এই ভবিষ্যৎ ফলাফলকে অদৃষ্টলিপি বলা হইত। এই অদৃষ্টলিপি খণ্ডনার্থ নির্দিষ্ট দেবতাদের মনস্তুষ্টি বিধানের জন্য পুরোহিতেরা নানা প্রকার মন্ত্র-বচনা ও যাগ যজ্ঞ ক্রিয়া-কলাপের বিধান করিতেন। রাজাও নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তখন যুদ্ধবিগ্রহ প্রায় লাগিয়াই থাকিত। সুতরাং রাজ্যের ও রাজবংশের অদৃষ্ট-লিপি অবগত হইতে তাঁহারা খ্যাতনামা ও ভবিষ্যৎ বক্তাগণকে সাদরে রাজসভায় স্থান দান করিতেন।

মহারাজ নমরুদের রাজসভায় রাজ্যের অনেক বড় বড় ভবিষ্যৎ বক্তা ছিলেন। একদিন তাঁহারা রাজসকাশে নিবেদন করিলেন—"মহারাজ, আকাশে একটি নক্ষত্রের উদয় হইয়াছে। ইহাতে আপনার অমঙ্গলের ইঙ্গিত পরিলক্ষিত হইতেছে। আপনার প্রজাগণের মধ্যে আপনার এক পরম শত্রু জন্মগ্রহণ করিবে। তাহাতে আপনার সিংহাসন বিপন্ন হইবার আশঙ্কা"। উক্তি শুনিয়া রাজার মুখ মলিন হইয়া গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ আদেশ প্রচার করিলেন—"আমার রাজ্যে যে সকল শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছে ও করিবে তাহাদিগকে হত্যা করিতে হইবে।" আদেশ অনুযায়ী কার্য্য চলিতে লাগিল।

দক্ষিণ ব্যাবিলনীয়ার কালডিয়া প্রদেশের অন্তর্গত ইউফ্রেতিস্ নদীর মোহনার নিকট, 'উর' নামে একটি স্থান ছিল। এ 'উর' জিলায় আর নামে এক ব্যক্তি বাস করিত। আজর (তেরা) মহারাজ নমরুদের জনৈক ভৃত্য ছিল। এ সময় এই আজরের এক অনিন্দ্যসুন্দর পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। কিন্তু পুত্র মুখ দর্শন করিয়া মাতাপিতার মনে আনন্দের সঞ্চার হওয়া দূরে থাকুক পুত্রের প্রাণনাশের আশঙ্কায় উভয়ে মহা ভীত ও বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন। পুত্রের প্রাণ রক্ষার জন্য লোকা-লয়ের বাহিরে মৃত্তিকাগর্ভে এক গর্ত্ত খনন করিয়া প্রসূতি সন্তানকে তথায় রাখিয়া লালন পালন করিতে লাগিলেন। এই মহাভাগ পুত্র সমস্ত ধর্ম্মের আদি গুরু মানবজাতির পথপ্রদর্শক **মহাত্মা ইব্রাহিম।**

শিশু ইব্রাহিম নমরুদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াইয়া মেঘের আড়ালে চন্দ্রকলার ন্যায় দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি সপ্তবর্ষে পদার্পণ করিলেন কিন্তু তখনও মাতাপিতা নমরুদের ভয়ে তাঁহাকে গুহাগৃহ ত্যাগ করিয়া প্রকাশ্য স্থানে আসিতে দেয় নাই। তথাপি মাতাপিতার অনুপ-স্থিতি কালে তিনি বাহিরে আসিয়া প্রকৃতির শোভা নিরীক্ষণ করিতেন। রাত্রিতে নক্ষত্রপুঞ্জের অপরূপ শোভা, পূর্ণচন্দ্রের নির্ম্মল জ্যোতি, প্রভাতে সূর্য্যো-দয়ের ভুবনমোহন সৌন্দর্য্য, নিরীক্ষণ করিয়া উহার মন আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া উঠিত। তিনি একাকী বসিয়া নিজ মনে চিন্তা করিতেন—"আমরা কোথা হইতে আসিয়াছি? আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা কে? আমরা যে ফলমুল শস্যাদি ভক্ষণ করি তাহাই আবার রক্তমাংসে পরিণত হইয়া আমাদের শরীর-বর্দ্ধন এবং জীবন রক্ষা করিতেছে। ইহাই বা কাহার ইঙ্গিতে হইতেছে? আমরা চক্ষু দিয়া দর্শন করি, কর্ণ দিয়া শ্রবণ করি, মুখ দিয়া আহার করি, জিহ্বা দিয়া কথা বলি, হস্ত দিয়া কর্ম্ম করি, পা দিয়া পথ চলি। এগুলি আমাদের অমূল্য সম্পদ। এই গুলিই বা এত সুন্দর করিয়া কে দিয়াছে?" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি

হয়ত কোন দিন সারারাত্রি কাটাইয়া দিতেন। একদিন মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মা! আমাদিগকে কে সৃষ্টি করিয়াছেন?"

"মহারাজ নমরুদ"।

"মহারাজ নমরুদকে কে সৃষ্টি করিয়াছেন?"

"বাছা, তিনিই আমাদের সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা। তাহার আবার সৃষ্টিকর্ত্তা কে?" বালক মায়ের উত্তরে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না! একদিন পূর্ণিমা রাত্রিতে চন্দ্র যখন প্রকৃতির পূর্ব্ব গগনে উদিত হইয়া তাহার বিশ্বভোলা রূপের ভাণ্ড হইতে একমুষ্টি সৌন্দর্য্য ছড়াইয়া দিয়া প্রকৃতির প্রসাধন ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া দিল, তখন তিনি মুগ্ধ নেত্রে বলিয়া উঠিলেন—"ইহাই বুঝি আমার সৃষ্টিকর্ত্তা।" কিন্তু দেখিতে দেখিতে চন্দ্র যখন পশ্চিমাকাশে ঢলিয়া পড়িল এবং রাত্রিশেষে মলিন বর্ণ ধারণ করিয়া প্রভাতের আলোক-সম্পাতে লাজনম্র বধূর ন্যায় অদৃশ্য হইয়া গেল, তখন তিনি বলিয়া উঠিলেন—"ইহাত ক্ষয়শীল, এরূপ ক্ষয়শীল পদার্থ আমার সৃষ্টিকর্ত্তা হইতে পারেন না।"

প্রভাতে পূর্ব্ব গগনে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন সূর্য্য তাহার অপরূপ সৌন্দর্য্যরাশিতে পৃথিবী আকাশ ভরিয়া দিয়াছে; সে যতই ঊর্দ্ধে উঠিতেছে তাহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপও ততই জগৎকে অস্থির করিয়া তুলিতেছে, তিনি তখন মুগ্ধ চিত্তে বলিয়া উঠিলেন—"এই বুঝি আমার সৃষ্টিকর্ত্তা!" কিন্তু দ্বিপ্রহরের পর সূর্য্য যতই পশ্চিমাকাশে ঢলিয়া পড়িতে লাগিল তাহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপও ততই ক্ষীণ হইতে লাগিল, অবশেষে সন্ধ্যা সমাগমে যখন সে অদৃশ্য হইয়া গেল তখন তিনি বলিয়া উঠিলেন—"ইহাও ত ক্ষয়শীল পদার্থ; এইরূপ ক্ষয়শীল কখনই আমার সৃষ্টিকর্ত্তা হইতে পারে না।"

এইরূপে বালক কিছুতেই স্বস্তিলাভ করিতেছেন না। দিবারাত্র তাঁহার এক চিন্তা "আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা কে?" একদিন ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ তাঁহার অন্তর স্বর্গীয় আলোকমালায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, তাঁহার মনের অন্ধকার বিদ্যুদ্বেগে তিরোহিত হইল; তিনি সহর্ষে বলিয়া উঠিলেন—নিশ্চয় কোন ক্ষয়শীল পদার্থ আমার সৃষ্টিকর্ত্তা হইতে পারে না—যিনি অক্ষয়, অব্যয়, অনাদি, অনন্ত তিনিই আমার আল্লাহ। যিনি সমস্ত আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছি। আমি নিশ্চয় অংশীবাদীগণের অন্তর্ভুক্ত নহি।"

হজরত ইব্রাহিমের এই পুণ্যস্মৃতির অনুকরণ করিয়া মোছলমানগণ আজিও প্রত্যেক নামাজের সময় বিছানায় দণ্ডায়মান হইয়াই তাঁহার এই উক্তির আবৃত্তি করিয়া থাকেন।

ইব্রাহিমের এখন বয়োবৃদ্ধি হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে নমরুদের শক্রভীতিও অনেকটা লাঘব হইয়াছে। সুতরাং তাহার আদেশের কঠোরতাও অনেকটা হ্রাস পাইয়াছে। তাই তাঁহার পিতামাতা এখন পুত্রকে বাহিরে যাইতে আর নিষেধ করেন না।

ইব্রাহিমের পিতা আজর একজন বিশিষ্ট শিল্পী। তিনি রাজদরবারে পূজাপার্ব্বণাদির সময় রাজবাড়ীর প্রতিমাদি প্রস্তুত করিয়া দিতেন। একদিন তিনি কতকগুলি পুতুল তৈয়ার করিয়া বাজারে বিক্রয় করিবার জন্য পুত্রকে দিলেন। পুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবা, এই মূর্ত্তিগুলি লোকে কেন কিনিবে?

"বাছা, তুমি জান না, ঐগুলি আমাদের দেবতা, লোকে ঐগুলি কিনিয়া উহাদের পূজা করিবে।"

"এই সকল হাতেগড়া মূর্ত্তি কি তাহাদের দেবতা হইতে পারে? ইহারা কথা বলিতে পারে না, চলিতে পারে না, খাইতে পারে না, খাওয়াইতে পারে না, শুনিতে পায় না, দেখিতে পায় না, ভাল মন্দ কিছুই করিবার শক্তি ইহাদের নাই। সুতরাং কেমন করিয়া ইহারা তাহাদের দেবতা হইবে?"

"বাবা ইব্রাহিম, আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা ঐ গুলির পূজা করিয়াছেন সুতরাং আমরাও করি। তুমি বালক, তুমি এসব কি বুঝিবে? তুমি বাজারে গিয়া ঐ গুলি বিক্রয় করিয়া অর্থের সংস্থান কর।"

"কিন্তু বাবা, তোমরা পথ ভ্রান্ত হইয়াছ। পূর্ব্ব পুরুষেরা যদি ভুল করিয়া থাকে তবে তোমরা কেন সেই ভুল পথে চলিবে? অজ্ঞ শিশুরা ভুল করিতে পারে; তাহারা অজ্ঞতা বশতঃ অনেক অখাদ্য ভক্ষণ করিয়া থাকে; কিন্তু বড় হইয়াও যদি কেহ বলে "আমরা পূর্ব্বে উহা ভক্ষণ করিয়াছি অতএব এখনও

ভক্ষণ করিব" তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয়ই ভুল করিবে। শিশুরা পুতুল লইয়া খেলা করে, পুতুলের বিয়ে দেয়, তাহাদিগকে মাতাপিতা পুত্র-কন্যা ইত্যাদিরূপে কল্পনা করে; কিন্তু জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা উহার অসারতা উপলব্ধি করিয়া উহা পরিত্যাগ করে। কৈ তাহারা ত বলে না আমরা চির জীবন পুতুল লইয়াই খেলিব? জাতির শৈশবকালে তাহারা অনেক ভুল করিয়া থাকে কিন্তু এখন ঐগুলি পরিত্যাগ না করিলে মহাভুল করা হইবে। আমি আমার সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাকে চিনিয়াছি। তিনি নিরাকার, সর্ব্বশক্তিমান, অব্যয় অক্ষয়, অনাদি অনন্ত। তিনি চন্দ্র সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, বৃক্ষলতা, নদ, নদী, স্থাবর-জঙ্গম, সকলেরই সৃষ্টি-কর্ত্তা। তোমরা তাঁহাকে ছাড়িয়া নিজহাতে গড়া মাটীর পুতুলকে কেন উপাস্য জ্ঞানে পূজা কর! তোমরা আবার কেহ কেহ মহারাজ নমরুদকেও ঈশ্বরজ্ঞানে ভক্তি কর। মানুষ হইতে বিশ্ব জগতের সমস্ত পদার্থই আল্লার সৃষ্টি। মানুষ সুখ দুঃখ জন্ম মৃত্যুর অধীন। সুতরাং তাহাকে ঈশ্বর মনে করা মহাপাতক। আল্লাহ্ জন্ম মৃত্যুর অতীত। রোগ শোক, জরা, মৃত্যু, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সমস্তই তিনি দান করেন। তিনিই সকলের জীবিকার সংস্থান করিয়া দেন—অতএব বাবা তোমরা আল্লার উপাসনা কর।"

পুত্রের এই ধৃষ্টতা দেখিয়া পিতা রাগে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বলিলেন—"ইব্রাহিম, তুমি ১০ বৎসরের বালক মাত্র। তুমি এখনই পিতার বিরুদ্ধাচরণ করিতে শিখিলে! মহারাজ নমরুদ শুনিলে তোমাকে জলন্ত আগুণে পোড়াইয়া মারিবে।"

"বাবা! আমার আল্লাই আমার রক্ষক। আমার আল্লাহ যথেচ্ছাচারী নহেন। তিনি ন্যায় বিচারক; দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনই তাঁহার কার্য্য; মহারাজ নমরুদ যে ঈশ্বরত্বের দাবী করিতে-ছেন, এবং অপরকেও সেই ভ্রান্ত পথে চালাইতে-ছেন—ইহাই তাঁহার পক্ষে মহা অপরাধের কার্য্য, তদুপরি যদি তিনি আমাকে অন্যায় ভাবে শাস্তি দিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমার আল্লাই আমাকে রক্ষা করিবেন।" আজর আরও অধিকতর রাগান্বিত হইয়া পুত্রকে বলিলেন "আরে মূর্খ পুত্র! দূর হ আমার সম্মুখ হইতে! এই জন্যই শিশুকালে মহারাজ নমরুদের কবল হইতে তোকে এত সংগোপনে রক্ষা করিয়াছিলাম! তখনই তোর জীবনলীলা সাঙ্গ হইলে মঙ্গল হইত!"

"বাবা, তবেই দেখুন মঙ্গলময় আল্লাহ কেমন করিয়া আমাকে নমরুদের হাত হইতে বাঁচাইয়া-ছেন। তিনি সর্ব্বশক্তিমান! নমরুদের কি সাধ্য যে আমাকে মারিয়া ফেলে?"

এই বলিতে বলিতে পুতুলগুলি লইয়া বালক বাজারে রওনা হইলেন। সন্ধ্যার সময় বাড়ীতে ফিরিয়া পিতাকে বলিলেন—"বাবা! আমি তোমার পুতুলগুলি বিক্রয় করিতে পারি নাই। বাজারে গিয়া উহাদিগকে একস্থানে রাখিয়া কার্য্যোপলক্ষে একটু দূরে গিয়াছিলাম, ফিরিয়া দেখি তাহারা রাস্তার ধারে, জলাশয়ের ধারে হস্তপদভগ্নাবস্থায় পড়িয়া আছে। বোধ হয় দৌড়িয়া পলাইতে চাহিয়াছিল, পড়িয়া গিয়া হাত পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।"

আজর সমস্তই বুঝিতে পারিলেন। রাগে তাহার শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি রুক্ষ স্বরে বলিলেন—"তুই এখনই বাড়ী হইতে দূর হ।"

পিতা কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া ইব্রাহিম ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং মূর্ত্তি পূজার অসারতা সকলকে বুঝাইতে লাগিলেন।

একদিন পর্ব্বোপলক্ষে সকলে বাজারে গিয়াছে। ইব্রাহিম একাকী গৃহে রহিয়াছেন। এই অবসরে তিনি রাজবাড়ীর প্রধান দেবালয়ে প্রবেশ করিয়া কোন মূর্ত্তির হাত, কোন মূর্ত্তির পা, কোন মূর্ত্তির মাথা ভাঙ্গিয়া, সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ মূর্ত্তিটির গলায় একটি কুঠার ঝুলাইয়া রাখিলেন। বাজার হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মূর্ত্তিগুলির অবস্থা দেখিয়া সকলে হাহাকার করিতে লাগিল। রাজবাড়ীতে ক্রন্দনের রোল উঠিল। দেবতার নিকট গললগ্নীকৃতবাসে কেহ বলিতে লাগিল—"হে আমার দেবতা! যে তোমাদের হাত পা ভাঙ্গিয়াছে, এই মুহূর্ত্তে যদি তাহার হাত পা ভাঙ্গিয়া সে পঙ্গু হয় তবে তোমাদের নিকট আমি একশত বলিদান করিব"—কেহ বলিতে লাগিল—যদি এই মুহূর্ত্তেই সেই পাষণ্ডের

মৃত্যু হয় তবে আমি তোমাদের নিকট ৪০টী বলিদান করিব। আবার কেহ বলিল—যদি সেই নরাধমের বংশ নিপাত হইয়া যায় তবে আমি ২০০ বলিদান করিব।"

সকলেই সন্দেহ করিল ইব্রাহিমই প্রতিমা ভাঙ্গিয়াছে। পিতা ইব্রাহিমকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সহর্ষে বলিলেন—"আপনারা দেবালয়ে চলুন কে প্রতিমা ভাঙ্গিয়াছে আমি বলিয়া দিতেছি।"

সকলে মহাসন্তুষ্ট হইয়া ইব্রাহিমকে লইয়া দেবালয়ে প্রবেশ করিল। ইব্রাহিম বলিলেন—"এই যে আপনাদের বুড়ো দেবতাটী অক্ষত রহিয়াছে উহাকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিবেন কে মূর্ত্তিগুলি ভাঙ্গিয়াছে। এই বুড়া দেবতাটাই উহাদিগকে ভাঙ্গিয়াছে। নইলে উহার গলায় কুঠার ঝুলান কেন?"

সকলে বলিল, উহারাও মাটির পুতুল, নির্জ্জীব পদার্থ, তুমিও জান, উহারা কথা বলিতে পারে না, উহারা কেমন করিয়া অন্যের অনিষ্ট করিবে।

"যদি উহারা কথা বলিতে না পারে, যদি উহারা আত্মরক্ষা করিতে না পারে তবে কেমন করিয়া তোমাদের রক্ষা করিবে। তোমরা এইরূপ মাটীর পুতুলকে পূজা করিয়া মহাভুল করিতেছ। তোমরা সেই সকল বিপদবারণ একমাত্র আল্লার উপাসনা কর।"

যুক্তি তর্কে কেহই ইব্রাহিমের সহিত আটিয়া উঠিতে পারিল না। অথচ মনের বদ্ধ কুসংস্কারের অবিসম্বাদিত ফলস্বরূপ তাঁহার মত কেহ গ্রহণ করিল না বরং বিরুদ্ধ মতের জন্য সকলে উহার ঘৃণা ও শত্রুতা পোষণ করিতে লাগিল।

মহারাজ নমরুদ নিজে পৌত্তলিক ছিলেন। ব্যাবিলন, শীমার প্রভৃতি দেশে তিনি অনেক দেবমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পুরোহিতগণ এই সকল মন্দিরের রক্ষক ও সর্ব্বময়কর্ত্তা ছিলেন। তাহাদিগকে **'প্যাটেসি'** বলা হইত। মন্দিরের দেবতাদের নিকট নরবলি দেওয়া হইত। বিশেষতঃ যুদ্ধের বন্দীদিগকে দেবতার উপহার স্বরূপ বলি দেওয়া হইত। মিশরেও এই সময় নরবলির প্রথা প্রচলিত ছিল।

প্রতিমা ভাঙ্গার কথা ক্রমে চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। মহারাজ নমরুদের কানে পৌঁছিতে বিলম্ব হইল না। সংবাদ শুনিয়া তিনি মনে মনে ভাবিলেন এই বুঝি আমার সেই পরম শত্রু যাহার কথা ভবিষ্যৎ বক্তারা বলিয়াছিলেন। অলক্ষিতে তাঁহার অন্তর একটু কাঁপিল। কিন্তু বাহ্যতঃ রাগে গরগর করিতে করিতে আদেশ করিলেন—"যে প্রতিমা ভাঙ্গিয়াছে এই মুহূর্ত্তেই তাহাকে আমার নিকট আনয়ন কর। আমি সেই দেবতার কাছে এখনই তাহার মস্তক কাটিয়া দিব—অথবা তাহাকে জ্বলন্ত আগুনে পোড়াইয়া মারিব।"

রাজাদেশে ইব্রাহিমকে ধরিয়া মহারাজের সম্মুখে উপস্থিত করা হইল। মহারাজ অপরাধীর মস্তক কাটিবেন, ইহা দেখিবার জন্য কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া রাজসভায় লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। কিন্তু একি! উর্দ্ধফণা সর্প যেমন ঔষধি স্পর্শে মস্তক অবনত করে ইব্রাহিমের মুখের উপর দৃষ্টি পড়িতেই কি যেন এক অলৌকিক শক্তি প্রভাবে নমরুদের রোষকষায়িত চক্ষু অবনত হইল, তাঁহার তীব্র রাগ, উগ্র প্রতিহিংসা, কঠোর প্রতিজ্ঞা সকলই বন্যার জলের ন্যায় কোথায় নামিয়া গেল। প্রকৃতি শান্ত ভাব ধারণ করিল। তিনি ইব্রাহিমকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"রে বালক! তুমি নাকি এক নূতন আল্লার সন্ধান পাইয়াছ?"

"মহারাজ তিনি নূতন নহেন, তিনি অনাদি তিনি বিশ্বজগতের জীবিকার মালেক, আপনি যে সুখ-সম্ভোগের অধিকারী হইয়াছেন তাহার বিধানকর্ত্তা; যিনি সমস্ত বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন; যাঁহার ইচ্ছায় চন্দ্র, সূর্য্য আলোক দান করে, ভূমি শস্য প্রদান করে, মেঘ বারি বর্ষণ করে, নদী চলে, বায়ু বহে তিনিই আমার আল্লাহ।"

"বালক, তুমি কৃতজ্ঞতার কি বুঝিবে? যে চন্দ্র সূর্য্য হইতে আমরা আলোক পাইতেছি, যে মেঘ হইতে বৃষ্টি পাইতেছি, যে মৃত্তিকা হইতে ফসল পাইতেছি, যে নদ নদী হইতে ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি পাইতেছে, নিশ্চয় তাহারা আমাদের দেবতা। সুতরাং আমরা কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ ঐ সকল দেবতার নিকট মস্তক অবনত করিব ইহা ত স্বাভাবিক।"

"মহারাজ, বাস্তবিক ঐ গুলির নিকট মানুষ প্রভৃত উপকার পাইয়া থাকে। কিন্তু মনে রাখিবেন উহারা সকলেই ক্ষয়শীল। উহাদের একজন অক্ষয়, অব্যয় সৃষ্টিকর্তা আছেন। তিনি মানুষের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যই উহাদের সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং উহারা মানুষের অধীন, মানুষ হইতে নিকৃষ্ট। যোগ্য পাত্রে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। রাজ্যের সুশাসনের জন্য প্রজাবর্গ আপনার নিকট কৃতজ্ঞ না হইয়া যদি রাজকর্ম্মচারীদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তবে উহা বুদ্ধিমানের কার্য্য হইবে, এবং আপনি কি তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারিবেন?

"ইব্রাহিম, তুমি বালক; উপাসনার মর্ম্ম তুমি কি বুঝিবে! আমরা যাহা পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা করিতে পারি না, মন তাহার কল্পনা করিতে পারে না। তুমি বল তোমার আল্লাহ্ নিরাকার সুতরাং কি করিয়া মন সেই আকৃতিবিহীন উপাস্যের কল্পনা করিতে পারে? নিরাকার উপাসনা কেবল বাহ্যাড়ম্বর মাত্র।"

"মহারাজ আপনি ভ্রান্ত হইয়াছেন। আপনি পরম সুখী কিন্তু সুখ জিনিষটা কি? আপনি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উহা অনুভব করিতে পারেন কি? অথচ মন উহা অনুভব করিতে পারে। আমরা যাহাকে ভালবাসা বলি তাহা একটা বস্তু নহে। তাহাকে কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভব করা যায় না। অথচ সকলেই জানে যাহা দেখিতে পাই যাহা ধরিতে পারি তাহা অপেক্ষা এই ভালবাসার শক্তি অনেক বেশী।

"আপনি সৌন্দর্য্যশালী। কিন্তু সেই সৌন্দার্য্য জিনিষটা কি? ইহাও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ নহে। অথচ মনের দ্বারা অনুভবনীয়। যদি আপনি ঐ গুলির মূর্ত্তি তৈয়ার করিতে পারেন তবে সেই মূর্ত্তি এই প্রকৃত জিনিষগুলি কি এক হইবে?

আল্লাও তেমনি বাহ্য ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য না হইলেও মনের দ্বারা গ্রহণীয়। এই আল্লার যে কোন মূর্ত্তি তৈয়ার করা যাইবে উহা কখনই প্রকৃত উপাস্যের প্রতিরূপ হইবে না। ঐ রূপমূর্ত্তির পরিকল্পনা শুধু মনের বিকার মাত্র। সুতরাং সাকার উপাসনাই বাহ্যাড়ম্বর মাত্র।

"তাহা হইলে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করিবার উপায় কি?"

"মহারাজ আপনার দেহে প্রাণ আছে। প্রাণের কোন বাস্তব মূর্ত্তি নাই; অথবা দেহ ও প্রাণ এক পদার্থ নহে। অথচ উভয়ের পৃথক করণ ও সম্ভবপর নহে। তথাপি আপনার মন স্বতঃই উহার পৃথক অস্তিত্ব অনুভব করিয়া থাকে। এইরূপ আল্লাহ যদিও বিশ্বজগৎ হইতে অবিচ্ছিন্ন অথচ একীভূত ও নহেন, কিংবা তাঁহার কোন মূর্ত্তিও নাই তথাপি তাঁহার সত্ত্বা অনুভব করিবার শক্তি মনের আছে। এরূপ অনুভব শক্তি কেবল মনের শিক্ষার উপর নির্ভর করে।"

বালকের অপূর্ব্ব প্রতিভা দেখিয়া নমরুদ অবাক হইলেন। মুখে কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। অথচ তাহার মরুময় অন্তরে সত্যের বীজ পড়িয়া রসের অভাবে শুকাইয়া গেল; অঙ্কুরোদ্গম হইতে পারিল না। ভবিষ্যদ্বক্তাগণের বাণী তাহার মনে পড়িল তখন তিনি আদেশ প্রচার করিলেন ইব্রাহিমকে জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করা হইবে।

অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত হইতে লাগিল। অনেকে ইব্রাহিমকে বলিতে লাগিল—"ইব্রাহিম, প্রবল প্রতাপান্বিত মহারাজ নমরুদের আদেশ লঙ্ঘন হইবার নহে। জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে এখনই তোমার প্রাণ যাইবে। সময় থাকিতে দেবতাদের নিকট মস্তক অবনত কর। উহাদিগকে উপাস্য বলিয়া স্বীকার কর, মহারাজ তোমাকে ক্ষমা করিবেন।"

ইব্রাহিমের মুখে চিন্তা বা ভীতির চিহ্ন মাত্র নাই। তিনি সহাস্য বদনে সকলকে বলিতে লাগিলেন—"ভ্রাতৃগণ তোমরাও মহারাজ নমরুদের ন্যায় মহাভ্রান্তিতে পতিত হইয়াছ। আমার আল্লাহ্ সর্ব্বশক্তিমান, পরম দয়ালু; ন্যায়বান; তিনিই জীবন-মৃত্যুর অধিকারী। আমি যদি তাঁহার সত্য ধর্ম্মের প্রচারক হই তবে তিনিই আমার জীবন রক্ষা করিবেন। মহারাজ নমরুদের সাধ্য কি তিনি আমার তিলমাত্র ক্ষতি করেন?"

নির্দ্দিষ্ট দিনে ইব্রাহিমকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হইল। মহারাজ নমরুদ পাত্র মিত্র সভাসদ্বর্গ সহ তামাসা দেখিতে অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসিলেন।



তিব্বতে বাঙ্গালী পণ্ডিত

[illegible] পৃষ্ঠার পর

মহীপালের পর তাঁহার পুত্র নয়পাল পালবংশের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু ইহার রাজ্যের কোন কোন অংশে অন্য লোকে অধিকার করিয়া লয়। এই সময়ে একজন বৌদ্ধপণ্ডিত বিখ্যাত হইয়া উঠেন। তাঁহার নাম **দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ**। তাঁহার শ্রী অর্থাৎ সৌন্দর্য্য এমনি ছিল যে তিনি যেখানে যাইতেন, সেই স্থানই যেন প্রদীপের আলোকে হাসিয়া উঠিত। আর তিনি জ্ঞানেও সকলের বড় ছিলেন, এই জন্য তাঁহাকে জ্ঞান-অতীশ বলিত। লোকে তাঁহাকে শুধু অতীশ বলিয়াও সম্বোধন করিত। তাঁহার পূর্ব্ব নাম ছিল চন্দ্রগর্ভ, পূর্ব্ববঙ্গের বিক্রমপুর তাঁহার জন্মস্থান, চন্দ্রগর্ভ বৌদ্ধমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া দীপঙ্কর শ্রী জ্ঞান অতীশ নাম লাভ করেন। ক্রমে তিনি একজন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ ভিক্ষু বা সন্ন্যাসী হইয়া উঠেন। অতীশ অনেক শাস্ত্রের জ্ঞান লাভ করিয়া একজন বিখ্যাত পণ্ডিত হন, যেখানে বুদ্ধদেব জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, সেই বুদ্ধগয়ার মহাবোধিমঠে তিনি বহুদিন বাস করেন। তাঁহার মহাবোধিমঠে বাস করার সময় চেদি-বংশের কর্ণদেব মগধ আক্রমণ করিয়াছিলেন। নয়পালের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। কর্ণদেবের সৈন্যগণ নয়পালের সৈন্যের হস্তে নিহত হইতেছে দেখিয়া দীপঙ্কর শ্রী তাঁহাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়. নয়পালের রাজত্ব কালেই দীপঙ্কর শ্রী নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া তিব্বতের রাজা লোক পাঠাইয়া তাঁহাকে তিব্বতে লইয়া যান। দীপঙ্কর শ্রী বৃদ্ধ বয়সেই তিব্বতে গিয়াছিলেন। সেখানে গিয়া তিনি বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অনেক উন্নতি সাধন করেন। দীপঙ্কর শ্রী অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ তীব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। অনেকে তাঁহার শিষ্য হইয়াছিল। তিব্বতে গিয়া তিনি অতীশ নামেই প্রসিদ্ধ হন। আজিও তিব্বতে অতীশের গৌরব ঘোষিত হইয়া থাকে। এইরূপে একজন বাঙ্গালী পণ্ডিত হিমালয় পার হইয়া সেই বরফের দেশে গিয়া সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। [অতীশের বিস্তৃত জীবনী 'শিশু-ভারতীর' ১৫৫৪ পৃষ্ঠায় দেখিতে পাইবে।]

দুইটি নূতন রাজবংশ

মহীপালদেবের পর হইতে আবার পালবংশের অবনতি ঘটে, এই সময়ে একটি নূতন রাজবংশ পূর্ব্ববঙ্গে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছিল, এই বংশ **চন্দ্র রাজবংশ** নামে বিখ্যাত। এই বংশের একজন রাজাই বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহার নাম শ্রীচন্দ্র। শ্রীচন্দ্রের পিতার নাম ত্রৈলোক্যচন্দ্র। ইনি প্রথমে চন্দ্রদ্বীপে বা বর্ত্তমান বরিশাল জেলার দেখিয়াই বুঝা যায়। ঐ স্থান আজকাল রামপাল বলিয়া পরিচিত।

বিক্রমপুর—রামপাল

প্রাচীন বিক্রমপুর নগরী বা রামপালে যে সকল ইষ্টকালয় ছিল তদ্বারা ঢাকা নগরীর অনেকানেক ইষ্টকালয় নির্ম্মিত হইয়াছে। রামপাল একটি বৃহৎ স্থান। উহার এক অংশের নাম শাঁখারী বাজার। পূর্ব্বে তথায় অনেক শাঁখারী জাতি বাস



রামপাল দীঘি—বিক্রমপুর

রাজা হন। ইঁহার পুত্র শ্রীচন্দ্র কিন্তু সমস্ত পূর্ব্ব-বঙ্গের অর্থাৎ ত্রিপুরা, নোয়াখালি, ঢাকা, ফরিদপুর, ও বরিশাল জেলা জুড়িয়া বেশ একটি মাঝারি রকমের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া ফেলিলেন। এই রাজ্যের রাজধানী ছিল **শ্রীবিক্রমপুর**। এই বিক্রমপুর নগরের ভগ্নাবশেষ আজিও ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণায় দেখিতে পাওয়া যায়। এক সময়ে বিক্রমপুর প্রকাণ্ড নগর ছিল, তাহা উহার ভগ্নাবশেষ করিত। পরে যখন ঢাকা নগরীর পত্তন হয়, তখন তাহারা (শাঁখারীরা) তথা হইতে ঢাকাতে যাইয়া বাস এবং ব্যবসায় করিতে আরম্ভ করে। রামপালের পশ্চিমাংশের নাম রঘুরামপুর। রামপালে চৌগড়ার বা গড়ের অন্ত নাই। এ স্থানের মৃত্তিকাগর্ভ হইতে অনেক প্রাচীন দেবদেবীর মূর্ত্তি, মুদ্রা, মূল্যবান্ হীরক এবং বল্লালবাড়ী নামক প্রাচীন রাজবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ, বাবা আদমের মসজিদ, দীঘি ও পুষ্করিণী

অনেক আছে। এক সময়ে এখানকার একটি গজারী বৃক্ষ দর্শনীয় বস্তু ছিল। কয়েক বৎসর হইল উহার মৃত্যু হইয়াছে। লোকে ইহাকে এতদিন অমর বলিয়া মনে করিত। ইহার সহিত অনেক কিছু কিংবদন্তী বিজড়িত ছিল। বিখ্যাত রামপালের দীঘির দৈর্ঘ্য ২২০০×৮৪০ ফিট। ইহা ছাড়া রামপালের আশে পাশে আরও অনেক দীঘি সরোবর আছে।

এই চন্দ্রদেবের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় দুইশত বৎসর কাল পর্য্যন্ত এই বিক্রমপুর নগরে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই রাজধানীতে প্রথমে শ্রীচন্দ্র, পরে বর্ম্মরাজগণ এবং সর্ব্বশেষে সেনরাজগণ রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত রাজ্য সম্ভবতঃ শ্রীচন্দ্রের সহিতই শেষ হয়। তাঁহার মৃত্যুর পরে যাদববংশীয় বর্ম্মরাজগণ পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বঙ্গ অধিকার করিয়া লয়।



কোদালধোয়া দীঘি—বিক্রমপুর

পশ্চিম ভারতের যাদববংশীয় বজ্রবর্ম্মা প্রথমে পূর্ব্ববঙ্গে আসিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র জাতবর্ম্মা সেখানে রাজ্য স্থাপন করিয়া বর্ম্মবংশের প্রভুত্ব বিস্তার করিতে আরম্ভ করেন। এই বংশের হরিবর্ম্মা নামে নরপতি সর্ব্বাপেক্ষা খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি অনেক দেশ জয় করিয়া প্রবল হইয়া উঠেন। কেবল তাহাই নহে, তাঁহার অনেক কীর্ত্তি বহুদিন পর্য্যন্ত তাঁহাকে স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছিল। হরিবর্ম্মা প্রশস্ত রাজপথ নির্ম্মাণ, বহু জলাশয় খনন, নানা দেবদেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া যশোলাভ করিয়াছিলেন। অনেক ব্রাহ্মণকে তিনি ভূমি দানও করেন। বহু প্রসিদ্ধ পণ্ডিত তাঁহার মন্ত্রণাসভায় থাকিতেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন ভবদেব ভট্ট উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরে নারায়ণ অনন্ত প্রভৃতির মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ভুবনেশ্বরের অনন্ত বাসুদেবের মন্দিরে একখানি শিলাখণ্ডে সে কথা লিখিত আছে। বাচস্পতি মিশ্র নামে আর একজন পণ্ডিত হরিবর্ম্মার মন্ত্রী ছিলেন বলিয়া জানা যায়।

এই বংশের **সামল বর্ম্মাও** একজন প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। তাঁহার সময়ে পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্বপুরুষেরা পূর্ব্ববঙ্গে আসিয়াছিলেন। এদেশের তখনকার ব্রাহ্মণেরা যাগযজ্ঞ ভাল করিয়া করিতে পারিতেন না। সেই জন্য বৈদিক ব্রাহ্মণদিগকে আনিতে হইয়াছিল। হরিবর্ম্মার সময়ে এবং সামলবর্ম্মার পরও কোন কোন পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণের আগমনের কথাও জানা যায়। বঙ্গদেশে এক্ষণে এই পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণগণ অনেক স্থানে যাগযজ্ঞাদি করিয়া থাকেন। চন্দ্র ও বর্ম্ম বংশের জন্য পূর্ব্ববঙ্গে পালবংশীয়দিগের প্রভুত্ব লোপ পাইয়াছিল।

ভীমের জাঙ্গাল

নয়পালের পর হইতে পালবংশের রাজগণ ক্রমে ক্ষমতাহীন হইয়া পড়েন। তাঁহাদের রাজ্য ভিন্ন ভিন্ন রাজবংশের হস্তগত হয়। কেবল বাঙ্গালা-দেশের উত্তরভাগ গৌড় বা বারেন্দ্রী মাত্র তাঁহাদের অধিকারে ছিল। এই বারেন্দ্রী ভূমিতেই পালরাজগণ বহুদিন ধরিয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন। ক্রমে তাঁহারা বারেন্দ্রী ভূমির অধিকার হইতে বঞ্চিত হন।



পদ্মার তীর গ্রাম্য—দৃশ্য

যে সময়ে দ্বিতীয় মহীপাল রাজত্ব আরম্ভ করেন, সেই সময় হইতে প্রজাগণ তাঁহার শাসনে অসন্তুষ্ট হইয়া উঠে। দ্বিতীয় মহীপাল মন্ত্রিগণের কোন পরামর্শ শুনিতেন না। তাঁহার যাহা ইচ্ছা হইত তাহাই করিতেন। এমনকি সিংহাসনচ্যুত হওয়ার ভয়ে তাঁহার দুই ভ্রাতা শূরপাল ও রামপালকে হাতে কড়া লাগাইয়া কারাগারে রাখিয়াছিলেন। সেই সময়ে কৈবর্ত্ত প্রজাগণ বিদ্রোহী হইয়া তাঁহার শাসন অমান্য করে। মহীপাল তাহাদিগকে দমন করিতে গিয়া নিহত হন। তখন কৈবর্ত্তগণের দিব্বোক, বারেন্দ্রী ভূমি অধিকার করিয়া লন। দিব্বোকের পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠেন। তিনি যেমন পরাক্রমশালী সেইরূপ ঐশ্বর্য্যশালী ছিলেন। তাঁহার শাসনে লোকে সন্তুষ্টই থাকিত। কিন্তু ভীম অনেকদিন রাজ্যভোগ করিতে পারেন নাই। দ্বিতীয় মহীপালদেবের ভ্রাতা রামপালদেব তাঁহার হস্ত হইতে বারেন্দ্রীভূমি অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। সে কথা আমরা পরে বলিতেছি।

বারেন্দ্রী ভূমিতে বগুড়া সহরের উত্তরে একটি উচ্চ ও প্রশস্ত রাস্তা দেখিতে পাওয়া যায়। স্থানে স্থানে উহা এখন পর্য্যন্ত বার চৌদ্দ হাত উচু আছে। এই রাস্তাকে স্থানীয় লোকে **ভীমের জাঙ্গাল'** বলে। কেহ কেহ মনে করেন কৈবর্ত্ত রাজা ভীম এই রাস্তা তৈয়ার করাইয়াছিলেন।



আফ্রিকা

আফ্রিকার সম্বন্ধে তোমরা 'শিশু-ভারতী'তে অনেক কিছু পড়িয়াছ। সেই লিভিংষ্টোন, মঙ্গোপার্ক, ষ্ট্যানলি, স্পেক প্রভৃতি পর্য্যটকের কাহিনী ও 'আফ্রিকার মানুষদের কথা' পড়িবার সময় আফ্রিকার বিষয়ে এত বেশী কথা বলা হইয়াছে যে তোমরা এই মহাদেশ সম্বন্ধে


২৮৬৭ পৃষ্ঠার পর

বাকী যাহা কিছু জানিবার আছে সে সব কথাই বলিব।

আফ্রিকা মহাদেশটি প্রাচীন জগতের (Old World) অন্তর্ভূত। তোমরা জান যে পৃথিবীতে যে পাঁচটি মহাদেশ প্রধান, তাহাদের মধ্যে আফ্রিকাও একটি। এসিয়ার সহিত সুয়েজ যোজকের দ্বারা ইহা সংযুক্ত।

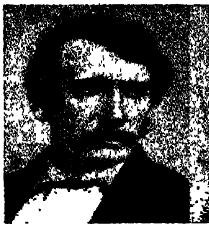

আফ্রিকার নিগ্রো

অনেক কিছুই জানিতে পারিয়াছ। এইবার তোমাদের কাছে আফ্রিকা মহাদেশ সম্বন্ধে আর

আফ্রিকার অতি প্রাচীন কথা

ভূ-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা বলেন,—সেই অতি প্রাচীন কালের গণ্ডোয়ানা মহাদেশ আফ্রিকার একটি অংশ। সেই মহাদেশের পূর্ব্ব দিকের ও পশ্চিম দিকের ভূ-ভাগ নিমগ্ন অর্থাৎ নামিয়া যাওয়ায় ভারত মহাসাগর ও আটলাণ্টিক মহাসাগরের উৎপত্তি হইয়াছে। এবং এই মহাসাগরের জন্মের জন্যই দক্ষিণাপথ ও আমেরিকার সহিত আফ্রিকার সংযোগ হয় নাই। তাঁহারা আরও বলেন যে দক্ষিণা-পথের ও আফ্রিকার মালভূমির প্রস্তরময় ভূমি একই প্রকার প্রস্তর ও মৃত্তিকার দ্বারা গঠিত। পণ্ডিতেরা ত আর যে সে লোক নন্, তাঁহারা ঐ সকল মৃত্তিকা ও প্রস্তরের পরীক্ষার দ্বারা নির্ণয় করিয়াছেন যে এঙ্গোলার, কেপকলোনি, মোম্বাসা ও সোমালি-ল্যাণ্ডের উপকূলের অঞ্চল সামুদ্রিক শিলার দ্বারা গঠিত। এক সময় নাকি নাইজার নদীর চাদ হ্রদের

আফ্রিকার—আবিষ্কারকগণ



ডেভিড্ লিভিংষ্টোন্



হিউ ক্ল্যাপারটন্



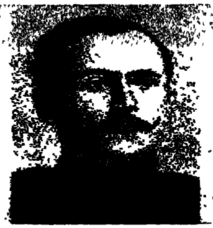
মঙ্গো পার্ক



স্যার এইচ, এম ষ্ট্যান্লি



ভি, এল·ক্যামারোন্



জে, এইচ স্পেক্



ক্যাপ্টেন গ্র্যাণ্ট



জেমস্ ব্রুস্



গুষ্ট্যাব্ ন্যাকটিগ্যাল



ক্যাপ্টেন উইস্ম্যান্



স্যার রিচার্ড বার্টন



জোসেফ্ টমসন্



লিউইস্ ক্র্যাফ



হ্যান্কির বার্থ



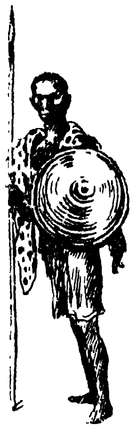
জর্জ্জ সিউইন্ফার্থ



উইলহেম জান্কার

জলধারার সহিত ভূ-মধ্যসাগরের যোগ ছিল। কিন্তু এখন, কি ঐরূপ একটা কল্পনা তোমরা করিতে পার ?

আফ্রিকা মহাদেশ যে আফ্রিকা (Africa) নামে পরিচিত, সেই আফ্রিকা নামটি রোমকদের দেওয়া। রোমকেরা প্রথমে তাহাদের এই মহাদেশের অধিকারভুক্ত দেশগুলিকে নাম দিয়াছিলেন, আফ্রিকা। কার্থেজ (Carthage) ও তাহার মধ্যে ছিল। ক্রমে কিন্তু এই নামটি সমগ্র মহাদেশের নাম রূপেই পরিচিত হইতে থাকে। পূর্ব্বে কিন্তু গ্রীক্ ও রোমকদের সময়ে এ দেশের নাম **লিবিয়া** (Libya) বলিয়া পরিচিত ছিল। ঐতিহাসিক হিরোডোটাস (Herodotus খৃঃ পূঃ ৪৮৪) এবং টোলেমির (Ptolemy ১৩৯ খ্রীষ্টাব্দে) লিখিত বিবরণীতে আফ্রিকার সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। সপ্তম শতাব্দীতে আরবেরা এদেশে যাতায়াত করিতে



যুদ্ধের সাজে



কে বেশী সুন্দর ?

থাকেন। তাঁহারা সাহারা মরুভূমির দক্ষিণ দিকের দেশ সমূহের সন্ধানও জানিতেন। আবার ভৌগোলিকদের মধ্যে এড্রিসি (Edrise) ইবন্-বতুতা (Ibn-Batuta) জন লিয়ো (John Leo) আফ্রিকার সম্বন্ধে নানা কথা লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের লিখিত সব বিবরণই যে ঠিক এমন কথা বলা যাইতে পারে না। তবে গ্রীক ও রোমক-লেখকদের অপেক্ষা, ইঁহারা আফ্রিকার সম্বন্ধে অনেক বেশী প্রয়োজনীয় কথা লিখিয়াছিলেন।



বাড়ীর পথে

পঞ্চদশ শতাব্দীতে পর্ত্তুগীজেরা আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিম দিকের সমুদ্র-তীরবর্ত্তী অনেক দেশের সন্ধান পাইয়াছিলেন। ১৪৮৭ খৃষ্টাব্দে বার্থোলোমিউ (Bartholomew Diaz) উত্তমাশা অন্তরীপ (Cape of Good Hope) আবিষ্কার করেন, কিন্তু তিনি উহার কাছাকাছি ভীষণ ঝড়ের মধ্যে পড়ায় উহার নাম দিয়াছিলেন **ঝড়ের অন্তরীপ** (Cape of Storms)। পর্ত্তুগীজেরা সেকালে আবিষ্কারকের হিসাবে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন, তাঁহারা ক্রমশঃ

আফ্রিকার মধ্যবর্ত্তী নানাদেশেও গমনাগমন করিতে থাকেন। ষোড়শ শতাব্দীতে ফরাসীরা আফ্রিকাতে আসেন এবং ক্রমশঃ সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে সেনিগ্যাল (Senegal) নামক অঞ্চলে অনেক ব্যবসায়-বাণিজ্যের কুঠি স্থাপন করেন। ফরাসীরা স্বর্ণপ্রসূ বাম্বোক (Bambowk) প্রদেশ আবিষ্কার করেন এবং ঐ সময়েই তাহারা নাইজার (Niger) এবং টিমবাকটু (Timbuctu)র সন্ধান পান। ইহার পরে ক্রমশঃ ওলন্দাজ (Dutch) দিনেমার এবং ইংরাজেরা এদেশে অভিযানে প্রবৃত্ত হন।

তোমাদের কাছে মঙ্গোপার্কের কথা বলা হইয়াছে, সেই মঙ্গোপার্ক ১৭৯৪, ১৭৯৬ এবং



আফ্রিকার কাফ্রি

১৮০৫ খৃষ্টাব্দে অনেক নূতন দেশ আবিষ্কার করেন, টিমবাকটুর কাছাকাছি অনেক ছোট বড় দেশের তিনি সন্ধান পাইয়াছিলেন। ঊনবিংশ-শতাব্দীর প্রারম্ভে টাকি (Tuckey), পেডি (Paddie), ক্যাম্পবেল (Campbell) বোড়িচ (Bowdich), মোলিয়েন (Mollien) রিট্‌চি (Ritchie) লাইয়োন (Lyon) এবং ল্যাঙ্গ (Lang) অনেক কিছু আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে ডেনহাম এবং ক্ল্যাপারটোন ত্রিপলী হইতে রওয়ানা হইয়া চাদহ্রদে (Lake Chad) যাইয়া পৌঁছিয়াছিলেন। ল্যাঙ্গ এবং ক্যালী (Caille) টিমবাকটু পৌছেন এবং রিচার্ড ল্যাণ্ডার (Richard Lander) ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে নাইজার নদীর মোহনা পর্য্যন্ত যাইয়া পৌঁছিয়াছিলেন। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আবিসিনিয়া, নীল নদের উত্তর প্রদেশের দিকে কয়েকটি অভিযান প্রেরিত হইয়াছিল। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ডেভিড্ লিভিংষ্টোন্ নামি হ্রদে (Lake Nagmi) যাইয়া পৌঁছিলেন এবং সেখান হইতে আরও উত্তরাভিমুখে গমন করিয়া জ্যাম্বেসি (Zambezi) এবং নিযানা হ্রদ (Lake Nyana) এবং ট্যাঙ্গানিকা পর্য্যন্ত যাইয়া পৌঁছিয়াছিলেন (১৮৫৯—১৮৭৩)। অতঃপর বার্টন ও স্পেক ভিক্টোরিয়া নিয়ানজার (Victoria Nyannza) দক্ষিণদিক্ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিলেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে স্পেক (Spek) এবং গ্রাণ্ট (Grant) গোণ্ডোকোরো (Gondokoro) পর্য্যন্ত পৌছেন আর বেকার (Baker) এলবার্ট নিযানজা (Albert Nyanza) আবিষ্কার করেন। এইভাবে বার্থ (Barth) গুস্তাব, নাকাটিগ্যাল (Gastov) জর্জ্জ সিযউইনফার্থ (George Segweinfurth), জোসেফ টমসন্ (Joseph Thomson), উইসম্যান (Wisman) প্রভৃতি অনেকেই আফ্রিকার নানাস্থান আবিষ্কার করেন।

আফ্রিকার সীমা ও ভূমির বিশিষ্টতা

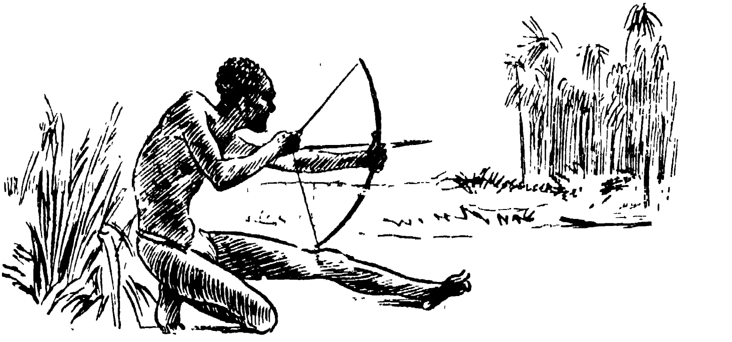
আফ্রিকা একটি প্রকাণ্ড উপদ্বীপ। ভূমধ্য-সাগর ও লোহিত-সাগর দ্বারা ইহা ইউরেশিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন। আফ্রিকার মধ্য দিয়া বিষুবরেখা চলিয়া গিয়াছে। এই রেখার উত্তরের ও দক্ষিণের ভূ-ভাগের দৈর্ঘ্য হইবে প্রায় ২,৫০০ মাইল। উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত আফ্রিকার দৈর্ঘ্য ৫০০০ হাজার মাইল এবং প্রস্থে প্রায় ৪৬৫০ মাইল। এই মহাদেশ আয়তনে ইউরোপ হইতে তিনগুণ এবং ভারতবর্ষ হইতে প্রায় ৬½ গুণ। ইহার ক্ষেত্রফল প্রায় ১ কোটি ১৫ লক্ষ মাইল। লোকসংখ্যা মাত্র ২০ কোটি।

এই মহাদেশের লোকসংখ্যা সুদান অঞ্চলেই বেশী, আর **সাহারা** ও **কালাহারি** এই দুইটি বিস্তৃত মরুর দেশে সব চেয়ে কম।

আফ্রিকা মহাদেশের সমুদয় ভূ-ভাগই একটি মালভূমি বলিলে অন্যায় হয় না। সাহারা মরুভূমির উত্তর প্রান্ত হইতে দক্ষিণে কেপ কলোনি পর্য্যন্ত এবং পশ্চিমে গিনির আটলান্টিক উপকূল হইতে পূর্ব্বে সোমালিল্যাণ্ড পর্য্যন্ত বিস্তৃত। তথাপি আফ্রিকার ভূমিকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। এটলাস পার্ব্বত্য অঞ্চল, ঐ অঞ্চলের দক্ষিণ দিকের সমতল ভূক্ষেত্র, পশ্চিমদিকে নান্ হইতে কেবিস্ উপসাগর পর্য্যন্ত এবং মরক্কো, আলজিরিয়া টিউনিস পর্ব্বতমালার দক্ষিণের অধিত্যকা প্রদেশ হইতে সাহারার উত্তর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং এই সমতলক্ষেত্রের দক্ষিণ ও পূর্ব্বের সমুদয় ভূখণ্ড সেই অতি আদিযুগের পর্ব্বত দ্বারা গঠিত এক বিরাট মালভূমি।

পর্ব্বতমালা

আফ্রিকার পর্ব্বতমালাকেও তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। উত্তরে এটলাস্ (Atlas) পর্ব্বতমালা বিরাজিত। এটলাস মরোক্কোর উত্তর সীমায় অবস্থিত। এই পর্ব্বতশ্রেণীর শৃঙ্গগুলি সচরাচর ১০,০০০ ফিট হইতে ১৪,০০০ ফিট পর্য্যন্ত উচ্চ। উচ্চ শৃঙ্গগুলি সর্ব্বদা বরফে আবৃত থাকে। পশ্চিমদিকের পর্ব্বতমালার মধ্যে ক্যামেরুণ (Cameroon) পর্ব্বতের নাম করা যাইতে পারে। এই পর্ব্বতের উচ্চতা ১৩,০০০ হইতে ১৪,০০০ ফিট হইবে। পূর্ব্বদিকে আবিসিনিয়া পর্ব্বতশ্রেণী (Abyssinian Mountains)। এই পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে কিলিমানজারো (Kilimanjaro) পর্ব্বত আফ্রিকার মধ্যে সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত। দক্ষিণদিকে মালভূমি। মালভূমির পূর্ব্বদিকে এবং দক্ষিণদিকেও পর্ব্বতশ্রেণী রহিয়াছে। ঐ সমুদয় পর্ব্বতের ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। আফ্রিকার পর্ব্বতমালা সমুদ্রের উপকূলে অবস্থিত। এই জন্য আফ্রিকার উপকূল প্রাকৃতিক ভাবে সুরক্ষিত। সহজে এই মহাদেশে প্রবেশ করা সুসাধ্য নহে। আফ্রিকার ভূখণ্ড অন্যান্য দেশের ভূখণ্ডের ন্যায়



জুলু শিকারী

ক্রমনিম্ন নহে, এই জন্য এই সব নদীর গতিপথে প্রায়ই জলপ্রপাত দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সমুদয় জলপ্রপাতের মধ্য দিয়া অগ্রসর হওয়াও বড় সহজ নহে, কাজেই এই মহাদেশে বাহিরের লোকে অনায়াসে প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। এইজন্যই সভ্যদেশের সহিত আফ্রিকার পরিচয় ঘটিতে অনেক বিলম্ব হইয়াছে। এখনও আফ্রিকার সব দেশ আবিষ্কৃত হইয়াছে কিনা সন্দেহ। এইজন্যই ইউরোপীয়েরা এই মহাদেশের নাম দিয়াছেন (Dark Conitnent) বা অন্ধকার মহাদেশ।

মরুভূমি

আফ্রিকায় দুইটি বিখ্যাত মরুভূমি আছে। একটি সাহারা। সাহারা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা

বৃহৎ মরুভূমি। উত্তরে যেমন সাহারা মরুভূমি তেমনি দক্ষিণদিকে **কালাহারি** (Kalahari) মরুভূমি অবস্থিত। লিবিয়া এবং নিউবিয়ার মরুভূমি দুইটি সাহারা মরুভূমিরই অংশ বলিতে পারা যায়।

নদী ও তাহার অবগাহিকা

আফ্রিকার নদীর সংখ্যা অনেক। তবে সে সকলের মধ্যে **নীলনদ, নাইজার, জ্যাম্বেসি, কঙ্গো** প্রভৃতি নদী বেশ বড়। এই সকল নদীতে নৌকা চলাচলের তেমন সুবিধা নাই, নদীর তীরে তীরে বন্দরের সংখ্যাও নাই বলিলেই হয়। কঙ্গো নদীর উৎপত্তিস্থান ন্যায়েসা হ্রদের উত্তর দিকের উচ্চ ভূমি। তোমরা বিখ্যাত পর্য্যটক ষ্ট্যানলির বিষয় 'শিশু ভারতী'তে পড়িয়াছ। ষ্ট্যানলি সাহেব এই নদীটি আবিষ্কার করেন। এই নদীপথ অতি দুর্গম। সমুদ্রের দিকে যতই অগ্রসর হইতেছে, ততই জলপ্রপাতের দ্বারা ইহার গতিপথ দুর্গম হইয়াছে। এই নদীর প্রথম জলপ্রপাতটির নাম লিভিংষ্টোন জলপ্রপাত। বর্ত্তমান সময়ে ষ্ট্যানলি পুলের পর—অনেকদূর পর্য্যন্ত ষ্টীমার চলাচল করিতেছে। রেলপথও এখন বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। কঙ্গো নদীর দৈর্ঘ্য ৩০০০ হাজার মাইল এই নদী অত্যন্ত বেগশালী। ইহার কর্দ্দমাক্ত জল আটলান্টিক মহাসাগরের প্রায় পঞ্চাশ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হওয়ায় সমুদ্রের জল লবণাক্ত হইতে পারে নাই।

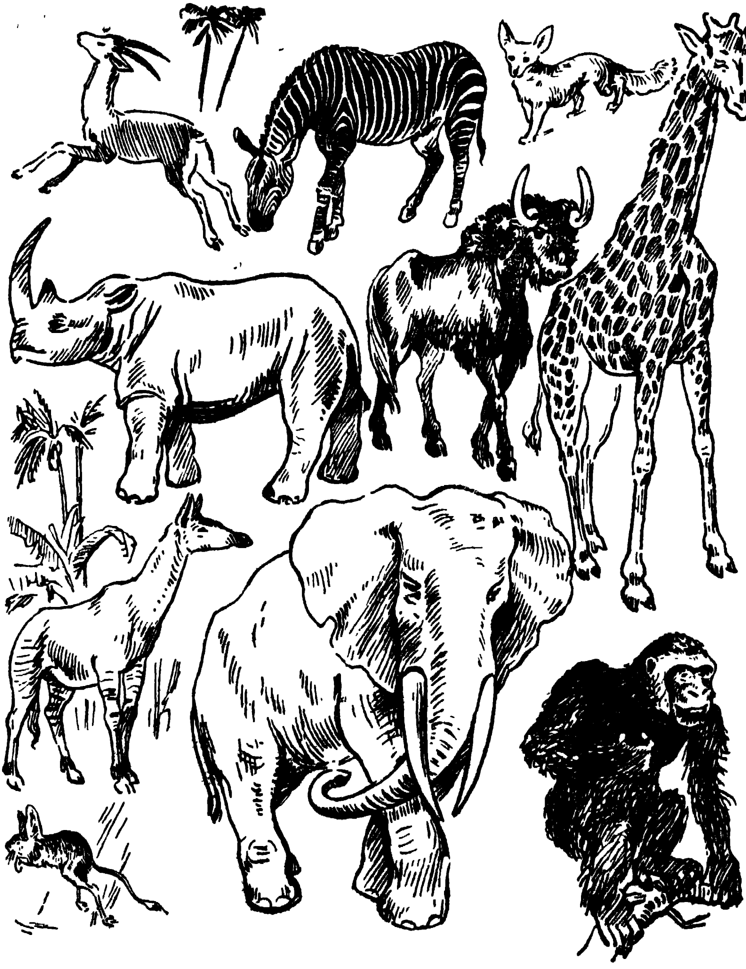
নীলনদ—ভিক্টোরিয়া ন্যায়নজা নামক একটি হ্রদ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

এই নদী আফ্রিকার একটি বৃহৎ নদী। এই নদী দৈর্ঘ্যে পৃথিবীর তৃতীয় স্থানীয় এবং আফ্রিকার নদী সমূহের মধ্যে প্রথম। ইহার উৎপত্তি স্থানে অনবরত বৃষ্টি হয় বলিয়া এই নদী সাহারা মরুভূমির ভিতর দিয়া বহিয়া আসিবার সময়ও কোনরূপে ইহার জলাভাব হয় না। প্রতি বৎসর নীলনদের বন্যা হয়। সেই বন্যায় সারা মিশর দেশ প্লাবিত হইয়া যায়। প্লাবনে জমিতে পলি পড়িয়া থাকে, পলির জন্যই মিশরের জমি এত উর্ব্বরা ও শস্যশালিনী। নীলের এই জলধারা যাহাতে দূরবর্ত্তী শস্যক্ষেত্রের মধ্য দিয়াও প্রবাহিত হইতে পারে তাহারও ব্যবস্থা আছে। নীলনদ সম্বন্ধে প্রাচীনকালের লেখকগণ একটি অতি সুন্দর কথা বলিয়াছেন,—Little damp trickle of life that steals along, undefeated, through the jaws of established death.

নীলনদে নৌকা চলাচল করিয়া থাকে। কিন্তু সর্ব্বত্র সে সুবিধা নাই। আশোয়ান (Aswan) নামক নীলনদের প্রথম জলপ্রপাতের স্থানে একটি বাঁধ তৈয়ারী করা হইয়াছে। এই বাঁধের সাহায্যে কৃষকেরা প্রয়োজনমত ক্ষেত্রসমূহে জল-সেচনের ব্যবস্থা করে। নীলনদের বক্রগতি পর্য্যটক মাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সাপের মত বক্রগতিতে ইহা প্রবাহিত। ইহার প্রবাহ-পথ অনবরত ঘুরিয়া ফিরিয়া চলিয়াছে। সময় সময় নীলনদের বুকে খুব ঝড় হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সময় নৌকা ও জাহাজ অনবরত নীলনদের মধ্য দিয়া চলাফেরা করে।

প্রাচীনকালের ভৌগোলিকগণ নাইজার নদীকে নীলনদেরই একটি শাখা বলিয়া মনে করিতেন। নাইজার (Niger) সাহারার দক্ষিণদিকে সুদান (Sudan)। ইহার পূর্ব্বদিক দিয়া নীলনদ প্রবাহিত। পশ্চিমদিকে নাইজার নদী। কঙ্গো পর্ব্বতে (Congo Mountains) ইহার উৎপত্তি। নাইজার পশ্চিম সুদানের প্রধান নদী, পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া গিনি উপসাগরে যাইয়া পড়িয়াছে। **জ্যাম্বেসী** (Zambesi) দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধান নদী। ইহার উৎপত্তি স্থান কঙ্গোর দক্ষিণ পশ্চিমের বনানী প্রদেশ! এই ভীষণ বন যেমন বন্যজন্তুর বাসভূমি, তেমনি বিবিধ পীড়ার আশ্রয়স্থল। এই নদী কালাহারী মরুভূমির সীমান্ত-প্রদেশের জলাভূমির মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া মোজাম্বিক চ্যানেলে (Mozambique Channel) পড়িয়াছে। আফ্রিকার অন্যান্য নদীর ন্যায় এই নদীও এক পর্ব্বতের উপর হইতে অপর নিম্ন পর্ব্বতে পড়িবার সময় অনেকগুলি জলপ্রপাতের সৃষ্টি করিয়াছে। এই সকল প্রপাতের মধ্যে **ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত** পৃথিবী বিখ্যাত। এই কয়টি নদী ছাড়া লিংপোপো এবং অরেঞ্জ নদীর নাম করা যাইতে পারে। লিংপোপো নদী ট্রান্সভালের উত্তর সীমা দিয়া প্রবাহিত হইয়া ডেলাগোয়া উপসাগরে পড়িতেছে।

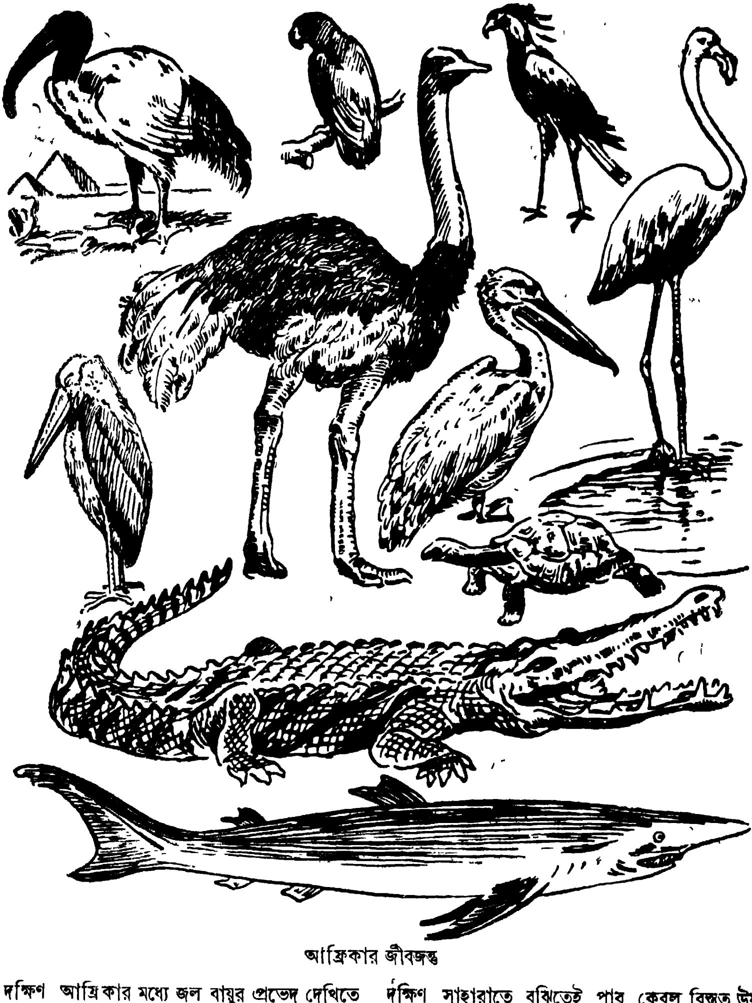
অরেঞ্জ নদী ড্রেকেন্সবার্গ পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া পূর্ব্ব দিকে প্রবাহিত হইয়া আটলান্টিক মহাসাগরে শাখারূপে এবং পরে এই নদী ব্রিটিশ বেচুয়ালাণ্ড, জার্ম্মাণ, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং কেপকলোনির



আফ্রিকার জীবজন্তু

যাইয়া পড়িয়াছে। উৎপত্তি স্থানের কিছু দূরে এই নদী, অরেঞ্জ স্বাধীন রাজ্য কেপকলোনীর মধ্যবর্ত্তী সীমান্তরেখা হইয়াছে। অরেঞ্জ নদীর উপনদী ভাল্‌নদী, ট্রান্সভাল ও অরেঞ্জ স্বাধীন রাজ্যের মধ্যবর্ত্তী।

জলবায়ু- আফ্রিকার জলবায়ু বৈচিত্র্যপূর্ণ। এই বিরাট মহাদেশের তিন ভাগই বিষুবমণ্ডলে অবস্থিত।। এইজন্য ঐ তিনভাগই গ্রীষ্মপ্রধান। উত্তর তরুলতা প্রভৃতি অনেকটা দক্ষিণ ইউরোপের অনুরূপ। সেখানে জলপাইয়ের সারি, দ্রাক্ষালতার-কুঞ্জ ও গমের ক্ষেত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু



আফ্রিকার জীবজন্তু

ও দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে জল বায়ুর প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। ভূমধ্যসাগরের তীরবর্ত্তী দেশ সমূহের দক্ষিণ সাহারাতে বুঝিতেই পার কেবল বিস্তৃত উষর প্রান্তর। বালুকার পর বালুকা, বালিয়াড়ির সারি।

আফ্রিকা

আফ্রিকার বন-জঙ্গল যে কিরূপ ভীষণ এবং তাহাতে কত প্রকারের হিংস্র জন্তু বাস করে তাহা বলিয়া বুঝাইতে পারা যায় না। সে সমুদয়ের কোন কোন বনে প্রবেশ করিলে আর পথের সন্ধান মিলে না। সেই সব গভীর অরণ্যে হস্তীরা দলে দলে বিচরণ করে। আফ্রিকার সিংহ, আফ্রিকার জলহস্তী, আফ্রিকার সর্প প্রভৃতি যে কিরূপ ভীষণ তাহা ভ্রমণকারীদের বর্ণনা হইতে জানা যায়।

এই বিরাট মহাদেশের মানুষ যেমন বিচিত্র ঐ দেশের পশু-পক্ষী, জীবজন্তুও তেমনি বিচিত্র। তোমরা ছবিতে দেখ, কত রকমের অদ্ভুত জানোয়ারের বাস সেই দেশে।

তোমরা উপর হইতে একে একে ছবিগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবে, একজাতীয় হরিণ, জেব্রা, শৃগালজাতীয় জানোয়ার, গণ্ডার, গ্নু, জিরাফ, হস্তী, গরিলা খরগোস প্রভৃতি কত জন্তু! আবার অপর ছবিখানিতে দেখ, উটপাখী, কুম্ভীর, কচ্ছপ ইত্যাদি কত প্রকারের প্রাণী রহিয়াছে। ইহাদের কতকগুলি হয়ত তোমরা চিড়িয়াখানায় দেখিয়া থাকিতে পার, আবার কতকগুলি হয়ত দেখ নাই।

আফ্রিকার পশু-পক্ষীদের মত সেদেশের মানুষও নানা আকারের ও প্রকারের আছে।

আফ্রিকার উত্তরে আরব এবং বারবার জাতির বাস। ইহারা বেশীর ভাগই মুসলমান।

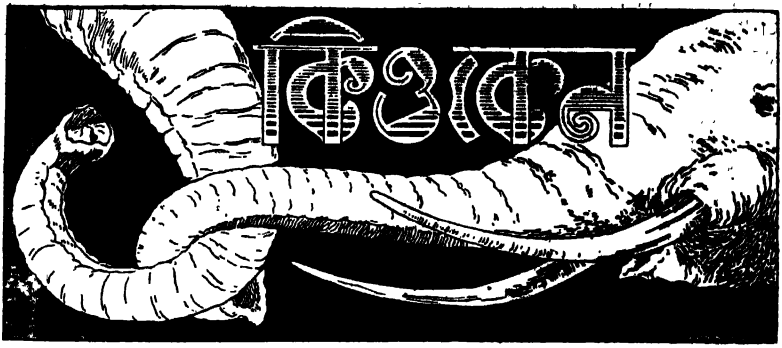
এতদ্ব্যতীত সুডান এবং পশ্চিম আফ্রিকায় নিগ্রোজাতি, পিগমি, বুশম্যান, কাফির, জুলুজাতি, হোটেন্‌টট্ ইত্যাদি নানা অদ্ভুত অদ্ভুত জাতি বাস করে। তাহাদের আকার-প্রকার, আচার-ব্যবহার সবই যেন অদ্ভুত প্রকারের।

আফ্রিকার লোকদের বসবাস, চলাফেরা, ঘরবাড়ীও নানা বিচিত্র রকমের হইয়া থাকে। একদিকে নিগ্রোদের কুটির ও লাঠিহস্তে নিগ্রো, অন্যদিকে একটি মামি, তার নিয়ে মিশরের সভ্য অধিবাসী ও নৃপতিগণের প্রাসাদ, বাহিরের রাজপথে মহিলারা বোরকা পরিয়া চলিয়াছে। আবার ঐ দেখ স্ফিংকস্। অদ্ভুত নয় কি?

আফ্রিকা রৌদ্রদগ্ধ মহাদেশ। উত্তর, মধ্য, পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিকের অপেক্ষা দক্ষিণ আফ্রিকাই বাসের পক্ষে সুবিধাজনক বলিয়া ঐ অঞ্চলেই ইউরোপীয়গণ বাস করিয়া আসিতেছেন।—এখন পর্য্যন্তও আফ্রিকার ভ্রমণকারীগণ বলেন—Africa, as a whole is still a land of mystery, hiding its treasures and holding its secrets from all who are strangers to the soil. অর্থাৎ আফ্রিকা এখনও এমন এক অদ্ভুত অজানা দেশ যে, ইহার কোথায় কোন্ বস্তু লুকাইয়া আছে, তাহা এখন পর্য্যন্তও আবিষ্কৃত হয় নাই।

দক্ষিণ আফ্রিকা

সুয়েজখাল কাটিবার পূর্ব্বে ইউরোপের নাবিকেরা আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণদিক ঘুরিয়া ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকা একটি অতি সুন্দর স্বাস্থ্যকর স্থানে পরিণত হইয়াছে। উত্তমাশা অন্তরীপের নিকট **কেপটাউন** নামে সহর। এই সহরটি অতি সুন্দর। এখানকার জলবায়ুও অত্যন্ত স্বাস্থ্যপ্রদ। সহরের অনতিদূরে একটি অতি সুন্দর পর্ব্বত আছে। পর্ব্বতটির নাম—টেবল পর্ব্বত বা (Table Mountain) দক্ষিণ আফ্রিকাতে অনেক ভারতবাসী বাস করিতেছেন। এখানকার চাষবাস, কৃষিকার্য্য এবং ফলের বাগান বিশেষ প্রসিদ্ধ। ভারতবাসীরা অনেকেই ইউরোপীয়দের অধীনে কৃষিকার্য্য করেন। কেপটাউন হইতে রেলপথে কিম্বারলি (Kimberly) যাইতে পারা যায়। কিম্বারলির হীরকের খনি জগৎ প্রসিদ্ধ। এইখানে অনেক কাফ্রি কাজ করে। যদি তোমরা কখনও এই সব স্থানে বেড়াইতে যাও তাহা হইলে দেখিতে পাইবে কাফ্রিরা খনি হইতে কেমন যত্ন করিয়া হীরক তুলিতেছে। খনির মাটির ভিতরে হীরাগুলি লুকানো অবস্থায় থাকে, মাটি উপরে উঠাইয়া শুকাইলে পর তাহা হইতে উজ্জ্বল হীরকগুলি বাছিয়া আনা হয়। দক্ষিণআফ্রিকার জোহান্‌স্‌বার্গ (Johanesburg) সোণার খনির জন্য প্রসিদ্ধ। এখানে প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ পাওয়া যায়। রোডেসিয়া নামক স্থানেও যথেষ্ট স্বর্ণ পাওয়া যায়। এইজন্য ঐ স্থান বিখ্যাত।



হাতীর শুঁড় থাকে কেন ?

২৯৬০ পৃষ্ঠার পর

তোমরা নিশ্চয়ই হাতী দেখিয়া থাকিবে। ভারতবর্ষ ও আফ্রিকা মহাদেশ হস্তীর বাসভূমি। হাতীর চেহারাটা নিশ্চয়ই অদ্ভুত রকমের। লম্বা একটা শুঁড় কেমন ঝুলিয়া পড়িয়াছে। তোমাদের মনের মধ্যে একটা প্রশ্ন হয়ত অনেক সময় আসে, হাতীর শুঁড় আছে কেন?---কিন্তু ঈশ্বরের সৃষ্টি অতি অদ্ভুত! তাঁহার কোন সৃষ্টিই নিষ্ফল নহে। জিরাফের কেমন লম্বা গলা, এই লম্বা গলা না থাকিলে তাহারা তালগাছের মত উঁচু গাছের ডাল হইতে খাবার খাইত কিরূপে?---এই ভাবে প্রত্যেক জন্তুরই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিধাতা তাহাদের জীবনধারণের সহায়করূপে সৃষ্ট করিয়াছেন। কাহারও লম্বা গলা, কাহারও ঘাড় ছোট, এইরূপভাবে জীবজন্তুদের আকৃতি ও প্রকৃতি লক্ষ্য করিলে সৃষ্টির বৈচিত্র্য দেখিতে পারিবে। এইবার হাতীর কথা বলিতেছি। হাতীর দিকে লক্ষ্য কর, যদি জীবিত হাতী দেখিয়া থাক ভালই, নতুবা হাতীর একটি ছবি বেশ ভাল করিয়া দেখ। হাতীর ঘাড়টি খুব ছোট। তাহার যত কিছু শক্তি মাথার উপর। এই জন্য সে মাটির দিকে নত হইয়া খাবার খাইতে পারে না, কিংবা উপরের দিকে মুখ তুলিয়া হাঁ করিয়া খাবার খাইতে পারে না। এই প্রকারের অসুবিধা দূর করিবার জন্য বিধাতা হাতীর একটি শুঁড় জুড়িয়া দিয়াছেন। সে এই শুঁড়টি উঁচুতে তুলিয়া ইচ্ছামত গাছের ডাল পালা ভাঙ্গিয়া স্বচ্ছন্দে গাছের পাতা খাইতে পারে। নীচে রাস্তার আশেপাশের ঝোপজঙ্গল হইতে খাদ্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে পারে।—যখন জল পান করিতে ইচ্ছা হয়, যখন স্নান করিতে ইচ্ছা হয়, ইচ্ছানুসারে শুঁড় দিয়া জল তুলিয়া পান ও স্নান করিয়া থাকে।

তোমরা হয়ত ছবিতে দেখিয়া থাকিবে, হাতী শুঁড় দিয়া অনায়াসে বড় বড় সেগুন গাছ সরাইয়া ফেলিতেছে। তাহাদিগকে শিক্ষা দিলে আরও নানাপ্রকারের কাজ করিতে পারে। কিন্তু সব কাজই কিন্তু শুঁড়ের সাহায্যে করিয়া থাকে। হাতীর শুঁড়ের জোর এত বেশী যে, যদি তাহারা অতি বড় বলশালী ব্যাঘ্রকেও একবার শুঁড় দিয়া জড়াইয়া ধরিতে পারে, তাহা হইলে তাহার মৃত্যুও অনিবার্য্য। হাতী তাহার শুঁড়ের সাহায্যে মাটি হইতে অতি ক্ষুদ্র পদার্থ, যেমন সিকি, দুয়ানি, সূচ ইত্যাদিও তুলিয়া লইতে পারে।



আইজু প্রধান—মিশ্‌মি-অভিযান ১৯১৩

Reproduced with the permission of the Surveyor General of India.



সমুদ্র তল

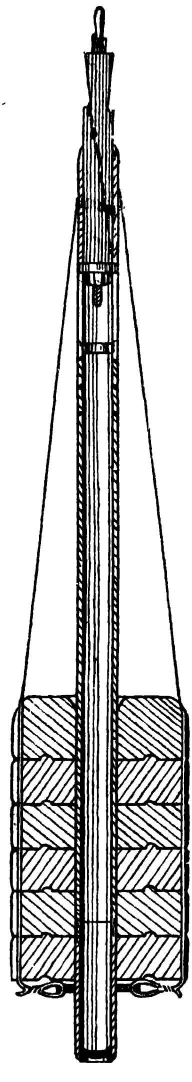
২৬২৬ পৃষ্ঠার পর

সমুদ্রের গভীরতা সম্বন্ধে তোমাদের একটা সাধারণ ধারণা করে দিয়েছি। সাগরগর্ভের নানা ভাগের উত্তাপ নানারকম তাও বলেছি। কি উপায়ে জলের ভিতরকার সেই তাপের মাপ করা যায়, তাও তোমরা শিখেছ। এখন দেখতে হবে, সাগরের জল কোথায় কত গভীর তা কি যন্ত্র সাহায্যে নিরূপণ করা হয়, এবং তলদেশ কি কি উপাদানে গঠিত তা কি উপায়ে জানা যায়।

তোমাদের মধ্যে যারা ষ্টীমারে পদ্মাবক্ষে ঘুরেছ, তারা দেখেছ যে জাহাজের খালাসীরা ক্রমাগত দুধারে জলে একটা রশি ফেলছে আর হাঁকছে "বাঁয়ে দশ বাম",—"ডাইনে সাত বাম",—"বাঁয়ে বাম মিলে না ইত্যাদি। খোঁজ করলে জানতে পারবে যে ঐ রশির এক দিকে একটা সীসার ঢেলা বাঁধা আছে। জলে পড়লে সেই ঢেলাটা তলায় গিয়ে ঠেকে, তখন রশি টেনে তুলে মাপলেই সেই জায়গার জলের মাপ পাওয়া যায়। এই হল জলের গভীরতা মাপবার সবচেয়ে সরল ও প্রাচীন যন্ত্র। আগেকার দিনে দাঁড়টানা নৌকার উপর থেকে এইরকম দড়ি ফেলে ফেলে সমুদ্র কিনারের কাছাকাছি সব জল মাপা হয়েছিল। অবশ্য সমুদ্রে ব্যবহারের জন্য দড়িও নেওয়া হত মোটা ও মজবুত, সীসার তালটাও নেওয়া হত খুব ভারী, সাধারণতঃ ছয়-সাত সের। উপরন্তু এই সীসার তালটার উপর বেশ করে চরবী মাখান হত। রশি টেনে তুললে দেখা যেত যে সীসার তালের চরবীতে আটকে রয়েছে তলার ধূলা-বালি, এমন কি শামুক গুগ্‌লী জাতীয় অনেক ছোট ছোট জীব। এক সঙ্গে দুই কাজ হয়ে যেত! জলের মাপও নেওয়া হত, আবার ধূলাবালি সমস্ত ছাড়িয়ে নিয়ে পণ্ডিতেরা সমুদ্রতলের উপাদান সম্বন্ধে গবেষণা করতেও পারতেন।

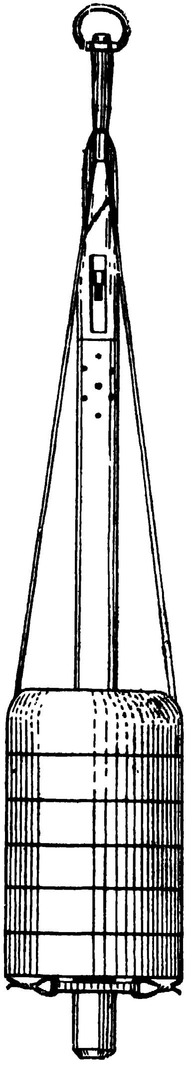
আরও গভীর জলের, একশো হতে দুশো বাম পর্য্যন্ত, মাপ নেওয়ার জন্য মোটা শক্ত শণের রশি ব্যবহার করা হত আর

সীসার তালটা নেওয়া হত আরও বেশী ভারী। সেই সীসার তালে লাগান থাকত নানারকমের ছোট খাটো পাত্র। কোনটা সরার গড়ন কোনটা ঠোঙ্গার মতন, কোনটা বা নল। সমুদ্রতলের বালি, কাঁকর, পাঁক কাদার নমুনা কিছু কিছু উঠে আসত এই সব পাত্রের মধ্যে। সেকালে এইরকম একটা মোটা মেঠো উপায়ে কিনারের কাছাকাছি সমুদ্রগর্ভের তত্ত্বানুসন্ধান অনেক দিন চলেছিল। আন্দাজ ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে স্যর জেমস রস দক্ষিণ মেরু প্রদেশে ছোট নৌকার উপর থেকে এই রকম কাছি ফেলে ফেলে তিন হাজার বাম পর্য্যন্ত গভীর সমুদ্রের মাপ নিয়েছিলেন। অবশ্য বুঝতেই পারছ যে তিন হাজার বাম কাছি পদ্মার খালাসীদের মত হাতে ছাড়া সম্ভব নয়। তাই কাছি জড়ান থাকত এক প্রকাণ্ড কাঠিমের ওপর, আর এমন ব্যবস্থা ছিল যে প্রত্যেক একশো বাম কাছি ছাড়লেই আপনা হতে তার একটা হিসাব থেকে যেত। তবু দেখা গেল যে মাপটা সম্পূর্ণ নির্ভুল নেওয়া হচ্ছে না, কেন-না অত নীচে সীসার তালটা ঠিক কোন সময়ে তলায় ঠেকত তা বোঝা যেত না। রস সাহেব নিজেই এ কথা বুঝতে পারলেন। ফলে মাপ যন্ত্রের উন্নতির নানা চেষ্টা হতে থাকল। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার নৌবহরের সেনানী ব্রুক সাহেব এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করলেন। কাছির ডগায় তিনি সীসার তালের বদলে একটা ভারী যন্ত্র ঝুলিয়ে দিলেন। সেই যন্ত্র তলায় ঠেকলেই তার খানিকটা ভাগ খসে পড়ত আর রশির টান থেকে তৎক্ষণাৎ বোঝা যেত যে যন্ত্র তলায় পৌঁছে গেছে, ভুলচুকের কোন সম্ভাবনা থাকত না। এর পর দ্রুতগতিতে ব্রুকের এই যন্ত্রের নানা-রকমের পরিণতি হতে লাগল। সমস্ত কথা তোমাদের জানার দরকার নেই। তবে একটা যন্ত্রের ছবি এইখানে দিচ্ছি সেইটা ভাল করে দেখলেই সব ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারবে। এর নাম Baillie Sounding Machine। ১৮৭২-৭৬ খৃষ্টাব্দে চেলেঞ্জার জাহাজের অভিযানে এই যন্ত্রের ব্যবহার হয়েছিল। মোটা শণের কাছিতে ঝুলিয়ে এই কল জলে নামান হত। এর ওজন ছিল মোট প্রায় সাড়ে চার মণ। ঠিক মাঝখানে একটি নল, তার বহর কম বেশী আড়াই ইঞ্চি। গভীর সমুদ্রের তলায় পৌঁছলে নলটা সেখানকার লাল পাঁকের মধ্যে প্রায় এক হাত গেড়ে যেত। কাছি ঢিলে হওয়া মাত্র নলের চারিপাশের ভারী ওজনের চাকতিগুলো খসে



জল মাপিবার যন্ত্র

পড়ত। কাছিতে আবার টান দিলে নল উপরে উঠে আসত, চাকতি নীচেই পড়ে থাকত। নল উঠে আসার সঙ্গে সঙ্গে তার নীচের মুখে যে valve, কপাটিকা আছে সেটা আপন হতে বন্ধ হয়ে যেত ভেতরের মাটি কাদা বেরিয়ে যেতে পারত না। এই রকমে চেলেঞ্জা-রের পণ্ডিতেরা প্রতি বারে প্রায় এক quart বোতল ভরা পাঁকের নমুনা সংগ্রহ করতেন। অনুবীক্ষণ যন্ত্রে সেই পাঁক তন্ন তন্ন করে দেখে সমুদ্র-তল সম্বন্ধে অনেক তথ্য তাঁরা আবিষ্কার করেছিলেন। লিউ-কাস ইত্যাদি আরও কয়েক রকমের যন্ত্র আছে, তাতে শণের কাছির বদলে ধাতব তারের রশি ব্যবহার হয়। ঐ সব যন্ত্রের তলায় মাটি কাদা সংগ্রহের ব্যবস্থাও নানা রকমের করা হয়েছে। তবে সর্বত্রই এই এক নিয়ম যে যন্ত্র তলায় ঠেকবামাত্র উপরে খবর পৌঁছায়, রশি লোল হলেই ওজনটা খসে পড়ে আর উঠে আসবার সময় মাটি ভরা নল বা পাত্রের মুখ আপনা হতে বন্ধ হয়ে যায়।



জল মাপিবার যন্ত্র

আর এক বৈজ্ঞানিক উপায়ে সাগর জলের গভীরত্ব নির্ণয় করা হয়ে থাকে। উপরে জাহাজে একটা ঘণ্টা বাজিয়ে দেখা হয় তলা থেকে তার প্রতিধ্বনি আসতে কত সময় লাগে। জলে কত ক্ষণে কত দূর শব্দ চলে তা জানা আছে। সুতরাং প্রতিধ্বনি কতটা দূর থেকে আসছে সেটা একটু হিসাব করলেই বার করা যায়। আজকাল এরই একটু রকমারি করে অনেক জায়গায় জলের গভীরতা মাপা হয়। জাহাজের মধ্যে ঘণ্টা না বাজিয়ে জাহাজের একটু বাহিরে একটা বোমা ফোটে, তারপর সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক উপায়ে দেখা হয় যে কতক্ষণে সেই বোমার আওয়াজের প্রতিধ্বনি সমুদ্রতল থেকে ফিরে আসে। এই হিসাব করা হয় Radio বা বৈদ্যুতিক তরঙ্গের সাহায্যে। এ সম্বন্ধে বেশী কথা বলব না, তোমরা বুঝবে না। তবে প্রায় ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে বরফ ঢাকা দুর্গম দক্ষিণ মেরু সাগরে এই পরীক্ষার দ্বারা Byrd সাহেব সহজেই নির্ণয় করেছিলেন নীচের সমুদ্রের জলই বা কত গভীর, আর উপরের বরফ স্তরই বা কত পুরু।

সমুদ্রগর্ভের মাপজোক নেওয়া সম্বন্ধে তোমাদের একটু ধারণা হল ত!

এইবার সমুদ্রতলের উপাদান সম্বন্ধে সামান্য কিছু বলব। তোমরা জান যে ক্ষিতি-মণ্ডল একটার উপর একটা এই রকম নানা স্তর দ্বারা গঠিত। ডাঙ্গার উপর এটা সহজেই দেখা যায়, বোঝা যায়। ক্রমাগত ঝড়

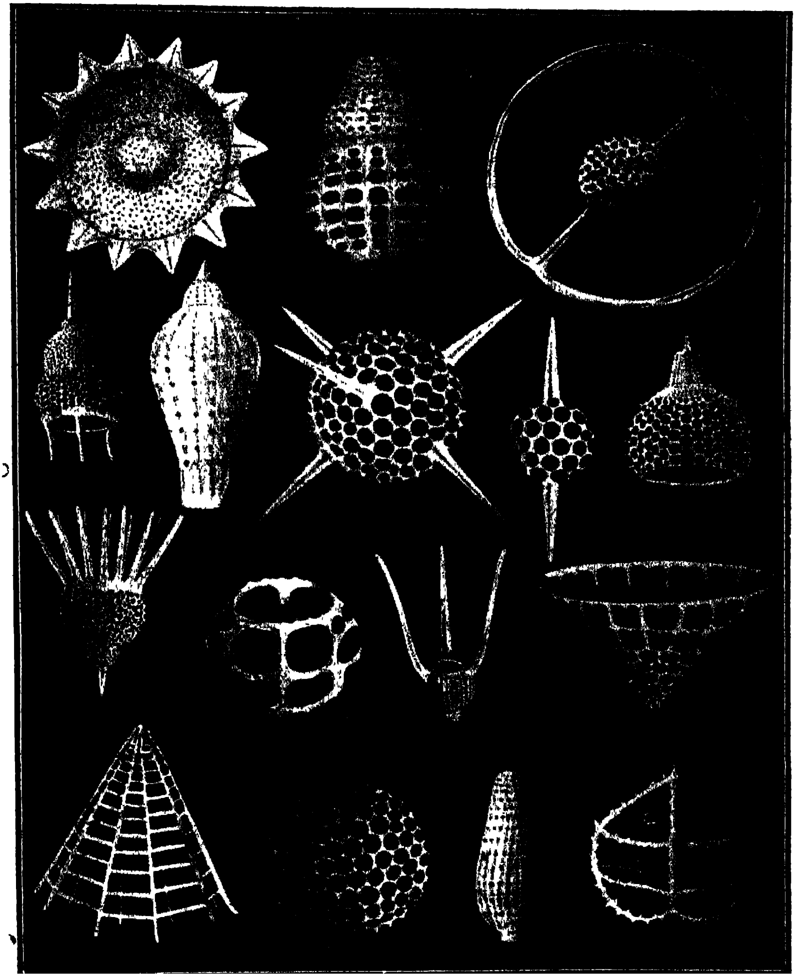
বৃষ্টির তোড়ে উপরের স্তর ক্ষয়ে যাচ্ছে, নীচের স্তরগুলো বেরিয়ে পড়ছে। শুধু তাই নয়, যেখানে ইচ্ছা মানুষ খুঁড়ে দেখতে পারে, নীচের স্তরগুলো আপনা থেকে নজরে পড়বে। সমুদ্রে কিন্তু এসব কিছুই হবার জো নেই। ঝড় বৃষ্টির প্রকোপে সমুদ্রতল ক্ষয়েও যাচ্ছে না, আর জলের ভিতর কেউ খুঁড়েও দেখতে পারে না। তাই যে আদিম পাথরের স্তরগুলো সমুদ্রতলের ভিতরে আছে সাধারণতঃ তার কোন পাত্তাই পাওয়া যায় না। উপরে যে যন্ত্রগুলার কথা বলেছি তার সাহায্যে যে মাটি কাদা পাঁক উঠে আসে তার মধ্যে কদাচ কখনও এক আধটা আদিম (Tertiary) পাথরের টুকরা পাওয়া যায়, এই পর্য্যন্ত। কাজেই জলের ঠিক তলাতে উপরের স্তরে যে বালি কাদা পাঁক পাওয়া যায় তারই বর্ণনা পড়ে তোমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে। এই বালি কাদা পাঁকের মধ্যে ধাতব পদার্থ ও জান্তব পদার্থ দুই আছে। বেলা ভূমির বালি এক চিমটী নিয়ে যদি অনুবীক্ষণ দিয়ে পরীক্ষা কর ত দেখবে যে তার মধ্যে অজস্র ছোট ছোঠ Quartz পাথরের দানাও রয়েছে আবার অসংখ্য অতি ক্ষুদ্র বিচিত্র গড়নের জীবপঞ্জর শামুক, ঝিনুক জাতীয় জীবের খোসাও রয়েছে। একখানা ছবি এইখানে দিচ্ছি, দেখবে কি অপূর্ব্ব সুন্দর গঠন এই সমস্ত জান্তব পদার্থ কণার!

এখন একটু হিসাব করে দেখা যাক যে সমুদ্রতলের বালি কাদা আসে কোথা হতে। প্রথম হল, ক্ষিতিমণ্ডলের দান। পৃথিবীতে যত নদ নদী আছে তারা দিবারাত্র সারাক্ষণ জলের সঙ্গে রাশি বালি কাদা এনে ঢালছে সমুদ্রের মধ্যে এই বালি কাদা ত সমস্তই ডাঙ্গা থেকে সংগ্রহ করা। নদীর স্রোতে, বৃষ্টির তোড়ে মাটি ও পাথর কুচো জলজ জীব শামুক ইত্যাদির কঙ্কাল সব পিষে ভেঙ্গে গুড়ো হয়ে স্রোতের সঙ্গে এসে সাগরে ঢুকছে, আর তলায় প্রায় তিনশো মাইল পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়ছে। সুধু নদীর জলের সঙ্গেই যে ডাঙ্গার এই সব চূর্ণ পদার্থ আসে তা নয়। ঠাণ্ডা দেশে বরফের চাঙ্গ-ডার ভেতরে ভেসে ভেসে কত রকমের পদার্থ কণা দূর দূর সমুদ্রে চালান হচ্ছে! এ ছাড়া সমুদ্র কিনারের বড় বড় পাহাড়ের গা পর্য্যন্ত অনবরত ভেঙ্গে ধসে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে জলগর্ভে মিশে যাচ্ছে। বেলাভূমি হতে তিনশো মাইল পর্য্যন্ত সমুদ্রতল প্রধানতঃ ডাঙ্গা থেকে পাওয়া এই চূর্ণ দ্রব্য সমূহ দিয়ে গঠিত।

দ্বিতীয় হল আগ্নেয়গিরির দান। আগ্নেয়-পর্ব্বত জলের মধ্যেও আছে, ডাঙ্গাতেও আছে। ডাঙ্গায় অগ্নি উৎপাতের ফলে যে Pumice (ঝামার মত পদার্থ) ইত্যাদির গুঁড়ো উৎপন্ন হয়, সে গুলো হাওয়ার স্রোতে উড়ে সমুদ্রের উপর গিয়ে পড়ে। জলে ভেসে ভেসে বহুদূর পর্য্যন্ত যায় ও অবশেষে থিতিয়ে পড়ে সমুদ্র তলে। তারপর সমুদ্র-গর্ভস্থ জ্বালামুখী পাহাড়ে বহুযুগ ধরে যে অগ্নির উৎপাত হয়ে আসছে, তার দরুণ যে সমস্ত তপ্ত চূর্ণ পদার্থ (Volcanic dust) বেরিয়ে এসেছে সে সমস্তই সমুদ্র তলে সঞ্চিত হয়ে রয়েছে। বাহিরের দূর সমুদ্রে অগাধ জলের নীচে হতে যন্ত্র সাহায্যে যে লাল কাদা তুলে আনা হয় তার প্রধান উপকরণই হচ্ছে এই আগ্নেয় ধূলি কণা।

তা হলে কিনারের কাছের সাগর তল হল প্রধানতঃ ডাঙ্গা হতে আনা চূর্ণ পদার্থ। দূর সমুদ্রের অথৈ জলের নীচে যে মাটি, সেটা হল মুখ্যতঃ আগ্নেয়গিরির দান। তা হলে এই দুয়ের মাঝে যে সমুদ্রের ভাগ

তার তলায় কি রকম মাটি ? জলে রশি ফেলে যন্ত্র দ্বারা যে নমুনা তুলে আনা হয় সেটা প্রধানতঃ ধূসর বর্ণ পাঁক। অনুবীক্ষণ দিয়ে এই ধূসর দ্রব্য পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে এর প্রধান উপাধান হচ্ছে Globigerina জাতীয় জীবাণুর পঞ্জর। অণুবীক্ষণে

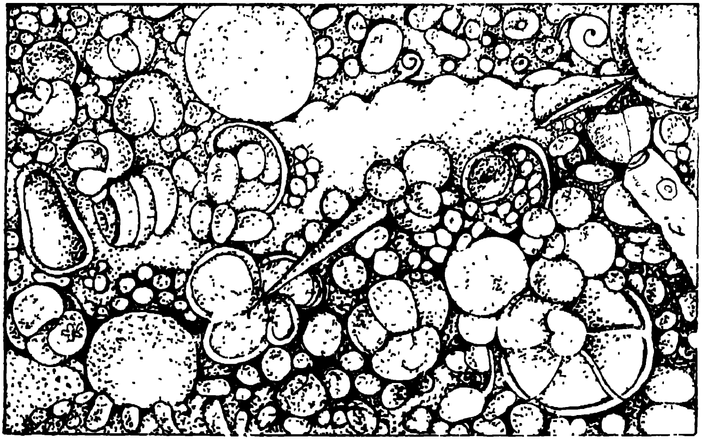


অণুবীক্ষণ দিয়ে পরীক্ষা করে বেলাভূমির একচিমটি বালুর মধ্যে দেখা গিয়াছে অতি ক্ষুদ্র বিচিত্র গঠনের জীবপঞ্জর শামুক, ঝিনুক জাতীয় জীবের খোসা

যেরূপ দেখা যায় তাহার একখানা চিত্র এইখানে দিলাম। পৃথিবীর নানা স্থানে সমুদ্র তটে যে চা খড়ির পাহাড় আছে সেগুলি প্রধানতঃ এই জীব কঙ্কাল দিয়ে গঠিত।

একটা কথা তোমাদের জানা উচিত। বাহির সমুদ্রের তলায় যে লাল পাঁক পাওয়া যায় তাতেও জীবপঞ্জর যথেষ্ট আছে, কেন-না সমুদ্রের জল সর্ব্বত্র নানা জাতীয় অতি ক্ষুদ্র জীবাণুতে ভরা। আর এক আশ্চর্য্য

সমুদ্র গর্ভের অবস্থা সম্বন্ধে একটা কথা বলা বাকী রয়েছে, আলো আঁধারের কথা। সাগরের জলকে মোটামুটি স্বচ্ছ পদার্থ বলা যায়। তাই সূর্য্যের আলো বহুদূর পর্য্যন্ত, প্রায় ৬০০ ফুট প্রবেশ করে। ছয়শো ফুট নীচে অবশ্য আলো খুব কম। তারপর ক্রমশঃ এই আলো কমতে কমতে তিন হাজার ফুটে একে বারে শেষ হয়ে যায়। তার নীচে গভীর অন্ধকার, স্তব্ধ শান্ত অতি শীতল ঘোর



ব্যাপার এই যে গভীর জলের লাল পাঁকের মধ্যে সময় সময় সাবেক কালের অধুনা লুপ্ত জল জন্তুর দন্তাদি পাওয়া যায়। ডাঙ্গায় হলে এই সব দন্তাদি পদার্থ মাটি চাপা পড়ে পড়ে অনেক নীচে ভূগর্ভে চলে যেত। কিন্তু বাহিরের অগাধ সাগরে পলিমাটিও পড়ে না, তলদেশের জলরাশির কোন নড়া চড়াও নাই, একেবারে স্তব্ধ শান্ত, তাই সেখানকার পাঁকের মধ্যে প্রাচীন জীব জন্তুর দেহাবশেষ উপরের স্তরেই রয়ে গেছে।

অন্ধকার। সে অন্ধকার যে কেমন তা তোমরা কখনও কল্পনা করতে পারবে না। তোমরা অমাবস্যার অন্ধকারকেই ভীষণতম অন্ধকার বলে মনে কর, কিন্তু সমুদ্রতলের সেই ভীষণ অন্ধকারের সহিত তাহার তুলনা-ই হ'তে পারে না। আলোর ক্ষীণ রেখাটিও সেখানে নেই—সমস্ত জায়গা ঘিরে রয়েছে একটা ঘুটঘুটে কালো অন্ধকার। উপরে সমুদ্র জলের নীল শোভা যেমন বিচিত্র, তেমনি ইহার অতল তলের গাঢ়তম অন্ধকারও বৈচিত্র্যময়।



দেশীয় পুষ্পজাত রঞ্জন উপকরণ

২৫২১ পৃষ্ঠার পর

বর্ত্তমান সময়ে বস্ত্রাদি রঞ্জন কার্য্যের জন্য প্রায়শঃই কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত রং সমূহ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কৃত্রিম রং সমূহের আবিষ্কারের পূর্ব্বে, অর্থাৎ বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্তও বৃক্ষলতাদি জাত প্রাকৃতিক উপাদান সমূহই রঞ্জন কার্য্যের জন্য একমাত্র ব্যবহৃত হইত। পাশ্চাত্য শিল্পিগণ রঞ্জন উপকরণ সমূহের জন্য অনেকটা ভারতবর্ষ, আফ্রিকা বা আমেরিকার মুখাপেক্ষী ছিলেন। প্রতি বৎসর বহু টাকা মূল্যের রঞ্জন উপকরণ ভারতবর্ষ প্রভৃতি স্থান হইতে ইউরোপে প্রেরিত হইত।

পক্ষান্তরে প্রাচীন কাল হইতেই ভারতবর্ষে নানা প্রকার স্বদেশজাত প্রাকৃতিক উপাদান রঞ্জন কার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। এতদ্দেশে প্রচলিত রঞ্জন উপকরণ সমূহকে মোটামুটি পাচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে :—

(১) **পুষ্প** (পলাশ ফুল, কুসুমফুল প্রভৃতি)।

(২) **বৃক্ষলতাদির মূল**—(হরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, অল প্রভৃতি)।

(৩) **বৃক্ষকাষ্ঠ ও বল্কল**—(কাঁঠাল, বাকম ও চন্দনকাষ্ঠ প্রভৃতি)।

(৪) **ফল বা বীজ**—(লট-কান, কমলা প্রভৃতি)।

(৫) **বৃক্ষপত্র**—(নীল, মেন্দী প্রভৃতি)।

পুষ্পজাত রঞ্জন উপকরণ সমূহের আলোচনা করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

পুষ্পজাত রঞ্জন উপকরণের ব্যবহার :—

বহুকাল যাবৎ এদেশে বিবিধ প্রকার পুষ্প বস্ত্রাদি রং করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ভারতবর্ষ ব্যতিরেকে পৃথিবীর অন্য কোনও দেশেই রঞ্জন কার্য্যের জন্য এত প্রকার পুষ্পের ব্যবহার হয় না। পুষ্পসমূহ দুষ্প্রাপ্য বলিয়াই অথবা পুষ্প দ্বারা রঞ্জন প্রণালী সম্বন্ধে জ্ঞানাভাব বশতঃই বা অন্য যে কোন কারণেই হউক ইউরোপে পুষ্প-জাত রংয়ের ব্যবহার কখনও বিশেষ ছিলনা এবং বর্ত্তমানেও নাই. পূর্ব্বে কুসুম ফুল এবং কুম্ কুম্ প্রাচ্য দেশ সমূহ বিশেষতঃ ভারতবর্ষ হইতে প্রচুর পরিমাণে প্রতি বৎসর রঞ্জন কার্য্যের জন্য ইউরোপে প্রেরিত হইত। অধুনা উক্ত ব্যবসায়ে এক প্রকার লুপ্ত হইয়াছে বলা যাইতে পারে।

প্রকৃতির লীলাভূমি ভারতবর্ষে অরণ্যে, কান্তারে, পর্ব্বতে, মাঠে, বাগানে, গৃহপার্শ্বে সর্ব্বত্রই প্রায় সকল ঋতুতেই অসংখ্য প্রকার বিবিধ বর্ণের ফুল দেখিতে পাওয়া যায়। এমত অবস্থায় নানাপ্রকার পুষ্প যে দেশীয় রঞ্জন-শিল্পে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিবে, ইহা অতি স্বাভাবিক। কিন্তু এতদ্দেশীয় অসংখ্য প্রকার পুষ্প হইতেই যে বর্ণনানুযায়ী রং পাওয়া যাইবে এইরূপ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক। প্রকৃতপক্ষে অতি অল্প সংখ্যক পুষ্পই রঞ্জন কার্য্যের জন্যই ব্যবহার করা যাইতে পারে। অবশ্য অনেক পুষ্পের ব্যবহারের চেষ্টাও হয়ত হয় নাই এবং হয়ত অনেক পুষ্পের ব্যবহার প্রণালীও অনেকে অবগত নহে! কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা বহুস্থলে দেখা গিয়াছে যে অতি উজ্জ্বল বর্ণের পুষ্প হইতে ও বস্ত্রাদি রঞ্জন উপযোগী কোনও রং পাওয়া যায় না। অনেক স্থানে "কেরোটিন" (Carotion) নামে পরিচিত কয়েকটি যৌগিক জৈব পদার্থ বর্ত্তমান থাকায় পুষ্পগুলি উজ্জ্বল পীতবর্ণ দেখায়, কিন্তু কেরোটিন দ্বারা মোটেই রং করা যায় না।

এদেশে যে সমস্ত পুষ্প হইতে রং পাওয়া যায় তাহাদিগকে দুইটি সাধারণ শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে (ক) যে সমস্ত পুষ্পের অংশ বিশেষ হইতেই মাত্র রং পাওয়া যায়—(১) পলাশফুল, (২) কুসুমফুল (৩) গেন্দাফুল (৪) শেফালিকা (৫) কুমকুম্ (৬) মান্দারফুল,—উক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত। (খ) যে সমস্ত পুষ্পের সমস্ত অংশ হইতেই রং পাওয়া যায়—(১) তুনফুল (২) ধাইফুল, (৩) অম্বার্গ, (৪) পাট্ বা পাটোয়া (রক্তজবা জাতীয় একপ্রকার ফুল) শেষোক্ত শ্রেণীর ।

যে সমস্ত পুষ্পের অংশ বিশেষই মাত্র রঞ্জন কার্য্যোপযোগী, নিয়ে এক একটি করিয়া তাহাদের সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব বিস্তৃত আলোচনা করা গেল।

পলাশফুল

পলাশ, কিংশুক, যজ্ঞীয় রক্তপুষ্পক, ক্ষার শ্রেষ্ঠ বাত পোথ, ব্রহ্মবৃক্ষ ও সমিদ্বর এই কয়েকটী এক পর্য্যায়ক শব্দ। পলাশকে হিন্দুস্থানে ঢাক ও ব্রহ্মদেশে পকৃপিন্ (Paukpin) বলে। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম (Butea-Froudosa) ইহা প্রকৃত ভারতবর্ষীয় বৃক্ষ। আব্রহ্ম ভারতের সর্ব্বত্রই অযত্নে বর্দ্ধিত অসংখ্য বন্য পলাশবৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। ইতিহাস প্রসিদ্ধ পলাশী যুদ্ধক্ষেত্র পূর্ব্বে অসংখ্য পলাশবৃক্ষে পরিপূর্ণ ছিল এবং ঐ পুষ্প বৃক্ষের নামানুসারেই উক্ত স্থানের নাম "পলাশী" হইয়াছে। মুর্শিদাবাদের রঞ্জন শিল্পিগণ পীত বর্ণের রেশম রং করিবার জন্য পলাশী হইতে পূর্ব্বে প্রচুর পরিমাণ পলাশফুল সংগ্রহ করিত। বর্ত্তমান ঢাকা নগরী ও পূর্ব্বে বহু পলাশ বা ঢাক বৃক্ষ পরিবৃত ছিল; প্রচলিত একটি প্রবাদ অনুসারে ঢাকবৃক্ষের প্রচুরতা হেতুই এই স্থানের নাম ঢাকা হইয়াছে, এবং নগরের উত্তরাংশে নিবিড় পলাশবনের মধ্যে আবিষ্কৃত ও প্রতিষ্ঠিত দশভূজা দেবী ঢাকেশ্বরী আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

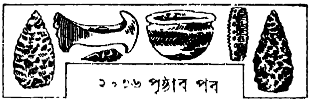
ওষধিরূপে প্রাচীন সংস্কৃত বহু গ্রন্থে পলাশের উল্লেখ পাওয়া যায়। পলাশ বৃক্ষগাত্র নিঃসৃত কটু তিক্ত কষায় স্বাদ বিশিষ্ট একপ্রকার নির্য্যাস ধারক ওষধিরূপে আসল বা পিয়াশাল (Indian kind নির্য্যাসের পরিবর্ত্তে কখনও কখনও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। স্যার জর্জ্জ ওয়াটের মতে চেষ্টা করিলে পলাশের বক্কল বা কাষ্ঠ হইতে খয়েরের ন্যায় এক প্রকার কাষায়িন (Fannin) নির্য্যাস সংগ্রহ করা যাইতে পারে। ডেমক্ (Daymock) রেচক ওষধিরূপে পলাশ বীজ তৈলের উল্লেখ করিয়াছেন।

পলাশ নিম্বাদিজাতীয় বৃক্ষ (Leguminosae) পলাশফুল একবর্ষী, রক্তবর্ণ ও গন্ধহীন। গন্ধহীনতা নিবন্ধন পলাশ-পুষ্পকে গুণ শূন্য বাহ্য সৌন্দর্য্যের উপমাস্থল ধরা হইয়া থাকে। শীতের শেষভাগে পলাশফুল ফুটিতে আরম্ভ করে এবং পুষ্পোদ্গমের সঙ্গে সঙ্গে পত্র সমূহ ক্রমে ঝরিয়া পড়িতে থাকে। তখন পল্লবপত্র শূন্য লোহিত বর্ণ পুষ্প সৌন্দর্য্য ধারণ করে। বৌদ্ধগণ পলাশ ফুলকে রক্তাম্বরপরিহিত সংসার ত্যাগী অনুতপ্ত যোগীর সহিত তুলনা করিয়া থাকেন। সপ্তশতকের একটী চরণের (Strophe) অর্থ এই যে "বসন্তকালে পৃথিবী পলাশ ফুলে আচ্ছন্ন থাকায় যেন ভিক্ষু দ্বারা বলিয়া প্রতীয়মান হয়।" উপমাটি অতি সুন্দর নয় কি?



মুদ্রা

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আধুনিক সভ্যজগতে সোণারূপা মুদ্রা হিসাবে ব্যবহৃত হয়। খণ্ড খণ্ড ধাতুর উপর বিশেষ ছাপ অঙ্কিত করিয়া দিয়া মুদ্রায় পরিণত করা হয়। সরকারের নিদর্শন বিশিষ্ট এইরূপ ধাতু খণ্ডকে 'মুদ্রা' কহে। খাঁটী সোণা বা রূপা দিয়া কখনও মুদ্রা তৈয়ারী করা হয় না। সোণা রূপার সহিত খাদ না মিশাইলে উচিত মত শক্ত হয় না, নরম থাকিয়া যায় এবং সহজে ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে পারে ; তাই কিঞ্চিৎ পরিমাণ খাদ মিশাইয়া মুদ্রা তৈরী করা হয়। সোণার সহিত রূপা ও তামা এবং রূপার সহিত তামা খাদ দেওয়া হয়। সরকারের নামাঙ্কিত মুদ্রাগুলি সরকারের নির্দ্দেশে লোকে দেনা পাওনা উশুলিতে লইতে বাধ্য। তাই মুদ্রা গুলিকে 'চলৎ-সিক্কা' বা 'লিগ্যাল্ টেন্ডার' বলা হয়। এই খানেই মুস্কিল—কেননা, তাহা হইলে মুদ্রার দুই রকম মূল্য হয়—(১) সোণা বা রূপার তাল হিসাবে ইহার একটা ধাতুগত মূল্য এবং (২) সরকার নির্দ্দিষ্ট একটা চলৎ-সিক্কা মূল্য।



২০৩৬ পৃষ্ঠার পর

এই চলৎ-সিক্কা মূল্য বা মুদ্রা-মূল্য এবং ধাতুমূল্য সব সময়েই একই হওয়া আবশ্যক ; কেন না যদি ধাতু-মূল্য, মুদ্রা-মূল্য অপেক্ষা অধিক হয় অর্থাৎ মুদ্রাটী 'উৎকৃষ্ট' (ষ্ট্রং) বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহা হইলে লোকে মুদ্রা গলাইয়া ধাতু হিসাবেই বিক্রয় করিবে। পক্ষান্তরে মুদ্রাটী যদি 'নিকৃষ্ট' (উইক্) হয় অর্থাৎ ধাতু মূল্য, মুদ্রা-মূল্য অপেক্ষা কম হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে সরকার লোককে ফাঁকি দিয়া ন্যায্য মূল্য অপেক্ষা বেশী আদায় করিতেছেন। সুতরাং সরকারের দেখা কর্ত্তব্য যে মুদ্রাগুলির মুদ্রা-মূল্য ও ধাতুমূল্য সর্ব্বদাই একইরূপ থাকে। কিন্তু তাহা করা সহজ নহে। হয়ত সরকার অনেক হিসাব করিয়া নূতন মুদ্রা ছাড়িবার সময় তাহার একটা মূল্য স্থির করিয়া দিলেন, সে মূল্য হয়ত ঠিক্ ধাতু-মূল্যের সমান। কিন্তু সোণাও ত বাজারে আর পাঁচটা পণ্যের মত বিক্রয় হয় ; তাই বাজারের ওঠা-নামার সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রাটীর ধাতু মূল্যেরও তারতম্য হইতে পারে। সুতরাং সরকারের পক্ষে এমন একটা উপায় বাহির করা আবশ্যক যাহাতে সোণার বাজার মূল্য না ওঠে-নামে। অবাধ মুদ্রা তৈয়ারীর প্রথার প্রচলন করিয়া সরকার ইহা করেন। যে-কেহ সোণার তাল টাঁকশালে জমা দিয়া সেই সোণায় মুদ্রা তৈয়ারী করাইয়া লইতে পারেন। যে-কেহ এই ভাবে সোণার তালকে মুদ্রা করাইয়া

লইতে পারেন বলিয়া, মুদ্রা ও সেই ওজনের সোণার তালের বিনিময় মূল্য একই থাকে, তফাৎ হয় না। সোণার তালের পরিবর্ত্তে যে হারে মুদ্রা দেওয়া হয়, তাহাকে সোণার 'টাঁকশালী দর', (মিনট প্রাইস্) কহে। ইংলণ্ডে সরকার যে কোন পরিমাণ সোণা আউন্স প্রতি ৩ পাঃ ১৭ শিঃ ১০½ পেন্স দরে ক্রয় করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। সরকার যখন এই দরে সোণা কিনিতে প্রস্তুত তখন কেহই ইহা অপেক্ষা অল্প দরে সোণা বিক্রয় করিতে চাহিবে না। পক্ষান্তরে যদি কোন বণিক টাঁকশালী দর অপেক্ষা বেশী দর দেন, তবে লোকে বিক্রয়ার্থ তাহার নিকট এত অধিক পরিমাণ সোণা উপস্থিত করিবে যে, সম্ভবই সে, দর কমাইয়া দিতে বাধ্য হইবে; কেন না সভারিণ গলাইয়া বিক্রয় করিয়া মুনাফা করিতে কেহই দ্বিধা বোধ করিবে না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, সোণার দর, টাঁকশালী দরের দ্বারাই স্থিরীকৃত হয়।

কোন দেশের সকল কাজ একমাত্র স্বর্ণমুদ্রার দ্বারা চলে না—দুই বা তিন রকমের মুদ্রার ব্যবস্থা রাখিতে হয়। তাই সব দেশেই সোণা ছাড়াও রূপা ও তামার মুদ্রার ব্যবস্থা রাখিতে হয়। এই সব গৌণ মুদ্রায় যতটা পরিমাণ ধাতু থাকে তাহা অপেক্ষা উহার আকৃতি-মূল্য বা মুদ্রা-মূল্য অধিক হয়। যদি ঐ গৌণ মুদ্রাগুলিতে যতটা ধাতু থাকে তাহার মূল্য, মুদ্রা মূল্য অপেক্ষা অধিক হয়, তাহা হইলে লোকে ঐ সব মুদ্রা গলাইয়া ফেলিবে এবং দেশেও আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুদ্রা দেখা যাইবে না। রাণী এলিজাবেথের বাণিজ্য বিষয়ক পরামর্শদাতা স্যার টমাস গ্রেশাম্ আনুমানিক ১৫৪৯ খৃষ্টাব্দে এই নিয়মাবলীর সুস্পষ্ট রূপ দেন। নিয়মটী এই—"যে-দেশেই দুই ধাতুর মুদ্রা একসঙ্গে চলৎ-সিক্কা বলিয়া প্রচলিত সেই দেশেই মানুষ ঐ দুই রকম মুদ্রার মধ্যে যেটী অপেক্ষাকৃত মন্দ সেই অর্থদ্বারা বিনিময়ের কাজ চালায়, আর ভাল অর্থ ক্রমশঃ অপ্রচলিত হইয়া অদৃশ্য হইয়া পড়ে।" ইহাকেই সংক্ষেপে বলা হয় যে "নিকৃষ্ট মুদ্রা উৎকৃষ্ট মুদ্রাকে সরাইয়া দেয়।" কথাটা হয় ত ঠিক বুঝিতে পারিলে না, আর একটু বিশদ ভাবে বুঝাইয়া বলি। লোকের পাওনা মিটানোর জন্যই প্রধানতঃ মুদ্রা ব্যবহার হইয়া থাকে। আইনতঃ যদি দুইটী বিভিন্ন ধাতু নির্ম্মিত মুদ্রা দ্বারায় পাওনা মিটানো যায়—দুইটী মুদ্রাই চলৎ সিক্কা বলিতে ইহাই বুঝায়—তবে স্বভাবতঃই লোকে দুইটীর মধ্যে যেটী নিকৃষ্ট সেইটী দিয়াই ঋণ পরিশোধ করিবে এবং উৎকৃষ্ট মুদ্রাটী নিজের কাছেই রাখিয়া দিবে। দুইটী মুদ্রার একটী উৎকৃষ্ট ও অপরটি নিকৃষ্ট বলিলে এই বুঝিতে হইবে যে, দুইটীর যে-কোনটী দ্বারাই ঋণ পরিশোধ করা গেলেও, সোণা রূপার বাজারে বা সেকরার দোকানে দুইটীর সমান মূল্য নাই। সেখানে সোণার দর রূপার চেয়ে কিছু চড়া: অতএব স্বর্ণ মুদ্রাগুলিকে সোণা হিসাবে বাজারে বিক্রয় করাই লাভজনক। তাই লোকে পাওনা মিটানোর জন্য রৌপ্যমুদ্রাগুলি ব্যবহার করিয়া স্বর্ণমুদ্রা নিজের কাছেই রাখিয়া দিবে এবং সময়মত সোণারূপার বাজারে বা সেকরার দোকানে বিক্রয় করিবে। যখন দেখা যাইবে যে সোণা বাজার হইতে সরিয়া পড়িতেছে, তখন বুঝিতে হইবে যে লোকে উৎকৃষ্ট মুদ্রাটী রাখিয়া নিকৃষ্ট মুদ্রাটীই ছাড়িয়া দিতেছে। সকলে হতাদর মুদ্রাই ঋণ-পরিশোধের জন্য ব্যবহার করিয়া থাকে এবং উৎকৃষ্ট মুদ্রাটী লাভজনক ভাবে খাটাইবার জন্য রাখিয়া দেয়। ধরা যাক, টাঁকশালে ১৬ আউন্স রূপা জমা দিলে যতগুলি মুদ্রা পাওয়া যায়, ১ আউন্স সোণা জমা দিলেও ঠিক ততটা মূল্যের মুদ্রা পাওয়া যায়। তাহা হইলে আমার ১৬ আউন্স রূপা ১ আউন্স সোণার সমান হইল। আরও ধরা যাক যে সোণা-রূপার বাজারেও সোণা-রূপা এই হারে কেনা-বেচা হয়। এরূপ ক্ষেত্রে আমার পাওনা মিটানোর সময় আসিলে আমি দুইটীর যেটী ইচ্ছা সেইটী দিয়াই করিব। কেন না উভয় মুদ্রাই সমান উৎকৃষ্ট বা সমান নিকৃষ্ট; সুতরাং কোন একটী বিশেষ ধাতু-নির্ম্মিত মুদ্রাকে হাতছাড়া করিতে কোন কষ্ট হইবে না। কিন্তু যদি কোন কারণে সোণারূপার বাজারে ১৭ আউন্স রূপার মূল্য ১ আউন্স সোণার মূল্যের সমান হইয়া দাঁড়ায় তাহা হইলে বাজার দর হিসাবে সোণার ধরাট থাকিবে এবং রৌপ্য মুদ্রা নিকৃষ্ট মুদ্রা হইয়া দাঁড়াইবে কেন না এই অবস্থায় ১ আউন্স সোণা, সোণারূপার বাজারে বিক্রয় করিলে ১৭ আউন্স রূপা পাওয়া

যায়। আবার এই ১৭ আউন্স রূপা টাঁকশালে জমা দিলে ১৬ আউন্স রূপার বদলে যতগুলি মুদ্রা পাওয়া যাইত তাহা অপেক্ষা কিঞ্চিদধিক পরিমাণ মুদ্রা পাওয়া যাইবে। অতএব স্বর্ণমুদ্রা কাছে রাখিয়া সোণারূপার বাজারে বিক্রয় করিয়া, সেই রূপায় টাঁকশাল হইতে মুদ্রা করাইয়া লইয়া পাওনা মিটানোই লাভজনক। ফলে এই দাঁড়াইবে যে, দেশের টাকাকড়ির মধ্যে আর স্বর্ণমুদ্রা খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না, রৌপ্য মুদ্রারই প্রাধান্য দেখা যাইবে।

কোন দেশের সরকার যখন পুরাতন মুদ্রা বা ক্ষয়প্রাপ্ত মুদ্রাগুলিকে টাকাকড়ির বাজার হইতে সরাইয়া ফেলিতে চাহেন তখন গ্রেশামের নিয়মটা খাটিতে দেখা যায়। যদিও পুরাতন ও নূতন মুদ্রা উভয়েরই ক্রয়শক্তি এক, তথাপি লোকে নূতন মুদ্রা হাতে পাইলে তাহা আর হাত ছাড়া করিতে চাহে না। মনে কর, তোমার বন্ধু সুশীলকে তোমায় কিছু টাকা দিতে হইবে। পকেটে হাত পুরিয়া তুমি একমুঠা টাকা বাহির করিলে—দেখিবে যে তুমি সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই চকচকে টাকাগুলি নিজের পকেটে রাখিয়া ময়লা টাকাগুলি বাছিয়া বাছিয়া সুশীলকে দিতেছ। এইভাবে নূতন মুদ্রাগুলি বাজারে আসিবার সাথে সাথেই অদৃশ্য হইয়া যায় এবং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর পরিমাণে পুরাতন মুদ্রাগুলি দেখা যায়। পুরাতন মুদ্রাগুলি সরকারী তহবিলে আসার সঙ্গে সঙ্গে যদি সরকার সেগুলি আটকাইয়া না রাখেন, তবে বহুদিন পর্য্যন্ত পুরাতন মুদ্রাই কেবল বাজারে দেখা যাইবে। তবে একটা কথা, যদি টাকাকড়ির যোগান একটা পুরাতন মুদ্রা সম্পূর্ণ মিটাইতে না পারে তবে পুরাতন মুদ্রার সহিত নূতন মুদ্রাও চলিবে।

এবার হয়ত তোমাদের মনে হইতে পারে যে উৎকৃষ্ট মুদ্রাগুলি সরিয়া পড়িয়া যায় কোথা? প্রথমতঃ, যাহাদের হাতে উৎকৃষ্ট মুদ্রাগুলি যাইয়া পড়ে তাহারা সেগুলি বাক্সবন্দী করিয়া রাখে অর্থাৎ উৎকৃষ্ট মুদ্রাগুলি সঞ্চিত হইতে থাকে। ইউরোপীয় মহাসমর আরম্ভ হইবার পর আমাদের দেশে লোকে টাকা বা গিনি হাত-ছাড়া করিতে চাহে নাই। যে-দেশে লোকে টাকা বাক্সে পুরিয়া বা মাটীতে পুঁতিয়া না রাখিয়া ব্যাঙ্কে জমা করিয়া রাখে সেখানের ব্যাপার একটু পৃথক। ব্যাঙ্ক মাঝে মাঝে বিদেশে টাকাকড়ি পাঠায়। বিদেশ হইতে মাল আমদানী করিয়া তাহার মূল্য বাবৎ টাকাটা ব্যাঙ্কের মারফৎই সাধারণতঃ পাঠান হইয়া থাকে। যদি বাজারে রূপার দর, মুদ্রা-মূল্য অপেক্ষা বেশী থাকে তাহা হইলে ব্যাঙ্কের পক্ষে রূপার বদলে সোণাই বিদেশের পাওনা মিটানোর জন্য পাঠান লাভজনক। এই ভাবে দেশের মধ্যে ব্যবহারের জন্য রূপা থাকিয়া যায়। আর সোণা বিদেশের ঋণ পরিশোধের জন্য ব্যবহৃত হইতে থাকে।

কিন্তু, তাহা হইলে যে-সব দেশে রৌপ্য মুদ্রারও চলন আছে' সে-সব দেশে সোণা সরিয়া পড়ে না কেন? ইহার হেতু এই যে, সে-সব দেশে লোকে রূপা টাঁকশালে জমা দিয়া ইচ্ছামত মুদ্রায় পরিণত করিবার ক্ষমতা সরকার নিজের হাতেই সম্পূর্ণ রাখিয়াছেন। অপর কেহ মুদ্রা প্রস্তুত করিতে পারে না বা করাইয়াও লইতে পারে না। সরকার রৌপ্য মুদ্রার জন্য বাণী আদায় করিয়া নিজের তহবিল বাড়ান; কিন্তু সেজন্য সরকারকে অনেকখানি দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইয়াছে। সরকারকে দেখিতে হয় যে, যেন রৌপ্য মুদ্রা অধিক পরিমাণে ছাড়া না হয়, কেননা তাহা হইলে রৌপ্য মুদ্রার মূল্য কমিয়া যাইবে বা হতাদর হইবে। যাহাতে বেশী ছাড়া না হয়—একবারে ঠিক ঠিক ছাড়া হয়—সেদিকে লক্ষ্য রাখা বড় সহজ কথা নয়, যেহেতু অধিক বা অল্প ছাড়া—উভয়ের ফলই ভয়ঙ্কর। রৌপ্য মুদ্রার পরিমাণ কম থাকিলে যাহারা সোণার বদলে রূপা চায় তাহাদিগকে মুস্কিলে পড়িতে হয়। সরকার সাধারণতঃ কখনও প্রয়োজনের অপেক্ষা কম রৌপ্য মুদ্রা ছাড়িতে চাহিবে না, কেননা, তাহাতে তাঁহার অতখানি পরিমাণ বাণী লোকসান হইবে। অধিক রৌপ্য মুদ্রা ছাড়ার ফল এত ভয়ানক যে সরকারের পক্ষে তাহা বুঝিতে পারিলে বন্ধ করিবার চেষ্টা করা উচিত। রূপাকে যদি অবাধ ভাবে টাঁকশাল হইতে মুদ্রায় পরিণত করা যায় তবে অল্প সময়েই সোণা দেশের টাকাকড়ির বাজার হইতে সরিয়া পড়িবে। সেইজন্য রূপাকে চলৎ-সিক্কা করা উচিত। পাশ্চাত্য দেশ সমূহে প্রায় সর্ব্বত্রই এই ব্যবস্থা আছে।



উনডিন্

[লা মট্ ফুকের De La Motte Fouque (১৭৭৭—১৭৪৩) নামক জার্ম্মেণ লেখকের Undine and the Knight লিখিত গল্পের ইংরাজী হইতে অনূদিত। মট্ফুকের লিখিত উনডিন্ বিখ্যাত গ্রন্থ। এ বইখানি ১৮১১ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়।]

এক

২৭৭৮ পৃষ্ঠার পর

শত শত বৎসর পূর্ব্বে এক দিন সন্ধ্যার সময় একটি সুন্দর হ্রদের ধারে এক বৃদ্ধ ধীবর তরুলতা-বেষ্টিত ক্ষুদ্র কুটীরের সম্মুখে বসিয়া জাল বুনিতেছিল। স্থানটি বড়ই মনোহর ও নির্জ্জন। অন্য লোকালয়ের চিহ্নমাত্র নাই। ধীবরের কুটীরের পশ্চাতে এক গভীর দুর্ভেদ্য অরণ্য। অরণ্যের অপর পারে এক নগর। লোকে বলিত, এই অরণ্য, ভূত প্রেতের আবাস-স্থান। এই কারণে কেহ সে বনে প্রবেশ করিতে সাহস করিত না। কিন্তু বৃদ্ধ ধীবর প্রত্যহ উচ্চৈঃস্বরে ভগবানের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে নির্ব্বিঘ্নে বন অতিক্রম করিয়া নগরে মৎস্য বিক্রয় করিয়া আসিত।

সে দিন সন্ধ্যাকালে জাল বুনিতে বুনিতে সহসা অরণ্যমধ্যে অশ্বপদশব্দ শুনিতে পাইল। চমকিয়া বৃদ্ধ ধীবর সেই দিকে চাহিল ও দেখিল, অরণ্যের নিবিড় তরুশ্রেণীর মধ্যে এক গৌরবর্ণ বৃহৎ মনুষ্যমূর্ত্তি দেখা যাইতেছে। ভীত হইয়া সে উচ্চৈঃস্বরে ভগবানের নাম উচ্চারণ করিতে লাগিল, এবং তৎক্ষণাৎ দেখিল যে, সেই মূর্ত্তি অদৃশ্য হইয়া পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্র নদীতে বিলীন হইয়া গেল। সে বিস্ময়পূর্ণনয়নে সহসা পুনরায় দেখিল যে, শ্বেত অশ্বে আরোহণ করিয়া এক মনুষ্যমূর্ত্তি অরণ্যের মধ্য হইতে বাহির হইয়া তাহার দিকে আসিতেছে। অশ্বারোহী নিকটে আসিলে ধীবর দেখিল, সে এক জন সুসজ্জিত যুবক যোদ্ধা; তাহার দেহ সুগঠিত, বদনমণ্ডল অত্যন্ত সুন্দর, মস্তকে উজ্জ্বল মনোহর উষ্ণীষ; কটিদেশে বহুমূল্য মণিমুক্তাখচিত তরবারি। যোদ্ধা কুটীরের সম্মুখে আসিয়া বৃদ্ধ ধীবরকে সম্বোধন করিয়া সেই রাত্রির জন্য অতিথি হইতে চাহিলেন। ধীবর, আহ্লাদের সহিত তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া নিজের কুটীরে লইয়া চলিল। যোদ্ধা তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, "তুমি ইচ্ছায় আমাকে

আশ্রয় না দিলে আমি বলপূর্ব্বক থাকিতাম; কারণ এই হ্রদ অতি গভীর এবং সহজে পার হওয়াও সম্ভব নহে; আর ঐ মায়াকাননের ভিতর দিয়া ফিরিয়া যাওয়াও অসম্ভব।" এই কথা বলিতে বলিতে উভয়ে কুটীরে প্রবেশ করিলেন। ধীবর পত্নী সম্ভ্রান্ত অতিথি দেখিয়া তাঁহাকে সমাদর করিয়া একখানি আসনে বসিতে দিল, এবং রন্ধনশালায় আহারের উদ্যোগ করিতে গেল। কিছুক্ষণ পরে বৃদ্ধা ফিরিয়া আসিল, এবং ধীবর, ধীবরপত্নী ও যুবক বসিয়া আলাপ করিতে লাগিলেন। যোদ্ধা বলিলেন, তাঁহার নাম 'হুলডব্র্যাণ্ড'। অরণ্যের অপর পারে—নগরে তাঁহার প্রাসাদ। তিনি পূর্ব্ব দিন এই গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, সহসা কুটীরের বাহিরে জলের শব্দ শোনা গেল, এবং মনে হইল, কেহ যেন বাহির হইতে জানালার উপরে সজোরে জল ফেলিতেছে। ইহা শুনিয়া ধীবর বিরক্তিব্যঞ্জক ভ্রূকুটী করিয়া সেই দিকে চাহিল। কিন্তু আরও দুই তিনবার ঐরূপ শব্দ শ্রুত হইল, এবং অবশেষে গৃহের ভিতর জলের ধারা বহিয়া আসিল। তখন বৃদ্ধ রাগ করিয়া জানালার নিকট উঠিয়া গিয়া বলিল, "উনডিন্! তুমি এ সকল কুঅভ্যাস ও তামাসা কি কখনও ছাড়িবেনা?—বিশেষতঃ আজ আমাদের গৃহে একজন সম্ভ্রান্ত অতিথি আসিয়াছেন।"

বাহির হইতে কেহ উত্তর দিল না; কেবল মৃদু মধুর হাস্যধ্বনি সকলের কর্ণে প্রবেশ করিল। ধীবর আসিয়া হুল্ডব্র্যাণ্ডকে বলিল—"মহাশয়! আশা করি, আপনি এই সকল বা অন্য কোনও ঘটনায় বিরক্ত হইবেন না। আমাদের পালিতা কন্যা উন্‌ডিন্ বড় দুষ্ট। তাহার বয়স যদিও এখন সপ্তদশ বৎসর হইয়াছে, তথাপি এখনও তাহার বালিকা-সুলভ চঞ্চলতা যায় নাই,—কিন্তু আর যাহাই করুক, তাহার মন বড়ই সরল এবং"—ধীবরপত্নী একটু বিরক্তির স্বরে বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ, তুমি ত ভাল বলিবেই। সমস্ত দিন বাহির হইতে ঘুরিয়া আসিয়া হয় ত তোমার এই সকল দুষ্টামি ভাল লাগে। আমি এই বৃদ্ধ বয়সে সারাদিন গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত থাকি এবং পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া যাই, উন্‌ডিনের নিকট ত কোন সাহায্য পাই না, বরং সে আমাকে কেবল বিরক্ত ও জ্বালাতন করে।"

ধীবর হাসিয়া বলিল, "তা যাই করুক, উহার উপর বেশী রাগ করা যায় না।"

সহসা দ্বার খুলিয়া গেল, এবং একটি পরমাসুন্দরী বালিকা হাসিতে হাসিতে গৃহে প্রবেশ করিল, এবং বীণানিন্দিতস্বরে বলিল, "বাবা, তুমি আমার সহিত তামাসা করিতেছ? কোথায় তোমার অতিথি?"

বলিতে বলিতে তাহার চঞ্চল দৃষ্টি যুবক যোদ্ধার উপর পড়িল। সে তৎক্ষণাৎ নীরব হইয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া বিস্মিতনয়নে অতিথির প্রতি চাহিয়া রহিল! সহসা এই নির্জ্জন স্থানে ধীবরের ক্ষুদ্র কুটীরে এই অপূর্ব্বসুন্দরী বালিকাকে দেখিয়া হুল্ডব্র্যাণ্ড বিস্মিত হইয়া মুগ্ধনয়নে তাহার লাবণ্যপূর্ণ বদন-কমল দেখিতে লাগিলেন এবং ভাবিলেন যে, এখনই বুঝি বালিকা লজ্জিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া



পদকখানি লইয়া নাড়িতে লাগিল

লইবে।—কিন্তু ঠিক তাহার বিপরীত ঘটনা ঘটিল। স্থিরনয়নে হুল্ডব্র্যাণ্ডকে নিরীক্ষণ করিয়া বালিকার যেন সাহস হইল। সে ধীরে ধীরে যুবকের নিকটে গিয়া ভূমিতে জানু পাতিয়া বসিয়া তাহার কণ্ঠের স্বর্ণহার ও তাহার সহিত সংলগ্ন পদকখানি হস্তে লইয়া নাড়িতে নাড়িতে বলিল—"তুমি কিরূপে এতদিন পরে আমাদের এই ক্ষুদ্র কুটীরে আসিলে? তুমি কি ঐ ভয়ঙ্কর অরণ্য হইতে আসিয়াছ? বালিকার

কথা শেষ না হইতেই ধীবর পত্নী তাহাকে তিরস্কার করিয়া উঠিল, বলিল—"যাও, নিজের কাজ করগে।" উন্‌ডিন্ উঠিয়া একখানি ছোট তক্তা টানিয়া আনিয়া যুবকের পায়ের কাছে বসিল, এবং তাহার বুনিবার জালখানি হাতে লইয়া মৃদুস্বরে বলিল—"মা, আমি এখানে বসিয়াই রান্না করিব।" তারপর পুনরায় ধীবর হুল্ডব্র্যাণ্ডের সহিত কথা কহিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু উন্‌ডিন তাহাদের কথায় বাধা দিয়া বলিল,—"আমি



এখানে বসিয়াই রান্না করিব

অতিথিকে জিজ্ঞাসা করিলাম—তিনি কোথা হইতে আসিয়াছেন? কিন্তু এখনও কোনও উত্তর পাই নাই।" অতিথি বলিলেন—"আমি ঐ বনের ভিতর হইতে আসিয়াছি।"

"ঐ ভয়ঙ্কর অরণ্যের মধ্যে কেন প্রবেশ করিয়াছিলে, আর সেখানে কি দেখিলে? শুনিয়াছি, উহার ভিতর অনেক প্রকার অদ্ভুত ও ভয়ঙ্কর বস্তু আছে; তুমি কি কি দেখিয়াছ, তাহা শুনিতে বড় ইচ্ছা হইতেছে। আমাকে সেই সকল বৃত্তান্ত বল। হুল্ডব্র্যাণ্ড শিহরিয়া উঠিলেন, তাহার পর বালিকার দিকে চাহিয়া গম্ভীরস্বরে কি বলিতে আরম্ভ করিতেছিলেন, কিন্তু বৃদ্ধ ধীবর বলিয়া উঠিল "মহাশয়, আপনি পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়াছেন, রাত্রিও অধিক হইয়াছে, আহারাদিও হয় নাই; এক্ষণে সেই সকল কথা বলিবার কোন প্রয়োজন নাই।" বৃদ্ধের নিষেধ শুনিয়া উন্‌ডিন্ উঠিয়া দ্রুতপদে বৃদ্ধের সম্মুখে গিয়া বলিল, "কেন বাবা? বলিতেই হইবে। যখন আমার ইচ্ছা, তখন নিশ্চয় বলিবে! দেখি কে বাধা দেয়!"

অত্যন্ত ক্রোধ করিয়া বালিকা এই কথাগুলি বলিল, কিন্তু তাহার সুন্দর মুখের কোনও বিকৃতি



আমি আজ আশ্রয় চাই

হইল না। তাহার হাসি চঞ্চলতা দেখিয়া যুবক যেমন মোহিত হইয়াছিলেন, তাহার উগ্রমূর্তি দেখিয়া তেমনই মুগ্ধ হইলেন। কিন্তু বৃদ্ধ ধীবর উন্‌ডিন্‌কে অত্যন্ত তিরস্কার করিতে লাগিল। তখন উন্‌ডিন্ বলিল, "আমার শুনিতে এত ইচ্ছা, আর তুমি আমাকে শুনিতে দিবে না? আচ্ছা, তোমরা তোমাদের অন্ধকার ছোট কুটিরে একা থাকো।"

এই বলিয়া বালিকা বিদ্যুদ্বেগে বাহিরে চলিয়া গেল, এবং ঝড় বৃষ্টি ও অন্ধকারে কোথায় অদৃশ্য



সেই মূর্তি নদীতে বিলীন হইয়া গেল

হইল। অন্ধকার রাত্রে তাহাকে সহসা চলিয়া যাইতে দেখিয়া ধীবর চীৎকার করিয়া উঠিল, "উন্‌ডিন্! কি করিলে? এই ভয়ঙ্কর ঝড় বৃষ্টির

সময় রাত্রে কোথায় গেলে? এখনই ফিরিয়া আইস।" কিন্তু কেহ উত্তর দিল না। তখন হল্‌ডব্র্যাণ্ডের প্রতি চাহিয়া বৃদ্ধ বলিল, "উন্‌ডিন্ বড় দুষ্টু মেয়ে, আরও কয়েকবার এইরূপ করিয়াছে; খুঁজিয়া কোথাও পাই নাই, আবার নিজেই ফিরিয়া আসিয়াছে। মহাশয়। এই ঝড়ে ও অন্ধকারে তাহাকে পাওয়া অসম্ভব। ও বড় দুষ্ট; নিকটেই কোথাও আছে, আমরা একটু অপেক্ষা করিয়া দেখি, ঝড় একটু কমিলে খুঁজিতে যাইব।" এই বলিয়া ধীবর নীরব হইল

দুই

ধীবর বলিতে লাগিল,—"আপনি হয় ত আমাদের পালিতা-কন্যা উন্‌ডিনের বিষয় জানিতে কৌতূহলী হইয়াছেন। কিরূপে তাহাকে



একটি সুন্দরী বালিকা গৃহে প্রবেশ করিল

পাইয়াছি, তাহা আমি আপনাকে বলিতেছি। পনেরো বৎসর পূর্ব্বে আমার একটি কন্যা জন্মিয়াছিল। আমার আর কোন সন্তান-সন্ততি ছিল না। বুড়া বয়সের একমাত্র মেয়েটি আমাদের অত্যন্ত আদরের হইল। যখন বয়স দুই বৎসর, তখন এক দিন আমি সহরে মৎস্য বিক্রয় করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিতেছিলাম। গৃহের নিকটে আসিয়া দেখিলাম, আমার পত্নী করুণ-স্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে কুটীর হইতে দৌড়াইয়া আমার দিকে আসিতেছে। আমার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। আমি বলিলাম, "দয়াময় ভগবন্! কি হইয়াছে? কোথায় মেয়ে? শীঘ্র বল!" আমার পত্নী কাঁদিতে কাঁদিতে উত্তর করিল, "যাঁহাকে ডাকিলে, তাঁহারই নিকট সে গিয়াছে।" তাহার পর পত্নীর নিকট শুনিলাম যে, সে হ্রদের ধারে কন্যাটিকে কোলে লইয়া বসিয়াছিল, সহসা শিশু জলের দিকে চাহিয়া হ্রদে ঝাঁপ দিয়া পড়িল, এবং মুহূর্ত্তমধ্যে একেবারে ডুবিয়া গেল। আমরা কত খুঁজিলাম, কত কাঁদিলাম, কিন্তু হায়! আর সেই হৃদয়ের ধনকে ফিরিয়া পাইলাম না। সেইদিন রাত্রে আমরা শোকার্ত্ত-হৃদয়ে নীরবে কুটীরে বসিয়াছিলাম। সহসা দ্বার খুলিয়া গেল, এবং একটি সুন্দরী বালিকা হাসিতে হাসিতে গৃহে প্রবেশ করিল। তাহার পরিধানে সুন্দর কাপড়, কিন্তু তাহার সমস্ত দেহ আর্দ্র বস্ত্র ও কেশ হইতে বিন্দু বিন্দু জল ঝরিতেছে। কিছুক্ষণ বিস্মিত ও নির্ব্বাক ভাবে আমরা তাহার প্রতি চাহিয়া রহিলাম। তাহার পর আমি বলিলাম এইমাত্র আমাদের প্রাণাধিক সন্তানকে হারাইয়াছি; তাই আমাদের সান্ত্বনা করিতে বুঝি দয়াময় এই সুন্দর শিশুটিকে পাঠাইয়াছেন। সেই দিন অবধি উন্‌ডিন্ আমাদের নিকট রহিয়াছে। কাহার সন্তান, কিরূপে কোথা হইতে আসিল, জানিতে পারি নাই। কিন্তু বোধ হয়, বহু দূরে কোন অপরিচিত সুন্দর দেশে বাস করিত। কারণ, সে 'স্ফটিক প্রাসাদ' ও 'প্রবাল-মন্দিরের' গল্প করিত। আমি উহার নাম ডরোথিয়া ('ভগবানের উপহার') রাখিতে চাহিয়াছিলাম। কিন্তু বালিকা তাহাতে কোনও মতে রাজী হইল না। সে জেদ করিয়া বলিল, তাহার নাম "উন্‌ডিন্"। আমরা অগত্যা তাহার সেই উন্‌ডিন নামই রাখিলাম। উন্‌ডিন্ বড় চঞ্চল প্রকৃতি। সহসা জলপ্রবাহের শব্দ হইল, এবং অতি বেগে কুটীরের ভিতরে জল বহিয়া আসিল। তখন বৃদ্ধ ধীবর ভীত হইয়া চীৎকার করিয়া বলিল,—উন্‌ডিন্! উন্‌ডিন্ তুমি এখন কোথায়!" যুবক ও ধীবর দ্রুতপদে বাহিরে গেলেন। তখন ঝড় বৃষ্টি থামিয়াছে, মেঘ সরিয়া গিয়াছে এবং চন্দ্রালোকে চারিদিক প্রফুল্ল ও উজ্জ্বল হইয়াছে। যে ক্ষুদ্র নদী অরণ্য

হইতে বহির্গত হইয়া হ্রদে পড়িয়াছে, তাহা স্ফীত হইয়া মাঠ বন সমুদায় প্লাবিত করিয়াছে এবং সেই জল, বেগে কুটিরের চারিদিকে বহিতেছে। দু'জনে দুই দিকে অন্বেষণ করিতে বাহির হইলেন, এবং বার বার নাম ধরিয়া



জলে সাঁতার দিয়া তাহার নিকট গেলেন

উনডিন্‌কে ডাকিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ পরে সহসা হল্‌ডব্র্যাণ্ড দেখিলেন যে, জলবেষ্টিত একটি উচ্চ স্থানে উনডিন্ একটি বড় গাছের নীচে বসিয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া হাসিতেছে। সহসা যুবক জ্যোৎস্নাকিরণে চতুর্দ্দিকে জলপ্রবাহ ও বৃক্ষতলে সেই অপূর্ব্বসুন্দরী বালিকাকে দেখিয়া যেন কোনও স্বপ্নের ন্যায় বোধ করিলেন। হল্‌ডব্র্যাণ্ড জলে সাঁতার দিয়া তাঁহার নিকট গেলেন। বালিকা তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া হল্‌ডব্র্যাণ্ডকে নিকটে বসাইয়া মৃদুস্বরে বলিল, "সুন্দর যোদ্ধা! এখানে বসিয়া তোমার গল্প আমায় বল।" বালিকার এইরূপ ব্যবহারে যুবক যোদ্ধা মোহিত হইয়া তাহাকে স্নেহালিঙ্গন করিলেন। এমন সময় বৃদ্ধ ধীবর সেই স্থানে আসিয়া এই দৃশ্য দেখিয়া ক্রোধভরে তাহাদিগকে তিরস্কার করিতে লাগিল, এবং উনডিন্‌কে ফিরিয়া যাইতে আজ্ঞা করিল। যুবক লজ্জিত হইল। কিন্তু বালিকা বিন্দুমাত্র লজ্জিত হইল না। অবশেষে বৃদ্ধ ক্রন্দন করিতে লাগিল। তখন হল্‌ডব্র্যাণ্ড বালিকাকে বলিলেন "উনডিন্, বৃদ্ধ পিতার দুঃখ দেখিয়া কি তোমার একটুও মায়া হয় না? এখনই তাঁহার নিকট ফিরিয়া যাওয়া উচিত।" ইহা শুনিয়া বালিকা বিস্ময়পূর্ণ বড় বড় নয়ন দুইটি তাহার দিকে ফিরাইয়া চিন্তিতভাবে বলিল, "তুমি যদি তাহা মনে কর, তবে অবশ্য যাওয়া উচিত; কিন্তু বাড়ী গিয়া আমাকে গল্প বলিতে হইবে।"

তারপর সকলে গৃহে ফিরিল। তখন রাত্রি শেষ হইয়া আসিয়াছে। গৃহে ফিরিয়া উনডিনের অনুরোধে হল্‌ডব্র্যাণ্ড তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন।—"ঐ অরণ্যের অপর পারে—নগরে সাত আট দিন হইল অশ্বোৎসব হইয়াছিল। তাহাতে আমি উপস্থিত ছিলাম। উৎসবে এক দিন এক সুন্দরী কুমারীকে দেখিলাম। শুনিলাম যে, তিনি নগরের এক জন ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পালিতা কন্যা। উৎসবে নৃত্যে-গীতে আমি তাহার সহিত তিন দিন নৃত্য করিয়াছিলাম; কিন্তু তাহাকে প্রথম দিন যত সুন্দরী মনে করিয়াছিলাম, পরে দেখিলাম, তাহা নয়। তথাপি সে আমার উপর সর্ব্বাপেক্ষা প্রসন্ন বলিয়া আমিও তাহার নিকট সর্ব্বদা থাকিতাম। অন্যান্য যোদ্ধারা যেমন তাহাদের প্রণয়িনীর নিকট হইতে কোনও প্রণয়োপহার চাহিয়া রাখিত, আমিও সেইরূপ একদিন উপহার চাহিলাম। কিন্তু বারটাল্ডা বলিল 'তুমি যখন ঐ মায়াকাননে প্রবেশ পূর্ব্বক ভ্রমণ করিয়া ফিরিয়া আসিবে, তখন উপহার



উৎসবে নৃত্যে ও গীতে মুগ্ধ হইয়াছিলাম

পাইবে।' তাহার উপহার পাইবার নিমিত্ত আমি বিশেষ উৎসুক ছিলাম না; কিন্তু তাহার কথা না রাখিলে আমার কাপুরুষতা প্রকাশ পায়, এই নিমিত্ত আমি কল্য প্রাতঃকালে অশ্বারোহণে অরণ্য পার হইব স্থির করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিলাম।"

অরণ্যের ভিতর যুবক যে সকল বিভীষিকা দেখিয়াছিলেন, সে সকলের বর্ণনা করিয়াপরে তিনি

বলিলেন, “অবশেষে আমি এই কুটীরে আসিয়াছি।” ধীবর বলিল, “ভগবানের কৃপায় আপনি নির্ব্বিঘ্নে গৃহে ফিরিতে পারিলেই আনন্দ।” উন্‌ডিন্‌ সহসা হাততালি দিয়া হাসিতে লাগিল। হুল্‌ডব্র্যাণ্ড বালিকার প্রতি চাহিয়া বলিলেন, “আমি আসিয়াছি বলিয়া তুমি এত আহ্লাদ প্রকাশ করিলে আবার এখন যাইব শুনিয়া আনন্দে হাসিতেছ কেন?” “কেন হাসিতেছি, জান? তুমি এখন এস্থান হইতে যাইতে পারিবে না। নদী ও হ্রদের অবস্থা দেখিতেছ না? আমি উহাদের বেশ চিনি। এখন তোমার যাওয়া অসম্ভব!”

ইহা শুনিয়া যুবক ও ধীবর বাহিরে গেল, এবং দেখিল বালিকার কথা সত্য। চতুর্দ্দিকের জলরাশির মধ্যে ছোট কুটীরখানি যেন দ্বীপের স্থায় উপরে ভাসিতেছে।

তিন

হ্রদ ও নদীর জল যেন কোনও ঐন্দ্রজালিক শক্তির প্রভাবে সহসা ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। যুবক দেখিলেন, শীঘ্র এই স্থান হইতে বহির্গত হইবার কোন উপায় নাই। কিন্তু তিনি সে জন্য দুঃখিত হইলেন না। অত্যন্ত আনন্দে তাঁহার দিন কাটিতে লাগিল। হুল্‌ডব্র্যাণ্ড সমস্ত দিন তীর ও ধনুক লইয়া বেড়াইতেন এবং জলচর পক্ষী বা অন্য কোনও শিকারের চেষ্টায় থাকিতেন। যে দিন কোন মৃত পক্ষী লইয়া ফিরিতেন, উন্‌ডিন্‌ তাঁহাকে অত্যন্ত তিরস্কার করিয়া বলিত, “এইরূপে অসহায় জীবনের প্রাণনাশ করা অত্যন্ত নিষ্ঠুরতা।” বালিকা মৃত পক্ষীকে বুকে লইয়া কাঁদিত। আবার যে দিন যুবক শূন্যহস্তে ফিরিতেন, সে দিন বালিকা তাঁহাকে অত্যন্ত তিরস্কার করিয়া বলিত যে, “তোমার জন্য রাত্রে মাংসের অভাবে কেবল মৎস্য আহার করিয়া থাকিতে হইবে।” কিন্তু বালিকার এইরূপ বিপরীত ভাব ও সময়ে সময়ে এরূপ স্বভাবের পরিবর্ত্তন দেখিয়া হুল্‌ডব্র্যাণ্ড বিরক্ত হইতেন না। তাহার সরল হাসি, করুণ অশ্রু ও মধুর বচনে নবীন অতিথি বিমুগ্ধ হইতেন।

এইরূপে যুবক ধীবরের কুটীরে বাস করিতে লাগিলেন। ক্রমে হুল্‌ডব্র্যাণ্ড উন্‌ডিনের অত্যন্ত হইলেন। এই শান্তিময় সরল সুখময় আনন্দে কেবল একটি কারণে যুবক বড়ই ব্যথিত হইতেন। উন্‌ডিন্‌ সারা দিন ধীবর-পত্নীকে বিরক্ত করিত, এবং এই জন্য সর্ব্বদা তিরস্কৃত হইত। হুল্‌ডব্র্যাণ্ড জানিতেন যে, বালিকারাই দোষ, তথাপি চঞ্চলপ্রকৃতি সরলা বালিকাকে এইরূপ তিরস্কৃত হইতে দেখিলে অত্যন্ত দুঃখিত হইতেন।

একদিন সন্ধ্যাকালে কুটীরবাসীগণ সম্মুখের ছোট ঘরটিতে বসিয়া কথোপকথন করিতেছিল। সহসা বাহির হইতে কে দ্বারে করাঘাত করিল। চতুর্দ্দিক জলে প্লাবিত, এ স্থানে মনুষ্য আসিবার কোন পথ নাই, কেবল নিকটে ভীষণ অরণ্য। সহসা দ্বারে করাঘাত শ্রবণ করিয়া সকলে ভীত ও চমকিত হইল। হুল্‌ডব্র্যাণ্ড এক লম্ফে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং তরবারি ধরিলেন, কিন্তু উন্‌ডিন্‌ দ্রুতপদে দ্বারের নিকটে গিয়া বলিল, “মর্ত্ত্যের প্রেতাত্মা, তোমার যদি মন্দ অভিসন্ধি থাকে কুহেলবর্ণ তোমাকে যথোচিত শিক্ষা দিবে।” বালিকার এই অদ্ভুত বাক্য শুনিয়া সকলে অধিকতর ভীত হইল, এবং বিস্মিতনয়নে সকলে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল। বাহির হইতে উত্তর হইল, “আমি প্রেতাত্মা নই, কিন্তু আমার এই নরদেহে ভগবানের সেই স্বর্গীয় আত্মার এক পরমাণু অবস্থান করে। তোমরা কে এই কুটীরে? যদি ভগবানে বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে দ্বার খুলিয়া আমাকে আশ্রয় দাও।” অপরিচিত ব্যক্তির কথা শেষ না হইতেই বালিকা দ্বার খুলিয়া দিল এবং একজন বৃদ্ধ পুরোহিত কুটীরে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু উন্‌ডিনকে দেখিবামাত্র বিস্মিতনয়নে দ্বারদেশে নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। সহসা এই নির্জ্জন স্থানে সামান্য দরিদ্র ধীবরের কুটীরে বালিকার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখিয়া তাহার যেন আশ্চর্য্য মনে হইল। তিনি হস্ত উত্তোলন করিয়া তাহার প্রতি গম্ভীরভাবে চাহিয়া বলিলেন,—“ভগবানের নাম কর।”

বালিকা তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া মৃদুমন্দ হাসিতে হাসিতে বলিল, “ঠাকুর, আমি প্রেতাত্মা বা অমানুষিক কিছু নহি। দেখুন, আমি ভগবানের নামে কিছুমাত্র ভয় পাইতেছি না,

আমিও ভগবানে বিশ্বাস করি। গৃহে আসুন ঠাকুর, আপনার এখানে কোন ভয় নাই।

বৃদ্ধ পুরোহিত গৃহের মধ্যে আসিলেন। ধীবর ও ধীবরপত্নী তাঁহাকে ভক্তিভবে প্রণাম করিল। তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র আর্দ্র দেখিয়া তাহারা অতি যত্নে তাঁহাকে শুষ্ক বস্ত্র দিল এবং আহার করাইয়া বিশ্রামের স্থান দিল। কিছুক্ষণ বিশ্রাম ও ক্লান্তি দূর করিয়া পুরোহিত তাঁহার পরিচয় দিলেন, বলিলেন যে, অরণ্যের অপর পারে নগরে তিনি বাস করেন। প্রাতঃকালে একটি ক্ষুদ্র নৌকায় উঠিয়া নদী পার হইতেছিলেন। সহসা যেন কোন ঐন্দ্রজালিক-শক্তি-বলে নদীর জলে ভয়ঙ্কর স্রোত ও তরঙ্গ উঠিল। বৃদ্ধ মাঝি দুইজন সামলাইতে পারিল



বৃদ্ধ মাঝি দুইজন সামলাইতে পারিল না

না, নৌকা ডুবিয়া গেল, তিনি সংজ্ঞাশূন্য হইলেন। চেতনা হইবার পর সবিস্ময়ে দেখিলেন যে, এক ক্ষুদ্র কুটীরের নিকট বৃক্ষতলে পড়িয়া আছেন; তাহার পর পুরোহিত বলিলেন, "আমি ভগবানকে শত শত ধন্যবাদ দিতেছি যে, তোমাদের নিকট আসিয়াছি, কিন্তু কিরূপে যে গৃহে ফিরিয়া যাইব, তাহা জানি না। কারণ, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, আর এই জলপ্লাবন দেখিয়া মনে হইতেছে যে, শীঘ্র এক স্থান হইতে বহির্গত হইবার সম্ভাবনা নাই।"

পুরোহিতের এই কথা শুনিয়া উন্‌ডিন্‌ উঠিয়া হুল্‌ডব্র্যাণ্ডের নিকট গিয়া বসিল এবং যুবকের স্কন্ধে তাহার ক্ষুদ্র সুন্দর মস্তক রাখিয়া মধুর স্বরে বলিল— "তবে তুমি আমাদের ছাড়িয়া যাইতে পারিবে না, এখানেই থাকিতে হইবে, আর যাইতে পারিবে না।"

যুবক বালিকার এই সরল স্নেহপূর্ণ বাক্যের কোনও উত্তর দিলেন না। নানা চিন্তায় তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইতেছিল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল যে, যথার্থই বুঝি আর নগরে ফিরিতে পারিবেন না। এই নির্জ্জন সুন্দর শান্তিপূর্ণ স্থানে চিরজীবন কাটাইতে হইবে। তিনি বালিকার মুখের দিকে চাহিলেন! তাহার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের প্রতি অতৃপ্ত নয়নে চাহিয়া রহিলেন; তাঁহার হৃদয়ে সুমধুর পবিত্র প্রেম জাগিয়া উঠিল—সম্মুখে পুরোহিত। এই সময় ধীবর-পত্নী উন্‌ডিনের প্রতি চাহিয়া যুবকের স্কন্ধে মস্তক রাখিতে দেখিয়া তাহাকে তিরস্কার করিয়া উঠিল। হৃদয়ের আবেগে যুবক সহসা বলিয়া উঠিলেন, "এই বালিকা আমার বাগদত্তা পত্নী, ঠাকুর, যদি উহার পিতা মাতার কোন আপত্তি না থাকে, অদ্য রাত্রেই আমাদের দু'জনকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করুন।"

উন্‌ডিন ও হুল্‌ডব্র্যাণ্ডের ভালবাসা দেখিয়া ধীবর ও তাহার পত্নী ইহাই আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু সহসা যোদ্ধার মুখে এই প্রস্তাব শুনিয়া তাহারা চমকিত হইল। হুল্‌ডব্র্যাণ্ডের কথা শুনিয়া বালিকার মুখে এক নূতন ভাব দেখা দিল। উন্‌ডিন্‌ নীরবে মস্তক নত করিল। পুরোহিত ধীবরের নিকট বালিকার ও যুবকের সমুদায় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বলিলেন যে, ধীবর ও ধীবরপত্নীর কোন আপত্তি না থাকিলে তিনি সেই রাত্রেই উন্‌ডিন্‌ ও হুল্‌ডব্র্যাণ্ডের বিবাহ দিতে প্রস্তুত আছেন! বৃদ্ধ ও তাহার পত্নী আহ্লাদের সহিত অনুমতি দিল, এবং বিবাহের সমুদায় আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইল। পুরোহিত দুইটি অঙ্গুরীয় চাহিলেন। তখন উন্‌ডিন্‌ "আমার কাছে আছে" বলিয়া দ্রুতপদে অপর কক্ষে প্রবেশ করিল, এবং দুইটি বহুমূল্য অঙ্গুরীয় লইয়া আসিল। ধীবর ও তাহার পত্নী বিস্মিতনয়নে চাহিয়া রহিল। তাহারা পূর্ব্বে কখনও এই অঙ্গুরীয় দুইটি দেখে নাই। তখন বালিকা বলিল, "যখন তোমাদের নিকট আসিতেছিলাম, আমার পিতা এই দুইটি আমার বস্ত্রে বাঁধিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন, বিবাহ স্থির না হওয়া পর্য্যন্ত ইহা অতি গোপনে রাখিয়া দিবে। তোমাদের কুটীরে আসিবার পর

যখন তোমরা আমার বস্ত্র খুলিয়া ফেল, আমি পিতার আজ্ঞামত উহা গোপনে রাখিয়া দিয়াছিলাম।" উনডিনের এই নূতন কথা শুনিয়া তাহারা দু'জন তাহাকে সবিশেষ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, কিন্তু পুরোহিত ঠাকুর তাহাদের কথায় বাধা দিয়া সকলকে বিবাহ কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইতে বলিলেন।

বিবাহ হইয়া গেল। উন্‌ডিন্ কম্পিতদেহে সলজ্জভাবে অবনতমস্তকে স্বামীর পার্শ্বে নীরবে দাড়াইয়া রহিল। পুরোহিত বলিলেন, "এ স্থানে আর কোন মনুষ্য বাস করে না; কিন্তু বিবাহের সময় জানালার মধ্য দিয়া দেখিলাম, একজন দীর্ঘকায়, শ্বেতবস্ত্রপরিহিত বৃদ্ধ দাড়াইয়া বিবাহ কার্য্য দেখিতেছিলেন বোধ হয়, সেই ব্যক্তি এখনও বাহিরে দাড়াইয়া আছেন।"

ইহা শুনিয়া বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা অত্যন্ত ভীত হইল, এবং হুল্‌ড্‌ব্র্যাণ্ড চমকিয়া উঠিয়া তাঁহার তরবারি খাপ হইতে খুলিয়া জানালার নিকটে গিয়া বাহিরে চাহিল। দেখিল দূরে এক শ্বেতবস্ত্র পরিহিত মনুষ্যমূর্ত্তি ধীরে ধীরে অরণ্যের নিবিড় বৃক্ষরাজির মধ্যে অদৃশ্য হইতেছে। এই মূর্ত্তি অপরিচিত নহে, কারণ, তিনি অরণ্যে ভ্রমণকালে উহা দেখিয়াছিলেন বিবাহের পূর্ব্বে ও বিবাহ সম্পন্ন হইবার কিছুক্ষণ উন্‌ডিন্ নীরব ও শান্ত ছিল। কিন্তু সহসা তাহার পূর্ব্ব চাঞ্চল্য দেখা দিল; সে নানা রকম দুষ্টামি করিয়া সকলকে বিরক্ত করিতে আরম্ভ করিল। অবশেষে বৃদ্ধ পুরোহিতকেও বিরক্ত করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া হুল্‌ড্‌ব্র্যাণ্ড একটু বিরক্তি প্রকাশ করিলেন। কিন্তু বালিকা তাহা গ্রাহ্য করিল না। তাহার এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া পুরোহিত তাহার প্রতি স্থির নয়নে চাহিয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন—"বৎসে, তোমার সুন্দর সরল মুখ দেখিলে সকলেরই হৃদয় ভালবাসায় পরিপূর্ণ হয়, কিন্তু তুমি এখন আর এক জনের সহিত পবিত্র বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ হইলে; দেখিও, যাহার জীবন-সঙ্গিনী হইলে, যাহার হৃদয়ের সহিত এক হইলে, তাহার সহিত যেন আত্মায় আত্মায় মিলিত হইবার চেষ্টা কর, নচেৎ সুখী হইবে না।"

উন্‌ডিন্ নীরবে পুরোহিতের বাক্য শুনিতেছিল, সহসা হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "আত্মা! আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা অবশ্য উচিত কথাই হইবে কিন্তু যাহার আত্মা নাই, সে কিরূপে আত্মার উন্নতি করিবে?"

বালিকা বিদ্রূপ করিতেছে মনে করিয়া পুরোহিত বিরক্ত হইয়া নীরবে মুখ ফিরাইয়া লইলেন। কিন্তু বালিকা দ্রুতপদে তাঁহার নিকট গিয়া অতি কাতর মৃদুস্বরে বলিল,—

"ঠাকুর, আমার উপর রাগ করিবেন না। আমার কথা আগে শ্রবণ করুন, আমি যাহা বলিতেছি, তাহা সত্য।"

ক্ষণকাল নীরব হইয়া উন্‌ডিন্ আগ্রহের সহিত কি বলিতে আরম্ভ করিতেছিল, সহসা কি কারণে তাহার বাক্য রুদ্ধ হইল। শিহরিয়া বালিকা নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

উন্‌ডিনের কথা শুনিয়া ও তাহার এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া সকলে ভীত ও উদ্বিগ্নচিত্তে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে অশ্রুসংবরণ করিয়া ধীরে ধীরে নয়ন মুদ্রিত করিয়া বালিকা পুরোহিতের প্রতি চাহিয়া ব্যগ্রতাপূর্ণ গম্ভীরস্বরে বলিল,—

"আত্মা আত্মা বোধ হয় কোন সুন্দর অথচ ভয়ঙ্কর পদার্থ হইবে। ঠাকুর, মনুষ্যদেহে এই অজ্ঞাত আত্মা না থাকিলে কি ভাল হইত না?

সেই ক্ষুদ্র গৃহে যাহারা ছিল, তাহারা সকলে ভীত ও বিস্মিত হইয়া উঠিয়া দাড়াইল কিন্তু উন্‌ডিন্ কাহারও প্রতি দৃক্ষেপ না করিয়া পুরোহিতের মুখের দিকে স্থিরনয়নে চাহিয়া রহিল। তাহার বদনে তীব্র ঔৎসুক্যপূর্ণ কৌতূহল প্রতিফলিত হইল। উন্‌ডিন্ পুনরায় বলিল,—

"আত্মার ভার বহন করা বোধ হয় অত্যন্ত কঠিন। কি ভীষণ ভার! এখনই তাহার আগমন-আশঙ্কায় আমার হৃদয় এক অজ্ঞাত, অপূর্ব্ব মর্ম্মান্তিক বেদনায় অভিভূত হইতেছে। এতদিন আমার হৃদয়ে কোনরূপ চিন্তা বা দুঃখ ছিল না, বড় সুখেও আনন্দে জীবন কাটিয়াছে।" এই বলিয়া উন্‌ডিন্ পুনরায় অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল।

বৃদ্ধ পুরোহিত চিন্তিতহৃদয়ে স্থিরনয়নে বালিকার প্রতি চাহিয়া গম্ভীরস্বরে তাহাকে ভগবানের নাম

লইতে আজ্ঞা করিলেন। বালিকা তৎক্ষণাৎ ভূমিতে জানু পাতিয়া করযোড়ে অবিচলিত গম্ভীরস্বরে ভক্তিভাবে পুরোহিতের সহিত বারবার ভগবানের নাম উচ্চারণ করিল।

তখন পুরোহিত হুল্ডব্র্যাণ্ডকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বৎস, তুমি চিন্তা করিও না। এই বালিকার মধ্যে কুলক্ষণ বা অশুভ-চিহ্ন দেখিতে পাই না। কিন্তু আমাদের অজ্ঞাত, গুপ্ত ও বিস্ময়াবহ কিছু আছে, আমরা এখনও তাহা জানিতে পারি নাই। তুমি এই সরলা পবিত্রহৃদয়া বালিকাকে ঈশ্বরসমক্ষে বিবাহ করিয়াছ; উহাকে চিরকাল আদর যত্ন করিও, সুশিক্ষা দিও; সুখী হইবে।"

চার

নব দম্পতিকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তাহাদের নিকট বিদায় লইয়া পুরোহিত শয়ন করিতে গেলেন।

পুরোহিতের বাক্য শ্রবণ করিয়া ও বালিকার অপার্থিব সৌন্দর্য্য দেখিয়া হুল্ডব্র্যাণ্ডের সকল সন্দেহ ও ভয় দূর হইল। সুখে ও আনন্দে বিবাহরাত্রি কাটিয়া গেল।

পরদিন প্রভাতে হুল্ডব্র্যাণ্ডের প্রফুল্ল মুখ দেখিয়া সকলের হৃদয়ে যে এক আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা বিদূরিত হইল, এবং উন্‌ডিনের অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন দেখিয়া সকলে বিমুগ্ধ হইল। তাহার সেই অনিন্দ্যসুন্দর মুখমণ্ডল প্রেমে কোমল ও প্রতিভায় প্রদীপ্ত হইয়া এক নূতন সৌন্দর্য্যে বিভাসিত হইয়াছে; তাহার নির্ম্মল পবিত্র আত্মা নয়নে প্রতিবিম্বিত হইতেছে। তাহার বালিকা-মূর্ত্তি সলজ্জ গম্ভীর ভাবে প্রস্ফুটিত। পুরোহিতের নিকট গিয়া বালিকা জানু পাতিয়া বিনীতস্বরে পূর্ব্বকৃত ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চাহিল, এবং তাহার আত্মার উন্নতির জন্য ভগবানের নিকট তাঁহাকে প্রার্থনা করিতে বারবার অনুরোধ করিল। বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাকে আলিঙ্গন করিয়া অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বার বার বলিতে লাগিল, "তোমরা কত যত্নে কত আদরে সন্তানের ন্যায় আমাকে প্রতিপালন করিয়াছ, তাহা এতদিনে বুঝিলাম। সেই স্নেহের কিছু প্রতিদান করি নাই, বরং বিরক্ত করিয়াছি, কতক্লেশ দিয়াছি। হায়! এখন কিরূপে তোমাদের ছাড়িয়া যাইব?" সমস্ত দিন উন্‌ডিন্ আগ্রহ ও উৎসাহের সহিত তাহার মাতাকে গৃহকর্ম্মে যথাসাধ্য সাহায্য করিল। সহসা সন্ধ্যাকালে উনডিনের আর এক নূতন পরিবর্ত্তন হইল। তাহার নয়ন অশ্রুপূর্ণ ও উজ্জ্বল হাস্যময় মুখকমল বিষাদের ছায়াপাতে মলিন হইল, এবং বালিকা নীরবে বারংবার দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল।

অবশেষে হুল্ডব্র্যাণ্ডকে ডাকিয়া কুটীরের অল্প একটুদূরে লইয়া গিয়া বলিল, "দেখ, জল একেবারে সরিয়া গিয়াছে, নদী কেমন শান্তভাবে বহিয়া যাইতেছে। তুমি এখন অক্লেশে এই স্থান হইতে যাত্রা করিতে পারিবে।"

হুল্ডব্রাণ্ড সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল যে, এক রাত্রেই সহসা জল অনেকটা সরিয়া গিয়াছে, এবং জলপ্লাবনের চিহ্নমাত্রও নাই। যুবক আনন্দে ও প্রেমপূর্ণনয়নে বালিকার প্রতি চাহিয়া সস্নেহে বলিল, "উনডিন্! এখন ত আর একা যাইব না। তুমিও যাইবে।"

কিন্তু উন্‌ডিন্ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মৃদুকম্পিত স্বরে বলিল, "স্বামিন্, তাহা তুমি এখনই স্থির করিবে। নদীর মধ্যে ঐ ছোট নির্জ্জন দ্বীপের উপর চল। সেখানে তোমাকে সমুদায় বলিব। আমার কথা শুনিয়া যদি তুমি আমাকে ত্যাগ করিতে চাও, ঐ শীতল নদীবক্ষে আশ্রয় লইব।"

এই বলিয়া উন্‌ডিন্ হুল্ডব্র্যাণ্ডকে লইয়া ধীরে ধীরে সেই স্থানে গিয়া দ্বীপের শ্যামল ঘাসের উপর বসিল, এবং তাহাকে বলিল, "তুমি আমার সম্মুখে বস, আমি তোমার কাছ হইতে আমার অদৃষ্ট জানিয়া লইব। আমি যাহা বলিব, তাহা মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর।"

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া উন্‌ডিন্ গম্ভীরস্বরে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল,—"তুমি হয় ত জান যে, জগতে অনেক প্রকার প্রাণী আছে—যাহারা সচরাচর মনুষ্যের দৃষ্টির অগোচর। তাহারা পঞ্চভূতে সৃষ্ট, এবং পঞ্চভূতে লয় পায়। তাহাদের আকৃতি মনুষ্যের ন্যায়। কিন্তু ইহাদের সর্ব্বদা কেহ দেখিতে পায় না। অগ্নির উজ্জ্বল শিখায় এইরূপ

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী আনন্দে ক্রীড়া করে, এবং জ্যোতিঃ বিস্তার করে। মৃত্তিকার মধ্যে পৃথিবীর ভিতরে দুষ্ট ক্ষুদ্র প্রাণীগণ বাস করে, এবং নির্ম্মল বায়ুতে প্রাণিগণ সুখে ভ্রমণ করে, শীতল জলে বহুবিধ জল-প্রাণী সুখে ও আনন্দে বাস করে। গভীর সাগর তলে স্ফটিকের মধ্য দিয়া চন্দ্র-সূর্য্যকিরণ নিয়ে প্রবেশ করিয়া সেই সুন্দর পুরী আলোকিত করে। প্রবাল বৃক্ষ সকল উচ্চে উঠিয়া কত বর্ণের ফল ও ফুল ধারণ করে। এই সৌন্দর্য্যের রাজ্যে জল-প্রাণীগণ আনন্দে বাস করে; শঙ্খের উপর নাচিয়া বেড়ায়। এই অপূর্ব্ব সৃষ্টি সাগরজলে ও নদীজলে আচ্ছাদিত থাকে। যাহারা এই জলরাজ্যে বাস করে, তাহাদের আকৃতি মনুষ্যমূর্ত্তির ন্যায়, কিন্তু মানুষের চেয়ে অনেক বেশী সুন্দর। কখনও কোন জলবালিকা খেলা করিতে করিতে সাগরবক্ষে ভাসিয়া উঠিয়াছে, এবং মনুষ্যের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া তাহাদিগকে বিমুগ্ধ ও বিস্ময়াপন্ন করিয়াছে! তুমি উন্‌ডিনদিগের নাম শুনিয়া থাকিবে—কিন্তু আর অধিক বলিবার কি প্রয়োজন? স্বামিন্! তোমার সম্মুখে একজন 'উন্‌ডিন্' দেখিতেছ?"

বালিকা নীরব হইল। হুল্ডব্র্যাণ্ড সব কথা শুনিয়া নীরব হইয়া রহিলেন। বালিকা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, "কিন্তু যদিও আমাদের আকৃতি মনুষ্যের ন্যায়, তথাপি আমরা মনুষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতাম! কিন্তু হায়! আমাদের একটি মহা অভাব, একটি দুঃখের কারণ আছে, আমাদের আত্মা নাই! মৃত্যুর পর আমাদের আর কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। আমরা যে ভূতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তাহাতেই বিলীন হইয়া যাই—আমাদের আর চিহ্নমাত্র থাকে না। মনুষ্য মৃত্যুর পর পবিত্র, অমর, অনন্ত অস্তিত্ব প্রাপ্ত হয়; কিন্তু হায়! আমরা তাহাতে বঞ্চিত। আমরা ভৌতিক শক্তির দ্বারা পরিচালিত হই। এবং যত দিন জীবিত থাকি, সেই শক্তি আমাদের আজ্ঞার অধীন থাকে। কিন্তু মৃত্যু হইলে সেই জল, বায়ু, মৃত্তিকা, অগ্নির মধ্যে আমরা বিলীন হইয়া যাই। সুতরাং আমাদের কোন চিন্তা কোন দুঃখ নাই, আমরা আনন্দে ও সুখে জীবন কাটাই। কিন্তু আশা অনন্ত; তাই জগতের যাবতীয় জীব আপন আপন অবস্থা হইতে উচ্চতর অবস্থা পাইবার অভিলাষী। 'আত্মা' পাওয়া আমাদের নিতান্ত অসম্ভব অসাধ্য নহে। কথিত আছে, কোন জল-প্রাণী যদি মনুষ্যের সহিত বিবাহ-বন্ধনে মিলিত হয়, তাহা হইলে সে আত্মা লাভ করিতে পারে। আমার পিতা একজন অত্যন্ত প্রতিভাশালী জলরাজ। আমি তাঁহার একমাত্র অতি আদরের সন্তান। পিতার প্রবল আকাঙ্ক্ষা হইল যে তাঁহার কন্যা আত্মা লাভ করে! যদিও এই বাসনা পূর্ণ হইলে আমাকে মনুষ্যের ন্যায় শোক দুঃখ ভোগ করিতে হইবে, তথাপি তিনি এই ইচ্ছা ত্যাগ করিলেন না, এবং যাহাতে উহা সফল হয়, তাহারই চেষ্টা করিলেন। এতদিনে পিতার সেই বাসনা পূর্ণ হইল, এতদিনে আমি 'আত্মা' লাভ করিয়াছি। যদি তুমি আমাকে ত্যাগ কর, তাহা হইলে আমার কি হইবে, তাহা ভাবিলেও আমি আত্মহারা হই। কিন্তু তোমাকে আমি কিছু বলিব না। তুমি নিজেই তাহা ভাবিয়া স্থির কর। যদি আমাকে চলিয়া যাইতে আজ্ঞা কর, আমি এখনই এই নদী-জলে প্রবেশ করিব। আমার পিতৃব্য এই নদীতে বাস করেন, তিনি আদর করিয়া আমাকে গ্রহণ করিবেন। যখন ক্ষুদ্র আত্মাবিহীন জলবালা ছিলাম তখন তিনিই আমাকে পিতার আজ্ঞামত বৃদ্ধ ধীবরের নিকট দিয়া গিয়াছিলেন। এক্ষণে আত্মায় বিভূষিত হইয়া প্রেম ও সহিষ্ণুতায় পূর্ণ রমণী-হৃদয় লইয়া গৃহে পিতা মাতার নিকট চিরজন্মের মত ফিরিয়া যাইব।"

হুল্ডব্র্যাণ্ড বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়া এই সকল অপূর্ব্ব কথা শ্রবণ করিতেছিলেন। উন্‌ডিনের শেষ কথায় হৃদয় বিগলিত হইল। সেই পবিত্র নির্ম্মল অতুলনীয় সৌন্দর্য্য, সেই গম্ভীর বালিকামূর্ত্তি তাহার নয়নে সেই পবিত্র স্বর্গীয় নবপ্রাপ্ত পুণ্য আত্মার বিমল আলোক দেখিয়া হুল্ডব্র্যাণ্ডের সকল সন্দেহ, সকল আশঙ্কা দূর হইল। তিনি আত্মহারা হইয়া উন্‌ডিন কে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া তৎক্ষণাৎ বারবার শপথ করিলেন,—"ইহজন্মে আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিব না।"

হুল্ডব্র্যাণ্ড জলকন্যাকে লইয়া গৃহে ফিরিলেন। গৃহে কিছুদিন সুখে কাটিল। কিন্তু হায়, তাহার পর

হুল্ডব্র্যাণ্ড আবার বারটাল্ডার মায়াপাশে পড়িল। অনাদৃতা উন্‌ডিন্ নীরবে সব সহ্য করিত। কেবল স্বামীকে বলিত জল ভ্রমণের সময় আমাকে কোনও কুবাক্য বলিও না, বিপন্ন হইবে। কিন্তু যে দিন হুল্ডব্র্যাণ্ড তাহার পত্নী উন্‌ডিন্‌কে অনাদর করিতে লাগিল, সেই দিন হইতে জলকন্যার রুষ্ট জলরাজ্যের আত্মীয়স্বজন নানারূপ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সকল সময়ে নানা প্রকার ভয় দেখাইতে লাগিল এবং দুই তিনবার হুল্ডব্র্যাণ্ডকে বিপদে পড়িতে হইয়াছিল! সে সময় প্রেমময়ী ক্ষমাশীলা উন্‌ডিন্ করযোড়ে তাহাদের মিনতি করিয়া হুল্ডব্র্যাণ্ডকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিত। স্বামীর গৃহের উদ্যানে একটি ক্ষুদ্র প্রস্রবণ ছিল, তাহার মুখ প্রস্তর দ্বারা রুদ্ধ করিয়া রাখিল। কিন্তু এই সমস্ত কারণে হুল্ডব্র্যাণ্ড উন্‌ডিনের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া আরও অনাদর করিতে লাগিল। এক দিন তাহার নিষেধ ভুলিয়া হুল্ডব্র্যাণ্ড তরী বিহার কালে উন্‌ডিন্‌কে ক্রোধভরে কুবাক্য কহিল। তখন উন্‌ডিন্ অশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে মৃদু ক্লান্ত স্বরে বলিল "হায় স্বামী, কি করিলে? হায়! এই তরুণ বয়সে নারীজীবন ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। "মুহূর্ত্ত মধ্যে উন্‌ডিন্ জল মধ্যে



মুহূর্ত্ত মধ্যে উন্‌ডিন্ জল মধ্যে অদৃশ্য হইল

অদৃশ্য হইল, কেবল তরীর চারিপাশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলি আর্ত্তনাদ্ করিয়া যেন বলিতে লাগিল,—"হায়! হায়!" হুল্ডব্র্যাণ্ড স্তম্ভিত হইয়া রহিল। কিন্তু পরক্ষণেই লাবণ্যময়ী উন্‌ডিনের জন্য অনুতাপে ও শোকে কাতর হইল।

এই সময় বারটাল্ডা হুল্ডব্র্যাণ্ডকে সান্ত্বনা দিত। ক্রমে বারটাল্ডার মায়াপাশে পড়িয়া যুবক সমুদয় ভুলিল। কেবল মাঝে মাঝে স্বপ্নরাজ্যের কোন স্মৃতির ন্যায় বালিকার মুখচ্ছবি হৃদয়ে উদয় হইত। রাত্রে যখন হুল্ডব্র্যাণ্ড নিদ্রাবস্থায় থাকিত তখন যেন জলবালিকা ছায়াময়ী মূর্ত্তি ধরিয়া পাশে আসিয়া



ছায়াময়ী মূর্ত্তিতে আসিয়া দাঁড়াইত

বিষাদময় মূর্ত্তিতে দাঁড়াইত। এক দিন যুবক দেখিল উন্‌ডিন্ গভীর জলতলে স্ফটিকের মন্দিরের ভিতর বসিয়া করতলে মস্তক রাখিয়া নীরবে রোদন করিতেছে। এই সকল সময় যুবকের হৃদয় অনুতাপ ও দুঃখে ব্যাকুল হইত। এই বিষাদপূর্ণ স্মৃতি দূর করিবার নিমিত্ত যুবক স্থির করিল যে বারটাল্ডকে বিবাহ করিয়া সমুদায় ভুলিয়া যাইবে। বিবাহের কথা স্থির হইল। জলরাজ্যের কঠিন নিয়ম ছিল যে, যাহার প্রেমে কোন জলবালা মানবাত্মা প্রাপ্ত হইবে, সেই নর যদি তাহাকে ভুলিয়া পুনরায় বিবাহ করে, তাহা হইলে সেই আত্মাপ্রাপ্ত উন্‌ডিন্ তাহার স্বামীর প্রাণ লইবে।

বিবাহ নিশায় নির্ব্বোধ বারটাল্ডার আজ্ঞায় উন্‌ডিন্ দ্বারা প্রস্তররুদ্ধ সেই নির্ঝরমুখ মুক্ত হইল। সেই মুহূর্ত্তে মুক্ত নির্ঝর ধারা প্রবাহে উন্‌ডিন্ আসিয়া উপস্থিত। শুভ্র বসনে আপাদমস্তক আবৃত। নীরবে ধীর পদে সেই ছায়াময়ী মূর্ত্তি হুল্ডব্র্যাণ্ডের শয্যাগৃহে উপস্থিত হইল! যুবক স্তম্ভিত হইয়া চাহিয়া রহিল। তখন মৃদু গম্ভীর স্বরে উন্‌ডিন্ কহিল, "হুল্ডব্র্যাণ্ড, তুমি জানিতে না, কিন্তু আজ তোমাকে লইতে আসিয়াছি। তোমার প্রাণ

লইতে আসিয়াছি।" তখন হুল্‌ড্‌ব্র্যাণ্ড কহিল—উনডিন্ আমাকে মৃত্যু সময়ে পাগল করিও না। যদি ঐ আবরণ মধ্যে আমার উন্‌ডিন্ ভিন্ন অন্য কোন ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি থাকে, তবে আমার প্রাণ লও, কিন্তু আবরণ তুলিও না।"

"না প্রিয়তম! তুমি যে উন্‌ডিনকে ভালবাসিয়াছিলে সেই হতভাগিনী আজ তোমার নিকট



সেই নির্ঝর মুখ মুক্ত হইল

আসিয়াছে।" তারপর মৃদুস্বরে কহিল—তোমার মরণ নিশ্চিত। আমি তোমাকে লইতে আসিয়াছি। কথাটা শুনিয়া হুল্‌ড্‌ব্র্যাণ্ডের মুখ মলিন হইয়া গেল। সে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। আকাশে চন্দ্র হাসিতেছিল। চারিদিকের তরুলতাগুল্মের মধ্যের অপূর্ব্ব শোভা জাগিয়াছিল।

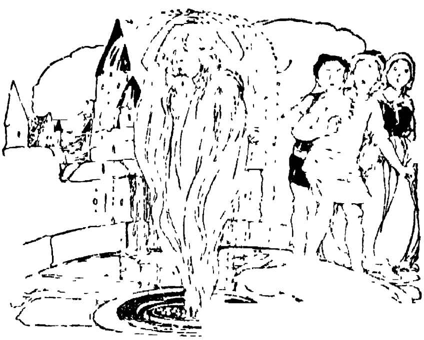
এ দিকে বারটাল্ডার কাছে দাসদাসীরা ছুটিয়া আসিয়া সংবাদ দিয়াছিল নির্ঝরের মুখ মুক্ত হইলে পর সেই পথে এক অপূর্ব্ব সুন্দরী নারী মূর্ত্তির আবির্ভাব হইয়াছে।—বারটাল্ডার মুখ দিয়া কোন শব্দ বাহির হইতেছিল না। সে এই আশ্চর্য্য সংবাদে কাঁপিতে লাগিল। সে কি বলিবে? তাহার কণ্ঠ হইতে কোনও স্বর বাহির হইতেছিল না। তাহারা সকলে মিলিয়া নিষ্পন্দ ভাবে বাতায়ন সমীপে দাঁড়াইয়া রহিল। কেহ এক পাও অগ্রসর হইতে পারিল না।

এ দিকে এই আশ্চর্য্য ও অদ্ভুদ ব্যাপারে বিশাল প্রাসাদের দাস-দাসীদের মধ্যে একটা ভয় ও আতঙ্কের ভাব জাগিয়া উঠিয়াছিল। সকলে প্রাণ-ভয়ে চারিদিকে ছুটাছুটি দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিল। কেহ উৎসটির দিকে আর ফিরিয়া চাহিতেও সাহস করিতেছিল না। জীবিত মানুষের কাছে এমন একটা ব্যাপার যে সম্পূর্ণ অসম্ভব এবং ভীতিজনক তাহা সহজেই বুঝিতে পার। বারটাল্ডার মুখের হাসি কখন যে মিলাইয়া গিয়াছিল, কখন যে তাহার শয্যাগৃহে অসংখ্য মণি-মুক্তাপূর্ণ অলঙ্কাররাশি ছড়াইয়া রাখিয়া আসিয়াছিল, সেকথা এখন সে ভুলিয়া গিয়াছিল।

এদিকে হুল্‌ড্‌ব্র্যাণ্ড বুঝিলেন যে, তাঁহার মৃত্যু নিকট, তখন তিনি দুই হাত দিয়া মুখ ঢাকিয়া বলিলেন—"তুমি এই আসন্ন মৃত্যুর সময় ভয়ে বিহ্বল করিও না। জানি না তোমার গুণ্ঠনের নীচে কেমন সেই মুখখানি। যদি তুমি সেই উন্‌ডিন্ হও, তবে একবার তোমারি মুখ দর্শন করিয়া তোমার আলিঙ্গনে মরিতে দাও।"

উন্‌ডিন্ কহিল—তুমি আমাকে বিবাহের সময় যেমন সুন্দরী দেখিয়াছিলে, আমি তেমনিই আছি। তুমি মুখ দেখিতে চাও।

তাহাই হউক, বলিয়া জলবালা মুখের আবরণ তুলিল। তাহার স্বর্গীয় অতুলনীয়



জলবালা মুখের আবরণ তুলিল

সৌন্দর্য্য বিকশিত হইল। তাহার পর দুই বাহু দ্বারা উন্‌ডিন স্বামীকে আলিঙ্গন করিল—সেই মুহূর্ত্তে হুল্‌ড্‌ব্র্যাণ্ড প্রাণত্যাগ করিল। তারপর—তারপর সেই নির্ঝর-পথে উন্‌ডিন্ অদৃশ্য হইয়া গেল।



পাল ও সেনরাজ বংশ

পালরাজবংশের শেষ কথা

২৯০৮ পৃষ্ঠার পর

রামচন্দ্র, রাবণ রাক্ষসকে বধ করিয়া সীতাদেবীর উদ্ধার করিয়াছিলেন—ইহা তোমরা সকলেই জান। পালবংশের রামপালও তেমনি এক সীতা উদ্ধার করিয়া দ্বিতীয় রামচন্দ্র বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ঐ আমলের কবিগণের মধ্যে **রামপালকে** রামচন্দ্রের সহিত তুলনা দেওয়া একটা চলতি প্রথা হইয়া গিয়াছিল। তাঁহারা বলিতেন, রাম করিয়াছিলেন রাবণ বধ করিয়া সীতার উদ্ধার, রামপাল করিয়াছিলেন ভীমকে বধ করিয়া জনকভূর উদ্ধার। জনকভূর এক মানে সীতা, জনক হইতে যিনি হইয়াছেন। আর এক অর্থ জনকের অর্থাৎ পিতারও জন্মভূমি—অর্থাৎ পিতৃরাজ্য বরেন্দ্রীদেশ এখন এই জনক-ভূ উদ্ধারের কাহিনী তোমাদিগকে বলিতেছি।

দ্বিতীয় মহীপালদেবের নিহত হওয়ার পর রামপালদেব কারামুক্ত হন। কিন্তু তাহাদের রাজ্য তখন শত্রুপক্ষের হস্তগত। রামপাল কিরূপে তাহার উদ্ধার করিবেন, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। অবশেষে তিনি নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া সামন্ত রাজগণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন, তাঁহারা রামপালকে সাহায্য করিতে সম্মত হন। তাহার পর রামপাল গজারোহী, অশ্বারোহী পদাতিক তিন প্রকার সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ভীমের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। নদী পার হওয়ার জন্য অনেক নৌকাও সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সামন্তরাজগণ ভিন্ন রামপালদেবের মাতুলবংশীয়েরাও এইযুদ্ধে যোগদান করেন। তাঁহার মাতুলপুত্র রাষ্ট্রকূট-বংশের শিবরাজ প্রথমে গঙ্গা পার হইয়া ভীমের রাজ্যে উপস্থিত হন। এবং তাঁহার লোকজনকে পরাজিত করেন। কিন্তু বরেন্দ্রী অধিকার করিতে পারেন নাই।

অবশেষে রামপাল সমস্ত সামন্তরাজা ও মাতুল-বংশীয়দিগকে লইয়া আবার যুদ্ধযাত্রা করিলেন। তিনি অনেক নৌকাদ্বারা সেতু বাঁধিয়া গঙ্গাপার হইলেন এবং ভীমের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিলেন। ভীমও নিজ পরাক্রম দেখাইতে ত্রুটী করেন নাই। কিন্তু সে যুদ্ধে তিনি জয়লাভ করিতে

পারিলেন না, রামপালেরই জয় হইল। ভীম হস্তী-পৃষ্ঠে ধৃত হইলেন। তাহার পর হরি নামে ভীমের এক বন্ধু কৈবর্ত্ত সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনিও ধৃত হন। ভীম ও হরি পরে নিহত হইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। ভীমের রাজধানীও ধ্বংস হইয়া যায়। রামপালদেব আবার বরেন্দ্রী অধিকার করিয়া লইলেন। এইরূপে রামপালদেব রামচন্দ্রের জনক-ভূ সীতার উদ্ধারের ন্যায় নিজের জনকভূর উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন। পিতৃরাজ্য অধিকারের পর রামপাল দিগ্বিজয়ে বাহির হন। উৎকল, কলিঙ্গ, কামরূপ প্রভৃতি তাঁহার অধীনে আসিয়াছিল। রামপাল বরেন্দ্রীতে **রামাবতী** নামে তাঁহার রাজধানীর প্রতিষ্ঠা করেন। রামপাল যেমন বীর ছিলেন সেইরূপ সুবিচারের সহিত প্রজাপালনও করিতেন।

বাঙ্গালার শেষ হিন্দু রাজবংশ

রামপালদেবের পর অল্পদিনের মধ্যেই পাল-বংশের রাজত্বের অবসান ঘটে। তাহার পর **সেন-বংশ** বাঙ্গালায় রাজত্ব আরম্ভ করেন। সেনবংশই বাঙ্গালার শেষ হিন্দু রাজবংশ। সেনবংশীয়দিগের আদি নিবাস দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটদেশ। তাঁহারা আপনাদিগকে চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। চন্দ্রবংশীয় বীরসেন নামে রাজা হইতে তাঁহাদের বংশের আরম্ভ বলিয়া জানা যায়। ইঁহারা অনেকদিন হইতে রাঢ় দেশে বাস করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন্ সময়ে তাঁহারা কর্ণাট হইতে রাঢ়দেশে আসিয়াছিলেন, তাহা স্থির করা যায় না। এই বংশের **সামন্তসেন** হইতে ইঁহাদের পরিচয় ভাল করিয়া জানা যায়। সামন্ত সেনের সহিত কর্ণাটেরও সম্বন্ধ ছিল। তিনি শত্রুগণের হস্ত হইতে কর্ণাট রাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন। সামন্ত-সেন বৃদ্ধ বয়সে রাঢ়দেশের গঙ্গাতীরেই বাস করিতেন। তাঁহার পুত্র **হেমন্তসেন** একজন বীরপুরুষ ছিলেন। হেমন্ত সেনের পুত্র বিজয় সেন হইতেই সেন বংশের গৌরব আরম্ভ হয়। তিনিই বাঙ্গলা-দেশে সেনবংশের রাজ্য স্থাপন করেন। সে কথা আমরা পরে বলিব। বিজয় সেনের পুত্র বল্লালসেন একজন বিখ্যাত রাজা ছিলেন। বাঙ্গালা দেশের সকলেই বল্লালসেনের কথা জানে বল্লালসেনের পুত্র **লক্ষ্মণসেনও** একজন পরাক্রান্ত রাজা। তিনি বিদ্যার সমাদর করিতেন। তাঁহারই বৃদ্ধ বয়সে মুসলমানেরা এদেশে আসিয়া পশ্চিমবঙ্গ জয় করিয়া লন। কিন্তু লক্ষ্মণসেনের বংশধরেরা অনেকদিন পর্য্যন্ত পূর্ব্ববঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন। আমরা ক্রমে ক্রমে তোমাদিগকে সেনবংশের কথা শুনাইতেছি।

বিজয়সেনের দিগ্বিজয়

সেনবংশীয়েরা যে অনেকদিন হইতে রাঢ়দেশে বাস করিতেছিলেন এবং বিজয় সেন হইতে বাঙ্গলায় তাঁহাদের রাজত্বের আরম্ভ, সে কথা তোমাদিগকে বলিয়াছি। সেনবংশীয়েরা যখন রাঢ়দেশে বাস করিতেছিলেন, তখন রাঢ়দেশ তাঁহাদের অধিকারে ছিল বলিয়া বোধ হয়। তাহার পর বিজয়সেন দিগ্বিজয়ে বাহির হন। তিনি প্রথমে বরেন্দ্রভূমির কতক অংশ অধিকার করিয়া লন। সে সময়ে পাল-বংশীয়েরা একেবারে হীনবল হইয়া পড়িয়াছিলেন। রামপাল দেবের কনিষ্ঠ পুত্র মদনপালই পালবংশের শেষ রাজা বলিয়া অনুমান হয়। বিজয়সেন তাঁহারই নিকট হইতে বরেন্দ্রীর দক্ষিণাংশ অধিকার করিয়া থাকিবেন। তাহার পর তিনি অন্যান্য দেশ জয় করিতে অগ্রসর হন। বিজয় সেন কামরূপ, কলিঙ্গ, মিথিলা প্রভৃতি জয় করিয়াছিলেন। এইরূপে দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া বিজয়সেন অনেক রাজাকে পরাস্ত করেন। তিনি সমস্ত বাঙ্গালাদেশেরই অধীশ্বর হইয়াছিলেন।

রাঢ়, বরেন্দ্রী ও পূর্ব্ববঙ্গ বিক্রমপুরে সেনবংশের তিনটি রাজধানী ছিল। বরেন্দ্রীর রাজধানীর নাম **গৌড়** আর রাঢ়ের রাজধানীর নাম **নবদ্বীপ**। বঙ্গের বা পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানীর নাম **শ্রীবিক্রমপুর**। সেনবংশীয় রাজাদের তাম্রশাসনে বিক্রমপুর রাজধানীর উল্লেখ আছে। গৌড় নগর কোন্ সময়ে স্থাপিত হইয়াছিল তাহা স্থির করা কঠিন। পাল-বংশের রাজত্বকালে ইহার কোন গৌরবের কথা জানা যায় না। তবে সেন বংশের সময় হইতে গৌড় বিখ্যাত হইয়া উঠে। সে সময়ে ইহার লক্ষ্মণাবতী নাম হয়। লক্ষ্মণসেনের নামেই গৌড়ের

লক্ষ্মণাবতী নাম হইয়াছিল। বিজয়সেনই পৌত্রের নামে গৌড়ের লক্ষ্মণাবতী নাম দিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। রাঢের রাজধানী নবদ্বীপকে সে সময়ে বিজয়পুর বলিত। উহা যে বিজয়সেনের নামেই হইয়াছিল, এইরূপ অনুমান হইয়া থাকে। বিজয়সেনের সময় হইতে উহা সেনবংশের রাজধানী হওয়াই সম্ভব। পূর্ব্ববঙ্গের বিক্রমপুর সেনবংশীয়দের প্রধান স্থান ছিল।

বিজয়সেন অনেকদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার সময় হইতে একটি অব্দ প্রচলিত হওয়ায় উহা লক্ষ্মণ সম্বৎনামে প্রসিদ্ধ। বিজয়সেন পৌত্রের নামে ঐ অব্দ প্রচলিত করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। কাহারও কাহারও মতে লক্ষ্মণ সম্বৎ লক্ষ্মণসেনের রাজত্ব আরম্ভ হইতে প্রচলিত হইয়াছিল। বিজয়সেন বরেন্দ্রভূমিতে প্রদ্যুম্নেশ্বর নামে শিবস্থাপনা করিয়া তাঁহার এক বৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তাহার সম্মুখে একটী বৃহৎ সরোবরও খনন করা হইয়াছিল। রাজশাহী জেলার দেবপাড়া গ্রামে সেই সরোবরের তীরে প্রদ্যুম্নেশ্বরের মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। সেই মন্দিরের এক শিলাখণ্ডে বিজয়সেনের কীর্ত্তিকথা লিখিত হইয়াছিল।

বল্লালসেনের কৌলীন্যমর্য্যাদা

বিজয়সেনের পুত্র বল্লালসেন আমাদের দেশের লোকের নিকট বিশেষভাবেই পরিচিত। তাঁহার অনেক সুকীর্ত্তির কথা শুনিতে পাওয়া যায়। তিনি পিতার সাম্রাজ্য স্থাপনের অনেক সহায়তা করিয়াছিলেন। এমনকি বিজয়সেনের রাজত্বের শেষভাগে লক্ষ্মণসেনও কোন কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বল্লালসেন সেনবংশের রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া উহার অভ্যন্তর ভাগেরও অনেক উন্নতি সাধন করেন। **গৌড়, নবদ্বীপ** এবং **বিক্রমপুর-রামপালে** এখনও তাঁহার অনেক কীর্ত্তির চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালা দেশ অনেকদিন হইতে বৌদ্ধ পালবংশীয়দিগের অধীন থাকায় হিন্দুধর্ম্ম সেরূপ প্রবল হইতে পারে নাই। সেনবংশীয়েরা আবার হিন্দুধর্ম্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। বল্লালসেনই বিশেষভাবে তাহার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি অনিরুদ্ধ ভট্ট নামে একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের শিষ্য হন। বল্লালসেন "দানসাগর" নামে একখানি ধর্ম্মশাস্ত্রের গ্রন্থ প্রকাশ করেন। অদ্ভুতসাগর নামে একখানি জ্যোতিষের গ্রন্থ তিনি লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, লক্ষ্মণসেনের সময় তাহা শেষ হয়। তখন সমাজের মধ্যে অনেক গোলযোগ ঘটিয়াছিল। সেজন্য বল্লালসেন ধার্ম্মিক ও সাধারণ লোকদিগকে মর্য্যাদা দিয়া কুলীন নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। যাঁহাদের, আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, আবৃত্তি, তপ, দান এই নয়টি গুণ ছিল, তাঁহারাই কুলীন হইয়াছিলেন। আদিশূরের সময়ে আগত পঞ্চব্রাহ্মণ ও পঞ্চকায়স্থের সন্তানদিগের মধ্যে যাঁহারা ঐ নবগুণের অধিকারী হইয়াছিলেন, তাঁহারাই বল্লালসেনের নিকট হইতে কৌলীন্যমর্য্যাদা লাভ করেন। বল্লালসেন শূরবংশের দৌহিত্র ছিলেন। সে জন্যই বোধ হয় আদিশূর যাঁহাদিগকে এ দেশে আনাইয়াছিলেন বল্লাল তাঁহাদের সন্তানদিগকেই কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রদান করেন। ব্রাহ্মণ বৈদ্য ও কায়স্থদিগের মধ্যেও কৌলীন্য মর্য্যাদা আছে। তাহা বল্লালসেনের দেওয়া নহে। যাঁহারা প্রথমে কুলীন হইয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশের লোকেরা এখনও কুলীন বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। এইরূপে বল্লালসেন সমাজের শৃঙ্খলাস্থাপন করায়, আজ পর্য্যন্তও সকলের নিকট সুপরিচিত হইয়া আছেন।

লক্ষ্মণসেনের রাজসভা

বল্লালসেনের পর তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণসেন বাঙ্গালার রাজা হন। পিতা ও পিতামহের প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য লক্ষ্মণসেনও অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি পিতামহের সময় হইতেই রাজকার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। লক্ষ্মণসেন যে সময়ে যুবরাজ ছিলেন সে সময়ে কলিঙ্গদেশ জয় করেন বলিয়া জানা যায়। তিনি কাশী এবং কামরূপও জয় করিয়াছিলেন দক্ষিণ সাগরের তীরে পুরীধামে, বারাণসী ক্ষেত্রেও প্রয়াগতীর্থে লক্ষ্মণসেন যজ্ঞের কষ্টিস্তম্ভের সহিত যুদ্ধের জয়স্তম্ভও স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে। এইরূপে সকল দেশের রাজাকে বশে আনিয়া লক্ষ্মণসেন

বিদ্যাচর্চ্চায় মনোনিবেশ করেন। সে সময়ে সংস্কৃত ভাষারই চর্চ্চা হইত। তাঁহার রাজসভা পণ্ডিত ও কবিতে অলঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছিল। হলায়ুধ নামে একজন বিখ্যাত পণ্ডিত প্রথমে তাঁহার রাজপণ্ডিত, পরে ধর্ম্মাধিকারী বা বিচারপতি হইয়াছিলেন। হলায়ুধ সংস্কৃত ভাষায় অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। তাহাদের মধ্যে **ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্ব** নামে গ্রন্থই প্রসিদ্ধ। হলায়ুধের দুই ভ্রাতা ঈশান এবং পশুপতিও বড় পণ্ডিত ছিলেন।

পাঁচজন সুপ্রসিদ্ধ কবি লক্ষ্মণসেনের রাজসভায় থাকিতেন। তাঁহাদের নাম উমাপতি ধর, জয়দেব, শরণ, গোবর্দ্ধনাচার্য্য ও কবিরাজ চক্রবর্ত্তী ধোয়ী। ইঁহারা সকলেই সংস্কৃত কবিতা রচনা করিতেন। বিজয়সেনের প্রদ্যুম্নেশ্বরের মন্দিরে তাঁহার যে কীর্ত্তি-কথা লিখিত হইয়াছিল উহা উমাপতি ধরের রচনা। "গীতগোবিন্দ" নামে রাধাকৃষ্ণের লীলাগানে পূর্ণ সুললিত সংস্কৃত কাব্য কবি জয়দেবকে চির-স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। বীরভূম জেলায় কেন্দু-বিল্ব বা কেঁদুলীগ্রামে জয়দেবের বাসস্থান ছিল। প্রতি বৎসর পৌষ সংক্রান্তিতে এখনও সেখানে তাঁহার নামে একটি মেলা বসিয়া থাকে। শরণেরও অনেক সুন্দর সুন্দর কবিতা দেখিতে পাওয়া যায়। গোবর্দ্ধনাচার্য্যের 'আর্য্যাসপ্তশতী' নামে একখানি সংস্কৃত কবিতাগ্রন্থ আছে। উহাতে সাতশত সুমিষ্ট কবিতা সংস্কৃত আর্য্যাছন্দে লিখিত হইয়াছে। ধোয়ী কবিও একজন শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। তিনি লক্ষ্মণ-সেনের নিকট হইতে অনেক উপহার ও কবিরাজ-চক্রবর্ত্তী উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। 'পবনদূত' নামে তাঁহার একখানি সুমধুর কবিতায় পূর্ণ সংস্কৃত কাব্য সুপ্রসিদ্ধ কবি কালিদাসের 'মেঘদূত' নামে কাব্যের অনুকরণে রচিত হইয়াছিল। 'মেঘদূতে' কালিদাস মেঘকে একজন যক্ষের দূত করিয়া তাহার পত্নীর নিকট পাঠাইয়াছিলেন। আর 'পবন-দূতে' ধোয়ী কবি মলয়পর্ব্বত হইতে মলয় পবনকে কুবলয়বতী নামে একটী গন্ধর্ব্ব-কন্যার দূত করিয়া বিজয়পুর বা নবদ্বীপে লক্ষ্মণসেনের নিকট পাঠাইয়া-দেন। লক্ষ্মণসেন নিজেও একজন সুকবি ছিলেন। তাঁহার অমাত্য বটুদাসের পুত্র শ্রীধর দাস প্রসিদ্ধ কবিগণের কবিতা সংগ্রহ করিয়া, "সদুক্তি কর্ণামৃত"-নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। 'সদুক্তি কর্ণামৃতের' 'সূক্তিকর্ণামৃত' নামও আছে। এইরূপে লক্ষ্মণসেনের রাজসভা পণ্ডিত ও কবিতে পরিপূর্ণ হই থাকিত। ইঁহারা রাজকার্য্যেও রাজাকে উপদেশ দিতেন। মালদহ জেলায় পাণ্ডুয়ায় এক পুরাতন মসজিদের মালিকের নিকট একখানা সংস্কৃত পুথি পাওয়া যায়, উহার নাম "সেক শুভোদয়া"। উহাতে এক মুসলমান পীরের জীবন-কথা আছে। এই মুসলমান পীর নাকি লক্ষ্মণসেনের সভায় উপস্থিত ছিলেন। এই বই খানিতে লক্ষ্মণসেনের সভার নানা রকম মজার গল্প আছে, গল্পগুলি সত্য কি না বলা যায় না।

লক্ষ্মণসেনের এক শালা ছিল। সে ছিল ভারি দুষ্ট, লোকজনের উপর সে বড়ই পীড়ন করিত। একবার সে একটি বেনের মেয়ের প্রতি অশিষ্ট ব্যবহার করিলে, সে ছুটিয়া আসিয়া রাজ-সভায় উপস্থিত হইল ও রাজার শালার নামে নালিশ করিল। রাজা শালাকে ধরিয়া আনিবার আদেশ দিলেন। রাণীর নিকট সে সংবাদ পঁহুছিলে তিনি তাড়াতাড়ি রাজসভায় আসিয়া বলিয়া উঠিলেন যে কাহার সাধ্য তাঁহার ভাইকে শাস্তি দেয়। রাণীর কথায় সভাশুদ্ধ লোক অবাক্ হইয়া গেল। তখন গোবর্দ্ধনাচার্য্য তাঁহার হাতের দণ্ড দেখাইয়া বলিলেন যে, যে রাজসভার বিচারে বাধা দিবে, তিনি তাহাকে সেই দণ্ডাঘাতে তাড়াইয়া দিবেন। তাহার পর তিনি রাজাকে বলিলেন যে তাঁহার রাজ্যে পাপ প্রবেশ করিয়াছে। শীঘ্রই তাহা ধ্বংস হইবে। আচার্য্য রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছেন বলিলেন। তাহার পর তিনি সভা পরিত্যাগ করিয়া যাইতে উদ্যত হইলে, রাজা লক্ষ্মণ সেন সিংহাসন হইতে নামিয়া আসিয়া তাঁহার চরণ ধরিয়া তাঁহাকে শান্ত করিলেন। বেনের মেয়ের নালিশের সুবিচার হইল।

বাঙ্গালার শিল্পের উন্নতি

পাল ও সেন বংশের রাজত্বকালে বাঙ্গলাদেশে শিল্পের অনেক উন্নতি হইয়াছিল। ইহার পাথরের শিল্প সে সময়ে সমস্ত ভারতবর্ষে প্রশংসা লাভ করে। হিন্দু ও বৌদ্ধ নানা দেবদেবীর ও অন্যান্য অনেক

সুন্দর সুন্দর মূর্ত্তি পাথরে নির্ম্মিত হইয়া বহুস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। অনেক পাথরের মন্দিরের থামে ও দেওয়ালে নানা প্রকার মূর্ত্তি ও লতাপাতা খোদাই করা হইত। তাহা শিল্পিগণের নিপুণতার পরিচয় দিত। ধাতুর মূর্ত্তিও সে সময়ে সূক্ষ্মকার্য্যে ভূষিত হইয়া সকলের আনন্দ বাড়াইয়া তুলিত। তাহাতে শিল্পীগণ যথেষ্ট পরিমাণে আপনাদের প্রতিভার পরিচয় দিতেন। অনেক স্থানের শিলালিপি সুস্পষ্ট ভাবে খোদিত হইয়া শিল্পির গুণপণা প্রকাশ করিত। আবার তাম্রশাসন সকলেও ঐরূপ অক্ষরে খোদাই করা হইত। এই তাম্রশাসন ও শিলালিপিতে রাজাদিগের গুণগান ও লিখিত হইত। কাষ্ঠশিল্প ও চিত্রকার্য্যও সে সময়ে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ঐ সমস্ত পাথর ও ধাতুনির্ম্মিত মূর্ত্তি, মন্দিরের ভগ্নাবশেষ, শিলালিপি, তাম্রশাসন প্রভৃতির অনেকগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহা হইতেই সে সময়ের শিল্পের কিরূপ উন্নতি হইয়াছিল তাহা বুঝিতে পারা যায়। এইরূপে পালবংশের ও সেনবংশের রাজত্বকালে নানা প্রকার শিল্পের উন্নতি হইয়া বাঙ্গালাদেশ সমস্ত ভারতবর্ষকে বিখ্যাত করিয়াছিল।

বাঙ্গালায় মুসলমান আগমন

আরব দেশে হজরত মুহম্মদ এক নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। যাঁহারা সেইধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে মুসলমান বলে। মুসলমানেরা তাঁহাদের ধর্ম্ম-প্রচারের জন্য দেশ-বিদেশে যাইতেন ও সেই সেই দেশ জয় করিয়াও লইতেন। সে সকল দেশের অনেক লোকে মুসলমান হইত। মুসলমানেরা অনেকদিন হইতে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন। প্রথমে কাসীমের পুত্র মহম্মদ সিন্ধুদেশ জয় করেন। তাহার পর আফগানিস্থানের অন্তর্গত গজনীর সুলতান মামুদ প্রভৃতি অনেকবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন। এবং দেব দেবীর মন্দিরাদি ভাঙ্গিয়া অনেক ধন রত্ন লুটিয়া লইয়া যান। তাহার পর আবার গজনীর মহম্মদ দিল্লীর রাজাকে পরাজিত করিয়া দিল্লী অধিকার করেন। পৃথ্বীরাজ প্রথম মহম্মদ ঘোরীকে হারাইয়া দিয়াছিলেন। বারে নিজে পরাজিত হইয়া নিহত হন। মহম্মদ ঘোরী দিল্লী অধিকার করিয়া; কুতবুদ্দীনকে দিল্লী রাজ্যের ভার দিয়া যান। কুতবুদ্দীনই দিল্লীর প্রথম মুসলমান বাদশাহ।

মুসলমানেরা ক্রমে ক্রমে পূর্ব্বদিকে আসিতে লাগিলেন। ইহাদের মধ্যে বক্তিয়ার খিলিজীর পুত্র ইক্তিয়ার উদ্দীন মহম্মদ নামে একজন যোদ্ধা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিল। বাদশাহ কুতবউদ্দীন ইক্তিয়ারের বীরত্বের পরিচয় পাইয়া তাহার প্রতি সমাদর দেখাইয়াছিলেন। ইক্তিয়ার ক্রমে মগধ বা বিহারে আসিয়া উপস্থিত হন। বিহার জয় করিয়া তিনি বাঙ্গলায় আসেন। সে সময়ে লক্ষ্মণসেন বাঙ্গলায় রাজত্ব করিতেছিলেন। কিন্তু তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। নিকটে তাঁহার কোন শত্রু না থাকায় তাঁহার সৈন্যগণ ও যুদ্ধকার্য্য একরূপ ছাড়িয়া দিয়াছিল। পূর্ব্বে তাহারা অনেক দেশ জয় করিয়াছিল, এক্ষণে বিশ্রামসুখ ভোগ করিতেছিল। রাজধানীতে তাহারা প্রায়ই থাকিত না। প্রয়োজন হইলে মধ্যে মধ্যে আসিত। সে সময় বিজয়পুর বা নবদ্বীপ লক্ষ্মণসেনের প্রধান রাজধানী। গৌড় বা লক্ষ্মণাবতীও তাহার আর একটি রাজধানী ছিল। এই দুইটি যে সেন বংশীয়দের রাজধানী সে কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। লক্ষ্মণ সেন নবদ্বীপ থাকিতেই ভালবাসিতেন। তাঁহার বৃদ্ধাবস্থার ও সৈন্যগণের বিশ্রামঅবস্থা বুঝিতে পারিয়া ইক্তিয়ার খিলজী একেবারে নবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে সতের জন মাত্র অশ্বারোহী সৈন্য ছিল বলিয়া শুনা যায়, কিন্তু সে কথা সত্য বলিয়া মনে হয় না। হয়ত তাঁহার সৈন্যগণ কোন স্থানে গুপ্তভাবে ছিল। ইক্তিয়ার কেবল সতের জন অশ্বারোহী লইয়া নবদ্বীপ প্রবেশ করিয়া থাকিবেন। লক্ষ্মণসেনের সৈন্যেরা সে সময়ে নবদ্বীপ ছিল না বলিয়া, মনে হয়। তাহারা অন্য কোন সেনানিবাসে অথবা আপনাপন বাটীতে বিশ্রাম করিতেছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। 'লক্ষ্মণসেনের পলায়ন কলঙ্ক' লইয়া বাঙ্গালা সাহিত্যে অনেকেই আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে স্বর্গত ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি এ বিষয়ে আলোচনা করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল কিনা তাহাই সন্দেহস্থল।



ভারতের মানুষের কথা

২৯৫৫ পৃষ্ঠার পর

রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষকে "মহামানবের সাগর" বলিয়াছেন। বস্তুতঃ মানবজাতিব প্রধান বিভাগগুলির অল্পবিস্তর নিদর্শন ভারতবর্ষে এখনও বর্ত্তমান।

"শিশুভারতীর" প্রথম খণ্ডে (১১৯ ১২০ পৃষ্ঠায়) তোমরা পড়িয়াছ যে মানব-জাতি সাদা, কালো, হল্‌দে প্রভৃতি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত। নৃতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা গায়ের রং এবং মাথার ও নাকেব আকৃতি ও চুলের পার্থক্য প্রভৃতি শারীরিক লক্ষণ অনুসারে সমুদয় মানবসমাজকে তিন চারিটী মূল জাতিতে (primary races) বিভাগ করেন। মূলতঃ শ্বেত বর্ণের জাতিগুলিকে শ্বেতাঙ্গ বা ককেসিক্ জাতি (White or Caucasian race), কৃষ্ণবর্ণের জাতিগুলিকে কৃষ্ণাঙ্গ বা নিগ্রো এবং নেগ্রিটো (Black বা জাতি Negritic race), এবং পীতাভ বা পীতবর্ণের জাতিগুলিকে পীত বা মোঙ্গোলীয় জাতি (Mongolian বা Yellow race) বলা হয়। কেহ কেহ আমেরিকাবাসী তামাটে রঙ্গের (copper-coloured) আদিম জাতি-গুলিকে (Red Indiansকে) স্বতন্ত্র শ্রেণীভুক্ত করিতেন; কিন্তু এখন উহাদিগকে মূলতঃ পীতাভ মোঙ্গোলীয় জাতির অন্তর্গত বলিয়াই পণ্ডিতেরা নির্ণয় করিয়াছেন। অষ্ট্রেলিয়ার অসভ্য জাতিদিগকে কোনও কোনও পণ্ডিত একটি স্বতন্ত্র জাতীয়রূপে পরিগণিত করেন। কিন্তু বাসভূমির জল হাওয়ার প্রভাবে তাহাদের গায়ের বং কৃষ্ণাভ এবং কোনও কোনও বিষয়ে তাহারা কৃষ্ণ-বর্ণ নিগ্রোদের অনুরূপ হইলেও, মূলতঃ উহারা মিশ্র ককেসিক জাতি বলিয়া অনুমিত হয়।

অষ্ট্রেলিয়াবাসী আদিম জাতিদিগকে ছাড়িয়া দিলে, অবশিষ্ট (বিশেষতঃ ইউরোপীয়) শ্বেতাঙ্গ জাতিদিগকে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়:—উত্তর ইউরোপে নর্ডিক (Nordic) জাতি, মধ্য ইউরোপে আল্পাইন (Alpine) জাতি, ও দক্ষিণ ইউরোপে মেডিটেরানিয়ান (Mediterranean) জাতি। ভারতের ককেসীয় জাতিদের

মধ্যে 'আর্য্য' জাতি **শিখ, পাঞ্জাবী,** প্রভৃতি "নর্ডিক" শ্রেণীর অন্তর্ভূত ; **বাঙ্গালী, মারাঠী,** ও **গুজরাটি** "আল্পাইন" শ্রেণীর অন্তর্ভূত ; আর **তামিল, তেলেগু, মালায়ালি** প্রভৃতি 'দ্রাবিড়' ভাষী জাতি "মেডিটেরানিয়ান" শ্রেণীর অন্তর্ভূত।

যদি ও ভারতবর্ষে 'সাদা' 'কালো' এবং 'পীত' এই তিন বর্ণের জাতিই বিদ্যমান, তবু গ্রীষ্মাধিক্যের অর্থাৎ প্রখর সূর্য্য তাপের প্রভাবে এদেশের শ্বেত-জাতির রং অপেক্ষাকৃত মলিন। আর অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতবর্ষেও পুরাকালে বিভিন্নজাতির সংমিশ্রণে কিছু বর্ণ-সঙ্করের সৃষ্টি হইয়াছে। যদি ও ঐরূপ বর্ণ-সাঙ্কর্য্য প্রতিষেধ ভারতের জাতি-ভেদ প্রথা প্রবর্ত্তনের অন্যতম কারণ, তবু এখন পর্য্যন্ত বিভিন্ন-জাতির সংমিশ্রণ একেবারে তিরোহিত হয় নাই বা কখনও হইতে পারে না।

সে যাহা হউক, অধুনা ভারতে যে সমস্ত মূল-জাতির নিদর্শন বর্ত্তমান, তাহাদের কথা সংক্ষেপে বলিতেছি।

(১) নৃতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে ভারতবর্ষে প্রস্তর যুগ হইতে বহুকাল পর্য্যন্ত খর্ব্বাকার, চ্যাপটা নাক-বিশিষ্ট ও কোঁকড়া-চুল-বিশিষ্ট কৃষ্ণ-কায় জাতির মানুষ বাস করিত। তাহারা দলবদ্ধ হইয়া বন্য ফল-মূল আহরণ ও মৃগয়া-দ্বারা পশুশিকার ও মৎস্যাদি সংগ্রহ করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করিত, এবং পর্ণকুটিরে বা গিরিগুহায় বাস করিত। বর্ত্তমানকালে ভারতের দক্ষিণপ্রান্তে কাডার, উরুলা প্রভৃতি দুই একটি বন্য অসভ্য জাতির দৈহিক প্রকৃতিতে ঐ অধুনা-বিলুপ্ত নেগ্রিটো জাতির কিছু কিছু নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়।

(২) তারপর নূতন প্রস্তর যুগেই বর্ত্তমান মুণ্ডা, সাঁওতাল, কোল, ভীল, প্রভৃতি-জাতির পূর্ব্ব পুরুষেরা ভারতে আসে। আগেকার পণ্ডিতেরা মনে করিতেন ইহারা ভারতের পূর্ব্বপ্রান্ত হইয়া এখানে আসিয়াছে, কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতেরা উত্তর পশ্চিম প্রান্তকেই ইহাদের ভারতে প্রবেশের পথ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। যদিও ইহাদের গায়ের রং এখন অনেকটা কালো বা ধূসর (black-brown), তবুও পণ্ডিতেরা অনুমান করেন ইহারা শ্বেতাঙ্গ ককেসিক জাতির (White or Caucasian race এর) একটি অনুন্নত শাখা। ইহাদের আকৃতি খর্ব্ব-কায়, মথার খুলি লম্বাটে, এবং নাক ছোট ও চওড়া। এক সময় ইহারা ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত ছিল। কিন্তু সভ্যতর জাতিদের আগমনে ক্রমে তাহাদের অধিকাংশ দলগুলি মধ্যভারতের ও ছোটনাগপুরের ও দক্ষিণ-ভারতের পাহাড় ও জঙ্গলে গিয়া আশ্রয় লয়, এবং এখন পর্য্যন্ত ঐ সমস্ত পার্ব্বত্য প্রদেশে তাহাদের বংশধরেরা বাস করিতেছে। ছোটনাগপুরের মুণ্ডা, সাঁওতাল, ভূমিজ, হো, বিরহোড়, অসুর, প্রভৃতি জাতি বর্ত্তমান ওড়িষ্যার খন্দ, গণ্ড, জুয়াং, শবর, গদব প্রভৃতি জাতি, মান্দ্রাজ প্রদেশের চেঞ্চু, কোটা, কুডুম্বা প্রভৃতি জাতি ও মধ্যপ্রদেশের কোড়কু, কোডোয়া, ও কোল, এবং বোম্বের খান্দেশ প্রভৃতি অঞ্চলের ভীল কোলি, চোঢ়া প্রভৃতি জাতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহাদের সহিত অষ্ট্রেলিয়া দেশের অসভ্যজাতিদের সাদৃশ্য ও জাতিগত সম্পর্কের সম্ভাবনার জন্য অধুনা ইহাদিগকে প্রোটো-অষ্ট্রেলয়ড জাতি (Proto-Australoid race) বলিয়া অভিহিত করা হয়। ইহারাই সম্ভবতঃ ভারতে কৃষিকার্য্য প্রবর্ত্তন ও গ্রামস্থাপন করিয়া সভ্যতার মূলপত্তন করিয়াছিল।

(৩) তারপর ভূমধ্যসাগর উপকূলে উদ্ভূত নাতিহ্রস্ব-নাতিদীর্ঘ-নাসিকা ও লম্বাটে মস্তক-বিশিষ্ট-মেডি-টারেনিয়ান জাতির একাধিক শাখা স্থলপথে ও পরে কতক হয়তো জলপথে ভারতে আগমন করে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি মেডিটারেনিয়ান জাতি ককেসিক জাতির অংশবিশেষ। ছোটনাগপুর প্রভৃতি প্রদেশে কোন কোন স্থানে যে সমস্ত প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তর-সমাধি, পুরাতন ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহাদির ধ্বংসাবশেষ ও তাম্রযুগের অস্ত্র অলঙ্কার ও তৈজসপত্রাদি দেখা যায় তাহা প্রাগৈতিহাসিক "অসুর" জাতির নির্ম্মিত বলিয়া ঐ প্রদেশে কিংবদন্তী আছে। ইহারাই ভারতে প্রথম ধাতুদ্রব্য নির্ম্মাণ ও কৃত্রিম উপায়ে জলসেচন দ্বারা কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধন ও আদিম দুর্গ স্থাপন করে। পৃথিবীর সম্ভবতঃ সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন গ্রন্থ যে আর্য্যহিন্দুদের ঋগ্বেদ তাহাতে 'অসুর'দের সহিত 'আর্য্য' জাতির যুদ্ধাদির উল্লেখ দেখা যায়। কেহ কেহ ঋগ্বেদোক্ত

'অসুর'দিগকে প্রাগৈতিহাসিক ভারতে উপনিবিষ্ট মেডিটারেনিয়ান জাতির তথাকথিত 'অসুর' শাখা বলিয়া মনে করেন; আর কোনো কোনো পণ্ডিত তাহাদিগকে তৎকালের 'অসুর-মজদা'-পূজক সুর-বা দেব-দ্বেষী 'আর্য্য', বর্ত্তমান পারসিকদের পূর্ব্বজ, বলিয়া মনে করেন। সে যাহাই হউক, ভারতে সমাগত মেডিটারেনিয়ান জাতির এই "অসুর" শাখার কোন কোন দল উত্তর ও উত্তর-পূর্ব্ব ভারতের কোনো কোনো স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিলেও উত্তর ভারতের নদীর উর্ব্বর সুজলা সুফলা উপত্যকাগুলি মুণ্ডা, ভীল, সাঁওতাল প্রভৃতি "প্রোটো অষ্ট্রেলয়েড" জাতিদের অধিকৃত থাকায়, আগন্তুক মেডিটারেনিয়ান শাখার অধিকাংশ দলগুলি ক্রমে ক্রমে দক্ষিণ ভারতে গমন করিল। ইহারাই দাক্ষিণাত্যের বর্ত্তমান দ্রাবিড়ভাষী (Dravidian-speaking) তামিল, তেলেগু, ক্যানারিজ, প্রভৃতি জাতিদের পূর্ব্বপুরুষ। পণ্ডিতেরা উহাদের প্রোটো-ড্রাভিডিয়ান বা 'প্রত্ন-দ্রাবিড়' নামকরণ করিয়াছেন। দাক্ষিণাত্যের ও ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন প্রভৃতি প্রদেশের অপেক্ষাকৃত হীনবল চেরুমল, পুলিয়ান, প্রভৃতি কতকগুলি অসভ্য জাতি প্রত্ন-দ্রাবিড়দের দাসত্ব স্বীকার করিয়া কালক্রমে অস্পৃশ্য জাতি বলিয়া পরিগণিত হয়। অপেক্ষাকৃত উন্নত ও বলবান কোনও কোনও আদিম জাতি নবাগত "প্রত্ন-দ্রাবিড়" জাতিদের সহিত মিশিয়া যায়। আর অপেক্ষাকৃত স্বাধীনচেতা অনেকগুলি আদিমনিবাসী জাতি—যেমন, কোটা, কুডুম্বা, উরুলা, প্রভৃতি—দক্ষিণ ভারতের পাহাড়-জঙ্গলে আশ্রয় লয়, এবং এখন পর্য্যন্ত বন্য ফল মূল আহরণ ও পশু-শিকার কিংবা অমার্জ্জিত হস্তশিল্প দ্বারা কায়ক্লেশে জীবিকা-অর্জ্জন করে।

এই মেডিটারেনিয়ান জাতির একটি অপেক্ষাকৃত উদ্যমশীল ও ভাগ্যবান শাখা সিন্ধুনদের উপত্যকায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। স্থলপথে ও জলপথে দেশবিদেশে যাতায়াতের সমুচিত সুবিধা লাভ করিয়া তাহারা নানা জাতির সংস্পর্শে আসিয়াছিল, এবং তাহার ফলে সভ্যতায় সমধিক উন্নতি সাধন করে। ইহারা তৎকালে পৃথিবীর মধ্যে একটী সভ্যতম জাতি হইয়া উঠিয়াছিল। ইহাদের কথা তোমরা "শিশু-ভারতীর" প্রথম খণ্ডে (১৮৯-১৯৮ পৃষ্ঠায়) পড়িয়াছ।

(৪) সম্ভবতঃ ইহাদের পরে বাঙ্গালী, গুজরাটি, মারহাটি প্রভৃতি জাতিদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা ভারতে আগমন করে। তোমরা পৃথিবীর মানচিত্রে দেখিয়াছ ইউরেশিয়ার মধ্যভাগে সুদূর-বিস্তৃত আল্পস্ পর্ব্বত ও তৎসংলগ্ন পর্ব্বতমালা ইউরোপের একপ্রান্ত হইতে এসিয়ার প্রায় মধ্যভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। এই পর্ব্বতমালার সানুদেশবাসী জাতিগুলির মস্তিষ্ক করোটী ককেসিক জাতিদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত গোলাকার (broad headed) নাক মধ্যমাকার বা লম্বাটে (medium-nosed ও long-nosed), আকৃতি নাতিদীর্ঘ-নাতিখর্ব্ব (medium stature)। ইহারাই শ্বেতাঙ্গ জাতির আল্পাইন (Alpine) শাখা। ইহাদের একাধিক দল মধ্যএসিয়ার পার্ব্বত্য অধিত্যকা হইতে পামির গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করিয়া ভারতে প্রবেশ করে। ইহাদেরই সুদূর বংশধর বর্ত্তমান বাঙ্গালী, মারহাটি, গুজরাটি ও সম্ভবতঃ উড়িয়া ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চতর জাতিগুলি। এই আল্পাইন জাতির ভারতে আগমনকালে সম্ভবতঃ গঙ্গা যমুনার উপত্যকা হইতে ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকার কতকাংশ পর্য্যন্ত মুণ্ডা সাঁওতাল, ভীল প্রভৃতি "কোল" জাতির প্রাধান্য ছিল এবং সিন্ধুনদের উপত্যকায় ও নর্ম্মদা, তপ্তি প্রভৃতি নদীর উপত্যকায় ও ছোটনাগপুরের সুবর্ণরেখা, দামোদর, সপ্তয় ও বিজয় নদীগুলির উপত্যকায় মেডিটারেনিয়ান "অসুর" জাতির প্রাধান্য ছিল বলিয়া মনে হয়। গুজরাত ও মারহাটিদের আল্পাইন জাতীয় পূর্ব্বপুরুষেরা আরব-সমুদ্রের পূর্ব্ব উপকূলে ও পশ্চিম ও মধ্যভারতে বসবাস করিল। বাঙ্গালীদের আল্পাইন পূর্ব্বজেরা মধ্যভারত ও বিহার অঞ্চল হইয়া যে প্রদেশে বাস করিল তাহা ক্রমে বঙ্গ, সুহ্ম বা রাঢ়, এবং পুণ্ড্র বা বরেন্দ্র দেশ নামে পরিচিত হইল; এই আল্পাইন জাতীয় বাঙ্গালী, গুজরাত ও মারহাটী প্রভৃতি জাতিরা তাহাদের নূতন বাসভূমিতে স্ব স্ব বিশিষ্ট সভ্যতা গড়িয়া তুলিল। মহাভারতে বঙ্গদেশীয় বাসুদেব চন্দ্রসেন প্রভৃতি রাজাদের উল্লেখ দেখা যায়।

(৫) পরে আনুমানিক ন্যূনাধিক পাঁচসহস্র বর্ষ হইল ভারতের উত্তর পশ্চিমস্থ গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করিয়া ককেসীক নর্ডিক "আর্য্য"-ভাষা-ভাষী জাতি ভারতে প্রবেশ করে। ক্রমে ধীরে ধীরে সমগ্র উত্তর ভারতে আর্য্য-সভ্যতা প্রাধান্য লাভ করে। মুণ্ডা প্রভৃতি আদিম "অষ্ট্রিক" বা "প্রোটোঅষ্ট্রালয়েড" জাতিদের উচ্চস্তরের কতক অংশ আর্য্যসভ্যতা গ্রহণ করিয়া ক্রমে "হিন্দু" শ্রেণী ভুক্ত হইল ও তাহাদের অবশিষ্ট জাতিগুলি মধ্যভারত ও ছোটনাগপুরের পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় লইল। কালে "আর্য্য-সভ্যতা" দক্ষিণভারতের দ্রাবিড় জাতিদের মধ্যেও পরিব্যাপ্ত হইল এবং কিঞ্চিৎ আর্য্যশোণিত দ্রাবিড় সমাজের উচ্চতমস্তরে প্রবেশলাভ করিল।

(৬) "আর্য্য"দের ভারতে আগমনের পূর্ব্বে ও পরে ভারতের উত্তর-পূর্ব্ব দিক হইতে পীতবর্ণ মোঙ্গোলিয়ান জাতির (Mongolion বা Yellow-race এর) ভোট-চীন (Tibeto Chinese) শাখার কতকগুলি জাতি ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া ভারতের বর্ত্তমান উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্ত প্রদেশে (North-Eastern Frontier Province) ও আসামে এবং হিমালয় পর্ব্বতের দক্ষিণ প্রান্তের কোনও কোনও স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিল।

পরে ভারতের এই ছয়টি প্রধান জাতীয় উপাদান ছাড়া আরও কয়েকটি নবাগত জাতি এদেশে আসিয়া বসবাস করিয়াছে। পুরাকালের ব্যাকট্রিয়ান (গ্রীক), হুন, শক, প্রভৃতি আগন্তুক জাতি ভারতের হিন্দু সমাজে বিলীন হইয়া গিয়াছে। পরে আরব, পাঠান, মোগল, ইহুদী, মক্রানি, মাপিল্লা, নেপালি, ভুটিয়া ও অল্পসংখ্যক নিগ্রোজাতীয় হাবসি এখানে আসিয়া এখন ভারতের স্থায়ী বাসিন্দা হইয়াছে। আর বম্বে ও গুজরাটের পার্শীজাতি "আর্য্য" হিন্দুদেরই অতি ঘনিষ্ঠ জাতি। নৃতত্ত্ববিৎ-পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে ভারতের পূর্ব্ব ও পশ্চিম সমুদ্রকূলে এবং আসামের সীমান্ত প্রদেশে ইণ্ডোনেসিয়ান (Indonesion) ও মেলানেসিয়ান (Melanessian) জাতীয় উপাদানেরও সামান্য চিহ্ন বর্ত্তমান।

এইরূপে ভারতের জাতীয় উপাদানগুলি বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে আমাদের এই পুণ্য-তীর্থ ভারতবর্ষ পৃথিবীর মূলজাতিদের (primary races এর) প্রতিনিধিবর্গের অল্পাধিক আবাসভূমি হইয়াছে।

তোমরা আমাদের এই কথাটী বেশ ভালভাবেই উপলব্ধি করিতে পারিবে তোমরা যদি কলিকাতা, বোম্বাই, দিল্লী, মাদ্রাজ, করাচি প্রভৃতি বড় বড় সহরে বেড়াইতে যাও এবং একটু লক্ষ্য কর তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে কত রংয়ের এবং কত বিভিন্ন পোষাকের নর-নারীই না পথ দিয়া চলাফেরা করিতেছেন। বিভিন্ন জাতীয় লোক বিভিন্ন রকমের পোষাক পরিতেছে, বিভিন্ন ভাষায় কথা বলিতেছে। সত্য সত্যই যেন এক বিশাল জগৎ।

যেমন নানা বিভিন্ন জাতি ও বর্ণের লোকের বাস, তেমনি এই সব বিভিন্ন দেশের লোকেরা একই ভাষায় কিন্তু কথা বলে না। তাহারা নানা জনে নানা ভাষায় কথা বলে।

এই জন্যই ভারতবর্ষে প্রায় আড়াই শতের উপর ভাষা প্রচলিত। তোমাদের কাছে আর একটি নূতন ও সত্য কথা বলিলাম তাহা এই যে এতদিন নৃতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা বাঙ্গালী জাতিকে—Mongolo-Dravidian type বলিত। কিন্তু তাহা যে সত্য নহে—বাঙ্গালী জাতি আল্লাইন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত তাহা ভুলিও না।

ভারতবর্ষের নানা বিভিন্ন জাতির উৎপত্তি ও ইতিহাস যেমন বিচিত্র, তেমনি ইহাদের রীতি-নীতি আচার অনুষ্ঠান, সামাজিক বিধান ও নানা রকমের। সাঁওতাল পরগণা, ছোটনাগপুর প্রভৃতি স্থানে বেড়াইতে গেলে এখনও সেই আদিমজাতির বংশধরদিগকে দেখিতে পাইবে। তাহাদের সবাই যেন বর্ত্তমান জগৎ হইতে স্বতন্ত্র, তাহারা যেন সেই অতি আদিম কালেরই মানুষ রহিয়া গিয়াছে। অতি আদিম কালের জীবন-যাত্রার ধারা এখনও তাহাদের শোণিতের ধারার সঙ্গে বহিয়া চলিয়াছে। ইহাদের অনেক কথাই তোমরা পরে জানিতে পারিবে।



উত্তর ভারত

অষ্টম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী


২৯১৮ পৃষ্ঠার পর

সম্রাট হর্ষের দেহাবসানের পর উত্তর ভারতে কিছু কালের জন্য ঘোর অরাজকতা হইয়াছিল। কথিত আছে কোনও ন্যায্য উত্তরাধিকারীর অভাবে তাহার ব্রাহ্মণ অমাত্য অর্জ্জুন বা অরুণাশ্ব বলপূর্ব্বক সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। অর্জ্জুন নিরতিশয় নিষ্ঠুর প্রকৃতির ছিলেন। চীন দেশের সম্রাট ৬৪৫ খৃষ্টাব্দে, হর্ষের জীবিত কালেই ওয়াংহিয়েন সি নামক একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নেতৃত্বে একটী দৌত্য পাঠাইয়াছিলেন এই দৌত্যটীকে অর্জ্জুন সমূলে বিনষ্ট করিয়াছিলেন। কিন্তু ওয়াং-হিয়েন সি কোনও উপায়ে পলায়ন করিয়া নেপাল দেশে আশ্রয় লইয়াছিলেন। সে সময় নেপাল তিব্বতরাজ বিখ্যাত **স্রং-সাং-গাম্পোর** অধীনে ছিল। তিব্বত-রাজ, বৌদ্ধ-বিদ্বেষী ব্রাহ্মণ অমাত্যের ধৃষ্টতা সহ্য করিতে না পারিয়া ওয়াং-হিয়েন-সিকে সৈন্য সাহায্য করিয়া অর্জ্জুনের দর্পচূর্ণ করিবার জন্য ভারতবর্ষে পাঠাইয়াছিলেন। ওয়াং অর্জ্জুনকে সম্পূর্ণ ভাবে পরাজিত করিয়া তৎকৃত অত্যাচারের প্রতিশোধ লইয়াছিলেন। এই কাহিনীর মূলে কতটুকু সত্য আছে বলা অসম্ভব। কারণ চীনদেশীয় গ্রন্থ ছাড়া ইহার উল্লেখ আর কোথাও নাই।

বোধ হয় হর্ষের মৃত্যুর পর কান্যকুব্জের সিংহাসনের অধিকার লইয়া ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে কিছুকাল যাবৎ বিবাদ চলিয়াছিল ও তাহার ফলে দেশময় অরাজকতা হইয়াছিল। কোনও একচ্ছত্র সম্রাট না থাকায় সামন্তরাজগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন। সর্ব্ব প্রথম মগধরাজ আদিত্যসেন স্বাধীনতাসূচক পদবী গ্রহণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি আদিত্যসেনের পিতা মাধবগুপ্ত হর্ষের প্রিয় বয়স্য ছিলেন ও তাঁহারই অধীনে মগধদেশ শাসন করিতেন। পিতার মৃত্যুর পর পুত্র সিংহাসন অধিকার করিয়া উত্তরাপথের একজন শক্তিশালী সম্রাটের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন। তিনি অশ্বমেধ ও অন্যান্য অনেক যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্যকালের অনেকগুলি লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাঁহার মাতা মহাদেবী শ্রীমতী গয়াজেলার অফসড়

নামক স্থানে একটি বৌদ্ধবিহার নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী মহাদেবী কোণ দেবী ভাগলপুর জেলায় মন্দার পর্ব্বতের শীর্ষদেশে একটি জলাশয় খনন করাইয়াছিলেন। আদিত্যসেন নিজে পরম বৈষ্ণব ছিলেন। **ভোগবর্ম্মা** নামক একজন সমকালীন মৌখরি রাজা তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিল। চালুক্যরাজ বিনয়াদিত্য ও বিজয়াদিত্য ৬৮০—৬৯০ খৃষ্টাব্দে একজন 'সকলোত্তরাপথনাথ'কে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন—'সকলোত্তরাপথনাথ' অর্থে সম্পূর্ণ উত্তরাপথের অধীশ্বর। এই 'উত্তরাপথনাথ' হয় আদিত্যসেন অথবা তাঁহার পুত্র তৃতীয় দেবগুপ্ত।

আদিত্যসেনের পর তাঁহার পুত্র দেবগুপ্ত ও পৌত্র বিষ্ণুগুপ্ত পর পর সিংহাসন লাভ করিয়া ছিলেন। তাঁহার প্রপৌত্র জীবিতগুপ্ত (দ্বিতীয়) মগধের গুপ্তবংশের শেষ রাজা। তাঁহার মৃত্যুর পর পূর্ব্বভারতে ঘোর অরাজকতা হইয়াছিল।

এদিকে **যশোবর্ম্মা** নামক একজন রাজা অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভেই কান্যকুব্জের সিংহাসনে আরূঢ় হইয়াছিলেন। যশোবর্ম্মা প্রকৃত ক্ষমতাশালী ছিলেন। তিনি ৭৩১ খৃষ্টাব্দে চীনদেশে একটী দৌত্য পাঠাইয়াছিলেন। সুদূর বঙ্গদেশ ও মগধ জয় করিবার জন্য তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হইয়াছিল। ৭৪০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি কাশ্মীররাজ **ললিতাদিত্য মুক্তাপীড়** তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তাঁহার প্রাণহরণ করিয়াছিলেন। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে যশোবর্ম্মার নাম অমর হইয়া থাকিবে। কারণ তিনি 'উত্তররামচরিত' নামক প্রসিদ্ধ নাটকের রচয়িতা বিখ্যাত কবি ভবভূতির আশ্রয়দাতা ছিলেন। তা ছাড়া তিনি বাক্‌পতিরাজ নামক প্রাকৃত কবিকেও আশ্রয়দান করিয়াছিলেন।

যশোবর্ম্মার পর বজ্রায়ুধ কান্যকুব্জের রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহাকে কাশ্মীররাজ জয়পীড় পরাজিত করিয়া রাজ্যচ্যুত করিয়াছিলেন। বজ্রায়ুধের উত্তরাধিকারী ইন্দ্রায়ুধ ৭৮৩ খৃষ্টাব্দে কান্যকুব্জ শাসন করিতেছিলেন। এই তারিখটী জৈন হরিবংশ পুরাণের একটি শ্লোক হইতে অবগত হওয়া যায়। ইন্দ্রায়ুধ বঙ্গেশ্বর ধর্ম্মপালের দ্বারা রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন। ধর্ম্মপাল চক্রায়ুধ নামক ভূতপূর্ব্ব রাজার কোনও আত্মীয়কে প্রতিবেশী রাজাদের সম্মতিক্রমে কান্যকুব্জের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ধর্ম্মপালের একটী তাম্রশাসনে ইন্দ্রায়ুধকে 'নতিবামন' বলা হইয়াছে অর্থাৎ তিনি ধর্ম্মপালের পদপ্রান্তে প্রণত হইয়া বামন অর্থাৎ ক্ষুদ্রাকার হইয়াছিলেন। ইন্দ্রায়ুধ গুর্জ্জররাজ দ্বিতীয় নাগভট্টের সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছিলেন। সিংহাসনচ্যুত ইন্দ্রায়ুধের পক্ষ অবলম্বন করাতে ধর্ম্মপালের সহিত তাঁহার দীর্ঘকালস্থায়ী সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। অবশেষে ধর্ম্মপালের পরাজয় হয় কিন্তু তিনি দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূটরাজ গোবিন্দ (তৃতীয়ের) সাহায্যে গুর্জ্জরদিগকে ভীষণভাবে পরাজিত করিয়া নষ্টপ্রায় প্রভাব পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন।

গুর্জ্জরজাতি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রাজপুতদের একটি শাখা বিশেষ ছিল। রাজপুতেরা বীরত্বের জন্য প্রসিদ্ধ। তাঁহাদের ন্যায় বীরজাতির জন্ম আমাদের দেশে আর হয় নাই। স্বাধীনতা তাঁহাদের প্রাণাধিক প্রিয় ছিল। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তাঁহারা হাসিতে হাসিতে সম্মুখ সমরে প্রাণবিসর্জ্জন করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। দাসত্ব-শৃঙ্খল পায়ে পরিয়া বাঁচিয়া থাকাকে তাঁহারা নিতান্ত হেয় জ্ঞান করিতেন। প্রাচীন ভারতের মধ্যযুগের ইতিহাস প্রধানতঃ এই রাজপুতজাতিরই ইতিহাস। অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভেই ভারতের রঙ্গমঞ্চে তাঁহাদের আবির্ভাব। তাহার পর বহুশতাব্দী ধরিয়া তাঁহারা আমাদের দেশের ইতিহাসে গৌরবময় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

রাজপুতদের উৎপত্তি এখনও রহস্যাবৃত রহিয়াছে। পণ্ডিতেরা এবিষয়ে অনেক অনুসন্ধান করিয়াছেন। কিন্তু অদ্যাবধি কোনও সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। রাজপুতদের উৎপত্তির বিষয়ে একটি জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। কথিত আছে যে পরশুরাম পৃথিবীকে একবিংশতি বার নিঃক্ষত্রিয় করাতে বসুন্ধরা বীরশূন্য হইয়াছিল। এই অবাঞ্ছনীয় দশা দেখিয়া ঋষিগণ অর্ব্বুদগিরিশীর্ষে (অর্থাৎ আবু পাহাড়ের উপর) বিশ্বামিত্রের দ্বারা একটি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করাইয়াছিলেন। এই যজ্ঞের অগ্নিকুণ্ড হইতে একটি পুরুষের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল এবং এই যজ্ঞীয় পুরুষ হইতেই পরমার, চালুক্য

অথবা সোলঙকী প্রতীহার এবং চাহমান (চৌহান)—এই চারিটি রাজপুতজাতির উৎপত্তি হইয়াছিল-এই কারণে ইহাদিগকে অগ্নিকুল ক্ষত্রিয় বলা হয়।

অনেক পণ্ডিতেরা মনে করেন যে রাজপুতেরা ভারতবর্ষের আর্য্যজাতি হইতে ভিন্ন। ডাঃ ভাণ্ডারকার নামক একজন পণ্ডিত প্রমাণ করিয়াছেন যে প্রতীহার নামক রাজপুতকুল গুর্জ্জর জাতি হইতে উদ্ভূত। গুর্জ্জরেরা একটি বিদেশী জাতি। তাঁহারা হূণদের পরে উত্তরপশ্চিম সীমান্তের গিরিবর্ত্মের ভিতর দিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল ও পঞ্জাব এবং গুজরাট প্রভৃতি প্রদেশে নিবাস স্থাপন করিয়াছিল। এখনও গুজরাট, পঞ্জাব, রাজপুতনার কোনও কোনও অঞ্চলে ও মধ্য-প্রদেশের উত্তরপশ্চিমাংশে বহুসংখ্যক গুর্জ্জর দৃষ্ট হয়। এই গুর্জ্জরেরা পরে হিন্দুসমাজভুক্ত হইয়া হিন্দুদেরই বর্ণাশ্রমধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। প্রকৃত পক্ষে রাজপুতদের ভিন্ন ভিন্ন শাখা হূণ, গুর্জ্জর ইত্যাদি বিদেশী জাতি হইতেই উৎপন্ন হইয়াছিল। হয়ত বা অল্প পরিমাণে দ্রাবিড় জাতিরও সংমিশ্রণ তাহাদের মধ্যে ছিল। কালক্রমে বিদেশী জাতিরা হিন্দু জাতিতে পরিণত হইয়াছিল এই পরিবর্ত্তিত হিন্দুজাতিই ভারতবর্ষের ইতিহাসে রাজপুত নামে প্রসিদ্ধ। ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা পরে তাহাদের উৎপত্তির বিষয়ে একটী মনোরঞ্জক পৌরাণিক উপাখ্যান রচনা করিয়াছিলেন। হয়ত বা বিদেশী হূণ গুর্জ্জরদিগকে হিন্দুসমাজভুক্ত করিবার জন্য সত্যই একটি বিরাট শুদ্ধিক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। রাজপুতদের যজ্ঞকুণ্ড হইতে উৎপত্তি বিষয়ে যে পৌরাণিক কথা প্রচলিত আছে তাহা হইতেই ইহা বুঝিতে পারা যায়।

প্রাচীন গুর্জ্জরদের দুইটি শাখা ছিল একটি শাখা গুপ্তসাম্রাজ্য ধ্বংসের কিছুকাল পরেই ভৃগুকচ্ছ বা আধুনিক বরোচ নামক স্থানে রাজ্যস্থাপন করিয়াছিল। এই বংশের **রাজা দদ্দ** দ্বিতীয় বলভীরাজ ধ্রুবসেন দ্বিতীয়কে সম্রাট হর্ষের বিরুদ্ধে আশ্রয় প্রদান করিয়াছিলেন। দদ্দ দ্বিতীয় ৬২৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। মনে হয় অষ্টম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে আরবজাতি কর্ত্তৃক এই রাজ্যটী ধ্বংস হইয়াছিল। গুর্জ্জরদের আর একটী শাখা সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে দক্ষিণ রাজপুতনায় ভীনমল নামক স্থানে একটি রাজ্যস্থাপন করিয়াছিল। এই শাখা পরে প্রতীহার নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। ইহাকে গুর্জ্জর প্রতীহার নামেও অভিহিত করা হয়। প্রতীহার বংশের প্রাচীনতম রাজার নাম নাগভট্ট। নাগভট্ট সিন্ধুদেশের আরবদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র কক্কুস্থ তাঁহার পর সিংহাসন অধিকরিয়াছিলেন। কক্কুস্থের পর তাহার ভ্রাতা দেবশক্তি রাজা হইয়াছিলেন। দেবশক্তিই এই বংশের প্রথম উল্লেখযোগ্য রাজা। দেবশক্তির পুত্র এবং উত্তরাধিকারী বৎসরাজ রাজপুতনার মরুস্থলের ভিন্ন ভিন্ন গুর্জ্জর উপজাতিগুলিকে একতাসূত্রে বন্ধন করিয়া উত্তরাপথের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজাদিগকে প্রবলভাবে আক্রমণ করিয়াছিলেন। ভীনমল হইতে অভিযান করিয়া তিনি কান্যকুব্জ জয় করিয়াছিলেন ও পরে বঙ্গ ও কোশলের রাজাদিগকে পরাজয় করিয়াছিলেন। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের প্রবল পরাক্রান্ত রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব বৎসরাজের বিজয়াভিযানকে প্রতিরোধ করিয়াছিলেন। তিনি বৎসরাজকে পরাজিত করিয়া তাঁহাকে মরুদেশে পলায়ন করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন ও তদনন্তর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র লাটাধিপ কর্করাজকে গুর্জ্জররাজের উপর লক্ষ্য রাখিতে আদেশ করিয়াছিলেন।

বৎসরাজ ৭৮৩ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। জৈন হরিবংশ পুরাণের পূর্ব্বোল্লিখিত শ্লোকে তাঁহাকে ইন্দ্রায়ুধ ও কৃষ্ণরাজের পুত্র রাজা বল্লভ অর্থাৎ রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুবের সমসাময়িক বলা হইয়াছে। বৎসরাজের পুত্র নাগভট্ট দ্বিতীয় এই সময়ে উত্তরা-পথের রাজনৈতিক ইতিহাসের একজন বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি। তিনি ইন্দ্রায়ুধকে আশ্রয় দিয়াছিলেন ও পরে পঞ্জাব ও রাজপুতনার গুর্জ্জরজাতির একটি সঙ্ঘ গঠন করিয়া তাহার সাহায্যে ধর্ম্মপাল ও তাঁহার আশ্রিত কান্যকুব্জরাজ চক্রায়ুধকে কান্যকুব্জ হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। তখন রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ ধর্ম্মপালের সহিত যোগদান করিয়া পুনরায় গুর্জ্জরদিগকে কান্যকুব্জ হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। নাগভট্ট ৮১০ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। তাঁহার পুত্র ও উত্তরাধিকারীর নাম রামভদ্র।

নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে গুর্জ্জরশক্তি **মিহির-ভোজের** নেতৃত্বে উত্তরাপথে অজেয় হইয়াছিল। মিহিরভোজ নাগভট্টের প্রপৌত্র। তাঁহার সাম্রাজ্য পশ্চিমে পঞ্জাবের কর্ণাল জেলা হইতে পূর্ব্বে উত্তরবঙ্গ পর্য্যন্ত ও উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে নেবাতট পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই বিশাল সাম্রাজ্য তিনি স্বীয় বাহুবলে গঠিত করিয়াছিলেন। মিহির-ভোজের সময় হইতেই ভারতে রাজপুত-শক্তির অভ্যুদয় হইয়াছিল। এই সময় সমগ্র ভারতবর্ষে তিনটি প্রধান রাজ্য ছিল। উত্তরে গুর্জ্জর প্রতীহার-দের রাজ্য, দক্ষিণে রাষ্ট্রকূটদের রাজ্য পূর্ব্বে পাল-বংশীয়দের রাজ্য। রাজা ভোজ দক্ষিণে রাষ্ট্রকূট-শক্তিকে খর্ব্ব করিয়াছিলেন। রাষ্ট্রকূটেরা গুর্জ্জরদের চিরশত্রু সিন্ধুদেশের আরবদের সাহায্য লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। গুর্জ্জরেরা ৮৬৭ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে কোনও সময়ে লাটদেশ অর্থাৎ গুজরাট আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু গুজরাটের রাষ্ট্রকূট রাজ প্রতিনিধি **ধ্রুব ধারাবর্ষ** তাহাদিগকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে পালরাজ্যের সীমান্তে গুর্জ্জর ও পালদের মধ্যে দীর্ঘকালস্থায়ী সংঘর্ষ চলিয়াছিল। অবশেষে পালেরা মুদ্গগিরি অর্থাৎ মুঙ্গেরের যুদ্ধে গুর্জ্জরদের হস্তে নিদারুণ ভাবে পরাজিত হইয়াছিলেন। রাজা ভোজ প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী (৮৪০—৮৯০) পর্য্যন্ত রাজ্য করিয়াছিলেন।

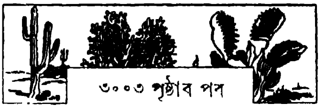
তাঁহার পুত্র মহেন্দ্রপালের রাজ্যকালে প্রতীহার সাম্রাজ্য কাঠিয়াবাড় হইতে মগধদেশ ও উত্তরবঙ্গ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বিখ্যাত কবি রাজশেখর মহেন্দ্রপালের গুরু ছিলেন। নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগে মহেন্দ্রপালের মৃত্যু হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রদের মধ্যে রাজ্যের অধিকার লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। প্রথমে ভোজরাজ (দ্বিতীয়) হৈহয়রাজ কোকাল্লের সাহায্যে সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। কিছু কাল পরেই মহীপাল প্রথম চন্দেলরাজ হর্ষের সাহায্যে তাহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছিলেন। মহীপাল বিশাল প্রতীহার সাম্রাজ্য স্বীয় শাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু নিরন্তর গৃহবিবাদের ফলে সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশ স্বাধীন হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। প্রথমেই গুজরাট দেশের চালুক্যরাজ ও মালবদেশের পরমররাজ স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন। এই সব কারণে প্রতীহার সাম্রাজ্যের শক্তি হ্রাস হইয়াছিল। এদিকে মহারাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় ইন্দ্রের বিজয়-বাহিনী ৯১৬ খৃষ্টাব্দে মহীপালকে পরাজয় করিয়া কান্যকুব্জ অধিকার করিয়াছিল। মহীপাল প্রয়াগাভিমুখে পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। এই প্রচণ্ড পরাজয়ের পরও সুরাষ্ট্র আরও কিছুকাল গুর্জ্জর রাষ্ট্রীয়দের অধীনে ছিল। মহীপাল চন্দেলাধিপতির সাহায্যে কান্যকুব্জ পুনরায় অধিকার করিয়াছিলেন। এই অবনতির সময়েও প্রতীহার রাজ্যশক্তি নিতান্ত হেয় ছিল না। ৯১৫—১৬ খৃষ্টাব্দে বুগদাদ নিবাসী **আলমসৌদী** নামক মুসলমান পর্য্যটক ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তিনি প্রতীহারদের বিশাল সাম্রাজ্য তাঁহাদের অসংখ্য সেনা ও দক্ষিণের রাষ্ট্রকূটরাজাদের সহিত চিরন্তন বিরোধের উল্লেখ করিয়াছেন। মহীপাল ৯৩১ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন।

মহীপালের পর তাঁহার ভ্রাতা বিনায়কপাল বা হেরম্বপাল রাজা হইয়াছিলেন। বিনায়কপালের পর মহীপালের পুত্রগণ, মহেন্দ্রপাল দ্বিতীয়, দেবপাল, মহীপাল দ্বিতীয় এবং বিজয়পাল পর পর রাজা হইয়াছিলেন। ইহারা সকলেই পিতার পর ২৪।২৫ বৎসরের মধ্যেই সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন।

বিজয়পাল ৯৬০ খৃষ্টাব্দে রাজ্য করিতেছিলেন। ইঁহার রাজ্যকালে বিশাল গুর্জ্জর প্রতীহার সাম্রাজ্য কান্যকুব্জের স্থানীয় রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। গুজরাটে চালুক্য মূলরাজ ৯৭৪ খৃষ্টাব্দে সাম্রাজ্য-সূচক পদবী গ্রহণ করিয়াছিলেন। জেজাকভুক্তি বা জিকৌটীর (বুন্দেলখণ্ডের) চন্দেলবংশীয় রাজগণ যশোবর্ম্মার সময় হইতেই রাজকীয় পদবী গ্রহণ করিয়াছিলেন। ডহাল (জব্বলপুরের নিকটবর্ত্তী প্রদেশ) প্রদেশের চেদিরাজগণ বহু পূর্ব্বেই স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন। বিজয়পাল দীর্ঘকাল রাজ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র রাজ্যপাল ১০১৮ খৃষ্টাব্দে কান্যকুব্জের সিংহাসনে আসীন ছিলেন। এই বৎসরে **সুলতান মহম্মদ গজনী** ভারত আক্রমণ করিয়া মথুরাপুরী ধ্বংস করিয়াছিলেন।

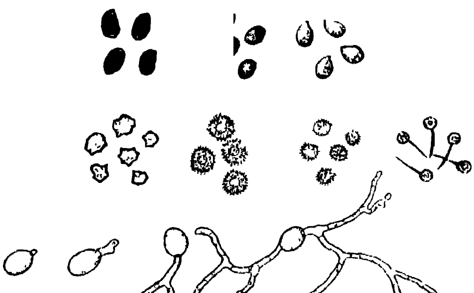


ব্যাঙের ছাতা



৩০০৩ পৃষ্ঠার পর

এগারিক্‌স বংশের ছত্রাককে সাধারণ কথায় বলা হয় ব্যাঙের ছাতা। ইহাদের কথা ছত্রাক গোত্রের পরিচয়ে তোমাদিগকে কিছু বলিয়াছি। ইহারা মৃতজীবী, সুতরাং পচা কাঠ, গোবর মাটি প্রভৃতি ইহাদের বাসস্থান।



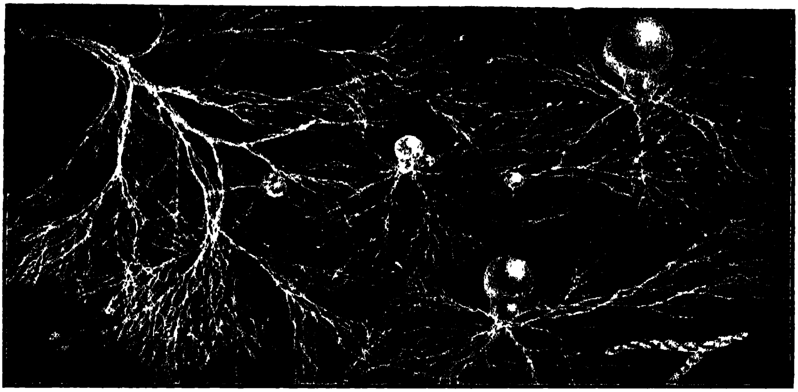
ব্যাঙের ছাতার নানারকম বীজরেণু, নীচে বীজরেণু হইতে অনুসূত্র বাহির হইয়াছে

বর্ষার সময় মাঠে ঘাটে, বনেজঙ্গলে, ভিজা জায়গায় ঘুরিলেই ইহাদের সন্ধান মিলিবে। উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইলেই ইহাদের বীজরেণু হইতে অনুসূত্র বাহির হইয়া চারিদিকে দেহ বিস্তার করে। তারপর যখন বংশ বিস্তারের প্রয়োজন অনুভব করে তখন ব্যাঙের ছাতার উৎপত্তি হয়। এই ব্যাঙের ছাতাই আমরা খালি চোখে দেখিতে পাই। সপুষ্পক গাছে যেমন ফুল ফোটে বীজ উৎপন্ন করিবার জন্য এগারিক্‌স ছত্রাকের দেহে তেমনই ব্যাঙের ছাতার উৎপত্তি হয় বীজরেণু ধারণ করিবার জন্য। সুতরাং ব্যাঙের ছাতা বলিতে আমরা যাহা বুঝি সেটা বীজরেণুস্থলী। ইহার কথাই আমরা আলোচনা করিব।

প্রথম অবস্থায় ইহার ডিম্বাকার দেহ একটি আবরণ দ্বারা সম্পূর্ণ ভাবে ঢাকা থাকে। এই আবরণকে **প্রাবর** বা **আবরক** (Volva) বলে। ছাতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই আবরণটি ছিঁড়িয়া যায়। উহার নীচের অংশ একটি বাটির মত অবস্থায় থাকে, উপরের অংশ টুকরা টুকরা হইয়া ছাতার টুপির উপর আঁইশের মত লাগিয়া থাকে।

এইবার ছাতাটি বড় হইয়াছে। এই অবস্থায় ইহার উপরের অংশ একটি ছাতা বা টুপির মত বিস্তৃত হয়। আর নীচের অংশ দণ্ডাকারে ছাতাটিকে বিস্তৃতভাবে ধবিয়া রাখে। দণ্ড ও ছাতা মিলিযা একটি সত্যিকাবেব ছাতার (umbrella) মত দেখিতে হয় বলিযা ইহাকে **ব্যাঙের ছাতা** বলা হয়। ব্যাঙেব সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই।

টুপিব তলদেশে মাছের কানকুয়াব মত পাতলা পাতলা বহু ফলক বা গিল (gills) দণ্ডটিকে ঘিরিয়া সাজান থাকে। ছাতাটি যখন আববকের বন্ধন ছিঁড়িয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়ায় তখন তাহার কোমল টুপিটি আর একটি আবরণ দিয়া ঢাকা থাকে। এই দ্বিতীয় আবরণটিকে **পরিধান** বলে। ছাতা যখন পরিণত হইয়া টুপিটি বিস্তার করে তখন এই আবরণটি ছিঁড়িয়া যায়, কিন্তু উহার নীচের অংশ দণ্ডটির সহিত বলযাকারে লাগান থাকে। এই বলয়াকারে সংলগ্ন অংশটিকে **অঙ্গুরীয়ক** (ring) বলে। গিলের উভয় পার্শ্বে অসংখ্য বীজরেণু (pores) উৎপন্ন হয়। সে গুলি ছড়াইয়া পড়িয়া সুযোগমত নূতন গাছে পরিণত হয়। গিল গুলি যে বীজরেণু বহন করে, তাহা তোমরা সহজেই পরীক্ষা করিতে পার।



ব্যাঙের ছাতার দেহ হইতে 'ব্যাঙের ছাতা' উৎপন্ন হইতেছে



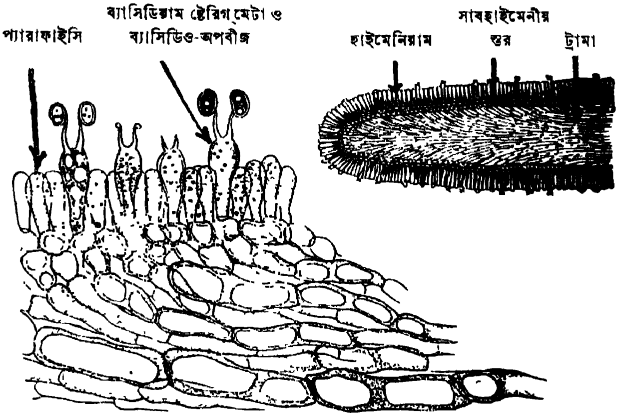
ব্যাঙের ছাতার ক্রম পরিণতি

দণ্ড ও টুপিব সংযোগস্থলে কাটিয়া টুপিটিকে বিস্তৃত ভাবে একখানি রঙ্গিন কাগজের উপর বসাইয়া রাখ, টুপির তলদেশ যেন কাগজেব সঙ্গে লাগান থাকে। কিছুক্ষণ পরে দেখিতে পাইবে কাগজের উপব বীজরেণু পতিত হইয়া ফলকগুলি যে ভাবে সজ্জিত থাকে ঠিক সেই ভাবে সজ্জিত হইয়াছে।

ব্যাঙের ছাতার অস্বাভাবিক রকম বৃদ্ধির কথা ছত্রাকের বংশ পরিচয়ে বলিয়াছি। কাল সন্ধ্যায় যেখানে কিছু ছিল না আজ সকালে সেখানে হয় তো দেখিবে, একটি প্রকাণ্ড ছাতা ফুটিয়া আছে। আবার সেই দিনই সন্ধ্যায় দেখিবে সেটা শুকাইয়া গিয়াছে।

তোমরা ভাবিতেছ ব্যাঙের ছাতা আবার আমাদের কি কাজে লাগে যে উহার সম্বন্ধে এত

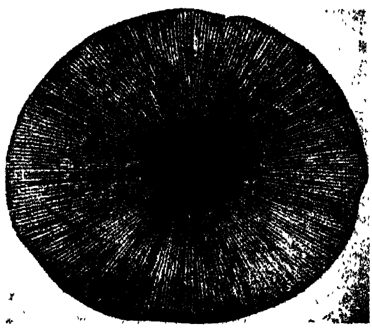
খবর জানিতে হইবে? আসলে কিন্তু সেটা ঠিক কথা না। ঔষধ ও খাদ্য হিসাবে ইহার ব্যবহার আমাদেরই দেশে ন্যূনপক্ষে আড়াই হাজার



ফলকের অনুপ্রস্থ খণ্ড

বৎসর আগে চিকিৎসা-শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছিল। আরও আশ্চর্য্যের কথা সুশ্রুতে ইহাদিগকে উদ্ভিদবর্গের অন্তর্গত করিয়া ইহাদের উৎপত্তিস্থান, গুণাগুণ সব বর্ণনা করা হইয়াছে। এই একটা উদাহরণ হইতে বুঝিতে পারিবে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বৈজ্ঞানিক অনুশীলনে সে যুগে, যখন অন্যান্য দেশ অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল তখন, কতখানি অগ্রসর হইয়াছিলেন।

তোমাদের নিকট স্বীকার করিতে আমার লজ্জা নাই ব্যাঙের ছাতা যে খাদ্য দ্রব্য হিসাবে ব্যবহার হয় তাহা আমি নিজে কয়েক বছর আগেও জানিতাম না। সেবার ঘাটশিলায় গিয়া দেখি বাজারে ব্যাঙের ছাতা 'ছাতু' নামে বিক্রয় হইতেছে। কলিকাতায় কিংবা বাঙ্গলা দেশের অন্যত্র হাটে বাজারে ইহাকে বিক্রয় হইতে বড় একটা দেখিতে পাইবে না, কিন্তু কলিকাতায় হগ সাহেবের বাজারে (Municipal-market) টিনে করা ব্যাঙের ছাতা কিনিতে পাইবে। গিরিডি, দেওঘর, মধুপুর অঞ্চলে ইহাদিগকে বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়। ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি সভ্য দেশে ব্যাঙের ছাতা উপাদেয় খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। চীন জাপান এ বিষয়ে ইউরোপ আমেরিকার পশ্চাদপদ নয়। ফরাসী দেশে, চীন ও জাপানে ব্যাঙের ছাতার চাষ হইয়া থাকে। দেশ ছাড়া বিদেশেও ইহার রপ্তানি বড় কম হয় না। ইহার চাষ ও ব্যবসায় অতিশয় লাভজনক। বিদেশে ইহাদের চাষের নমুনার একটি ছবি দেওয়া হইল। আমাদের দেশে কেহ ইহার চাষ করে না। বন জঙ্গল হইতে সংগ্রহ করিয়া বাজারে বিক্রয় করিতে আনে। কিন্তু ইহাতে ঘোরতর বিপদের আশঙ্কা আছে, কারণ সেখানে বিষাক্ত ছাতারও অভাব নাই রিপণ কলেজের উদ্ভিদ বিদ্যার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শচীন বাবু বিষাক্ত ও আহার্য্য



অসংখ্য অপবীজ কাগজের উপর পতিত হইয়া টুপির তলদেশের আকার ধারণ করিয়াছে

ছাতা চিনিবার উপায় মোটামুটি ভাবে যে ভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন এখানে তাহা লিখিলাম :—

১। যে ছাতার আকৃতি প্রকৃতি সম্বন্ধে জানা নাই তাহা কদাচ আহার করা উচিত নহে।

২। বিষাক্ত ছাতার দণ্ডের গোড়ায় **প্রাবর** থাকে, আহার্য্য ছাতার প্রাবর থাকে না। প্রাবর অনেক সময় মাটির নীচে থাকায়, ছাতা সংগ্রহ করিবার সময় উহা খুঁজিয়া দেখা উচিত।

৩। অধিকাংশ বিষাক্ত ছাতার দণ্ডের উপরি-ভাগে **অঙ্গুরীয়ক** থাকে, কিন্তু আহার্য্য ছাতার সাধারণতঃ অঙ্গুরীয়ক থাকে না। আহার্য্য ছাতা এগারিকসের অঙ্গুরীয়ক থাকিলেও প্রাবর একেবারেই থাকে না।

৭। শ্বেত ফলকযুক্ত, আঁইশযুক্ত বা ফাঁপা দণ্ডযুক্ত ছাতাও সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়।

৮। যে সকল ছাতা দেখিতে ভিজা, এবং যাহাদের টুপিগুলি ভাঙ্গিবার পর নীলবর্ণ হইয়া যায় সে গুলিও পরিত্যাগ করা উচিত।

বিষাক্ত ছাতার মধ্যে আমানিটা ছাতাই সাংঘাতিক। কিন্তু প্রকৃতির এমনই বিধান যে আমানিটা সাধারণতঃ দুর্গম বন বা জঙ্গলে জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু আহার্য্য ছাতা এগারিকস খোলা মাঠে



ব্যাঙের ছাতার

৪। বিষাক্ত ছাতা আমানিটার ফলকগুলি সাদা কিন্তু আহার্য্য ছাতা এগারিকস, এন্টোলোমা প্রভৃতির ফলক প্রথমে গোলাপী বর্ণের হইয়া থাকে।

৫। যে ছাতা টাটকা বা শক্ত নহে, পোকা-মাকড় পূর্ণ ও তীব্রগন্ধযুক্ত তাহা সকল সময় বর্জ্জনীয়।

৬। যে গুলি বিচিত্র বর্ণের ও যে সকল হইতে সাদা দুধের ন্যায় আঠা বাহির হয় তাহারাও পরিত্যজ্য।

প্রচুর রৌদ্র ও বাতাসে জন্মে। আমানিটা ফ্যালয়-ডিস নামক ছাতাকে **মৃত্যুদূত** (Death angel) বলা হয়। ভুল করিয়া খাইলে আর রক্ষা থাকে না। এ রকম অনেক দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে।

নিম্নে ব্যাঙের ছাতার কয়েক প্রকার খাদ্য প্রস্তুত প্রণালী লিখিয়া দিলাম। যদি তোমাদের খাইতে ইচ্ছা হয় তবে বিশ্বাসী ও দায়িত্বপূর্ণ লোকের দোকান হইতে ব্যাঙের ছাতা কিনিবে। আর সে হাঙ্গামা যদি পোহাইতে না চাও তবে কলিকাতার কোন বড় ইংরাজী হোটেলে কিংবা ভাল চীনা

হোটেলে গিয়া ব্যাঙের ছাতার 'ডিস' অর্ডার দিয়া খাইও।

ব্যাঙের ছাতার সূপ—ছাতাকে পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া চপের মাংসের মত কুচি কুচি করিয়া কাটিতে হইবে। তারপর সেই ছাতা উপযুক্ত পরিমাণ গরম ব্রথের সঙ্গে ২০ মিনিট আন্দাজ সিদ্ধ করিতে হইবে। মাখনের মধ্যে কিছু ময়দা ভাজিয়া সেই ময়দা আস্তে আস্তে সেই ব্রথে মিশাইতে হইবে। এইবার মরিচগুঁড়া লবণ প্রভৃতি মিশাইয়া লইলেই সুস্বাদু সূপ প্রস্তুত হইল। ইচ্ছা করিলে সমস্ত জিনিস ছাঁকিয়া লইয়া খাওয়া যাইতে পারে।

ব্যাঙের ছাতার ষ্টু পরিষ্কৃত ব্যাঙের ছাতা পাতলা পাতলা করিয়া কাটিয়া ষ্টু প্যানে কিছু মাখনের সহিত ঢাকনা চাপা দিয়া মিনিট দশেক সিদ্ধ করিতে হইবে। ইতিমধ্যে কিছু ময়দা জল কিংবা ঠাণ্ডা ব্রথে গুলিয়া তাহার সহিত খব কুচি কুচি করিয়া কাটা পারসলি কিংবা পালংশাক লুন ও মরিচগুঁড়া মিশাইয়া প্রস্তুত রাখিতে হইবে। দশ মিনিট পরে ষ্টু প্যানের ঢাকনা খুলিয়া এইগুলি ব্যাঙের ছাতার উপর ঢালিয়া দিয়া কয়েক মিনিট সিদ্ধ করিলেই ষ্টু প্রস্তুত হইল। টোষ্টের সঙ্গে কিংবা তরকারী হিসাবে ইহা খাওয়া যায়।

ব্যাঙের ছাতা ভাজা ও ডিম—ছাতাকে ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া মাখনে অল্প ভাজিয়া লইতে হইবে। একটি প্যানে ভাজা ছাতা লইয়া তাহার উপর উপযুক্ত পরিমাণে ডিম ভাঙ্গিয়া ছাড়িয়া দিয়া লবণ ও গুঁড়া মরিচ প্রভৃতি মিশাইতে হইবে। তাহার পর ঢাকনা দিয়া ঢাকিয়া প্যানটি গরম করিলেই ডিমের শ্বেতভাগ শক্ত হইয়া যাইবে। তখন নামাইয়া কাটিয়া কাটিয়া খাইয়া দেখিও কেমন লাগে।

ব্যাঙের ছাতার অমলেট—পূর্ব্বের মত ছাতাকে টুকরা টুকরা করিয়া ভাজিয়া লইতে হইবে। এইবার অমলেট তৈয়ারী করিবার মত করিয়া ডিমের কুসুম প্রভৃতি ফেটাইয়া তাহাতে লবণ ও মসলা মিশাইয়া লইতে হইবে। ভাজা ছাতা এই ডিমের উপরোক্ত ব্যসনে ডুবাইয়া ভাজিয়া খাইও এবং তাহার স্বাদ 'শিশু-ভারতী'র সম্পাদক মহাশয়কে লিখিয়া জানাইও।

ব্যাঙের ছাতা ভাজা ও টোষ্ট—আগের মতই মাখনে ব্যাঙের ছাতা ভাজিয়া লইতে হইবে, কিন্তু মাখন যেন বেশী না হয়। আর ছাতার জল যেন একেবারে শুকাইয়া যায়। বেশ করিয়া ভাজা ছাতায় লবণ মরিচ প্রভৃতি দরকার মত মিশাইয়া লইয়া গরম গরম টোষ্টের সহিত খাইতে অতি উপাদেয় মনে হইবে।

আর বেশী খাদ্য তালিকা ও তাহাদের প্রস্তুত প্রণালী দিলাম না, কি জানি লোভে পড়িয়া তোমরা কোন অনর্থ করিয়া ফেল।

ব্যাঙের ছাতার স্বাভাবিক বর্ণ লইয়া কয়েকখানি রঙ্গিন ছবি দেওয়া হইল। ছাতাগুলিকে তাহাদের বীজরেণুর বর্ণ হিসাবে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হইয়াছে, যথা—সাদা গোলাপী, পিঙ্গল বা বাদামী বেগুনি ও কাল। তোমরা একটি লেন্‌সের সাহায্যে সহজেই বীজরেণুর রং পরীক্ষা করিতে পার। ইহাদের সম্বন্ধে যদি কিছু জানিতে তোমাদের আগ্রহ হয় 'শিশু-ভারতী'র সম্পাদক মহাশয়কে লিখিয়া পাঠাইলেই তাহার ব্যবস্থা তিনি করিবেন।

ব্যাঙের ছাতা যে নানা রকমের হইয়া থাকে, সে কথা বোধ হয় এখন তোমরা বেশ ভাল করিয়াই বুঝিতে পারিলে।

যে ব্যাঙের ছাতা তোমরা যেখানে সেখানে আপনা হইতেই মাটির উপর মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখ, যাহাদিগকে তোমরা কোনরূপ আমল দিতেই চাহ না, তাহারাও যে বড় যে সে নয়, তাহারাও যে আশ্চর্য্য রকমের উদ্ভিদ এবং তাহারাও যে মানুষের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয় এইবার সে কথাটা বেশ ভাল ভাবেই জানিতে ও বুঝিতে পারিলে।—কাজেই এখন পথ চলিতে চলিতে ব্যাঙের ছাতা যদি চোখে পড়ে, তবে লক্ষ্য করিতে ভুলিও না!

যে ব্যাঙের ছাতাকে তোমরা পথ চলিতে চলিতে হয়ত পায়ের তলায় দলিয়া ফেল, সেই ব্যাঙের ছাতার দোষ ও গুণ যেমন অনেক কিছুই শুনিলে, তেমনি তাহার গুণের কথাও অনেক জানিতে পারিলে। অতএব ব্যাঙের ছাতাকে আর তুচ্ছ মনে করিও না। ছোটদের রূপকথার সঙ্গে ব্যাঙের ছাতার কতই না কাহিনী চলিয়া আসিতেছে। সে সব তোমরা এইবার যত্ন করিয়া সংগ্রহ করিও।



জল-খেলা

ডাঙ্গার মত জলেও নানারূপ খেলা করা যায়। ঐ ক্রীড়া (১) সাধারণ ও (২) প্রতিযোগিতামূলক এই দুই ভাগে বিভক্ত। এইখানে এইরূপ কয়েকটি জলখেলার কথা লিখিলাম।

চোর চোর

একজন আগাইয়া সাঁতার কাটিতে থাকিবে যে চোর হইবে সে তাহাকে তাড়া করিয়া ধরিবার চেষ্টা করিবে। অগ্রবর্ত্তী ব্যক্তি সময় সময় চোরকে ঠকাইবার নিমিত্ত জলে ডুব দিয়া, দিক্ পরিবর্ত্তন করিয়া লইবে। এইরূপ করিলে চোর সহজে তাহাকে ধরিতে পারিবে না। অগ্রবর্ত্তী ব্যক্তি ছোঁয়া পড়িলে সেই তখন চোর হইবে। এইরূপ ভাবে খেলিতে হয়।

সুড়ঙ্গ সাঁতার

চার হইতে আটজন পর্য্যন্ত এই খেলায় যোগদান করিতে পারে। খেলিবার সময় একজন ব্যতীত সকলকেই পা ফাঁক করিয়া পিছনে পিছনে একটু তফাতে তফাতে দাঁড়াইতে হইবে। সে, ঐসকল খেলোয়াড়ের পায়ের ফাঁক দিয়া ডুব সাঁতার দিয়া সম্মুখের খেলোয়াড়ের আগে গিয়া অপর সকলের মত পা ফাঁক করিয়া দাঁড়াইবে।

১৯৮৯ পৃষ্ঠার পর

আবার শেষের খেলোয়াড় পূর্ব্বের মত পায়ের ফাঁক দিয়া সন্তরণ করিয়া সকলের অগ্রে গিয়া পা ফাঁক করিয়া দাঁড়াইবে। এইভাবে সকলের পালা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত খেলা চলিতে থাকিবে।

প্রত্যেকবার সমগ্র দলটা আবশ্যক মত পিছু হটিয়া আগত বালকের জন্য স্থান করিয়া দিতে হইবে। ফলতঃ সমগ্র দলটি খেলা আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত একই নির্দ্দিষ্ট স্থান মধ্যে রহিবে।

প্রতিযোগিতামূলক জল-ক্রীড়া

ডাঙ্গার মত জলেও নানারূপ প্রতিযোগিতা-মূলক ক্রীড়া করা যায়। এইরূপ প্রতিযোগিতা-মূলক কতক গুলি ক্রীড়া-প্রণালী নিম্নে বর্ণিত হইল।

বল ও চামচা সহ সন্তরণ

এই ক্রীড়া আরম্ভ করিবার সময় বড় চামচের উপর রবারের ছোট বল দিয়া তাহা দাঁতে ধরিয়া সাঁতার দিয়া যাইতে হইবে। সঙ্কেত দিবামাত্র নির্দ্দিষ্ট স্থানে এই বলসহ চামচা দাঁতে ধরিয়া যে অগ্রে পৌঁছাইতে পারিবে তাহারই জিৎ হইবে।

পথিমধ্যে যাহাদের চামচ হইতে বল পড়িয়া যাইবে অনুপযুক্ত বলিয়া তাহাদের নাম গণনা করা

হইবে। যতজন ইচ্ছা, এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পরে।

বিপন্ন উদ্ধারের প্রতিযোগিতা

এই ক্রীড়া করিবার সময় দুইজন করিয়া জোড় বাঁধিতে হয়। একজন নিষ্ক্রিয় ভাবে ভাসিয়া রহিবে এবং অপর ব্যক্তি তাহাকে টানিয়া লইয়া যাইবে। এইভাবে যত জোড়া ইচ্ছা, প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পারে। নিষ্ক্রিয় ব্যক্তিকে বিপন্ন মনে করিয়া তাহাকে উদ্ধার করার ছলে এই খেলা অভ্যাস করিতে হয়।

সঙ্কেত পাইবামাত্র, একজন আর একজনকে যে কোন প্রকারে টানিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইতে পারিবে তাহারই জিৎ হইবে।

তিন পায়ে সাঁতার

দুইজন দুইজন করিয়া জোড় হইতে হইবে। খেলার নিয়ম হইতেছে- দুই দুইজনে ঠিক পাশাপাশি গায়ে লাগিয়া সন্তরণ করিতে হইবে। সন্তরণ করিবার সময় প্রতিযোগীদের একজনের ভিতরদিককার পা, তাহার জুড়িদারের ভিতর দিককার পায়ের সহিত বাঁধিয়া দেওয়া হইবে।

আরম্ভ করিবার সঙ্কেত দিবা মাত্র এইভাবে যে জোড়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে অগ্রে পৌছাইতে পারিবে সেই জোড়ারই জিৎ হইবে।

ছাতা হাতে অন্ধসাথীকে টানা

এই খেলায় দুইজন দুইজন করিয়া এক একটা জোড় হইতে হইবে। ইহাদের মধ্যে একজন চোখ বাঁধা অবস্থায় নিষ্ক্রিয় ভাবে ভাসিয়া রহিবে। অপর ব্যক্তি, একহাতে ছাতা ধরিয়া ও অপর হাতে তাহার তথাকথিত অন্ধ-সাথীকে ধরিয়া লইয়া যাইবে। ফলতঃ ইহার একহাতে ছাতা ও অপর হাতে অন্ধের হাত সুতরাং দুই হাতই বন্ধ বলিয়া তাহাকে কেবল মাত্র পায়ের সাহায্যেই সন্তরণ করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে।

আরম্ভ করিবার সঙ্কেত দিবামাত্র, যে জোড় পূর্ব্বোক্ত ভাবে অগ্রসর হইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে সর্ব্বাগ্রে পৌছাইতে পারিবে, সেই জোড়েরই জিৎ হইবে।

আপেল রেস

পুকুরের কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে দুই খুঁটির মধ্যে দড়ি বাঁধিয়া জলের ঠিক উপরে প্রতিযোগীদের সংখ্যা অনুযায়ী আপেল ফল ঝোলান থাকিবে। সঙ্কেত দিবা মাত্র, প্রতিযোগিগণকে দৌড়িয়া গিয়া কেবল মুখ দিয়া ঐ আপেল লইয়া আসিতে হইবে। হাতের কোন সাহায্য পাইবে না। যে পূর্ব্ব নির্দ্দেশ মত আপেল লইয়া আসিতে পারিবে, তাহারই জিৎ হইবে।

বাধা অতিক্রম করিয়া সন্তরণ

জল পথের মধ্যে বাঁশ, দড়ি, চাকা, পিপা, কাঠের গুড়ি, বেড়া প্রভৃতি বাধা দিবার নানা রকম দ্রব্যাদি সাজাইয়া রাখা হইবে। নির্দ্দেশ মত প্রতিযোগীদিগকে ঐ সমস্ত দ্রব্যাদি কোনটার উপর চড়িয়া কোনটার ভিতর ঢুকিয়া, আবার কোনটার তলদেশের দিকে যাইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌছাইতে হইবে।

সঙ্কেত দিবামাত্র, যথারীতি অগ্রসর হইয়া যে সর্ব্বাগ্রে নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌছাইতে পারিবে, তাহারই জিৎ হইবে।

এক সঙ্গে দুইজনের উদ্ধার

এই খেলায় চারজন, চারজন করিয়া এক একটা দল বাঁধিতে হয়। ইহার মধ্যে, একজন হাল্কা ওজনের এবং ছোট আকারের বালক হওয়া আবশ্যক।

দুইজন সন্তরণপটু ব্যক্তি পিছনে পিছনে বুকে ভর দিয়া সন্তরণ করিবার কৌশলে অগ্রসর হইতে থাকিবে। এই দুইজনের মধ্যে একজন সম্মুখের সন্তরণকারীর স্কন্ধের উপরে তাহার দুইহাত রাখিবে। আর তাহার পদদ্বয় পশ্চাৎ সন্তরণকারীর স্কন্ধের উপরে রাখিবে। এই মধ্য ব্যক্তির পিঠের উপর সেই ছোট ছেলেটিকে ঘোড়া চড়ার মত চড়াইতে হইবে। সম্মুখ ও পশ্চাতের ব্যক্তি মধ্যের দুইজনকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে হইবে।

এই ভাবে একসঙ্গে দুইজন ব্যক্তির উদ্ধারকার্য্য সাধিত হইতে পারে!

জল-পোলো

জল পোলো খেলিবার বলের আকৃতি ঠিক ফুটবলের মত। এই খেলায় গোলরক্ষক ব্যতীত, কেহই দুই হাতে বল ধরিতে পারিবে না। যতক্ষণ খেলা চলিবে, ততক্ষণ সর্ব্বদাই সন্তরণ করিয়া এই জল পোলো খেলিতে হয়।

বল ধরিবার সময় অঙ্গুলি ফাঁক করিয়া ও হাত মাথার উপরে তুলিয়া এবং কাঁধ উঁচু করিয়া বল ধরিতে হয়। বল নিক্ষেপ করিবার সময় হাত সরাইয়া ও সোজা করিয়া ছুঁড়িতে হয়। বল নিক্ষেপ করিবার সময় জলের ভিতরে যত শরীর ডুবিয়া থাকে, ততই ভাল। কারণ ইহাতে বল ছুঁড়িবার যথেষ্ট সাহায্য হয়। অর্থাৎ বেশী জোরে নিক্ষেপ করিতে পারা যায়।

খেলা ঠিক মত হইতেছে কিনা এবং তাহার ফলাফল জানাইবার জন্য উপযুক্ত লোক নিযুক্ত করিতে হয় তাহার নাম 'রেফারি'। এই রেফারী খেলার সন্নিকট তীরে দাঁড়াইয়া খেলোয়াড়দের ত্রুটী এবং কোন দলের হার বা জিৎ হয়, তাহা লক্ষ্য করিবেন। ইহা খেলিতে গেলে এক একদলে ৭ জন করিয়া ১৪ জন খেলোয়াড়ের দরকার হয়। তাহার মধ্যে সাধারণতঃ ৩ জন ফরওয়ার্ডে ২ জন হাফ্‌ব্যাকে ১ জন ফুলব্যাকে ও ১ জন গোলে খেলিয়া থাকে।

জল পোলো খেলিবার সীমা—দৈর্ঘ্যে একগোল হইতে অপর গোল ১৯ হইতে ২০ গজ এবং প্রস্থে ২০ গজের বেশী হইবে না। গোলের সীমা ২ গজ, গোল লাইন হইতে ৪ গজ দূরে, পেনাল্টি লাইন এবং মধ্য লাইন ইত্যাদি খেলিবার যায়গার নিকটবর্ত্তী তীরে দাগ দিয়া চিহ্ন করিয়া রাখিতে হইবে।

খেলিবার যায়গায় জলের গভীরতা তিনফুটেরও বেশী থাকা আবশ্যক।

দুই গোল-পোষ্টের ব্যবধান—১০ফুট রাখিতে হইবে। ক্রসবার (গোলপোষ্টের মাথার বার) জলের উপরি ভাগ হইতে তিনফুট উচ্চে অবস্থিত থাকিবে।

এই খেলায় একজন 'রেফারী' একজন সময়রক্ষক ও দুইজন গোল চেকারার রাখিতে হইবে।

রেফারীর কার্য্য—খেলা আরম্ভ করা, অন্যায় খেলা বন্ধ করা, খেলার বিষয় বিচার করা গোল-'কর্ণার থ্রো' কিংবা 'গোল থ্রো' প্রভৃতি হইলে জানাইয়া দেওয়া।

রেফারীর বিচার নির্ব্বিচারে মানিয়া লইতে হইবে।

সময়রক্ষকের কার্য্য—ষ্টপ্ ওয়াচ্ লইয়া বসিয়া থাকা। সে কেবল মধ্য সময় এবং পূর্ণ সময় বা শেষ খেলা হইলে বাঁশী বাজাইয়া জানাইয়া দিবে।

গোল স্কোরারের কার্য্য—গোল লাইনের নিকট দাঁড়াইয়া ঠিক গোল হইয়াছে কি না তাহা পতাকা দ্বারা সঙ্কেত করিয়া জানাইয়া দিবে। এই খেলা ৭।+৭। ১৫ মিনিট ধরিয়া হয়। এই খেলার মধ্য সময়ে তিন মিনিট সময় বিশ্রাম করিবার জন্য দেওয়া হয়। মধ্য সময় অতিবাহিত হইয়া গেলে পর দুই দলকেই দিক পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। খেলিতে খেলিতে বল সীমার বাহিরে চলিয়া যাওয়া প্রভৃতি যে সময় নষ্ট হয় তাহা বাদ দেওয়া হয়। এই খেলায় প্রত্যেক দলে ৭ জন করিয়া খেলোয়াড় থাকিবে।

খেলা আরম্ভ করিবার সঙ্কেত দিবার সময় খেলোয়াড়গণ আপন আপন গোল লাইনের মধ্যে সারি হইয়া থাকিবে। মধ্য লাইনের মধ্যে বল নিক্ষেপ করিয়া দিলে পর, খেলোয়াড়গণ আসিয়া বিপক্ষদলকে গোল দিবার জন্য যথাসাধ্য কৌশলের সহিত খেলিতে থাকিবে। গোল-পোষ্টের ক্রশ-বারের নীচের দিকে বল সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করিয়া গেলেই 'গোল' হইল বলিয়া ধার্য্য হইবে অন্যথায় নহে।

পোলো খেলিতে হইলে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি মানিয়া চলিতে হইবে। নতুবা খেলা ঠিকমত হইল বলিয়া গণনা করা হইবে না।

১। গোলরক্ষক ব্যতীত বল এককালে দুই হাত দিয়া ছুইতে পারিবে না।

২। খেলা চলিতে থাকিবার সময় গোল-পোষ্ট, জাল, খুঁটী, কিংবা কোন জিনিষ নাড়িতে পারিবে না।

৩। বিশ্রামের নির্দ্দিষ্ট সময় ব্যতীত খেলিবার সময় ভূমি স্পর্শ করিতে পারিবে না।

৪। গোল রক্ষক, গোল লাইন হইতে ৪ গজ বেশী দূরে সম্মুখে অগ্রসর হইতে পারিবে না। মধ্য লাইনের বেশী দূরে বল নিক্ষেপ করিতে পারিবে না।

৫। 'রেফারী' বল নিক্ষেপ করিলে, জলে না পড়া পর্য্যন্ত বল নাড়িতে পারিবে না।

৬। 'রেফারী' বাঁশী বাজাইবার পূর্ব্বে খেলোয়াড়গণ খেলিবার জন্য অগ্রসর হইতে পারিবে না।

৭। হাত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া বলে ধাক্কা দিতে পারিবে না।

৮। খেলিবার সময় বিপক্ষদলের কোনও খেলোয়াড়ের মুখে ইচ্ছা করিয়া জলের ছিটা দেওয়া, ধাক্কা দেওয়া প্রভৃতি করিতে পারিবে না।

৯। প্রত্যেক নিয়মভঙ্গের জন্য, যে স্থানে নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছিল, সেইস্থান হইতে বিপক্ষদল বাধাহীন বল নিক্ষেপ (ফ্রি-থ্রো) করিবে। যে স্থানে নিয়ম ভঙ্গ হইয়াছিল, সেই স্থানের নিকটস্থ বালকই কেবল বাধাহীন বল নিক্ষেপ করিবে। অপর খেলোয়াড়গণ নিজ স্থানেই রহিবে। একই সময়ে যদি দুই জনেরই নিয়মভঙ্গ হয় এবং কোন দলের নিয়মভঙ্গ হইয়াছে নির্ণয় করা কঠিন হয়, তাহা হইলে রেফারী জল হইতে বল তুলিয়া লইবে এবং যেখানে নিয়মভঙ্গ হইয়াছিল, সেই স্থানে বল নিক্ষেপ করিয়া দিবে। বল এরূপ ভাবে নিক্ষেপ করিবে, যাহাতে দুই দলেই খেলিতে সুবিধা পায়।

১০। গোল-রক্ষক কেবল গোল রক্ষা করিবে। সে মধ্য লাইন পার করিয়া বল নিক্ষেপ করিতে পারিবে না।

১১। গোল-লাইন হইতে চারগজের ভিতরে নিয়মভঙ্গ করিলে, ক্ষতিপূরণের দণ্ড স্বরূপ গোলের সন্নিকটস্থ নির্দ্দিষ্টস্থান হইতে বাধাহীন বল পেনাল্টী-থ্রো করিতে হইবে।

১২। কোন খেলোয়াড় যদি নিজের গোল-লাইনের ভিতর দিকে বল চাপাইয়া দেয়, তাহা হইলে 'ফ্রি কর্ণার থ্রো' বলিয়া গণ্য হইবে।

১৩। বল গোল পোষ্টে লাগিয়া কিংবা ক্রশ-বারে লাগিয়া ফিরিয়া আসিলে, সেই বল লইয়া খেলা চলিতে থাকিবে। খেলা থামিবে না এবং ইহা নিয়মভঙ্গ বলিয়া গণ্য হইবে না।

১৪। গোল ও কর্ণার থ্রো এর ফুটবল সমিতির নিয়মানুযায়ী কার্য্য হইবে।

ভেলা প্রতিযোগিতা বা বাচ্ খেলা

নৌকার দাড়টানা একটা চমৎকার শ্রমসাধ্য ব্যায়াম। ইহাতে শরীরের মাংসপেশী বলিষ্ঠ হয়। ইহার দ্বারা একাগ্রতা ও একসঙ্গে কাজ করার শিক্ষা লাভ হয় ও অভ্যাস জন্মে।

আটজন প্রতিযোগী যখন একই সঙ্গে কোনরূপ ভুল ত্রুটী না করিয়া, ঠিক কলের মত দাড় টানিয়া চলে তখন তাহারা যে একটা নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুবর্ত্তন করিয়া সমবেত ভাবে প্রাণপণে সমভাবেই দ্রুত অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছে এ কথা আর কেহ অস্বীকার করিতে পারে না।

দাড়টানার প্রতিযোগিতা করিবার সময় এক একটা সরু লম্বা নৌকায় আটজন করিয়া প্রতিযোগী বসে। তাহার পর, সঙ্কেত দিবামাত্র প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। যাহাদের দল দাড় টানিয়া তাহাদের নৌকা নির্দ্দিষ্ট স্থানে আগে পৌছাইতে পারিবে, তাহাদেরই জিত হইবে। এইরূপ দাড়টানা খেলাকে ভেলা প্রতিযোগিতা বা বাচ্ খেলা বলে।

প্রতিযোগিতার সময় প্রত্যেক প্রতিযোগীকে প্রাণপণে ঠিক একই সময়ে একাগ্রমনে দাড় টানিয়া চলিতে হয়। একটুক অন্যমনস্ক হইলে তৎক্ষণাৎ সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়। দাঁড় সম্মুখ দিকে ডুবাইয়া জলের ভিতর পিছন দিকে ধাক্কা দিলেই অগ্রসর হওয়া যায়। যাহারা বেশী জোরে ধাক্কা দিতে পারিবে তাহাদেরই নৌকা দ্রুত অগ্রসর হইতে থাকিবে।

জল খেলার প্রচলন আজকাল আমাদের দেশে খুব হইয়াছে। কেবল যে সহরে, তাহাই নহে। বর্ত্তমান সময়ে এইসব খেলার প্রতিযোগিতা গ্রামে গ্রামে ও প্রচারিত হইয়াছে। এবং এই সব খেলা দেখিবার জন্য বহু দর্শকেরও সমাবেশ হইয়া থাকে। আনন্দের জন্য, স্বাস্থ্যের জন্যও সন্তরণ সম্বন্ধে নিপুণতালাভের জন্য এই সব খেলা ধূলা বিশেষ প্রয়োজনীয়।



তিনটি পাতিহাঁস


২৯৮ পৃষ্ঠার পর

তিনটি পাতিহাঁস এক মাঠে বাস করিত। তারা বড় একটা নিশ্চিন্ত ছিল না বড় অশান্তিতে তাদের দিন কাটিতে ছিল। কেননা হাঁস তিনটি যেখানে বাস করিত, তারি কাছাকাছি ছোট একটি জঙ্গলের মধ্যে এক ধূর্ত্ত শেয়াল বাস করিত। এইজন্য তাহাদের মনে সর্ব্বদা এই ভয় ছিল, বুঝি বা কখন শেয়াল মহাশয় আসিয়া তাহাদের তিনজনকে ভোজে লাগাইয়া দেন।

একদিন হাঁসেদের বড় বোনটি বলিল,—'এস আমরা একটি ছোট ঘর তৈরী করে তাতে বাস করি, তাহলে আর আমাদের কোন ভয় থাকবে না।'

অন্য দু'টি বোন ও এ প্রস্তাবে সম্মতি জানাইল। ঘর তৈরী করিতে হইলে ত সাজ-সরঞ্জাম চাই। সেই সব সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করিতে তাহারা তিনজনে বাহির হইয়া পড়িল।

পথে বাহির হইবা মাত্রই তাহাদের সঙ্গে একজন মানুষের দেখা হইল। তাহারা সেই মানুষকে কহিল 'ওহে! আমাদের কাছে কিছু খড় কুটো বিক্রি করতে পার?' লোকটি হাসিয়া কহিল 'তোমরা খড়-কুটো দিয়ে কি করবে?'

'আমরা একখানি ছোট ঘর তৈরী করবো।'

'বেশ কথা। আমি তোমাদের খড় দিচ্ছি।'

হাঁসেরা ঐ লোকটির কাছ হইতে খড় পাইয়া তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া এক সবুজ ঘাসে-ভরা বড় মাঠের মধ্যে যাইয়া সুন্দর একটি ছোট ঘর খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তৈরী করিয়া ফেলিল।

ঘর তৈরী হইলে পর বড় বোন্ কহিল—'আচ্ছা এবার ঘরের ভিতর ঢুকে দেখা যাক। আমাদের তিনজনের থাকবার মত যায়গা হল কি না?'—এ কথা বলিয়া বড় বোন্ ঘরের ভিতর ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

ছোট বোনেরা যখন দরজায় ঘা দিয়া বলিল—"দিদি ও দিদি, দরজা খোল আমরাও ঢুকবো যে।" তখন বড় হাঁসটি দরজার ভিতর হইতে কহিল—"এখানে যায়গা কোথায়? একজনেরই যায়গা হচ্চে না, আবার তোরা আসতে চাইছিস্?—যা—যা—যায়গা হবে না!"

ছোট দু'টি বোন্ পড়িল মহাবিপদে। কি যে তারা করিবে তাহার কোন একটা কূল-কিনারা করিতে পারিল না। তারা দুই জনে মহা গোরগোল ও চেঁচামিচি করিয়া মাঠের এধারে ওধারে ছুটাছুটি

করিতে লাগিল! তাদের এত চেঁচামিচিও যে শেয়াল মহাশয়ের কানে যাইয়া পৌঁছায় নাই, ইহা তাহাদের বিশেষ ভাগ্যের কথা বলিতে হইবে বই কি!

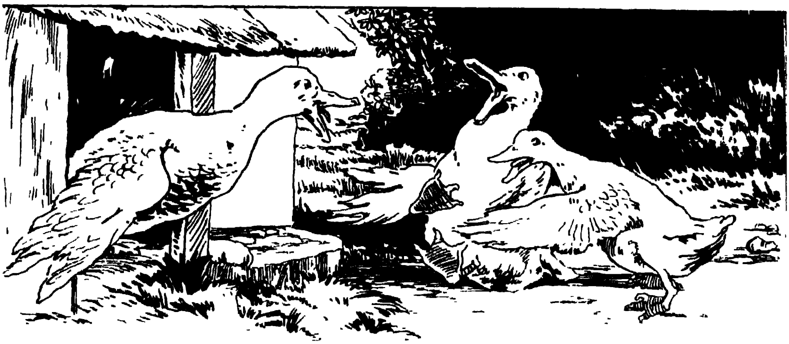
তখন তারা আর কি করে, নিরুপায় হইয়া যে লোকটি খড় দিয়াছিল তাহার নিকট গিয়া আবার খড় চাহিতেই সে কহিল—'আবার খড় চাইছ কেন? এই না সেদিন তোমাদের খড় দিয়েছি।'

দুই বোনে তখন যেমন যেমন ঘটিয়াছিল, সেসব কথা বলিল।

খোলনা ভাই। আমাকে আর কতক্ষণ বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখবে, ভিতরে ঢুকতে দাও।'

বড় বোনের মত মেজবোন্ও প্যাক্ প্যাক্ করিয়া কহিল—যা—যা—এখান থেকে পালা! আমার একলা থাকবারই ঠাঁই নেই, আবার তোকে ঠাঁই দেব কোত্থেকে?

ছোট হাঁসটি আবার চেঁচামিচি করিয়া সারা মাঠটা একেবারে তোলপাড় করিয়া ফেলিল। সে মাঠের এদিকে ওদিকে চারিদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। কে জানে শেয়াল মশায় এসব



যা—যা—যাঃ!!

লোকটি তাহাদের কথা শুনিয়া এইবারও তাহাদের দুইজনের থাকিবার মত ছোট একটি ঘর করিবার মত খড় দিল।

তারা দুইজনে এইবার বেশ যত্ন করিয়া আবার ছোট একটি ঘর তৈরী করিল। এবার তারা বেশ একটু বড় করিয়াই ঘর তৈয়ারী করিয়াছিল। ঘর তৈরী হইলে পর মেজ বোন্ ছোট বোন্কে কহিল—'আমি একবার ঘরের ভিতর গিয়ে দেখি ঘরটি কেমন হয়েছে, তোমার কোন ভয় নেই, আমি বড়দিদির মত তোমায় তাড়িয়ে দিব না।'

ছোট হাঁসটি বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল। অনেকটা সময় কাটিয়া গেল। মেজ বোনের কিন্তু আর কোন সাড়াই নেই! তখন সে ব্যাকুল হইয়া ল—দিদি!—ও দিদি! দরজাটা একবার

শুনিয়াছিলেন কিনা! কিন্তু আশ্চর্যের কথা যে এত সুযোগ পাইয়াও তিনি কিন্তু এ দিকে আসিলেন না!

এমন সময়ে সে পথে একজন কৃষক যাইতেছিল। সে ছিল বড় দয়ালু স্বভাবের লোক। সে ছোট, অতি সুন্দর হাঁসটাকে এইরূপ বিপন্ন অবস্থায় ছুটাছুটি করিতে দেখিয়া বলিল কি হয়েছে তোমার? এত কাঁদছো কেন?

তখন হাঁসটি তাহার সব দুঃখের কথা কৃষকের কাছে বলিল।

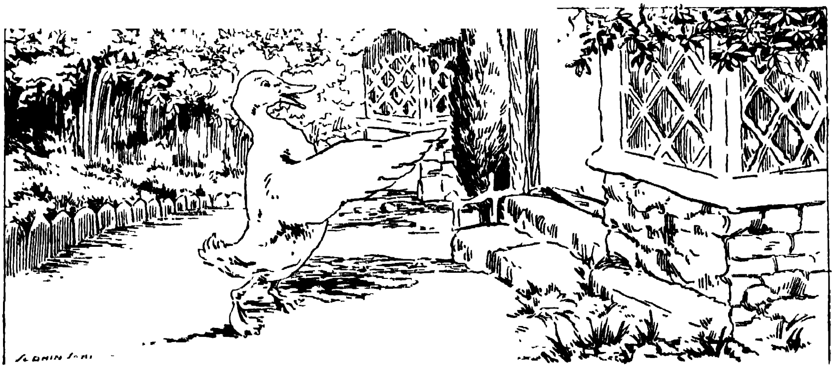
চাষা বলিল,—'কেঁদনা বাছা! আমি তোমার জন্য একটা অতি সুন্দর ছোট মজবুত ঘর তৈয়ারী করে দিব, কোন ভাবনা নেই তোমার।

সেই চাষা ইট, পাথর, কাঠ সব জোগাড় করিয়া একটা অতি সুন্দর ছোট বাড়ী তৈরী করিল। বাড়ীর দরজা জানালা, সব হইল অতি চমৎকার! সুধু কি তাই? একটি ছোট বাগান এবং বাড়ীর চারিদিক ঘিরিয়া বেশ ছোট দেয়াল ও তৈরী করিয়া দেওয়ায় বাড়িটি হইল দেখিতে অতি চমৎকার।

ছোট হাঁস ঘরের ভিতর যাইয়া নিরাপদে দরজা বন্ধ করিয়া রহিল। এখন আর তাহার কিসের ভয়?

এইবার সে আসিল ছোট হাঁসটির বাড়ী। এ ত আর খেলার ঘর নয়, এযে সত্যিকার বাড়ী। ইট পাথরে তৈরী, কাজেই শেয়াল মহারাজ একটু ভাবনায় পড়িলেন। তিনি আস্তে আস্তে জানালায় ধাক্কা দিতে সুরু করিলেন—ঠক্ ঠক ঠক! ছোট হাঁস ভিতর হইতে জানালায় আওয়াজ পাইয়া কহিল—'ভাল মানুষটির মত কে গো তুমি?' শেয়াল মহাশয় ঢোক গিলিয়া বলিলেন—'আমিগো আমি। দরজাটা একবার খুলে দাও না লক্ষ্মীটি!'

'সে হবে না।'



কি চমৎকার বাড়ীটি!

সেদিন দুপুর রাতে শৃগাল মহারাজ, শিকারে বাহির হইলেন। থপ্ থপ্ থপ্! তার পায়ের শব্দ, নিশুতি রাতে শোনা গেল!

হুঁ হুঁ প্যাক প্যাক প্যাক্—এই যে হাঁসের গায়ের গন্ধ পাওয়া যাইতেছে! কাছেই বুঝি, আছে, ঠিক তাই। সামনেই সে দেখিতে পাইল—যে ছোট একটি খড়ো ঘর। আস্তে আস্তে সে দরোজার ফাঁক দিয়া নাকটি ঢুকাইয়া দিল। বুঝিল হাঁ, তার অনুমান সত্য, সত্য সত্যই সেখানে একটা হাঁস ঘর বাঁধিয়াছেন। সে ঘর আর কতক্ষণ টিকে। বাপাৎ করিয়া ঘরটি পড়িয়া গেল—সঙ্গে সঙ্গে বড় হাঁসটিকে শিয়াল মহাশয় ক্ষুধার তাড়নায় একেবারে গিলিয়া ফেলিলেন!

বড় বোনের যে দশা ঘটিল, মেজ বোনেরও সেই দশাই হইল।

ছোট হাঁস একথা বলিয়া চুপ্ করিয়া রহিল। শেয়াল বুঝিলেন—মহা বিপদ! তখন আস্তে আস্তে দরজার কড়াটা নাড়া দিতে দিতে বলিলেন—'তা ভাই, তুমি ভয় কর কেন? আমাদের দু'জনার মধ্যে কি বেশ একটু ভাব হ'তে পারে না? দু'জনে একসঙ্গে থাকবো, খাওয়া দাওয়া করবো,—কি বল? আমি বাইরে যাবো,—জিনিষ পত্র কিনে নিয়ে আসবো, তুমি রান্না করবে, তারপর—বুঝলে খাবার দু'জনে একসঙ্গে বসে খাব!'

ছোট হাঁস কহিল—'তা বেশ, আমি রান্না করতেও খুব পারি।'

শেয়াল মশায় তখন থপ্ থপ্ করিতে করিতে বাহির হইলেন সদায় করিতে। সামনেই ছিল মুদির দোকান। সেখান হইতে নানা খাবার জিনিষ কিনিয়া আনিয়া ছোট হাঁসটির বাড়ীর দরজায়

ঘা দিতে দিতে কহিল—'দরজা খোল, আমি দোকান হ'তে সব খাবার জিনিষ কিনে নিয়ে এসেছি।' ছোট হাঁস কিন্তু দরজা খুলিল না। সে বলিল—'জিনিষ কিনে এনেছ, বেশ, এক কাজ কর, ঐ জানালার কাছে রেখে দাও।'

শিয়াল মহারাজ নিরুপায় হইয়া তাহাই করিলেন। ছোট হাঁসটি খানিক পরে যখন দেখিতে পাইল ও বুঝিতে পারিল যে ধূর্ত্ত শিয়াল সত্য সত্যই চলিয়া গিয়াছে, তখন সে নিমেষের মধ্যে জানালা খুলিয়া সব জিনিষপত্র ঘরে আনিয়া ফেলিল এবং চমৎকার ভাবে খাবার তৈয়ারী করিল।

বাহির হইয়া ঘরের ভিতর আসিয়া ছিট্‌কাইয়া পড়িল। শিয়াল মহারাজের এমন ক্ষুধা পাইয়াছিল যে তাহাদের চিবাইয়া খাইবার আর সুযোগ হয় নাই। কাজেই তারা দুই জনেই শিয়ালের পেটের ভিতর যাইয়াও মরে নাই। ছোট বোন্ বড় দুই বোন্‌কে ক্ষমা করিল এবং ঐ সুন্দর মজবুত পাকা বাড়ীতে তাহাদের আশ্রয় দিল।

আর শেয়াল মহারাজ? তারপর কি করিল, সে কথা নাইবা শুনিলে!

কেমন সুন্দর গল্পটি বল ত? এই গল্প হইতে তোমরা একটা বিষয় বেশ শিখিলে! মানুষ যখন



দরজাটা একবার খুলে দাও না লক্ষ্মীটি!

খানিক পরে শিয়াল মহারাজ আসিয়া বলিল—'খাবার হয়েছে ত?'

ছোট হাঁস ঘরের মধ্য হইতে কহিল—'না গো না! এখনও হয় নি।'

শিয়াল আবার খানিকটা ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়া কহিল—'কি ভাই, খাবার কতদূর?—ক্ষুধার জ্বালায় তার জিভ দিয়ে লালা ঝরিতেছিল।

'রান্না হয়েছে, তবে বড্ড গরম।'

'তা বেশ, আমি ঘরের ভিতর এসে ফুঁ দিয়ে ঠাণ্ডা করে নেব।'

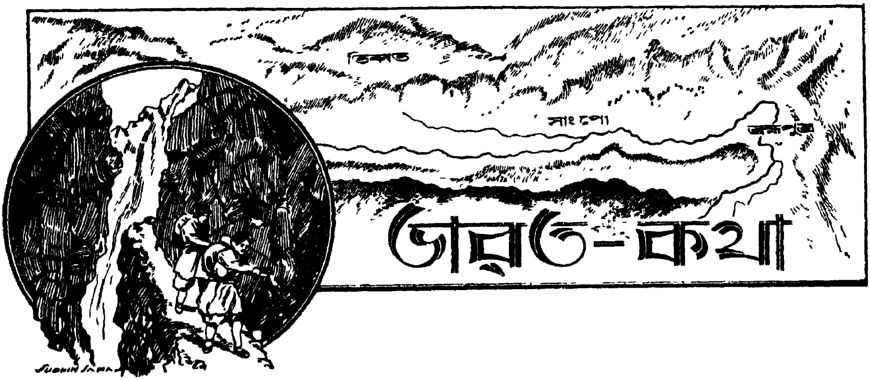
ছোট হাঁস বলিল—'ঘরে আস্‌বার দরকার নেই! জানালার কাছ হ'তে ফুঁ দিলেই চল্‌বে।

শিয়াল মহারাজ, এইবার ভয়ানক জোরে ফুঁ দিতে লাগিলেন, ফুঁয়ের সঙ্গে সঙ্গে ছোট হাঁসের বড় বোন্ আর মেজ বোন্ তাহার মুখ হইতে

বড় হয় এবং কোন সুযোগ পায়, তখন উপকারী-জনকে এমনকি আপনার লোককেও ভুলিয়া যায়। যাহারা মন্দ তাদেরই হয় অমনধারা স্বভাব! কিন্তু যাহারা সত্যই পরের উপকার করিতে ভালবাসে, তাহারা সুযোগ পাইলেই পূর্ব্বের কথা ভুলিয়া যাইয়া, পরকে আপনার করে। আবার যে বিপদ ঘটিতে পারে সে কথাও তখন আর তাহাদের মনে থাকে না। বল ত এই দু'য়ের মধ্যে কে ভাল?

যাহারা পরোপকারী তাহারা চিরদিনই আপনার সুখ-দুঃখ ও বিপদের কথা ভুলিয়া যাইয়া পরের কল্যাণ করিয়া থাকে। পরোপকারের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আর নাই। আর এদিকে আপনাকে রক্ষা করিয়াও চলিতে হয়। ছোট হাঁসটিরই কথা ধর না কেন, সে যদি সতর্কতা অবলম্বন না করিত, তাহা হইলে তাহার বাঁচিবার কি কোন সম্ভাবনা থাকিত?

F. 7—39



ব্রহ্মপুত্রের উৎস সন্ধানে

কিন্‌থাপ

২৯৮৯ পৃষ্ঠার পর

সাংপো নদীর উৎসের দিকের প্রায় ৪৫ মাইল পর্য্যন্ত স্থান এখন পর্য্যন্ত ও অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে। স্থানীয় শিকারীরা বলে যে সেখানে খাড়া উঁচু পাহাড়, জলপ্রপাত এই সব অনেক আছে। সেখানে নদী আপনাকে একেবারে লুকাইয়া রাখিয়াছে। সেই স্থানটি সমুদ্রতট-সমতা হইতে ৭,৪৮০ ফিট উচ্চ হইবে।

১৯১২-১৩ সালে যে আবর অভিযান প্রেরিত হইয়াছিল, তাহাতেও অনেক কিছু অজ্ঞাত প্রদেশের সন্ধান মিলিয়াছে।

কিন্‌থাপ্ ফিরিয়া আসিবার পর পৃথিবীর উৎসাহী পর্য্যটক এবং বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে একটা আন্দোলন ও আলোচনা আরম্ভ হইল। রাজকীয় ভূগোল সমিতির (Royal Geographical society) সদস্যগণের মধ্যে অনেকে নানারূপ তর্ক ও বিতর্ক তুলিতে আরম্ভ করিলেন।

কিন্‌থাপ সত্যই কি ব্রহ্মপুত্র বা সাম্পো নদীর উৎস-সন্ধানে তিব্বতের পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন? তাহাও অনেকের কাছে সন্দেহের কারণ হইয়া দাঁড়াইল। বিশেষ করিয়া কিন্‌থাপ তাঁহার বিবরণীতে বলিয়াছিলেন যে তিনি—তিব্বতের পূর্ব্বভাগে সাম্পোনদীর একটি বিশাল জলপ্রপাত দেখিয়াছেন। এই সংবাদে অভিযানকারীদের মধ্যে যেমন সন্দেহ হইয়াছিল, তেমনি কৌতূহল ও জাগিয়াছিল বড় কম নহে। অনেকেই বলিয়াছিলেন, কিন্‌থাপের কথা ঠিক নয় এ সুধু অতিরঞ্জিত কাহিনী মাত্র। ভারতীয় জরিপবিভাগের কর্ত্তারা কিন্‌থাপের এই জলপ্রপাতের কথা অবিশ্বাস করেন নাই কিন্তু কয়েকজন সৌখিন ভৌগোলিক ও পর্য্যটক প্রচার করিয়া দিলেন—"কিন্‌থাপের কথা ঠিক্ নয়, সে তিব্বত হইতে লোকের মুখে শোনা এই প্রপাতের গল্পকেই সত্য বলিয়া প্রচার করিয়াছে এবং তাহার বিবরণীতে লিপিবদ্ধ করিয়াছে"—এই অভিযোগের বিবরণের সত্যাসত্য সম্বন্ধে একটা অনুসন্ধান করা জরিপবিভাগের কর্ত্তারা বিশেষ আবশ্যকীয় বলিয়া মনে করিলেন।

আবর-অভিযানের কথা বোধ হয় তোমরা শুনিয়াছ। আমাদের উত্তর পূর্ব্বদিকে হিমালয়-



মাটুম গিরিসঙ্কট—ডিবং উপত্যকা (মিশমি অভিযানের সময়কার চিত্র)

Reproduced with the permission of the Surveyor General of India.

পর্ব্বতের উচ্চ শৃঙ্গগুলি নীল ও ধূসর রূপ লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। হিমালয়ের এই সকল পার্ব্বত্য-অঞ্চলে আবর, মিরি, মিশমি প্রভৃতি নানা জাতীয় লোকের বাস। ইহাদের মধ্যে আবরেরা যেমন সাহসী, তেমনি হিংস্র-প্রকৃতির লোক। আবর শব্দটি আসামী। উহার অর্থ স্বাধীন। ইহারা সমতল ভূমিতে আসিয়া সময় সময় নানা উৎপীড়ন করিত। ইংরাজ সরকারের সহিত ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ইহাদের সহিত প্রথম সংঘর্ষ উপস্থিত হয় এবং ১৮৯৩-৩৭ সালে প্রথম আবর অভিযান প্রেরিত হয়। নোয়েল উইলিয়ামসন্ সাহেব ও ডাক্তার গ্রীগরসন্ নামে দুইজন রাষ্ট্র-কর্ম্মচারী মাত্র ৪০ জন অনুচর লইয়া বন্ধুভাবে আবর রাজ্য দেখিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্দ্দান্ত স্বাধীনতাপ্রিয় আবর-জাতির কাছে তাহা ভাল লাগিল না। সহস্রাধিক আবর হঠাৎ ঐ নিরস্ত্র ব্যক্তিদের আক্রমণ করিয়া বধ করিল। দুইজন কুলিমাত্র এই দুঃসংবাদ বহন করিয়া আনিতে পারিয়াছিল। এজন্য আবরদের দেশে একটা অভিযান ও অনুসন্ধানকারী দল (Exploration party) পাঠাইবার দরকার হইয়াছিল। ১৯১১—১২—১৩ খৃষ্টাব্দে আবর-অভিযান প্রেরিত হয়। এই অভিযানের নেতা হইয়াছিলেন ক্যাপ্টেন বেলী (Captain Bailey) এবং ক্যাপ্টেন মুরশেদ (Moorshead)। আমরা এখানে আবর-অভিযান সম্বন্ধে কোন কথা বলিব না। কিন্‌থাপের অভিযানের বিষয়েই আলোচনা করিব।



কিন্‌থাপ—ব্রহ্মপুত্রনদের উৎস-সন্ধানে সর্ব্বপ্রথম ভারতীয় অভিযানকারী

"Reproduced with the permission of the Surveyor General of India".

কিন্‌থাপের বিবরণ

এখানে একটা কথা জানা দরকার। সে কথাটা এই যে কিন্‌থাপ নিজে লেখাপড়া জানিতেন না। তিনি দার্জ্জিলিং ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার ভ্রমণ বা অভিযানের কথা—লামা ইউয়েন্ গিয়াৎসু (Ugyen Gyatsho)র কাছে বলিয়াছিলেন। এই লামা গিয়াৎসুকে পরে গভর্ণমেণ্ট রায় বাহাদুর উপাধি দিয়াছিলেন। এই লামা গিয়াৎসুই কিন্‌থাপের

ভ্রমণ বিবরণের অনুবাদ করেন। কিনৃথাপ পেমাকো অঞ্চলের (Pemako) ভাষা জানিতেন। এই ভাষা তিব্বতের কোন কোন অংশে প্রচলিত। কিনৃথাপ পেমাকো ভাষা জানিলেও আবরদের ভাষা একেবারেই জানিতেন না। এজন্যই আবরেরা যে সব যায়গার নাম যে ভাবে উচ্চারণ করিয়াছে, কিনৃথাপ তাহা স্মরণ রাখিতে পারেন নাই, এজন্যই অনুবাদে অনেক কিছু গোলমাল হইয়াছে। আবর নাম ও পেমাকো ভাষার নামে অনেক যায়গার নামের প্রকৃত উচ্চারণ হয় নাই বলিয়া কিনৃথাপের বিবরণীতেও তাহার ভুল রহিয়াছে।

১৯১২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গয়লা (Gyala) হইতে ড্যামরো (Damro) বা প্যাদাম (Padam) পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্যাম্পোনদীর সীমান্তভূক্ত দেশের পরিচয় সম্পর্কে কিনৃথাপের বিবরণী ব্যতীত অন্য কিছুই প্রমাণসহ ছিল না। অবশ্য লামা সেরাপ-গিয়াৎসু (Serap Gyatsho) ঐ সকল স্থানের কোন কোন তীর্থস্থানের অর্থাৎ বিহার বা মঠের পরিচয় ও শাসন-রীতি সম্বন্ধে কিছু কিছু পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, বিশেষ করিয়া পোম্ (Pome) নামক স্থানের। তা ছাড়া সব দিকেই কিনৃথাপের কৃতিত্ব স্বীকার করিতে হইবে।

আবরেরা যে অতি বড় দুর্দ্দান্ত জাতি একথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ইহারা বিদেশী কাহাকেও একেবারেই প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারে না। দেখিলেই তাহাকে মারিয়া ফেলে কিংবা নানাভাবে উৎপীড়ন করে। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে একবার আবরদের দেশে অভিযান প্রেরিত হইয়াছিল। সেই অভিযান গিয়াছিল সুধু প্যাদাম অঞ্চলের আবরদের দেশে। সেই অভিযান দ্যাম্‌রো (Damro) নামক স্থানের কাছাকাছি যাইয়া পৌঁছিয়াছিল। এবং কিব্যাঙ্গ (Kebang) ও কোমিয়িং নামক দুইটি স্থানের সীমান্ত দেশে উপনীত হয়। এই অভিযানে ডাক্তার গ্রিগরসন্ (Dr Gregorson) এবং মিঃ উইলিয়ামসন্ (Mr Williamson) আবরদের হাতে প্রাণ হারাইয়াছিলেন। সে কথা তোমাদের পূর্ব্বে বলিয়াছি। আবরেরা বিদেশী মানুষকে কোনরূপেই বিশ্বাস করে না। বিদেশী মাত্রকেই তাহারা সন্দেহের চক্ষে দেখে। এইরূপ অবস্থায় দিনের পর দিন রাত্রির পর রাত্রি এবং মাসের পর মাস আবরদের দেশে আবরদের গ্রামে পর্য্যটন করিয়া কেমন করিয়া যে কিনৃথাপ নিরাপদে জীবন লইয়া দেশে ফিরিতে পারিয়াছিলেন, তাহা সত্যই আশ্চর্য্য বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে।

কিনৃথাপ যে সব অজানা দেশে দুঃসাহসিকতার সহিত পর্য্যটন করিয়াছিলেন, সেই সব দেশে তাঁহার অনেক পরে জরিপবিভাগের সুশিক্ষিত কর্ম্মচারিরা গমন করেন। আবর-অভিযানের সময় ক্যাপ্টেন মুরশেদ আবরদের দেশের নানা স্থানে পর্য্যটন করিয়া জরিপ করিয়াছিলেন এবং নানা বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সে সময়ে ক্যাপ্টেন মুরশেদ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে কিনৃথাপের বর্ণনা এতটুকুও অতিরঞ্জিত নহে—বরং প্রত্যেকটি কথাই সত্য। চারিবৎসর কাল নিঃসঙ্গ অবস্থায় দুর্দ্দান্ত আবরদের দেশে পর্য্যটন করিয়া একজন অশিক্ষিত বর্ণজ্ঞানহীন অভিযানকারীর পক্ষে প্রত্যেকটি স্থানের এবং সেদেশের লোকের যথাযথ পরিচয় দেওয়া যে কতবড় স্মৃতিশক্তি ও দক্ষতার পরিচায়ক তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

কিংথাপ সিতাংয়ের (Tsetang) পূর্ব্বদিকের প্রায় দেড়শত স্থানের নাম করিয়াছেন। তিনি যে সকল স্থানের নাম করিয়াছেন তাহার মধ্যে কুড়িটি যায়গা ছাড়া প্রায় সব যায়গারই সন্ধান মিলিয়াছে। ঐ নামের মধ্যে অনেক গুম্ফার কথা আছে ও অনেক গ্রামের নাম রহিয়াছে। আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে পথে কিনৃথাপ হিমালয়ের দুর্গম পথে অভিযান করিয়াছিলেন, সে পথের যে বর্ণনা তিনি দিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা সুন্দর ও সঠিক বর্ণনা আর কিছু হইতে পারে কি না, তাহাই সন্দেহ!

পুপারাংয়ের (Puparang) কাছাকাছি কিনৃথাপ দেখিতে পাইয়াছিলেন, সেখান হইতে স্যাম্পো বা সানপো নদী দক্ষিণদিকে বহিয়া চলিয়াছে। কিনৃথাপের পরবর্ত্তী কালের শিক্ষিত অভিযানকারীরা কিনৃথাপের এই বিবরণ যে সম্পূর্ণ সত্য তাহা স্বীকার করিয়াছেন। এমন কি তাহারা এইরূপ বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই যে—কোম্‌কার (Komkar) এবং গেকু (Geku) পর্য্যন্ত স্যাম্পো নদ দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইয়াছে তাহা নহে



রায় বাহাদুর কিষণ সিং মিলামোয়াল তিব্বত-অভিযানে জরিপ বিভাগ হইতে প্রেরিত ১৮৬৯-৮৩

Reproduced with the permission of the Surveyor General of India

তাহারও অনেক দূর পর্য্যন্ত ও ঐ নদ দক্ষিণাভিমুখে বহিয়া চলিয়াছে। ইহা হইতে উপলব্ধি হয় যে সত্যের প্রতি এই নিরক্ষর অভিযানকারীর কিরূপ লক্ষ্য ছিল। কিন্থাপ কোম্‌কার এবং গেকুর দক্ষিণদিকে না গেলেও যে বিবরণ সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন তাহা যেমন প্রশংসার যোগ্য, তাহার ব্রহ্মপুত্র নদের গতি সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য কি অসাধারণ অনুরাগ ও আগ্রহ ছিল তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে।

টোঙ্গিযাক জোঙ্গ (Tongkyuk Dzong) নামক স্থানের দক্ষিণভাগের যে বিবরণ কিন্থাপ দিয়াছেন তাহার মধ্যে কিছু কিছু ভুলচুক আছে। সে বিষয়ে ক্যাপ্টেন মুরশেদ বলেন—"টোঙ্গিযাক জোঙ্গের দক্ষিণাংশের পথের বর্ণনায় যে সামান্য ত্রুটি কিন্থাপের বিবরণীতে দেখিতে পাই, তাহার মূলে রহিয়াছে একটা মস্ত ব্যাপার, এ সময়ে কিন্থাপ বন্দী অবস্থায় ছিলেন, কাজেই তাঁহার সব কথা মনে না থাকিতেও পারে। স্মৃতি হইতে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে ভুল ভ্রান্তি থাকা অসম্ভব নহে এবং আর দেশীয় লোকেরা যাহা বলিয়াছে তাহাও হয়ত বা ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন নাই।

স্যাম্পো জলপ্রপাত

স্যাম্পো বা ব্রহ্মপুত্রনদের প্রপাত সম্বন্ধে ক্যাপ্টেন মুরশেদ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া যাহা লিখিয়াছেন ও কিন্থাপ স্যাম্পোর জলপ্রপাতের সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছেন তাহাতে সামান্য কিছু ভুল থাকিলেও তাহার বিবরণ সত্য। প্রায় চারিবৎসর কাল ভ্রমণ করিয়া কিন্থাপ অন্যের কাছে যে বর্ণনা দিয়াছিলেন, তাহাতে অনুবাদক একস্থানের নাম অন্য স্থানের সহিত গোলমাল করিয়া ঐরূপ গোলযোগের সৃষ্টি করিয়াছেন।" বেলি এবং মুরশেদ স্যাম্পোর গতিপথ অবলম্বন করিয়া মাত্র দশ মাইল পথের বেশী তাহারা যাইতে পারেন নাই কাজেই সেই ভূ-ভাগকে অনাবিষ্কৃত দেশ বলা যাইতে পারা যায়। এই পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে ব্রহ্মপুত্র নদের কয়েকটি জলপ্রপাত রহিয়াছে। এই জলপ্রপাত কয়টির জন্যই ব্রহ্মপুত্র অতি সহজে নীচের দিকে নামিয়া আসিতে পারিয়াছে। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে কিংডন্ ওয়ার্ড এবং লর্ড ক্রড্ নামে দুইজন অভিযানকারী স্যাম্পোর অনাবিষ্কৃত প্রদেশ সমূহের আবিষ্কার করিবার জন্য যাত্রা করেন। তাহাদের বিশেষ লক্ষ্য ছিল, কিংথাপের বর্ণিত জলপ্রপাত সত্য সত্যই আছে কি না তাহার সন্ধান করা। পেমাকোচুংযের পর কোন পথ ছিল না, এজন্য তাহাদিগকে পথ তৈয়ারী করিয়া চলিতে হইয়াছিল। সে পথ ছিল অতি ভীষণ। দুই দিকে উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী। সেই পর্ব্বত-শ্রেণীর মধ্য দিয়া স্যাম্পোনদী ভীষণ গর্জ্জন করিতে করিতে উন্মত্ত জলধারা বুকে লইয়া বহিয়া চলিয়াছে। তাঁহারা যে সংকীর্ণ গিরিপথ দিয়া অগ্রসর হইতেছিলেন, তাহার প্রায় ১০০০ ফিট নীচু দিয়া স্যাম্পো নদী কল-প্রবাহে বহিয়া যাইতেছিল। এই পথে যাইতে যাইতে তাহারা দেখিতে পাইলেন কোথায় যেন পাহাড়ের বুকে স্যাম্পো আপনাকে লুকাইয়া রাখিয়াছে। সে দিকে অনুসন্ধান করিতে যাইয়া তাহারা দেখিতে পাইলেন—একটি জলপ্রপাত। এই জলপ্রপাত ত্রিশ ফিটের বেশী উঁচু নহে। কিন্তু জলপ্রপাতের শোভা অতি চমৎকার। আকাশের গায়ে উৎক্ষিপ্ত জলকণার বুকে শত শত রামধনুর সৃষ্টি হইয়াছে। এই জলপ্রপাতটি পেমাকোচাংয়ের কাছাকাছি। সত্য সত্যই মেঘমুক্ত দিনে সূর্য্যের কিরণে এই জলপ্রপাতের বুকে শত শত ইন্দ্রধনুর সৃষ্টি হয়। কিংথাপ ১৫০ শত ফিট উচ্চ যে জলপ্রপাতের কথা বলিয়াছিলেন—সেইটির নাম হইতেছে সিংচি চোগি (Shingche Chogye)। এই জলপ্রপাতটি ত্রোলা (Trala) নামক স্থানের কিছু নীচের দিক হইতে উৎপন্ন একটি ছোট নদীর উৎস মুখে অবস্থিত। গয়ালার কাছাকাছি স্যাম্পো নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। ক্যাপ্টেন মুরসেদ বলেন—যে কিংথাপের ভ্রমণ-কাহিনীর অনুবাদের দোষেই এইরূপ ভুল হওয়ায় অনেকে তাহার এই বর্ণিত প্রপাতের কথা বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। [It would seem that in the course of dictation and translation of Kinthup's narrative, the accounts of the two separate falls have been confused.] এই অনুমানই সম্পূর্ণ সত্য।

ক্যাপ্টেন বেলি তাঁহার অভিযানের পরে কিন্থাপের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই জলপ্রপাতের সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সে সময়ে কিন্থাপ বলেন, তাহার সে জলপ্রপাতের কথা বেশ মনে আছে। সেই প্রপাতের কাছ হইতে প্রায় পঞ্চাশ ফিট উপরে কিছুদিন তাহাকে থাকিতে হইয়াছিল। ইহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে কিন্থাপ যে কথা বলিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণ সত্য, শুধু শ্রুতিলেখনের সময় এবং অনুবাদ করিবার সময় অনুবাদকের ভুলের দরুন এইরূপ গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছে।

১৯১০ খৃষ্টাব্দের আবর অভিযানের সময় মিঃ বেণ্টিঙ্ক (Mr Bentinck) ছিলেন রাষ্ট্র-কর্ম্মচারী (Political officer)। তিনি রাজকীয় ভৌগোলিক সভায় (The Royal Geographical Society) আবর অভিযান প্রসঙ্গে যে বক্তৃতা দেন তাহাতে প্রসঙ্গ ক্রমে কিন্থাপের নাম উল্লেখ করিয়া বলেন—"কিংথাপ সর্ব্ব প্রথম এঙ্গিঙ্গ (Angging) নামক গ্রামে পৌছিয়াছিলেন। সে গ্রাম হইতে দক্ষিণ দিকে যাইতে যাইতে তিনি যে এগারোটি গ্রামের নাম লিখিয়াছেন তাহার মধ্যে চারিটি গ্রামের নাম সম্বন্ধে কোনও গোলমাল নাই, ঠিক মিলিয়া যায়। দুইটির নাম সম্বন্ধে মাত্র একটু গোল আছে।

কিংথাপের বর্ণিত ও আবর-অভিযানের সময় এগিঙ্গ হইতে ড্যামরো পর্য্যন্ত যে সমুদয় গ্রামের জরিপ হইয়াছিল, এখানে তাহার উল্লেখ করা গেল, উহা হইতেই বেশ বুঝা যাইবে কিংথাপ কিরূপ সতর্কতার সহিত দুর্গম পথের যাত্রা হইয়াছিলেন।

জরিপের বিবরণ ১৯১'	২ কিন্থাপ ১৮৮৩-৮৪
আঙ্গি (ইঙ্গ) (Angi ng)	আঙ্গি (Angi)
সিংগিং (Singging)	সিংগিং (Shingging)
পালিং (Paling)	হাংগিং (Hanging)
রিকোর (Rikor)	সোবাং (Shobang)
পুগিং (Puging)	পুগিং (Puging)
গেটি (Gette)	রিকার (Rikar)
সিমোং (Simong)	কেতি (Keti)
মোবুক বা (Mobuk or গোবুক Gobuk)	সিমোং (Shimong)
ডালবুইং (Dalbuing)	মোবুক (Mobuk)
ওলোন বা মিলাং (Olon or Milang)	তারপিন্ (Tarpin)
ড্যামরো বা পাদান Damro or Padan)	ওনলো বা ওনলেট (Onlow or Onlet)
	মিরিপাদম্ (Meri Padam)

কিন্থাপের আবর দেশে ভ্রমণ

কিন্থাপ বলিয়াছেন "তিনি ওন্লো বা ওন্লেটে গিয়াছিলেন।" এখন ওন্লেটের নাম হইয়াছে ওলোন্। কিন্তু তাঁহাকে সেই পথে ভারতের দিকের সমতল ভূমির দিকে অগ্রসর হইতে দেওয়া হয় নাই। এজন্য কিন্থাপ যে পথে এখানে আসিয়াছিলেন আবার সেই পথ ধরিয়া তাঁহাকে ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল। রাষ্ট্রকর্ম্মচারী (Political officer) মিঃ ডুণ্ডাস সি, আই, ই (Mr W. C M. Dundas. C. I E) এবং ক্যাপ্টেন ওয়াকার্স - আর, ই, (Captain G. F T oakers, R E)—যখন ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ওলান্ বা মিলাং গিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা কিন্থাপ সত্য সত্যই ওলোন আসিয়াছিলেন কিনা তাহার সন্ধান লইয়াছিলেন। গামা তাদাং (Gama Tadang) এবং ইউবাং (Yubung) নামক দুই ব্যক্তি তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন যে—তাহারা যখন অতি ছেলে মানুষ—সে প্রায় ত্রিশ বৎসর আগে—একজন মোন্বা (Monba) পেমাকোর লোক সিমোং গোবাক এবং ডাল বুইংয়ের পথে আসিয়াছিলেন। কিন্থাপ ঐ স্থানকে তারপিন Tarpin বলিয়াছিলেন ও ওনোলো আসিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাহারা তাঁহাকে দেখে নাই। কিন্তু তারা লোকের মুখে কিন্থাপের কথা শুনিয়াছে। কেন না তাহাদের দেশে কোন মোন্বা অর্থাৎ পেমাকো অঞ্চলের লোককে ডালবুইংয়ের পথ অতিক্রম করিতে দেওয়া হয় না। দৈবাৎ কেহ কখনও সিমোংয়ের পথে অগ্রসর হইতে পারিয়াছে। ঐ মোনবাকে দ্যামরো বা ড্যামরো অতিক্রম করিতে দেওয়া হয় নাই বলিয়া তাহাকে সিমোংয়ের পথেই ফিরিতে হইয়াছিল।

কিন্থাপ আবরদের দেশের কথা বলিতে যাইয়া মাত্র দুই একটী সামান্য ভুল করিয়াছেন। যথা :—

(১) মোবাক বা গোবাকের এবং ওলোনের মধ্যে, ইয়ামনি (Yamne) অধিত্যকাকে ভুল করিয়া দিহাং বা সান্পো (Tsan-Po) বলিয়া ভুল করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

ব্রহ্মপুত্রের উৎস সন্ধানে

(২) কিংথাপ বলিয়াছেন যে সাংগাচো জোঙ্গ (Sangacho Dzong) হইতে উৎপন্ন নদী মিরি প্যাদাম্ হইতে তিন মাইল দূরে সান্ পো স্যাম্পো নদের সহিত মিলিত হইয়াছে।

প্রথম ভুলটীর সম্বন্ধে ক্যাপ্টেন ওয়াকার্স বলেন যে—যাহাদের আবর দেশের সম্বন্ধে সামান্য অভিজ্ঞতাও আছে, তাহারা একথা অতি অবশ্য স্বীকার করিবেন যে—নিয়ত কুয়াসায় ঢাকা এবং সেই বৃষ্টি বাদলের দেশে অতি বড় অভিযানকারীর ও ভ্রম হওয়া স্বাভাবিক। দ্বিতীয় ভুলটী হইবার কারণ সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে সে সময়ে তিনি বন্দী অবস্থায় ছিলেন বলিয়া নিজে সেইদিকে যাইতে পারেন নাই, তাঁহাকে শোনা কথার উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে, এইজন্য ভুল হওয়া স্বাভাবিক। তারপর সেদেশের লোকের কথাবার্ত্তা বা ভাষা বুঝিবার পক্ষে অসুবিধা ও এই ভুলের অন্যতম কারণ বলা যাইতে পারে।

কিনথাপের আর একটী ভুল এই যে তিনি মিরি প্যাদম নামক স্থানের নাম বলিয়াছেন ড্যামরো (Damro)। ঐ স্থানের নাম প্যাদম। সমতলভূমির দিকে অগ্রসর হইতে হইলে প্যাদমের পরেই মিন্ধি (Midhi) বা মিশ্‌মি গ্রাম। এই পথেই ব্যবসায়ীরা আবরদের দেশে যাতায়াত করে। ড্যামরোর পরেই বৈশা (Baisha) গিরিপথ। এই পথটী বরাবর মিশ্‌মিদের গ্রামের মধ্য দিয়া সদিয়া সহরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। কিনথাপ দেশে ফিরিয়া আসিবার অনেক দিন পরে তাঁহার অভিযানের বিবরণ বলিয়াছিলেন, কাজেই মিন্ধি বা মিরি এবং প্যাদম প্রভৃতি দুই একটী গ্রামের নামের সম্বন্ধে গোলমাল হওয়া আশ্চর্য্য নহে।

কিনথাপ তিব্বতের পথে প্রায় দুই শত মাইল অতিক্রম করিয়াছিলেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের আবর-অভিযানে অভিযানকারীরা সমতলভূমি হইতে মাত্র ২৫ মাইল পাহাড়ের পথে অগ্রসর হইতে পারিয়াছিলেন।

কিনথাপের বর্ণনা যে কিরূপ যথার্থ সে বিষয়ে এখন আর কেহ কোনও সন্দেহ করেন না। একজন অশিক্ষিত লোক নিজের জীবনকে সঙ্কটাপন্ন করিয়া ধূর্ত্ত চীনা লামার সহকারীরূপে নানারূপ বিপদে পড়িয়াও ভাবে দুর্জ্জয়কে জয় করিয়াছিলেন সে বিষয়ের আলোচনা করিতে যাইয়া ক্যাপ্টেন ওয়াকার্স যথার্থই বলিয়াছেন—"A romance of the survey of India"

কিনথাপ ছিলেন দার্জ্জিলিং বাজারের একজন অতি সাধারণ দর্জ্জি। দর্জ্জির কাজ করিয়াই তাঁহার দিন কাটিতেছিল, গভর্ণমেণ্ট তাঁহার বৃদ্ধাবস্থায় উপযুক্ত আর্থিক সাহায্য দিয়া তাঁহার শেষ জীবনটা শান্তিতে অতিবাহিত করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া তাঁহার ধন্যবাদভাজন হইয়াছিলেন।

কিনথাপের ন্যায় তিব্বত অভিযানের সময় আরও দুইজন ভারতবাসী অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহারাও ভারতীয় জরিপ বিভাগ হইতে প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের একজনের নাম রায় বাহাদুর কিষণ সিং মিমালমোয়াল এবং অপরের নাম নেন সিং।

এই দুইজনের সাহায্যে তিব্বতীয় অভিযান সম্পর্কে আমরা অনেক কথা জানিতে পারিয়াছি। পণ্ডিত নেন সিং অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া দোভাষীর কার্য্য এবং নানা প্রাচীন পুঁথিপত্র এবং বৌদ্ধ সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক কিছু সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ভারতীয় জরিপ বিভাগ নেন সিংয়ের পরিচয় দিতে যাইয়া লিখিয়াছেন—Pandit Nain Singh, C. I. E. survey of India. The First of the Pandit of Tibetan Exploration—রায় বাহাদুর কিষণ সিংও তিব্বত অভিযানের সহযাত্রী ছিলেন।

স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণও তিব্বত-অভিযানের একজন সহযাত্রী ছিলেন।

তবে কিনথাপের বিশেষত্ব এই যে তিনি নিরক্ষর হইয়া এমন এক মহৎ কার্য্য করিয়া গিয়াছেন যাহা সত্য সত্যই আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। তারপর আবরদের দেশে ইংরাজীতে যাহাকে বলে Abor proper, সেখানে যাওয়া যেমন অসম্ভব, তেমনি দুঃসাহসিক ব্যাপার। দিবং বা দিহং নদী ও দির্জ্জমো নদীর মধ্যবর্ত্তী ভূ-ভাগ আবরদের বাসস্থান। এইস্থান আসামের লখীমপুর ও ডিব্রুগড়ের উত্তরের পার্ব্বত্য ভূমি। সেই পার্ব্বত্য ভূমির মধ্যেই আবরদের দেশ অবস্থিত।



গ্রীক্ পুরাণ ও ধর্ম্ম


২৯৭৩ পৃষ্ঠার পর

সেকালে গ্রীকদের দেবতা ছিলেন তিন শ্রেণীর। তাঁহাদের দেবতাদের আবাসস্থান ছিল তিনটি—স্বর্গ, সমুদ্র ও পাতালপুরী।

জুপিটার (Jupiter), এপোলো (Apollo), মার্স (Mars), মার্কিউরি (Mercury), ব্যাকাস্ (Bacchus) ভলকান্ (Vulcan), জুনো (Juno), মিনার্ভা (Minerva), ভিনাস্ (Venus), ডায়েনা (Diana), সিরিস্ (Ceres), ও ভেষ্টা (Vesta)। ইঁহারা ছিলেন স্বর্গের অধিবাসী। এই সকল দেবতাদের মধ্যে, জুপিটারের সম্মান ছিল সব দেবতাদের চেয়ে বেশী। আকাশে যখন কাজল কালো মেঘের বুকে প্রভা বিলসিত হইত এবং ভৈরব-মন্দ্রে বজ্র উঠিত, তখন গ্রীকেরা মনে করিতেন, দেবতাদের অধিপতি বৃহস্পতি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন।

অলিম্পিক ক্রীড়া-কৌতুকের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। জুপিটারের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশে গ্রীকেরা এই ক্রীড়া-কৌতুকের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। প্রতি চারি বৎসর পর পর এই ক্রীড়ার ব্যবস্থা ছিল। এই ক্রীড়া-ক্ষেত্রে—দৌড়, ঘোড়দৌড়, রথচালনা, ফা-লাফি, কুস্তি এবং হইত। অলিম্পিক ক্রীড়া-বিজয়ী তরুণ দলের সম্মানের অবধি ছিল না। দেশের লোকেরা তাহাদিগকে অসীম শ্রদ্ধা করিত।

এপোলো দেবতা ছিলেন জুপিটারের পুত্র। তিনি ছিলেন সূর্য্যের রথের সারথী। সূর্য্যদেবকে সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত চারিঘোড়ার একখানি রথে করিয়া চালনা করিতে হইত। সে রথখানা ছিল অতি সুন্দর।

এপোলো কি কেবল সূর্য্যের সারথী ছিলেন, তা নয়। তিনি ছিলেন—সঙ্গীত, কবিতার, চিকিৎসা-শাস্ত্র এক কথায় সকল প্রকার ললিতকলার অধিনায়ক। ডেল্‌ফি (Delphi) দেবতার মন্দিরে যে দৈববাণী হইত তাহার নেতৃত্বভার ও ছিল এই এপোলো দেবতাটির উপর। ডেল্ফির মন্দিরের দৈববাণী শুনিবার জন্য নানা দেশ-দেশান্তর হইতে লোক আসিত।

মার্স (Mars) ছিলেন রণদেবতা। মার্কিউরি ছিলেন চোরদের দেবতা! ব্যাকাস্ ছিলেন মদ্য-পায়ীদের দেবতা! ভলকান্ ছিলেন কর্ম্মকারদের

আরাধ্য দেবতা। ভলকান্ কে সর্ব্বদা তাঁহার চাপরের কাছে হাতুড়ি হাতে করিয়া কাজ করিতে দেখা যাইত।



দেবী এথিনির মূর্ত্তি
গ্রীসের জাতীয় চিত্রশালায় রক্ষিত আছে

রূপরাণী ভিনাস ছিলেন—সৌন্দর্য্যের আরাধ্য দেবতা। তাঁহার মূর্ত্তি অপূর্ব্ব লাবণ্যময়ী নারী-মূর্ত্তির আদর্শে গঠিত হইলেন। যেমন আমাদের রতিও সৌন্দর্য্যরাণী উর্ব্বশীকে কবিরা রূপের আদর্শ প্রতিমা বলিয়া গণ্য করিয়া থাকেন। কবি এজন্যই বলিয়াছেন 'হে ভুবনমোহিনী উর্ব্বশী'! তাঁহার ছেলে কিউপিড (Cupid) হইলেন দুষ্টুমিতে সেরা। সে মানুষদের তীর ছুঁড়িয়া মারিয়া আনন্দ পায়।

নেপচুন্ -(Neptune) হইতেছেন বরুণ-দেবতা। অদ্ভুত তাঁহার রথ, বড় একটা সামুকের খোলে তৈরী, আর তাঁহার রথ-চালক ঘোড়াগুলির লেজ হইতেছে মৎস্যের আকারের।

নেপচুন্ যখন সাগরের বুকে ঢেউয়ের উপর দিয়া রথ চালাইয়া যান, তখনই দেখিতে পাওয়া যায় ট্রাইটোন্ নামে একজাতীয় সামুদ্রিক দৈত্য তাঁহার রথের চারিদিক ঘিরিয়া সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া চলিয়াছে।

প্লুটো হইতেছেন পাতালপুরীর দেবতা। তাঁর সিংহাসন পাথরে তৈরী। প্লুটো দেখিতে অতি ভয়ঙ্কর। অতি ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে চারিদিকে লক্ষ্য করিতেছেন। এক হাতে তাঁর দণ্ড, অপর হাতে দুইটি চাবি।

এই সকল দেব-দেবী ছাড়া গ্রীকেরা অর্দ্ধমানুষ ও অর্দ্ধদেবতা এইরূপও অনেক কিছুর পূজা করিতেন। যেমন **হার্কিউলিস**। হার্কিউলিসের সাহস ও বীরত্বের বার্ত্তা গ্রীক পুরাণের অনেকখানি পাতা জুড়িয়া আছে।

গ্রীকেরা তাঁহাদের দেব-দেবীর প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন। কত সুন্দর সুন্দর মন্দির যে এই সমুদয় দেবতাদের প্রতিষ্ঠার্থ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, এখনও সেই সকল মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায়। সেই সমুদয় মন্দির এক সময়ে স্থাপত্যের দিক দিয়া পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মন্দির রূপে বিবেচিত হইত। সেই সকল মন্দিরের অনুকরণে ইউরোপের নানা দেশে অনেক উপাসনা গৃহ (গীর্জ্জা) নির্ম্মিত হইয়াছে।

গ্রীক-ভাস্করেরা মর্ম্মর প্রস্তর খোদিত করিয়া তাহাদের দেব-দেবীর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ঐ সব মূর্ত্তি যেমন বৃহৎ, তেমনি সুন্দর, তেমনি গাম্ভীর্য্যপূর্ণ, দেখিলে মনে হয় যেন এই অপূর্ব্ব শ্রীসম্পন্ন দেবমূর্ত্তি শুধু কল্পনায় গড়িয়া উঠে নাই, গ্রীক-শিল্পীদের সম্মুখে যেন এই সকল দেবতারা

F 8—39

মূর্ত্তি ধরিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, নতুবা এমন অপূর্ব্ব মূর্ত্তি, এমন সৌন্দর্য্য, এমন মাধুর্য্য কাহার সাধ্য মর্ম্মর-প্রস্তরের গায়ে ফুটাইয়া তুলিতে পারে ?

গ্রীক্ দার্শনিক

গ্রীকেরা যেমন স্থাপত্য-শিল্পে এবং ভাস্কর্য বিদ্যায় অসাধারণ ছিলেন, তেমনি তাঁহাদের মধ্যে অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। গ্রীক দার্শনিকদের কথা তোমরা ইউরোপীয় দর্শনের কথায় ও 'অমর-জীবনে' পড়িয়াছ।

থেল্‌স ছিলেন একজন বিখ্যাত দার্শনিক। তাঁহার কথা ('শিশু-ভারতী' ১১২৯—১১৩১ পৃষ্ঠা) বলা হইয়াছে। বন্ধু থেলসের বিষয়ে একটি গল্প শোন। এই দার্শনিক পণ্ডিতের নাম, সেকালে গ্রীসদেশেই শুধু নয় পৃথিবীর প্রায় সব দেশের পণ্ডিতদের মুখে মুখে শুনা যাইত।

এক রাত্রি থেলস্ আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া পথ চলিয়াছেন। গ্রহ-নক্ষত্রের গতি পর্য্যবেক্ষণ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। কোন দিকে লক্ষ্য নাই, আকাশের দিকে চাহিতে চাহিতে চলিয়াছেন, হঠাৎ থেলস্ একটা গভীর গর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া গেলেন। একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক তাড়াতাড়ি দৌড়িয়া আসিয়া তাঁহাকে গর্ত্ত হইতে টানিয়া তুলিল। দার্শনিক পণ্ডিত মহাশয়ের তখনকার দুর্দ্দশার চূড়ান্ত হইয়াছিল। তাঁহাকে সারা গায়ে কাদামাখা অবস্থায় টানিয়া তোলা হইল।

সেই স্ত্রীলোকটী থেলসকে কহিলেন "মহাশয়! আপনার পা দু'খানা যখন মাটিতে থাকিবে, তখন আর মাথাটা আকাশের দিকে তুলিয়া পথ চলিবেন না।"

বল দেখি এ দু'জনের মধ্যে বড় দার্শনিক কে ?

পিটাকাস্ (Pitacus) নামে একজন দার্শনিক ছিলেন, তিনি তাঁহার জীবনে একদিনের জন্য ও কোনরূপ মাদকদ্রব্য স্পর্শ করেন নাই। এমনি মিতাচারী ও চরিত্রবান্ ছিলেন তিনি।

দার্শনিক **বিয়াস** (Bias) ৬২৭ খৃঃ পূঃ গ্রীস দেশে জীবিত ছিলেন। তাঁহার কাছে টাকা, কড়ি, ধন, রত্ন তুচ্ছ বলিয়া মনে হইত। শত্রুরা যখন তাঁহাদের বাস-নগর আক্রমণ করিল, তখন নাগরিকেরা সকলে নিজ নিজ ধন রত্ন রক্ষার জন্য



আদি গ্রীক ভাস্কর্য্যের নিদর্শন এই মূর্ত্তিটি পার্থিননের মাটির ভিতর হইতে পাওয়া গিয়াছে এবং এখন এইটা এ্যাক্রোপোলিসের যাদুঘরে রক্ষিত আছে

ব্যাকুল হইয়া পড়িল। বিয়াস, নিশ্চিন্ত রহিলেন। তাঁহাকে এইরূপ নিশ্চিন্ত ভাবে থাকিতে দেখিয়া

একজন প্রতিবেশী জিজ্ঞাসা করিল, তুমি যে বড় নিশ্চিন্ত রহিয়াছ? বিয়াস বলিলেন টাকাকড়ি সে সব তুচ্ছ খেলার জিনিস মাত্র। আমার ধন সে আমার কাছেই আছে। 'আমার চিন্তাই হইতেছে আমার ঐশ্বর্য্য।' কি সুন্দর কথা!

এপিমেনিডিস্ ছিলেন এক অদ্ভুত ধরণের দার্শনিক। তাঁহার সম্বন্ধে অনেক রকমের গল্প গুজব চলিয়া আসিতেছে। এখানে একটি গল্প শোন। এপিমেনিডিস্ যখন বালক ছিলেন, তখন একবার তাঁহার বাবা তাঁহাকে একটি হারানো ভেড়ার খোঁজে পাঠাইয়াছিলেন। ভেড়াটি খুঁজিয়া পাইবার পর গ্রীষ্মের দরুন ক্লান্তিবশতঃ তিনি পথের ধারের একটা গুহার ভিতরে যাইয়া যেমন শুইলেন, অমনি তাঁহার ঘুম আসিল।

তাঁহার এই ঘুম ভাঙ্গিয়াছিল সাতান্ন বৎসর পরে। ঘুম ভাঙ্গিলে পর দেখিলেন তিনি বুড়ো হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার মাথার চুল, গোঁফ, দাড়ি সব পাকিয়া গিয়াছে। যৌবনের সেই শক্তি শরীরে আর নাই।

ঘুম ভাঙ্গিবার পর বাড়ী ফিরিলেন। কিন্তু কেহ তাঁহাকে চিনিল না, তিনিও কাহাকেও চিনিতে পারিলেন না। এপিমেনিডিস্ দেখিলেন তাঁহার বাবা অনেকদিন হইল মারা গিয়াছেন। তাঁহার ছোট ভাইটি যাহাকে অতি শিশু দেখিয়া গিয়াছিলেন সেও এখন বুড়োর দলের সামিল। সহর লোকে ভরিয়া গিয়াছে। যেখানে বাড়ী-ঘর কিছুই ছিল না, সেখানে অনেক বাড়ী-ঘর হইয়াছে। এক ঘুমের পরেই কিনা এত পরিবর্ত্তন!

দার্শনিক **পিথাগোরাস্** বিশ্বাস করিতেন যে মানুষের মৃত্যুর পর তাহার আত্মা পশু-পক্ষী প্রভৃতির শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে তিনি পূর্ব্ব জন্মে ময়ূর ছিলেন।

এফিসাস্ (Ephesus) নিবাসী দার্শনিক **হেরাক্লিটাস্** ছিলেন অদ্ভুত প্রকৃতির লোক। তাঁহার কথা সাধারণে বুঝিতে পারিত না। তিনি বলিতেন—যদি সকলেই সব কথা বুঝিতে পারে তাহা হইলে পণ্ডিতের আদর হইবে কেন? অনেকে ইঁহাকে কাঁদুনে পণ্ডিত বলিত। তাঁহার কাছে পৃথিবীর যা কিছু সবই ছিল দুঃখময়। তিনি যে কোন মানুষের দিকে তাকাইতেন তৎক্ষণাৎ কাঁদিয়া ফেলিতেন। ইঁহার সম্বন্ধে 'শিশু ভারতী' ৪০৭ পৃঃ অনেক কিছু বলা হইয়াছে।

আর একজন **এনাক্সাগোরাস্** (Anaxagoras) ছিলেন এক অদ্ভুত কল্পনার লোক। তিনি বলিতেন আকাশটা পাথরের তৈয়ারী, আর সূর্য্য



সোপোক্লিস্

হইতেছে একটা ভয়ানক তপ্ত লৌহপিণ্ড। তোমরা একথা শুনিয়া নিশ্চয়ই হাসিবে। কিন্তু সেকালের গ্রীকদের কাছে পৃথিবীর আকার ইত্যাদি সম্বন্ধে নানারূপ অদ্ভুত রকমের ধারণা ছিল, সে কালে

তাহারা পৃথিবীর আকার ইত্যাদি সম্বন্ধে নানারূপ অদ্ভুত ধারণা করিত।

আমরা পূর্ব্বেই এম্‌পেডোক্লাস্, সোক্রেটীস্, ডায়োজিনিস্, প্লেটো প্রভৃতির কথা বলিয়াছি, গ্রীকেরা সোক্রেটীস ও প্লেটো সম্বন্ধে অত্যন্ত উচ্চ



ইউরিপিডেস্

ধারণা করিতেন, তাঁহারা প্লেটোকে—"Plato the divine" বলিত।

গ্রীকদের মধ্যে আরও অনেক বড় বড় দার্শনিক পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের সকলের কথা বলা ত বড় সহজ নয়, সেইজন্য এইখানে আমরা কয়েকজন খুব বড় নামকরা পণ্ডিতের কথাই বলিলাম! তোমরা বড় হইলে সব গ্রীক দার্শনিক-দের কথা পড়িও।

গ্রীক কবি

যেমন দার্শনিক পণ্ডিতদের নাম গ্রীসের ইতি-হাসে গৌরবের সহিত লিখিত হইয়াছে, তেমনি গ্রীস দেশে এমন সব বড় বড় কবি জন্মিয়াছিলেন যাহাদের নাম এখনও আমরা গৌরবের সহিত বলিয়া থাকি। একজনের কথা সকলের আগেই শোন, তাঁহার নাম **হোমার**। হোমার যখন বাঁচিয়া ছিলেন, তখন তাঁহাকে নগরে নগরে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতে হইত। আর তিনি যখন মারা গেলেন তখন সাতটা সহরের লোক হোমারের জন্মভূমি বলিয়া দাবী করিতে ছাড়ে নাই। এ বিষয়ে একটি অতি সুন্দর ছড়া প্রচলিত আছে। সেই ছড়াটীর ইংরাজী অনুবাদ এখানে উদ্ধৃত করিলাম :—

> ° cities Str ve for Homer dead.
> ıch the livi ıg Homer begg'd his bread.'

চতুর্থ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে সাত সহরের লোকেরা হোমারের মৃত্যুর পর হোমারের জন্মভূমি বলিয়া দাবী করিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার জীবিতকালে সেই সব সহরের অধিবাসীদের দ্বারে দ্বারে অন্ধ কবি হোমারকে ভিক্ষাপাত্র হস্তে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে হইয়াছে।

হোমারের জন্ম এবং কোন্ সময়ে তিনি গ্রীস-দেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন সে কথা বলা বড় সহজ নয়। তবে অনেকে অনুমান করেন ৯০০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে হোমার জন্মগ্রহণ করেন। হোমার ছিলেন অন্ধ। তিনি মুখে মুখে কবিতা রচনা করিতেন এবং সহরে সহরে ঘুরিয়া ফিরিয়া গাহিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার রচিত **ইলিয়াড্** এবং **ওডিসি** অনেকগুলি খণ্ডে রচিত। গ্রীস দার্শনিক **লাইকারগাস্** ঐ সব গানগুলি যদি সংগ্রহ না করিতেন তাহা হইলে তোমরা ওডিসি ও ইলিয়াডের নাম শুনিতে পারিতে কি না এবং অমন মহাকাব্যের অমৃত পান করিতে পারিতে কি না তাহাই ছিল সন্দেহের বিষয়। পিসিস্‌ট্রেটাস্ নামে একজন গ্রীক পণ্ডিত

ঐগুলিকে সম্পাদন করিয়া বর্ত্তমান আকারে দাঁড় করাইয়াছেন।

গ্রীস দেশে আরও কত যে বড় বড় কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাদের সকলের কথা এখানে বলা চলে না। আমরা এখানে কয়েকজনের নাম করিলাম। একজন ছিলেন **এনাক্রিয়ন** (Anacreon) তিনি প্রেম ও ভালবাসার সম্বন্ধে অনেক কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন, **পিণ্ডার** (Pindar) নামে একজন কবি গাম্ভীর্য্যপূর্ণ অতি সুন্দর সুন্দর কবিতা



সমাধির উপরে খোদিত ফলক

রচনা করিয়াছেন। কবি থিয়োক্রিটেস্ (Theocritics) রাখাল বালক-বালিকাদের সম্বন্ধে অনেক কিছু লিখিয়া গিয়াছেন। **এ্যাস্‌কিলাস** (Aeschylus) **সোপোক্লিস** (Sophocles) **ইউরিপিডেস্** (Euripides) **সাপো** প্রভৃতি অনেক কবি ও নাট্যকার সেকালের গ্রীসে জন্মিয়া দেশের কাব্য-সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন।

প্রাচীন গ্রীসের শিল্প সৌন্দর্য্য যেমন গ্রীক্-শিল্পীদের অতুলনীয় করস্পর্শে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তেমনি কাব্যও সাহিত্যের মধ্য দিয়া এক নবীন-ধারার প্রবর্ত্তন হইয়াছিল। হোমারের সহিত একসঙ্গে নাম করার মত কবি সেকালে আর একজন জন্মিয়াছিলেন, তাঁহার নাম **হেসিওড্** (Hosiod)। হেসিওড্ সম্ভবতঃ নবম কিংবা সপ্তম খৃঃ পূর্ব্বাব্দে জন্মিয়াছিলেন।

গ্রীসদেশে বিভিন্ন জাতীয় কবিতার উৎস ধারা মহাকাব্য হইতেই প্রেরণা পাইয়াছিল। গ্রীসে অনেক শতাব্দী পর্য্যন্ত মহাকাব্য ব্যতীত অন্য কোন কবিতাই প্রাচীন গ্রীকদের কাছে আদর পায় নাই।

নাটকের সৃষ্টির জন্য গ্রীসদেশের কাছে পৃথিবীর অনেক দেশ ঋণী থাকিবে। ইউরোপের সাহিত্যের মধ্যে যে এক নূতন ভাব ও সৌন্দর্য্যের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় তাহার মূলেও গ্রীক সাহিত্যেরও প্রভাব রহিয়াছে। **সোপোক্লিস** (৪৯৫ খৃঃ পূঃ) যেমন নাটক লিখিতেন; তেমনি দক্ষ অভিনেতাও ছিলেন।

তাঁহাদের কবিতায় ও গানে আজকালকার বৈজ্ঞানিক যুগের অনেক কিছু নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কারের বিষয় পাইবে এমন ভরসা করিতে পার না। তাঁহাদের ইতিহাস ও ভূগোল সম্বন্ধে তেমন কোনও সঠিক ধারণাও ছিল না। তবে তাঁহাদের কল্পনা ছিল অসাধারণ, সৌন্দর্য্যানুভূতিও ছিল প্রবল। তারপর তাঁহারা এক অতি সুন্দর দেশে বাস করিতেন। সে দেশের পাহাড়-পর্ব্বত, নদ-নদী, শ্যামল-উপত্যকা, ফুল-ফল ও পশু-পক্ষী প্রভৃতি ছিল তাঁহাদের কাব্যের উপাদান। সব প্রাচীন গ্রীকের কবিরা দেব-দেবীর সম্বন্ধে অনেক কিছু অলৌকিক কাহিনী আমাদের কাছে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন। তাঁহাদের দেবতারা পাহাড়ের গায়ে গায়ে বাস করেন, শ্যামল উপত্যকার বুক দিয়া ছুটাছুটি করেন—জলের বুকে নাচিয়া বেড়ান। এ সব কথা বাস্তবিকই মানুষের চোখের কাছে এক নূতন কল্পনার রাজ্য আনিয়া দেয়।

হাজার হাজার বৎসর চলিয়া গিয়াছে এখনও পৃথিবীর লোকে গ্রীক-কবিদের কাব্য ও নাটক পড়িয়া আনন্দ লাভ করে, পর্য্যটকেরা তাঁহাদের বর্ণিত দেশের পাহাড়ে ও বনে বেড়াইয়া বেড়ায় এবং শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাদের প্রতি পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করে।



ব্রিটিশ দক্ষিণ আফ্রিকা

কেপ প্রদেশ



৩৩৯ পৃষ্ঠার পর



আফ্রিকার দেশ সমূহের এইবার সংক্ষেপে পরিচয় দিব। প্রথমে কেপ প্রদেশ (Cape-Province)এর কথা বলিতেছি। এদেশের ভূ-ভাগ সমুদ্রের উপকূল হইতে ক্রমশঃ উচ্চ হইয়া টেবল্ পর্ব্বতের নিকট যাইয়া মিশিয়াছে।

কেপ প্রদেশের জল-বায়ু শুষ্ক। ইহার উত্তর-পশ্চিমদিকে প্রায়ই বৃষ্টি হয় না। এ দেশের অধিবাসিগণের মধ্যে ইংরাজ, ওলন্দাজ, বান্টু (কাফ্রি) এবং হোটেনটোটেরা বাস করে। কেপ দেশের পরিমাণ ফল ২৭৬, ৫৩৬ বর্গ মাইল।

কেপ্ টাউন (Cape Town) 'দক্ষিণ আফ্রিকা সম্মিলনীর' (South African union) ইহাই রাজধানী। কেপ টাউন সহরটি দেখিতে যেমন সুন্দর, তেমনি বন্দর হিসাবেও পৃথিবীর মধ্যে ইহা একটি শ্রেষ্ঠ বন্দর। এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। তা ছাড়া এখানকার গভর্ণমেণ্ট হাউস্, পার্লামেণ্ট এবং অনেক সুন্দর সুন্দর বাড়ী ঘর রহিয়াছে।

ন্যাটাল

আফ্রিকার একেবারে দক্ষিণদিকের অংশ বলিয়াই ইহাকে কেপ প্রদেশ বলে। তাহার পাশে ন্যাটাল (Natal)। ন্যাটালের বেশির ভাগ লোকই কাফ্রি এবং জুলু। ন্যাটাল কৃষিকার্য্যের জন্য বিখ্যাত। এইখানে ইক্ষু, ভুট্টা, চা, গম, কলা এই সকল ফসল জন্মে। ন্যাটালের উচ্চ ভূ-ভাগে নানা প্রকার জীব-জন্তু যেমন ছাগল, মেষ প্রভৃতি চরিয়া বেড়ায় এবং তাহাদের চরিবার উপযোগী সবুজ তৃণক্ষেত্র যথেষ্ট আছে। দেশটি পর্ব্বতে পরিপূর্ণ। এই জন্য এখানে প্রাকৃতিক শোভা অত্যন্ত মনোরম। অনেক উদ্যান ও শস্যক্ষেত্র এখানে আছে। আমাদের ভারতবাসী অনেক শ্রমজীবী ন্যাটালে আছে। ন্যাটালে অনেক শ্বেতকায় কৃষি-জীবী কৃষিকার্য্য করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতেছেন। এখানকার প্রধান সহরের নাম **পিটার-মারিটস্ বার্গ** (Pietermaritzburg)। ভারত-মহাসাগরের তীরে **ডারব্যান** নামে একটি সুন্দর এবং বৃহৎ সামুদ্রিক বন্দর আছে। এখানকার লোকসংখ্যা ৯৫,৫৪১, ইহাদের মধ্যে ইউরোপীয়দের সংখ্যা হইবে প্রায় ৪৮,০০০। **লেডিস্মিথ, ডাণ্ডি** এবং **নিউক্যাসেল** প্রভৃতি সহর ও বেশ প্রসিদ্ধ। লেডিস্মিথ হইতে একটি রেলপথ অরেঞ্জ-ফ্রি-ষ্টেটের মধ্যে এবং আর একটি ডাণ্ডি ও নিউক্যাসেলের মধ্য দিয়া ট্রান্সভালে যাইয়া পৌছিয়াছে। **পূর্ব্বে এই**

সকল স্থানে যাতায়াতের কিংবা ব্যবসায়-বাণিজ্যের দিক দিয়া কোনরূপ সুবিধা ছিল না। রেলপথ



কিলিমান্জারো পর্ব্বতের শোভা

খোলা হইবার পর এই স্থানে ব্যবসায়-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। ১৯১০ সালে মোট ১৪৫৫ মাইল রেলপথ বিস্তৃত হইয়াছে।

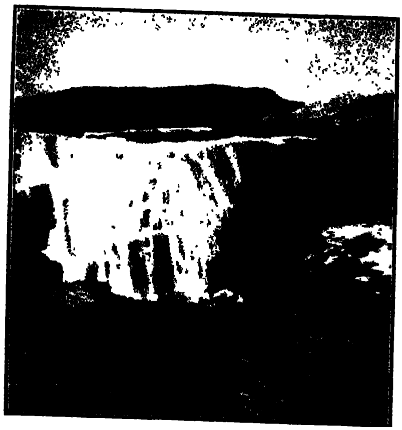
এই প্রদেশের পরিমাণফল ৩৫,২৮৪ বর্গ মাইল। তুগেলা, বাফেলো, রিব্ প্রভৃতি নদীর স্রোতোধারা এই দেশকে সুজলা সুফলা ও শস্যশ্যামলা করিয়াছে। এই নদী কয়টির জন্য এদেশে ধানের চাষ ও বেশ হয়। ন্যাটালের ভিতর দিয়া প্রায় ৩৫টি নদী প্রবাহিত হইতেছে। এইজন্য ন্যাটাল সত্য সত্যই দক্ষিণ আফ্রিকার উদ্যানস্বরূপ বিবেচিত হয়। যে সকল নদীর কথা বলিলাম সে সব নদীতে নৌকা চলাচল সম্ভব নয়, তবে শস্যক্ষেত্রে জলসেচনের পক্ষে এই সব নদীর উপকারিতা অত্যন্ত বেশী। ন্যাটালের জলবায়ু অতি উৎকৃষ্ট। সমুদ্রের দিকে আবহাওয়া কতকটা নাতিশীতোষ্ণ দেশের মত কিন্তু ন্যাটালের ভিতরের দিকের জল বায়ু বারো মাসই বেশ ঠাণ্ডা।

জীব-জন্তুর মধ্যে চিতাবাঘ, প্যান্থার, শৃগাল, হায়েনা, বন্যবিড়াল, জলহস্তী ও নানা জাতীয় কুর্মীর দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু দিন দিনই এই সকল জন্তুর সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে। ন্যাটালে বিষাক্ত সাপের সংখ্যাই খুব বেশী। এ দেশে পাইথন্ (Python) বা অতি বৃহৎ অজগর সাপ দেখিতে পাওয়া যায়। পাখীর মধ্যে শকুনি, ঈগল-পাখী, কেরাণী পাখী (Secretary bird) তোতাপাখী, ফ্রেমিঙ্গো প্রভৃতি প্রধান।

ন্যাটাল নামের উৎপত্তি কিরূপে হইল, এইবার সেই কথা বলিতেছি। বিখ্যাত পর্ত্তুগীজ আবিষ্কারক ভাস্কো-ডা-গ্যামা ১৪৯৭ খৃষ্টাব্দে এই দেশটি আবিষ্কার করিয়া ইহার নাম রাখিলেন Terra Natalis। সে দিন হইতে এ দেশের নাম ন্যাটাল নামেই পরিচিত হইয়া আসিতেছে। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ইহা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হয়।

অরেঞ্জ-ফ্রি-ষ্টেট্

এই দেশটি ভাল ও অরেঞ্জ নদীর মধ্যে অবস্থিত। এখানকার লোকদেরও প্রধান উপজীবিকা হইতেছে

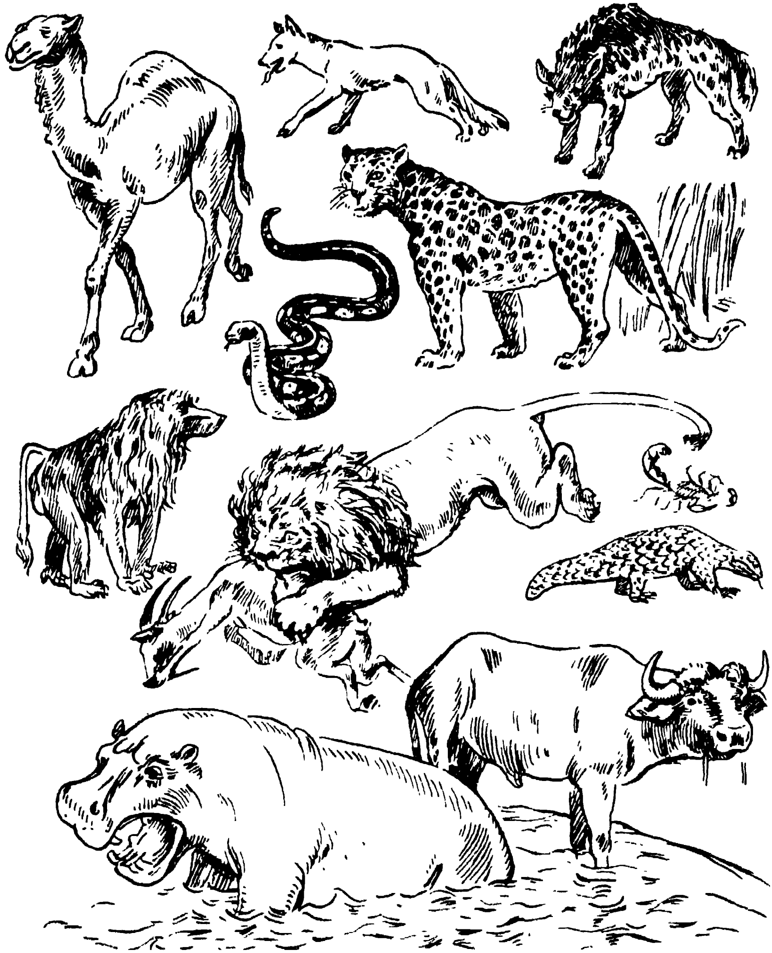


১৯,০০০ ফিট উচ্চে কিলিমান্জারো পর্ব্বতের একটী জলপ্রপাত

পশুচারণ। এ দেশের প্রধান শস্য হইতেছে গম। এই দেশটির অধিবাসীদের মধ্যে বুয়ারেরাই অধিক

সংখ্যায় বাস করে। বুয়ারেরা ওলন্দাজ বা ডাচ্ ভাষায় কথাবার্ত্তা বলে। অরেঞ্জ-ফ্রি-ষ্টেটের রাজধানীর নাম ব্লুমফন্টিন্ (Bloemfontein)। এই প্রদেশটি ৩,০০০ ফিট হইতে ৫,০০০ হাজার ফিট উচ্চ মালভূমির উপর অবস্থিত। এজন্য দৃশ্য মনোরম।

এ দেশের চারিদিকে বিচ্ছিন্ন ভাবে অনেক পর্ব্বতশ্রেণী অবস্থিত। কোনটির উচ্চতা ৭,০০০ কোনটির বা ৮,০০৯ হাজার ফিট। ন্যাটালের সীমান্ত প্রদেশে ড্র্যাকেনস্বার্গ (Drakensberg) নামে পর্ব্বতশ্রেণীর উচ্চতা প্রায় ১০,০০০ ফিট হইবে।



আফ্রিকার জীবজন্তু

এ দেশের অধিকাংশ ভূ-ভাগই অনুর্বর। তবে বৃষ্টির পর ফসল প্রায় সব দেশেই জন্মে। এখানকার জল বায়ু স্বাস্থ্যকর।

গম, ভুট্টা, তামাক এবং নানাজাতীয় ফসল এদেশে উৎপন্ন হয়। সময় সময় পঙ্গপালের উৎপীড়নে শস্যক্ষেত্র বিনষ্ট হইয়া যায়।



আফ্রিকার বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ ও তাঁহাদের জীবন-যাত্রা

এখানকার গোচারণভূমিতে মেষ, ছাগল প্রভৃতি গৃহপালিত পশুরা স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে।

পশ্চিম অরেঞ্জ-ফ্রি-ষ্টেটে হীরকের খনি আছে এবং উত্তর অঞ্চলে কয়লার খনি আছে। রাজ-

ধানীর নাম ব্লুমফন্টিন (Bloemfontein)। এ সহরের শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীরা বেশীর ভাগই ওলন্দাজ বা ডাচ্ ভাষায় কথোপকথন করে। এ দেশের পরিমাণ ফল ৪৯,৬৪৭ বর্গ মাইল।

ট্রান্সভাল

দক্ষিণ-আফ্রিকা-সম্মিলনী (Union of South Africa)র অন্তর্ভূত ট্রান্সভাল প্রদেশ ভাল্ নদীর অপর তীরে অবস্থিত বলিয়াই এ দেশের নাম হইয়াছে ট্রান্সভাল (Transval)। ট্রান্সভাল দেশটি মালভূমির উপর অবস্থিত। মালভূমির উচ্চতা ১,০০০ ফিট হইতে ৬,০০০ হাজার ফিট পরিমাণ হইবে। জোহানেসবার্গের (Johannesburg) এর কাছাকাছি উচ্চতা হইবে প্রায় ৭,০০০ ফিট।

এদেশে সোনার খনি বিশেষ লাভজনক ব্যবসা। এখানে হীরা পাওয়া যায়। কয়লার খনি ও অনেক আছে। টিন, তামা প্রভৃতিও পাওয়া যায়।

শীতের সময় এদেশের জল বায়ু শুষ্ক ও উষ্ণ থাকে এবং সে সময়ে ঝড়ো হাওয়া বহিয়া যায়। অক্টোবর হইতে মার্চ্চ মাস—গ্রীষ্ম ও বর্ষা ঋতু। সে সময়ে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দেখা দেয়।

জোহানেস্বার্গ দক্ষিণ আফ্রিকার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ সহর। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে মাত্র এই সহরটি স্থাপিত হইলে ও অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বিশেষ বিখ্যাত হইয়াছে। লণ্ডন হইতে কেপ্ টাউন যাইবার Imperial Airways এর ইহা একটী প্রধান বিরতি স্থান। উইট্ওয়াটার্স র‍্যাণ্ডের (Wit waters rand) বিখ্যাত স্বর্ণক্ষেত্র, জোহানেস্বার্গের কাছে অবস্থিত। প্রিটোরিয়া (Pretoria) হইতেছে ট্রান্সভালের রাজধানী।

বেচুয়ানাল্যাণ্ড

অরেঞ্জ ও জ্যাম্বেসী নদীর মধ্যবর্ত্তী দেশ। এ দেশের অধিবাসিগণকে বেচুয়ানা (Bechuana) বলে। ইহার পরিমাণ ফল-২৭৫,০০০ বর্গমাইল। অধিবাসী বেচুয়ানারা বাণ্টু ভাষায় কথা বলে। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে এদেশ ব্রিটিশ অধিকারে আসিয়াছে। অন্য প্রধান সহরের নাম ভ্রিবার্গ। এই সহর দুইটী কেপ্ টাউন রেলের ধারে অবস্থিত। এদেশের অধিকাংশ ভূভাগই উচ্চ তৃণভূমি। গোরু, মহিষ, ভেড়া, প্রভৃতির জন্য এ স্থান বিখ্যাত। ভুট্টা, কফি, ধান, ইক্ষু, তামাক, চীনেবাদাম প্রভৃতির চাষ খুব হয়। সোণা ও অন্যান্য অনেক ধাতুর খনি এখানে আছে। ব্রিটিশ বেচুয়ানাল্যাণ্ডের পরিমাণ ফল হইবে, প্রায় ৫১, ২৫৪ বর্গ মাইল।

রোডেশিয়া

রোডেশিয়া (Rhodesia)—দক্ষিণ আফ্রিকার অন্তর্ভূত অতি সুন্দর দেশ। এখানকার জল-বায়ু অতি উৎকৃষ্ট। বিখ্যাত সিসিলরোডসের নামানুযায়ী এ স্থানের নাম রোডেশিয়া হইয়াছে। এদেশ যখন প্রথম আবিষ্কৃত হয়, তখন বনে-জঙ্গলে দেশটি ঢাকা ছিল। সিংহ, হস্তী, গণ্ডার প্রভৃতি বন্য-পশুর বিচরণভূমি ছিল, আর এখন ইহার নানা স্থানে কত বৃহৎ ও সুন্দর নগর গড়িয়া উঠিয়াছে।

কেনিয়া

আফ্রিকার পূর্ব্বদিকে সমুদ্রের উপকূলে কয়েকটী ব্রিটিশ উপনিবেশ ও রক্ষিত রাজ্য আছে (Protectorate) ইহার নাম—কেনিয়া উপনিবেশ (Kanya-Colony)। এখানে অনেক ভারতবাসী বাস করে। ভারতীয় শ্রমজীবীদের দ্বারাই এই উপনিবেশের উন্নতি হইয়াছে। কেনিয়ার প্রধান সহর ও বন্দরের নাম—মোম্বাসা। এই কেনিয়ার দক্ষিণ দিকে টাঙ্গানিইকা। পৃথিবীব্যাপী মহাসমরের পর জার্ম্মেনরা এই দেশটী ইংরাজের হাতে ছাড়িয়া দিয়াছেন।

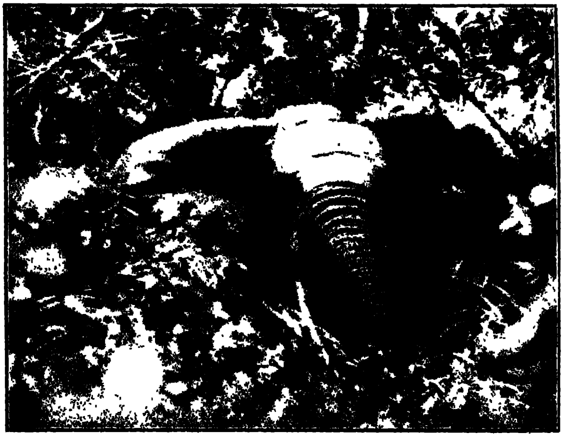
কেনিয়ার কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে ধান, ভুট্টা, নারিকেল এবং তুলা প্রধান। এখানকার রাজধানীর নাম **নাইরোবি** (Nairobi)। নাইরোবি সহরটী ৫,৫০০০ ফিট—উচ্চে অবস্থিত। উগা রেলপথের ইহা একটী কেন্দ্রস্থল।

উগাণ্ডা

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ হইতে উগাণ্ডা একটি ব্রিটিশ প্রোটেক্টোরেট বা রক্ষিত রাজ্য। মধ্য আফ্রিকায় ইহা অবস্থিত। এদেশের বেশীর ভাগ ভূ-ভাগ

উচ্চ মালভূমির উপর অধিষ্ঠিত। সমুদ্রতটরেখা হইতে উচ্চতা প্রায় ৩,০০০ ফিট হইবে। ইহার দক্ষিণ ভাগের কোন কোন পর্ব্বত-শিখরের উচ্চতা প্রায় ২,০০০ ফিট হইবে। নীলনদের জলধারা উগাণ্ডার ভূভাগকে শস্যশ্যামল করিয়া তুলিয়াছে। এদেশে কিয়োগো (Kiogo) হ্রদ এবং ভিক্টোরিয়া, এড্‌ওয়ার্ড, অ্যালবার্ট, এবং বাডলাফ হ্রদের কতক কতক অংশ পড়িয়াছে।

উগাণ্ডার জল বায়ু-ভাল। দক্ষিণ পশ্চিম দিকের নিম্নভাগের সমতলভূমিতে ম্যালেরিয়ার



উগাণ্ডার হাতী

প্রকোপ খুব বেশী। দেশটা উর্ব্বর। এদেশে তুলা, রাবার, কোকোয়া, কফি প্রভৃতি জন্মে। উগাণ্ডার গভীর বনে ও জলাশয়ে বন্যহস্তী, সিংহ, মহিষ, চিতাবাঘ, জলহস্তী পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। এজন্য শিকারীরা দলে দলে এদেশে শিকার করিতে আসে। এখান হইতে হাতীর দাঁত, ও চামড়া প্রভৃতি বিদেশে রপ্তানী হয়।

উগাণ্ডা চারটী প্রদেশে বিভক্ত। দেশীয় রাজারা ব্রিটিশ রেসিডেন্টের অধীনে নিজ নিজ রাজ্য শাসন করেন।

এখানকার প্রধান সহর ও রাজধানীর নাম—এণ্টেবি (Entebbe) এবং দেশীয় রাজ্যের প্রধান সহরের নাম—ক্যাম্পালা (Kampala) উগাণ্ডা রেলপথের সহিত মোম্বাসার (কেনিয়ার) সঙ্গে ও ভিক্টোরিয়া হ্রদ পর্য্যন্ত সংযুক্ত। এদেশের পরিমাণ ফল, ৯৪,২০৪ বর্গমাইল।

আফ্রিকার বিখ্যাত নীলনদ উগাণ্ডার জলাভূমির ভিতর দিয়াই প্রবাহিত হইয়া আলবার্ট নিয়াঞ্জা হ্রদে প্রবেশ করিয়াছে।

এ কয়টি প্রদেশ ছাড়াও সোয়াজিল্যাণ্ড (Swaziland) বাসুটোল্যাণ্ড, (Basutoland) রক্ষিত রাজ্য। গ্যাম্বিয়া (Gambia) ও এসেনসান্, (Ascension) সেণ্ট হেলেনা, (St Helena) মরিশাস্ (Mauritius), সোকোত্রা (Socotra) এবং আরও কয়েকটি দ্বীপও ব্রিটিশরাজ্যের অন্তর্ভূত।

মিশর

মিশর দেশ হইতেছে আফ্রিকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভূ-ভাগ, এই হিসাবে কেননা মিশরের প্রাচীন শিক্ষা ও সভ্যতা এই মিশরকে আশ্রয় করিয়াই বড় হইয়াছিল। এ দেশের পরিমাণ ফল হইতেছে ৩৮৩,০০০ বর্গ মাইল। মিশরের জনসংখ্যা হইবে ১৫,১৬৬,৭৫৬। ১৯১৪—১৯২২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইহা ব্রিটিশ সংরক্ষিত রাজ্যরূপে পরিচালিত হইয়াছে। সুডান্ ব্রিটিশ ও মৈশরীয় যুক্ত শাসনে শাসিত হইতেছে।

মিশর দেশটি দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত। উত্তর ভাগ (Upper Egypt) এস্‌সৈদ (Es-Said) ভাগ্যবান্ দেশ। নিম্ন ভাগের (Lower Egypt) নাম এর্‌রিফ্ বা (Er-Rif) উর্ব্বর প্রদেশ নামে দেশবাসিগণের নিকট আখ্যাত।

নীলনদ যদি না থাকিত তাহা হইলে মিশরের গৌরব বা সমৃদ্ধি কিছুই থাকিত না। আমাদের দেশের গঙ্গা নদীরই মত নীলনদ মিশরের পবিত্র নদী এবং মিশরকে পুণ্যভূমিতে পরিণত করিয়াছে।



প্লেটো ও অ্যারিষ্টটলের দার্শনিক মতবাদ

১৮০৬ পৃষ্ঠার পর

প্লেটোর দর্শনের খানিকটা আভাস তো পেলে, কিন্তু তাঁর সব চেয়ে বেশী নামজাদা যে বই, তাতে দর্শন ছাড়া রাজনীতির কথাও রয়েছে ঢের। তোমরা সবাই বড় হয়ে একদিন তার "রিপাবলিক" বা "গণ-রাষ্ট্র" বইখানি পড়বে। বইখানি সমাজ ও রাষ্ট্রের একটা কাল্পনিক ছবি। সমাজ বা রাষ্ট্র কাকে বলে, সে কথা জানো তো? সমাজ অর্থাৎ মানুষের সঙ্গে মানুষ মিলে একসাথে যে থাকে, তাকে বলে সমাজ, কিন্তু সেই একসাথে থাকার মধ্যেও কত রকম বেরকম যে রয়েছে, তা বলা যায় না। ধর, আমাদের দেশে হিন্দুসমাজ রয়েছে, মোস্লেম-সমাজ রয়েছে, তাদের থাকবার ধরণ-ধারণ ভিন্ন। সমাজের যেটা শক্তির দিক্ তাকে বলা যায় রাষ্ট্র—অনেক সময় বিভিন্ন সমাজ একই রাষ্ট্রের অধীন, হিন্দুসমাজ ও মোস্লেম-সমাজ দুইই বাঙ্গলার রাষ্ট্রের অংশ। সামাজিক নিয়ম হিন্দু-মুসলমানের অনেকটা আলাদা। কিন্তু রাষ্ট্রের নিয়ম, অর্থাৎ আইন, দুইয়ের বেলাই এক। এ সম্বন্ধে অনেক জানবার, অনেক শেখবার, অনেক ভাববার আছে, সেগুলি তোমরা বড় হয়ে নিজেরাই আবিষ্কার করবে।

দুনিয়ার কোন সমাজ বা রাষ্ট্রই মানুষকে পুরোপুরি খুসী করতে পারে না—মানুষ যখন যে অবস্থায় থাকে, তা নিয়ে কোনদিনই তারা তুষ্ট নয়, তুষ্ট থাকা বোধ হয় উচিতও নয়, তাই মানুষ সর্ব্বদাই ভাবে কি ভাবে রাষ্ট্র বা সমাজের ব্যবস্থার উন্নতি করা যায়। আমাদের দেশে ধর ছোঁওয়া ছুঁয়ীর ব্যাপার এখনো রয়েছে, মেয়েদের পর্দ্দারও অনেক জায়গায় বাড়াবাড়ি—আমরা চাই যে তার বদল হোক। আমাদের দেশ পরাধীন—আমরা চাই যে দেশকে স্বাধীন করে তার রাষ্ট্রশক্তি আমরা নিজেদের হাতে নেবো দেশে গরীব দুঃখী আর থাকবে না, ব্যবসায় বাণিজ্য বেড়ে যাবে, অসুখ-বিসুখে

চিকিৎসার ব্যবস্থা ভাল হবে। এমনি মানুষ সমস্ত দেশে রয়েছে রাষ্ট্র এবং সমাজের উন্নতির স্বপ্ন দেখেছে, তার জন্য সাধনা করেছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত আদর্শ ভবিষ্যৎ সমাজের যত ছবি আঁকা হয়েছে, তার মধ্যে "রিপাব্লিকের" মত এত বড় কল্পনা বোধ হয় আর নেই। 'রিপাব্লিক' মানে গণ-তন্ত্র, অর্থাৎ দেশের সমস্ত লোকের মত নিয়ে দেশের রাজকার্য্য চালান। প্লেটোকে কিন্তু গণ-তন্ত্রের বিরোধীই বলতে হয়—তাঁর মতে আদর্শ সমাজে দার্শনিকদের হাতে শাসন-ভার থাকবে, সাধারণ মানুষ কেবলমাত্র তাদের আদেশ পালন করবে। এমনকি **প্লেটোর** মতে গোলাম বা ক্রীতদাসও সমাজে থাকবে—তারা কিন্তু মানুষের অধিকার পাবে না। গোরু, ঘোড়া যেমন আমাদের কাজে লাগে, সমাজের নাগরিকদের তারা তেমনি করে সেবা করবে। আমরা আজ-কাল গণ-তন্ত্র বলতে যা বুঝি, তার সঙ্গে ঢের তফাৎ, কতখানি বলতো?

সাধারণ মানুষের উপর প্লেটোর রাগের একটা কারণ বোঝা যায়। সাধারণ মানুষের নির্ব্বুদ্ধিতার জন্যই যে সক্রেটিসকে মরতে হ'ল, একথা প্লেটো কোনদিন ভুলতে পারেন নাই, সেই থেকে তাঁর ধারণা হয়ে গেল যে সাধারণ মানুষের হাতে শাসনভার দিলে অবিচার এবং অত্যাচারের সীমা থাকবে না। তাই তাঁর আদর্শ সমাজে সাধারণের হাত থেকে শাসনভার কেড়ে নিয়ে দর্শনবিদ্ শাসকদের হাতেই তিনি তা ছেড়ে দিয়ে-ছিলেন। তার কারণও তিনি স্পষ্ট করে বলে গিয়েছেন—একমাত্র দার্শনিকেরাই সত্যকে জানেন, বাকী সমস্ত লোক কেবলমাত্র পৃথিবীর বাইরের দিকই দেখে। বাইরের পৃথিবীকে আমরা জানি ইন্দ্রিয় দিয়ে, আর ইন্দ্রিয় দিয়ে যা জানা যায়, তার মধ্যে সবই অস্থির, সবই মায়া—সাধারণ লোকের হাতে শাসনভার ছেড়ে দিলে তাই বিচারেরও কোন স্থিরতা থাকবে না, যখন যা খুসী তাই তারা করবে, ফলে পৃথিবী অরাজকতায় ভরে উঠবে।

প্লেটো আরো অনেক যুক্তি দিয়েছেন, অনেক এমন কথা বলেছেন যে হঠাৎ শুনলে চমকে উঠতে হয়। দর্শনবিদ্ যাঁরা শাসক হবেন, তাঁদের নিজের বলতে ঘর বাড়ী কিছু থাকবে না—সমাজে সমস্ত জিনিষেই সকলের অধিকার থাকবে, কেউ কোন জিনিষ নিজের সম্পত্তি মনে করে ভোগদখল করতে পারবে-না। আজকাল যেমন বড়লোকের বড় বাড়ী, কত দাসদাসী, মোটর গাড়ীর ছড়াছড়ি প্লেটোর আদর্শ রাজ্যে কিন্তু তা হবার যো নেই। যখন যার দরকার, সেই তখন মোটর চড়বে, ততক্ষণ মোটরখানি তার। যেই তার দরকার ফুরুলো, অন্য লোকে মোটর খানি নিয়ে নিল তখন আবার মোটরখানি ততক্ষণের জন্য তার। 'রূপকথায়' তোমরা পড়েছ—

> হিজল কাঠের নৌকা, মন পবনের দাঁড
> বল দেখি সত্যি করে এখন তুমি কার?

তার উত্তরে নৌকো বলে—

> যাহার হাতে দাঁড়
> তখন আমি তার।

প্লেটোর রিপাব্লিকের ব্যবস্থাও যেন তাই।

প্লেটো ভেবেছিলেন যে মানুষের যদি কিছু নিজস্ব না থাকে, তবে লোভও থাকবে না—মারামারি দ্বন্দ্ববাদের ও অনেক কারণ দূর হবে। লোকে ঝগড়া করে কেন? যার যেটুকু আছে, তাতে সে তুষ্ট নয়, চায় যে তার ধনসম্পত্তি আরো বেড়ে যাক। প্রত্যেকেই চায় যে তার হোক্ সব চেয়ে

ভাল বাড়ী, তার থাক্ সবচেয়ে বড় ক্ষেত-খামার, তার হোক সব চেয়ে বেশী টাকা-পয়সা। কিন্তু ঘর বাড়ী খেত খামার টাকা-পয়সা যদি কারু নিজস্ব না হয়, তবে লোকে বিবাদ করবে কি নিয়ে? সবাই সমাজের জন্য খাটবে, যার যে রকম প্রয়োজন, সে সেই রকম পাবে কেউ কিছু জমাতে পারবে না, এই হোল প্লেটোর আদর্শ রাজ্যের ব্যবস্থা।

বিশেষ করে শাসকদের বেলা প্লেটো এ বিষয়ের কড়াকড়ি চেয়েছেন, বলেছেন দেশের যারা শাসক হতে চায়, তারা দেশের কাজ করবার জন্যই শাসক হবে, অর্থলোভে নয়, আজকাল আমাদের দেশে যেমন যে যত বড় চাকরী করে, অর্থাৎ দেশের সেবা করবার যে যত বেশী সুযোগ পায়, সেই বেতনও চায় তত বেশী। এ দেখলে প্লেটো অবাক হয়ে যেতেন, ভাবতেন যে এ নিশ্চয়ই পাগলে কাণ্ড। এমনি বড় চাকরী করা মানে ক্ষমতা হাতে পাওয়া ক্ষমতার টানেই লোকে তা পেতে চায়, তার উপর যদি তাতে টাকা পয়সারও বাড়াবাড়ি থাকে, তবে লোকে দেশের সেবা করতে না এসে নিজের স্বার্থের খাতিরে, টাকা পয়সার লোভে সে সমস্ত কাজ পেতে চাইবে। তার ফলে হবে এই যে দেশের শাসন দেশের উপকারের জন্য হবে না—বড় বড় চাকুরেরা নিজেদের সুখ সুবিধার দিকেই দৃষ্টি দেবে বেশী।

সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্লেটো শাসকদের তফাৎটা বড্ড বড় করে দেখেছেন। আইন-কানুন শাসকেরাই করবে, সাধারণ লোকে কেবলমাত্র তাদের হুকুম তামিল করবে। সাধারণ মানুষের বুদ্ধিতে প্লেটোর বিশ্বাস ছিল না, সে কথা আগেই বলেছি। কিন্তু তা হলেও প্রায় সকলেই তো সাধারণ মানুষ তাদের বুদ্ধি ত বেশী না হলেও নিজেদের সুখ-সুবিধা ভালোমন্দ তারা কি একেবারেই বুঝতে পারে না? যে জুতো তৈরী করে, সে হয় তো জুতোর বিষয় আমার চেয়ে ঢের বেশী জানে কিন্তু তবুও জুতো পায়ে দিলে আমার যে কোন্‌খানটায় লাগছে, সে কথা কি আর জুতোওয়ালা বলতে পারে?

আসল কথা সাধারণ মানুষকে প্লেটো নাবালক ভাবে দেখেছেন, ভেবেছেন যে শাসকেরা তাদের শিশুর মতনই লালন-পালন করবে। শাসকদের নামও দিয়েছেন তিনি পালক বা অভিভাবক। কিন্তু শিশুকে যে পালন করে, তার ও তো ভুল হ'তে পারে? শিশু যদি কাঁদে আর দাই যদি ঘুমোতে চায় তা হলে? অবশ্য প্লেটো বলেছেন যে শাসকদের ধনসম্পত্তি থাকবে না, বাড়ীঘর থাকবে না, স্ত্রী-পুত্র কিছুই থাকবে না—এক কথায় নিজের বলতে কিছুই থাকবে না। কিন্তু তা হলেও তাদেরও তো ভুল হতে পারে। একটা প্রবাদ আছে যে একটা মাথায় যতই বুদ্ধি থাক না কেন, হাজার মাথার বুদ্ধি আরো বেশী, তা কি একেবারেই ভুল?

বড় হয়ে তোমরা এ সব বিষয়ে নিজেরা আরো অনেক বেশী ভাববে—নিজেরা প্লেটো এবং আরো অনেক দার্শনিকের বই পড়বে। দেশবিদেশের অবস্থার খবর নেবে, ইতিহাস থেকে শিখবে। একদিন হয় তো তোমাদেরই একজন প্লেটোর মত এ বিষয়ে নতুন কথা বলতে পারবে। এবং আজ যেমন দু'হাজার বৎসর পরে আমরা প্লেটোর কথা নিয়ে ভাবি, তেমনি আরো দু'হাজার বছর পরে তোমাদের কথা নিয়েই কত আলোচনা হবে।

প্লেটো যেমন সক্রেটীসের শিষ্য, প্লেটোর শিষ্যদের মধ্যেও তেমনি **অ্যারিষ্টটল**। তিনজনেরই অসাধারণ বুদ্ধি—মানুষের ইতিহাসে তিনজনেই এক একটা পাহাড়ের শিখরের মতন। কিন্তু প্লেটো আর অ্যারিষ্টটলের মধ্যে মস্ত তফাৎ এই যে প্লেটো তাঁর গুরু সক্রেটীসের মতকে গ্রহণ করে তাঁর দর্শন গড়ে তুলেছেন, আর অ্যারিষ্টটল প্লেটোর মতবাদের ভুল ভ্রান্তি দেখিয়ে তাকে অস্বীকার করবারও চেষ্টা করেছেন। প্লেটোর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল না একথা মনে করলে কিন্তু ভুল হবে। দীর্ঘ কুড়ি বৎসর কাল তিনি প্লেটোর সঙ্গে ছিলেন, তাই প্লেটোর সঙ্গে যেখানে তাঁর পার্থক্য, সেখানেও প্লেটোর মতামত না জানলে অ্যারিষ্টটলের কথা বোঝা সহজ নয়।

আসলে প্লেটো এবং অ্যারিষ্টটলের স্বভাবের মধ্যে মস্ত বড় একটা তফাৎ ছিল। নিজের আদর্শ রাজ্য থেকে সব কবিদের তাড়াবার ব্যবস্থা করলেও আদতে প্লেটো নিজেই ছিলেন কবি। বাস্তবের চেয়ে কল্পনার দিকে তাঁর ঝোক ছিল বেশী, তাই সমস্ত জ্ঞানের মধ্যে অঙ্কের দিকে ছিল তাঁর টান। আর অ্যারিষ্টটল ছিলেন যাকে আমরা বলি কেজো মানুষ। যাকে ধরা যায়, ছোঁওয়া যায়, মাপা যায়, তাঁকে নিয়েই অ্যারিষ্টটলের আনন্দ। অ্যারিষ্টটল তাই অঙ্ক ছেড়ে ইতিহাস নিয়ে পড়লেন—নানা রকম জীব জন্তুর গঠন, তাদের জীবনধারার প্রণালীর হিসেব করে তিনি বাস্তবকে জানতে চাইলেন।

প্লেটো ব্রহ্মকে জানতে চেয়েছিলেন, সে কথা আমরা আগেই দেখেছি। তিনি বলেছিলেন যে ইন্দ্রিয় দিয়ে আমরা যা জানি, তা বদলায়, কিন্তু বদলের মধ্যেও তার স্বরূপ ঠিক থাকে। তাই ব্রহ্মকে জানতে হলে জিনিষের স্বভাব বা স্বরূপকে জানতে হবে, তা নইলে আমরা পদে পদে মুস্কিলে পড়ব। জিনিষগুলি বদলায়, কিন্তু স্বরূপ বদলায় না, কাজেই স্বরূপেরও নিশ্চয়ই আলাদা সত্তা আছে। ধর সাদা ঘোড়া, বাদামী ঘোড়া, কাল ঘোড়া—সমস্তই ঘোড়া। কাজেই স্বভাব বা স্বরূপ বিচার করলে কেবলমাত্র একটারই হিসাব পাই, অথচ সাদা ঘোড়া, কাল ঘোড়া এ গুলি প্রত্যেকই জন্তু হিসেবে আলাদা। কেবলমাত্র তাই নয়। যে সাদা ঘোড়াটা আজ দেখেছি—তিন বছর আগে তার চেহারা, তার বয়স সবই আলাদা ছিল, অথচ তখনো তাকে বলেছি ঘোড়া, আজও তাকে সেই ঘোড়া বলেই জানি। তাই প্লেটো বল্লেন যে দুনিয়ার সমস্ত সাদা ঘোড়া কাল ঘোড়া বাদেও "ঘোড়া"র একটা স্বরূপ রয়েছে, এবং দর্শনে আমরা বিভিন্ন জিনিষের সেই 'স্বরূপ' বা স্বভাবকেই জানতে চাই।

কথাটা নিশ্চয়ই তোমাদের খুব গোলমেলে লাগছে, আর লাগবারই কথা। কিন্তু সত্যি খানিকটা ভাববার কথা রয়েছে, একথা বুঝেছ তো? প্রত্যেক দিনের জীবনে আমরা না বুঝে কথার ব্যবহার করি—দর্শনের কাজ সে সমস্ত কথার আসল মানে বের করা। গোলটেবিল, লম্বা টেবিল, তিনপেয়ে টেবিল চারপেয়ে টেবিল—টেবিল তো কত ধরণের কিন্তু সবগুলিকেই যে টেবিল বলি তার নিশ্চয়ই একটা মানে আছে। টেবিল তিন পেয়েও হতে পারে, চারপেয়েও হতে পারে, লোহারও হতে পারে, কাঠেরও হতে পারে, পাথরেরও হতে পারে। কাজে কাজেই টেবিলের যে সব গুণ বা লক্ষণ প্রথমে চোখে পড়ে, তার প্রত্যেকটাকে এক এক

করে বাদ দিলেও টেবিল টেবিলই থেকে যায়। তাইতো প্লেটো বলেছিলেন যে "টেবিলত্ব" বা টেবিলের "স্বরূপ" যেখানে আছে, সেটাই টেবিল, এ স্বরূপ না থাকলে টেবিলও নাই।

অ্যারিষ্টটল কিন্তু প্লেটোর এ যুক্তি মেনে নেন নাই। তিনি বল্লেন যে টেবিল ছাড়া টেবিলের স্বরূপ নাই। টেবিল যদি কাঠের না হয়, তবে লোহার হবে, লোহার না হয়, তবে পাথরের হবে, তাও না হয় তবে টীন, তামা, সীসা—কোনও না কোন একটা কিছু দিয়ে তৈরী হবে। যদি টেবিলের স্বরূপই থাকত, তবে সে স্বরূপের সঙ্গে সত্যিকারের টেবিলের সম্বন্ধ কি? আর যে টেবিল কাঠেরও নয়, লোহারও নয়, পাথরেরও নয়, তামা, সীসা, টীন কিছুরই নয়, সে আবার কোন্ দেশী টেবিল?

তাই অ্যারিষ্টটল বল্লেন যে টেবিলের "স্বরূপ" টরূপ বলে আলাদা কোন জিনিষ নেই—রয়েছে দুনিয়ার হাজারো ধরণের হাজারো ভাবে তৈরী টেবিল। আর তাদের সবাইকে আমরা টেবিল বলি কারণ তারা আমাদের কাজে লাগে। শেষ পর্য্যন্ত দেখতে গেলে সব জিনিষই তো পঞ্চ ভূতের তৈরী, কাজেই কি দিয়ে তৈরী সে বিচার করলে মানুষের সঙ্গে মোটর গাড়ীরও বেশী তফাৎ নেই।

পঞ্চভূত কাকে বলে জানোতো? অন্ধকার রাত্রে বাঁশ বনে যারা ভয় দেখায়, এ সে রকমের ভূত নয়, এ পঞ্চভূত নেহাৎ আমাদের ঘরোয়া ভূত! ক্ষিতি, অপ্, তেজ মরুৎ, ব্যোম—এই পাঁচটীকে পঞ্চভূত বলা হোত এবং এককালে ধারণা ছিল যে এই পাঁচটী দিয়েই দুনিয়ার যত কিছু তৈরী। আজকাল অবশ্য পঞ্চভূতের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। অপ্ বা জলের মধ্যেও আমরা আজকাল দু'তিন রকমের ভূতের সন্ধান পাই, মাটীর বেলায়ও তাই। যাই হোক্ বিজ্ঞানও আজ বলে যে সমস্ত জিনিষকেই যদি বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, তবে শেষ পর্য্যন্ত কতগুলি উপাদান বা ভূতের সন্ধান পাওয়া যায়, সে গুলির আর বিশ্লেষণ চলে না। সে গুলিকেই দুনিয়ার মালমসলা মনে করা যায়। যেমন ধর কয়লার টুক্রা আর হীরে—দুইই কার্ব্বন দিয়ে তৈরী, কিন্তু কার্ব্বন যে কি দিয়ে তৈরী, সে কথা জিজ্ঞেস করলে আর কোন উপাদান খুঁজে পাওয়া যায় না, তখন হয় তো বলতে হয় যে তারো গোড়ায় রয়েছে বিদ্যুৎপ্রবাহ! কথাটী শুনলে তোমরা তো অবাক হবেই—কখনো তোমরা ভেবেছ যে অনড় অচল পাথর যাকে আমরা মনে করি, আসলে কিন্তু তা মোটেই অনড় অচল নয়। বিজলি কণার ছুটোছুটী মাতামাতিতে সেখানে প্রলয় চলেছে বল্লেও বেশী বলা হয় না।

অ্যারিষ্টটল অবশ্য বিদ্যুৎকণার খোঁজ পান নি। কিন্তু তবু তিনি বলেছিলেন যে সমস্ত পৃথিবী এবং পৃথিবীর সমস্ত জিনিষই একধরণের উপাদানে তৈরী, কেবলমাত্র তাদের সংগঠন বা সাজাবার প্রণালী আলাদা। ধর খাটও কাঠের তৈরী, আবার বাক্স টেবিলও কাঠের তৈরী। কাজেই তাদের উপাদান হিসাবে তারা এক অথচ তাই বলে খাটকে বাক্স বা টেবিল বলে ভাবতে পার? কাঠের তৈরী হলেও খাটে আর টেবিলে কাঠ সাজাবার রীতি আলাদা—এই সাজাবার রীতি বা ধরণকে অ্যারিষ্টটল বলেন সংগঠন। ফলে কথাটা দাঁড়াল এই যে উপাদানে সব জিনিষই এক, কিন্তু সংগঠনে তারা আলাদা।

কেবলমাত্র একথা বল্লে নানান জিনিষ এবং তাদের পরস্পরের সম্বন্ধে বোঝা যায় না। তাই অ্যারিষ্টটল আরো বল্লেন যে একটা জিনিষের যা উপাদান, অন্যের হয়ত তাই সংগঠন। ধর গাছের উপাদান—কাঠ, তা সে সেগুন গাছই হোক আর সুপারি গাছই হোক। গাছের সংগঠন রয়েছে বলে তারা সবাই তবু গাছ। সুপারি গাছের বেলা কিন্তু তার উপাদানই হল—গাছ, তার সংগঠন হল সুপারি। এমনি করে প্রত্যেকটি জিনিষেরই উপাদান এবং সংগঠন পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত—সিঁড়ির মতন সব যেন ধাপে ধাপে উঠে গেছে। তার গোড়ায় হল পঞ্চভূত, বা তারও তলায় বিদ্যুৎকণা, সেখানে সংগঠন বড় বেশী একটা নেই, আর তার সমাপ্তিতে হল—ঈশ্বর, সেখানে আর উপাদান নেই, সমস্তই সংগঠন।

এ গোলমেলে ব্যাপার তোমাদের বেশী ভালো না লাগবারই কথা, কিন্তু তবু যদি একবার তোমরা ভাবতে সুরু কর, তাহলে দেখবে যে এ সব গোলমেলে প্রশ্ন পুরোপুরি এড়িয়ে চলাও অসম্ভব। বাক্স আর টেবিলকে আলাদা মনে করে কেন? তার তো খানিকটা বর্ণনা অ্যারিষ্টটলের মধ্যে পেলে, কিন্তু আলাদা আলাদা জিনিষ আলাদা থাকে কেন, সে প্রশ্নও অ্যারিষ্টটলকে ভাবিয়ে তুলেছিল। ধর তোমাদের যদি আজ দুটো মুরগীর ডিম এনে দিই, তবে সে ডিমের কোন্‌টি থেকে মোরগ হবে আর কোন্‌টি মুরগী হবে, সে কথা কখনো বলতে পারবে না। অথচ একটা ডিম থেকে মোরগই হবে—অন্যটি মুরগীই হবে। তেমনি ধর যদি দু'তিন রকমের ধানের বীজ আনা যায়, তবে বীজ দেখে বোধ হয় কেহই বলতে পারবে না যে কোন্ বীজ কোন ধানের! অথচ এক একটা বীজ থেকে এক এক রকমের ধান হবে। তেমনি বট গাছের তো এতটুকু ফল, অথচ তারই মধ্যে সমস্ত বট গাছটি নিহিত রয়েছে, জল বাতাস মাটির যোগ সেই বীজটি থেকেই বিপুল বটগাছ জেগে ওঠে।

এমনি ধরণের প্রশ্ন অজস্র, আর সেই সমস্ত প্রশ্ন নিয়েই অ্যারিষ্টটলের কারবার। প্লেটো সমস্ত সৃষ্টিকে জানতে চেয়েছিলেন, অ্যারিষ্টটল বল্লেন যে সব কিছু জানবার আগে প্রথমে সৃষ্টির খুঁটিনাটির খোঁজ করতে হবে। তাই একদিক থেকে অ্যারিষ্টটলকে বিজ্ঞানের জন্মদাতা বলা যেতে পারে, কারণ বিজ্ঞানেরও কাজ খুঁটিনাটির হিসাব করে তাদের অর্থ বের করা। বড় হয়ে রাজনীতি, দর্শন, নীতিশাস্ত্র এসব ব্যাপারে অ্যারিষ্টটলের অনেক কথা শুনে অবাক হয়ে যাবে, ভাববে যে দু'হাজার বছর আগে কেমন করে তার মাথায় এসব চিন্তা এল।

রাষ্ট্রের কথায় তিনি বলেছেন যে সবাই যাতে মিলে-মিশে থাকতে পারে, সকলেই ভালভাবে জীবন কাটাতে পারে সেইজন্যই রাষ্ট্র। প্রায় প্রত্যেকেই নিজের ব্যক্তিগত ভালো প্রথম চায়, তাই নিজের ইচ্ছার উপর ঝোঁক দিলে আর রাষ্ট্র টিকে না। সকলের যা ভাল হবে, সেই রকম আইনই তাই রাষ্ট্রের ভিত্তি, রাজাও যদি সত্যিকার রাজা হন, তবে তাঁকেও সেই আইন মেনে নিতে হবে।

এমনই করে কেমন সুন্দর ভাবে প্লেটো ও অ্যারিষ্টটল তাঁদের দার্শনিক মত প্রচার করেছেন। তা এখানে তোমাদের বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করেছি। তোমরা বেশ মন দিয়ে পড়লে সব কথা বুঝতে পারবে।



মহাকবি সূরদাস

১২৮৯ পৃষ্ঠার পর

গুরু রামানন্দ রাম নামে উপাসনা এবং ভক্তি-ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি স্ত্রী-পুরুষ ও জাতি-বিচার তুলিয়া দিয়া সকল জাতীয় শিষ্য করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন ঃ—

জাত পাঁত পুঁছে নহি কোই।
হরিকো ভজে, সো হরি কা হোই॥

তাঁহার বারজন প্রধান শিষ্য মধ্যে একজন মুসলমান, একজন চর্ম্মকার, একজন রাজপুত, একজন জাট, একজন নাপিত, দুইজন স্ত্রীলোক ও পাঁচজন ব্রাহ্মণ। ইহার মধ্যে মুসলমান বৈষ্ণব কবীর ও চর্ম্মকার রবিদাস [রইদাস, রুইদাস, রুহিদাস] আপনাদের স্বতন্ত্র 'পন্থ' স্থাপন করিয়াছিলেন। সে সময়ে তাঁহার জাতিবিচার অমান্য করিবার প্রভাব এত বেশী হইয়াছিল যে, রাজপুত-কুলগৌরব মারবার-নন্দিনী, মেবারবধূ, রাজমহিষী ভক্তকবি মীরাবাঈ চর্ম্মকার-নন্দন রবিদাসকে আপনার শিক্ষাদাতা গুরু বলিয়া স্বীকার করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই।

রাম-উপাসকদের কবি যেমন তুলসীদাস, কৃষ্ণ-উপাসক বৈষ্ণবদের সেইরূপ, কবি সূরদাস। তুলসীদাস যেমন বাল্মীকির রামায়ণ হইতে মূল বিষয় লইয়া আপনার ইচ্ছামত "রামচরিত-মানস" ইত্যাদি পাঁচখানি গ্রন্থ সৃজন করিয়াছেন, সূরদাস সেইরূপ ভাগবতের ছায়া লইয়া শ্রীকৃষ্ণের জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা তাঁহার "সূরসাগরের" পদে করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের শৈশবের ঘটনাগুলি এমন মধুর ভাবে এবং স্বাভাবিক ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, সেগুলি পড়িতে বসিলে মনে আনন্দের ঢেউ খেলিতে থাকে এবং ঘটনাগুলি যেন চক্ষের সম্মুখে দেখিতে পাওয়া যায়।

সূরদাসের কবিত্বের জন্য তাঁহার উপাধি ছিল "সাগর"। মহাকবি সূরদাসের সম্বন্ধে পরবর্ত্তী কালের একজন সমালোচক বলিয়াছেন,—

সূর সূর, তুলসীশশি, উডগণ কেশবদাস।
অব কে কবি খদ্যোতসম, কহিঁ কহিঁ করঁ্যা প্রকাশ॥

অর্থাৎ কবিদের মধ্যে সূরদাস সূর্য্যসম, তুলসীদাস চন্দ্রসম ও কেশবদাস তারাসম। এখনকার অন্য কবিরা খদ্যোৎসম, মধ্যে মধ্যে বা কোথাও কোথাও একটু উজ্জ্বল হইয়া ওঠেন আবার নিবিয়া যান।

সূরদাসের জীবন সম্বন্ধে বেশী কথা জানা নাই। সূরদাসের লেখা 'দৃষ্টিকূট" নামক একখানা বই

হইতে কবির জীবনী সম্বন্ধে তাঁহারই লিখিত বিবরণী হইতে যাহা জানা যায় তাহা এখানে তোমাদের কাছে বলিতেছি।

চোহান-সম্রাট পৃথ্বীরাজের সভাতে "ব্রহ্মভট্ট" বা "রাও" অর্থাৎ ভাট-জাতীয় বরদাই কবি চন্দ রাজসভাসদ ও রাজকবি ছিলেন। সম্রাট তাঁহাকে জ্বালা দেশ [পঞ্জাবের আধুনিক জলন্ধর জেলায় জ্বালামুখী পর্ব্বতের চারিদিকের দেশ] দান করিয়াছিলেন, ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সেখানকার রাজা করিয়া দিয়াছিলেন। চন্দের চার পুত্র-মধ্যে দ্বিতীয় পুত্র গুণচন্দ্র, তাঁহার পুত্র শীলচন্দ্র, তাঁহার পুত্র বীরচন্দ্র, পৃথ্বীরাজের বংশধর, রণথম্বের রাজা বীরবর হাম্মীরের বাল্যসহচর ছিলেন। "তাসু বংশ অনূপ ভযো হরিচন্দ অতি বিখ্যাত।" অর্থাৎ তাঁহার বংশে অতি বিখ্যাত হরিচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি আগ্রাতে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। এখানে বীরচন্দ্রের কয় পুরুষ পরে হরিচন্দ্র তাহা লেখা নাই, কিন্তু দু-এক পুরুষের বেশী হইবে না, কেননা, হাম্মীর যুবক অবস্থায় ১৩০১ ঈশাব্দে অলাউদ্দীন খিলজীর সহিত যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন ও সুরদাসের জন্ম ১৫০০ ঈশাব্দের কাছাকাছি কোনো সময়ে হইয়াছিল, যাহা হউক, হরিচন্দ্রের পুত্র বীর রামচন্দ্র গোপাচলে [গোয়ালিয়রে] বাস করিয়াছিলেন, রামচন্দ্রের সাত পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল, প্রথম ছয় পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র, উদারচন্দ্র, রূপচন্দ্র, বুদ্ধিচন্দ্র, দেবচন্দ্র, ও সংস্কৃতচন্দ্র দেশের রাজা লোদী পাঠানদের অধীনে যোদ্ধা ছিলেন, বিদেশী আক্রমণকারী মোগল বাবরের সহিত যুদ্ধে তাহারা সকলেই বীরগতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন,—

সো সমর করি শাহিসেবক, গয়ে বিধি কে লোক।
রহে সুরজচন্দ, দৃগতেঁ হীন, ভর বর শোক ॥

কেবল সর্ব্বকনিষ্ঠ দৃষ্টিহীন সুরজচন্দ [বা সুরদাস] শোকাকুল হইয়া জীবিত রহিলেন।

সুরদাস অন্ধ ছিলেন, তিনি ঐ পদে লিখিয়াছেন, আমার ছয় ভ্রাতা বীরগতি প্রাপ্ত হইলেন, কেবল আমি অন্ধ, শোক করিতে বাঁচিয়া রহিলাম।

পরো কূপ, পুকার কাহু শুনি না সংসার।
সাতয়েঁ দিন আয় যদুপতি কীন আপ উদ্ধার ॥

একদিন আমি কূপে পড়িয়া গিয়াছিলাম, পড়িয়া অনেক চেঁচাইলাম, কিন্তু কেহ শুনিতে পাইল না, সপ্তম দিবসে স্বয়ং ভগবান যদুপতি আসিয়া আমাকে উদ্ধার করিলেন। এপদের এরূপ অর্থও হইতে পারে, যে, আমি সংসার রূপ কূপে পড়িয়াছিলাম আমি অনেক কাঁদিলাম, কিন্তু সংসার আমার ডাক শুনিল না, তখন আর্ত্ত হইয়া ভগবানকে ডাকিতে লাগিলাম, সপ্তম দিবসে, অর্থাৎ শেষে স্বয়ং ভগবান আমাকে উদ্ধার করিলেন।

দিযো চখ, ক্যা কহি শিশু শুন মাঁগ বর যো চাই।
হোঁ কহী প্রভু ভকতা চাহত, শত্রু নাশ সুভাই ॥

তিনি আমার চক্ষু দান করিলেন, ও বলিলেন, "রে শিশু, শুন, আপনার ইচ্ছামত বর চাও।" অথবা তিনি আমাকে জ্ঞান-চক্ষু দান করিলেন ও বর চাহিতে আজ্ঞা করিলেন। আমি বলিলাম, "প্রভু, আমি ভক্তি চাই ও আমার শত্রুনাশ হউক।"

দূসরে ন রূপ দেখোঁ দেখি রাধেশ্যাম,
শুনত করুণাসিন্ধু ভাখী, "এবমস্তু" সুধাম ॥

"আমি রাধাশ্যাম রূপ দর্শন করিয়া সেই চক্ষে আর অন্য কোন রূপ দেখিতে চাহি না। এই কথা করুণাসিন্ধু ভগবান আমার ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া বলিলেন, "এবমস্তু"।

ভগবান আমাকে বর দিয়া বলিলেন,—তোমার অক্ষয় বুদ্ধি, বিচার-শক্তি, বিদ্যা ও মান হইবে। তাহার পর—"নাম রাখো মোর সুরজদাস, সুর, সুশ্যাম। তাহার পর তিনি অন্তর্দ্ধান করিলেন, আমি ব্রজে বাস করিতে লাগিলাম। কিন্তু এই কবিতার সহিত তাঁহার "সুরসারাবলী"র অন্য স্থানের উক্তির [শিব বিধান তপ করেউ বহুত দিন] ঠিক সামঞ্জস্য হয় না। এ কবিতানুসারে তিনি শিশুকাল হইতেই "যদুপতি" উপাসক, "বহুতদিন" 'শিব-বিধান তপ' আর হয় না।

যাহা হউক, দিল্লীর নিকট সিহীগ্রামে ব্রহ্মভট্ট বা ভাটকুলে সুরদাস জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অন্য এক প্রবাদ আছে যে, তিনি আগরা হইতে নয় ক্রোশ দূরে মথুরার পথে, যমুনাতীরে গউঘাট নামক গ্রামে বাস করিতেন। তিনি জন্মান্ধ হউন বা না হউন, তিনি যে বিদ্বান্ ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি সংস্কৃত-সাহিত্য, ব্যাকরণ,

কাব্য, অলঙ্কার জানিতেন, পুরাণে তাঁহার ভাল জ্ঞান ছিল। ইহা ছাড়া তিনি ফার্সি ভাষাও অল্প-বিস্তর জানিতেন।

সুরদাসের গুরু বল্লভাচার্য্য শেষ বয়সে কয়েক-বৎসর কাশীতে ছিলেন। তিনি বৃন্দাবন বাসকালে ১৫২৮ ঈশাব্দের পূর্ব্বে সুরদাসকে দীক্ষিত করিয়া থাকিবেন। তিনি ১৫৩০এর শেষে বা ১৫৩১ আরম্ভে দেহরক্ষা করিয়াছিলেন। ১৫১৩ ঈশাব্দে সুরদাসের জন্ম হইলে দীক্ষার সময়ে ১৫ বৎসরের বেশী বয়স হয় না; অতএব "শিব বিধান তপ করেউ বহুত দিন" এই কথার অর্থ হয় না। আবার ১৬০৭ ঠিক হইলে তাঁহার জন্ম ১৪৮৩ ঈশাব্দে হয়। বেরমের সময়ে (১৫৬০ ঈশাব্দে) তাঁহার বয়স ৭৭।৭৮ হয়। তিনি আপনার পিতার সপ্তম ও শেষ পুত্র, অতএব সে সময়ে তাঁহার পিতা বাঁচিয়া থাকিলে তাঁহার বয়স একশত হইতে অনেক বেশী হইয়া যায়। ওরূপ বৃদ্ধের গান শুনিয়া লক্ষ টাকা দান করা বিশ্বাস হয় না। অতএব এ সকল উক্তির সামঞ্জস্য হইতেছে না।

আইন-ই-আকবরীতে সুরদাসের পিতার নাম "বাবা রামদাস গোয়ালিয়রী, গোয়েন্দা" ও সুরদাসের নাম "সুরদাস, পিসর বাবা রামদাস গোয়েন্দা" এইরূপে লেখা আছে, অর্থাৎ উভয়ের নাম গায়ক শ্রেণী মধ্যে পাওয়া যায়। প্রবাদ আছে, যখন বৃদ্ধ বয়সে তিনি ত্যাগী সাধুরূপে বৃন্দাবনে বাস করিতেন, বিষয়ীদের কাছেও যাইতেন না; তখন আকবর বাদশা সুখ্যাতি শুনিয়া তাঁহাকে ডাকাইয়া পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি যাইতে অস্বীকার করিলেন। বৃন্দাবনের মুসলমান-শাসনকর্ত্তা তাঁহাকে বলিলেন, "আপনি সাধু, সম্রাট আপনার কিছুই করিতে পারিবেন না, কিন্তু আপনি না যাইলে আমার চাকরী যাইবে, আমার অন্ন মারিবেন না।" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন সম্রাট কেন যাইতে বলিয়াছেন। শাসনকর্ত্তা আজ্ঞাপত্র দেখাইলেন, তাহাতে এইমাত্র লেখা ছিল, "শুনিয়াছি বৃন্দাবনে সুরদাস নামে ভাল কবি ও গায়ক আছে, তাঁহাকে আমার কাছে পাঠাইবে।" ইহার পর পাল্কী ঘোড়া ইত্যাদি যে যান-বাহনের প্রয়োজন হয় তাহার ব্যবস্থা করিবার আজ্ঞা ছিল। সুরদাস ফতেপুর-সীকরীতে আসিয়া সম্রাটের সহিত দেখা করিলেন। বাদশা গান শুনিতে চাহিলে তিনি তানপুরা সঙ্গতে মুখে মুখে রচনা করিয়া গান ধরিলেন।

গান শেষ হইলেও কিছুক্ষণ সকলে নিস্তব্ধ ছিলেন, পরে বাদশা বলিলেন, "আমি পূর্ব্বে তোমার দুইটি গুণের কথা শুনিয়াছিলাম যে, তুমি ভাল কবি ও ভাল গায়ক, আজ দেখিলাম তোমার আর একটি গুণ আছে, তুমি ভাল ফকির [সাধু] ও বটে।" বাদশা তাঁহাকে একশতী "মনসব" পুরস্কার দিলেন। একশতী মনসবের তিনটি শ্রেণী ছিল, যাহার মাসিক বেতন ৫০০৲, ৬০০৲ ও ৭০০৲ টাকা। মনসবদারেরা সমর-বিভাগের কর্ম্মচারী রূপে গণিত হইত। একশতী মনসবদারকে যুদ্ধের জন্য দশটি ঘোড়া, তিনটি হাতী, দুইটি উট, ও পাঁচটি ভারবাহী বলদের গাড়ী রাখিতে হইত, যুদ্ধের সময়ে তাহারা সম্রাট নিযুক্ত সেনাপতির অধীনে যুদ্ধ করিত, কিন্তু সাধুদের এ সকল রাখিতে হইত না, তাহারা বেতনের পূরা টাকা পাইত। সুরদাস বলিলেন, "আমি ভিখারী সাধু, আমি এ-মনসব কি করিব? আমি লইব না।" আকবর হাসিয়া বলিলেন, "আমি বুঝিয়াছি তুমি প্রকৃত সাধু, তোমার অর্থের প্রয়োজন নাই, সেই জন্য লইতেছ না। তুমি সাধু বলিয়া সাধুর গর্ব্ব ত্যাগ করিতেছ না; কিন্তু আমিও বাদশা, আমি বাদশার মান ছাড়িব কেন? তোমাকে এ মনসব লইতে হইবে, তবে তোমার অর্থের যদি প্রয়োজন না থাকে, তুমি দান করিও।"

এই গল্পে বোধ হইতেছে, যে সুরদাস ১৫৭৪ ও ১৫৮৩ ঈশাব্দের মধ্যে বাঁচিয়াছিলেন, কেন-না ফতেপুর-সীকরী ১৫৭৩ হইতে ১৫৮৩ পর্য্যন্ত রাজধানী ছিল ও ১৫৭৪ ঈশাব্দে মনসব-রীতি স্থাপিত হইয়াছিল। এ সময়ে তাঁহার বৃদ্ধাবস্থা, কিন্তু জন্ম বা মৃত্যুর ঠিক সময় জানা নাই। ইহার পর কোনো সময়ে সুরদাস গোকুলে দেহরক্ষা করিয়াছিলেন।

সুরদাস প্রথম বয়সে, শৈব থাকা কালে, নল-দময়ন্তীর গল্প কবিতায় লিখিয়াছেন, কিন্তু এখন সে পুস্তক পাওয়া যায় না। পরিণত বয়সে

বৈষ্ণব-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার পর শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক গেয় পদ ছাড়া আর কিছুই রচনা করিতেন না। মধ্যে মধ্যে কেবল কয়েকটী দোহা রচনা করিয়াছিলেন। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সুরদাসের পূর্ব্বেও পণ্ডিতেরা সংস্কৃতেই কবিতা রচনা করিতেন, হিন্দিতে গেয় পদ ছাড়া কবিতা-রচনা প্রথা তখনও প্রচলিত হয় নাই। হিন্দিতে ছন্দ ও অলঙ্কার শাস্ত্র এই সময়েই কবি কেশবদাস প্রচলিত করিয়াছিলেন।

সুরদাসের "সুরসাগর" প্রকাণ্ড গ্রন্থ, তাহাতে কবি শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের জীবনের প্রত্যেক ছোট বড় ঘটনা বর্ণনা করিয়া বহু সুললিত পদ রচনা করিয়াছেন। প্রবাদ আছে, পুস্তকখানি যখন রচিত হইয়াছিল তখন তাহাতে একলক্ষ [মতান্তরে ১,২৫,০০০] পদ ছিল, কিন্তু এখন পাঁচ হাজার অপেক্ষা বড় বেশী পদ পাওয়া যায় না। তবে এখনও সব সংগ্রহ করা হয় নাই, পশ্চিম অঞ্চলের সাহিত্যিকরা এখনও চেষ্টা করিতেছেন। হিন্দী ভাষাতে সুরদাসের পদের মত হৃদয়গ্রাহী কবিতা আর নাই বলিলেই হয়। একজন কবি উঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,—

কিধোঁ সুর কো সর লগো ? কিধোঁ সুর কী পীর ?
কিধোঁ সুর কো পদ শুনো ? যো অস্ বিকল শরীর ?

তোমার কি হইয়াছে ? তুমি কি কোনো সুরবীরের শরাঘাতে পীড়িত ? কিংবা তোমার কি শূলবেদনা হইয়াছে ? কিংবা তুমি কি সুরদাসের পদ শুনিয়াছ, যে তোমার শরীর এত বিকল হইয়াছে ?

বাঙ্গালা সাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণের ও চৈতন্যদেবের শৈশব ও কৈশোর লীলার অনেক মধুর পদ আছে, তাহাতে সমস্ত জীবনের সত্য ও কল্পিত ঘটনাগুলি অতি মধুর ভাষাতে বর্ণিত হইয়াছে। সেইরূপ সুরদাসের হিন্দী পদগুলি ও অতি হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বর্ণিত। সেগুলি ভক্ত গায়কের মুখে শুনিতে বড় মধুর। এদেশের গ্রামে গ্রামে বালক-বালিকা হইতে তানসেনের মত গায়কেরা পর্য্যন্ত অতি আনন্দের সহিত ঐ পদ গাহিয়া থাকে। প্রবাদ আছে, আকবর বাদশা মিঞা তানসেনের মুখে সুরদাসের পদ শুনিতে ভালবাসিতেন।

যখন শ্রীকৃষ্ণ দুগ্ধপোষ্য শিশু, দোলায় শুইয়া থাকেন, তখনকার বর্ণনা করিয়া সুরদাস গাহিতেন—

যশোদা হরি পালনে ঝুলাওয়েঁ।
ইহি অন্তর অকুলায় উঠে
হরি যশোমতি মধুরে গাওয়েঁ ॥

যখন শ্রীকৃষ্ণের কিছু বয়স বাড়িয়াছে তখন নন্দরাজা তাঁহার হাত ধরিয়া দাঁড়াইতে ও হাঁটিতে শিক্ষা দিতেছেন, শিশু পড়িয়া যাইতেছে, তিনি আবার তুলিয়া দাঁড় করাইয়া দিতেছেন, বার-বার একটা কথা বলাইয়া কথা কহিতে শিখাইতেছেন,—

গহে অঙ্গুরিয়া তাত কী নন্দ চলন সিখাওয়ৎ।
অররয়ার গির পরৎহ্যাঁ, কর টেকি উঠাওয়ৎ ॥
বার বার বকি, শ্যাম সোঁ কছু বোল বকাওয়ৎ।
সুর শ্যাম মুখ দেখি মহর মন হর্ষ বঢ়াওয়ৎ ॥

এ বর্ণনা কত স্বাভাবিক হইয়াছে, ইহাতে কৃত্রিমতার লেশমাত্র নাই। যখন শিশুর আধ আধ বোল ফুটিয়াছে তখন মাতার কাছে শিশুসুলভ আবদার করিতেছে,—

মৈয়া কবহিঁ বঢ়েগী চোটী ?
কিতীবার মোহেঁ দুধ পিয়ৎ ভই,
ইযে অজহুঁ হ্য ছোটী।

মা আমার, মাথার চুল কবে বড় হইবে ? আমি কত দিন হইতে দুধ খাইতেছি, তবু আমার বেণী এত ছোট কেন ?

শিশু আবদার ধরিয়াছে অন্য বালকদের সহিত খেলিতে যাইবে না, তাহাকে অন্য বালকদের সঙ্গে দেখিলেই দাদা বলদেব ক্ষ্যাপায়, বলে,—"বসুদেব তোর পিতা ও দেবকী তোর মাতা ॥"

খেলন অব মেরী জাৎ বলইয়া।
যবহিঁ মোহিঁ দেখৎ লরকন্ সঙ্গ,
তব হিঁখিজৎ বল—ভইয়া।
মোসেঁ কহৎ তাত বসুদেব কো,
দেবকী তেরী মইয়া ॥

আর একদিন আকাশের চাঁদ খেলনারূপে লইবার জন্য শিশু আবদার করিতেছে, মাতা যশোদা তাহাকে নানারূপে ভুলাইতেছেন,—

চন্দ্র খিলোনা ল্যাহোঁ মইয়া মেরী,
চন্দ্র খিলোনা লইহোঁ।
কো পয় পানা ন করিহোঁ, বেণী
সির ন গুথৈ হোঁ ॥

জৈ হৌ লোট অভই ধরণীপর,
তেবী গোদ ন অইহৌ।
লাল কহৈহৌ নন্দ ববা কো,
তেরো সুৎ কহৈহৌ ॥
কান লায় কছু কহৎ যশোদা,
দাউ হি ঁ নাহি ঁ শুনৈহৌ।
চন্দাহুতে অতি সুন্দর তোহি ঁ নবল
দুলহনিযা বিযৈহৌ ॥
তেরী সোঁ মেরী শুন মৈয়া,
অবহি ঁ বিয়াহন জৈহৌ।
সূরদাস সব সখা বরাতী নূতন
মঙ্গল গৈহৌ ॥

মা আমার, আমি চাঁদ লইয়া খেলা করিব। না দিলে আমি দুধ খাইব না, মাথার বেণী বাঁধিয়া দিতে দিব না। আমি এখনই ধরণীতে লুটাইব, তোব কোলে যাইব না, আমি নন্দ বাবার পুত্র হইব, তোর পুত্র হইব না। যশোদা কানের কাছে মুখ আনিয়া চুপি চুপি বলিতেছেন, তোমাকে একটি কথা বলি, তাহা বলদেবকে বলিব না, চাদ অপেক্ষা সুন্দরী বধু আনিয়া তোমাব বিবাহ দিব। (এই কথা শুনিয়া শিশু আনন্দে বলিল,—তোমার দিব্য, মা, চল এখনই বিবাহ করিতে যাইব। সূবদাস বলিতেছেন, সকল সখা ও ববযাত্রীরা মিলিয়া নূতন মঙ্গল গীত গাহিব।

শিশু আর একটু বড হইয়াছে, প্রতিবাসী ব্রজগোপীদের ঘরে গিয়া শিকা হইতে ননী চুরি করিয়া খাইতে শিখিয়াছে, গোপীরা যশোদার কাছে অভিযোগ করিতেছে, শিশু কৃষ্ণ অভিমান করিযা জয়ী হইতেছে ;—

মৈয়া মেরী, মঁ্যা নহি ঁ মাখন খায়ো।
ভোর ভয়ো গইয়ন কে পাছে,
মধুবন মোহি ঁ পঠায়ো ॥
চার পহব বংশীবট ভট্‌কিয়ো,
সাঁঝ পরে ঘর আয়ো ॥
মঁ্যা বালক, বহিয়ন কো ছোটো,
ছিকো কিস্ বিধ্ পায়ো ? ॥
গোয়াল বাল সব ব্যাব পরে হঁ্যা,
বর্‌বস্ মুখ লপটায়ো ॥
তূ জননী মন কী অতি ভোরী,
ইনকে কহে পতিয়ায়ো।
জিয় তেবে কছু ভেদ্ উপজ হ্যা,
জান পবাযো জাযো ॥
ইয়হ লে অপনী লকুট কমরিয়া,
বহুতহী নাচ নচায়ো ॥
সূরদাস তব বিহঁসি যশোদা
লে উব কণ্ঠ লগাযো ॥

মা আমার, আমি মাখন খাই নাই। ভোববেলাই ত তুমি আমাকে গরু লইযা মধুবনে পাঠাইযাছিলে। সমস্ত দিন বংশীবটে ঘুরিযা সন্ধ্যাব সময়ে ঘরে আসিলাম। আমি ত বালক, আমার হাত ছোট, শিকাতে হাত গেল কেমন করিযা ? গোয়ালেব বালকেবা শক্রতা করিযা আমাব মুখে মাখন মাখাইয়া দিযাছে। মা জননী, তোব মন সাদা (বা কপটতাহীন), ইহাদের কথায বিশ্বাস করিলি। আমি পরের ছেলে বলিয়া তোব মনে কিছু ভেদজ্ঞান হইযাছে। (যখন এত কথাতে ও যশোদা নবম হইলেন না, তখন শিশুব শেষ যুক্তি কান্না ও অভিমান) এই নে তোব কৌপিন ও কম্বল, আমাব চাইনা, তুই অনেক নাচ নাচালি। সূবদাস তখন হাসিযা ফেলিলেন, ও যশোদা কৃষ্ণকে কোলে তুলিযা কণ্ঠে ধাবণ করিলেন।

সূবদাসেব সমসাময়িক ভক্ত কবি নাভাজী "ভক্তমাল" নামক পুস্তকে ভক্তদের জীবনীর মধ্যে সূবদাসেব জীবনী লিখিয়াছেন, কিন্তু সে লেখা এত সংক্ষিপ্ত যে, থাকা না থাকা সমান। তাহাতে এইমাত্র আছে যে সূরদাস দরিদ্র পিতা-মাতার সন্তান, ভক্ত ও কবি ছিলেন। 'ভক্তমালেব' টীকাকার লিখিয়াছেন তিনি ব্রাহ্মণ। ইহা ছাড়া এত বড় কবি সম্বন্ধে লিখিবার মত আর কিছু পান নাই।

সূরদাসের মৃত্যুব পব তাঁহাব কবিতাবলির প্রথম সংগ্রহ-কর্ত্তা ছিলেন, ঐ বেরমের একমাত্র পুত্র নবাব আবদুল রহিম খান খাঁ। এই আবদুল রহিম স্বয়ং তুর্কী ফার্সী ও হিন্দী ভাষায় একজন উচ্চশ্রেণীর কবি ছিলেন। রহীমের সৎ সই (সপ্তশতী দোহা সংগ্রহ) এখনও হিন্দী-সাহিত্য আকাশে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করূপে বিরাজমান।



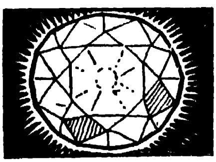
কোহিনূর হীরা কি ? উহা ইংল্যাণ্ডে গেল কেন ?

১০৪০ পৃষ্ঠার পর

হীরা মাণিক বলিতেই তোমরা কোহিনূরের নাম করিবে। তোমরা পড়িয়াছ কি না জানি না, আমরা ছেলেবেলা "পদ্যপাঠ" প্রথম ভাগ নামে একখানা কবিতার বইতে পড়িয়াছিলাম—

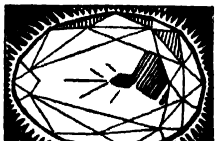
"গোলকুণ্ডা প্রদেশের হীরক আকর
ইচ্ছা হলে টাকা দিয়ে কর তুমি ক্রয় !" ইত্যাদি।

ভারতবর্ষে গোলকুণ্ডার হীরকখনি এক সময়ে জগদ্বিখ্যাত ছিল। কোহিনূর—সেই গোলকুণ্ডার খনিতেই পাওয়া গিয়াছিল।—আমাদের দেশে বরাবর প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে যে—এই জগৎ-প্রসিদ্ধ কোহিনূর শ্রীকৃষ্ণের স্যমন্তক মণি, সে যাহাই লোকে বলুক না কেন। ইহার ইতিহাস এইরূপ—অনেককাল এই বিখ্যাত হীরকটি



কোহিনূর হীরক

মালবদেশের রাজাদের কাছে ছিল। দিল্লীর বিখ্যাত সুলতান আলাউদ্দীন ১৩০৪ খ্রীষ্টাব্দে মালবদেশের নৃপতিদিগকে পরাজিত করিয়া এই হীরকটি গ্রহণ করেন। প্রায় আড়াইশত বৎসর পরে উহা মোগল সম্রাট হুমায়ুন বাদশার হাতে আসে। সম্রাট ঔরঙ্গজীবের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত ইহা ছিল মোগলদের অধিকারে। বিখ্যাত তখৎ-তাউস বা ময়ূরাকৃতি-আসনের, ময়ূরের একটি চোখের গায়ে এই মণিটি সংলগ্ন ছিল।—তারপর দিল্লীর বাদশাহ মহম্মদ শার, রাজত্বকালে নাদির শা যখন দিল্লী আক্রমণ করেন, তখন তিনি দিল্লী অধিকার করিয়া দিল্লীর ধনভাণ্ডার তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও কোহিনূর মণি পাইলেন না—কেন পাইলেন না জান ?—মহম্মদ শা উহা পাগ্‌ড়িতে লুকাইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। নাদির-শা অত্যন্ত চতুর ব্যক্তি ছিলেন, তিনি মহম্মদশার সহিত সন্ধি স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে দিল্লীতে ফিরিয়া আসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।



কুলীনাম হীরক

মহম্মদশা ফিরিয়া আসিলে পর, বন্ধুত্বের চিহ্নস্বরূপ উভয়ের মধ্যে পাগড়ি বদল হইল। মহম্মদশা পাগড়ি খুলিলে পর তাঁহার পাগড়ির মধ্যস্থিত অপূর্ব্ব মাণিক এই কোহিনূরের জ্যোতিঃ প্রভা চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। মুগ্ধ নাদিরশা পুলকিত হইয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—কোহ্-ই-নূর বা আলোর পাহাড়!—

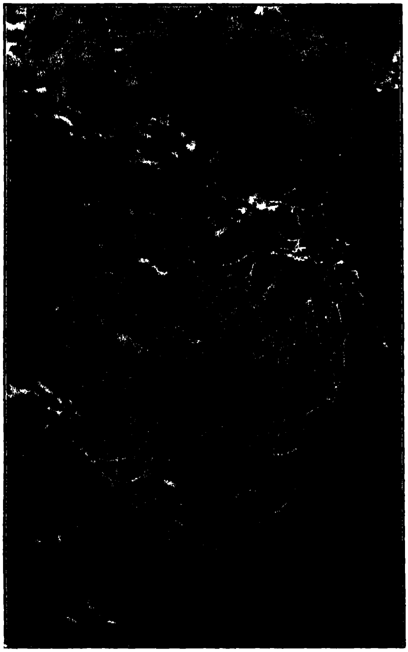
নাদির শার পরে তাঁহার পুত্র শাকখ খাঁ আফ্গান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা—আহমদ শা দুরাণীকে কোহিনূর দান করিয়াছিলেন। দুরাণীদের হাত হইতে এই অপূর্ব্ব মাণিক পঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিংহের অধিকারে আসে। তারপর ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ইহা ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্তগত হয়। উক্ত কোম্পানী মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে ইহা উপহার দেন। তদবধি এই মণি ইংল্যাণ্ডের রাজপরিবারে রহিয়াছে। এখন ইহা ইংল্যাণ্ড ও ভারত-সম্রাটের মুকুট-মণি। একবার কে একজন মহারাজা রণজিৎসিংহকে এই মণির মূল্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন—'পাঁচ জুতি!' অর্থাৎ যাহার শক্তি আছে, যাহারা বিজয়ীবীর এই মণি তাহাদেরই হস্তগত থাকিবে। অনেকের মতে Great Mogul, বা মহৎ মোগল নামে যে বিখ্যাত মণির কথা এক সময়ে শোনা যাইত, সেই হারাণো মাণিকই হইতেছে, এই 'কোহিনূর'!

পূর্ব্বে কোহিনূরের ওজন ছিল ১৮৬ ক্যারেট (Carat)। কিন্তু এমষ্টার্ডামের এক জহুরীকে দিয়া কাটাইবার পর ইহার ওজন দাঁড়াইয়াছে ১০৬ ক্যারেট।

পৃথিবীর সব চেয়ে বড় হীরার নাম কুলিনাস্ (Cullinas)। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে এই হীরাটি পাওয়া গিয়াছে। ইহার ওজন ৩০২৫ ক্যারেট।

মাকড়শা জাল বুনে কেন?

মাকড়শার জাল সর্ব্বদাই ঘরের একোণে সেকোণে ঝুলিতে দেখিতে পাও। অতি সূক্ষ্ম সূতার মনোরম জাল। ঢাকার মসলিনকেও হার মানাইয়া দেয় এমনতর দেখিতে। তোমরা হয়ত মনে কর বেচারা মাকড়শার ত কোন কাজ নাই তাই নিজের ইচ্ছামত কেবলি যখন তখন জাল বুনিয়া যাইতেছে। কিন্তু কথা কি তাই? তা নয়। মাকড়শা কিন্তু অকাজ করে না। সে মিছামিছি সময় নষ্ট করে না। মাকড়শা যে কয়টি কারণে জাল বুনে এখানে তাহা বলিতেছি।—প্রথমতঃ সে যে একটি জালের গুটি তৈরী করে, তাহার প্রয়োজন হইতেছে তাহার ডিমগুলিকে সজীব ও উষ্ণ রাখা। বাহিরের



মাকড়শার জাল

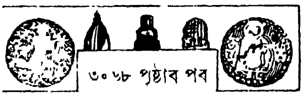
ঠাণ্ডা লাগিবে না। সহসা কেহ শত্রুতা করিতে পারিবে না। মাকড়শার জাল ত নয় উহা একটি ফাঁদ। এই ফাঁদে ছোট ছোট পোকামাকড়েরা ভুল করিয়া যেমন আসিয়া বসে, তখনি মাকড়শা শিকার ধরিয়া খায়। মাকড়শা সাবাস কারিকর বটে। যারা লেস্ (Lace) তৈরী করে তাহারা অনেকে মাকড়শার জালের অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু পারেন নাই।



মিনার—গৌড়



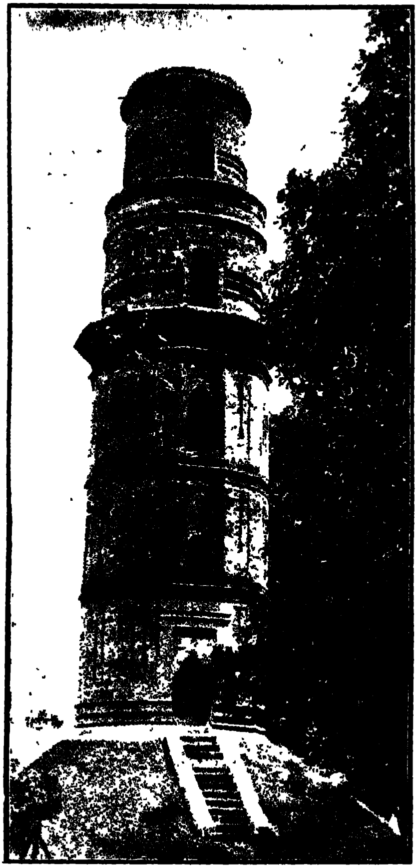
বাঙ্গালায় মুসলমান


৩০৬৮ পৃষ্ঠার পর

ইক্তিয়ার নবদ্বীপ অধিকার করেন নাই বটে, কিন্তু তিনি সেখান হইতে ফিরিয়া গিয়া লক্ষ্মণাবতী অধিকার করিয়াছিলেন। সেই অবধি গৌড় মুসলমানদিগের রাজধানী হইয়া উঠে। মুসলমানেরা বরেন্দ্রী এবং উত্তর রাঢ়া অধিকার করিয়া বাঙ্গলায় রাজত্ব আরম্ভ করিয়া দেন। দক্ষিণ ও পূর্ব্ববঙ্গে সেনরাজগণই রাজত্ব করিতে থাকেন। অনেকদিন পরে তাহা মুসলমানদিগের হস্তগত হয়। ইক্তিয়ারের নবদ্বীপ লুণ্ঠনের পর লক্ষ্মণসেন কয়েক বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাহার পর তাঁহার তিন পুত্র মাধব, বিশ্বরূপ ও কেশবসেন রাজত্ব করেন। লক্ষ্মণের পুত্রগণের পর সেনবংশের আর কোন রাজার সেরূপ পরিচয় পাওয়া যায় না। মধুসেন নামে এক রাজার নাম পরে দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ তাঁহাকে সেন-বংশীয় বলিয়া মনে করেন। হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত কোন কোন পার্ব্বত্য রাজ্যের অধীশ্বরগণ আপনাদিগকে বাঙ্গলার সেনরাজবংশীয় বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। মুসলমানগণের বাঙ্গলায় আসার পর সেনবংশীয়গণ যে পূর্ব্ববঙ্গে অনেকদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন, ইহা কিন্তু জানিতে পারা যায়। ক্রমে ক্রমে মুসলমানেরা তাঁহাদের রাজ্য অধিকার করিয়া লন। সেন বংশই বাঙ্গলার শেষ হিন্দু রাজবংশ। তাঁহাদের পরে আর কোন হিন্দু রাজবংশ প্রবল হইতে পারে নাই। মুসলমানেরাই এদেশের রাজা হইয়া উঠিয়াছিলেন, কিরূপে মুসলমানগণ বাঙ্গালাদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন, ক্রমে ক্রমে তাহা তোমাদিগকে শুনাইতেছি।

মুসলমানগণের রাজত্ব আরম্ভ

গৌড় বা লক্ষ্মণাবতীতে রাজধানী স্থাপন করিয়া মুসল্‌মানেরা এদেশে রাজত্ব আরম্ভ



ফিরোজ মিনার—গৌড

করেন। প্রথমে উত্তর রাঢ়া ও বারেন্দ্রীতে তাঁহাদের অধিকার বিস্তৃত হয়। তাহার পর ক্রমে ক্রমে অনেক স্থান তাঁহারা অধিকার করিয়া লন। বাঙ্গালা জয়ের পর ইক্তিয়ার তিব্বত জয় করিতে রওনা হন। কিন্তু ব্রহ্মপুত্রের উত্তর পার ধরিয়া তিনি গৌহাটির অপর পার হইতে উত্তরে চলিয়া ভুটানের মধ্যে মাত্র প্রবেশ করিয়াছিলেন। পরে বাধা পাইয়া ফিরিতে বাধ্য হন। পথে কামরূপের রাজার আক্রমণে সমস্ত সৈন্য হারাইয়া তিনি ভগ্ন-হৃদয়ে দেবকোটে ফিরিয়া আসেন। দেবকোট বর্ত্তমানে দিনাজপুর সহরের ১৮ মাইল দক্ষিণে। দেবকোটে তাঁহার প্রাণ বিয়োগ ঘটে। কেহ কেহ বলেন, আলিমর্দ্দন নামে খিলজীবংশীয় কোন ব্যক্তি ইক্তিয়ারকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করিয়াছিলেন। ইক্তিয়ার যে সময়ে তিব্বত-জয়ে গমন করেন, সে সময়ে তাঁহার অনুগত মহম্মদ শেরান ও তাঁহার ভ্রাতাকে জাজনগর বা উড়িষ্যা আক্রমণের জন্য পাঠাইয়া দেন। ইক্তিয়ারের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া শেরান দেবকোট চলিয়া আসেন। তখন আলিমর্দ্দন সেখান হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন। শেরান তাঁহাকে তাঁহার আবাস স্থানে বন্দী করিয়া কারারুদ্ধ করেন এবং আবার দেবকোটে ফিরিয়া আসেন খিলজীরা শেরানকেই তাঁহাদের সর্দ্দার বলিয়া স্বীকার করিয়া লন। আলিমর্দ্দান কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া দিল্লীতে উপস্থিত হন। তিনি বাদশাহ কুতবউদ্দীনের নিকট সমস্ত ঘটনা জানাইলে বাদশাহ খিলজীগণের বিরুদ্ধে অযোধ্যার শাসনকর্ত্তাকে বাঙ্গালায় যাইতে আদেশ দেন। তাঁহার সহিত যুদ্ধে শেরান ও অন্যান্য খিলজীগণ

পরাজিত হইয়া দেবকোট হইতে পলায়ন করেন। তাহার পর তাঁহাদের পরস্পরের বিবাদে শেরান নিহত হন। আলিমর্দ্দান বাদশাহের অনুগ্রহে বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া আসেন এবং বাঙ্গলায় রাজত্ব আরম্ভ করিয়া দেন। আলিমর্দ্দান দেব-কোটেই অবস্থিতি করেন।

গৌড়পতির স্বাধীনতা ঘোষণা

বাদশাহ কুতবউদ্দীনের মৃত্যুর পর আলিমর্দ্দান স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া সুলতান আলাউদ্দীন উপাধি ধারণ করেন। তিনি অত্যন্ত অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছিলেন। সেইজন্য খিলজী আমীরেরা তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিলেন। তাহার পর তাঁহারা হাসামুদ্দীনকে আপনাদের সর্দ্দার মনোনীত করেন। হাসামুদ্দীন গিয়াসউদ্দীন উপাধি ধারণ করিয়া আপনাকে স্বাধীন নরপতি বলিয়া প্রচার করেন। তাঁহার নামে মুদ্রা অঙ্কিত হইতে আরম্ভ হয় এবং নামাজের সময় তাঁহার নাম উচ্চারিত হইতে থাকে। গিয়াসউদ্দীন লক্ষ্মণাবতীকে নিজের রাজধানী করিয়া তুলেন। ইক্তিয়ারের মৃত্যুর পর হইতে দেবকোটই রাজধানী হইয়াছিল। এক্ষণে আবার লক্ষ্মণাবতী রাজধানী হইয়া উঠিল। গিয়াসউদ্দীনের সময় লক্ষ্মণাবতী ও দেবকোট উভয় স্থানই রাজধানী বলিয়া গণ্য হইত। গিয়াসউদ্দীন লক্ষ্মণাবতীকে অনেক অট্টালিকায় ভূষিত করিয়াছিলেন। তিনি দেবকোট হইতে লক্ষ্মণাবতী এবং তথা হইতে রাঢ় দেশ পর্য্যন্ত এক উচ্চ রাজপথ নির্ম্মাণ করেন। গিয়াসউদ্দীন কামরূপ জাজনগর প্রভৃতি জয় করিতে গিয়াছিলেন। গিয়াসউদ্দীনের স্বাধীনতা ঘোষণায় কুতবউদ্দীনের জামাতা বাদশাহ আলতমশ্ লক্ষ্মণাবতী অবরোধ করিতে অগ্রসর হন। গিয়াসউদ্দীন বাদশাহ অপেক্ষা আপনাকে দুর্ব্বল জানিয়া, বাদশাহের বশ্যতা স্বীকার করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করেন। তাহার পর আবার তিনি বিহার অধিকার

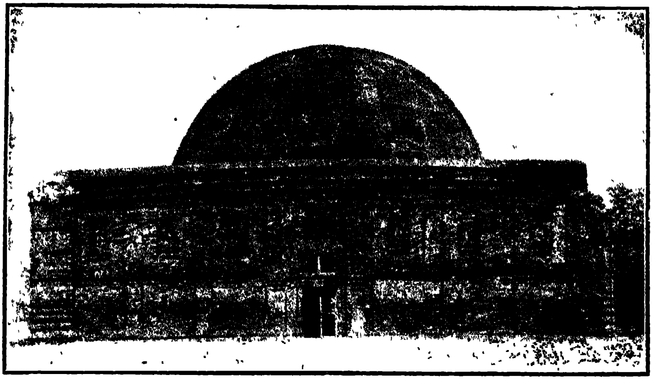


পিয়াসবাড়ীর দীঘি—গৌড়

করিয়া লইলে বাদ্‌শাহের পুত্র নাসিরউদ্দীন মহম্মদ লক্ষ্মণাবতী আক্রমণ করেন। গিয়াসউদ্দীন তাঁহার সহিত যুদ্ধে পরাজিত, বন্দী ও নিহত হন।

উড়িষ্যারাজের গৌড় আক্রমণ

গৌড় ও রাঢ় জয় করিয়া মুসল্‌মানেরা তাহার দুই দিকে কামরূপ বা আসাম ও জাজনগর বা উড়িষ্যা-জয়ের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু অনেকদিন পর্য্যন্ত উঠেন। তিনি অবশ্য দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন। এই সময়ে জাজনগরের রাজা, লক্ষ্মণাবতী আক্রমণ করিতে অগ্রসর হন। তোগান খাঁ তাঁহাকে বাধা দিবার জন্য জাজনগরের সীমা পর্য্যন্ত অগ্রসর হন। কিন্তু পরাজিত হইয়া ফিরিয়া আসেন। তাহার পর তোগান খাঁ দিল্লীতে সাহায্য চাহিয়া পাঠাইলেন, বাদশাহের আদেশে অযোধ্যার শাসনকর্ত্তা তমুর খাঁ লক্ষ্মণাবতীর দিকে যাত্রা করেন। জাজ-



কদমরসুল—গৌড়

কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। পূর্ব্ববঙ্গ জয় করিতেও তাঁহাদের কতক সময় লাগিয়াছিল। ইক্তিয়ারের সময় হইতেই জাজনগর অধিকারের চেষ্টা হয়। নাসির-উদ্দীন মহম্মদের মৃত্যুর পর আবার খিলজীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিল। বাদ্‌শাহ আল্‌তমশ্‌ আর একবার লক্ষ্মণাবতী আক্রমণ করেন। ক্রমে ক্রমে খিলজীরা নিরস্ত হয়। কিছুকাল পরে তোগান খাঁ নামক একজন লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্ত্তা হইয়া নগরের রাজা ইহার মধ্যে লক্ষ্মণাবতীর অভিমুখে অগ্রসর হন। তাঁহার সৈন্য রাঢ়দেশের রাজনগর আক্রমণ করিয়া লক্ষ্মণাবতীতে উপস্থিত হয় এবং তাহা অবরোধ করে। তোগান খাঁ যুদ্ধে পরাজিত হন। তাহার পর তমুর খাঁ আসিয়া উপস্থিত হইলে, উড়িষ্যার সৈন্য লক্ষ্মণাবতী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। এই সময়ে গঙ্গবংশীয় প্রথম নরসিংহ দেব জাজনগর বা উড়িষ্যার রাজা ছিলেন। ইহার পরও মুসল্‌মানগণ



কদম রসুল—গৌড়

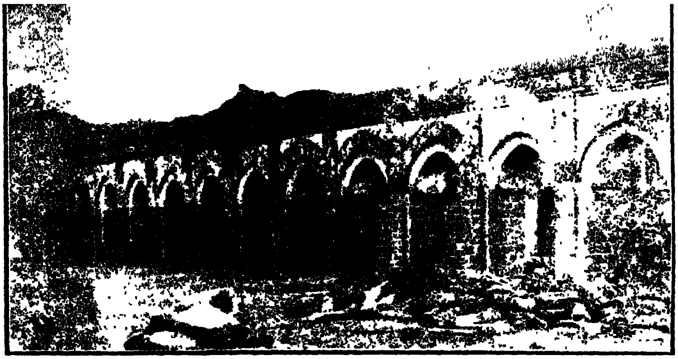
অনেকবার জাজনগর বা উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে সে কথা বলা যাইবে।

সিংহলে বাঙ্গালী পণ্ডিত

এই সময়ে রামচন্দ্র কবি-ভারতী নামে একজন বাঙ্গালী পণ্ডিত যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি বরেন্দ্রীমণ্ডলের বীরাবতী নামক স্থানের অধিবাসী। পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ-কুলে তাঁহার জন্ম হয়। কবি

সুলতান উজবক্

ইক্‌তিয়ার উজবক নামে লক্ষ্মণাবতীতে শাসনকর্ত্তা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া সুলতান মুগীসউদ্দীন উপাধি ধারণ করেন। প্রথম প্রথম তিনি মুদ্রায় বাদশাহের নামের সহিত নিজ নাম অঙ্কিত করাইয়া পরে কেবল আপনার নামই অঙ্কিত করাইতেন। তাঁহার সময়ে বাঙ্গলায় মুসলমান রাজ্য,



৭৬ সোনা মসজিদ— গৌড়

ভারতী বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেইজন্য তাঁহার আত্মীয় স্বজন তাঁহার সহিত সম্বন্ধ রাখেন নাই। রামচন্দ্র তখন স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া সিংহলে উপস্থিত হন। সে সময়ে পরাক্রমবাহু সিংহলে রাজা ছিলেন। তিনি কবি-ভারতীকে সম্মান করিয়া সমুদ্ধাগমচক্রবর্ত্তী উপাধি প্রদান করেন। রামচন্দ্র অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ ও কোন কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থের টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। কবি-ভারতীর প্রণীত "ভক্তি-শতকম্", একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

দক্ষিণে নবদ্বীপ উত্তরে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। উজবকের মুদ্রায় নবদ্বীপের নাম পাওয়া যায়। উজবক ও জাজনগর আক্রমণে গমন করেন। তিনি প্রথম দুইবার জয় লাভ করিয়া তৃতীয়বার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ফিরিয়া আসেন। তাহার পর দিল্লীর বাদশাহের সাহায্যে তিনি জাজনগরের রাজাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। উজ্‌বক কামরূপ জয় করিতে গিয়া পরাজিত ও বন্দী হইয়া প্রাণত্যাগ করেন।

বাঙ্গলায় দিল্লীর বাদশাহ

ইহার কিছুদিন পরে তোগ্রল খাঁ নামে এক পরাক্রান্ত ব্যক্তি লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সে সময়ে গিয়াসুদ্দীন বলবন্ দিল্লীর বাদশাহ ছিলেন। তোগ্রল কামরূপ জয় করিয়া তাহার কতক অংশ অধিকার করিয়া লন। তিনি জাজনগরের রাজাকেও পরাজিত করিয়া বহু হস্তী ও ধনরত্ন লইয়া আসেন তাহার পর তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া সুলতান মুগী-সুউদ্দীন উপাধি ধারণ করেন। তাঁহার নিজ নামে মুদ্রা অঙ্কিত হইতেও আরম্ভ হয়। এইরূপে বিদ্রোহী হইয়া উঠিলে, বাদশাহ বলবন তাঁহার দমনের জন্য আমীর খাঁ নামে একজন সেনাপতিকে পাঠাইয়া দেন। আমীর খাঁ তোগ্রলের নিকট পরাজিত হইয়া ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হন। তাহার পর বাদশাহ আবার আর একজন সেনাপতিকে পাঠান। তিনিও তোগ্রলের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন। অবশেষে বাদশাহ কনিষ্ঠ পুত্র বগড়াখাঁকে লইয়া নিজে বাঙ্গলায় উপস্থিত হন। তিনি অনেক সৈন্য সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। বাদশাহ আসিতেছেন শুনিয়া তোগ্রল জাজনগরের দিকে পলাইয়া যান। বাদশাহ লক্ষ্মণাবতীতে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্ববঙ্গের দিকে যাত্রা করেন। তোগ্রল পূর্ব্ববঙ্গে যাহাতে আশ্রয় লইতে না পারে, তাহার ব্যবস্থার জন্য বাদশাহ পূর্ব্ববঙ্গে গিয়াছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গের সুবর্ণগ্রাম বা সোণারগাঁয়ে উপস্থিত হইয়া তিনি সেখানকার রাজার সহিত মিত্রতা করিয়া তাঁহাকে জলপথে তোগ্রলের গতিরোধ করিতে অনুরোধ করিয়া আসেন। তাহার পর জাজনগরের দিকে অগ্রসর হইয়া তিনি তোগ্রলের অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করেন। কয়েকদিন পরে তোগ্রলের সন্ধান পাওয়া গেলে, বাদশাহের সৈন্যগণ তোগ্রলের শিবির আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে নিহত করে।

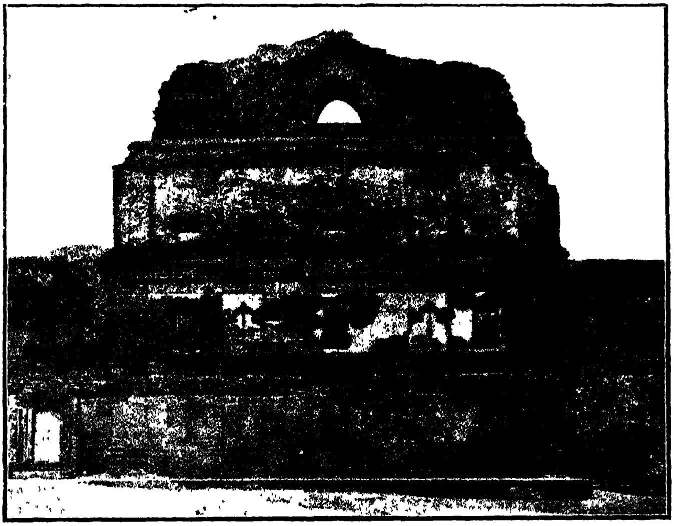
পূর্ব্ববঙ্গপতি দনুজ রায়

বাদ্শাহ বল্বন্ সুবর্ণগ্রামে যে পূর্ব্ববঙ্গাধিপতির সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম দনুজ রায়। তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, অরিরাজ শ্রীমদ্দশরথ দেব নামে চন্দ্রবংশীয় কোন রাজা পূর্ব্ববঙ্গের বিক্রমপুরে রাজত্ব করিতেন। কোন কোন গ্রন্থে দেখা যায় যে সেনবংশের পর তাঁহার রাজত্ব কাল। এই দনুজমাধব ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ কুলীনদিগকে সম্মানিত করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। দনুজমাধব-



আদিনা মস্জিদের অভ্যন্তর ভাগ—গৌড়

কেই রাজা দনুজ রায় বলিয়া মনে হয়। এই সময়ে তিনি স্বাধীনভাবে পূর্ব্ববঙ্গে রাজত্ব করিতেছিলেন। তখনও পর্য্যন্ত মুসলমানেরা পূর্ব্ববঙ্গ জয় করিতে পারেন নাই। বাদশাহ বলবন্ দনুজ রায়ের সহিত মিত্রতা করিয়া তোগ্রলের বিরুদ্ধে তাঁহাকে জলপথ সকল বন্ধ করিয়া রাখিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। সুবর্ণগ্রাম বা সোণারগাঁ সে সময়ে বাঙ্গলায় আসিয়াছিলেন। বগড়াখাঁ অযোধ্যার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। বাঙ্গলা হইতে ফিরিয়া যাওয়ার সময় বাদশাহ বগড়াখাঁকে লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া যান। বলবনের জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃত্যু হইলে তিনি বগড়াখাঁকে দিল্লী যাইতে বলেন। বগড়াখাঁ দিল্লী গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু আবার লক্ষ্মণাবতীতে ফিরিয়া আসেন। ও দিকে



আদিনা মস্‌জিদের মধ্যস্থিত কারুকার্য্য—পাণ্ডুয়া

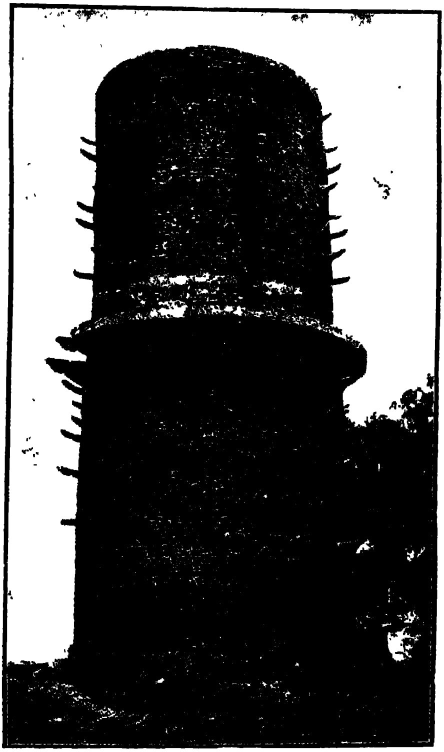
পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী ছিল। দনুজরায় তথায় অবস্থিতি করিতেন। সুবর্ণগ্রাম একটি প্রসিদ্ধ নগর ছিল। সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্র বা মসলিনের জন্য ইহা বিখ্যাত হয়। পূর্ব্ববঙ্গ জয়ের পর মুসলমানেরা সুবর্ণগ্রামকে একটী প্রধান স্থান করিয়া লন। সে কথা পরে বলিব।

পিতা-পুত্রে

আমরা বলিয়াছি দিল্লীর বাদশাহ বল্‌বন্ তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র বগড়াখাঁকে লইয়া বলবনের ও মৃত্যু হয়। তখন সকলে বগড়াখাঁর পুত্র কৈকোবাদকে দিল্লীর সিংহাসনে বসাইয়া দেন। বগড়া নাসিরউদ্দীন মহম্মদ উপাধি ধারণ করিয়া স্বাধীনভাবে বাঙ্গলা শাসন করিতে থাকেন। কৈকোবাদ অত্যন্ত বিলাসী হইয়া উঠিয়াছিলেন। বগড়াখাঁ তাঁহাকে সাবধান হইবার জন্য অনেকবার লিখিয়া পাঠান। কিন্তু তিনি পিতার কথায় মনোযোগ না দেওয়ায়, বগড়াখাঁ নিজেই

দিল্লী যাইবার অভিলাষ করেন। কৈকো-বাদও সৈন্য লইয়া দিল্লী হইতে অযোধ্যার দিকে অগ্রসর হন।

অযোধ্যার সরযূ নদীর উভয়তীরে উভয় পক্ষের শিবির সন্নিবেশিত হয়। বগড়া খাঁ পুত্রের সহিত দেখা করিতে চাহিয়া দূত প্রেরণ করিলেন। মন্ত্রীদের কুপরামর্শে কৈকোবাদ আদেশ করিলেন, বগড়া খাঁ আসিতে পারেন তবে সম্রাটকে যথারীতি কুর্ণিশ করিতে করিতে সম্রাটের নিকট অগ্রসর হইতে হইবে। বগড়া খাঁ এই ব্যবস্থায়ই সম্মত হইলেন। বগড়া খাঁ কৈকোবাদের শিবিরে উপস্থিত হইয়া, সিংহাসনে উপবিষ্ট পুত্রকে ভূমিস্পর্শ করিয়া তিনবার অভিবাদন করিলেন। তাহার পর সিংহাসনের দিকে অগ্রসর হইলে কৈকোবাদ সিংহাসন হইতে নামিয়া আসিয়া পিতার চরণতলে নিপতিত হইলেন। তাহার পর পিতাপুত্রে পরস্পরে আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ হইয়া অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। উপস্থিত ব্যক্তিগণও এ-দৃশ্য দেখিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন নাই। কৈকোবাদ পিতাকে লইয়া সিংহাসনে বসিলেন। পরে আবার নামিয়া আসিয়া পিতার সম্মুখে জানু পাতিয়া রহিলেন। তাহার পর পিতাপুত্রে গোপনে কথাবার্ত্তা হইলে বগড়া খাঁ নিজ শিবিরে ফিরিয়া যান। তিনি পুত্রকে অনেক সদুপদেশ দিয়া লক্ষ্মণাবতীতে চলিয়া আসেন। কৈকোবাদ কিন্তু পিতার উপদেশ রক্ষা করিতে পারেন নাই। তিনি নিজের বিলাসিতার জন্য আপনার জীবন ও দিল্লীর সিংহাসন হারাইতে বাধ্য হন। কয়েক বৎসর, বাঙ্গলা শাসনের পর বগড়া খাঁও পরলোক-গমন করেন। তাঁহার পুত্র পৌত্রেরাও স্বাধীনভাবে লক্ষ্মণাবতীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন। পরে তাহা বল্‌বন্‌ বংশীয় দিগের হস্তচ্যুত হয়।



নিমসরাই স্তম্ভ—পুরাতন মালদহ

প্রাচীন গৌড় নগরীতে সেকালের হিন্দু রাজাদের এবং মুসলমান নৃপতিদের নির্ম্মিত নানা কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া রহিয়াছে। তাহা দেখিলে বিস্মিত ও চমৎকৃত হইতে হয়।



রিপভ্যান উইঙ্কল


৩০৮৯ পৃষ্ঠার পর

আজ এক ভারি অদ্ভুত ঘুমের গল্প তোমাদের বলবো। এমন ঘুমের কথা তোমরা কেউ শুনেছ কিনা জানি না।

আমেরিকার ক্যাট্স্কিল পাহাড়ের নাম শুনেছ কি? এই পাহাড়ের বিষয় অনেক গল্প-গুজব শোনা যায়। পাহাড়টা দেখতে খুব সুন্দর। সূর্য্যের কিরণ যখন এর গায়ে এসে পড়ে তখন তার গায়ের রং ঝলমল করে ওঠে। ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে এই পাহাড়ের রং ভিন্ন ভিন্ন দেখা যায়। এই অপরূপ দৃশ্য যে একবার দেখেছে তার এই ক্যাট্স্কিল পাহাড়কে ভুলে যাওয়া অসম্ভব।

এই পাহাড়ের গায়ে একটি ছোট গ্রাম। গ্রামটা খুব পুরাণো। তারই একটা ছোট কুটীরে রিপভ্যান উইঙ্কল বাস করতেন। তিনি ছিলেন খুব অমায়িক নম্র ও পরোপকারী লোক। তার স্ত্রীর স্বভাব ছিল একেবারে উল্টো! তিনি ভীষণ রাগী এবং দজ্জাল মহিলা—সুবিধা পেলেই স্বামীকে খানিক গালাগাল দিতে ছাড়তেন না। স্বামীটি গোবেচারা ভালমানুষ, স্ত্রীকে তাই খুব ভয় করতেন এবং খুব মেনে চলতেন।

গ্রামে রিপভ্যানের খুব সুনাম ছিল। পরের কোন কাজের দরকার হ'লে ডাক পড়ত রিপভ্যানের! রিপভ্যান, যতই কঠিন কাজ হোক না কেন আনন্দের সঙ্গে করে দিতেন। শিশু-মহলেও তার বেজায় খাতির! তাঁকে প্রায়ই তাদের গুলি খেলায় সাহায্য করতে, তাদের ঘুড়ি ওড়াতে শেখাতে দেখা যেতো। এই জন্য তিনি ঘর থেকে বের হলেই ছেলেরা আহ্লাদে আটখানা হয়ে কেউ তাঁর ঘাড়ে—কেউ তাঁর পিঠে, কেউ তাঁর মাথায় চড়ে বসত।

রিপভ্যানের কিন্তু একটা মস্ত দোষ ছিল। সেটা হচ্ছে তাঁর কুড়েমি—যে কাজ তাঁর করা দরকার; যে কাজ করে তার নিজের ও পরিবারের খাওয়া পরার জোগাড় করতে হ'বে, সে কাজ করতে তার ভারি আপত্তি ছিল। তিনি নিজের জমি, বাড়ী কিছুই দেখাশোনা করতেন না—ক্রমে তার শস্যক্ষেত্র এক জঙ্গলে পরিণত হ'লো। কেউ কিছু বল্লে তিনি তার জমির দোষ দিতেন। তার এমন বিশ্রী জমি—সে না কি হাজার চেষ্টা করলেও তাতে ফসল হয় না! একদিনও চাষ না করেই রিপভ্যান কাজের ভয়ে—তার জমির নামে এই অপবাদ দিতেন। তাঁর স্ত্রী তাঁর এই আলস্যের জন্য প্রায়ই তার সুমধুর বচন তাঁর উপর বর্ষণ করতেন। রিপভ্যান নির্ব্বিকার! সুধা বর্ষণ হলেই তার প্রিয়

কুকুর উল্‌ফকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এক সরাইতে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দিয়ে কাটিয়ে দিতেন। মাঝে মাঝে আড়ালে স্ত্রীকে গালি দিয়ে, (কারণ তার স্ত্রীকে কিছু বলার সাহস তার ছিল



সুবিধা পেলেই স্বামীকে গালাগাল দিতে ছাড়তেন না

না) নিজের মনের ঝাল মেটাতেন। কখনও বা এই আড্ডায় বসে রাজনীতি আলোচনা করবার চেষ্টা করতেন যদিও তার রাজনীতি সম্বন্ধে, জ্ঞান মোটেই ছিল কিনা সে-বিষয় খুব সন্দেহ!

শরৎকালে বিকেলের দিকে একদিন রিপভ্যান তার বন্দুক কাঁধে নিয়ে উল্‌ফকে সঙ্গে নিয়ে পাখী শীকার করতে পাহাড়ের দিকে গেলেন। খানিক দূর যেতেই তার মনে হল কে যেন তার নাম ধরে ডাকছে: "রিপভ্যান, রিপভ্যান"। প্রথমে তিনি ভাবলেন নিশ্চয় তার শুনতে ভুল হয়েছে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার কুকুর চীৎকার করে ঘেউ ঘেউ করে উঠল। সামনের দিকে তাকিয়ে দেখেন একটি অদ্ভুত মানুষ! মানুষটি ছোট্ট বেঁটে, লম্বা লম্বা দাড়ি আর তার বেশভূষা আরও অদ্ভুত—একসঙ্গে যে কতগুলি পাজামা পরেছে তার ঠিক নেই কিন্তু ওপরে শুধু একটি ছোট জামা ও মাথায় এক অদ্ভুত গোল টুপী। মানুষটির ঘাড়ে একটি মদের পিপে—সে অনেক কষ্টে তা' বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। রিপভ্যানকে দেখে সে তাকে সাহায্য করবার জন্য অনুরোধ করল।

রিপভ্যান ত সর্ব্বদাই পরোপকার করতে ব্যস্ত। বুড়ো লোকটীর অনুরোধ শুনে তিনি তাড়াতাড়ি তাকে সাহায্য করতে গেলেন যদিও মনে মনে তাঁর বেজায় ভয় ও কৌতূহল হচ্ছিল। যেতে যেতে রিপ এক ভীষণ শব্দ শুনতে পেলেন। মনে হলো যেন সামনে কোথাও বাজ পড়েছে। চমকে সামনের দিকে তাকিয়ে দেখেন পাহাড়ের ওপরকার পথ ঘুরেফিরে গিয়ে প্রকাণ্ড মাঠে পড়েছে আর সেখানে কয়েকটা অদ্ভুত আকৃতির লোক প্রকাণ্ড গোলা নিয়ে গুলিডাণ্ডার মত এক খেলা খেলছে। এই ভীষণ শব্দ এই খেলারই। মানুষগুলিকে দেখে



রিপভ্যান তার বন্দুক কাঁধে নিয়ে উলফকে সঙ্গে করে পাহাড়ের দিকে গেলেন

রিপভ্যানের পিলে চমকে গেল। এক এক জনের চেহারা এক এক রকম! কারো বা সমস্ত মুখ জুড়ে একটি নাক, কারোও বা প্রকাণ্ড মুখের মধ্যে দুইটী ছোট বিন্দুর সমান চোখ আর প্রত্যেকেরই দাড়ির রং আলাদা।

রিপভ্যান উইঙ্কল

এঁদের দু'জনকে তারা দেখতে পেয়ে খেলা ছেড়ে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইলো। বুড়ো লোকটা তাড়াতাড়ি তার মদের পিপে থেকে মদ এদের পাত্রে ঢেলে দিতে লাগল আর রিপকে তাদের



মদের পিপে অনেক কষ্টে বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল

মদ পরিবেশন করতে বল্লেন। এই লোকগুলি মদ পেয়ে বেজায় খুসী হয়ে আবার খেলায় মত্ত হলো। যদিও তারা খেলায় খুব ব্যস্ত, রিপ তাদের হাঁড়ি মুখ করে খেলা দেখে বেজায় আশ্চর্য্য হলেন। সকলেই ভীষণ গম্ভীর হয়ে খেলছে তারা যেন কতই বিপদে পড়েছে।

খানিকক্ষণ এই ভাবে কাটতে রিপভ্যান একটু নিশ্চিন্ত হ'লেন এবং বেজায় তেষ্টা পাওয়ায় এক চুমুক মদ খেলেন। মদটা তার বড়ই ভাল লাগলো। তিনি একটু একটু করে অনেক খেয়ে ফেল্লেন। তার পর আর তার কিছুই মনে নেই। তার বড় ঘুম পেলো। তিনি যে কতক্ষণ ঘুমিয়েছেন তা কিছুই টের পান নি। হঠাৎ সূর্য্যের আলো গায়ে এসে পড়ায় তার ঘুম ভাঙ্গলো। প্রথমে তার স্ত্রীর কাছে কত বকুনি খেতে হবে মনে পড়লো। তাড়াতাড়ি উঠে দেখেন, তিনি মদের পিপে নিয়ে বুড়োকে যে জায়গায় প্রথমে দেখতে পেয়েছিলেন তিনি সেই জায়গায় পড়ে আছেন। কিন্তু তার আশে পাশে কেউ নেই। সেই বুড়ো—সেই অদ্ভুত লোকগুলি সব কে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। তার কুকুরটিও তাকে ছেড়ে গেছে। রিপভ্যান ভাবলেন নিশ্চয় তিনি এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলেন। তিনি আস্তে আস্তে গ্রামের দিকে যেতে লাগলেন। কিন্তু কি অদ্ভুত! গ্রামে যে সব নতুন লোক চলাফেরা করছে একজনও চেনা লোক রাস্তায় দেখলেন না। পথ-ঘাট সবই তার অন্য রকম লাগতে লাগল। তিনি ভাবতে লাগলেন—তবে কি অন্য গ্রামে এসে পৌচেছেন? না, এই ত সে ক্যাটস্কিলে পাহাড় ঐ ত সে হাডসন্ নদী!" রিপ্ ভাবলেন গত রাত্রের নেশার ফলে তার মাথার নিশ্চয় কোন গোলমাল হয়েছে। রিপ এবার তাঁর বাড়ীর দিকে গেলেন। দেখেন তার ঘর বাড়ী ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে।



একটু করে অনেক খেয়ে ফেল্লেন

স্ত্রীর নাম ধরে ডাকলেন—কোন উত্তর পেলেন না। চারিদিক শূন্য—কোন জন-মানবের চিহ্ন নেই।

রিপভ্যান রাস্তায় বের হতেই রাস্তার কুকুর গুলি ঘেউ ঘেউ করে তার পেছন ধাওয়া করল।

চারিদিক থেকে অচেনা লোক তাকে ঘিরে ফেল্লে। তারা চীৎকার করতে লাগল : "এ নিশ্চয় ডাকাত না দুষ্ট লোক, এর কোন বদ মতলব আছে!" রিপ বেজায় বিপদে পড়লেন। তিনি যে এই গ্রামেরই লোক তা কিছুতেই এদের বোঝাতে পারলেন না।

তিনি একে একে তাঁর বন্ধুদের কথা জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। উত্তর এল—"নিকোলাস ওযে-ডার? ব্রোম ডাচার? ভ্যান বুমেল? এরা যে কবে মরে ভূত হয়ে গেছে।" তিনি ভাবলেন, তার আগের দিনই পাহাড়ে যাবার আগে তিনি এদের সকলকে দেখে গেছেন, আর একদিনেই এত পরিবর্ত্তন। রিপ ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারলেন না।

ভীড়ের মধ্যে একটি মহিলা তার ছেলে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি রিপভ্যানকে দেখিয়ে ছেলের কান্না থামাবার চেষ্টা করছিলেন। রিপভ্যান তাঁর কাছে এগিয়ে মহিলাটিকে তাঁর নাম আর বাবার নাম জিজ্ঞেস করলেন। মহিলাটী উত্তর দিলেন; "আমার নাম জুডিথ গার্ডেনিয়ার, আমার, বাবার নাম রিপভ্যান উইঙ্কল। তিনি আজ কুড়ি বছর হল একদিন শীকার করতে বেরিয়েছিলেন— কিন্তু আর বাড়ী ফেরেন নি—কেউ তার কোন খোঁজ দিতে পারেন নি।"

রিপভ্যান তার মায়ের কথা জিজ্ঞেস করলেন— মেয়েটি বল্লেন, "মা একদিন হঠাৎ মাথার বগ ছিঁড়ে রাস্তায় পড়ে মারা গেছেন।" এবার রিপ আর চুপ থাকতে পারলেন না তিনি তাঁর মেয়ের গলা জড়িয়ে বল্লেন, "বাছা, আমিই তোমার বাবা রিপভ্যান উইঙ্কল!" কিন্তু প্রথমে কেউ তার কথা বিশ্বাস করে না তাঁর মেয়েও তাঁকে চিনতে পারলেন না। এক বুড়ী কাছে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি বল্লেন, সত্যি ত একে যে রিপভ্যানের মতই দেখাচ্ছে—এ-নিশ্চয় আমাদের গ্রামের রিপভ্যান উইঙ্কল। রিপভ্যান তখন তার অদ্ভুত ঘুমের গল্প এবং সেই বিকট লোকদের গল্প সকলকে বল্লেন। ক্যাটস্কিল পাহাড়ের এই অদ্ভুত গল্প চারিদিকে ছড়িয়ে গেল।

রিপভ্যান এখন নিশ্চিন্তে মেয়ে-জামাই, নাতি-নাতিনী নিয়ে বাস করতে লাগলেন। তাঁর স্ত্রীর কথা কেউ বল্লে তিনি এমন মুখ করতেন যে স্ত্রীর মৃত্যুতে তিনি সুখী হয়েছেন কি দুঃখিত হয়েছেন সেটা ঠিক বোঝা যেত না। আর তার এই অদ্ভুত গল্প তিনি গ্রামের ছেলে-বুড়ো সকলকে এতবার শোনালেন যে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সকলেরই ও-গল্প মুখস্থ হয়ে গেল।

ল্যাজ আর মাথা

সাপের ল্যাজ বরাবরই যে দিকে মাথা চলে তার পিছু পিছু চলিতে থাকে। একদিন কিন্তু ল্যাজের হইল ভারী রাগ, সে বলিল—"আমি মাথার হুকুম মানিব না, আমার হুকুম মানিয়া মাথার চলিতে হইবে।

মাথা ল্যাজকে বলিল,—বোকা কোথাকার! তোমার না আছে চোখ, না আছে কাণ, তুমি কি ভাবে শরীরটাকে চালাইতে পারিবে? আমি যে তোমাদের চালাই, তা নিজের জন্য নয়, তোমাদের মঙ্গলের জন্য।

ল্যাজ কহিল—সব দুষ্ট লোকের ঐ এক কথা! সে হবে না, আমিই এখন হইতে নেতৃত্ব গ্রহণ করবো।

বেশ, তাই হউক।

ল্যাজ চলিল। কিন্তু প্রথমেই সে একটি কাদা ভরা নালির মধ্যে যাইয়া পড়িল, সারা শরীরে কাদা মাখা হইল। বিপদ দেখিয়া মাথা আবার শরীরটাকে চালনা করিয়া কাদা হইতে মুক্ত করিল। ল্যাজ আবার শরীরটাকে লইয়া চলিতে যাইয়া একটা কাঁটা বনে আটকা পড়িল, সারা শরীরটা কাঁটাতে বিদ্ধ হইল, সারা গা হইতে ঝর্‌ঝর্‌ করিয়া রক্ত ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। আবার মাথা নেতৃত্ব লইয়া বিপদে হইতে উদ্ধার করিল।

আবার ল্যাজ মহাশয় চলিলেন—চলিতে চলিতে একেবারে একটা অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে পড়িয়া গেল। মাথা এই ভয়ানক বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। বেচারা সাপ ল্যাজের তাড়নায় পড়িয়া আগুনে পুড়িয়া প্রাণ হারাইল।

সব কাজই কি সকলের সাজে? যার যে কাজের যোগ্যতা তাকে সেই কাজের ভার দেওয়াই ভাল।



দেশীয় পুষ্পজাত রঞ্জন উপকরণ

পলাশ পুষ্পদ্বারা রঞ্জন-প্রণালী

৩০৪৮ পৃষ্ঠার পর

পলাশ ফুলদ্বারা বস্ত্রাদি রং করিতে হইলে এদেশে নিম্নোক্ত দুই প্রকার প্রণালীর যে কোনও একটি অবলম্বিত হইয়া থাকে :--

১। প্রথমতঃ পুষ্পগুলি কিছুক্ষণ উষ্ণ জলে ডুবাইয়া রাখিতে হয়; তাহা হইলেই জলে পুষ্প মধ্যস্থ রং দ্রব হইয়া যায় এবং জল পীতবর্ণ ধারণ করে। পরে ফুলগুলি ফেলিয়া দিয়া ঐ জল দ্বারা বস্ত্রাদি রঞ্জন করিতে হয়। পূর্ব্বোক্ত উপায়ে অথবা সমপরিমাণ পুষ্প ও জল ত্রিশ মিনিট কাল উত্তপ্ত করিলে রেশমী বস্ত্রাদি সুন্দর পাতলা হরিত বর্ণে রং করা যায়। রেশম খণ্ডকে পূর্ব্বে ফিটকারির জলে ডুবাইয়া, পরে পূর্ব্ব বর্ণিত উপায়ে পলাশ ফুলদ্বারা রং করিলে পিঙ্গলবর্ণে রঞ্জিত হইয়া থাকে। উপরে লিখিত উপায় অবলম্বন করিয়া কার্পাস বস্ত্রও পলাশ পুষ্পদ্বারা রঞ্জন করা যায়। ২৫ ভাগ পুষ্পের ক্বাথের সহিত ৭ ভাগ ফিটকারী ও ১০০ শত ভাগ জল মিশাইয়া কিছুক্ষণ রাখিয়া দিতে হয়, তাহা হইলেই ক্রমে একটা কঠিন পদার্থ জল হইতে পৃথক হইয়া আসে। পরে উক্ত কঠিন পদার্থটাকে ছাকিয়া ফেলিলে যে স্বচ্ছ জল পাওয়া যায় তাহাতেও পশমী, রেশমী বা কার্পাস বস্ত্র অর্দ্ধঘণ্টাকাল ডুবাইয়া রাখিয়া বাদামী বর্ণে রঞ্জিত করা যায়। কিন্তু পূর্ব্ব বর্ণিত যে কোন উপায় অবলম্বন করা যাউক না কেন, পলাশ পুষ্প দ্বারা উজ্জ্বল বর্ণে বস্ত্রাদি রং করা যায় না। পলাশ ফুল-জাত রং সমশ্রেণীর অন্যান্য রংয়ের তুলনায় যেন অনেকটা হীনপ্রভ।



পলাশ ফুল

পলাশপুষ্পজাত রং :—ওয়ার্ডেল হাইদ্রাবাদও মধ্যপ্রদেশ হইতে পলাশফুল সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে বস্ত্র রঞ্জন করিয়া পরীক্ষা করিয়াছেন। পরীক্ষার ফলে ওয়ার্ডেল মন্তব্য করিয়াছেন যে পলাশপুষ্পজাত রং অতি

উজ্জ্বল ও সুন্দর এবং যদি প্রচুর পরিমাণ পুষ্প উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করা যায়, তাহা হইলে ইহা একটী উচ্চদরের রঞ্জন উপকরণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। কিন্তু হামেল ও পার্কিন ওয়ার্ডেলের মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন। উক্ত রাসায়নিকদ্বয় বহু পরীক্ষার দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, পলাশফুলে প্রকৃতপক্ষে কোনও রঞ্জন উপকরণ নাই, পক্ষান্তরে উহার ভিতরে বুটিন (Butin) এবং বুটেন (Butein) নামক দুইটী যৌগিক জৈব পদার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে; তন্মধ্যে প্রথমটী বর্ণহীন ও দ্বিতীয়টী ঈষৎ পিঙ্গল বর্ণ, জলসহযোগে উত্তপ্ত করিবার সময় ঐ পদার্থ দুইটী রঞ্জন উপকরণে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। পরীক্ষার দ্বারা উক্ত রাসায়নিকদ্বয় আরও প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে প্রথমে কোন ও মৃদু ধাতব অম্ল সহযোগে পলাশ ফুলের কাথকে ফুটাইয়া পরে সর্য্যিকাক্ষার (সাধারণ সোডা) দ্বারা উহার অম্লত্বগুণ নাশ করিয়া লইলে যে জল প্রস্তুত হয়, ইউরোপে প্রচলিত Young Faustic এর ন্যায় তৎসাহায্যে বিভিন্ন প্রকার রং বন্ধকারী (Mordant) সংযোগে নানাপ্রকার সুন্দর বর্ণে পশম রং করা যায়। যথা, ফিটকারী সংযোগে উজ্জ্বল বাদামী, বঙ্গ (টিন্) সংযোগে উজ্জ্বল পীত; এবং লৌহ সংযোগে মেটে বাদামী। কিন্তু পলাশফুল দ্বারা রঞ্জিত পশমের রং অত্যন্ত অস্থায়ী, অর্থাৎ সহজেই ধৌত হইয়া যায়; আর সংযোগে উহার স্থায়িত্ব কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত করা যায় মাত্র। ঢাকা কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ডাঃ ওয়াট্‌সন ও পলাশপুষ্প দ্বারা দেশীয় প্রণালীতে বস্ত্রাদি রঞ্জন করিয়া বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরীক্ষা করিয়া হামেল ও পার্কিনের উক্ত মত সমর্থন করিয়াছেন।

পলাশপুষ্পের ব্যবসায়:—উত্তর ভারতের কোনও কোনও স্থানে শুষ্ক পলাশফুল বিক্রীত হইয়া থাকে। আশানুরূপ মূল্য পাওয়া যায় না বলিয়া উক্ত ব্যবসায় একপ্রকার লুপ্ত হইয়া আসিতেছে। বলা বাহুল্য সে চেষ্টা করিলে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণ পলাশফুল অতি অল্পায়াসে সংগ্রহ করা যাইতে পারে। শুষ্ক এবং সদ্য পলাশফুল হইতে প্রাপ্ত রং এ কোনও প্রভেদ নাই। পলাশফুল পাশ্চাত্য রঞ্জনশিল্পে কখনও স্থান পায় নাই।

মান্দার ফুল

বৈজ্ঞানিক নাম Erythrina Indica পলাশের ন্যায় মান্দার ও নিম্বাদি জাতীয় বৃক্ষ এবং ভারতবর্ষের নিজস্ব জিনিষ। মান্দার, পলিতা মান্দার, বা পারিজাত নামে প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে বহু স্থানে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। বঙ্গদেশে সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী স্থান সমূহে অসংখ্য বন্য মান্দার বৃক্ষ দৃষ্ট হয়। বঙ্গদেশে সর্ব্বত্রই কাষ্ঠের জন্য বা ক্ষেত্র প্রভৃতির সীমানা নির্দ্ধারণের জন্য যথেষ্ট মান্দার বৃক্ষ রোপিত হইয়া থাকে; কারণ উক্ত বৃক্ষ কণ্টকাকীর্ণ হওয়াতে গবাদি পশুদ্বারা বিনষ্ট হইতে পারে না। মান্দার ফুল দেখিতে অতি উজ্জ্বল লোহিত বর্ণ এবং পলাশ পুষ্পের ন্যায় শীতের শেষভাগে প্রস্ফুটিত হইতে থাকে। বঙ্গদেশ ও আসাম ব্যতিরেকে ভারতের অন্য কোন অংশে মান্দার বৃক্ষ বিশেষ দৃষ্ট হয় না। ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বেও বঙ্গদেশে কোনও কোনও স্থানে বিশেষতঃ হুগলী জেলায় এবং আসামের দুই একটি স্থানে বস্ত্র রং করার জন্য মান্দার পুষ্প ব্যবহৃত হইত। বর্ত্তমানে উক্ত পুষ্পের ব্যবহার সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়াছে।

মান্দার পুষ্পদ্বারা রঞ্জন প্রণালী:—

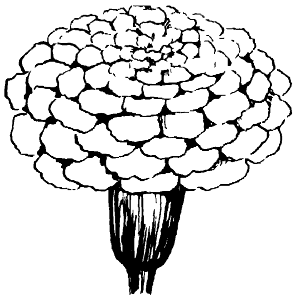
ফাল্গুন মাসের প্রথম ভাগে পুষ্প সমূহ সংগ্রহ করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া রাখিতে হয়, এবং প্রয়োজন মত ৪।৫ ভাগ জল মিশ্রিত করিয়া উত্তপ্ত করিলেই সুন্দর লোহিত বর্ণের রং জলে নির্গত হইয়া আসে, তখন উহা দ্বারা বস্ত্রাদি সহজেই লোহিত বর্ণে রং করা যায়।

এই পর্য্যন্ত মান্দার পুষ্প বা পুষ্প মধ্যস্থ রঞ্জনোপকরণ সম্বন্ধে কোন রাসায়নিক পরীক্ষা হয় নাই।

গেন্দাফুল

বৈজ্ঞানিক নাম—Tagetas Erecta, গেন্দার আদি জন্ম স্থান আমেরিকা। কোনও সংস্কৃত গ্রন্থে গেন্দা ফুলের উল্লেখ নাই। আমেরিকা হইতে গেন্দা ইউরোপে নীত হয় এবং ইউরোপ হইতে প্রায় দেড়শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে প্রথমে বম্বে অঞ্চলে আমদানী হয়। পুষ্পের সৌন্দর্য্য ও প্রচুরতা হেতু এবং অল্প যত্নে উৎপন্ন হয় বলিয়া গেন্দা অত্যল্পকাল

মধ্যেই সমস্ত ভারতে ছড়াইয়া গিয়াছে। গেন্দা একবর্ষী কোমল উদ্ভিদ বিশেষ; ইহা শরতের প্রথম ভাগে রোপণ করিতে হয় এবং শীতের প্রারম্ভ হইতে বসন্ত কাল পর্য্যন্ত সমভাবে ইহার পুষ্প প্রস্ফুটিত হইতে থাকে। পাশ্চাত্য অধিকাংশ পুষ্পের ন্যায় উহা গন্ধহীন। গেন্দাফুলের রঞ্জিত পাপড়ীগুলি



গেন্দা ফুল

মাত্র রঞ্জন কার্য্যোপযোগী। বার্কিলের মতে সম্ভবতঃ প্রথমে উত্তর ভারতেই রঞ্জন কার্য্যের জন্য গেন্দাফুলের ব্যবহার আরম্ভ হয়; এবং যাঁহারা পলাশ ফুলের ব্যবহার জানিতেন তাঁহারাই গেন্দাফুল দ্বারা বস্ত্রাদি রং করিবার প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে পঞ্জাবের কোনও স্থানে, বিশেষতঃ লাহোর এবং উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে ও ছোটনাগপুরের দুই এক স্থানে রঞ্জন কার্য্যের জন্য গেন্দাফুলের ব্যবহার প্রচলিত আছে। পূর্ব্বে বোম্বাই প্রদেশেও উক্ত কার্য্যের জন্য গেন্দাফুলের ব্যবহার হইত, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় কিন্তু বর্ত্তমানে উহা সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়াছে।

বঙ্গদেশে, আসাম, মান্দ্রাজ ও ব্রহ্মদেশে রঞ্জন উপকরণরূপে গেন্দাফুলের ব্যবহার কখনও ছিল না এবং বর্ত্তমানেও নাই। এ স্থলে একটি কথা উল্লেখযোগ্য,—পূর্ব্বাপর সাধারণ লোকের মধ্যেই রঞ্জন কার্য্যের জন্য গেন্দাফুলের ব্যবহার প্রচলিত। শিল্পিগণ কখনও উহার আদর করেন নাই।

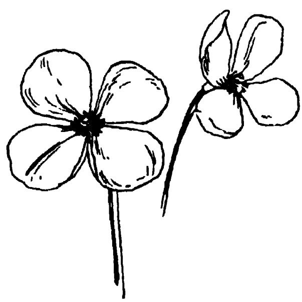
গেন্দাফুল দ্বারা রঞ্জন প্রণালী :—

গেন্দাফুল দ্বারা রঞ্জন ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হইলে পলাশফুল হইতে যে উপায়ে রং প্রস্তুত করা হইয়া থাকে, ঠিক তদনুরূপ পন্থা অনুসরণ করিতে হয়; অর্থাৎ ফুলগুলিকে অর্দ্ধঘণ্টা কাল উত্তপ্ত জলে রাখিয়া পরে নিংরাইয়া ফেলিয়া দিতে হয়। উক্তরূপ প্রক্রিয়ায় পুষ্পমধ্যস্থ রং জলে দ্রব হইয়া আসে; তখন ঐ জলদ্বারা বস্ত্রাদি পীতবর্ণে রং করা যায়। গেন্দাফুল হইতে যে প্রকার পীত রং প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাকে প্রচলিত ভাষায় "গেন্দারং" বলে এবং গেন্দাফুলের নামানুকরণেই উক্ত নামের উৎপত্তি হইয়াছে। 'চাম্পারং' প্রস্তুতের জন্য শেফালিকা বা হরিদ্রার পরিবর্ত্তে কখনও কখনও গেন্দাফুল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ওয়ার্ডেল (Wardle) রেশম ও পশম গেন্দাফুলের সাহায্যে রং করিয়া পরীক্ষা দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে বিভিন্ন প্রণালী অবলম্বন করিলে বিভিন্ন প্রকার পীতবর্ণে বস্ত্রাদি রঞ্জিত হইয়া থাকে।

গেন্দাফুল রাসায়নিক উপাদান :—১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে লেটোয়ার ও সস্ (Latour and Sauce) নামক রাসায়নিকদ্বয় এবং ১৯০২ খৃষ্টাব্দে পার্কিন গেন্দাফুলের রাসায়নিক পরীক্ষা করিয়াছেন। গেন্দাফুলের Quercetagetion নামক একটি যৌগিক জৈব পদার্থ বর্ত্তমান আছে এবং উহাই রঞ্জন উপকরণরূপে কার্য্য করে।

কুসুম ফুল

বৈজ্ঞানিক নাম—Carthamus Tinctorious. কুসুম ভৃঙ্গরাজাদি বর্গীয় (Compositae)



কুসুম ফুল

কোমল উদ্ভিদ। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে কুসুম, অগ্নিশিখা ও বস্ত্ররঞ্জক নামে কুসুম ফুলের উল্লেখ

পাওয়া যায়। পুষ্পজাত রঞ্জন উপকরণ সমূহের মধ্যে কুসুম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং অতি প্রাচীনকাল হইতেই রঞ্জন-শিল্পে বিশেষ আদৃত হইয়া আসিতেছে। পরীক্ষায় জানা গিয়াছে যে মিশর দেশে প্রাচীন শবাধার সমূহে সংরক্ষিত শবপরিহিত বস্ত্র অনেক স্থলে কুসুম ফুল দ্বারা রঞ্জিত। কোনও কোনও শবাধারে কুসুম বৃক্ষাংশ ও কুসুম বীজ পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে।

কুসুম ফুলের উৎপত্তি স্থান

কুসুম বীজ তৈল ভেদক ওষধিরূপে বহু সংস্কৃত গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে এবং প্রাচীনকালে মিশর ও আফ্রিকাতেও উক্তরূপে ব্যবহৃত হইত। কুসুমের আদিস্থান নির্দ্ধারণ করা কঠিন। এবেসিনিয়া দেশে একপ্রকার বন্য কুসুম বৃক্ষ দৃষ্ট হয়। কাহারও কাহারও মতে এবেসিনিয়াই কুসুমের আদিস্থান। পক্ষান্তরে অপর একদলের মতে ভারতবর্ষই কুসুমের আদি জন্মভূমি কারণ এদেশেও একপ্রকার বন্য কুসুম বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত রূপ মতদ্বৈধের মধ্যে ডিকোন্‌ডলে (De Condolle) এক নূতন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন; তাঁহার মতে যখন মিশর ও ভারতবর্ষ উভয় দেশেই বন্য কুসুম দৃষ্ট হয়, অথচ উভয়দেশেই যে প্রাচীনকাল হইতেই কুসুমের চাষ হইতেছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই এইরূপ স্থলে মিশর ও ভারতবর্ষের মধ্যবর্ত্তী আরবদেশই খুব সম্ভবতঃ কুসুমের আদি জন্মস্থান। ডিকোনডলে নিজ মত সমর্থনের জন্য আবু আলিফা নামক জনৈক আরব লেখকের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। আবু আলিফার গ্রন্থে আরব দেশেও যে প্রাচীনকালে কুসুমের চাষ হইত, তাহার প্রমাণ এবং তদ্দেশীয় এক প্রকার বন্য কুসুম সম্বন্ধে সংবাদ পাওয়া যায়। তখন এদেশে হইতেই জাপান ও হংকং প্রভৃতি স্থানে কুসুম ফুল রপ্তানি হইয়াছে। এক্ষণে আর ইউরোপে কুসুম ফুল প্রেরিত বা ব্যবহৃত হয় না। কৃত্রিম রং সমূহের প্রতিযোগিতা নিবন্ধন উহার মূল্যও বিগত ২৫।৩০ বৎসরের মধ্যে পূর্ব্ব মূল্যের এক পঞ্চমাংশে পরিণত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে বোম্বাই নগরে প্রতি টাকায় ১ সের হইতে সোয়া সের পর্য্যন্ত কুসুম ফুলের পিষ্টক বা চাপ্‌টী কিনিতে পাওয়া যায়। বস্ত্রাদি রং করিবার জন্য কুসুম ফুলের ব্যবহার পূর্ব্বাপেক্ষা কমিয়া থাকিলে ও দেশ হইতে উহা সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নাই। ব্রহ্মদেশে ও ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই কুসুম ফুল অল্লাধিক পরিমাণে রঞ্জন-শিল্পে এখনও ব্যবহৃত হইতেছে।

কুসুম ফুলের ব্যবসায়

পূর্ব্বে এদেশে প্রচুর পরিমাণে কুসুমের চাষ হইত। পূর্ব্বাপেক্ষা উহা কমিয়া থাকিলেও বঙ্গদেশের কোনও কোনও স্থানে, বিশেষতঃ ঢাকা জেলায়, আসামের সুরমা-উপত্যকায়, মনিপুরে, মধ্যপ্রদেশে, রায়পুর ও ছিন্দোয়ারা জেলায়, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে মিরাট, পঞ্জাবে প্রায় সর্ব্বত্রই বিশেষতঃ আম্বালা এবং হিসারপুর জেলায়, বেড়ারের সর্ব্বত্রই বোম্বাই অঞ্চলে কর্ণাট এবং গুর্জ্জরে ও মান্দ্রাজ এবং ব্রহ্মদেশের দুই এক স্থানে বর্ত্তমান সময়ে ও কুসুমের চাষ হইয়া থাকে। উত্তর ভারত এবং বঙ্গদেশে ফুলের জন্যই কুসুমের চাষ হইয়া থাকে। কিন্তু দাক্ষিণাত্যে উক্ত ফুলের মোটেই আদর নেই; পক্ষান্তরে তৈল বীজের জন্যই উহা চাষ হয়। পূর্ব্বে ঢাকা জেলা কুসুমফুলের জন্যই বিখ্যাত ছিল। এবং বুড়ীগঙ্গা ও ধলেশ্বরী নদীর উপকূলবর্ত্তী ভূখণ্ডে প্রচুর পরিমাণ কুসুম ফুল উৎপন্ন হইত। পাটেবগোটা এবং বিলাসপুর উহার কেন্দ্রস্থান ছিল। ভারতে অন্যান্য স্থানে উৎপন্ন কুসুম ফুল অপেক্ষা ঢাকা জেলায় উৎপন্ন ফুল অনেক অংশে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইত। বোম্বাই অঞ্চলে পাগড়ী রং করার জন্য ঢাকার কুসুম ফুল বিশেষ আদৃত হইত এবং ইউরোপেও সমধিক কাটতি ছিল সমগ্র ভারত হইতে বিদেশে প্রেরিত কুসুম ফুলের দুই তৃতীয়াংশ ঢাকা জেলা হইতে সংগ্রহ হইত। বর্ত্তমান সময়ে ঢাকা জেলায় কুসুম ফুলের চাষ বহু পরিমাণে কমিয়া থাকিলেও সম্পূর্ণ উঠিয়া যায় নাই; এবং এখনও ঢাকা জেলায় যতটা কুসুমের চাষ হয়, অন্য কোথাও ততটা হয় না।

কুসুম বৃক্ষের চাষ-প্রণালী

পাতলা বালুকার আদ্রভূমি উত্তমরূপে কর্ষণ করিয়া কার্ত্তিক হইতে অগ্রহায়ণের মধ্যে বীজ

বপন করিতে হয়। কুসুমফুলের গাছ সাধারণতঃ দেড় হইতে দুই হস্ত পরিমিত উচ্চ হইয়া থাকে। গাছগুলো একটু বড় হইলেই উহার অগ্রভাগ ছেদন করিয়া ফেলা হয়। উক্তরূপ ছেদনের ফলে অল্পকাল মধ্যেই চতুর্দ্দিকে শাখা বহির্গত হইতে থাকে এবং একই বৃক্ষে বহু পুষ্প পাওয়া যায়। গাছগুলি অতি ঘন হইলে মধ্যে মধ্যে তুলিয়া ফেলিয়া পাতলা করিয়া দিতে হয়। পৌষমাস হইতে আরম্ভ করিয়া চৈত্রমাস এবং কখনও কখনও বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত কুসুম ফুল প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে। একবার দুইদিন অন্তর পুষ্প সমূহ সংগ্রহ করিতে হয়, বিলম্বে পুষ্প মধ্যস্থ রং আংশিক রূপে বিনষ্ট হইয়া যায়। বঙ্গদেশে গড়ে প্রতি একর জমিতে একমণ ও বোম্বাই অঞ্চলে দেড়মণ শুষ্ক পুষ্প এবং ৫ হইতে ৭ মণ পর্য্যন্ত তৈলবীজ উৎপন্ন হয়।

কুসুম সাহায্যে রঞ্জন-প্রণালী

অদ্ধপোয়া পরিমিত কুসুম ফুলের সহিত দুই সের জল মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে ১৫ মিনিট পর্য্যন্ত নিষ্পেষণ করিতে হয়। তৎপর সরু বস্ত্রে ছাকিয়া ধৌত জল ফেলিয়া দিতে হয়; ফুলগুলি পুনরায় পূর্ব্ব পরিমাণ জলের সহিত মিশাইয়া পূর্ব্বোক্ত উপায়ে ধৌত করিতে হয়। উক্ত প্রক্রিয়া তিনবার সম্পন্ন করিতে হয় এবং ইহাতে ছত্রিশ ঘণ্টা সময় লাগিয়া থাকে। বাজারে যে সকল কুসুম ফুল ক্রয় করিতে পারা যায় তাহার অধিকাংশগুলি পূর্ব্বে উত্তমরূপে ধৌত করা হয় না। কাজেই সাবধানতার জন্য পূর্ব্বোক্ত উপায়ে ফুলগুলি ধৌত করিয়া রঞ্জনোপযোগী করিয়া লওয়া প্রয়োজন। তৎপরে ঐ ধৌত পুষ্পসহ ১½ তোলা সাজিমাটি এবং তিন পোয়া শীতলজল মিশাইয়া উহাদিগকে উত্তমরূপে নিষ্পেষিত করিয়া ৪ ঘণ্টা সময় রাখিয়া দিতে হয়। পরে বস্ত্র দ্বারা ছাকিয়া লইলে যে লোহিত বর্ণের জল পাওয়া যায় তৎসঙ্গে কিছু লেবুর রস মিশাইয়া লইতে হয়। উক্ত উপায়ে প্রস্তুত জল মধ্যে কার্পাশ বস্ত্র ১৫ মিনিট কাল ডুবাইয়া রাখিলে অতি উজ্জ্বল লোহিত বর্ণে রঞ্জিত হইয়া থাকে। পরিত্যক্ত পুষ্পগুলি পুনরায় তিন পোয়া জল সহ পূর্ব্ব বর্ণিত পন্থানুসরণে রাখিয়া দিলে যে রঞ্জিত জল পাওয়া যায়, তদ্দ্বারা কার্পাস বস্ত্র নাতি গাঢ় লোহিতবর্ণে রং করা যাইতে পারে। কুসুম-ফুল দ্বারা রেশম রং করিতে হইলে উহা এক ঘণ্টা পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে প্রস্তুত জলে ডুবাইয়া রাখিতে হয়, তাহা হইলেই রেশম উজ্জ্বল পাটল (Pink) বর্ণে রঞ্জিত হইয়া থাকে।

কুসুমফুলের রাসায়নিক উপাদান

১৮৪৬ খৃঃ ইস্‌ক্লিপার (Schileper) কুসুমফুলের রাসায়নিক পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়াছেন যে পুষ্পমধ্যস্থ Carthamin নামক লোহিত বর্ণের যৌগিক পদার্থটীই রঞ্জন কার্য্যোপযোগী, তৎসহ বর্ত্তমান পীতবর্ণ যৌগিক পদার্থটীর প্রকৃত কোনও মূল্য নাই। "কার্থেমিন" জল বা অম্লে অদ্রবনীয, কিন্তু ক্ষার সংযোগে সহজেই জলে দ্রব হইয়া থাকে।

শেফালিকা ফুল

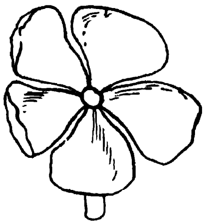
বৈজ্ঞানিক নাম— Nyctanthis—Arbor-Tristis, শেফালিকা, পারিজাতক, রজনীহাস প্রভৃতি সংস্কৃত নাম। হিন্দুস্থানে ইহা হরশিঙ্গার এবং পূর্ব্বাঞ্চলে শিউলি নামে পরিচিত। শেফালিকা প্রকৃত ভারতবর্ষীয় বৃক্ষ। হিমালয়ের পাদদেশস্থ অরণ্যসমূহে এবং টিবাই পাহাড়ে অসংখ্য বন্য শেফালিকা বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে।

শেফালিকা পুষ্পের ব্যবহার

রঞ্জন কার্য্যের জন্য বহুকালাবধি শেফালিকা ফুল ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। লিনস্কোটেন (Linschoten) নামক ষোড়শ শতাব্দীর জনৈক ইউরোপীয় পরিব্রাজক তৎকালে গুর্জ্জরে রঞ্জন-শিল্পে শেফালিকা ফুলের ব্যবহারের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। বস্ত্রাদি রং করিবার জন্য শেফালিকা ফুলের ব্যবহারের বিষয় বহু লেখক লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্ববর্ণিত পুষ্পসমূহের ন্যায় শেফালিকার পাপড়ী হইতে কোনও রং পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে উহার পাদমূল বা নলই রংয়ের আধার। শেফালিকা বৃক্ষের বল্কল হইতেও একপ্রকার পীত বর্ণের রং প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১৮০৭ সনে বুকানন হেমিলটন দিনাজপুরে শোলার খেল্‌না রং করিবার

জন্য শেফালিকার বল্কলের ব্যবহার লক্ষ্য করিযাছেন। উক্ত বৃক্ষ পত্র চর্ব্বণ করিলে মুখস্থিত লালা পীতবর্ণ ধারণ করে, ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে পত্রেও রং বর্ত্তমান আছে।

পূর্ব্বে শেফালিকা ফুল বস্ত্র রং করাব জন্য ভারতের সর্ব্বত্রই ব্যবহৃত হইত। বর্ত্তমান সময়ে উক্ত কার্য্যের জন্য পঞ্জাব ও অযোধ্যাব প্রায সর্ব্বত্রই উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, বোম্বাই ও মধ্য প্রদেশের বহুস্থানে হুগলী, দিনাজপুর প্রভৃতি বঙ্গদেশের দুই একস্থানে, আসামে, শ্রীহট্টেও ভারঙ্গে এবং মান্দ্রাজের উত্তর আরকটে অল্পাধিক মাত্রায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আসামে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় এবং দাক্ষিণাত্যে কখনও শেফালিকাব ব্যবহার প্রচলিত ছিল না। উত্তর ভারতে বন্য শেফালিকা পুষ্পেব প্রচুরতাই রঞ্জন-শিল্পে উহা আদৃত হইবার অন্যতম কারণ। পূর্ব্বে সিংহলে ধর্ম্মযাজকদেব পরিচ্ছদ শেফালিকা ফুলদ্বারা রঞ্জিত হইত। ব্রহ্মদেশে উক্ত কার্য্যের জন্য শেফালিকা ফুলের ব্যবহার এ পর্য্যন্ত হয় নাই। কৃত্রিম রং সমূহেব প্রচলন হেতু শেফালিকা ফুলেব ব্যবহাব ক্রমেই লুপ্ত হইয়া আসিতেছে এবং বোধ হয় ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ উঠিয়া যাইবে।



শেফালিকা ফুল

শেফালিকা পুষ্পদ্বারা রঞ্জন প্রণালী :—

পুষ্প সমূহ সংগ্রহ করিয়া প্রথমে রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া রাখিতে হয়; সময়মত পরে উহাদিগকে ফুটন্ত জলে ফেলিয়া রাখিলে পুষ্প মধ্যস্থ রং জলে দ্রব হইয়া আসে। জল গভীর পীতবর্ণ ধারণ করিলে পর ফুলগুলি ছাকিয়া ফেলিয়া দিতে হয়। পূর্ব্ববর্ণিত প্রণালীতে প্রস্তুত জলে রঞ্জনীয় বস্ত্র কিছুক্ষণ ডুবাইয়া রাখিলেই উহা পিঙ্গল বা গন্ধকবৎ পীত (Golden yellow) বর্ণে রঞ্জিত হইয়া থাকে। পঞ্জাবে পুষ্প হইতে রং বহিষ্কৃত করিবার জন্য ১২ সের ফুলেব সহিত ৪৫ সের জল ফুটাইয়া জল পাঁচসেরে পরিণত করা হইয়া থাকে। কিন্তু বহুদেশে ১৫ হইতে ৩০ সের থাকিতেই উহা ব্যবহার করা হয়। কখনও বা এক সের পুষ্পে দেড় সের মাত্র জল, এবং কখনও তৎপরিবর্ত্তে ৪০ সের জল লওয়া হয়। প্রকৃতপক্ষে জলের পরিমাণ সম্বন্ধে কোনও নির্দ্ধারিত নিয়ম নাই। মোট কথা ফুলগুলিকে ফুটন্ত জলে উত্তমরূপে সিদ্ধ করিতে হয়; তাহা হইলেই পুষ্প মধ্যস্থিত রং জলে দ্রব হইয়া থাকে। শ্রীহট্টে শেফালিকা ফুল হইতে রং প্রাপ্তির জন্য নিম্নলিখিত উপায অবলম্বিত হইয়া থাকে। প্রথমে একসেব পুষ্পনলেব সঙ্গে পাঁচসের পরিমিত জল মিশ্রিত করিয়া ফুটাইয়া, জল ৪ সেরে পরিণত করা হয়। তখন ঐ জলে এক ছটাক নাইট্রিক এসিড্ (Nitric acid) মিশাইযা লইলে স্থাযী পিঙ্গল রং পাওয়া যায। কিন্তু অর্দ্ধ ছটাক নাইট্রিক এসিড্ লইলে রং অনেকটা অনুজ্জ্বল হইয়া থাকে। রং স্থাযী করাব জন্য নাইট্রিক এসিডেব ব্যবহারই শ্রীহট্টে প্রচলিত প্রণালীব বিশেষত্ব। ভারঙ্গ জেলায শেফালিকা ফুলদ্বারা কখনও কখনও রেশমীসূত্র রঞ্জিত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ ফুলগুলিকে ৬ ঘণ্টা পর্য্যন্ত জলে ফেলিয়া রাখা হয। শেষোক্ত প্রণালীব বিশেষত্ব এই যে ইহাতে জল মোটেই উত্তপ্ত করিতে হয না।

শেফালিকা পুষ্পজাত রং মোটেই স্থায়ী নহে; অর্থাৎ সহজেই বিবর্ণ ও ধৌত হইয়া থাকে। লেবুব বস ও ফিটকারী সহযোগে রঞ্জন করিলে রং অনেকটা উজ্জ্বল ও স্থায়ী হয়। রঞ্জন কার্য্যেব জন্য শেফালিকা একাকী বিশেষ ব্যবহৃত হয় না। ইহা সাধারণতঃ হরিদ্রা ও কুমকুম্ এবং কখন কখনও নীল ও পলাশফুলের সহিত একত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

শেফালিকার রাসায়নিক উপাদান

হিল্ ও ডাঃ অন্নদাপ্রসাদ সরকার রাসায়নিক পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়াছেন যে শেফালিকা পুষ্পে Nyctanthin নামক একটী জৈব পদার্থ অতি অল্প পরিমাণে বিদ্যমান আছে। উহাই রঞ্জন উপকরণরূপে কার্য্য করে।

শেফালিকা পুষ্পের ব্যবসায়

পনেরো বিশ বৎসর পূর্ব্বে ও শুষ্ক শেফালিকা ফুল বড় বড় বাজারে ক্রয় করিতে পাওয়া যাইত। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল এবং পঞ্জাবে প্রতি মণ দশ টাকা হইতে ৬০ টাকা পর্য্যন্ত, অযোধ্যায় প্রতি মণ ৬৷৷০ টাকা হইতে ২০৲ টাকা পর্য্যন্ত এবং বঙ্গদেশে প্রতিমণ ৭৷৷০ টাকা হইতে ৭০ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যে বিক্রীত হইত। বর্ত্তমানে দুই একটী স্থান ব্যতিরেকে শেফালিকা ফুল রঞ্জন উপকরণরূপে কোথাও আর বিক্রীত হয় না। পাশ্চাত্য রঞ্জনশিল্পে শেফালিকা কখনও ব্যবহৃত হয় নাই।

কুম্‌কুম্

বৈজ্ঞানিক নাম—Crocus Sativus, ইহাকে হিন্দুস্থানে কেসর ও জাফরাণ, মহারাষ্ট্র ও গুর্জ্জরে কেসর, কর্ণাটে কুম্‌কুম্ ও আরবীতে জাফরাণ বলে। ইংরাজী নাম Saffron, কুমকুম, কাশ্মীর জন্মা, পীতক, বড, সংকোচ, পিশুন, বাল্মীক, এই সমস্ত কুমকুমের নামান্তর। কুমকুম্ বহুকাল যাবৎ এদেশে পবিত্র উৎসবাদিতে এবং খাদ্য দ্রব্য রং করার জন্য ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। "রাজনির্ঘণ্ট" "ভাবপ্রকাশ", "আইনি আকবরী" প্রভৃতি বহু গ্রন্থে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে কাশ্মীর ব্যতীত অন্য কোথাও কুম্‌কুমের চাষ কখনও হয় নাই এবং বর্ত্তমানেও হয় না। পূর্ব্বোক্ত কারণেই কুম্‌কুম্ "কাশ্মীর জন্মা" আখ্যা ধারণ করিয়াছে। উদ্ভিদতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মতে চেষ্টা করিলে ভারতের অন্য অন্য প্রদেশেও কুমকুম্ উৎপন্ন করা যাইতে পারে। কুমকুম পুষ্প শরৎকালে ফুটিয়া থাকে।

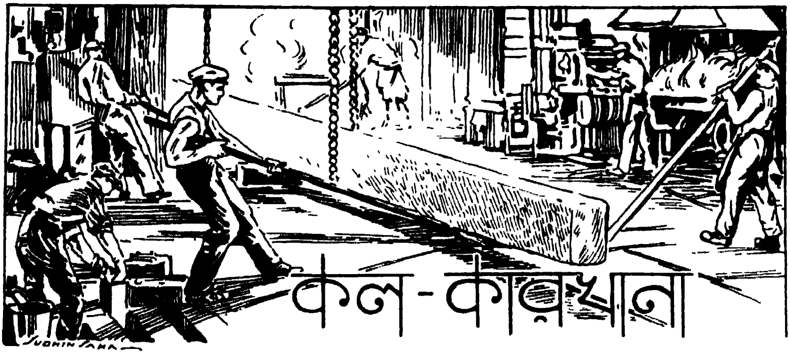
পুষ্প সমূহ সংগৃহীত হইলে উহা রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া পরে, পুষ্পদল মধ্যস্থ নলাকার দণ্ডত্রয় (Stignia) পৃথক করা হয়। উহাদের অগ্রভাগস্থিত লোহিত পিঙ্গল বর্ণ মণ্ডলাকার অংশ হইতেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বা "সহি জাফরাণ" প্রস্তুত হয়, এবং উহাদের শ্বেতবর্ণ নীচের অংশ হইতে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট বা দ্বিতীয় নম্বর জাফরাণ প্রস্তুত হইয়া থাকে। ব্যবসায়ীদের নিকট শেষোক্ত জাফরাণ "মোঙ্গ্‌লা" নামে পরিচিত এবং প্রতি টাকায় এক তোলা হিসাবে বিক্রীত হয়। মোঙ্গলা জাফরাণ সংগৃহীত হইলে পর শুষ্ক ফুলগুলিকে কিঞ্চিৎ চূর্ণ করিয়া জলে ফেলিয়া রাখা হয়। ক্রমে পাপড়ীগুলি জলে ভাসিয়া উঠে এবং পুষ্প মধ্যস্থ প্রয়োজনীয় অংশ তলদেশে পতিত হইতে থাকে। কিছুকাল পর ভাসমান পাপড়ীগুলিকে পৃথক করিয়া তলদেশস্থ জাফরাণ সংগ্রহ করা হয়। এবং উহাকে "নীওয়াল" বলা হইয়া থাকে।

কুমকুমের ব্যবহার

কুমকুম্ দ্বারা বস্ত্রাদি উজ্জ্বল পীতবর্ণে রং করা যায়; কিন্তু মূল্যাধিক্য হেতু উক্ত কার্য্যের জন্য ইহা ব্যবহৃত হয় না। উত্তর ভারতে ধনীদিগের মধ্যে কখনও কখনও বিবাহের সময় কুমকুম্ দ্বারা বস্ত্রাদি রঞ্জিত হইয়া থাকে। কুমকুম্ সাধারণতঃ পনীর, পিষ্টক ও পোলাও প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্যাদি সুগন্ধি ও রঞ্জিত করার জন্য, দেশীয় চিকিৎসা-শাস্ত্রে উৎসবাদির সময় গন্ধদ্রব্যরূপে এবং কাশ্মীর ও উত্তর ভারতে চন্দনের পরিবর্ত্তে বা চন্দনের সহিত সুগন্ধ অঙ্গলেপরূপে ব্যবহৃত হয়। খাদ্যদ্রব্য রং করার জন্য কুমকুমের ব্যবহার ভারতের সর্ব্বত্র এবং জার্ম্মানীও সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে বিশেষ প্রচলিত। ইউরোপে শুভকার্য্যে "Saffron cake" এর ব্যবহার এখনও সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নাই।

পূর্ব্বে প্রতি বৎসর বহু টাকা মূল্যের কুমকুম্ ভারতবর্ষ হইতে ইউরোপে প্রেরিত হইত। অনভিজ্ঞ ব্যবসায়ীগণ দ্বারা ভেজাল মিশ্রণ হেতু এদেশীয় কুমকুম্ এখন আর আদৃত হয় না। বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষ হইতে ইউরোপে কুমকুমের রপ্তানি সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। পক্ষান্তরে আমরা প্রতি বৎসর বহু টাকা মূল্যের কুমকুম্ ফ্রান্স দেশ হইতে ক্রয় করিয়া থাকি।

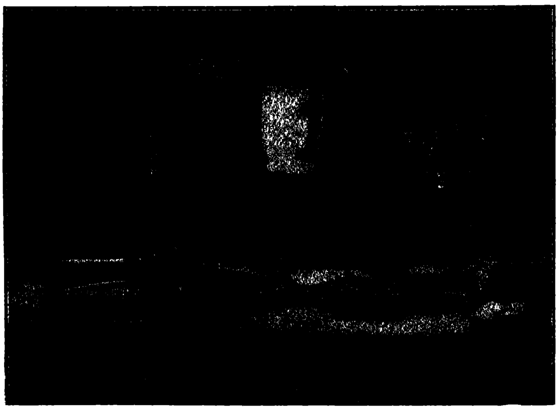
বর্ত্তমান সময়ে বাজারে যে জাফরাণ কিনিতে পাওয়া যায় তাহার কোনটাই সেই প্রকৃত কাশ্মীরি কুমকুম্ নহে। প্রকৃতপক্ষে উহারা ফরাসী দেশীয় কুমকুম্।



টাকশালের কথা

৩০২১ পৃষ্ঠার পর

তোমাদের কাছে অর্থ-নীতির কথা বলিতে যাইয়া টাকা-কড়ির কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু কি ভাবে কেমন করিয়া টাকা তৈয়ারী হয় সে-কথা বলা হয় নাই। এইবার সে কথা বলিব। তোমরা



টাকা তৈরীর জন্য তরল ধাতু-প্রবাহ

টাকশালের নাম শুনিয়াছ, টাকশালে কি হয় জান? সেখানে টাকাকড়ি তৈয়ারী হয়, সেজন্য উহাকে ইংরেজীতে বলে Mint আর বাঙ্গলা ভাষায় বলে টাকশাল। আমাদের দেশে শুধু নয় পৃথিবীর সব দেশেই টাকশালের প্রস্তুতি টাকা তৈয়ারীর পূর্ব্বে নানারূপ ধাতুর এবং অন্যান্য জিনিষের যেমন কড়ি ইত্যাদি টাকার মূল্যে ব্যবহৃত হইত। এ-বিষয়ে অর্থনীতি প্রবন্ধেই তোমরা টাকাকড়ি বলিতে কি বুঝায় তাহা জানিতে পারিয়াছ। আমি কিন্তু তোমাদের কাছে সে-বিষয়ে কোন কথা বলিব না। আমি শুধু কি ভাবে কেমন করিয়া টাকা প্রস্তুত হয় সে-কথাই বলিব।

ভারতবর্ষে হিন্দু রাজাদের আমলে কিংবা মুসলমান রাজাদের আমলেও টাকশালে টাকা পয়সা প্রস্তুত হইত এজন্য হিন্দুরাজাদেরও টাকশাল ছিল।

তোমরা একটা টাকা হাতে লও। টাকাটা কিসের তৈয়ারী? তুমি অতি সহজেই আমাকে বলিতে পারিবে উহা রূপার

।। সত্যি তাই। টাকশালে টাকা প্রস্তত করিতে যে ধাতু দ্বারা যে মুদ্রা তৈয়ারী করা হয় তাহা গলান হইয়া থাকে। প্রথমতঃ রূপার টাকাব কথাই শোন। রৌপ্য মুদ্রা, আধুলি, সিকি, দুয়ানি প্রভৃতি প্রস্তত করিতে হইলে সকলের আগে বেশ পরিষ্কার ভাবে বৌপ্যকে নির্দ্দোষ অর্থাৎ কিনা পবিশুদ্ধ কবিযা লওযা হয। তারপর ঐ গলিত বৌপ্যগুলি হইতে লম্বা লম্বা দণ্ড তৈয়ারী কবিয়া কলের ভিতবে ফেলিযা দেয, সেখানে একটি অতি অদ্ভুত রকমেব যন্ত্র আছে। সেই যন্ত্রে রূপার সেই দণ্ডগুলি এমনভাবে গলাইয়া ফেলা হয, যাহাতে টাকা, আধুলি, সিকি প্রভৃতি যোগ্য পবিমাণে গলিত হয, অর্থাৎ ওজনের সমতাটা নির্দ্দিষ্ট থাকে। এই ভাবে ঘণ্টা দু'যের মধ্যে ঐ ধাতুগুলি গলিয়া টাকা, সিকি, দু'আনি প্রস্তুতের যোগ্যতা লাভ করে। তাবপর এই গলিত



রূপার লম্বা ফালি

ধাতুগুলি বিভিন্ন আকারের ছাঁচে ফেলিয়া দেওয়া হয। এই যে কাজ ধাতুগুলিকে গলাইয়া দণ্ডের আকারে প্রস্তুত করা, তারপর সেগুলিকে পরিমাপ অনুযায়ী গড়িয়া তোলা এ সমুদয়ই বৈদ্যুতিক পরিচালিত যন্ত্রের সাহায্যে অতি দ্রুত সম্পন্ন হয়। উষ্ণ গলিত বৌপ্য হইতে ছাঁচে যখন মুদ্রাগুলি গড়িয়া উঠে, তখন যে খুব সুন্দর চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে থাকে না তাহা সহজেই বুঝিতে পার। একটা



রূপার ফালি বোধন যন্ত্রের সাহায্যে ছিদ্র কবা হইতেছে

কথা তোমাদের মনে বাখা উচিত। তোমরা ভুলেও মনে কবিওনা যে ধাতুগুলি গলাইযা কোনরূপে ছাঁচে ফেলিলেই তাহা হইতে উত্তম রূপে মুদ্রা প্রস্তুত হইল, ইহা কিন্তু একেবারেই সত্য নহে। নানারূপ যন্ত্রের সাহায্যে এবং বিবিধ প্রক্রিয়ার দ্বারা ধাতুকে গালাই করিয়া তারপর বিভিন্ন রূপ মুদ্রার পরিমাণ অনুযায়ী হাল্কা করিয়া লইতে হয়, যেন ওজনে কোনরূপ ব্যতিক্রম না ঘটে। ধর, যদি দু'আনির ওজন সিকির মত হয়, সিকির ওজন আধুলির মত হয়, এবং আধুলির ওজন টাকার মত হয় তাহা হইলে কিরূপে চলিতে পারে! এ-জন্যই বিভিন্ন মুদ্রার জন্য বিভিন্নরূপ ধাতুর দণ্ড প্রস্তুত হয় এবং তদনুরূপ ভাবে ওজনে তারতম্য করিয়া ছাঁচে ফেলিয়া মুদ্রা প্রস্তুত করা হয়, এ-সকল কার্য্যের জন্য নানা বিভিন্ন রূপ যন্ত্রপাতি থাকে। আমরা সেই সকল যন্ত্রের ছবিও দিলাম। কোন যন্ত্রে কি কাজ হয় তাহা ছবি হইতেই বুঝিতে পারিবে,

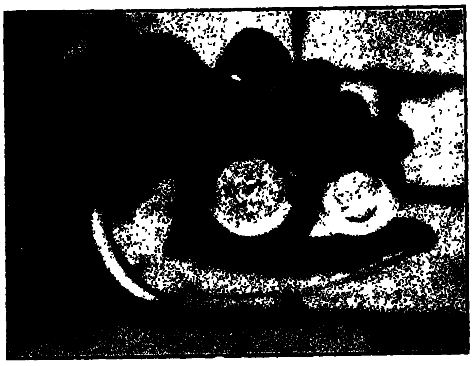
আর একটা কথা তোমরা আমাদিগকে প্রশ্ন করিতে পার। তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে পার টাকার



এই যন্ত্রে টাকার উপরের ও নীচের দিক্ তৈরী হয়

Heads and Tails অর্থাৎ টাকার রাজার বা রাণীর মুখওয়ালা দিকটা এবং অপর দিকটা কি করিয়া তৈয়ারী হয়? এ-প্রশ্ন তোমরা করিতে পার। কেন-না একসঙ্গেই ত উপরের ভাগ ও নীচের ভাগটা কলে তৈয়ারী হওয়া সম্ভবপর নয়, তাহা ঠিক। ইহার ব্যবস্থা ও রহিয়াছে। যেমন একদিকের কাজ হইয়া গেল তখন সেই মুদ্রাগুলি ওজন করা হয়, যদি দেখা যায় যে কোন ও মুদ্রা নির্দ্দিষ্ট ওজনের অতিরিক্ত হইয়াছে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে গলাইবার সময়ে কিংবা পরিমাপের সময়ে কোনরূপ ভুল বা ইংরেজীতে যাহাকে বলে Over weight blanks অর্থাৎ ভারী ওজনের চাকতি। তখন সে গুলিকে আবার গলাইয়া যথাযথ ওজনের মত করিয়া লইয়া শেষের দিক্‌টা ছাঁটিয়া ঠিক করিয়া লওয়া হয় এবং তখনই Tails এর দিকটা আবার তদনুরূপ ছাঁচে ফেলিয়া তৈয়ারী করিয়া ফেলে। এইভাবে যখন টাকা ইত্যাদি তৈয়ারী হইল তখন সে গুলিকে খানিক সময় ছড়াইয়া রাখা হয়, অর্থাৎ উষ্ণতা হ্রাস পাইলে সে-সময়ে একজন বিশেষজ্ঞ আসিয়া সেই তৈয়ারী টাকাগুলি পরীক্ষা করেন। এই পরীক্ষা যিনি করেন তাহার অনেক কিছু দেখিতে হয়। প্রথমত: তিনি ওজন করিয়া দেখেন, ওজন ঠিক আছে কি না। তারপর দেখেন মুদ্রা তৈয়ারী করিবার জন্য যে বিভিন্ন ধাতুর খাদ দেওয়া হয় তাহাও ঠিক আছে কি না। যদি সেইরূপ কোনও গোলযোগ থাকে তাহা হইলে তিনি সেই সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করেন।

তোমরা বোধ হয় টাকার চারিদিকটা বেশ ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছ। যদি লক্ষ্য করিয়া থাক তাহা হইলে দেখিতে পাইবে টাকার চারিদিকের গোল কিনারাটায় কাঁটা দাগ আছে। এই সব দাগ কাটিবারও যন্ত্র রহিয়াছে। তাহার সাহায্যে টাকার গোলাকার দিকগুলির এরূপ কাঁটা কাঁটা দাগের সৃষ্টি করা হয়, সে-সম্বন্ধে অর্থনীতিতে তোমরা জানিতে পারিয়াছ। এই যে টাকা তৈয়ারী হয় তাহার ছাঁচ কিরূপ, তাহা জানিবার



টাকার ছাঁচ

জন্য তোমাদের একটা কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। এইখানে ছাঁচের ছবি দেওয়া লইল। উহা হইতে

বুঝিতে পারিবে কি ভাবে টাকার দুই দিকের এইরূপ সুন্দর ভাবে রাজা বা রাণীর মাথা এবং



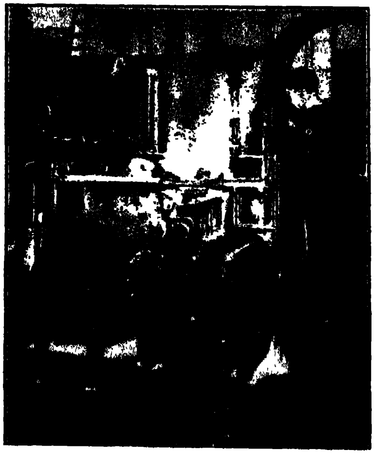
মুদ্রা-পরীক্ষা

অন্যদিকে তৈয়ারী সন, এবং লতা পাতা, ফুল ইত্যাদি কারুকার্য্য হইয়া থাকে।

টাকা তৈয়ারীর যন্ত্রপাতির সংখ্যা যে কত বেশী তাহা তোমরা টাকা পয়সা যখন খরচ কর তখন মনে ভাবনা। কিন্তু শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবে যে মুদ্রা প্রস্তুত করিতে প্রায় চল্লিশ-পয়তাল্লিশ প্রকারের যন্ত্র-পাতির ব্যবহার হয়।

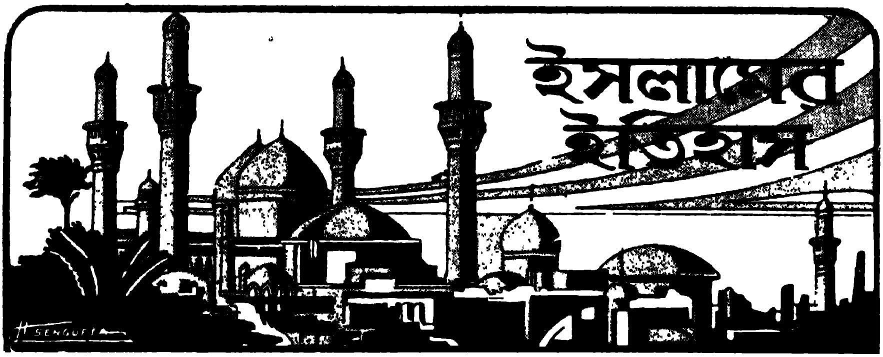
টাকা তৈয়ারী হইলে পরে সকলের শেষে ওজন করা হয়। যে-যন্ত্রের দ্বারা টাকা ওজন করা হয় তাহা এইরূপ সূক্ষ্মভাবে নির্ম্মিত যে পাঁচশ টাকার মধ্যে হয়ত বা একটী মাত্র মুদ্রা ওজনের অল্পতা কিংবা অন্য কোনরূপ ত্রুটির জন্য ফেলিয়া দেওয়া হয়। ইংরেজীতে এরূপ মুদ্রাকে Rejected Coin বলে। ঐরূপ মুদ্রাগুলিকে আবার গলাইয়া উপযুক্তরূপ ওজনের উপযোগী করিয়া তোলা হয়।

এইভাবে টাকা যখন প্রস্তুত হইয়া গেল তখন উহাদিগকে যাহাকে বলে Balanching and cleaning process এ আনা হয়। অর্থাৎ কিনা টাকার ওজন ঠিক হইল কি না এবং তাহা বেশ চকচকে ঝকঝকে হইল কি না তাহা দেখা হয়। এইরূপে যখন মুদ্রা তৈয়ারীর কার্য্য শেষ হইল, তখন আবার একটী বিশেষ পরীক্ষা করিয়া তারপর থলে বন্দী করিবার ব্যবস্থা করা হয়। সেই কাজটী হইতেছে টাকা বাজান। তোমরা বাজারে কিংবা ডাকঘরে, রেলের আফিসে, মিঠাইয়ের দোকানে এমন কি স্কুল, কলেজে মাহিয়ানা দিতে যখন টাকা দাও তখন নিশ্চয়ই দেখিতে পাও যে টাকাটা বাজাইয়া লওয়া হয়। যদি বাজনার কোনও দোষ হয় তাহা হইলে সেই টাকা কেহই গ্রহণ করে না। ঐরূপ টাকা বাজাইবার মধ্য দিয়াই সকলে টাকা আসল কি মেকী তাহা বুঝিয়া ফেলে। এইজন্যই টাকশালে টাকা প্রস্তুত হইলে পর সেইগুলি আবার একটী যন্ত্রে বাজাইয়া লইবার ব্যবস্থা করা হয়। যদি ঐরূপ বাজনার মধ্যে কোনরূপ গোলমাল থাকে তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সেই টাকা ফেলিয়া দেওয়া হয়।



সাদা ধব্‌ধবে উষ্ণ মুদ্রা

লণ্ডন সহরে যে টাকশাল আছে তাহাকে রাজকীয় টাকশাল বলে এবং ইহা জগদ্বিখ্যাত।

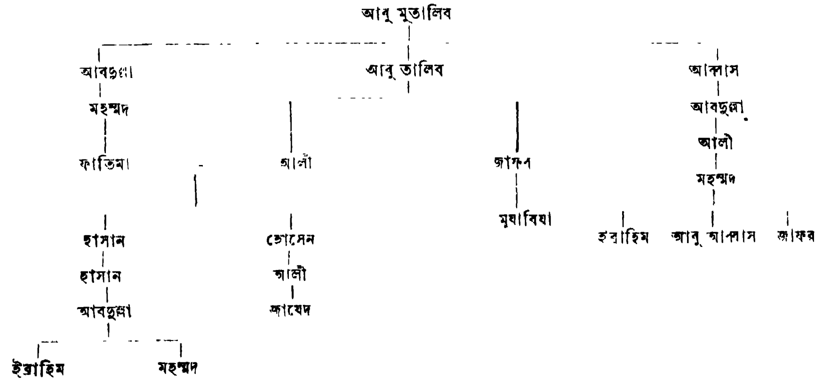


খলিফাদের কথা

আব্বাস বংশ (বাগদাদ যুগ) ৭৫০-১২৫৮ খৃঃ অব্দ

[৩০২৭ পৃষ্ঠার পর]

বংশ-পরিচয়



পূর্ব্বে তোমাদিগকে ওম্মিয়া খিলাফতের অবসানের বিষয় বলিয়াছি। আব্বাসবংশের ষড়যন্ত্র খুব সহজেই সফল হইয়াছিল। ওম্মিয়া-বংশের পতনের মূল কারণ তোমরা জানিতে পারিয়াছ। উপরের বংশলিপি হইতে তোমরা দেখিতে পাইবে যে মহম্মদের খুল্লতাত আব্বাস হইতে উদ্ভূত; আবু আব্বাসই এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। এই বংশের খলিফাগণ মুসলিম

জগতে বিশেষ বিখ্যাত। ওম্মিয়া বংশের খিলাফত হইতে আব্বাসিয়া রাজত্ব নানা ভাবে বিশেষ বিভিন্ন, ওম্মিয়া বংশের সময় ইসলাম ধর্ম্ম ও খিলাফতের পরিধি একই ছিল। প্রত্যেক মুসলমানই নির্ব্বিচারে ওম্মিয়া খিলাফতের আধিপত্য স্বীকার করিত; কিন্তু আব্বাসীয়াদের সময় খিলাফতের পরিসর ক্ষুদ্র হইল, নতুন নতুন বংশের প্রতিষ্ঠা হইল। আব্বাসীয়া বংশের অধিকার স্পেনদেশে স্বীকৃত হইল, মিসরে তাহাদের আধিপত্য কোন প্রকারে বাঁচিয়া রহিল। আফ্রিকা প্রদেশে আব্বাসীয় প্রাধান্য প্রতি পদে পদে ক্ষুণ্ণ হইতে লাগিল। প্রাচ্যদেশে ক্রমশঃ নূতন নূতন রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হইল। কালক্রমে ইসলামের অভ্যন্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য গড়িয়া উঠিল। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ নিজেদের খলিফা বলিয়াও দাবী করিতে দ্বিধা বোধ করে নাই। স্পেনদেশে **আবদুর রহমান্** স্বাধীন খিলাফত প্রতিষ্ঠা করিয়া রাজত্ব করিল। ধর্ম্মের ভিত্তি অথবা ধর্ম্ম-রাজ্যের ভিত্তি শিথিল হইয়া গেল। নানাপ্রকার বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও আরবের সান্নিধ্য বশতঃ তথা মুসলিম তীর্থগুলির রক্ষক হিসাবে আব্বাস বংশকেই অধিকাংশ মুসলমান খিলাফতের অধিনায়ক বলিয়া মান্য করিত। এই রাজ্যপরিসরের আয়তন হ্রাস মঙ্গলজনক হইয়াছিল, কারণ স্বল্লায়তনের মধ্যে মানব কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করা সম্ভব হইয়াছিল।

আব্বাসীয়া বংশের অধিনায়কতায় আরবীয় মুসলিমদের পূর্ব্বতন সামরিক শক্তি ক্রমশঃ বিলীয়মান হইতে লাগিল। পরাজিত সভ্যতর জাতির সংস্পর্শে আসিয়া আরবদের মধ্যে মাৎসর্য্য ও বিলাসিতা স্থান পাইল। ধর্ম্মের উন্মাদনা ক্রমশঃ কমিয়া যাইতে লাগিল। আরবদের মধ্যে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা অপেক্ষা আত্মপ্রতিষ্ঠা, পারিবারিক সমৃদ্ধি ও ব্যক্তিগত উন্নতির প্রয়াস অধিকতর প্রকাশ পাইল।

আব্বাসীয়াগণ আরবদের উপর আস্থা হারাইয়া ফেলিল। তাহারা ক্রমশঃ বিদেশীয় পারস্য ও খোরাসানী সাহায্য ও সৈন্যের উপর নির্ভর করিতে লাগিল। খলিফার দেহরক্ষী সৈন্য অক্সাস নদীর তীরস্থ তুর্ক জাতি হইতে সংগৃহীত হইল। কালক্রমে সামরিক বিভাগে আরবদের পরিবর্ত্তে তুর্কী অথবা পরাজিত দাসজাতি হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিল।

শাসন বিভাগে ক্রমশঃ আরবীগণ মুখ্য স্থান হারাইয়া ফেলিল। পারস্য হইতে ভদ্র ও সুশীল ব্যক্তি রাজ্যের পুরোভাগে স্থাপিত হইল। নিম্ন-স্তরে খৃষ্টান ও য়িহুদীগণ নিযুক্ত হইল। কর্ম্মবিধানের জন্য বহু জ্যোতিষী নিয়োগ করা হইল। তাহাদের উপর খলিফাদের বিশ্বাস কালক্রমে এত বেশী হইল যে জ্যোতিষী বচন ব্যতিরেকে কোন কার্য্যই তাঁহারা করিতেন না, যদিও এই বিদেশী নিয়োগ জাতীয়তা ও সামরিকতার দিক দিয়া নিন্দনীয়, কিন্তু বিদেশীয়দিগের সাহচর্য্যে আসিয়া আরবীয়গণ বহু নূতন গুণের সন্ধান পাইল। ভদ্রতা, শিষ্টতা, জ্ঞানানুশীলন প্রভৃতি গুণ বহু ভাবে খিলাফৎকে সমৃদ্ধ করিল। আরবে একটি নূতন যুগের সূচনা হইল।

আব্বাসীয়া রাজত্ব

আবুসাফা—৭৫০-৭৫৪ খৃঃ অব্দ

তোমাদের মনে আছে আবুলআব্বাস ওম্মিয়া বংশের শেষ খলিফাকে হত্যা করিয়া সিংহাসন গ্রহণ করেন। রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া তিনি প্রথমেই প্রচার করেন যে সমস্ত বিদ্রোহ দমন করিতে হইবে। আব্বাসীয়া বংশের যে শত্রু সে ইসলামের শত্রু। প্রতিহিংসা গ্রহণ করিতে হইবে। তারপর তিনি নিজে **"আসসাফা"** নাম গ্রহণ করেন। আসসাফা শব্দের অর্থ "রক্তগ্রাহী"। এই পদবী হইতেই তোমরা বুঝিতে পার যে তাঁহার রাজত্বের পরিণতি কিরূপ হইবে, ওম্মিয়া বংশের উচ্ছেদ-সাধন তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। একদা প্যালেষ্টাইন নগরে ওম্মিয়া-বংশের প্রায় নব্বই জন গণ্যমান্য ব্যক্তিকে বিরাট ভোজে আমন্ত্রণ করা হইল। ভোজনের সময় হঠাৎ জনৈক চারণ ওম্মিয়া বংশের খারাপ কার্য্যাবলির বর্ণনা করিতে লাগিল। সমস্ত অতিথি-গণ চঞ্চল হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পরে সঙ্কেত-ক্রমে সমস্ত অতিথিদের নির্ম্মমভাবে হত্যা করা হইল। হত্যার পরে সদ্য মৃতদেহের উপর মূল্যবান

গালিচা বিস্তৃত করিয়া সেই আস্তরণের উপর নিমন্ত্রণ-উৎসব সমাধান করা হইল। পর বৎসর মক্কা ও মদিনা নগরে যে সমস্ত ওম্মিয়া বংশীয় লোক আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল তাহাদের নিঃশেষ করা হইল।

খিলাফতের অন্তর্গত প্রায় সমস্ত স্থানে ওম্মিয়াদের যথা সম্ভব নির্ম্মূল করা হইল, ওম্মিয়া ধ্বংস-কার্য্য আবু আব্বাসের জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চলিল। এই সময়ে মক্কা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে ৭৫৪ খৃষ্টাব্দে হঠাৎ বসন্তরোগে আক্রান্ত আবু আব্বাস দেহত্যাগ করেন।

তাঁহার রাজত্বকালে তিনি কুফা হইতে মক্কার পথে কয়েকটি দূরত্বনির্দ্দেশক স্তম্ভ (Mile-stone) স্থাপন করেন। তীর্থযাত্রীদের জন্য দুইটি পান্থশালা নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার সময় খিলাফতে উজীরের পদ স্থাপন করা হয়। এই সময়ে হিরাটের কোন মঠের একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী (ব্রহ্মক) ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং রাজদরবারে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ব্রহ্মকের পুত্র খালিদ কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন ও পরে উজীর পদ লাভ করেন। তাঁহার বংশধরগণের সহিত আব্বাস বংশের গৌরব বহু ভাবে জড়িত, এই বংশই ইসলামের ইতিহাসে **"অল্-বরমেকী"** নামে বিখ্যাত।

মনসুর ৭৫৪-৭৭৫ খৃঃ অব্দ

আবু আব্বাস—মৃত্যুর পূর্ব্বে ভ্রাতা আবুজাফরকে খলিফা মনোনীত করিয়া যান, তিনি মনসুর নামে বিখ্যাত। মনসুর অর্থ "বিজয়ী"। বাস্তবিকই তিনি বিজয়ী। তাঁহার সময় আব্বাসবংশ স্থায়ী ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। রাজ্য জয়ে, রাষ্ট্রশাসনে, শৌর্য্যে-বীর্য্যে তাঁহার খ্যাতি বহুভাবে ইসলামকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। মনসুরই আব্বাসীয় খিলাফতের সঙ্গে ইসলাম ধর্ম্মের যোগসূত্র স্থাপন করিয়াছিলেন। মনসুরের নামে মস্‌জিদে মস্‌জিদে খুৎবা পঠিত হয়। ইসলামের পুণ্যতীর্থগুলির অভিভাবকরূপে আব্বাসীয়া খিলাফত ধর্ম্মের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার ফলে যখন আব্বাসীয়া রাষ্ট্রশক্তি শিথিল হইয়া গেল, তখনও ধর্ম্মাচার্য্যরূপে তাহারা নিজেদের প্রতিষ্ঠা ইসলাম-সংঘের উপর ন্যূনাধিক পরিমাণে অব্যাহত রাখিতে সমর্থ হইল। মনসুরের সময় হইতে খিলাফৎ মাত্র রাজ্যজয় ও ইসলাম-ধর্ম্ম প্রচারে নিবদ্ধ না থাকিয়া রাষ্ট্রশাসনে ও সংগঠনে মনোনিবেশ করিল। নূতন নগর প্রতিষ্ঠা, পথ-নির্ম্মাণ, কূপ খনন, পান্থশালা স্থাপন, জ্ঞানানুশীলন এবং বাণিজ্যপ্রচার আব্বাসীয়া রাজত্বের ধারা রূপে গৃহীত হইল। মনসুরের সময় বিখ্যাত বাগ্‌দাদ্ নগর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই বাগ্‌দাদ্‌কে কেন্দ্র করিয়া ইসলামের মহিমা বহুদূর প্রসারিত হইয়াছিল। একদিন এই বাগ্‌দাদ্ নগর সমস্ত মুসলিম সভ্যতার নিকষ পাষাণ রূপে পরিগণিত হইত। তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন খবই সুন্দর। তিনি স্নেহবান পিতা, শ্রদ্ধাবান ভ্রাতা এবং প্রেমময় স্বামী ছিলেন। প্রজানুরঞ্জন করিতে এবং রাজ্যের শাসন কুশল কামনায় নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যো তিনি বহু ভাবে ক্ষুণ্ণ করিয়াছিলেন।

কিন্তু শত্রুদমনে মনসুর যথার্থ আবুসাফার ভ্রাতা ছিলেন এবং ভ্রাতার অনুরূপ নৃশংসতার পরিচয় দিয়াছেন। আলীর বংশধরদের প্রতি তিনি ঘোরতর অবিচার করিয়াছেন। সিরিয়ার শাসনকর্ত্তা আবদুল্লাকে তিনি লবণের ভিত্তির উপর নির্ম্মিত গৃহের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক হত্যা করেন। আব্বাসীয় বংশের পরম বন্ধু শক্তিমান আবু মুসলিমকে তিনি পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়া রাজপ্রাসাদে আমন্ত্রণ করেন এবং পরে বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক হত্যা করেন—অথচ এই আবুমুসলিমের সাহায্য না হইলে আবু আব্বাস ওম্মিয়া-বিজয়ে সমর্থ হইতেন কিনা সে-বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

১৪৩ হিঃ মনসুর রাষ্ট্রশাসনের নূতন ব্যবস্থা করেন এবং গুপ্তচর বিভাগের স্থায়ী প্রতিষ্ঠা করেন। তাহাদের দ্বারা প্ররোচিত হইয়া নির্দ্দোষ আলীবংশধরদের হত্যার ব্যবস্থা করেন। আলীবংশের ধ্বংসের জন্য গুপ্তচরদের গুপ্ত সংবাদ অপেক্ষা মনসুরের সন্দেহাত্মক মন ও বিশ্বাসঘাতক মনই বেশী দায়ী। মনসুর কনষ্টাণ্টিনোপলের অভিযানকে বিধ্বস্ত করেন এবং সীমান্ত সংরক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা করেন। তবারিস্থান ও গিলান প্রদেশ জয় করেন। আফ্রিকার শাসন-কর্ত্তা স্পেন দেশ জয় করার চেষ্টা করেন। কিন্তু ওম্মিয়া আবদুর

রহমান কর্তৃক তাঁহার চেষ্টা বিফল হয়। জর্জিয়া প্রদেশে খুর্দ্দদের গোলযোগ কোষাধ্যক্ষ ও মেসোপোটেমিয়ার শাসনকর্ত্তা খালিদ বরমেকী কর্তৃক নিবারণ করা হয়। কিন্তু আফ্রিকা প্রদেশে খারেজীগণ মনসুরকে বিশেষ বেগ দিয়াছিল। মনসুরের শাসনকর্ত্তা আগলাব ও ওমর বিদ্রোহী হস্তে প্রাণত্যাগ করেন। পরে এজিদ মুহালিব মনসুরের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত কোনক্রমে আব্বাসীয়া প্রাধান্য রক্ষা করিতে সমর্থ হয়। এই সময় তাঁহার রাজত্ব বাইশ বৎসর পূর্ণ হয় এবং অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। মক্কা নগরে তীর্থ ব্যপদেশে যাত্রা করিলে পথিমধ্যে মনসুর আমাশা রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন।

মনসুরের চরিত্রে সাধারণতঃ দুইটি দিক দেখিতে পাওয়া যায়। একদিকে যেমন কর্ম্মক্ষমতা, উৎসাহ-উদ্যম, দূরদর্শিতা অন্যদিকে তেমনই নিষ্ঠুরতা বিশ্বাসঘাতকতা, স্বার্থপরতা নিরন্তর সমান ভাবে বহিয়া চলিয়াছে। রাষ্ট্রশাসনে তিনি যথেষ্ট বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছেন। আব্বাসীয়া বংশ প্রতিষ্ঠার গৌরব যথার্থ রূপে তাঁহারই প্রাপ্য। কিন্তু যে ভাবে মনসুর আবুমুসলিমকে হত্যা করিয়াছেন এবং আলীর বংশধরদিগকে ধ্বংস করিয়াছেন তাহাতে ওম্মিয়া ও আব্বাসীয়া বংশের মধ্যে কোন পার্থক্যই সূচিত হয় না।

মাহাদী— ৭৭৫-৭৮৫ খৃঃ অব্দ

মনসুরের পুত্র মাহাদী নাম গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। পিতার কৃত দুষ্কর্মের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্যই বোধ হয় তিনি খিলাফত গ্রহণ করেন। গুপ্তচরের সংবাদের উপর নির্ভর করিয়া যাহারা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধী ভিন্ন কারাগারস্থ সকল অপরাধীকে মুক্তি প্রদান করিলেন। পবিত্র তীর্থগুলির যে সমস্ত সুবিধা মনসুর কর্তৃক নষ্ট হইয়াছিল মাহাদী তাহা প্রত্যর্পণ করেন। হজরত মহম্মদের বংশের সম্পত্তি তিনি পুনরায় অর্পণ করেন। মক্কা নগরে তীর্থ ব্যপদেশে গমন করিয়া কাবার আচ্ছাদন বস্ত্র (গিলাব) পরিবর্ত্তন করেন এবং মক্কাবাসিগণকে বহু অর্থ দান করেন। মদিনার পরিসর বৃদ্ধি করেন। তীর্থযাত্রীদের জন্য পথি-পার্শ্বে কূপ খনন, পান্থশালা নির্ম্মাণ ও কুষ্ঠরোগ-গ্রস্ত দুঃস্থ কুষ্ঠীদের জন্য রাজকোষ হইতে অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করেন।

খোরাসানে মকান্না নামীয় এক ব্যক্তি নিজেকে ঈশ্বরের প্রেরিত অবতার বলিয়া প্রচার করে। তাহাকে কিস্ প্রদেশে হত্যা করা হয়। জিনদীকী সম্প্রদায় মাহাদীর যুগে প্রসিদ্ধি লাভ করে। তাহাদের মূলমন্ত্র অনেকটা বর্ত্তমান যুগের সমাজ-তন্ত্রবাদিদের মতন। জিনদীকীদের প্রতি মাহাদী কোন করুণাই প্রদর্শন করে নাই। সমাজের শত্রু বলিয়া তাহাদিগকে বিশেষ ভাবে নির্য্যাতিত করা হয়।

গ্রীকদিগের সহিত মাহাদীর বহু দিবসব্যাপী যুদ্ধ চলিয়াছিল। পরিশেষে গ্রীকগণ সন্ধি করিতে বাধ্য হয়। মুসলিম রাজ্য তখন বহু দিকে বিস্তৃতি লাভ করে। চীন, তিব্বত ও ভারতের কোন কোন রাজা মুসলমানদের সহিত সখ্যতা স্থাপন করে।

মৃগয়া ব্যপদেশে মাহাদী অশ্বারোহণ কালে আকস্মিক ভাবে আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন।

মাহাদীর মৃত্যুর পর হাদী একবৎসর কাল রাজত্ব করেন। কিন্তু এক বৎসরের মধ্যে দুরারোগ্য ব্যাধিতে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার সময় হাসানের বংশধর ইদ্রিস আফ্রিকাতে এক স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন।

হারুণ-অল্-রসিদ—৭৮৬-৮০৯ খৃঃ অব্দ

তোমরা অনেকেই সুপ্রসিদ্ধ হারুণ-আল-রসিদের নাম শুনিয়াছ। আরব্য-উপন্যাসের নায়ক রূপে তাঁহার খ্যাতি সমস্ত পৃথিবীতে ছড়াইয়া গিয়াছে। তিনি ছদ্মবেশে প্রজার সুখ-দুঃখের সংবাদ লইতেন। তাহাদের দুঃখ দূর করিতেন। তিনি ধর্ম্মের প্রায় সমস্ত অনুষ্ঠান অক্ষুণ্ণ রাখিতেন। যুদ্ধে তাঁহার বীরত্ব, শান্তিতে সংগঠন প্রচেষ্টা, রাজ্যশাসনে বিচক্ষণতা, প্রজার দৈন্য নিবারণে আত্ম-নিয়োগ, মনোজগতের প্রসারণে অকুণ্ঠ দান ইসলামের ইতিহাসকে বহু ভাবে সমৃদ্ধ করিয়াছে। হারুণ-অল-রসিদের সফলতার প্রধান মূল ছিল তাঁহার শৈশবের শিক্ষাগুরু **বরমকের** পৌত্র খালিদের পুত্র **এহিয়া**।

হারুণ খিলাফতে আরোহণ করিয়া এহিয়াকে সাম্রাজ্যের উজির নিযুক্ত করিলেন। এহিয়া রাষ্ট্রশাসন ক্ষমতা অদ্ভুত, হারুণের প্রসিদ্ধির মূলে রহিয়াছে এহিয়া ও তাঁহার পরিবারের নিপুণতা নিষ্ঠা ও সততা। এহিয়া ছিলেন বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, দৃঢ়চিত্ত, পরোপকারী। রাষ্ট্রের মঙ্গল চিন্তা ছিল তাঁহার জীবনের ব্রত। এহিয়া মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার প্রভুর কল্যাণ কামনা ত্যাগ করেন নাই। হারুণ তাঁহার শৈশবের শিক্ষক, যৌবনের বন্ধু, রাষ্ট্রের কর্ণধার এহিয়ার মর্য্যাদা বহুদিন ক্ষুণ্ণ করেন নাই। এমন কি এই ভাবর্তীয় মন্ত্রীকে তিনি "পিতা" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। এহিয়ার পুত্র ফজল, জাফর, মুসা এবং মহম্মদ প্রত্যেকেই অসাধারণ কর্ম্মপটু ছিলেন। ফজল খোরাসানও মিসরে শাসনকর্ত্তা ছিলেন, জাফরের শান্তি স্থাপনের ক্ষমতা ছিল অদ্ভুত। এহিয়া বার্দ্ধক্যে পদত্যাগ করিলে, তাঁহার পুত্র জাফর সাম্রাজ্যের উজীর পদ লাভ করিয়া পিতার ন্যায় সুনিপুণ ভাবে রাজ্য চালনা করেন। এই পরিবার সতেরো বৎসর রাষ্ট্রের কর্ণধার ছিলেন। হারুণের রাজ্যের এই সমৃদ্ধি পিতাপুত্রের অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিপুণতার সহিত জড়িত আছে।

হারুণ ও পররাষ্ট্র বিভাগ--খলিফাগণ মিসর-দেশ জয় করিয়াছিলেন কিন্তু মিসরজাতিকে জয় করিতে পারে নাই, সুযোগ পাইলেই মিসরীয় জাতিগুলি খিলাফতকে বিপর্য্যস্ত করিত। অর্থের দিক দিয়া মিসর চিরকাল খিলাফতের রাজকোষের উপর ভার স্বরূপ ছিল, হারুণ ইব্রাহিমকে বংশ-পরম্পরা মিসরের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া সেখানকার গোলযোগ শান্তি করিতে চেষ্টা করিলেন। ইব্রাহিম ও হারুণ সর্ত্ত করিলেন যে ইব্রাহিম খিলাফতকে বাৎসরিক ১০০০০ দিনার কর দান করিবে এবং বাগদাদের বশ্যতা স্বীকার করিবে। সম্মানের দিক দিয়া মর্য্যাদা একটু ক্ষুণ্ণ হইলেও পরোক্ষভাবে মিসর-বিচ্যুতি খিলাফতের মঙ্গলসূচকই বলিতে হইবে। ভবিষ্যতে মিসর-শাসনের দুশ্চিন্তা, অর্থব্যয় এবং জন-হানি হইতে খিলাফৎ মুক্তিলাভ করিবে।

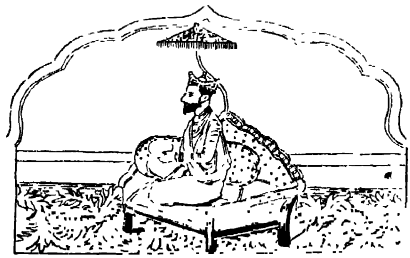
আফ্রিকা হস্তান্তরের আশু ক্ষতি কাবুল এবং সানহার প্রদেশ জয় দ্বারা পরিপূর্ণ হইল, এবং ইসলামের সীমানা হিন্দুকুশ পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করিল। প্রতীচ্যে গ্রীকদিগের সহিত যুদ্ধে নিকো-পারাস বহুবার বহুভাবে পরাজিত হইয়া বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন।

হারুণ পুত্রদের মধ্যে সিংহাসন অধিরোহণ-ক্রম-নির্দ্দেশ করিলেন, উদ্দেশ্য ভবিষ্যতে পারিবারিক ইতিহাস ভ্রাতৃযুদ্ধের লুষিত না হয়। তাঁহার পুত্রগণকে বিভিন্ন প্রদেশের শাসনভার প্রদান করেন। হারুণের পরে কে খলিফা হইবে তাহার ক্রমনির্দ্দেশক অঙ্গীকার পত্র কাবার মসজিদে রক্ষিত হয়, ইহাতে হারুণের দূরদর্শিতা প্রমাণ করে। কিন্তু এই ক্রমনির্দ্দেশ দ্বারা ইসলামের নির্ব্বাচন-প্রথা সম্পূর্ণভাবে পরিবর্ত্তিত হয় এবং খিলাফৎ পারিবারিক সম্পত্তিরূপে গণ্য হয়।

সম্রাজ্ঞী জুবেদা মক্কানগরে তীর্থযাত্রা করেন এবং মক্কা নগরীতে ও পথপ্রান্তে জলকষ্ট নিবারণের জন্য বহু জলাশয় খনন করেন, "জুবেদা কূপ" এখনও বর্ত্তমান আছে এবং বহু তৃষ্ণার্ত্ত তীর্থযাত্রীদের পিপাসা নিবারণ করে।

হারুণ এবং ব্রহমক পরিবার:—হারুণের জীবনের একটি শোচনীয় দিক ব্রহমক পরিবারের প্রতি ব্যবহারে প্রকাশ পাইয়াছে। ১৮৭ হিজরীতে হারুণ তাঁহার রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ-ভার এহিয়ার নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া রাবাইএর পুত্র ফজলের হস্তে সমর্পণ করেন। ব্রহমক পরিবারের ক্ষমতা, সমৃদ্ধি, সম্মান, রাজসভার বহু লোকের হিংসা উদ্রেক করিয়াছিল। ফজল হারুণের নিকট গোপনে প্রকাশ করিল যে শক্তিশালী ব্রহমক পরিবার আব্বাসীয়াবংশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছে। হারুণ বিশেষ কোন অনুসন্ধান না করিয়া একদা নিশাকালে উজীর জাফরকে হত্যা করিবার আদেশ দেন। বৃদ্ধ এহিয়া এবং তাঁহার পুত্র ফজল, মুসা ও মহম্মদকে অবরুদ্ধ করিলেন। তাঁহাদের সমস্ত সম্পত্তি রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত হইল। প্রথমতঃ—তাঁহাদের প্রতি বিশেষ অত্যাচার করা হয় নাই। কিছু কাল পরে বিদ্রোহ চক্রান্তের সন্দেহ বশে হারুণ তাঁহাদের প্রতি বিশেষ অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। বৃদ্ধ এহিয়া কারাগারে প্রাণত্যাগ করিলেন। এবং তিন বৎসর পরে পুত্র পিতার অনুগমন করিলেন। মুসা ও মহম্মদ পিতার মৃত্যুর পর মুক্তিলাভ করিল।

ইসলামের ইতিহাসে এই অকৃতজ্ঞতা চিরকালের জন্য হারুণকে কলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। সময়ান্তরে হারুণ বিশেষ অস্থিরমতিত্ব প্রকাশ করিতেন। বাগদাদ খলিফাদের মধ্যে মোটের উপর হারুণ-অল-রসিদকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে। ধর্ম্মের দিক দিয়া হারুণ নয় বার হজ করিয়াছেন। সুন্নতের নিয়ম-কানুন যথাসম্ভব অনুসরণ করিতেন। তাঁহার সময় "হানাফী" আইন প্রবর্ত্তিত হয়। মনসুর প্রতিষ্ঠিত "অনুবাদ বিভাগ" বহুধা পরিপুষ্টি লাভ করে। নানা দেশ হইতে নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাদি আনয়ন করিয়া অনূদিত করা হইল। ভারতবর্ষের চিকিৎসা শাস্ত্র, আয়ুর্ব্বেদ,



ধহ্‌ন্ বা ধন্বন্তরী

জ্যোতিষ হারুণকে বিশেষ ভাবে উৎসাহিত করিত। কথিত আছে, হারুণের খুল্লতাত পক্ষাঘাত রোগাক্রান্ত হইলে গ্রীক বৈদ্য গেব্রিয়েল তাহাকে মৃত বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু ব্রহ্মক পরিবারের গৃহ-চিকিৎসক **ধহন্ অথবা ধন্বন্তরী** তাহাকে জীবিত করিয়া প্রচার করেন এবং চিকিৎসার ভার গ্রহণ করেন। আয়ুর্ব্বেদ মতে চিকিৎসা করিয়া হারুণের খুল্লতাতকে নিরাময় করেন। চিকিৎসা-গুণে মুগ্ধ হইয়া হারুণ একটি আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করেন। ক্রমশঃ এই বিদ্যালয়ের ভিতর দিয়া সংস্কৃত-চর্চ্চা স্থায়ী ভাবে আরবে প্রচলিত হয়। ভারতীয় নাবিক সিন্ধাবাদের কাহিনী হারুণ-অল-রসিদকে সমস্ত সভ্যজগতের সঙ্গে পরিচিত করিয়া দিয়াছে। Arabian-night যাহার সহিত তোমরা ইউরোপীয় ভাষার মধ্য দিয়া পরিচিত—তাহা মূলতঃ ভারতীয় 'সহস্র-রজনী'র রূপান্তর। "সহস্র-রজনী" পারস্য ভাষায় অনূদিত হইয়া "হাজার দাস্তান" (হাজার = সহস্র ; দাস্তান = রাত্রি) ভাষান্তরে তাহা হইল "আলিফ্ লাইলা" (আলিফ = সহস্র ; লাইলা = রাত্রি)। সংস্কৃত কথা-সরিৎ-সাগরের সঙ্গে উহার বহু সামঞ্জস্য আছে। হারুণের রাজসভায় বহু কবি, গুণী, জ্ঞানী, শিল্পী রাজ্যশ্রী বর্দ্ধন করিয়াছে। রসিদ একজন কবি ছিলেন। মার্নসী (শর্বরী ?) প্রিয়তমা হেলেনের উদ্দেশ্যে রচিত প্রণয়-কবিতা আজিও বহু রসবেত্তাকে রস-সিঞ্চনে মুগ্ধ করে। এই সময় জ্ঞানের দিক দিয়া আরব তাহার মরুভূমির সীমা লঙ্ঘন করিয়া বৃহত্তর আরবের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। চীন সম্রাট ও রোমান সম্রাট্ হারুণের নিকট দূত ও উপহার প্রেরণ করিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিয়াছিল। রোমের প্রেরিত "ঘড়ি" আরবে প্রথম সময়-নির্দ্দেশক যন্ত্ররূপে প্রচারিত হইল। বাগদাদের রাজসভা তখন সভ্যজগতের সমস্ত দেশকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। ভারতবর্ষের সঙ্গে তাহার যথেষ্ট আদান প্রদান চলিয়াছিল।

আমিন্ ৮০৯-৮১৩ খৃঃ অব্দ

হারুণের বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁহার পুত্র আমিন্ মানুষ হইতে পারে নাই। তাঁহার চরিত্রে রাজোচিত গাম্ভীর্য্য, ঔদার্য্য অথবা শিক্ষা ছিল না। ফজল-বীন্-রাবির মন্ত্রীত্বে তাঁহার উচ্ছৃঙ্খলতা আরও বাড়িয়া গেল। যাদুকর, হাস্যরসিক, গণৎকার প্রভৃতি দ্বারা রাজদরবার অচিরে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। সাম্রাজ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা অন্যায়-অবিচারের স্রোত নিরন্তর বহিয়া চলিল। ক্রমশঃ সমস্ত ক্ষমতা মন্ত্রী ফজলের হস্তে ন্যস্ত হইল। রাজ্যের সীমান্তবর্ত্তী প্রদেশে ও বাহিরে বিদ্রোহের লক্ষণ দেখা দিল। ফজল এই সময় রাজপরিবারে ভ্রাতৃবিদ্রোহের বীজ রোপণ করিল, রাজভ্রাতা মামুন প্রাদেশিক শাসন-কর্ত্তার পদ হইতে বিচ্যুত হইল। আমিন্ মামুনের যুদ্ধে আব্বাসীয় খিলাফতের ভিতর ইসলামের সহজাত জ্ঞাতি শত্রুতা প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল, অচিরকালের মধ্যে আমিন্ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বশ্যতা স্বীকার করিল। আমিন্ তাঁহার অতি

অল্পকাল রাজত্বের মধ্যে অত শত্রু করিয়াছিল যে মামুনের অজ্ঞাতসারে শত্রুগণ তাঁহাকে নৃশংসভাবে হত্যা করিল। আমিনের রাজত্ব আব্বাসীয়া খিলাফতের কলঙ্কস্বরূপ।

মামুন ৮১৩-৮৩৩ খৃঃ অব্দ

মামুনের সিংহাসন আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে খিলাফতের সমস্ত গোলযোগ নির্ম্মূল হয় নাই। ইহার প্রধান কারণ মামুনের মার্ভে অবস্থিতি। মামুন তাঁহার মন্ত্রী ফজল-বীন-সালের উপর বাগদাদের শাসনভার ন্যস্ত করিয়া স্বয়ং মারভে তাঁহার প্রিয় জ্ঞানানুশীলনে সময় অতিবাহিত করিতেন। প্রায় পাঁচ বৎসরকাল মেসোপোটেমিয়া, ইরাক, কুফা, পারস্য-প্রান্তে বিদ্রোহ চলিল। মন্ত্রী ফজল কোন খবরই মামুনকে দেয় নাই। এই বিদ্রোহের মূলে ছিল আলীর বংশধরদের প্ররোচনা। মক্কা, মদিনা ইয়ামন বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। ঠিক এই সময়ে মামুন আলীর বংশধর আলী রিজাকে তাঁহার পরবর্ত্তী খলিফা মনোনয়ন করিল। কিন্তু প্রজাকুল এই মনোনয়ন প্রীত-মনে গ্রহণ করিল না, তাহারা মামুনকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহার খুল্লতাত ইব্রাহিমকে মনোনীত করিল। কিন্তু মামুন স্বয়ং বাগদাদে উপস্থিত হইলে অসন্তোষ-বহ্নি নির্ব্বাপিত হইল। ক্রমশঃ সকল বিদ্রোহ শান্ত হইল। মামুনের সাক্ষাৎ সম্পর্কে আসিয়া প্রজাকুল তুষ্ট হইল। তিনি স্বয়ং সীমান্ত রক্ষার আয়োজন করিলেন। ইয়ামন খোরাসান ও অন্যান্য প্রদেশের বিদ্রোহ দমন করা হইল। ক্রীট দ্বীপ বশ্যতা স্বীকার করিল। সিসিলী পরাজিত হইল, খিলাফতের চিরশত্রু গ্রীকসম্রাট Jheophilus সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। দুর্ভাগ্য-ক্রমে বিপুল কর্ম্মের মাঝখানে জ্বরাক্রান্ত হইয়া মাত্র ৪৮ বৎসর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন।

ঘটনার দিক দিয়া মামুনের রাজত্বে নূতনত্ব বিশেষ কিছুই নাই। রাজত্বের প্রারম্ভে বিদ্রোহ, বিদেশে যুদ্ধ জয়, কয়েকটী গুপ্ত-হত্যা অথবা প্রকাশ্য হত্যা ইসলামের প্রায় প্রত্যেক খলিফার রাজত্বেই খুঁজিয়া পাওয়া যায়। তবে মামুনের রাজত্বের বৈশিষ্ট্য, তাঁহার চরিত্র, তাঁহার কর্ম্ম-কুশলতা, জ্ঞানানু-শীলন, ধর্ম্মে উদারতা, নূতন সংস্কৃতির প্রচলন। তাঁহার রাষ্ট্রসভায় অমুসলমানের ও যথেষ্ট স্থান ছিল। সাম্রাজ্যে ধর্ম্মের জন্য পীড়নের করুণ-কাহিনী তাঁহার রাজত্বকে বিশেষ ভাবে কলঙ্কিত করে নাই। খৃষ্টানগণ নিশ্চিন্তে তাহাদের ধর্ম্মানুশীলন করিতে পারিত। তাহাদের গীর্জ্জার সংখ্যা ছিল অযুতাধিক। অগ্নি-উপাসকদের অগ্নিকুণ্ড ছিল বহু শত। মামুন তদানীন্তন "মুতাজ্জক" মতবাদের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে ও ধর্ম্মান্ধতা তাঁহাকে কলুষিত করে নাই। মামুন আরও কিছুকাল জীবিত থাকিলে আবু মুতাজ্জালের উদার মতবাদ ইসলামকে নূতন ভাবে উদ্বুদ্ধ করিতে পারিত।

মামুনের প্রযত্নে ইসলাম এক নূতন জ্ঞান-পিপাসায় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তাহার নিকট জ্ঞানের জাতি বিচার ছিল না। মণিকার যেমন রত্ন সন্ধান করিতে লবণ-সমুদ্রে অথবা ক্ষীর-সমুদ্র বিবেচনা করে না; মামুন ও তেমনি জ্ঞান অনুশীলন করিতে ধর্ম্মের ইতর বিশেষ বিবেচনা করেন নাই। আলেক-জান্দ্রিয়া, কনস্টান্টিনোপল, এথেন্স, ইরাণ, হিন্দুস্তান, কালদিয়া, সিরিয়া প্রভৃতি কোন দেশেরই শাস্ত্র আলোচনা করিতে মামুন কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। অনুবাদ-সম্ভারে আরব-সাহিত্য এক নূতন সম্পদে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল। পারস্য ভাষা খিলাফতের অভ্যন্তরে নিজের স্থান খুঁজিয়া পাইল; আরবীয় সাহিত্যের পার্শ্বে এক গৌরবময় স্থান অধিকার করিয়া পারসী ভাষা নিজেও কৃতার্থ হইল, আরবী-সাহিত্যকেও সমৃদ্ধ করিল।

মামুনের বিশেষ অনুসন্ধিৎসার বিষয়-বস্তু ছিল চিকিৎসা-শাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা ও জ্যোতিষ-চর্চ্চা, মামুনের সময় ভারতের বহু জ্যোতিষ-গ্রন্থ আরবীতে অনূদিত হয়। একজন ভারতীয় পণ্ডিত চরক-সংহিতার অনুবাদ করেন। মহম্মদবীন্ মুসা ভারতীয় বীজগণিত অনুবাদ করেন। পরে এই বীজগণিত স্পেন দেশে যায়। সেইখান হইতে ক্রমশঃ সমস্ত ইউরোপে প্রচারিত হয়। আবুল হাসান দূরবীক্ষণ যন্ত্রের বার্ত্তা সমস্ত পৃথিবীতে জানাইয়া দেন। ইসলামের প্রথম মানমন্দির মামুনের শাসনকালে সিরিয়া প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়।

মামুনের দান ইসলামের সংস্কৃতির ইতিহাসে

মুতাশিম ৮৩৩-৮৪২ খৃঃ অব্দ

মামুন মৃত্যুর পূর্ব্বে পুত্র আব্বাসকে বাদ দিয়া ভ্রাতা মুতাশিমকে খলিফা নির্দ্দেশ করিয়া যান। তাঁহার ধারণা ছিল যে মুতাশিম মামুন প্রচলিত রাষ্ট্রধারা অব্যাহত রাখিতে পারিবে। মুতাশিম শাসক হিসাবে মন্দ ছিলেন না। তাঁহার সময়ে কৃষিকার্য্যের বহু উন্নতি সাধিত হয়। নানা দিক দিয়া প্রজাবর্গের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধির চেষ্টা হয়। যুদ্ধ-বিগ্রহের দিক দিয়া বিবেচনা করিলে ও মুতাশিমকে প্রশংসা করিতে হয়। বাবেকের বিদ্রোহ দমন করেন এবং বাবেক ও তাহার পুত্রকে হত্যা করেন। গ্রীকগণ বিধ্বস্ত হন। আরবিস্থানে তুর্ক-বিদ্রোহ দমন করেন। ভারতের জাট জাতীয় প্রায় ১৭০০০ লোক এই সময়ে টাইগ্রীস্ নদীর তীরে উপস্থিত হয়। ভারতীয় জাটগণ কি উপায়ে কেন তথায় যায় তাহার কোন সন্ধান আমরা পাই না। মুতাশিম তাহাদিগকে পরাজিত করেন। কাহারো কাহারো মতে বর্ত্তমান জিপ্‌সী ইত্যাদি যাযাবর জাতি এই জাটদের বংশধর। কিন্তু মুতাশিম এই সমস্ত প্রশংসার্হ কার্য্যসত্ত্বেও খিলাফতের ভিত্তি বহুভাবে শিথিল করিয়াছিলেন।

মুতাশিম প্রায় ২০০০০০ তুর্ক সৈন্যকে দেহরক্ষী-রূপে বাগদাদে আনয়ন করেন এবং স্থাপিত করেন। বিদেশীয় তুর্কীদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি আরব ও পারস্য-দেশের মধ্যে বিক্ষোভের সঞ্চার করে। এবং প্রকাশ্যে অসন্তোষ প্রচারিত হয়, মুতাশিম বিরক্ত হইয়া সামারাতে বাসস্থান পরিবর্ত্তন করেন। এইবার বাস্তবিক খিলাফতে ঘুণ ধরিল, এই বিদেশীয় তুর্ক দল যতদিন খলিফার অধীনে থাকিবে এবং আদেশ মান্য করিবে, ততদিন খলিফার স্থান সুদৃঢ়। কিন্তু যখনই খলিফা দুর্ব্বল হইবে তখনই পরাক্রান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ বিদেশীয় তুর্কদল খিলাফৎ বিধ্বস্ত করিবে। ঠিক ভারতবর্ষেও পরবর্ত্তী যুগে ফিরোজ তোগলক তুর্কদাস স্থাপন করিয়া সাম্রাজ্য ধ্বংসের পথ পরিষ্কার করিয়াছিলেন। আব্বাসীয়া খিলাফৎ ধ্বংসের অন্যতম কারণ মুতাশিমের তুর্কী উপনিবেশ স্থাপন।

ওয়াসিক্ ৮৪২ ৮৪৭ খৃঃ অব্দ

মুতাশিমের পুত্র ওয়াসিক মামুনের মতন ন্যায়-পরায়ণ ও উদার ছিলেন। জ্ঞান অন্বেষণ অথবা আহরণ কালে তিনি কখনও জাতি-ধর্ম্ম-বিচার করেন নাই। মামুনের প্রদর্শিত পথানুসরণে ওয়াসিক্ অনুবাদ ও মৌলিক গ্রন্থের কল্যাণ-সাধনে নিজেকে নিয়োজিত করেন। সঙ্গীতে তাঁহার অসাধারণ প্রীতি ছিল। ওয়াসিক স্বয়ং বহু সঙ্গীত রচনা করেন। তিনি উদারপন্থী মুতাজ্জালের মতবাদ পোষণ করিতেন। সেইজন্য মোল্লাপণ্ডিত ইসলামের ইতিহাসে তাঁহার চরিত্র বিশেষ অশোভন আকারে লিখিত হয়। তাঁহার দানের গল্প সমসাময়িক যুগে প্রবাদ স্বরূপ প্রচলিত ছিল। তাঁহার রাজ্যে ভিক্ষুক ছিল না।

মানবতার বিচারে ওয়াসিকের গৌরব চির-অম্লান, কিন্তু রাজ্যশাসকরূপে তিনি মুতাশিক প্রবর্ত্তিত "তুর্ক-প্রীতি" নীতির অনুসরণ করিয়া আব্বাস বংশ ধ্বংসের পথ পরিষ্কার করিয়াছিলেন, আরব ও পারসিকগণ এই বিদেশীয়দের প্রতি তিনি কখনো বন্ধু ভাব পোষণ করেন নাই। আসনাছ ও ইসাককে সীমান্তের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলে আরবী ও পারস্যকগণের অসন্তোষ পরিস্ফুট আকার ধারণ করিল। এই সময় পাঁচ বৎসর রাজত্বের পর ওয়াসিক অকস্মাৎ পরলোক-গমন করেন।

মুতওয়াকিল ৮৪৭-৮৬১ খৃঃ অব্দ

ওয়াসিকের ভ্রাতা মুতওয়াকিল খিলাফতে আরোহণ করিয়া মামুন ও মুতাসিক প্রবর্ত্তিত উদার-নীতি সম্পূর্ণভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিলেন। মুতাজ্জাল-পন্থীর প্রতি তাহার ঘৃণা অপরিসীম। প্রাচীন ধর্ম্মকে তিনি সাম্রাজ্যের ধর্ম্মরূপে প্রচার করিলেন। মুতাজ্জাল ও বিজ্ঞানবাদিগণকে রাষ্ট্রের সমস্ত পদ হইতে অপসারিত করিলেন। কাজী আবুদায়ুদ ও তাঁহার পুত্রকে কারাগারে নিবদ্ধ করিলেন এবং তাহাদের সমস্ত সম্পত্তি সরকারের হইল। আলীবংশের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ যথেষ্ট ছিল। হোসেনের কবরকে নিশ্চিহ্ন করা হইল। সে-স্থানের উপর দিয়া পয়ঃ-প্রণালী নির্ম্মাণ করা হইল। শিয়া ধর্ম্মস্থানগুলিতে সাধারণের গমনাগমন নিষিদ্ধ হইল।

এই সমস্ত গোলমালের সুযোগ গ্রহণ করিয়া

গ্রীকগণ আরব সাম্রাজ্যের সীমান্ত আক্রমণ করিল এবং মুসলমানদের উপর বহু প্রকার অত্যাচার করিল। এই সব অত্যাচারের ফলে সমস্ত তুর্কী শরীররক্ষিগণ তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিল। এমন কি তাঁহার পুত্র মুন্‌তাসীর ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। একদা তাঁহাকে হত্যা করা হইল।

মুন্‌তাসীর ৮৬১-৮৬২ খৃঃ অব্দ

মুনতাসীর নিতান্ত সৎপ্রকৃতি ও স্থিরবুদ্ধি শাসক ছিলেন। পিতার বহু দুষ্কর্মের প্রায়শ্চিত্ত করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু মাত্র ছয় মাস রাজত্বের পর তিনি মৃত্যু-মুখে পতিত হন।

মুন্‌তাসীরের মৃত্যুর পর কয়েক বৎসরের মধ্যে কয়েক জন খলিফার সিংহাসন লাভ দেখিতে পাওয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে এই অধঃপতনের যুগে তুর্কী প্রাধান্যের পূর্ণ প্রকাশ দেখা যায়। তুর্কী শরীর-রক্ষিগণ ছিল খিলাফতের ভাগ্য-বিধাতা। এই তুর্কী প্রাধান্যের বিষময় ফল সমস্ত খিলাফতের ভিত্তি শ্লথ করিয়া ফেলিয়াছিল।

মুস্‌তাযিন খলিফা হইলে তুর্কগণ তাহাকে কোন ক্ষমতা দান করে নাই। ফলে, রাজশক্তির মূল দ্বিধা বিভক্ত হওয়ার দরুন প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিল। ক্রমশঃ খলিফার প্রাধান্য ইসলামের গৌরব ও সমৃদ্ধি নামে মাত্র পর্য্যবসিত হইল। তাহিরের বংশধরগণ নিশাপুরে রাজধানী স্থাপন করিয়া খোরাসানে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিল। তাহের বংশের অনুকরণে ক্রমশঃ প্রাচ্যদেশে বহু ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল। তুর্কগণের ব্যবহারে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া মুস্‌তাযিন বাগদাদে পারস্য ও আরব সৈন্যদের সাহায্য কামনা করিয়া সেখানে পলায়ন করিল। তুর্কগণ মুত্‌ওয়াকিলের দ্বিতীয় পুত্র মুতাজজ্‌কে খিলাফত দান করিল। নূতন খলিফা মুতাজজ্‌ মুস্‌তাইনকে বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক হত্যা করিয়া নিজ অধিকার সুদৃঢ় করিল।

মুতাজজ্‌ তিন বৎসর রাজত্ব করেন। তখন তুর্কগণের মধ্যে গৃহ-বিবাদ আরম্ভ হইল, তাহাদের নেতা ওয়াসিক ও বাঘ্‌হাকে হত্যা করা হইল। নূতন উজির বাবিকিয়াস ও নিহত হইল। আহমদ-বিন্‌ টুলুন মিসরে স্বীয় অধিকার স্থাপন করিলেন। মুতাজ্‌জ্‌ অর্থাভাবে সৈন্যদের বেতন দিতে না পারায় তাহারা মুতাজ্‌জ্‌কে সিংহাসনচ্যুত করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিল এবং কারাগারে তাঁহাকে হত্যা করা হইল।

তুর্কগণ ওয়াসিক পুত্র মুহ্‌তদিকে সিংহাসন প্রদান করিল। তাঁহার চরিত্র, কর্ম্মক্ষমতা এবং বিবেকবুদ্ধি ভাল ছিল। কিন্তু খিলাফতে অত বেশী ত্রুটি বৃদ্ধি পাইল যে সংস্কার অসম্ভব হইল। তাঁহার সংস্কার-নীতি তুর্কগণের অপ্রীতি সঞ্চার করিল, অনিবার্য্য সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। ফলে, মুহ্‌তাদির পরাজয়, কারাগার বাস ও অকাল মৃত্যু।

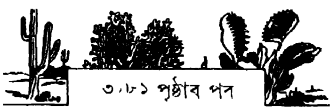
পরবর্ত্তী খলিফা মু্‌তামিদ মুত্‌ওয়াকিলের পুত্র দুর্ব্বল অস্থির ও চরিত্রহীন ছিলেন। কিন্তু তাঁহার ভ্রাতা মুয়াফিক রাষ্ট্রের কর্ণধার হইয়া তুর্কগণকে অনেকটা দমন করেন। এবং রাষ্ট্রের লুপ্ত গৌরব উদ্ধারের চেষ্টা করেন।

তবরীস্থান, সিস্তান, পারস্যে সাফারী বংশের প্রাধান্য স্থাপিত হইলেও মুতামিদকে খলিফার সম্মান দান করা হইল। ট্রান্‌সোকসিয়ানা প্রদেশে শামান বংশ সামান্য মাত্র করদানের প্রতিশ্রুতি দিয়া স্বীয় অধিকার দৃঢ় করিয়া লইল। তুলুনবংশ দামাস্‌কাসে বাস করিয়া সিরিয়া মিসরে রাজত্ব করিতে লাগিল। কালাদিয়া প্রদেশে নিগ্রো-বিদ্রোহ খিলাফৎকে বিশেষ ভাবে বিব্রত করিয়াছিল। কিন্তু মুয়াফিকের চেষ্টায় বিদ্রোহ দমন করা হইল। বাইজানটাইনের বিদ্রোহ বিশেষ বিস্তার লাভ করে নাই। এই অবসানের যুগেও পরিধি পশ্চিমে খিলাফতে আরব, পূর্ব্বে ভারত-মহাসাগর, এবং মেসোপোটেমিয়া, ব্যাবিলোনিয়া, কালাদিয়া, ইরাক, আরমেনিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

মুয়াফিক ২৭৮ খৃঃ দেহত্যাগ করেন। এবং তাহার কিছুকাল পরেই মুতামিদের মৃত্যু হয়। তারপর মুয়াফিকের পুত্র মুতাজিদ খলিফা পদ গ্রহণ করেন। এই সময়ে আবার আব্বাসীয়া খিলাফতের গৌরব কিয়ৎ পরিমাণে ফিরিয়া আসিল।



ব্যাকটিরিয়া

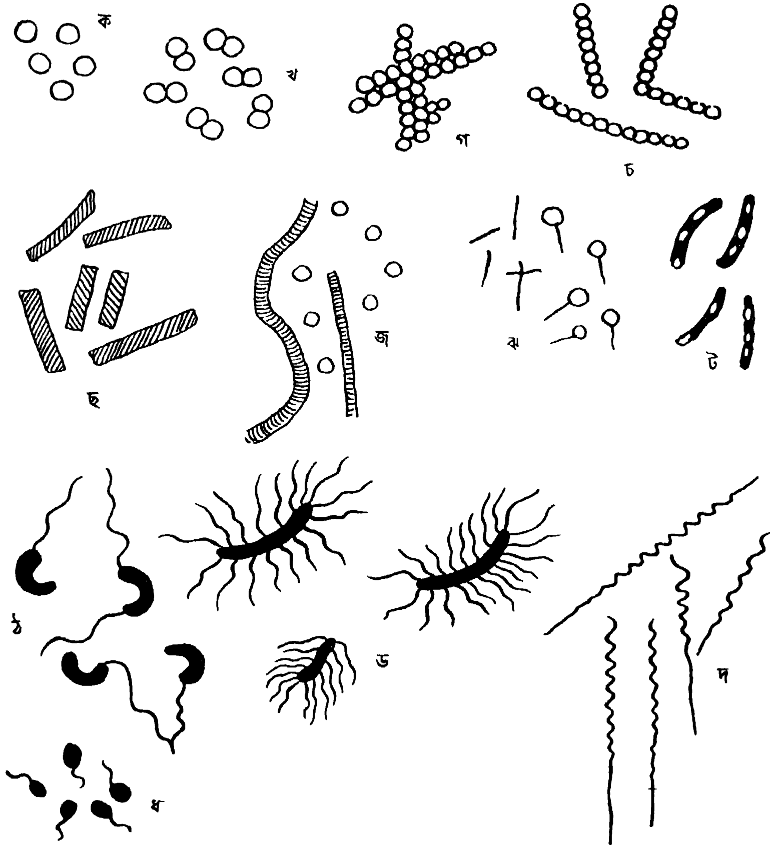

৩৮১ পৃষ্ঠার পর

ছত্রাকের বংশ পরিচয়ে ব্যাক্টিরিয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছি। ইহারা ছত্রাক জাতীয় উদ্ভিদের নিকটতম জ্ঞাতি এবং আকারে, অবয়বের গঠনে ও বংশবৃদ্ধির প্রণালীতে অনেকটা নীলহরিৎ শৈবালের (Blue green algae) মত। উদ্ভিদ-বিজ্ঞানবিদ্‌গণ ব্যাক্টিরিয়াকে উদ্ভিদ জগতের নিম্নতম উদ্ভিদ হিসাবে স্থান দিয়াছেন। আবার প্রোটোজোয়া নামক এক কোষ প্রাণীর সহিতও ইহাদের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। এই সকল কারণে ইহাদিগকে 'না-প্রাণী-না-উদ্ভিদ' পর্য্যায়ে ফেলিয়া এক নূতন ব্যাকটিরিয়া-বিজ্ঞান (Bacteriology) গড়িয়া তুলিয়াছেন। এই বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞদিগকে ব্যাকটিরিওলজিষ্ট বলা হয়।

ব্যাক্টিরিয়া অতি ক্ষুদ্রকায় এককোষ উদ্ভিদ। ইহাদের কাহারও কাহারও ব্যাস মাত্র ০·০০৫ মিলিমিটর (১০ মিলিমিটর = ১ সেন্টিমিটর = ২/৫ ইঞ্চি)। ইহাদের গোষ্ঠীর হিসাব দেওয়া এখানে সম্ভবপর নয়। সুতরাং ইহাদের একজনের কথা বলিলেই ইহাদের আকৃতি ও প্রকৃতির কথা কিছু বলা হইবে। মানবের বেশীরভাগ অসুখই হয় অদৃশ্য ব্যাক্টিরিয়ার আক্রমণে। টাইফয়েড, কলেরা, যক্ষ্মা, নিউমোনিয়া, বাত, ধনুষ্টঙ্কার, ডিপথেরিয়া, কুষ্ঠ, একপ্রকার আমাশয, প্লেগ, টন্‌সিলাইটিস, বিষব্রণ, প্রভৃতি মারাত্মক ব্যাধি ইহাদের প্রকোপেই মানব শরীরে প্রকাশ পায়। অথচ চক্ষুর অগোচর অতি ক্ষুদ্রকায় ইহারা!

টাইফয়েড রোগের কথা অনেকেই জানে। ইহার প্রকোপ প্রায়ই সাংঘাতিক হইয়া ওঠে। প্রথম হইতে সাবধান না হইলে ইহা সংক্রামক হইয়া দাঁড়ায়। একই বাড়ীতে দুই তিনটি লোক আক্রান্ত হওয়ার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে এক লাইনে পর পর সাজাইলে এক ইঞ্চি পরিমিত স্থান ঢাকিতে ১২০০ শত টাইফয়েড ব্যাক্টিরিয়ার দরকার হয়। এক ঘনবর্গ ইঞ্চি (cubic inch) স্থান পূর্ণ করিতে ৭,০০০,০০০,০০০,০০০ টাইফয়েড ব্যাক্টিরিয়ার প্রয়োজন হয়। সুতরাং ইহারা আকারে যে কত ছোট তাহার কতকটা হিসাব পাওয়া গেল। ইহাদের অস্তিত্ব অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ভিন্ন আবিষ্কার করা যায় না।

ইহাদেব বংশবৃদ্ধিব ক্ষমতা অসাধারণ। ব্যাক্টি-রিয়ার খাদ্যের উপর ইহাদেব একটিকে ছাড়িয়া দিলে অনুকূল অবস্থায় কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বিভক্ত হইয়া এক বহুতে পরিণত হয়। এ বিষয়ে ইহারা রক্তবীজের ঝাড়কেও পরাস্ত করে। জড্ডন সাহেব (Jordon) হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন ঘণ্টায় একবার করিয়া ভাগ হইলেও দুই দিনে ইহাদের সংখ্যা ২৮১, ৫০০,০০০,০০০ হইবে, এবং তিন দিনে ইহাদের সমবেত ওজন হইবে প্রায় ১৯০ হাজার মণ। অবশ্য অঙ্ক কষিয়াই এটা দেখান হইয়াছে,



বিভিন্ন প্রকার ব্যাক্টিরিয়া—বহুগুণ বড় করিয়া দেখান হইয়াছে

ক—ককাই, খ—ককাইজোড়া (Diplococci), গ—স্ট্যাফাইলো ককাই, চ—এস্ট্রেপ্টো ককাই, ছ ও জ—ব্যাসিলস অ্যানথ্রাসিস, ঝ—ব্যাসিলস টিট্যানি, ট—ব্যাসিলস টিউবারকুলোসিস, ঠ—ভিব্রিও কোলেরি, ড—ব্যাসিলস টাইফোসস, দ—ব্যাসিলস স্পিরিলম, ধ—ব্যাসিলস নাইট্রোসোমোনস

কার্য্যতঃ এ রকম হওয়া সম্ভবপর নহে, কারণ খাদ্যের অভাবে মারামারি কাটাকাটিতে ইহাদের অনেকেই বিনষ্ট হয়। ইহা ভিন্ন অন্যান্য প্রতিকূল অবস্থাও আছে অনেক।

এই প্রকার অসম্ভব রকম দ্রুত বংশবৃদ্ধি করার ক্ষমতা ছাড়াও জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইবার সুবিধা ইহাদের আরও অনেক আছে। প্রবল উত্তাপ, হিম, প্রভৃতি সহজে ইহাদিগকে কাবু করিতে পারে না। ইহারা ৬০°-৬৫° ডিগ্রি উত্তাপ এমন কি কেহ কেহ ১০০° ডিগ্রি উত্তাপ সহ্য করিয়াও বাঁচিয়া থাকিতে পারে। তেজস্কর বীজাণুনাশক ঔষধও কোন কোন অবস্থায় ইহাদের কিছুই করিতে পারে না। এমন স্থান নাই যেখানে ইহাদের কাহাকে না কাহাকেও দেখা না যায় তা সে পর্ব্বতের চূড়াতেই হোক, অন্ধকার গহ্বরেই হোক, জলের মধ্যে বা মাটীর নীচেই হোক। ইহারা মানুষ, জীবজন্তু, গাছপালা সে মৃতই হোক, কি জীবন্তই হোক সকলের শরীরেই সুবিধা পাইলেই বাসা বাঁধে, আবার বাহিরে জল, বাতাস, মাটি সর্ব্বত্রই ইহাদের দেখা পাওয়া যায়।

ইহাদের দেহ মাত্র একটি কোষ দ্বারা গঠিত। প্রত্যেকটি কোষ একটা কোষ প্রাচীর দ্বারা আবৃত। প্রাচীরের মধ্যে থাকে একটু প্রাণবস্তু, ও কয়েকটি দানা। প্রাণকেন্দ্র (nucleus) বলিয়া ইহাদের কিছু নাই। ব্যাক্‌টিরিয়া গোষ্ঠীর কতকগুলি সচল, আর কতকগুলি অচল। যাহারা সচল তাহাদের শরীরের নানাস্থানে শুঁয়ার মত একপ্রকার অঙ্গ (cilia) থাকে। এই অঙ্গের সাহায্যেই ইহারা চলাফেরা করে। ইহাদের দেহ সাধারণতঃ এক কোষ হইলেও কেহ কেহ আবার কয়েকটা কোষ মিলিয়া সূত্র দেহীও (filamentous) হইতে পারে।

ইহারা সকলেই একই প্রকার অবস্থায় বাস করিতে পারে না। ইহাদের কেহ কেহ বায়ু ভিন্ন জীবনধারণ করিতে পারে না (aerobic); কিন্তু কতকগুলি আবার বায়ুর সংস্পর্শে আসিলেই মরিয়া যায় (anaerobic), সুতরাং তাহারা বাঁচিয়া থাকিবার শক্তি অন্য প্রকারে আহরণ করে। আকৃতির পার্থক্য হিসাবে ব্যাক্‌টিরিয়াকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয় যথা—

১। যাহাদের আকৃতি গোলাকার (spherical) তাহাদিগকে **ককাস্‌** (coccus) বলে। যেমন স্ট্যাফাইলো ককাস্‌, এস্‌ট্রেপ্‌টোককাস্‌।

২। যাহাদের আকৃতি লম্বা (oblong or form of short rods) তাহাদিগকে **ব্যাক্‌টিরিয়ম** বা **ব্যাসিলস্‌** (bacterium or bacillus) বলে, যেমন টাইফয়েড ব্যাসিলি, টিটেনস ব্যাসিলি, ডিপ্‌থেরিয়া ব্যাসিলি, কলেরা ব্যাসিলি, প্রভৃতি।

৩। যাহাদের আকৃতি 'কমা'র (comma) মত কিছু বক্র (curved) তাহাদিগকে **স্পিরিলম্‌** (spirillum) বলে।

জীবনযাপনের ধারা অনুসারে ব্যাক্‌টিরিয়াকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যায়—

মৃতজীবী ব্যাক্‌টিরিয়া—ইহারা মৃতদেহ, তা প্রাণীরই হোক কিংবা উদ্ভিদেরই হোক, পচাইয়া নষ্ট করিয়া ফেলে। ইহাদের আক্রমণে প্রোটিন জাতীয় পদার্থ পচিয়া অত্যন্ত দুর্গন্ধ বাহির হয়। ফল, ফুল, তরি-তরকারী, মাছ, মাংস, দুধ প্রভৃতি কাহাকেও ইহারা রেহাই দেয় না। সুবিধা পাইলে ইহাদের সকলকেই পচাইয়া মানুষের প্রভূত অনিষ্ট সাধন করে। শুধু টাকা পয়সার ক্ষতির দিক দিয়াই নহে পচা মাছ মাংস প্রভৃতি খাইয়া সময় সময় প্রাণান্তকর অসুখ করার দৃষ্টান্তও বিরল নহে।

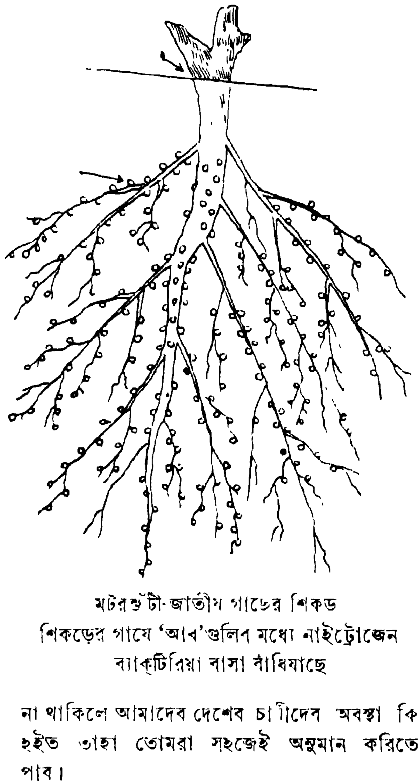
রোগোৎপাদক ব্যাক্‌টিরিয়া—ইহারা জীবন্ত উদ্ভিদ ও প্রাণীকে আক্রমণ করে। ইহাদের আক্রমণে হয় শরীরের আক্রান্ত অংশ পচিয়া নষ্ট হয় এবং আক্রমণ রোধ করিতে না পারিলে পচন ক্রমে সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হয়, আর না হয় শরীরে বাসা বাঁধিয়া এক প্রকার বিষ (toxin) নির্গত করিয়া ইহারা সমস্ত শরীরকে বিষাক্ত করিয়া তোলে। আবার কেহ কেহ এক সঙ্গে দুই প্রকারেই জীবকে আক্রমণ করে। দুষ্ট ব্রণ, ধনুষ্টঙ্কার, গলাহারি, যক্ষ্মা, টাইফয়েড, কলেরা, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি রোগ ইহাদের আক্রমণেই শরীরে প্রকাশ পায়। প্রথম হইতে সাবধান না হইলে ইহাদের প্রকোপ সাংঘাতিক ও সংক্রামক হইয়া উঠে।

নাইট্রোজেন ব্যাক্‌টিরিয়া—ইহারা মাটির মধ্যে বাস করে এবং মানুষের অতি উপকারী

বন্ধু। ইহাদের একটি অসাধারণ ক্ষমতা এই যে ইহারা বাতাসের বিমুক্ত নাইট্রোজেন গ্রহণ করিয়া নাইট্রোজেন সমন্বিত যৌগিক পদার্থ (nitrogenous compound) প্রস্তুত করিতে পারে।

প্রোটিন জীব জন্তু গাছ-পালার একটি বিশিষ্ট খাদ্য। জীব দেহের প্রাণবস্তু প্রোটিন জাতীয় দ্রব্যে প্রস্তুত। ইহার শতকরা প্রায় ১৬ ভাগ নাইট্রোজেন। প্রোটিন প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে একমাত্র সবুজ গাছ পালাই প্রস্তুত করিতে পারে। এ ক্ষমতা আর কাহারও নাই। প্রোটিনের নাইট্রোজেন গাছপালা শিকড়ের সাহায্যে মাটি হইতে নাইট্রেট হিসাবে গ্রহণ করে। এই জন্যই জমির উর্বরতা কমিয়া গেলে জমিতে নাইট্রেট সার দেওয়া হয়।

বাতাসের শতকরা ৭৫ ভাগ বিমুক্ত নাইট্রোজেন। অথচ বিমুক্ত নাইট্রোজেন সবুজ গাছ গ্রহণ করিতে পারে না। কিন্তু নাইট্রোজেন ব্যাকটিরিয়ার সে ক্ষমতা আছে। আমাদের দেশে চাষীরা জমিতে সার দেয় না! একই জমিতে বছরের পর বছর একই ফসল রোপন করিলে সেই জমির উর্বরতা শক্তি কমিয়া যায়, ফলে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ ক্রমশঃ কমিয়া আসে। ইহার প্রতিকারকল্পে চাষীরা একই জমিতে ধান কিংবা পাট চাষ করিবার পর মটর খেসারি প্রভৃতি মটরশুঁটি জাতীয় ফসলের (Leguminous crop) চাষ করে। একটি মটর শুঁটির গাছের শিকড় জমি হইতে টানিয়া উঠাইলে দেখা যাইবে উহার গায়ে আবের মত বহু গুটি (tubercles) হইয়াছে। এই গুটিগুলি নাইট্রোজেন ব্যাকটিরিয়ার বাসা। ইহারা জমিতে বাস করে। মটরশুঁটি গাছ যখন জন্মে তখন ইহারা গাছের শিকড়ে প্রবেশ করিয়া সেইখানে বাসা বাঁধে। সেই বাসাই ক্রমশঃ বড় হইয়া আবে পরিণত হয়। এই বাসায় বসিয়া ইহারা বাতাস হইতে বিমুক্ত নাইট্রোজেন গ্রহণ করে। ইতিমধ্যে মটরশুঁটি গাছ বাতাস হইতে গৃহীত কার্বনডায়কসাইড গ্যাস ও জলের রাসায়নিক সংযোগে শর্করা জাতীয় (carbohydrate) খাদ্য প্রস্তুত করিয়া সমস্ত শরীরে সঞ্চালিত করিয়াছে। নাইট্রোজেন ব্যাক্টিরিয়া বাতাস হইতে গৃহীত নাইট্রোজেন এবং এই শর্করা জাতীয় খাদ্যের সংযোগ ঘটাইয়া নাইট্রোজেন ঘটিত যৌগিক পদার্থ প্রস্তুত করিয়া আবগুলির মধ্যে সংগ্রহ করিয়া রাখে। ফসল কাটিয়া লইবার পর জমির মধ্যে শিকড়ের সহিত হাজার হাজার আব থাকিয়া যায়, এবং ক্রমশঃ পচিয়া জমির সহিত মিশিয়া উহার উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করে। নাইট্রোজেন ব্যাক্টিরিয়া এই ক্ষমতা



মটরশুঁটী-জাতীয় গাছের শিকড়
শিকড়ের গায়ে 'আব'গুলির মধ্যে নাইট্রোজেন ব্যাক্টিরিয়া বাসা বাঁধিয়াছে

না থাকিলে আমাদের দেশের চাষীদের অবস্থা কি হইত তাহা তোমরা সহজেই অনুমান করিতে পার।

নাইট্রিফাইং ব্যাক্টিরিয়া—ইহারাও মাটির মধ্যে বাস করে এবং মানবের প্রভূত উপকার সাধন করিয়া থাকে। যখন ইহাদের জ্ঞাতি ভাইরা জীবজন্তু, গাছপালার মৃত দেহ পচাইয়া গলাইয়া অ্যামোনিয়া গ্যাস (ammonia) প্রস্তুত করে

তখন ইহাদের কেহ কেহ সেই অ্যামোনিয়া গ্যাসকে নাইট্রস অম্লে (nitrous acid) পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলে। এই নাইট্রস অম্ল মাটিস্থ ধাতব পদার্থের সহিত মিলিত হইয়া নাইট্রাইটে (nitrite) পরিণত হয়। তখন ইহাদের অন্য জ্ঞাতি ভাই সেই নাইট্রাইটকে পরিবর্ত্তিত করিয়া নাইট্রেট (nitrate) প্রস্তুত করে। সবুজ গাছপালা মাটি হইতে শিকড় দিয়া এই নাইট্রেট গ্রহণ করিয়া প্রোটিন প্রস্তুত করে। নাইট্রিফাইং ব্যাক্‌টিরিয়া জমিতে না থাকিলে জীব-জগৎ মৃত জৈব পদার্থ (dead organic matters) হইতে নাইট্রোজেন ফিরিয়া পাইত না, কালে সমস্ত নাইট্রোজেন শেষ হইয়া যাইত তখন পৃথিবীতে জীবন রক্ষা করা এক প্রকার অসম্ভব হইত। কারণ ইহাদেরই আর এক জ্ঞাতি ভাই সুবিধা ও সুযোগ পাইলেই অ্যামোনিয়াকে ভাঙ্গিয়া তাহার নাইট্রোজেন বাতাসে ফিরাইয়া দেয়।

লৌহ ব্যাক্‌টিরিয়া—ইহারা লৌহমিশ্রিত জলে বাস করে। অনেক সময় নদীর ধারে কিংবা পার্ব্বত্য ঝরণার ধারে লাল্‌চে হড়হড়ে (slimy) যে মাটি দেখা যায় তাহা এই লৌহব্যাকটিরিয়া প্রসূত। পার্ব্বত্য ঝরণার কাছে এই রকম লাল্‌চে মাটি দেখিয়া অনেক সময় সেই অঞ্চলে লৌহ ধাতুর অবস্থিতির কথা জানা যায়।

গন্ধক ব্যাক্‌টিরিয়া—ইহাদিগকে উষ্ণ প্রস্রবণের জলে দেখিতে পাওয়া যায়। সালফিউরেটেড হাইড্রোজেন গ্যাস (H_2S) হইতে গন্ধক পৃথক করিয়া নিজেদের শরীরের মধ্যে উহাকে জমা করিয়া রাখিবার ক্ষমতা ইহাদের আছে।

জীব জন্তুর এত বড় শত্রু ও এত বড় মিত্র যে ব্যাকটিরিয়া তাহাদের অস্তিত্বের কথা ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে কেহ জানিত না। ঐ সালে ওলন্দাজ লিউয়েনহুক (Anthony van Leeuwenhock) সর্ব্বপ্রথম ইহাদের অস্তিত্বের কথা জগতে প্রচার করেন। আমরা বলিয়াছি ইহারা নানাপ্রকারে আমাদের শত্রুতা সাধন করে। আমাদের খাদ্য পচাইয়া নষ্ট করে, খাদ্য বিষাক্ত করিয়া আমাদের প্রাণান্ত পর্য্যন্ত ঘটায়। দুধ, জল প্রভৃতি নিত্য-প্রয়োজনীয় খাদ্যের সহিত মিশিয়া কলেরা, টাইফয়েড প্রভৃতি মারাত্মক ব্যাধির মহামারী আনয়ন করে। আমাদের শরীরে কোন প্রকারে ক্ষত হইলে তাহার ভিতর প্রবেশ করিয়া ক্ষত পচাইয়া কিংবা সমস্ত শরীর বিষাক্ত করিয়া আমাদের জীবনান্ত করে। ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইহাদের সহিত সাক্ষাৎ ভাবে যুদ্ধ করা মানুষের অসাধ্য ছিল। কিন্তু লিউয়েনহুকের আবিষ্কারের পরে এই কার্য্য এখন অনেকটা সহজ হইয়া আসিয়াছে। ইহাদের আকৃতি এবং প্রকৃতি আমাদের নিকট ধরা পড়িয়াছে। গবেষণাগারে ইহাদের জীবন-চরিত আমরা অধ্যয়ন করিতে পারি। আমরা ইহাদের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার কি কি উপায় আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছি সে সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়া ইহাদের কথা শেষ করিব।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি খাদ্যের মধ্য দিয়া ব্যাক-টিরিয়া আমাদের শরীরে প্রবেশ করে। অল্প কয়েকজন বাদে ইহাদের অনেকেই ১০০° ডিগ্রি তাপ সহ্য করিতে পারে না। কাজেই যে সমস্ত খাদ্যদ্রব্য উত্তাপে সহজে নষ্ট হয় না তাহাদিগকে আমরা ফুটাইয়া আহার করি। দুধ ফুটাইলে তাহার মধ্যে অবস্থিত ব্যাকটিরিয়ার বীজরেণু (spore) নষ্ট হইয়া যায়। সেই জন্যই কথায় বলে 'ঠাণ্ডা দুধ যমের দূত'। বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে ফুটান দুধকে 'পাস্তরাইজড' (pasteurised) দুধ বলে। যক্ষ্মা রোগের বীজ দুধের সঙ্গেই বেশীরভাগ ক্ষেত্রে সংক্রামিত হয়। সমস্ত সভ্যদেশেই পাস্তরাইজড দুধ বিক্রয় হয়। যেখানে ইহা করা সম্ভবপর নহে সেখানে দুধ দোহন করিবার পূর্ব্বে বীজাণুনাশক লোসন (lotion) দিয়া গরুর বাট ধুইয়া লওয়া উচিত। কলেরা প্রভৃতি সংক্রামক রোগের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য জল ফুটাইয়া খাইবার ব্যবস্থা করা হয়।

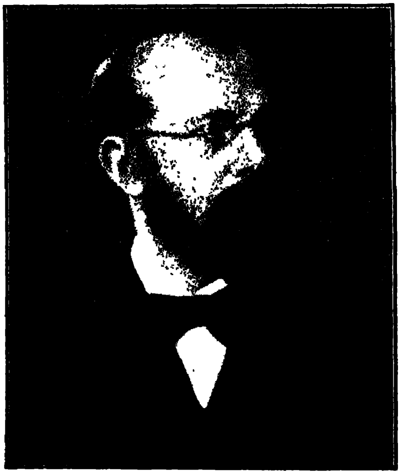
যাঁহারা সহরে বাস করেন তাঁহারা জানেন কাহারও বাড়ীতে কলেরা, বসন্ত, টাইফয়েড প্রভৃতি সংক্রামক রোগ হইয়াছে খবর দিলেই কিংবা খবর পাইলেই করপোরেশন হইতে লোক আসিয়া যে ঘরে রোগী ছিল সেই ঘর ও তাহার ব্যবহৃত জামা কাপড় বিছানা পরিশোধিত (disinfect) করিয়া দিয়া যায়। যে ব্যাধির আক্রমণ হইয়াছিল তাহার

বীজাণু যাহাতে কোথাও ছড়াইতে না পারে তজ্জন্য এই প্রক্রিয়া দ্বারা তাহাদিগকে মারিয়া ফেলা হয়। এই উদ্দেশ্যে আমরা নিত্য ফিনাইল ব্যবহার করি। কলেরা প্রভৃতি মহামারীর আবির্ভাব হইলে জল ফুটাইবার সঙ্গে সঙ্গে পানীয় জলে দুই চারি ফোঁটা 'ক্লোরিন জল' (chlorine water) সেই জলে মিশাইয়া খাইবার ব্যবস্থা আছে। ফিনাইল, ক্লোরিন জল, ফরম্যালিন, কার্ব্বলিক সাবান প্রভৃতির বীজাণুনাশক ক্ষমতা আছে বলিয়া ইহাদিগকে এবং ইহাদিগের মত জিনিষকে **নিঃসংক্রামক** (disinfectant) বলা হয়।

আজকাল অস্ত্রোপচার করিবার পূর্ব্বে যে স্থানে অস্ত্রোপচার হইবে সেই স্থান ঔষধ দ্বারা ধুইয়া বাষ্প দ্বারা পরিশোধিত (steam sterilized) ব্যাণ্ডেজ দিয়া বাঁধিয়া রাখা হয় যাহাতে ক্ষত পচাইবার ব্যাকটিরিয়া সেখানে বাসা বাঁধিতে না পারে। অস্ত্র করিবার পূর্ব্বে ডাক্তার স্বয়ং তাঁহার হাত, ছুরি, কাঁচি প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র লাইজল, অথবা বীজাণুনাশক সাবান প্রভৃতি দ্বারা ষ্টেবিলাইজ (sterilize) করিয়া লন। অস্ত্র করিবার পর কর্ত্তিত স্থানে পচননিবারক অ্যান্টিসেপ্টিক (antiseptic) ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হয়। আমাদের শরীরে কোন প্রকারে আঘাত লাগিয়া ক্ষত হইলে আমরা সেখানে আইওডিন দ্রব (iodine solution) লাগাই। ইহার তাৎপর্য্য এই যে সেখানে যদি কোন বীজাণু প্রবেশ করিয়া থাকে তবে তাহারা বিনষ্ট হইবে। ব্যাকটিরিয়ার আচরণের কথা না জানিলে আমরা তাহাদের বিরুদ্ধে এ অভিযান করিতে পারিতাম কি? এই অভিযানের সফলতার জন্য সমস্ত মানব সমাজ আজ পাস্তুর ও জোসেফ লিষ্টারের নিকট কৃতজ্ঞ।

কিন্তু ব্যাক্‌টিরিয়া জনিত ব্যাধির প্রকৃত কারণ নির্ণয় করেন রবার্ট কক (Robert Koch)। তিনিই সর্ব্বপ্রথম প্রমাণ করেন ব্যাক্‌টিরিয়া হইতেছে ব্যাধির কারণ (cause), 'ফল' (effect) নহে। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মানির ব্রেসলোতে (Breslau) গোরুর মরক আরম্ভ হয়। ব্রেসলো ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানের গরু মরিতে আরম্ভ করিল। সঙ্গে সঙ্গে মানুষ এবং অন্যান্য জন্তুর মধ্যেও এই রোগ সংক্রামিত হইতে

বছরের পর বছর এই রকম মরক হইতে থাকায় ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে গ্রাম্য ডাক্তার কক ইহার কারণ অনুসন্ধানে কৃতসংকল্প হইলেন। বহু প্রয়াসের পর তিনি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে প্রমাণ করিলেন গরু ও মানুষের এই মারাত্মক রোগের কারণ হইতেছে এক প্রকার ব্যাক্‌টিরিয়া (Bacillus anthracis)। তিনি এই রোগে আক্রান্ত গোরুর রক্ত হইতে এই ব্যাক্‌টিরিয়া পৃথক



রবার্ট কক্

করিয়া সুস্থ ইঁদুরের শরীরে টিকা দিয়া দেখাইলেন সুস্থ ইঁদুর এই রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। ইহার পর তিনি ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম যক্ষ্মারোগের ব্যাক্‌টিরিয়া আবিষ্কার করেন। ব্যাকটিরিয়া পৃথক করিয়া বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে তাহাদিগকে পরীক্ষা করিবার উপায় বাহির করিবার কৃতিত্ব তাঁহারই। কক ও তাঁহার সহকর্ম্মীগণ কয়েক বৎসরের মধ্যেই কলেরা, গলাহাবী, নিউমোনিয়া, টাইফয়েড প্রভৃতি রোগের ব্যাক্‌টিরিয়া পৃথক করিতে ও তাহাদের জীবন যাপনের ধারা আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

কক ব্যাধির কারণ আবিষ্কার করিতে সমর্থ

হইয়াছিলেন সত্য কিন্তু ব্যাধির প্রতিবিধানের উপায় আবিষ্কার করেন ফরাসী পাস্তর ও তাঁহার সহধর্ম্মীগণ। আজকাল বসন্ত সংক্রামক ভাবে প্রকাশ পাইলে বসন্তের টিকা লওয়া হয়। কলেরার সময় কলেরার টিকা লইলে উহার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার সম্ভাবনা থাকে। গঙ্গাসাগর যাত্রিদিগকে কলেরার টিকা দিবার প্রচলন হওয়ার পর হইতে গঙ্গাসাগরে কলেরায় মৃত্যুর হার কমিয়া গিয়াছে। ফোঁড়া সারিতেছে না, ফোঁড়া হইতে পুঁজ লইয়া অটোভ্যাক্সিন (auto-vaccine) তৈয়ার করিয়া



পাস্তর

টিকা দিলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে ফোঁড়া সারিয়া যায়। আজকাল এ-সকল কথা সাধারণেও জানে, কিন্তু পাস্তরের পূর্ব্বে এ কথা বড় কেহ জানিত না। জেনার (Jenner) পথ দেখাইলেও সে পথে পাস্তরের পূর্ব্বে আর কেহ চলেন নাই। পাস্তর পরীক্ষা করিয়া দেখাইলেন—

(ক) ব্যাধি-উৎপাদক ব্যাক্টিরিয়া শরীরে প্রবেশ করাইলে শরীরের মধ্যে এমন একটা প্রতিষেধকের সৃষ্টি হয় যাহা ব্যাক্টিরিয়া কিংবা তাহার কার্য্যের প্রতিবন্ধকতা করে।

(খ) এই প্রতিষেধক কার্য্যকরী হইলে রোগী নী-রোগ হয়, কিন্তু তাহা না হইলে মৃত্যু ঘটে।

(গ) ব্যাক্টিরিয়া শরীরে প্রবেশ করিলেই শরীর স্বয়ং সতর্ক হইয়া উঠে। অর্থাৎ ব্যাক্টিরিয়ার কার্য্য আরম্ভ হইবার অপেক্ষা রাখে না।

(ঘ) কাহারও দেহে যদি এমন মাত্রায় কোন ব্যাকটিরিয়ার টিকা (inoculation) দেওয়া যায় যাহা শরীর সহজে সহ্য করিতে পারে তাহা হইলে পরে সেই ব্যাক্টিরিয়া কর্ত্তৃক ভীষণভাবে আক্রান্ত হইলেও শরীর তাহা প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হয়। এই মাত্রা ঠিক করিতে পাস্তরকে অনেকদিন ধরিয়া পরীক্ষা করিতে হইয়াছিল।

পরীক্ষার ফলে তিনি Anthrax Serum বাহির করেন।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ২রা জুন তারিখে তিনি পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিয়া দেখাইলেন তাঁহার আবিষ্কৃত Anthrax serum দ্বারা যে সমস্ত ভেড়াকে টিকা দেওয়া হইল তাহারা বাঁচিয়া রহিল, আর পূর্ব্বে যাহাদিগকে টিকা দেওয়া হয় নাই তাহারা Anthrax bacillus টিকা দেওয়ার ফলে সকলেই মরিল।

কক ও পাস্তরের প্রদর্শিত পথে আজ অনেক প্রকার ব্যাক্টিরিয়ার সহিত আমাদের পরিচয় হইয়াছে ও তাহাদের সিরম (serum) বাহির হইয়াছে। এই সমস্ত বিশিষ্ট সিরম বিশিষ্ট ব্যাক্টিরিয়ার কর্ত্তৃক উৎপন্ন ব্যাধির চিকিৎসায় প্রয়োগ করা হয়। সিরম তৈয়ারী করিবার প্রণালীও অতি সহজ হইয়া গিয়াছে। বেঙ্গল কেমিক্যাল বা বেঙ্গল ইম্মিউনিটির গবেষণাগারে আজ কাল সিরম তৈয়ার হইতেছে। ইহার জন্য অনেকগুলি করিয়া সুস্থ ও তেজস্বী ঘোড়া রাখা হয়। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি পাস্তর দেখাইলেন ব্যাক্টিরিয়া কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে ব্যাক্টিরিয়া বিষ (toxin) নষ্ট করিবার জন্য শরীরে একপ্রকার প্রতিষেধক (anti-toxin) প্রস্তুত হয়। ক্ষার যেমন অম্লের শক্তিকে নষ্ট করিতে পারে ইহাদের কার্য্যও ঠিক অম্লক্ষারের উপর পরস্পরের কার্য্যের ন্যায়।

কোন ব্যাক্‌টিরিয়ার সিরম প্রস্তুত করিতে হইলে সেই ব্যাকটিরিয়া বিষের ক্রমবর্দ্ধমান শক্তি-দ্বারা ঘোড়াকে টিকা দেওয়া হয়। ক্রমশঃ সেই ঘোড়ার শরীরে বিষের প্রতিষেধকের (anti-toxin) শক্তিও এই প্রকারে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তখন ঘোড়ার শিরা কাটিয়া অপচনীয় (sterilized) অবস্থায় রক্ত বাহির করিয়া লওয়া হয়। এই রক্ত জমিয়া গেলে লাল্‌চে রং এর যে রস বাহির হয় তাহাই সিরম। সিরমে সেই ব্যাক্‌টিরিয়ার বিষ প্রতিষেধক থাকায় ইহা শরীরে প্রবিষ্ট করিলে ব্যাকটিরিয়ার আক্রমণ সহজে কিছু করিতে পারে না, কারণ ইহারা ব্যাকটিরিয়া বিষের কার্য্য নষ্ট করে।

ব্যবহারিক বাক্‌টিরিয়া-বিজ্ঞানের বিষয় দুই একটি কথা বলিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। তোমরা অনেক সময়েই লক্ষ্য করিয়া থাকিবে দুধের পাত্রে দুধ রাখা হইয়াছে, জ্বাল দিবার সময় কিংবা প্রয়োজনের সময় দেখা গেল দুধ কাটিয়া গিয়াছে। দুধের পাত্র ভাল করিয়া পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া না রাখিলেই এই অনর্থ হইয়া থাকে, সেই জন্য দেখা যায় গরু দুহিবার সময় গোয়ালারা দুধের পাত্র আগুনের সেক দ্বারা বিশুদ্ধ করিয়া লয়। ইহার অর্থ আর কিছুই নহে, দুধ কাটিবার (sour) জীবাণুকে আগুনের তাতে নষ্ট করিয়া ফেলা।

দোকানে টিনে করা ফল কিনিতে পাওয়া যায়। ঘরে পাকা ফল রাখিয়া দিলে কিছুদিন বাদেই দেখিবে ব্যাক্‌টিরিয়ার আক্রমণে ফল পচিয়া উঠিয়াছে। অথচ টিনে করা ফল পচে না কেন? ইহার কারণ ফলকে কোন তরল রসে প্রায় সিদ্ধ করিয়া ষ্টেরিলাইজ করার পর টিনে বায়ু সংস্পর্শ বর্জিত করিয়া সিল (seal) করিয়া দেওয়া হয়। সিদ্ধ করার তাপে জীবাণু মরিয়া যায় এবং সিল করায় বাহির হইতে নূতন জীবাণু টিনের ভিতর প্রবেশ করিয়া ফলকে পচাইতে পারে না।

অনেক ব্যাক্‌টিরিয়া আছে যাহারা জলাভাবে কাজ করিতে পারে না। তাহাদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে আমাদের অনেক খাদ্যকে আমরা শুষ্ক করিয়া রাখি। ঢাকা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি দেশে মাছ শুকাইয়া রাখিয়া সারা বছর ধরিয়া সেই মাছ খাইবার রীতি আছে। এই রকমেই ধান চাউল গম দাল প্রভৃতি শুকাইয়া আমরা ব্যাক্‌টিরিয়ার হাত হইতে উহাদিগকে রক্ষা করি। ইহারা ২।৪ দিন ভিজা অবস্থায় থাকিলেই পচিয়া নষ্ট হইয়া থাকে।

অনেক সময় মাছ 'নোনা' করিয়া ব্যাক্‌টিরিয়ার হাত হইতে রক্ষা করা হয়। কারণ লবণ বেশী থাকিলে ব্যাকটিরিয়া আক্রমণ করিতে পারে না।

খাবার 'বাসী' হইলেই পচিয়া উঠে। এই পচা বাসী খাবার খাওয়ার ফলে অনেক অঘটন ঘটিয়াছে। অথচ রোজকার উদ্বৃত্ত খাবার ফেলিয়া দেওয়াও সকল সময় সম্ভব হয় না। ইহার প্রতিকার কল্পে রেফ্রিজারেটর (refriegerator) নামে সিন্ধুকের মত একপ্রকার যন্ত্র আবিষ্কার হইয়াছে, ইহার ভিতর খাবার রাখিলে ঠাণ্ডায় ব্যাক্‌টিরিয়া সে খাবার নষ্ট করিতে পারে না।

ব্যাকটিরিয়া আমাদের পরম শত্রু। টিণ্ডেল (Tyndall) বলিয়াছেন—'We have been scourged by invisible thongs, attacked from impenetrable ambuscades, and it is only to-day that the light of Science is being let in upon the murderous dominion of our foes.

কিন্তু ব্যাক্‌টিরিয়া আমাদের পরম মিত্রও। ইহারা না থাকিলে পৃথিবীর সমস্ত জীব-জন্তু, গাছপালা, মানুষ প্রভৃতি খাদ্যাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইত, পৃথিবী জীবশূন্য হইত।

মানুষ দিন দিন বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাক্‌টিরিয়ার সহিত পরিচিত হইয়া তাহার প্রতি-ষেধক বিবিধ উপায় আবিষ্কার করিয়া মানুষকে অকাল মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিতেছে।

মানুষ যে কি ভাবে কেমন করিয়া রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে, তাহার ইতিহাস ও কারণ তোমরা বুঝিতে পারিলে। এই অমূল্য জীবনকে রক্ষা করিতে হইলে কতদিকে কতরূপ সতর্কতার প্রয়োজন তাহা ও জানিতে পারিলে, অতএব প্রত্যেকটি বিষয়ে তোমরা সতর্ক হইয়া চলিবে, খাওয়া দাওয়া, চলাফেরা, জল পান করা প্রত্যেকটি বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন না করিলে অকাল মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচা অসম্ভব।

সমুদ্র-তত্ত্ব

সাগর গর্ভের প্রাণী ও উদ্ভিদ

৩০৪৬ পৃষ্ঠার পর

এইবার মোটামুটি সমুদ্রগর্ভের জীবজগৎ সম্বন্ধে তোমাদিগকে দু-চার কথা বলব। জীব বলতে, প্রাণী ও গাছ-গাছড়া দুই-ই বোঝায়। ডাঙ্গার জীবের সঙ্গে তোমাদের যে রকম প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে, জলমধ্যস্থ জীবের সঙ্গে সে রকম নেই, থাকতেও পারে না, কেন না তোমরা নিজেরাই ডাঙ্গার জীব, স্থলচর। যদি মানুষ অবাধে সাগরগর্ভে ঘুরে বেড়াতে পারত তা হলে সামুদ্রিক জীবের সঙ্গেও তার ততটাই জানা শুনো হয়ে যেত যতটা আছে ডাঙ্গার গাছ-গাছড়া ও ডাঙ্গার পশুপক্ষী কীট-পতঙ্গের সঙ্গে। তা হলে, আলোচনা করা যাক, জলমধ্যস্থ জীবের খবর আমরা পেয়ে থাকি কি উপায়ে। প্রথম, জোয়ার-ভাটার কল্যাণে। সমুদ্রে রোজ দুবার ভাটা পড়ে, তিথি অনুসারে কখনও বেশী, কখনও কম। ভাটা পড়লে বেলাভূমির যে অংশ নজরে আসে তার উপর, বিশেষতঃ যদি সেই বেলাভূমি প্রস্তরাকীর্ণ হয় তা হলে, অসংখ্য বিচিত্র সামুদ্রিক জীবজন্তু গাছ গাছড়া পড়ে রয়েছে দেখতে পাওয়া যায়। যেদিন আবার সমুদ্রে ঝড় হয়, আর সেই ঝড় ডাঙ্গার পানে বইতে থাকে, সেদিনকার ত কথাই নেই! সেইদিন ভাটার সময় সমুদ্রতীর রঙ্গ-বেরঙ্গের সামুদ্রিক তৃণ-শৈবাল ও রকম রকমের জেলীমাছ, তারামাছ ও ছোট বড় শামুকে ঝিনুকে এমনই ঢেকে থাকে যে বালি প্রায় দেখা যায় না। আবার, পাথরের ফাটল ও গর্তে যে জল পড়ে থাকে সেই জলের ভিতরে কত রকমের অতি ক্ষুদ্র জীব যে দেখা যায়, তা বলে শেষ করা যায় না। তার কতক শুধু চোখেই দেখা যায়, কিন্তু অনেক গুলোই অণুবীক্ষণ নইলে নজরে পড়ে না।

এত গেল কিনারের কথা, যেখানে প্রাণী ও শৈবালের নমুনা নিজে দেখে কুড়িয়ে সঞ্চয় করা যায়। ডুব জলে অন্য উপায় গ্রহণ করতে হয়। ছোট নৌকায়



সমুদ্রতলের উদ্ভিজ্জ

চেপে খানিকটা বেরিয়ে গিয়ে জলের মধ্যে জাল ও বড় বড় বড়শী ফেলে, কড়া, কোদালি তাওয়া ইত্যাদি নানা বিচিত্র আকারের Dredging যন্ত্র জলে নামিয়ে দিয়ে সমুদ্রগর্ভের ও সমুদ্রতলের রকম রকমের শৈবালাদি ও মৎস্যাদি জীবের নমুনা জোগাড় করা হয়! এর চেয়েও দূর সমুদ্রে, যতদূর পর্য্যন্ত ডুবুরীরা নামতে পেরেছে, সেখানকার জীব-জন্তুর তথ্য তারাই সংগ্রহ করে নিয়ে আসে। ডুবুরী মানে ত শুধু অজ্ঞ অশিক্ষিত মজুর নয়, বড় বড় বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতেরা ডুবুরীর কাপড় পরে এই কাজের জন্য সমুদ্রগর্ভে নামেন। সম্প্রতি লোহার খাঁচার ভিতর ডাক্তার বীব্ নামে এক পণ্ডিত দুই হাজার দুশো ফুট অবধি নেমেছিলেন।

আগের পরিচ্ছদে তোমাদিগকে Lucas ও Baillie এর যন্ত্রের কথা বলেছি। ঐ সকল যন্ত্রের সঙ্গে নানা রকমের পাত্র জলে নামিয়ে দিয়ে তলাকার জল কাদার নমুনা তুলে আনা হয়েছে, ও পরে অণুবীক্ষণ দ্বারা পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে সেই নমুনাতে কি কি রকমের জীবাণু আছে। কিন্তু মাঝ-দরিয়ায় যেখানে জল অথই সেখানকার তলার অবস্থা ত ডুবুরী দেখে আসতে পারে না! যন্ত্র নামিয়েও সেখানকার তলার জল কাদার নমুনা সংগ্রহ করে আনা অসম্ভব। তাই, অতল সমুদ্র সম্বন্ধে আমাদের অনেকটা যুক্তি তর্ক ও আন্দাজের উপর নির্ভর করিতে হয়।

পূর্ব্ব পরিচ্ছদগুলি পড়ে তোমাদের সমুদ্রতলের অবস্থা সম্বন্ধে একটা মোটামুটি



এক জাতীয় তারামাছ (Cushion star)

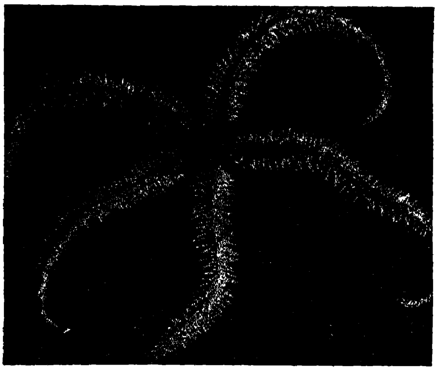
জ্ঞান নিশ্চয় জন্মেছে। তবু কতকগুলি কথা আবার এখানে বলতে হবে, কেন না জলের প্রাণী বা উদ্ভিদের অস্তিত্ব, তাদের স্বরূপ, তাদের সংখ্যা, অনেকাংশে নির্ভর করছে পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর। জল-গর্ভের পরিস্থিতি যে নানারূপ হতে পারে

তা সহজেই বুঝতে পার। আলো অন্ধকারের অবস্থা সর্ব্বত্র এক নয়। তাপ সর্ব্বত্র



এক জাতীয় সামুদ্রিক কীট

সমান নয়। জলের চাপেরও উপর নীচে অনেক তফাৎ। জলে নুনের পরিমাণও নান স্থানে নানারকম। এই সবই তোমাদের জানা কথা। জীবের অবস্থিতি অনেকাংশে এই সব অবস্থাভেদের উপর নির্ভর করে। ক্রমশঃ উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দেব। আপাততঃ জীবজগৎ সম্পর্কে যে দুটী মূলতত্ত্ব মনে রাখা অত্যন্ত দরকার, তার কথা বলি।



তারা মাছ (Brittle Star)

প্রথম এই যে, আলোর সঙ্গে উদ্ভিদজীবনের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। যেখানে আলো নেই সেখানে কোন প্রকারের উদ্ভিদ জন্মাতে পারে না, থাকতেও পারে না।

দ্বিতীয় তত্ত্ব এই যে, উদ্ভিদ বিনা প্রাণী বাঁচতে পারে না। প্রাণী মাত্রই উদ্ভিদ খেয়ে কিংবা উদ্ভিদভোজী অন্য প্রাণীর মাংস খেয়ে জীবন ধারণ করে। এই দুই তত্ত্ব ডাঙ্গাতে যেমন সত্য, জলেও তেমনি সত্য,



এক জাতীয় কাঁকড়া Spider crabs)

এর কখন কোন ব্যতিক্রম হতে পারে না। তাহলে প্রথম হিসাব করা যাক, সূর্য্যের আলো সমুদ্রগর্ভে কত দূর পৌঁছায়।

আগে তোমাদিগকে বলেছি, যে দিনের আলো জলের মধ্যে অক্লেশে একশো বাম বা ছয়শো ফুট পর্য্যন্ত প্রবেশ করে। উষ্ণপ্রদেশে যেখানে বাতাস পরিষ্কার সূর্য্য মাথার উপর আসে, সেখানকার প্রখর সূর্য্যালোক দুই বা আড়াই হাজার ফুট অবধি জলরাশি ভেদ করে যেতে পারে। তবে বুঝতে পারছ, যত নীচে যাবে আলো তত কম। দু'হাজার ফুটে অতি অল্প, তিন হাজার ফুট নীচে একেবারে সূচীভেদ্য অন্ধকার। সেখানে গাছ গাছড়া জন্মাবার কোন সম্ভাবনাই

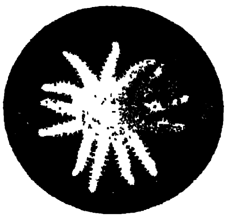
নেই। কিন্তু সম্প্রতি বারমুডাস্-এর কাছে, অর্থাৎ বিষুবরেখার সন্নিকটস্থ প্রদেশে, দুই হাজার ফুট নীচে এক রকম ছোট্ট দুই আড়াই ইঞ্চি শৈবাল পাওয়া গেছে। জীয়ন্ত



কাঁকড়া

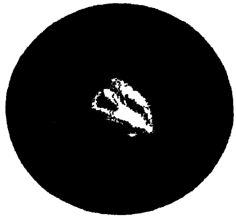
অবস্থায় ও তলার মাটিতে সংলগ্ন, কিন্তু একেবারে সাদা, কোন বর্ণ নেই। সেখানে আলো এত কম যে অতি ক্ষুদ্র জাতীয় উদ্ভিদের জীবন সম্ভব হলেও, বর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়। সাধারণতঃ শৈবাল বলতে যা বোঝায় তার বর্ণ বিচিত্র, আকারও বৃহৎ। কখন কখন ৫০।৬০ ফুট লম্বা হয়।

ভাটার সময় সমুদ্রের জল যত দূর নেমে যায়, বেলাভূমির সেই অংশটাকে বিজ্ঞানে বলে Littoral প্রদেশ। তার পরের অর্থাৎ নীচের অংশের নাম দেওয়া হয়েছে Sub-littoral প্রদেশ। সব চেয়ে বেশী,



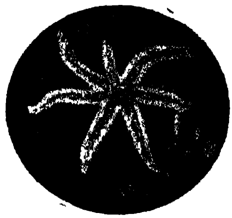
তারা মাছ ভিন্ন জাতীয়

বড় ও বিচিত্র বর্ণের শৈবাল পাওয়া যায় Littoral এর নীচের অর্দ্ধেক ও Sub-Littoral-এর উপরের অর্দ্ধেক এই ভাগটায়। তার পর শৈবাল ক্রমশঃ কমতে কমতে দুশো ফুটের নীচে প্রায় শেষ হয়ে যায়। ৬০০ ফুট অবধি সমুদ্রতলের এই ভাগটা মোটামুটি মহাদেশের ভিত বা Continental shelf-এর উপর। এই ভিত বেলাভূমির লাগা তাকের মত জমী, কতকটা গড়ানে। তাকের কিনার থেকে সমুদ্রতল খুব দ্রুত গতিতে দু'হাজার ফুট নেমে গেছে।



এক জাতীয় সামুদ্রিক প্রাণী

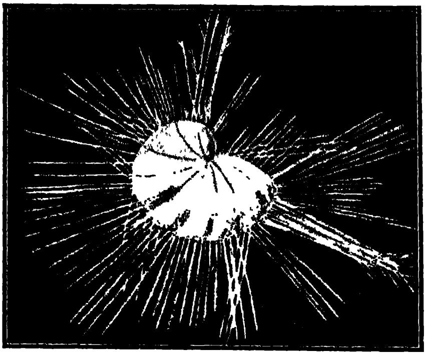
এই বন্ধুর অংশের নাম Continental slope। এখানে আলো খুব কম, তাই গাছ গাছড়াও প্রায় নেই। মোটামুটি বলা যায় যে সমুদ্রগর্ভ হতে যে সব গাছ গাছড়া ইতিপূর্ব্বে তুলে আনা হয়েছে সে সবই আশী নব্বই বাম পর্য্যন্ত। উত্তর মেরু সমুদ্রে Barents ও Spitz-bergen-এর কাছে দেড়শো বাম নীচে শৈবাল পাওয়া গিয়েছিল বটে. কিন্তু সে সময় পণ্ডিতেরা মনে করেছিলেন যে ঐ শৈবাল অন্য জায়গা থেকে ভেসে এসে গভীর জলে থিতিয়ে



তারা মাছ

পড়েছে। এখন Bermudasএর শৈবাল পাওয়ার পর তাঁরা কি বলবেন, জানি না। যাই হোক এত কথা তোমাদের বিচার

করে কাজ নেই। তোমরা ধরে নাও যে একশো বামের চেয়ে বেশী জলে সাধারণতঃ শৈবাল জন্মে না।



যে সামুদ্রিক প্রাণী হইতে খড়িমাটি তৈরী হয়

এ ত গেল আলো আঁধারের ফলাফল। সমুদ্রতল কি দিয়ে গঠিত, তার উপর



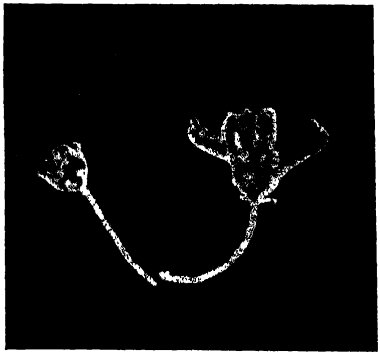
প্রবাল কীট

আবার অনেকাংশে নির্ভর করে সেখানকার গাছ গাছড়ার জীবন। সেখানে জলের নীচে শুধু বালি কিংবা নরম কাদা, সেখানে শৈবাল খুব কম। সব রকম শৈবাল ত



প্রবাল কীট

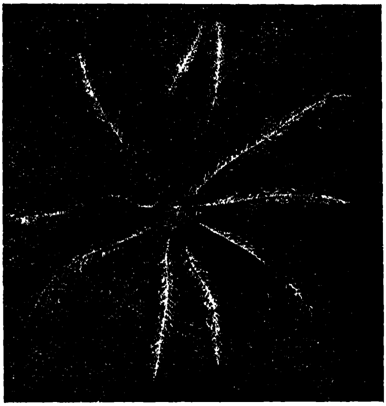
সেখানে জলের তোড়ে টিকতে পারে না। যেখানে পাথর বেশী, সেখানে সকল প্রকার



তারা মাছ

শৈবালই খুব জন্মায় ও বাড়ে। মোটামুটি এই নিয়ম। তবে সব নিয়মের একটু-আধটু ব্যতিক্রম আছেই। এখানেও তা হয়।

আবার, জলে নুনের ভাগ যেখানে খুব কম সেখানেও যথার্থ সামুদ্রিক গাছ গাছড়া



ফিদার ষ্টার

বেশী থাকে না। বল্টিক বা কৃষ্ণ সমুদ্রের মত স্থানে, সেখানে বড় বড় নদী ক্রমাগত মিঠা জল সমুদ্রে ঢালছে, সেখানে যথার্থ সমুদ্র শৈবাল অল্পই পাওয়া যায়। আমাদের দেশেও খাড়ির মাথায় যেখানে জলে নুনের ভাগ অত্যন্ত কম সেখানে যে সমস্ত গাছ



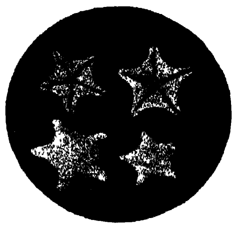
কাঁকড়া অন্তজাতীয়

গাছড়া জলে আমরা জন্মাতে দেখেছি সে গুলি মোটেই সমুদ্র শৈবালের মত নয়। তার গঠন ও প্রকৃতি ডাঙ্গার বড় গাছের



সামুদ্রিক শশা

মত। একটা কথা এই খানেই বলি। সমুদ্রের গাছগাছড়া ও ডাঙ্গার গাছগাছড়া এ দুইয়ের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ। সমুদ্রের গাছ গাছড়াকে ইংরাজীতে Alga বা Sea weed, ও বাঙ্গালাতে শৈবাল, বলা হয়েছে। শৈবাল সম্বন্ধে প্রধান জ্ঞাতব্য কথা এই যে এদের ফুল নেই, ফল নেই, যথার্থ শিকড় নেই, যথার্থ ডালপালাও নেই। এদের যথার্থ শিকড় নেই বলছি এই জন্য যে এরা মাটির থেকে রস (Sap) টানে না, আলোর সাহায্যে চারিদিকের জল থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে। যথার্থ ডালপালাও নেই বলার মানে এই যে এদের দেহের শাখা প্রশাখা দিয়ে রস বাহিত হয়ে পাতায় পাতায় পৌঁছায় না। সত্য বলতে এদের পাতা ও যা, ডাল বা পাতার বোঁটা গুলাও তাই। বোঁটা আস্তে আস্তে খুলে ক্রমশঃ পাতা হয়ে যায়। অনেক শৈবালের সর্ব্বাঙ্গে ফলের মত পদার্থ দেখা যায় বটে, কিন্তু সে



তারামাছ অন্তজাতীয়

গুলো হাওয়ায় ভরা ফাঁপা পটপটি মাত্র। সেই-পটপটির সাহায্যে তারা জলে ভাসতে পারে।



ঘুমন্ত কাঁকড়া

আবার অনেক শৈবালের বোঁটায় বোঁটায় পাতার সঙ্গে ফুলের মত পদার্থ দেখা যায়। সেগুলোও যথার্থ ফুল নয়, পাতারই রকমারি। আচ্ছা, ফল ফুল নেই, বীজও নেই, তাহলে



মুখোস পরা কাঁকড়া

এদের বংশরক্ষা হয় কি করে, বলতে পার? ডাঙ্গার ফার্ণ যদি নজর করে থাক ত দেখবে তারও বীজ নেই, তার অঙ্গ থেকে যে গুটি বা Spore খসে পড়ে সেইগুলোই নূতন ফার্ণ গাছে পরিণত হয়। সমুদ্র শৈবালেরও এই নিয়ম। তাদের দেহ হতেও



কাঁকড়ার লড়াই

Spore-রূপী জীবকোষ বেরিয়ে বেরিয়ে নূতন শৈবালের সৃষ্টি করে।

এ পর্য্যন্ত যে শৈবালের কথা বলেছি সেগুলো সমুদ্রতলে সংলগ্ন। অর্থাৎ তলার পাথর মাটিতে আটকান। গাছের গোড়ায় ছোট ছোট চাকতী আছে আর সেই চাকতীর চারিদিকে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ঝুরি আছে, তাই দিয়ে তলার পাথর মাটি কামড়ে থাকে।



সামুদ্রিক প্রাণী

ঝড় তুফান হলে জলের তোড়ে স্বস্থান-চ্যুত হয়, ও ভাসতে ভাসতে বহু দূর পর্য্যন্ত চলে যায়। আমরা বেলাভূমিতে ভাটার সময়

যে শৈবাল পড়ে আছে দেখি, সে এই রকম স্বস্থানচ্যুত উদ্ভিদ। কিন্তু এ ছাড়া এক রকম যথার্থ ভাসমান শৈবাল আছে, এইবার তার কথা বলব। সে শৈবাল মহাসমুদ্রের সকল প্রদেশে সর্ব্বদা ভেসে বেড়াচ্ছে।



শতপদী সামুদ্রিক কীট

তারই উপর নির্ভর করছে বাহিরের গভীর সমুদ্রের প্রাণী সমূহের জীবন। নৌকায় করে সমুদ্র বেড়াতে গিয়ে যদি পাশের দিকে মুখ বাড়িয়ে দেখ ত দেখবে শুধু স্বচ্ছ হরিতাভ জল, জীব জন্তু বড় একটা নজরে পড়বে না। হয়ত বড় জোর দেখবে এক আধটা জেলী মাছ জ্বল জ্বল করতে করতে ভেসে চলে যাচ্ছে। কিন্তু যদি নৌকার পিছনে একখানা মুখখোলা মলমলের থলী খানিকক্ষণ ঝুলিয়ে রাখ, আর তার পর সেই থলীটা তুলে উলটে এক গেলাস সমুদ্রের জলে ঝেড়ে ফেল, দেখবে যে সেই জলে হাজার হাজার ধূলি-কণার মতন কি সব ভাসছে। একটা পুটক (Lens) দিয়ে পরীক্ষা করলে দেখতে পাবে, রকম রকমের অতি ক্ষুদ্র জীবাণু সমূহ ঐ জলে ভাসছে। ছোট্ট জেলী মাছ, ছোট্ট চিংড়ী মাছ, ছোট্ট ছোট্ট খোসাওয়ালা জীব, এই রকম কত কি! অণুবীক্ষণ দিয়ে জল পরীক্ষা করলে আর এক জিনিস নজরে পড়বে। দেখবে যে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সবুজ উদ্ভিদকণাও লাখে লাখ জলে ভেসে বেড়াচ্ছে। এদিকেই বলে ভাসমান সমুদ্র শৈবাল। এর ছয় শ্রেণী। তার মধ্যে সব চেয়ে প্রধান যে শ্রেণী, তার নাম Diatom। Diatom এর প্রত্যেক কণা এক একটি স্বতন্ত্র জীব-কোষ। ভিতরে উদ্ভিদকণা-আর তার চারিদিকে Silica বা বালুকা সারের স্বচ্ছ ঢাকন। এই Diatom আদি ভাসমান শৈবাল বাহির সমুদ্রের হেরিং প্রভৃতি অনেক জাতীয় মাছের নিত্য ভোজ্য। আবার অন্য এমন অনেক মাছও আছে যারা প্রধানতঃ Diatom ভোজী মাছ খেয়ে প্রাণ ধারণ করে।

সমুদ্রের উপর সর্ব্বত্র এই সমস্ত নানা প্রকার জীবকণা ভেসে বেড়াচ্ছে। এর

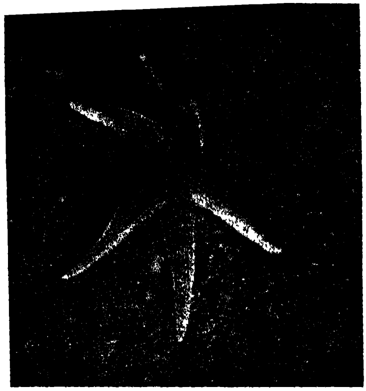
কতক প্রাণী, কতক বা উদ্ভিদ। প্রাণীর মধ্যে গ্লবিজেরিনার নাম তোমরা আগেই



এক জাতীয় সামুদ্রিক কীট (Lugworm)

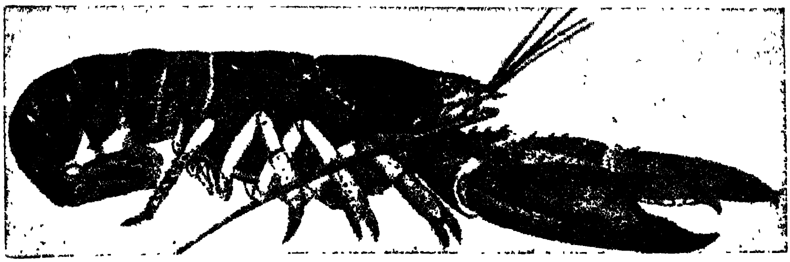
শুনেছ। উদ্ভিদের মধ্যে প্রধান ডায়াটম। এই সমস্ত ভাসমান জীবাণু সমষ্টির সাধারণ নাম Plankton। যে Plankton উপরিভাগে মৎস্যাদি প্রাণীর গ্রাস এড়াতে পারে, তারাও প্রকৃতির নিয়মে যথাসময় মরে যায়, ও তাদের দেহাবশেষ জলে তলিয়ে যায়, গভীর সাগর গর্ভের ও সাগর তলের প্রাণীর খোরাক জোগায়।

সমুদ্রের যে ভাগে পুরো খোরাক মেলে, মৎস্যাদি প্রাণী সেই ভাগেই বেশী। একশো বামের চেয়ে কম জলে, অর্থাৎ মহাদেশের ভিতের উপর, ত অজস্র শৈবাল জন্মাচ্ছে। তাই সেখানে মাছগুলো প্রাণ ভরে চরে খেতে পায়, বংশবৃদ্ধিও সেই অনুযায়ী হয়।



তারা মাছ

গভীর জলেও যেখানে ডায়াটমাদি বেশী আছে, সেখানে মাছও অনেক। অন্যত্র কম। কেন যে এক জায়গায় Plankton বেশী এক জায়গায় কম, তা তোমাদের বোঝা শক্ত। তবে সমুদ্রের মাছ ধরা যাদের ব্যবসায় তাদের হিসেব করতে হয় বই কি. কোথায় Plankton বেশী।



সামুদ্রিক চিংড়ী

পরিবেষ্টনের উপর যে শুধু মাছের সংখ্যা নির্ভর করছে, তা নয়। মাছের গড়ন, বর্ণ,



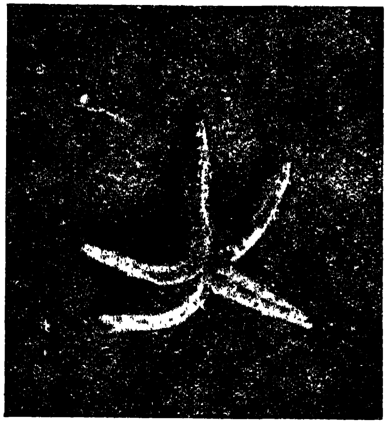
সামুদ্রিক কীট (The paddle worm)

সবই বিভিন্ন পরিস্থিতে বিভিন্ন প্রকারের। একটা কথা এইখানে তোমাদের বলি। সমুদ্রের অনেক প্রাণীকে আমরা সাধারণতঃ মাছ বলি, যারা মোটেই মাছ নয়। জেলী মাছ, তারা মাছ, ত মাছ নয়ই, তাদের অবয়বাদি মাছের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। চিংড়ী মাছকেও সত্যি মাছ বলা উচিত নয়, কেন না তার শিরের কাঁটা নেই। তিমি মাছ ত স্তন্যপায়ী প্রাণী, ডাঙ্গায় তার উৎপত্তি



সামুদ্রিক কাঁকড়া—বিভিন্ন জাতীয়

পরে এসে জলে বাসা করেছে। সামুদ্রিক প্রাণীর শ্রেণীবিভাগ পরে করব। এখন শুধু কয়েকটা উদাহরণ দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি যে পরিস্থিতি ভেদের জন্য এদের চেহারার কি রকম তফাৎ হয়। ব্যাপারটা বোঝা সহজ। ধর, যে মাছ উপরের জলে ভেসে বেড়ায় তার রঙই বল, গড়নই বল, দেহাবরণের কাঠিন্যই বল, পাঁচ মাইল নীচের গভীর জলের মাছের অনুরূপ হতে পারে না। উপরের মাছের রঙ পাটকিলে, ধূসর ও রূপালী কিন্তু অন্ধকার অতল জলের মাছ কৃষ্ণবর্ণ। গভীর জলের মাছকে চার পাঁচ মাইল জলের ভার



তারা মাছ—বিভিন্ন জাতীয়

বহন করে ঘুরে বেড়াতে হয়, তাই তাদের দেহও সেই রকম কঠিন করে তৈরী। এই জাতীয় অনেক মাছ উপরে তুললে তৎক্ষণাৎ ফেটে মরে যায়, কেন না উপরে তার দেহের উপর শুধু বায়ুর চাপ। উপর জলের চিঙড়ী মাছের রঙ অর্দ্ধস্বচ্ছ নীলাভ, কিন্তু গভীর জলের চিঙড়ী ও অন্যান্য মেরুদণ্ডহীন মাছের বর্ণ একেবারে লাল। আবার অতল জলের অনেক মাছের সামনে দুটো প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চোখ আছে, আবার দুই পাশে জোনাকীর

মত এক এক সারি ছোট জ্বল জ্বলে চোখই বল, কি বাতিই বল, আছে। জোনাকীর মত আলো বিকিরণের গুণ সমুদ্রের Plankton এরও আছে, তাই রাত্রিবেলা নৌকার দাঁড় টেনে যেতে যেতে মনে হয় যেন নৌকার চারিদিকে আগুনের ফিনকী উড়ছে।

খুব গভীর জলে, একেবারে তলায় যে সব মাছ থাকে তারা একেবারে অন্ধ, চোখে কিছুই দেখতে পায় না, স্পর্শ দ্বারা শিকার করে।

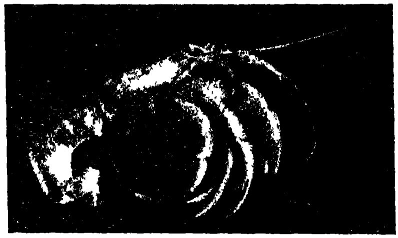
জলের উত্তাপের দরুনও মাছের অনেক তফাৎ হয়। বিষুবরেখা সন্নিকটস্থ উপর স্তরের তপ্ত জলের মাছ আর মেরু প্রদেশের উপর স্তরের শীতল জলের মাছ, এরা চেহারাতে এক নয়। তবে মনে রেখো যে গভীর জলের মাছ পৃথিবীর সকল সমুদ্রেই এক রকম, কেন না দশ বিশ হাজার ফুট নীচের জলের উত্তাপ সর্ব্বত্রই অল্পবিস্তর এক, অর্থাৎ বরফের উত্তাপের চেয়ে কিছু বেশী।

অবশ্য উত্তাপ ভেদের দরুন প্রাণীর স্বরূপভেদের কথা যা উপরে বলেছি সেটা



সামুদ্রিক কীট

শুধু মৎস্যাদি ঠাণ্ডা রক্তওয়ালা প্রাণীর সম্বন্ধে প্রযুজ্য। তিমি, জলহস্তী, সীল প্রভৃতি যে সমস্ত স্তন্যপায়ী জীব সমুদ্রে বাস করে তাদের রক্তের একটা আপন উষ্ণতা আছে বলে তারা সকল প্রদেশেই থাকতে পারে। মাছের রক্তের স্বাভাবিক উষ্ণতা নেই। ডাঙ্গার প্রাণীদের মধ্যেও সাপের রক্ত ঠাণ্ডা, তাই তারা শীতের দিনে একেবারে কাবু হয়ে পড়ে, এ কথা তোমরা নিশ্চয়ই জান।



কাঁকড়া

সামুদ্রিক প্রাণীর সব পরিচয় দেওয়া চলে না। সমুদ্র যেমন বিরাট ও বিশাল, তেমনি তার অতল তলে যে কত প্রকার প্রাণী আছে তাদের স্বরূপ নির্ণয় করাও বড় সহজ নহে। ধর তাবা মাছ,—তোমরা অনেকেই পুরী, ওয়ালটেয়ার বা অন্য কোনও সামুদ্রিক বন্দরে উহাদের দেখে থাকবে। কিন্তু এই তারামাছেরই বা কত প্রকার ভেদ রয়েছে।

এ সমুদয় সামুদ্রিক প্রাণীর ইতিহাস, তাহাদের শ্রেণী বিভাগ এবং বিভিন্ন শ্রেণীর আকৃতি ও প্রকৃতির পরিচয়ও বড় সহজ নহে। কাকড়া—এই কাঁকড়াই বা কত রকমের আকার ভেদ আছে তাদের গঠনই বা কত বিচিত্র রকমের, তারপর তাদের কার্য্য-প্রণালীই বা কত অদ্ভুত রকমের! এইরূপ ভাবে সামুদ্রিক প্রণালীর বৈচিত্র্য পূর্ণ ইতিহাস সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে বলা যে কত কঠিন তা বুঝতেই পার।



উত্তর ভারতের অন্যান্য রাজপুত জাতি


৩০৭৬ পৃষ্ঠার পর

আফগানিস্থানে ও পঞ্জাবের পশ্চিম ভাগেও রাজপুতেরা রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। কাবুলে 'সোহিয়া' নামক একটি ব্রাহ্মণ রাজবংশ ৮৭০ খৃষ্টাব্দ পর্যান্ত প্রতিষ্ঠিত ছিল। ঐ বৎসরে যাকুবলাইস নামক জনৈক আরব সেনাপতি কাবুল অধিকার করিয়াচলেন। তখন সাহিয়েরা নিজেদের রাজধানী উদভাণ্ডপুরে (আধুনিক উণ্ড) লইয়া গিয়াছিলেন। লল্লিয় নামক রাজপুত বীর আর একটি রাজবংশ স্থাপিত করিয়াছিলেন। ইহাও 'সাহিয়া' নামে প্রখ্যাত। ১০২০ খৃষ্টাব্দ পর্যান্ত এই রাজ্যটি স্থায়ী হইয়াছিল। সাহিয়াদের সহিত মুসলমানদের প্রায়ই বিবাদ হইত। এই বংশের শেষ রাজার নাম ত্রিলোচন পাল। ইনি ১০২১ খৃষ্টাব্দে মহমুদ গজনী কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। ইহার পর সাহিয়াদের রাজ্য বিনষ্ট হইয়াছিল।

অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভেই ব্রাহ্মনচাচের বংশধর দাহির নামক শাম্ব-যাদব বংশীয় রাজপুত সিন্ধুদেশে রাজ্য করিতেছিলেন। এই সময় মহম্মদ-বিন কাসিম নামক আরব-সেনাপতি অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া দেবল নামক সিন্ধু দেশের বন্দর অধিকার করিয়াছিলেন। সিন্ধু দেশে অনেক বৌদ্ধের নিবাস ছিল। ইহারা সম্পূর্ণ সিন্ধু দেশ জয় করিবার জন্য মহম্মদকে চুপি চুপি উৎসাহ প্রবান করিয়াছিলেন। মহম্মদ সিন্ধু দেশ জয় করিয়া মুলস্থানপুর অথবা মুলতান অধিকার করিয়াছিলেন। এখানে তিনি প্রচুর ধনরত্ন পাইয়াছিলেন। তিনি দাহিরের দুইটী কন্যাকে নিজ প্রভু বগদাদের খলিফার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। কন্যাদ্বয় মহম্মের হস্তে পিতার অশেষ দুর্গতি দেখিয়াছিলেন। তাঁহারা খলিফার নিকট্ মহম্মদের বিরুদ্ধে নির্যাতিত হইবার মিথ্যা অভিযোগ করিয়াছিলেন। ক্রোধান্ধ খলিফা তখন নৃশংসভাবে মহম্মদকে হত্যা করিয়াছিলেন। এই ভাবে কন্যাগণ পিতার দুর্গতির প্রতিশোধ লইয়াছিলেন। সিন্ধু এবং মুলতানদেশে আরবদের শাসন বহুকাল যাবৎ প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাহারা ৭৬৬ খৃষ্টাব্দের পর বলভীর মৈত্রকবংশ ধ্বংস করিয়াছিল। তাহারা বরোচের গুর্জ্জর রাজাকেও বিনষ্ট করিয়াছিল। দাক্ষিণাত্যের চালুক্যদের সহিত তাহাদের ঘোরতর শত্রুতা ছিল। রাষ্ট্রকূটদের সহিত ইহাদের মিত্রতা ছিল। তাহাদের

সাহায্যে ইহারা প্রায়ই কান্যকুব্জের গুর্জ্জর-প্রতীহার রাজ্য আক্রমণ করিত। কিন্তু তাহারা প্রতীহার-বংশের বিশেষ ক্ষতি করিতে পারে নাই।

তোমর নামক একটি রাজপুতবংশ দিল্লীর নিকট হরিয়াণক নামক প্রদেশে রাজত্ব করিত। এই বংশের সল্লক্ষণপাল, অনঙ্গপাল ও মহীপালের নাম পাওয়া যায়। একাদশ শতাব্দীতে আজমীঢের চাহমান বা চৌহান বংশ এই রাজ্য জয় করিয়াছিল। মুসলমান-বিজয়ের সময় আজমীঢ ও তোমর রাজ্য একত্র মিলিত ছিল।

চন্দেল বংশ

যমুনা ও নর্ম্মদা নদীর মধ্যবর্ত্তী, আধুনিক বুন্দেলখণ্ড নামক প্রদেশে চন্দেলদের রাজা প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই রাজ্যের নাম ছিল জেজাকভুক্তি বা জিঝোতি। ৬৪১ খৃষ্টাব্দে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েনসাঙ্ এই রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তখনকার রাজা জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। নবম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত জেজাকভুক্তি প্রতীহার-সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিত। ইহার পর চন্দেলবংশের বলবৃদ্ধি হইয়াছিল। এই বংশের প্রথম রাজার নাম নন্নুক। নন্নুকের বাক্‌পতি নামক পুত্র ছিল। তাঁহার জয়শক্তি বা জেজা এবং বিজয় শক্তি বা বিজা নামক দুই পুত্র ছিল। জয়শক্তি বা জেজার নাম হইতেই রাজ্যের নাম 'জেজাকভুক্তি' হইয়াছিল। এই বংশের প্রকৃতপক্ষে প্রথম স্বাধীন রাজা ছিলেন হর্ষদেব। তিনি প্রতিহার বংশের দ্বিতীয় ভোজদেবকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া প্রথম মহীপাল বা ক্ষিতিপালকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে সাহায্য করিয়াছিলেন। হর্ষের পুত্রের নাম যশোবর্ম্মা। যশোবর্ম্মা চেদিরাজকে পরাজয় করিয়া তাঁহার নিকট হইতে কালঞ্জর নামক দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি কান্যকুব্জপতি মহীপালের উত্তরাধিকারী দেবপালের নিকট হইতে একটি বিশাল বিষ্ণুমূর্ত্তি বলপূর্ব্বক লইয়া স্বীয় রাজধানী খাজুরাহোতে একটি স্বনির্ম্মিত প্রসিদ্ধ মন্দিরে স্থাপন করিয়াছিলেন। এই মূর্ত্তিটির নাম ছিল বৈকুণ্ঠ। তিব্বতরাজ এই মূর্ত্তিটি কৈলাস হইতে সংগ্রহ করিয়া কাঙড়াদেশের রাজাকে ইহা উপহার দিয়াছিলেন। কাঙড়াধিপতি প্রতীহাররাজ বিনায়কপালকে দিয়াছিলেন।

যশোবর্ম্মার পুত্র ধঙ্গ দশম শতাব্দীর শেষে উত্তর ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজা হইয়াছিলেন। তিনি ১০০৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১০৫৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্য করিয়া ছিলেন।

খাজুরাহোতে প্রাপ্ত একটি শিলালিপিতে তাঁহার বিষয়ে লিখিত আছে যে—"তিনি সমুদ্রমেখলা অনন্তা সতী পৃথিবীকে শতাধিক বৎসর শাসন করিয়া নিমীলিত নয়নে, হৃদয়ে শঙ্করের ধ্যান করিতে করিতে গঙ্গা ও যমুনার পবিত্র সলিলে প্রাণত্যাগ করিয়া মুক্তিপদকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।" ধঙ্গ ১০০২ খৃষ্টাব্দে মরকতেশ্বর ও প্রমথনাথ নামক দুইটী প্রসিদ্ধ মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তিনি সাহিয়া রাজ জয়পালকে সবুক্তেগিনের বিরুদ্ধে অন্যান্য হিন্দু-রাজাদের সহিত সাহায্য করিয়াছিলেন।

ধঙ্গের পুত্র গণ্ড কান্যকুব্জের রাজা প্রতীহার-বংশীয় রাজ্যপালের সমসাময়িক ছিলেন। তিনিও পিতার ন্যায় গণ্ডও ১০০৯ খৃষ্টাব্দে অন্যান্য হিন্দু-রাজাদের সহিত সম্মিলিত হইয়া সাহিয়ারাজ আনন্দপালকে মহমুদ গজনীর বিরুদ্ধে ভাটিণ্ডার যুদ্ধক্ষেত্রে সাহায্য প্রদান করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে হিন্দুরাজসঙ্ঘের পরাজয় হইয়াছিল। প্রতীহার রাজ রাজ্যপালও মহমুদের বিরুদ্ধে আনন্দপালকে সাহায্য করিয়াছিলেন। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া মহমুদ ১০০৮ খৃষ্টাব্দে কান্যকুব্জ আক্রমণ করিয়া ধ্বংস করিয়াছিলেন। রাজ্যপাল পলায়ন করিয়া গঙ্গার দক্ষিণে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। মহমুদের নিকট আত্মসমর্পণ করায় গণ্ডের পুত্র বিদ্যাধর রাজ্য-পালকে আক্রমণ করিয়া ও তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া নিহত করিয়াছিলেন। তখন মহমুদ গণ্ডকে দণ্ডিত করিবার জন্য চন্দেলরাজ্য আক্রমণ করিয়া-ছিলেন। গণ্ড পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন।

চেদিরাজ গাঙ্গেয়দেব এই সময় অতিশয় শক্তি-শালী হওয়ায় চন্দেলদের শক্তি হ্রাস হইয়াছিল। গণ্ডের পৌত্র বিজয়পাল আত্মরক্ষার নিমিত্ত বুন্দেল-খণ্ডের পার্ব্বত্য প্রদেশাভিমুখে পলায়ন করিয়া-ছিলেন। বিজয়পালের পুত্র দেববর্ম্মাকে গাঙ্গেয়-দেবের পুত্র কর্ণ সিংহাসনচ্যুত করিয়াছিলেন।

দেববর্ম্মার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কীর্ত্তিবর্ম্মা একাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে চন্দেলদের লুপ্ত স্বাধীনতাকে পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। কর্ণকে পরাজয় করিবার পর রাজ্যময় উৎসব পড়িয়া গিয়াছিল। এই উৎসবোপলক্ষে "প্রবোধচন্দ্রোদয়" নামক নাটক সর্ব্বপ্রথম অভিনীত হয়।

দ্বাদশ শতাব্দীতে কীর্ত্তিবর্ম্মার পৌত্র মদনবর্ম্মা রাজ্য করিতেছিলেন। মদনবর্ম্মা গাহড়বাল রাজ গোবিন্দচন্দ্রের সমসাময়িক। তিনি আবার যশোবর্ম্মা ও জয়বর্ম্মা নামক মালব রাজার সমসাময়িক ছিলেন। ডাহল প্রদেশের গয়কর্ণও তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন। গুজরাত প্রদেশের চালুক্যেরা রাজপুতানা জয় করিয়া চন্দেলদের সহিত বিরোধ উপস্থিত করিয়াছিলেন। সিদ্ধরাজ, জয়সিংহ ও কুমারপাল—এই তিন গুজরাতনরেশ মদনপালের সমসাময়িক ছিলেন। মদনবর্ম্মার রাজত্বকালে দেশে খুব উন্নতি হইয়াছিল। রাজ্য ভিলসা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। মদনবর্ম্মার পৌত্র পরমর্দ্দী তাঁহার পর সিংহাসনারোহণ করিয়াছিলেন। পরমর্দ্দীর সহিত চাহমানরাজ পৃথ্বীরাজের পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ হইয়াছিল। পরমর্দ্দী বারবার পরাজিত হইয়াছিলেন। এই সমস্ত ঝগড়া-বিবাদের ফলে মহম্মদ ঘোরী সহজেই উত্তর-ভারত জয় করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে পৃথ্বীরাজকে পরাজিত করিয়া জয়চন্দ্র গাহড়বালকে পরাজিত করিয়াছিলেন। অবশেষে ১২০৩ খৃষ্টাব্দে দুই বৎসর অবরোধের পর পরমর্দ্দীর রাজধানী কালঞ্জর শত্রুহস্তে পতিত হইয়াছিল।

পরমার বংশ

খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে মালবদেশে পরমার বংশ স্থাপিত হইয়াছিল। দশমশতাব্দীর প্রথমভাগে পরমার রাজগণ দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূটভূপতিদিগের অধীনতা স্বীকার করিতেন। তাঁহারা দশম শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে সীয়কপুত্র দ্বিতীয় বাক্‌পতিরাজের রাজত্বকালে স্বাধীন হইয়াছিলেন। বাক্‌পতিরাজ (৯৭৪ খৃষ্টাব্দে) চালুক্যরাজ তৈলপ দ্বিতীয়ের ভ্রাতার সমসাময়িক ছিলেন। তিনি ছয়বার তৈলপকে পরাজয় করিয়াছিলেন কিন্তু সপ্তমবারে নিজেই পরাজিত হইয়াছিলেন পরে অশেষ প্রকারে অপমানিত করিয়া তৈলপ তাঁহার শিরশ্ছেদন করিয়াছিলেন।

বাক্‌পতিরাজের পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সিন্ধুল সিংহাসনারোহণ করিয়াছিলেন। তাহার পর তাঁহার পুত্র ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ভোজরাজ মালবরাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। তিনি ১০১৮ হইতে ১০৫৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রভূত গৌরবের সহিত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজধানী ছিল ধারা নগরী। তাঁহার নাম অদ্যাবধি আমাদের দেশের অনেক প্রাচীন কথাতে অক্ষয় হইয়া আছে। হিন্দুরাজার মধ্যে যাহা কিছু মহান্, উৎকৃষ্ট বা গৌরবের বিষয় বলিয়া গণ্য হইতে পাবে, রাজা ভোজ ছিলেন তাহারি মূর্ত্ত প্রতীক। সমুদ্রগুপ্তের ন্যায় তিনি অশেষ রাজগুণে ভূষিত ছিলেন। তিনি বিদ্যারসিক এবং সৎকবি ছিলেন। তাঁহার দ্বারা রচিত জ্যোতিষ, গৃহনির্ম্মাণ, অলঙ্কার ইত্যাদি বিষয়ের গ্রন্থ অদ্যাবধি পাওয়া যায়। তিনি দেবী সরস্বতীর মন্দিরে একটী সংস্কৃত বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই বিদ্যালয়ে শিল্পশাস্ত্র, সাহিত্য, জ্যোতিষ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের অধ্যাপনা হইত।

রাজা ভোজ যে কেবলমাত্র বিদ্বান ছিলেন তাহা নহে। তিনি যুদ্ধবিদ্যাতেও সুপটু ছিলেন। তিনি গুজরাত-নরেশ ভীমকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন। তিনি চালুক্যরাজ জয়সিংহ দ্বিতীয় ও চেদি রাজ কর্ণ ও গঙ্গেয়দেবের সমসাময়িক ছিলেন। কল্যাণীর চালুক্যেরা গুজরাতরাজ ভীম ডহালরাজ কর্ণদেবের সহিত মিলিত হইয়া ভোজকে পরাজিত করিয়াছিলেন। এই পরাজয়ের সহিত মালব রাজ্য-গরিমা অন্তর্হিত হইয়াছিল। মালবরাজ্য অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়াছিল পরমার বংশের শেষ স্বাধীন রাজার নাম ছিল জয়সিংহ। তিনি ১৩০৫ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দিন খিলজির সেনাপতির হস্তে পরাজিত হইয়াছিলেন। তাহার পর মালবদেশ দিল্লীর সুলতানের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল।

উত্তর ভারতে রাজপুতজাতির এই ইতিহাস হইতে সেকালে ঐ প্রদেশ কিরূপ শক্তিশালী ও মহত্বপূর্ণ ছিল তাহা অবগত হইতে পারা যায়।



আনন্দময়ী কিশোরী



রামমোহন, মৃত্যুঞ্জয় ও ভবানীচরণ

২৩১২ পৃষ্ঠার পর

সব দেশেই চিরকাল লোকে গদ্যে কথা কহিয়া থাকে, লিখিবার সময় প্রথমে কবিতায় বা পদ্যে লেখে। আমাদের দেশেও ইহার অন্যথা হয় নাই। এখনকার দিনে এ-কথা অদ্ভুত বলিয়া ঠেকে, মনে হয় সাধারণ বুদ্ধিতে প্রথম রচনা গদ্যেই হওয়া উচিত, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এখনও আমাদের কথা কহিবার ভাষায় ও বই লিখিবার ভাষায় প্রভেদ করিয়া থাকি! তাহাতে তো মনে হয় না যে অস্বাভাবিক কিছু করিতেছি! পদ্যই তখনকার দিনে বই লিখিবার ভাষা ছিল; লোকে আকাশের তারার গতি নিরূপণ করিত পদ্য দিয়া, কখন কি ভাবে চাষ করিলে লাভ হইবে তাহা স্থির করিত পদ্যের সাহায্যে। এমন কি অঙ্ক কষিবার বই পর্য্যন্ত শ্লোকে লিখিত।

কয়েকজনের সমবেত চেষ্টায় বাঙ্গালা গদ্য আজ পুষ্টি লাভ করিয়াছে। গত দেড় শত বৎসরের মধ্যেই গদ্য চলিয়াছে বেশি, কিন্তু এই দেড় শত বৎসরের হিসাবও আমাদের কাছে খুব ভাল ভাবে নাই। সকলের নাম বলিতে পারা সম্ভব নয়, আমরা অত জানিই না। আমরা শুধু মোটামুটি আলোচনা করিতে পারি, এখানে সেইরূপ আলোচনাই করিব। যাঁহাদের কথা এখানে বলিব তাঁহারা সকলেই এ-বিষয়ে কৃতী, সকলেই বাঙ্গালা গদ্যকে সাহিত্যের ভাষায় স্থান করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু কে কতখানি কৃতী তাহাও যেমন স্থির করা দুঃসাধ্য এবং আমাদের পক্ষে অনাবশ্যক, তেমনই আবার এ কথাও প্রথমে বলিয়া রাখা ভাল যে, কেহই বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যে চলিবার বা চালাইবার একমাত্র হেতু নহেন,—সকলের সমবেত চেষ্টায় ভাষা অগ্রসর হইতে থাকে, সকলেরই নাম আমাদের মনে করিয়া রাখা উচিত।

এরূপ গদ্য লেখকদের মধ্যে, অর্থাৎ বাঙ্গালা ভাষার প্রথম গদ্য লেখকদের মধ্যে, সর্ব্বপ্রথম রামমোহনের নাম করিতে হয়।

রামমোহন রায় ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে হুগলি জেলার রাধানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা রামকান্ত রায় মুর্শিদাবাদে নবাব সরকারে কর্ম্ম করিতেন। তিনি পারস্য ও আরব্য ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়া সংস্কৃত লিখিবার জন্য কাশী যাত্রা করেন; কাশী হইতে সংস্কৃত শিখিয়া যখন দেশে ফিরেন তখন তাঁহার বয়স মাত্র ষোলো বৎসর। অল্প বয়সেই পিতার সঙ্গে ধর্ম্ম বিষয়ে তাঁহার মনান্তর হয়, এবং বাড়ী ছাড়িয়া নানা স্থানে ঘুরিবার পর হিমালয়ের নিকটে কোথাও গিয়া তিনি কিছুকাল অতিবাহিত করেন। তাহার পর তিনি যখন দেশে ফিরিয়া আসিলেন তখন তাঁহার বয়স কুড়ি বৎসর। নানা বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে আরও কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল। ছাব্বিশ বৎসর বয়সে তিনি চাকুরি গ্রহণ করেন; রঙ্গপুর, রামগড়, ভাগলপুর, ক্রমান্বয়ে এই তিনটি স্থানের কালেক্টরিতে কর্ম্ম করিয়া পরে কলিকাতায় আসিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করেন ইহার পূর্ব্বেই, অর্থাৎ বাইশ বৎসর বয়সে তিনি প্রথম ইংরাজি শিখিতে আরম্ভ করেন; সাতাইশ বৎসর বয়সে ইংরাজী বুঝিতে পারিতেন কিন্তু লিখিতে পারিতেন না, শেষে অবশ্য ইংরাজি ভাষায় নানা বিষয় কৃতিত্ব সহকারে লিখিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন অন্যান্য ভাষাও তিনি শিখেন। রঙ্গপুরে তাঁহার প্রথম কর্ম্মগ্রহণ, তিনি সামান্য কেরাণি হইতে নিজ গুণে দেওয়ান পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন; তাঁহার চাকুরি কাল মোট ১৩।১৪ বৎসর।

আপার সারকিউলার রোডে, এখন যেখানে সুকিয়া ষ্ট্রীটের থানা আছে, সেখানে রামমোহনের নিবাস ছিল। এই সময় কলিকাতা ছিল, শুধু বঙ্গভূমির নহে ভারতেরও রাজধানী। স্ত্রীশিক্ষা, উচ্চশিক্ষা, সমাজসংস্কার, সতীদাহ বা সহমরণ-প্রথার উচ্ছেদসাধন, বিশুদ্ধ ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি নানা বিষয়ে তখন কলিকাতায় আন্দোলন চলিতেছিল; প্রতিভা ও ঔদার্য্যগুণে রামমোহন সে সকলে অগ্রণী হইলেন। বাঙ্গালা ভাষায় শাস্ত্র ও অন্যান্য বিষয় আলোচনার জন্য তিনি এখন অবসরও যথেষ্ট পাইলেন।



রামমোহন

কলিকাতায় প্রায় ষোল বৎসর কাটাইবার পর তিনি বিদেশ যাত্রা করিবার সুযোগ পান; দিল্লীর বাদসাহের কোনও কর্ম্মের ভার লইয়া ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে তিনি ইংলণ্ড যাত্রা করেন। কোম্পানী বাদসাহের বৃত্তি কমাইয়া দেন, তাহার বিরুদ্ধে পার্লামেণ্ট বা ইংলণ্ডের মহাসভার নিকট আবেদন করার ভার থাকিল তাঁহার উপর। রামমোহন

দেশ বেড়াইতে ভালবাসিতেন, সুতরাং এই সুযোগে তিনি বিলাত বেড়াইয়া আসিতে রাজি হইলেন। ইংলণ্ডে নানা প্রয়োজনীয় বিষয়ে তিনি অনেক বক্তৃতা করেন। তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি ও চরিত্রের পরিচয় পাইয়া অনেকে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করেন। ইংলণ্ড হইতে তিনি ফ্রান্সে গিয়াছিলেন; সেখানেও সর্ব্বত্র তাঁহার সমাদর হয়। পর ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে ব্রিষ্টল নগরে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। দিল্লীর বাদসাহ তাঁহাকে রাজা উপাধি দিয়াছিলেন, এই রাজা উপাধি রামমোহনকে খুবই মানাইয়াছিল। তাঁহার শরীর অসাধারণ দীর্ঘ ছিল; শক্তিও ছিল অসাধারণ। আহারের পরিমাণও ছিল সেইরূপ; একটি গোটা পাঁঠার মাংস একা খাইতে পারিতেন; সমস্ত দিনে বার সের দুধ খাইতেন; পঞ্চাশটা আমে তাঁহার জলযোগ হইত; এক কাঁদি কলা অনায়াসে খাইয়া ফেলিতেন। অসাধারণ শারীরিক শক্তির সহিত আসিয়া মিলিয়াছিল ধর্ম্মপ্রাণতা, মানবপ্রীতি ও কর্ম্ম-কুশলতা। আমাদের যুগে **"রাজা রামমোহন"** নামেই তিনি পরিচিত, বিলাতেও লোকে "রাজা" বলিয়া তাঁহার উল্লেখ করিত।

রামমোহন বাঙ্গালা ভাষায় নানা বিষয়ে রচনা করিয়া যান। তিনি বিস্তর ধর্ম্মসঙ্গীত রচনা করেন, তাহাদের কয়েকটি এখনও প্রচলিত আছে, তাহাতে কবিত্বের বিশেষ পরিচয় পাওয়া না গেলেও, তবে তাঁহার লেখা সঙ্গীত হিসাবে ইহাদের আলোচনা হইতে পারে। একটি গান নীচে দেওয়া হইল :—

পরনিন্দা পরপীড়া এ বুদ্ধি কেন ত্যজ না,
বারংবার যাতায়াতে, পাইবে ঘোর যাতনা।
তমোগুণাক্রান্ত মতি পরদ্বেষে হৃষ্ট অতি,
পরমায়ু অল্প স্থিতি, গর্ব্বখর্ব ভাবনা।
সম্বন্ধ জীবনাবধি, আশার নাহি অবধি.
তবে কেন নিরবধি ভ্রান্তি বুদ্ধি কুমন্ত্রণা।
দম্ভ দর্প খর্ব করি, দ্বৈতবুদ্ধি পরিহরি,
বিষয়ে বৈরাগ্য করি, কর আত্মার উপাসনা।

কিন্তু রামমোহনের সাহিত্য রচনার মধ্যে সঙ্গীত অতি অল্প স্থান জুড়িয়া আছে। ধর্ম্ম সম্বন্ধেই তিনি অনেক লিখিয়াছেন, অনেক গ্রন্থ অনুবাদ করিয়াছেন, অনেক নিজের কথা বলিয়াছেন। খৃষ্টান মিশনরিগণ বাঙ্গালা দেশে যে ধর্ম্ম প্রচার করিতে আসেন সে বিষয়ে তিনি আপত্তি করিয়া লিখিয়াছিলেন :—

"যদ্যপিও যিশুখ্রীষ্টের শিষ্যেরা স্বধর্ম্ম সংস্থাপনের নিমিত্ত নানা দেশে আপন ধর্ম্মের উৎকর্ষের উপদেশ করিয়াছেন, কিন্তু ইহা জানা কর্ত্তব্য যে, সে সকল দেশ তাঁহাদের অধিকারে ছিল না। সেইরূপ মিশনরিরা ইংরেজের অনধিকারের রাজ্য, যেমন তুর্কি ও পারসিয়া প্রভৃতি দেশে যাহা ইংলণ্ডের নিকট হয়, এরূপে ধর্ম্ম উপদেশ ও পুস্তক প্রদান যদি করেন, তবে ধর্ম্মার্থে নির্ভয় ও আপন আচার্য্যের যথার্থ অনুগামিরূপে প্রসিদ্ধ হইতে পারেন। কিন্তু বাঙ্গালাদেশে যেখানে ইংরেজের সম্পূর্ণ অধিকার ও ইংরেজের নাম মাত্রে লোক ভীত হয়, তথায় এরূপ দুর্ব্বল, দীন ও ভয়ার্ত্ত প্রজার উপর ও তাহাদের ধর্ম্মের উপর দৌরাত্ম্য করা কি ধর্ম্মতঃ কি লোকতঃ প্রশংসনীয় হয় না। যেহেতু বিজ্ঞ ও ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা দুর্ব্বলের মনঃপীড়াতে সর্ব্বদা সঙ্কুচিত হয়েন, তাহাতে যদি সেই দুর্ব্বল তাঁহাদের অধীন হয়, তবে তাহার মর্ম্মান্তিক কোন মতে অন্তঃকরণেও করেন না। এই তিরস্কারের ভাগী আমরা প্রায় নয় শত বৎসর অবধি হইয়াছি ও তাহার কারণ আমাদের অতিশয় শিষ্টতা ও হিংসা ত্যাগকে ধর্ম্ম জানা ও আমাদের জাতিভেদ, যাহা সর্ব্বপ্রকারে অনৈক্যতার মূল হয়।

এরূপ বাঙ্গালার অর্থ করা খুব কঠিন নহে,—তবে চট্ করিয়া এক নিশ্বাসে একবার পড়িলেই যে বুঝিতে পারা যাইবে

F. 8—40

তাহাও বোধ হয় সম্ভব নহে, বিশেষতঃ যদি তাঁহার যুক্তির সহিত, তিনি কি বলিতে চাহিতেছেন তাহার সহিত, আমাদের পরিচয় না থাকে।

তবে রামমোহন যে শুধু ধর্ম্মকথার আলোচনা করিয়া গিয়াছেন তাহা নহে, আমরা সাধারণত যে সব আলাপ করি সে সকলের সম্বন্ধেও কিছু কিছু লিখিয়াছেন। একদিকে তিনি মিথ্যা-কথন বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, অন্যদিকে আবার মকর মৎস্য, চুম্বক, প্রতিধ্বনি, বেলুন প্রভৃতির কথা বলিতে গিয়া যথেষ্ট কৌতূহল দেখাইয়াছেন। যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চ্চা করিয়াছেন রামমোহন তাঁহাদের অগ্রণী, এ-কথা স্বীকার করিতেই হইবে। বেলুনের প্রসঙ্গে তিনি সেকালে যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছেন তাহা আজ সার্থক হইতে চলিয়াছে।

"যদি আপন আপন ইচ্ছানুসারে এবং বায়ুর প্রতিকূলে বেলুন চালাইবার কোন উপায় কখন মনুষ্যেরা পায়, তবে তাহার দ্বারা অশেষ উপকার হইতে পারে। ইদানীং কেবল বিহার ও বিদ্যা-বিষয়ক পরীক্ষা মাত্র তাহার কার্য্য। কতক বৎসর ফ্রান্সীয়ের ও জাম্মানীদের মধ্যে এক যুদ্ধ কালে ফ্রান্সীয় সেনাপতি বেলুনের দ্বারা আকাশে উঠিয়া বিপক্ষ সৈন্যের গমনাগমন বৃত্তান্ত উপর হইতে লিখিয়া পাঠাইল। বিপক্ষেরা তাহাকে মারিতে গুলি উর্দ্ধে ক্ষেপণ করিল; কিন্তু সে এতদূরে ছিল যে, গুলি ততদূরে পৌঁছিতে পারিল না। কল্পিত স্থান পর্যন্ত পৌঁছিলে সে দর্শনকারী নিরুদ্বেগ ও নির্ভাবনায় আকাশের শান্তিরাজ্য হইতে রণভূমিতে পরস্পর নাশক দুই সৈন্য দেখিল।"

বাস্তবিক, রামমোহন যে সব কথা লিখিয়া গিয়াছেন আজও সে সব পুরানো হইয়া যায় নাই—আর তাহার ভাষার বাঁধ-ছাঁদ একটু আধটু বদলাইয়া লইলে একেবারে আজকালকার মত হইয়া পড়ে। "উপাসনা কাহাকে বলে?" প্রশ্নের উত্তরে রামমোহন লিখিয়াছিলেন,—

"এই প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান যে জগৎ ইহার কারণ ও নির্ব্বাহকর্ত্তা পরমেশ্বর হন। শাস্ত্রত ও যুক্তিত এইরূপ যে চিন্তন তাহা পরমেশ্বরের উপাসনা হয়।"

এখনকার ভাষায় লিখিলে ইহা কতকটা এইরূপ দাড়াইবে,—

"এই প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান যে জগৎ, ইহার কারণ ও নির্ব্বাহকর্ত্তা পরমেশ্বর। শাস্ত্র ও যুক্তির দিক দিয়া এইরূপ চিন্তা করার নাম পরমেশ্বরের উপাসনা।"

কোনও শ্রেষ্ঠ পুরুষের জন্ম বা মৃত্যুর একশত বৎসর অতীত হইয়া গেলে তাঁহাকে মনে রাখিবার জন্য আমাদের দেশে উৎসব হইয়া থাকে। এরূপ উৎসবের নাম দেওয়া হইয়াছে শতবার্ষিকী বা স্মৃতি-বার্ষিকী। সাধারণের দিক হইতে সর্বপ্রথম রামমোহনের সম্বন্ধে এইরূপ অনুষ্ঠান হয়। তিনি যে আমাদের দেশের একজন কত বড় লোক ছিলেন, ইহা হইতে আমরা তাহা খানিকটা অনুভব করিতে পারি। কিন্তু তাঁহার সাহিত্য রচনা, বিশেষ করিয়া গদ্য রচনার কথা, আমরা এই প্রসঙ্গে মনে রাখিব, তাহা ভুলিব না,—কারণ আমরা বর্ত্তমান কালে যখন বাঙ্গালা গদ্য লিখি তখন তাঁহার ভাষা রামমোহনের আরব্ধ কর্ম্মের অন্যতম ফল। রামমোহনের সহিত বাঙ্গালীর এই যোগ বাঙ্গালী কিছুতেই আজ ভুলিতে পারে না।

রামমোহনের সময় আর একজন বাঙ্গালী গদ্য রচনা করিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার কথাও বাঙ্গালীর সাহিত্যে উল্লেখ করিতে হইবে; তিনি হইলেন **পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার**। কলিকাতায় ১৮০০ খৃষ্টাব্দে

কোম্পানীর ইংরেজ কর্ম্মচারিদিগকে এদেশী ভাষা সাহিত্য ইতিবৃত্ত রীতি-নীতি ব্যবস্থা প্রভৃতি শিখাইবার জন্য এক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার নাম ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ। এই কলেজে মৃত্যুঞ্জয় পণ্ডিত মহাশয় বাঙ্গালা শিখাইতেন। গদ্য রচনা কি ভাবে করিতে হয় তাহা দেখাইবার জন্য তাহাকে কয়েকখানি গদ্য পুস্তক লিখিতে হইয়াছিল। বত্রিশ-সিংহাসন ও হিতোপদেশ তিনি সংস্কৃত হইতে অনুবাদ করেন, রাজাবলি নাম দিয়া ভারতবর্ষের একখানি ইতিবৃত্ত লিখেন, আর বেদান্তচন্দ্রিকা ও প্রবোধ-চন্দ্রিকা নামে দুই খানি শাস্ত্রবিচারের পুস্তক রচনা করেন। বাঙ্গালায় এবং শাস্ত্রে তাঁহার জ্ঞানের জন্য তিনি পরে সুপ্রীম কোর্টের পণ্ডিত নিযুক্ত হন। আমাদের দেশে তখনও হাইকোর্ট হয় নাই, সুপ্রীম কোর্টেই শেষ বিচার নিষ্পত্তি হইত,—এ-দেশী পণ্ডিতদের সাহায্যে বিচারক দেশীয় প্রথা জানিয়া সত্য নির্দ্ধারণের চেষ্টা করিতেন।

এখন মৃত্যুঞ্জয়ের বাঙ্গালার একটু নমুনা দিতেছি :—

"আর শুন পরমাত্মা ও দেবাত্মা ও আর আর জীবাত্মা এ সকল আত্মা আত্মা যে দেহ হইতে ভিন্ন ইহা হিন্দু মোসলমান ইংরাজেরা সকলেই প্রায় জানে স্ব স্ব দৃষ্টান্ত অনুমানে বুঝ যেমন আমি আত্মা দেহী তেমনি তুমি সে এ আত্মা সকল দেহী এই দৃষ্টান্তে পরমাত্মা ও দেবাত্মারদেরো দেহ আছে সে দেহ কর্ম্মসিদ্ধ অস্মদাদির অদৃষ্ট যদি হউক তথাপি সিদ্ধ যোগীরদের দৃষ্ট বটে অস্মদাদির শাস্ত্রজ্ঞানমাত্র-গম্য যেমন ঈশ্বর অতএব যে শাস্ত্রজ্ঞানে ঈশ্বরকে মান সেই শাস্ত্রজ্ঞানে তাহারদের বিগ্রহ কেন না মান" ইত্যাদি।

উপরে যে যে বইয়ের নাম লেখা হইল তাহা ভিন্ন মৃত্যুঞ্জয় আরও একখানি বই অনুবাদ করিয়াছিলেন, তাহার নাম পুরুষ-পরীক্ষা। পুরুষ-পরীক্ষায় বাহান্নটি গল্প আছে; প্রত্যেক গল্পেরই উদ্দেশ্য, এক এক ধরণের পুরুষের পরিচয় দেওয়া। দানবীর, দয়াবীর, যুদ্ধবীর, সত্যবীর, এবং তাঁহাদের বিপরীত অর্থাৎ চোর, ভীরু, কৃপণ, অলস; সপ্রতিভ, সুবুদ্ধি, মেধাবী এবং তাহাদের বিপরীত, অর্থাৎ ঠক, খল ও বুদ্ধিহীন; বিদ্বান ও বিদ্যাহীন; ইত্যাদি নানাপ্রকারের লোকের কথা বিদ্যাপতি গল্প করিয়া গিয়াছেন, যাহাতে আমরা পুরুষের পরীক্ষা লইতে পারি, জানিতে পারি যে কে কি ধরণের লোক। এই বইখানির অনুবাদের ভাষা কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই সহজ। প্রথমে একটি গল্প বলিয়া, তাহার পরে মৃত্যুঞ্জয় কি ভাবে সেই গল্প বলিয়াছেন তাহা তাঁহার নিজের কথায় লিখিতেছি। যাহাদের বুদ্ধি নাই তাহাদের নাম দিয়াছেন বর্ব্বর। বর্ব্বর দুই প্রকারের জন্মবর্ব্বর ও সংসর্গবর্ব্বর। পণ্ডিতের কাছে বিদ্যা শিখিলেও জন্মবর্ব্বরের বুদ্ধি হয় না। একজন গণক তাঁহার ছেলেকে খুব যত্ন করিয়া লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন, তবু তাহার বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই। রাজার কাছে তাহার বিদ্যা পরীক্ষার জন্য লইয়া যাওয়া হইল; রাজা সোনার আংটি হাতের মুঠায় ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বলুন তো ইহার মধ্যে কি আছে? পণ্ডিতের ছেলে গণিয়া বলিল, ধাতুর তৈয়ারি কোনও জিনিষ আছে; তাহার পর বলিল, জিনিষটি চক্রাকার; উহার মধ্যে শূন্য অথচ জিনিষটি ভারি। রাজা এই সব কথা শুনিয়া খুব প্রশংসা করিলেন, তাহাতে খুসি হইয়া গণনা ছাড়িয়া পণ্ডিতের ছেলে অনুমানে বলিল,—আপনার মুঠার মধ্যে পাথরের জাঁতা রহিয়াছে। ছেলের বুদ্ধি ধরা পড়িল।

মৃত্যুঞ্জয় গল্পটি এই ভাবে বলিয়াছেন—

কৌশাম্বী নামে এক নগরী। তাহাতে দেবধর নামে এক গণক ছিলেন। শান্তিধর নামে তাঁহার এক পুত্র। সে জন্মবর্ব্বর ছিল এবং পণ্ডিতের নিকট দীর্ঘকাল অধ্যয়ন করিল তথাপি তাহার বিষয় বোধ হইল না। প্রাজ্ঞরা সেই প্রকার কহিয়াছেন যে পিতা সন্তুষ্ট হইয়া পুত্রদিগকে সর্ব্বস্ব দিতে পারেন কিন্তু ভাগ্য ও বুদ্ধি দিতে পারেন না সেই পুত্র পিতার লোকদ্বয়সাধনের প্রত্যাশারূপ বৃক্ষের বীজস্বরূপ এবং সকলাভিলাষের স্থান সেই একমাত্র পুত্র। দেবধর সে পুত্রের সহিত ছায়ার ন্যায় থাকিয়া অন্য সকল কার্য্যে বিরত হইয়া কেবল পুত্রকে শাস্ত্রাধ্যয়ন করাইলেন কিন্তু দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত পিতার মহা যত্নেতে সেই পুত্র শুকপক্ষীর ন্যায় কেবল শাস্ত্রাভ্যাস করিল কিন্তু তাহার পদার্থবোধ হইল না। দেবধর গণকপুত্রকে শাস্ত্রজ্ঞ করিয়া চিন্তা করিলেন যে এখন পুত্রকে রাজার নিকটে পরিচিত করিব। রাজা ঐ দুই জনকে দেখিয়া গণককে জিজ্ঞাসা করিলেন যে হে গণক তোমার পুত্র কোন্ কোন্ শাস্ত্র পড়িয়াছেন। দেবধর নিবেদন করিলেন হে ভূপাল আমার পুত্র জ্যোতিঃশাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়াছে যাহাতে প্রশ্নের উত্তর করিতে পারে কিন্তু যদি আজি মহারাজ কোন প্রশ্ন করিতে তাহার উপযুক্ত উত্তর করিতে পারে তবে শাস্ত্রাধ্যয়নের ফলভাগী হইবে। তদনন্তর রাজা কৌতুকাবিষ্ট হইয়া এক স্বর্ণাঙ্গুরী মুষ্টিমধ্যে রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন হে শান্তিধর গণক আমার মুষ্টিতে কি আছে কহিতে পার। পরে শান্তিধর খড়ি লইয়া গণনা করিল এবং গণনাতে জ্ঞাত হইয়া নিবেদন করিল হে নরেন্দ্র তোমার মুষ্টিমধ্যে কোন মূল কিম্বা কোন জীব নাহি কিন্তু ধাতুময় কোন দ্রব্য আছে। রাজা কহিলেন যে তুমি যথার্থ কহিয়াছ। গণকপুত্র পুনর্ব্বার গণনা করিয়া কহিল যে চক্রাকৃতি কোন দ্রব্য আছে। রাজা আজ্ঞা করিলেন যে বিশেষরূপে কহ। শান্তিধর পুনর্ব্বার নিবেদন করিল যে মধ্যে শূন্য অথচ ভারী এমন দ্রব্য আছে। রাজা সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন যে সাধু। গণকপুত্র রাজার প্রশংসাবাক্যেতে স্ফুরিতবাহু হইয়া কহিতেছি কহিতেছি ইহা কহিয়া গণনা ত্যাগ করিয়া নিজ বুদ্ধিতে কহিল হে রাজন্ তোমার মুষ্টিমধ্যে পাথরের জাতা আছে। রাজা এই কথা শুনিয়া কিছু হাস্য করিয়া কহিলেন হে দেবধর গণক তোমার পুত্র শাস্ত্রাভ্যাস করিয়াছে কিন্তু বুদ্ধিহীন।

অবশ্য পুরুষ-পরীক্ষার ভাষার উপর বিদ্যাপতির কিছু চিহ্ন নিশ্চয় আছে, কারণ উহা অনুবাদ মাত্র, বিদ্যাপতির রচনা হইতে অনুবাদ,—সুতরাং মৃত্যুঞ্জয়ের রচনা দেখিতে হইলে, মূল লেখা অর্থাৎ উপরে দেওয়া মৃত্যুঞ্জয়ের প্রথম রচনাই দেখা উচিত। তবে এই কথা স্বীকার করিতে হইবে যে মৃত্যুঞ্জয়ের ভাষা বিষয়ের অনুরূপ হইত, কঠিন বিষয়ের আলোচনা করিতে গিয়া গম্ভীর ভাষায় লিখিতেন, আবার সহজ বিষয়ের কথা সরল ভাষায় লিখিতেন।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রামমোহনের সময়ের একজন ক্ষমতাশালী লেখক ছিলেন। তা ছাড়া তিনি ছিলেন ধর্ম্মসভার সম্পাদক; "সমাচারচন্দ্রিকাও" তাঁহার সম্পাদকত্বে বাহির হইত। পল্লীগ্রাম হইতে চলিয়া আসিয়া তাঁহার পিতা কলুটোলায় বাড়ী করেন। ভবানীচরণ "কাষ্টম হাউসে" অর্থাৎ শুল্ক বিভাগে কার্য্য করিতেন। উত্তর-প্রত্যুত্তরে বাদ-বিসম্বাদে তাঁহার পটুতা ছিল। রামমোহন রায়ের সহিত তিনি যে মসীযুদ্ধ চালাইতেন তাহা পাঠকেরা সকলে বিশেষ ভাবে উপভোগ করিত। তিনি ব্যঙ্গ-রচনায় কৃতী ছিলেন। যাঁহারা তাঁহার কথা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা বলেন যে তাঁহার তিনখানি ব্যঙ্গ-রচনার বই ছিল,—একখানি নিজের নামে, দুইখানি বেনামীতে। তাহার রচিত মোট গ্রন্থসংখ্যা প্রায় দশ। তিনি ব্যঙ্গ করিতেন, যাহারা নকলনবিশ ছিল, যাহারা সং সাজিতে চাহিত, যাহারা অতিমাত্রায় বাবু-

গিরি করিত বা অনাচারকে আমল দিত, তাহাদের উপহাস করিতেন,—"নববাবু-বিলাসে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। ব্যঙ্গ লিখিতে কিন্তু গদ্য পদ্য একত্র কবিতেন, গদ্যও এমন লিখিতেন যে তাহাতে পদ্যের মত মিল দেখা যায়। যেমন,—

কিবা দিবা নিশি, কর্ত্তার নিকটে বসি,
অভাগা আছেন ছায়া প্রায়।
অপূর্ব্ব বসন পরি, নামমালা হাতে করি,
গাল গল্পে কেবল কাল যায়॥
রক্তযুত তন্তুগুচ্ছ, রঞ্জিত মালার পুচ্ছ
নামের সম্পর্ক নাই তাতে।
কেবল কর্ত্তার হিত, করে থাকেন যথোচিত,
তুষ্ট করেন মিষ্ট বচনেতে॥
কেবল কর্ত্তৃমনোনীত, হিতাহিত যথোচিত,
বচনেতে কর্ত্তাকে ভুলায়।
কর্ত্তা বলেন কাকে বক, হাঁ মহাশয়, এই হক,
এইরূপ তাবৎ কথায়॥

ভবানীচরণের লিখিবার রীতি ছিল সহজ,—"শান্তিপুর অম্বিকা বাদাগাছি ঢাকা চন্দ্রকোণা খাসবাগান ববাহনগর প্রভৃতি নানাস্থানের শাটী শালপেড়ে কাঁকড়াপেড়ে লালপেড়ে নীলপেড়ে তাবিজপেড়ে বরানগুবে ডুরে। মানুষের হাবভাব, পোষাক পরিচ্ছদ, আচার ব্যবহার, সকল বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান বিস্তর ছিল। উপরে দেখিতেছি তাঁহার সহজ-ভঙ্গী, সমাসবদ্ধ বাক্যের উপরও তাঁহার যথেষ্ট দখল ছিল,—একটা নমুনা হইতে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে,—অবশ্য এই নমুনা তাঁহার 'নব্যবাবুবিলাসের' ভূমিকা হইতে লওয়া হইয়াছে :

"নিশাকরনির্ম্মলধবলকোমলকমল মুক্তাকেশ নির্ম্মলগঙ্গাজলতুল্যসিতাশেষযশঃপ্রকাশীকৃতভূমণ্ডল বিবিধবিদ্যাযুতবুধগণগুণিজনগোব্রাহ্মণপ্রতিপালন বেদপুরাণাদিশ্রবণপরায়ণ বিবিধজনমনোরঞ্জন বচনামৃত-বিতরণান্তঃকরণকরুণাসাগরাপারসংসার-সাগরত্রাণকারণ শ্রীমন্নারায়ণনামোচ্চারণসংকীর্ত্তন-বন্দনাদিপরায়ণস্থান"—

ইত্যাদি ; এ সমস্তই কলিকাতার বিশেষণ। পড়িয়া মনে হয়, কলিকাতাকে ঠাট্টা করিতেছেন, সবটা প্রশংসা নয়, আর সেই সঙ্গে সংস্কৃত-সাহিত্যের বড় বড় বইএর ভাষার প্রতিও—যাহাতে কি না তিন পৃষ্ঠা ধরিয়া একই বাক্য চলিতে থাকে—একটু কটাক্ষ করিয়াছেন।

রামমোহন, মৃত্যুঞ্জয়, ভবানীচরণ—সকলেই আমাদের গদ্যসাহিত্যের বিশেষ উন্নতি করিয়া গিয়াছেন। যখন গদ্যে বেশী রচনা ছিল না, বা রীতি গঠিত হয় নাই তখন তাঁহারা বাঙ্গালা গদ্যে রচনা করিয়া নূতন পাঠক-শ্রেণী তৈয়ারী করিয়া গিয়াছেন। আজকাল তো দেশের বহুলোক নিত্য খবরের কাগজ পড়ে, অথবা একটুখানি অবসর পাইলেই গল্পের বই লইয়া পড়িতে বসে। তাহাদের মত আমরা যখন খবরের কাগজ কি গল্পের বই লইয়া বসিব তখন যেন বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের এই তিনজন আদি লেখকের কথা ভক্তিভরে স্মরণ করি। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র যে অমূল্য রত্ন জাতির সম্পত্তিরূপে আমাদের হাতে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন, ইহারা সেই রত্নের সন্ধান দিয়া গিয়াছিলেন। কমলকান্তের দপ্তর, কৃষ্ণকান্তের উইল, আনন্দমঠ, প্রাচীন সাহিত্য, গল্পগুচ্ছ, গোরা, বিন্দুর ছেলে, শ্রীকান্ত,—আমাদের দেশের গৌরব, আজ যাঁহাদের কথা বলিলাম—রামমোহন, মৃত্যুঞ্জয়, ভবানীচরণ—আমাদের দেশের, আমাদের ভাষার ও আমাদের সাহিত্যের এই গৌরবের সূচনা তাঁহারাই করিয়া গিয়াছেন।



অদৃশ্য আলোক

২৫৫২ পৃষ্ঠার পর

আমাদের চোখে যে বস্তুটী আলোর চেতনা আনিয়া দেয় পূর্ব্বে তোমাদের বলিয়াছি যে তাহা মূলতঃ তরঙ্গ ধর্ম্মী। তাই ইহাকে সাধারণতঃ "আলোক-তরঙ্গ" বলিয়া বলা হইয়া থাকে। তরঙ্গ বা কম্পনের দিক দিয়া বিচার করিলে আলোর পরিধি দৃষ্টি ক্রিয়া সম্পাদন ছাড়াও আরও ব্যাপক হইয়া দাঁড়ায়। এই দিক দিয়া বিচার করিলে আমরা পাই যে, যে ব্যাপারটিকে সাধারণভাবে "আলোক-তরঙ্গ" বলিয়া বলা হইয়া থাকে তার একটি খুবই ক্ষুদ্র অংশ দিয়াই আমাদের চোখে দেখার কাজ নিষ্পন্ন হয়।

যে সামান্য কয়টি তরঙ্গ সমষ্টি আমাদের দেখার কাজের জন্য প্রয়োজন হয় তাহাদের বৃহত্তমটিকে আমাদের চোখ লাল রঙের দেখে এবং ক্ষুদ্রতমটিকে দেখে বেগুনী রঙের। লাল রঙের তরঙ্গ হইতেও বৃহত্তর এবং বেগুনী রঙের তরঙ্গ হইতেও ক্ষুদ্রতর তরঙ্গ প্রকৃতির মধ্যে বর্ত্তমান, কিন্তু সেগুলিকে আমাদের চোখ ধরিতে পারে না। আলোর তরঙ্গের আর একটি ক্ষমতা এই যে তাহা বস্তু মাত্রের মধ্যে রাসায়নিক ক্রিয়া সম্পাদন করিতে পারে। আলোর এই ক্ষমতাটাকে ধরিয়া কি ভাবে বেগুনী রঙের তরঙ্গ হইতেও ক্ষুদ্রতর আলোর তরঙ্গের সন্ধান হইয়াছিল তাহা তোমরা শুনিয়াছ। এইবার লাল রঙের তরঙ্গ হইতেও বৃহত্তর তরঙ্গের আবিষ্কার ও সেই সংক্রান্ত অন্যান্য কথা তোমাদের বলিব।

আলোক তরঙ্গের আর একটি ক্ষমতা এই যে তাহা বস্তুমাত্রকে উত্তপ্ত করিয়া তোলে। আলোর তরঙ্গ যখন কোনও বস্তুর গায়ে আসিয়া পড়ে তখন সেই তরঙ্গের মধ্যে যে শক্তি নিহিত আছে তাহার কিছু অংশ বস্তুর গা হইতে প্রতিফলিত হয়, কিছু অংশ তাহার ভিতরে প্রবেশ করিয়া অন্য পথে আবার বাহির হইয়া যায় এবং কিছু অংশ সেই জিনিষটা নিজের মধ্যে শুষিয়া লয়। আলোর শক্তি বা Energyর যে অংশ বস্তুটা নিজের মধ্যে শোষণ করিয়া লয় তাহার কতকটা সেই বস্তুর কণাগুলিকে উত্তেজিত করিয়া তুলে, অর্থাৎ তখন সেই জিনিষটা গরম হইয়া উঠে। আলোর এই গুণটিকে ধরিয়া বৈজ্ঞানিকগণ সর্ব্বপ্রথমে লালরঙের তরঙ্গ হইতেও বৃহত্তর তরঙ্গ আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

সার উইলিয়ম হার্শেল Sir (William-Herschel) ছিলেন তাঁহার সময়ের খুব প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্। তাঁহার মাথাতেই বোধ হয় সর্ব্বপ্রথমে

অদৃশ্য আলোক

আলোকরশ্মির বস্তু মাত্রকে উত্তপ্ত করিবার ব্যাপার অনুসন্ধানের কথা উদয় হয়। নিউটন যেরূপ করিয়াছিলেন সেই ভাবে তিনি সূর্য্যরশ্মিকে লইয়া একটা Prismএর (প্রিশ্ম বা তে-শিরা পরকলার) মধ্য দিয়া যাইতে দিয়া তাহার বর্ণালী (Spectrum) তৈয়ার করিলেন। তাহার পর বর্ণালীর রংগুলির উপর একটা তাপমান যন্ত্র ধরিলেন। তিনি দেখিলেন যে তাপমান যন্ত্রটি তাপ বৃদ্ধির সঙ্কেত ইঙ্গিত করিতেছে। এইভাবে তিনি প্রমাণ করিলেন যে আলোক-রশ্মি বস্তুকে উত্তপ্ত করিবার ক্ষমতা রাখে। তিনি আরও দেখিলেন যে সব রঙ সমান ভাবে বস্তুকে উত্তপ্ত করিতে পারে না। বেগুনী রঙের আলোর উপর তাপমান যন্ত্রটি থাকিবার সময় তাহাতে যে তাপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল লাল রঙের বেলায় তাহা অপেক্ষা অধিক তাপ তাহাতে নির্দিষ্ট হইয়াছিল। এইরূপ ব্যাপার তিনি দেখিবেন আশা করেন নাই। ইহা দেখিয়া তিনি আশ্চর্য্য হইলেন। তাঁহার সম্মুখে যে বর্ণালীটি তৈয়ারী হইয়াছিল তাহার এক প্রান্ত লাল রঙের ছিল, অপর প্রান্ত ছিল বেগুনী রঙের। তিনি এতক্ষণ তাপমান (Thermometer) যন্ত্রটিকে এক সীমার মধ্যেই আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন। এইবার ইহাকে এই সীমা অতিক্রম করিয়া যাইতে দিলেন। তিনি লক্ষ্য করিলেন যে বেগুনী রঙের সীমা অতিক্রম করিবার পরই তাপমান যন্ত্রে উত্তপ্ত হইবার কোনও নির্দ্দেশ দেখা যাইতেছে না। এইবার অপর সীমা অর্থাৎ লাল রঙের বাহিরে তাঁর তাপমানটিকে আস্তে আস্তে লইয়া গেলেন। এবার কিন্তু ব্যাপার অন্যরূপ ঘটিল। তাপমান যন্ত্রে তাপের নির্দ্দেশ কমিয়া যাইবার যায়গায় তাহা আরও বাড়িয়া উঠিল। তিনি আরও আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন।

তিনি অনুমান করিলেন যে আলোকরশ্মির বর্ণালীর সীমা শুধু লাল রঙ দিয়াই আবদ্ধ নয়, তাহা ইহাকে অতিক্রম করিয়া আরও চলিয়া যায়। তাপমান যন্ত্র তাহার অদ্ভুত আচরণের দ্বারা এই ব্যাপারেরই ইঙ্গিত দিতেছে। এই অতি চমৎকার পরীক্ষাটীর দ্বারা তিনি প্রমাণ করিলেন যে সূর্য্য শুধু যে চোখে দেখা আলোই ছড়াইতেছে তাহাই নহে, সে এমন সব আলোও চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া থাকে যাহা আমরা দেখিতে না পাইলেও বস্তুকে উত্তপ্ত করিবার মত কোনও কোনও বিষয়ে দৃশ্য আলোর তুলনায় তাহাদের কাজ করার শক্তি বেশী। স্যর উইলিয়ম হার্শেল এই আবিষ্কারটি করেন ১৩৮ বৎসর আগে ১৮০০ খৃষ্টাব্দে।

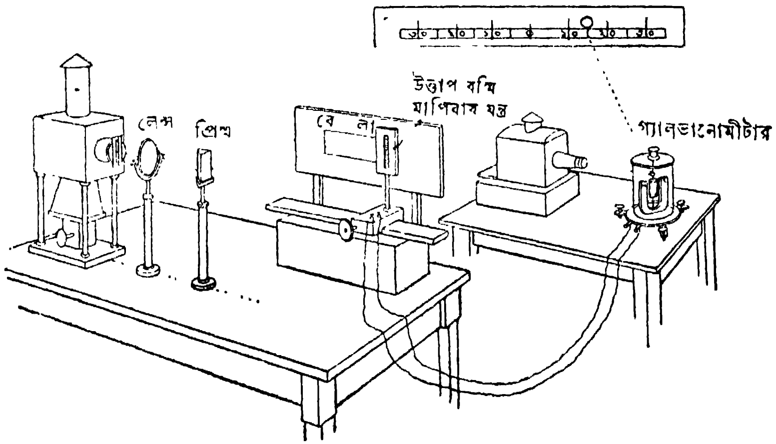
সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে উত্তপ্ত হইলে বস্তুমাত্রেরই আয়তন বৃদ্ধি হয় এবং যত বেশী তাহা উত্তপ্ত হয় তত বেশী তাহার আয়তনও বাড়িয়া থাকে। অতএব আয়তন বৃদ্ধির একটা হিসাব পাইলে তাহা হইতে তাহার উত্তপ্ত অবস্থার একটা হিসাব পাওয়া সম্ভব। বৈজ্ঞানিকেরা যে তাপমান যন্ত্র নির্ম্মাণ করেন তাহাতে বস্তুমাত্রের এই ধর্ম্মটিরই আশ্রয় লওয়া হইয়াছে। সাধারণতঃ যে তাপমান যন্ত্র সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতে খানিকটা "পারা" একটা কাচের থলির মধ্যে রাখা হয়। এই কাচের থলি হইতে একটা কাচের সরু নল উঠিয়া গিয়াছে। কাচের থলিটার ভিতরে "পারা" উত্তপ্ত হইলে তাহার আয়তন বৃদ্ধি হয় এবং তাহা কাচের নলটি দিয়া উপরে উঠিয়া যায়। পারা যতটা উপরে উঠে বৈজ্ঞানিকেরা তাহা হইতে উত্তপ্ত অবস্থার পরিমাণ অনুমান করেন।

এইরূপ তাপমান যন্ত্র বৈজ্ঞানিকেরা তাঁহাদের প্রায় সব্ব কাজে ব্যবহার করেন। কিন্তু আলোক-তরঙ্গের উত্তপ্ত করিবার ক্ষমতা এত অল্প যে এই যন্ত্রটী দিয়া তাহা ভাল করিয়া ধরা যায় না। বৈজ্ঞানিকেরা সে-জন্য অন্য যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। যে অতি সূক্ষ্ম যন্ত্র দিয়া বৈজ্ঞানিকেরা আলোক তরঙ্গের উত্তপ্ত করিবার ক্ষমতা সঠিক ভাবে মাপিতে সমর্থ হইয়াছেন তাহার একটির মূলতত্ত্ব তোমাদের এইখানে বলিতেছি। এই যন্ত্রটির নাম বোলোমিটার (Bolometer)। ইহার নির্ম্মাণ-কর্ত্তার নাম S. P. Langley।

বিদ্যুৎ শক্তি এক স্থান হইতে অন্য-স্থানে লইয়া যাইতে হইলে তাহাকে সাধারণতঃ তামার তারের মধ্য দিয়া লইয়া যাওয়া হয়। তোমাদের অনেকের বাড়ীতেই বিদ্যুৎ পাইবার জন্য সেই কারণে বিদ্যুৎ

তৈয়ারীর কারখানা হইতে তামার তার আসিয়া লাগিয়াছে। এই তারের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ-শক্তি চলিয়া আসিয়া তোমাদের বাড়ীতে বিজলী-বাতি জ্বালায় আর বিজলী-পাখাকে ঘুরাইয়া দেয়। এই-সব এবং অন্য নানা কারণে তারের ভিতর দিয়া কি কি নিয়মে বিদ্যুৎ-শক্তি বা স্রোত প্রবাহিত হয় তাহা বৈজ্ঞানিকের নিকট খুবই একটা মূল্যবান তথ্য। বৈজ্ঞানিকেরা এই লইয়া অনেক গবেষণা করিয়াছেন। তাঁহারা দেখিয়াছেন যে তারের ভিতর বহনকারী তারের উত্তাপের তারতম্য হইলে তাহার বিদ্যুৎকে বাধা প্রদানের ক্ষমতারও তারতম্য হইয়া থাকে। সঙ্গে সঙ্গে যে বিদ্যুৎ-প্রবাহ তারের ভিতর দিয়া চলিতেছে তাহাও কম-বেশি হইয়া যায়। এই তথ্যটি অর্থাৎ উত্তপ্ত হইলে তারের বিদ্যুৎকে বাধা প্রদানের ক্ষমতা বাড়িয়া যাওয়া ইহাকে অবলম্বন করিয়া Langley সাহেব তাঁহার Bolometer যন্ত্রটি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

একশত বা দুই শত ডিগ্রী উত্তাপের তারতম্য



চিত্র-১—আলোক রশ্মি প্রিজমের মধ্য দিয়া যাইবার পরে বর্ণালী তৈয়ারী করিয়াছে। 'বে' হইল বর্ণালীর বেগুনী প্রান্ত 'লা' হইল লাল প্রান্ত। উত্তাপ মাপিবার যন্ত্র লাল প্রান্তের গায়ে বর্ণালীর বিস্তারের নির্দ্দেশ দিতেছে।

বিদ্যুৎ-প্রবাহ প্রবাহমান থাকিতে হইলে সেই তারের মধ্যে বিদ্যুৎ-শক্তির বিরুদ্ধে একটা বাধা থাকার প্রয়োজন। তাঁহারা ইহাও দেখিয়াছেন যে বিদ্যুৎ-শক্তির বিরুদ্ধে এইরূপ বাধা বা Resistance বস্তু মাত্রের একটা স্বাভাবিক গুণ। এইবার মনে কর একটা তার বহিয়া বিদ্যুৎ-প্রবাহ চলিতেছে। সেই তারের মধ্যে বিদ্যুৎ-স্রোতের বিরুদ্ধে যে বাধা (Resistance) রহিয়াছে তাহা যদি বাড়িয়া যায় তাহা হইলে বিদ্যুৎ-স্রোত আপনা আপনি কমিয়া যাইবে। অপর পক্ষে এই বাধা যদি কোনও কারণে কমিয়া যায় তবে বিদ্যুৎ-স্রোত বাড়িয়া উঠিবে। বৈজ্ঞানিকেরা দেখিয়াছেন যে বিদ্যুৎ-হইলে তাদের বাধা প্রদানের ক্ষমতার যে পরিমাণ তারতম্য হয় তাহা অতি সামান্য। কিন্তু যতই সামান্য হউক না কেন তাহা পরিমাপ করা দুঃসাধ্য নয়। কিন্তু এক ডিগ্রীর হাজার ভাগের উত্তাপ, বা তাহারও কম উত্তাপের তারতম্য হওয়ার (বর্ণালীতে এই পর্য্যায়ের [order] উত্তাপের তারতম্য মাপিবার প্রয়োজন) পরিমাপ করা প্রায় কল্পনাতীত। Langley সাহেব সেইজন্য এক অভিনব উপায় মনন করিয়া কাজে লাগাইলেন।

কোনও জিনিষ ওজন করিতে হইলে আমরা একরকম যন্ত্র ব্যবহার করি। ইহাকে সাধারণতঃ দাঁড়িপাল্লা বা নিক্তি বলে। ইহাতে একটা দণ্ডের

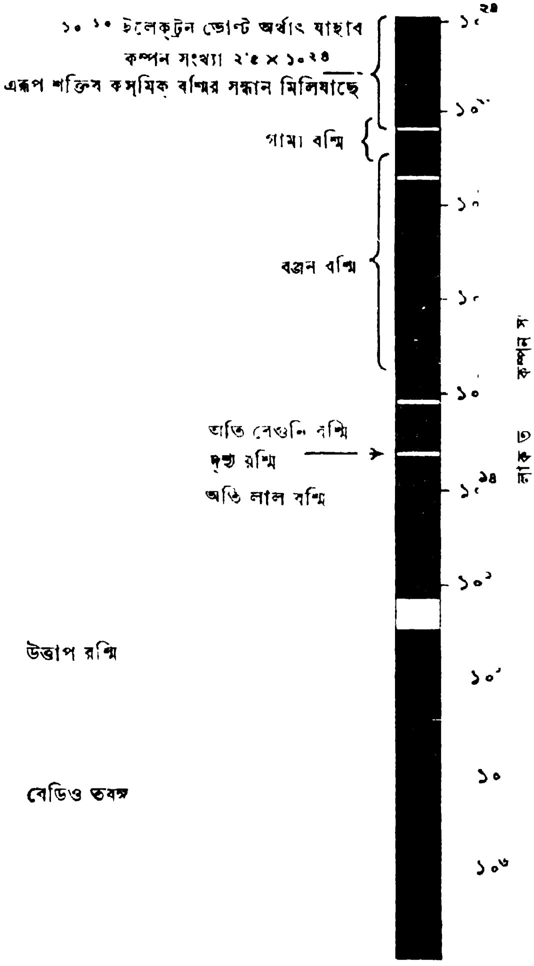
দুই প্রান্ত হইতে দুইটা পাল্লা লাগাইয়া দেওয়া হয়। ওজন সমান হইলে দণ্ডটা সাম্যাবস্থা লইয়া ঠিক সমান্তরাল ভাবে (Horizontal) থাকে। এই সাম্যাবস্থার একটু এদিক ওদিক হইলে তৎক্ষণাৎ আমরা ধরিতে পারি। এই উপায়ে খুব সূক্ষ্ম ভাবে আমারা সব জিনিষকে ওজন করিতে পারি। Langley সাহেব দেখিলেন যে এই সাম্যাবস্থা বিচ্যুত হওয়ার পরিমাপ করা মূল জিনিষের পরিমাপ করা হইতে অনেক পরিমাণে সোজা। তিনি দুইটি ঠিক এক রকমের তার নিয়া তাহার বিদ্যুৎকে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা (Resistance) যাহাতে একেবারে একরূপ থাকে তাহা স্থির করিয়া লইলেন। এই দুইটা তারের মধ্যে তিনি যথাসম্ভব একই পরিমাণে বিদ্যুৎ-প্রবাহ চালাইলেন। এই সমপরিমাণ বিদ্যুৎ-প্রবাহ তাহার বিদ্যুৎ-প্রবাহ মাপিবার যন্ত্রটিকে সাম্যাবস্থায় রাখিয়া দিল। এই ব্যবস্থাতে তিনি দেখিতে পাইলেন যে যে কোনও তার উত্তপ্ত হইয়া বিদ্যুৎ প্রবাহের সামান্যতম তারতম্য করিলেই সাম্যাবস্থা আর থাকে না। আর এই সাম্যাবস্থা বিচ্যুত হওয়ার অবস্থা তৎক্ষণাৎ তাঁহার যন্ত্রে ধরা পড়িয়া যায়। তাঁহার এই সমস্ত ব্যবস্থাটি এত সূক্ষ্ম (Sensitive) হইয়াছিল যে তিনি মনে করিলেন যে এক ডিগ্রীর সহস্র ভাগেরও কম উত্তাপের তারতম্য হওয়া তিনি মাপিতে সমর্থ হইবেন। তিনি সরু সাধারণ তারের পরিবর্ত্তে তাঁহার যন্ত্রটিতে প্লাটিনাম বা Palladium নামের অপর একটি ধাতুর পাতলা সরু পাত ব্যবহার করিয়াছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার যন্ত্রটিকে তিনি এত সূক্ষ্ম করিতে পারিয়াছিলেন যে ইহার দ্বারা তিনি এক ডিগ্রীর দশ সহস্রভাগের এক ভাগ উত্তাপ-পার্থক্য ধরিয়া ফেলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

Langley এই যন্ত্রটি দিয়া সৌর বর্ণালীর বিস্তার যে লাল রঙ হইতেও অনেক দূর পর্য্যন্ত বর্ত্তমান তাহা আবিষ্কার করেন। বৈজ্ঞানিকেরা আলোক-তরঙ্গ কত লম্বা হইতে পারে তাহা মাপিতে পারেন। তাঁহাদের মাপ অনুসারে বেগুনী রঙের তরঙ্গের দৈর্ঘ্য বা অন্তর ৪০০০ আংষ্ট্রম, দীর্ঘতম লাল রঙের তরঙ্গের দৈর্ঘ্য বা অন্তর ৭৬০০ আংষ্ট্রম। ৭৬০০ আংষ্ট্রম এর বেশী তরঙ্গ আমরা চোখে দেখিতে পারি না। ইহার জন্য Langley সাহেবের Bolometer এর মতন যন্ত্রের প্রয়োজন হয়। Bolometer দিয়া Langley সাহেব ১৫০,০০০ আংষ্ট্রম লম্বা আলোর তরঙ্গ মাপিতে পারিয়াছিলেন। এক সেন্টিমিটার লম্বা যায়গায় ১,০০,০০০,০০০ সংখ্যক আংষ্ট্রম থাকিতে পারে। অতএব হিসাব করিলে পাওয়া যাইবে যে Langley সাহেব তাঁহার Bolometer দিয়া 5×10^{-4} সেন্টিমিটার লম্বা আলোক তরঙ্গের আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিলেন। ইহা হইতেও বড় তরঙ্গ আছে, কিন্তু তাহাদের কথা বলিবার আগে এই তরঙ্গ গুলির পরিচয় আরও একটু বেশী করিয়া তোমাদের দিই।

যে আলোর তরঙ্গ বা তরঙ্গগুলি আমাদের দৃষ্টি শক্তির ক্রিয়া উৎপাদন করে তাহাদের সম্বন্ধে আমরা জানি যে তাহারা কোনও কোনও জিনিষের মধ্য দিয়া অবাধে চলিয়া যায়, আবার কোনও কোনও জিনিষে বাধা পাইয়া একেবারে থামিয়া যায়। যে জিনিষগুলির মধ্য দিয়া আলোক তরঙ্গ অবাধে চলিয়া যায় তাঁহাকে আমরা স্বচ্ছ বলি। এবং যাহার মধ্য দিয়া যাইতে পারে না তাহাকে বলি অস্বচ্ছ। কাচ, স্ফটিক, হীরা ইত্যাদি দৃশ্য আলোর তরঙ্গের কাছে স্বচ্ছ, এবং কাঠ পাথর, ধাতব দ্রব্য ইত্যাদি অস্বচ্ছ। আমরা দেখিয়াছি যে কাচ দৃশ্য আলোর কাছে স্বচ্ছ হইলেও বেগুনীর অতীত যে অদৃশ্য আলো বর্ত্তমান তাহার নিকট অস্বচ্ছ, অপর পক্ষে Quartz (কাচমণি) বলিয়া একরকমের পাথর আছে তাহা দৃশ্য ও অদৃশ্য অনেক রকমের আলোর কাছে স্বচ্ছ। এই Quartz (কাচমণি) আবার আরোও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোর তরঙ্গের নিকট একেবারে অঙ্গারের মত কালো। লাল আলোর তরঙ্গ হইতেও দীর্ঘ তরঙ্গের সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকেরা এইরূপ নানান্ তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহারা দেখিয়াছেন যে কাচ এই দীর্ঘ তরঙ্গের আলোর নিকট যথেষ্ট স্বচ্ছ নয়। Flint কাচ বলিয়া এক রকমের কাচ আছে। এই কাচ তৈয়ারী করিতে সীসার প্রয়োজন হয়। Flint কাচের মধ্য দিয়া এই তরঙ্গগুলি যাইতে যথেষ্ট বাধা পায়। Quartzএর (কাচমণি) কাছে দৃশ্য ও ক্ষুদ্র তরঙ্গের অদৃশ্য আলো সবই সমান ভাবে

স্বচ্ছ। ইহা দীর্ঘ তরঙ্গের অদৃশ্য আলোর কাছে কিন্তু অত স্বচ্ছ নয়। Calcite (চূর্ণসার) এর কথা তোমরা পূর্বে পাইয়াছ। ইহার স্বচ্ছতা এত ব্যাপক যে সেখানে Quartz (কাচমণি) অস্বচ্ছ বলিয়া পরিত্যাজ্য হইয়াছিল সেখানে Calcite (চূর্ণসার) ব্যবহার করিয়া বৈজ্ঞানিকেরা ফল পাইয়াছিলেন। কিন্তু এই তরঙ্গগুলি Calcite (চূর্ণসার) ভেদ করিয়া যাইতে পারে না। অপর পক্ষে সাধারণ লবণ অর্থাৎ rock salt এই সব তরঙ্গের কাছে কাচের চেয়ে বেশী স্বচ্ছ। এইজন্য এই দীর্ঘ তরঙ্গগুলির বর্ণালী তৈরী করিবার সময় বৈজ্ঞানিকেরা লবণের Prism (Rock Salt Prism) ব্যবহার করেন।

এইবার তোমাদের নিকটে দৃশ্য ও অদৃশ্য আলোকের একটা চিত্র দিতেছি (চিত্র-২)। এই চিত্র হইতে তোমরা বুঝিতে পারিবে পৃথিবীতে যত আলো আছে আমাদের চোখ তাহার কতটুকু ধরিতে পারে। দৃশ্য আলো ত মাত্র সাত রঙেই সমাপ্ত। অদৃশ্য আলো Ultra violetএর দিকে সম্ভবতঃ কস্‌মিক রশ্মি হইতে আরম্ভ হইয়া hard ও soft X-ray, Schumann সাহেবের আবিষ্কৃত রশ্মি, Ultra violet রশ্মি যাহা Calcite (চূর্ণসার) ভেদ করিতে সমর্থ, এবং অবশেষে যাহা Quartz (কাচমণি) ভেদ করিতে সমর্থ তাহার পর Infra red এর দিকে সেই আলোক তরঙ্গ কতদূর চলিয়া গিয়াছে। এখান নানা রকমের আলোর যে তালিকা দেওয়া হইল তাহাই ইহার শেষ নহে আরোও দীর্ঘ আলোক তরঙ্গ আছে। এই দীর্ঘ তরঙ্গগুলিকে লইয়া বেতার-বার্তার সূচনা হইয়াছিল। তোমরা রেডিয়োতে যে গান ও কথা শুনিতে পাও তাহাও এই দীর্ঘ তরঙ্গগুলিরই সাহায্যে। অদৃশ্য আলোকের ক্ষমতা যে কতদূর ব্যাপক তাহা বেশ বুঝিতে পারিলে ত?



চিত্র—২



দেশ-বিদেশের জাতীয় সঙ্গীত

[২৭৯২ পৃষ্ঠার পর]

বাঙ্গালী পল্টনের গান

এক হ'ল আজ অষ্ট বজ্র—যুদ্ধ ভয়ঙ্কর।
শঙ্কাহারীর ডঙ্কা বাজে বক্ষে নিরন্তর!
মর্দ্দ যারা মরতে জানে—নেই কিছু কেয়ার,
হাত আছে যার সেই ছুটেছে
ধরতে হাতিয়ার।
সাচ্চা পুরুষ-বাচ্চা যারা নাচছে তাদের মন,
মরুক বাঁচুক করবে লড়াই—
এই সে আকিঞ্চন।
এমন দিনে ঘরের কোণে কে পারে থাকতে?
মন আমাদের যুদ্ধে গেছে কেহই না ডাকতে।
শরীর শুধুই পিছিয়ে মোদের,
এগিয়ে গেছে মন—
মানস লোকে মার্চ্চ করে যায়
বাঙ্গালী পল্টন!

মন আমাদের খাকী পরে সেজেছে সোল্জার,
এমন সময় হুকুম এলো—পরোয়ানা রাজার!
পরোয়ানা এ প্রাণ-মাতানো—
এমন দেখি নাই,
মন এতদিন যা চেয়েছে আজ পেয়েছি তাই।
জোয়ান!—তোমার জোয়ানী আজ
দেখবে জগতে
ঘরের পরের বাড়বে আস্থা তোমার তাগতে;
অস্ত্র ধর! প্রাণের আদেশ করবে কে পালন?
বেরিয়ে পড়! বেরিয়ে পড়! **বাঙ্গালী পল্টন।**

অস্ত্র দীক্ষা সমর-শিক্ষা নতুন তোমার নয়,
চার যুগেই যে দিচ্ছে তোমার শৌর্য্য-পরিচয়;
দিগ্বিজয়ী রঘুর সঙ্গে তোমরা যুঝেছ,
কীর্ত্তি রঘুর গঙ্গা-স্রোতে হেলায় মুছেছ।
আঠারো দিন বিষম লড়াই করলে অহর্নিশ
ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে বঙ্গ-প্রাগজ্যোতিষ্।
শৌর্য্যে তোমার গৌড়েতে রাজলক্ষ্মী আকৃষ্টা,
তোমার বাহু করলে কপিল-বাস্তু প্রতিষ্ঠা,

তোমার সৃষ্টি সাতগাঁ এবং শ্রী পৌণ্ড্রবর্দ্ধন,
কনাসোনা সে তৈরী তোমার
বাঙ্গালী পল্‌টন!
শক্-হূণে আতঙ্ক মোদের কিসের?
তা' ভাই বল্!
রাক্ষসেদের লঙ্কা কেড়ে বানিয়েছি সিংহল।
গঙ্গার আলে বসত্ করি আমরা বাঙ্গালী
যার নামে গ্রীক্ সৈন্য হঠাৎ সাহস-কাঙ্গালী।
কাশ্মীরেতে দুঃসাহসী নিশান উড়ালে,
রাজার ইষ্টদেবের মূর্ত্তি ক্রোধে গুঁড়ালে,—
কেশাগ্র কেউ নারল ছুঁতে—চক্ষে হুতাশন,
মেঘের মতন আওয়াজ গলার
বাঙ্গালী পল্‌টন?

* * *

রাজ্য-হারা জয়াপীড়ের তোমরা তে সহায়,
আর্য্যাবর্ত্ত জয় ক'রে
থোও পাল-রাজাদের পায়,
হাতীর হল্‌কা ছুটলো তোমার দক্ষিণা পথে,
মগ-মোগলে কখ্‌লে তুমি নৌকাতে রথে।
নিমক্-হারাম হায় গো যেদিন মুলুক খোয়ালে
বৃদ্ধ রাজার সঙ্গে ক্ষোভে মাথা নোয়ালে;
দু'দিন পরেই বাংলা ছেড়ে নিশান অগণন
উড়ল তোমার কাংড়া-গড়ে।
বাঙ্গালী পল্‌টন!

* x *

সিংহবাহুর তোমার বাহু দৃপ্ত সুবিশাল,
চাঁদ প্রতাপের কেদাররায়ের
তোমরা খাঁড়া ঢাল!
শশাঙ্ক আর গণেশ রাজার সাঁজোয়া বজ্রসার
তোমরা বিজয়সিংহ দেবের পাথর যে কেল্লার।
ফ্রান্সে তোরা অস্ত্র ধরিস্ ভীষণ বিপ্লবে,
ব্রেজিলেতে সৈন্য চালাস্ অমর গৌরবে;
নামজাদা লাল পলটনে, ভাই,
তোরাই ছিলি শোন,
এম্পায়ারের ভিৎ গেড়েছে বাঙ্গালী পল্‌টন!

আজকে আবার ডাক এসেছে
যুদ্ধে যাবার ডাক
লাভক্ষতি কে খতিয়ে ছাখে?
হিসাব এখন থাক।
বেরিয়ে প'লাম স্পন্দনেতে বৃহৎ জীবনের
কুচ-কাওয়াজের ছন্দে মেতে আনন্দে মনের।
অনেক লোকের সঙ্গে যাব, যাব অনেক দূর,
পরব খাকী, ধরব কিরীচ, এই সুখে ভরপুর
বুকের বলে করব মোরা অসাধ্য-সাধন
কাজ ছাখালেই কম্যাণ্ড পাবে
বাঙ্গালী পল্‌টন!

* x x

পরোয়া ভাই পেইছি যখন কুছ্ পরোয়া নেই,
কাঁধে সঙীন উড়িয়ে মোরা চলব এগিয়েই।
কি পাই, না পাই, আমরা তা ভাই
মোটেই ধরিনে
মার্চ্চ করে যাই গোলার মুখে খেয়াল করিনে।
কিছুই চাওয়ার ধার ধারিনে
আজ আমরা বিলকুল
বাবের বরণ লাভ ক'রে মনস্ফুর্ত্তিতে মশ্‌গুল্
যশের পথে জয়ের পথে চল্‌ছে ছুটে মন
উড়িয়ে নিশান গান গেয়ে চল
বাঙ্গালী পল্‌টন!

বন্দীর প্রার্থনা

সিদ্ধিভিচ

বন্দী মোরা,—মোরা ভাগ্যহীন;
ভগবান্! দাও হে সুদিন।
কর প্রভু শৃঙ্খল মোচন,—
দূর কর অধর্ম্মাচরণ;
ল'য়ে চল উষার মন্দিরে,
স্নিগ্ধ শান্ত স্বর্গনদী-তীরে;
লয়ে চল শান্তি ধামে,—সান্ত্বনা ভুবনে;
শোনো প্রভু মোদের প্রার্থনা,
প্রভু মোরা হয়েছি ব্যাকুল;

দুর্ভাগার—বন্দীর প্রার্থনা,
দয়াময় হও অনুকূল !

উদ্দীপনা

ম্যাক্সিম গোর্কি

ওহো ! দেখ দাবানল জ্বলিল অন্তরে।
লম্ফে লম্ফে অট্টহাস্যে ছাইল কানন ;
অশ্ব মোর তীর বেগে ছোটে বায়ু-ভরে।
এ বাহু কিনেছে নাম যুদ্ধে অগণন।
ওহে ভাই, দূর কর নিদ্রা, তন্দ্রা সব,
উদয়গিরির দিকে চল মোর সাথে,
আঁধারে মগন দেশ, নিস্পন্দ নীরব,
অরুণ-কিরণ মোরা পাব পথে যেতে !
তপ্ত লোহ বক্ষে মোর আবেগের ভরে
অপূর্ব্ব পুলকে মোর আঁখি আসে ভ'রে,
ছুটেছি জ্যোতির দিকে উধাও, উধাও।
উঠ ভাই ? জাগ ভাই ? নহিলে এখনি
জাগাবে বিষার্চ্চি বায় দংশিয়া সঘনে ;—
পুড়িবে কপাল শিরে পড়িবে অশনি,
বরণ করিতে হ'বে বিফল মরণে।

পুণ্যের জন্য

থিয়োগ্নিস্

দেবতার মধ্যে এবে এ অধম দেশে
আশাদেবী আছেন কেবল,
অন্য সবে সুমেরুর স্বর্ণ চূড়া বাহি'
গেছেন ত্যজিয়া ভূমণ্ডল।
অন্তর্হিত ধর্ম্মদেব সত্যদেব সহ,
শ্রী গিয়াছে, ধী গিয়েছে চ'লে,
এ ভীরুর দেশে শুধু ধর্ম্মভীরু নাহি,
প্রতিজ্ঞা পালিতে এরা ভোলে
দুশ্চরিত্র দুর্জ্জনেরে করিতে বরণ
নারীদের দ্বিধা নাহি আর।
পাত্র—ধনী ?—ধন করে কলঙ্ক মোচন,
কুৎসিতে সুন্দরে একাকার।
কুবেরের যূপে বলি পড়ে জোড়া জোড়া
লুব্ধ, নীচ কুক্কুরী, কুক্কুর,
পুণ্যের প্রাচীন যুগ অতীতে বিলীন
ন্যায় ধর্ম্ম হয়ে গেছে দূর।

আমাদের হিন্দুস্থান

[কবি ইকবালের জাতীয় সঙ্গীত। কবির জন্ম ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ শিয়ালকোট, মৃত্যু ১৯৩৮ এপ্রিল। ইনি ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ মুসলমান জাতীয় কবি ছিলেন। ছন্দের, ভাবের এবং ভাষার মাধুর্য্যে ইনি একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন।]

সকল দেশের সেরা এদেশ মোদের হিন্দুস্থান
(তোমরা) এই বাগানের বুলবুলিয়া, হেথায়
গাহি গান।
বিদেশেতে যাই যদিবা, মন হেথায়ই থাকে,
ভেবে দেখ—এইতো সেদেশ ভুলতে
নারি যাকে।
সব পাহাড়ের উপরে যে, আকাশে যার ঠাঁই—
সেই হিমালয় ঘরের প্রাচীর, ভরসা
মোদের ভাই !
হাজার হাজার নদী মায়ের অঙ্কে করে খেলা
তাইতো এদেশ শ্রেষ্ঠ সবার, স্বরগের এ মেলা।
গঙ্গা-মাই। জননী গো ! ভুলেছো কি তুমি
তোমার তীরে তীরে কারা এল সলিল চুমি ?
ইউনানো, রোম, মিশর কারুর নিশানা
নাই আর,
যশের সুবাস বইছে শুধু মোদের ভারত মা'র
বেঁচে আছে এদেশ শুধু—ধন্য রে এই দেশ,
কালের কবল পারেনিক, করতে তারে শেষ।
কবি ! তাহার দুখের কথা তুমিই শুধু জানো,
তোমার মায়ের ব্যাথার বোঝা তুমিই
শুধু টানো॥



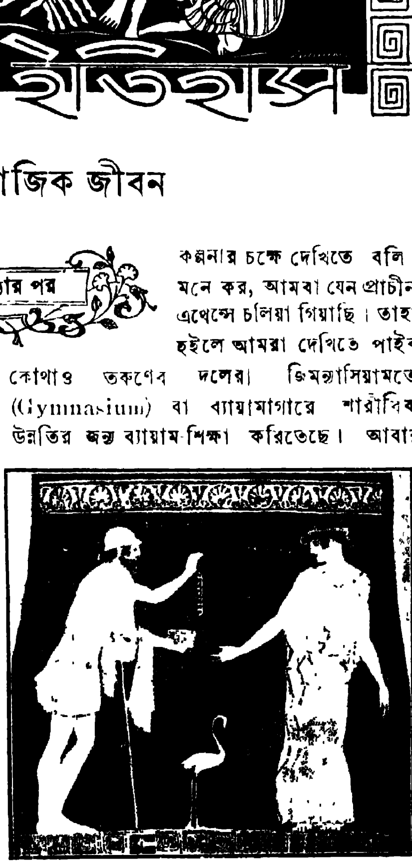
পৃথিবীর ইতিহাস

গ্রীক্‌দের সামাজিক জীবন

৩১০১ পৃষ্ঠার পর

পূর্ব্বে গ্রীক কবি, এবং দার্শনিক ও পণ্ডিতগণের কথা বলিয়াছি। এইবার গ্রীক্‌দের সামাজিক জীবনের কথা শোন। সেকালের গ্রীসের লোকেরা কি রকম পোষাক-পরিচ্ছদ পরিতেন, কি ভাবে চলাফেরা করিতেন তাহা জানিবার জন্য তোমাদের একটা কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। এখানে সে-সকল কথাই বলিতেছি। তোমরা একটা কথা মনে রাখিবে যে গ্রীক্ সভ্যতা কেবল মাত্র গ্রীসদেশের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না। তাহাদের আচার-ব্যবহার রীতি নীতি, সামাজিক শিক্ষা-দীক্ষা পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এসিয়ামাইনরের নানাসহর যেমন এপিসাস্ (Ephesus) মিলিসাস্ (Miletus) স্মার্ণা (Smyrna), লেবোস্ (Lesbos) কেয়স (Cheos) রোডস্ (Rhodes) এবং দক্ষিণ ইটালির গ্রীক্ উপনিবেশ, সিসিলি দ্বীপ, মিশরের অন্তর্গত গ্রীকদের ব্যবসা-বাণিজ্যের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র (Naukratis) নোক্রেটস এবং উত্তর আফ্রিকার অনেকটা স্থান জুড়িয়া গ্রীক্ শিক্ষা ও সভ্যতার এবং সামাজিক রীতি-নীতির প্রভাব বেশ ব্যাপক ভাবেই প্রসার লাভ করে।

তোমরা এথেন্সের কথা ভাল ভাবেই জান। আমি একবার তোমাদের প্রাচীন এথেন্সকে কল্পনার চক্ষে দেখিতে বলি। মনে কর, আমরা যেন প্রাচীন এথেন্সে চলিয়া গিয়াছি। তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইব কোথাও তরুণের দলেরা জিমন্যাসিয়ামতে (Gymnasium) বা ব্যায়ামাগারে শারীরিক উন্নতির জন্য ব্যায়াম-শিক্ষা করিতেছে। আবার



ফেরীওয়ালা পথে কেনাবেচা করিতেছে

ঐ দেখ দলে দলে পুরুষেরা ঠিক আমাদেরই মত বাজার হইতে প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যাদি সংগ্রহ

করিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। আমরা যেমন বাজার হইতে খাদ্যদ্রব্যাদি সংগ্রহ না করিলে খাওয়া দাওয়া করিতে পারি না তেমনি সেকালের গ্রীকদের ও তো ক্ষুধার তাড়না ছিল! তারপর আর একদিকে লক্ষ্য কর। ধনী ও বিলাসী এবং সাহিত্যানুরাগী জনসাধারণ অভিনয় দেখিবার জন্য রঙ্গালয়ের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে, আবার যাঁহারা ধর্ম্মপ্রাণ তাঁহারা মন্দিরের দিকে চলিয়াছেন দেব ও দেবীর উদ্দেশ্যে পূজা ও অর্চ্চনা



গ্রীক্ মেয়েদের কাপড় পরা

করিতে। ফেরীওয়ালা তাহার পণ্যদ্রব্য পথে বেচাকেনা করিতেছে। যেমন আমরা বাঁচিয়া আছি, তেমনি হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বে একদিন গ্রীকের লোকেরাও বাঁচিয়াছিলেন। কাজেই তাঁহাদের জীবন-ধারার সহিত আমাদের জীবন-ধারার যে ঐক্য থাকিবে তাহা কিছুই বিচিত্র নয়!

গ্রীকেরা কিরূপ পোষাক পরিচ্ছদ পরিতেন সে সম্বন্ধে আগ্রহ হওয়া তোমাদের পক্ষে স্বাভাবিক। পুরুষেরা যে ভাবে কাপড় পরিতেন তাহার নাম ছিল 'টিউনিক'। সেই কাপড়ের উপরে তাহারা যে উত্তরীয় ব্যবহার করিতেন তাহার নাম ছিল ম্যাণ্টল (Mantle)। তাহারা যে জুতা পরিতেন তাহার নাম ছিল স্যাণ্ডেল (Sandle)। এই স্যাণ্ডেল দড়ি দিয়া তাদের পায়ের উপর অনেক সময় হাঁটু পর্য্যন্ত বাঁধা থাকিত। তোমাদের কাছে স্যাণ্ডেলের পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। কয়েক বৎসর যাবৎ ভারতবর্ষে ও বাঙ্গালা দেশের নানা স্থানে প্রাচীন গ্রীকদের ঠিক অনুরূপ না হইলেও এক প্রকারের স্যাণ্ডেলের ব্যবহার চলিতেছে। প্রাচীন গ্রীকেরা কিন্তু মাথায় কোনরূপ টুপি পরিতেন না। তাঁহারা বাঙ্গালীদের মত খালি মাথায়ই চলা ফেরা করিতেন। অনেককাল পরে টুপি পরা আরম্ভ হয়। সেই টুপিও তাঁহারা চিবুকের নীচে একটা দড়ি বা চামড়া দিয়া বাঁধিয়া রাখিতেন।

গ্রীক্ রমণীরা খুব পাতলা ঘোমটা ব্যবহার করিতেন। সেই গুণ্ঠনের আবরণী কাঁধ পর্য্যন্ত লম্বিত থাকিত। মেয়েরা কিন্তু অলঙ্কারের বেশ ভক্ত ছিলেন।

সৰ্ব্বদেশে সর্ব্বকালে মেয়েদের মধ্যে যে অলঙ্কার-প্রীতি দেখা যায়, গ্রীক্ রমণীদের মধ্যেও তাহার কোন অভাব ছিল না। গ্রীক্ মেয়েরা মাথার চুলে সোণার তৈয়ারী চুলের কাঁটা ব্যবহার করিতে খুব ভালবাসিতেন। আর কানে পরিতেন ইয়ারিং বা কানের আংটি। এই অলঙ্কার কানের নীচ দিক্ হইতে ঝুলিয়া থাকিত। আমাদের দেশেও যে এই জিনিষের ব্যবহার অতি প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, সে-বিষয় তোমাদের অজানা নাই।

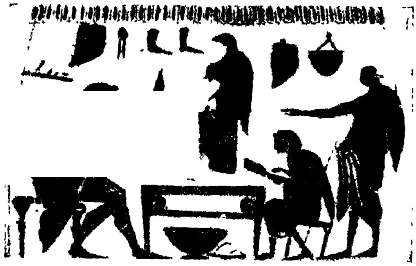
এইবার মেয়েরা কিরূপ ভাবে কাপড় পরিতেন বলিতেছি। তাহারা সাধারণতঃ সাদা ধব্‌ধবে কাপড় পরিতেই ভালবাসিতেন। উহা রেশমী হইলেই ভাল হইত। মেয়েদের এই পোষাক বেশ ঢিলা রকমের ছিল। উহা কটিদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া পায়ের গোড়ালী পর্য্যন্ত ঝোলান থাকিত। কোমরে কটিবন্ধস্বরূপ বস্ত্র খণ্ড দ্বারা কাপড় বাঁধিয়া রাখা হইত। মেয়েরা গায়ে অঙ্গাবরণীয় ব্যবহার করিতেন। সেই সব জামাও ঢিলা রকমের ছিল। সেকালের গ্রীক্ মেয়েরা ছিলেন খুব পরিশ্রমী। তারা-সে বড় ঘরেরই হউক আর গরীব ঘরেরই হউক সকলেই চরকায় সূতা কাটিতেন এবং তাতে কাপড় বুনিতেন।

বল দেখি গ্রীকেরা ক' বার খাইতেন? বোধ হয় তোমরা অনেকেই এই প্রশ্নের উত্তর দিতে



কৃষকেরা চাষ করিতেছে

পারিবে না। কেন-না ভারতবাসীদের যেমন খাবার কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই, তেমনি তাঁহারা যে কে কতবার খায় তাহারও একটা হিসাব রাখা কঠিন, কিন্তু ইউরোপীয় জাতির মধ্যে খাওয়া দাওয়া সম্পর্কে একটা নির্দ্দিষ্ট রীতি আছে। সেই রীতি অতি সামান্য একটু পরিবর্ত্তনের সহিত আজ পর্য্যন্ত সমান ভাবে চলিয়া আসিতেছে। গ্রীকেরা দিনে চার বার করিয়া খাইতেন। প্রাতঃরাশ, অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের যে খাওয়া হইত তাহাই প্রাতঃরাশ। আর দুপুর বেলা ছিল মধ্যাহ্ন ভোজন।



মুচী জুতার মাপ লইতেছে

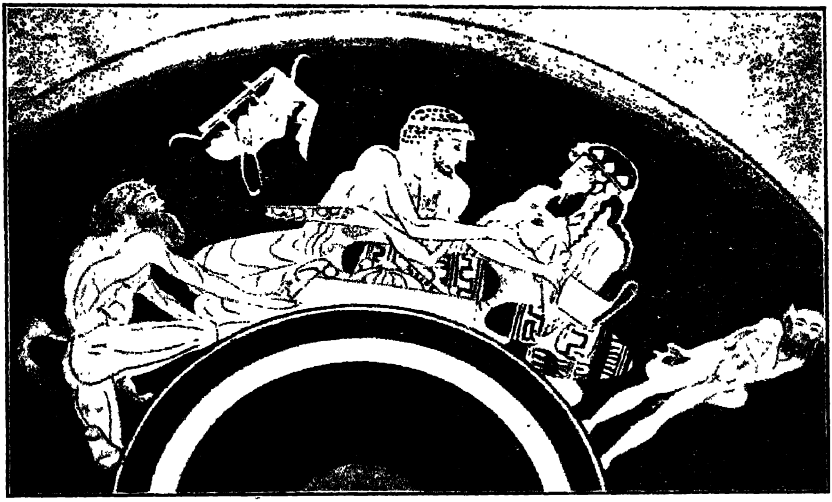
অপরাহ্নের দিকে ছিল আর একবার খাবার ব্যবস্থা। এই তিন বেলার খাওয়ার মধ্যে গুরুতর ভোজনের কোনরূপ ব্যবস্থাই ছিল না। বেশ হাল্‌কা রকমের খাওয়া দাওয়া হইত। কিন্তু সন্ধ্যার পর সারাদিনের কার্য্য শেষে রাত্রিবেলা যে খাওয়া দাওয়া হইত তাহাকে বেশ ভুরি ভোজন বলা যাইতে পারে। পরিবারের সকলে একসঙ্গে বসিয়া বেশ গল্প-গুজব করিতে করিতে মনের আনন্দে ও তৃপ্তির সহিত ভোজন করিত। গ্রীকদের খাওয়া দাওয়ার সময়ে আমোদজনক কথাবার্ত্তা ছাড়া কোনরূপ জটিল তর্ক বা দুরূহ দর্শনের বিষয় আলোচনার ব্যবস্থা, কি ধনী, কি গরীব কোন পরিবারের মধ্যেই বড় একটা হইত না। তাহারা এ-বিষয়ে ছিল অন্য রকমের। খাওয়া দাওয়া খেলা-ধূলার মধ্যে কোনরূপ অপ্রীতিকর সমস্যার জটিল বিষয় অবতারণা করা ছিল, তাহাদের নিয়ম-বিরুদ্ধ।

সেই অতি আদিকালে গ্রীক্‌দের খাদ্য ছিল শুধু মাতা বসুন্ধরার স্নেহের দান, ফলমূল খাদ্যশস্য এই মাত্র। আর পানীয় বলিতে ছিল শুধু নির্ম্মল জল। পশু পক্ষীর মাংস ভোজন পরবর্ত্তী যুগে গ্রীক্-সমাজে প্রচলিত হয়। যে-দিন হইতে গ্রীক্-সমাজে মাংস

খাওয়ার প্রচলন আরম্ভ হইল, তখন হইতে গ্রীস দেশের নানা প্রধান প্রধান সহরের মাংস খুব ভাল ভাবে পাক করিবার জন্য অনেক উৎকৃষ্ট পাচকের আবির্ভাব হইয়াছিল।

সেকালে গ্রীকেরা টেবিলের উপর বসিয়া খাওয়া দাওয়া করিতেন। সাধারণ ভোজনশালাও যে ছিল না তাহা নহে। সব দেশেরই গরীব দুঃখীদের অবস্থা সমান। সে সেকালেই হউক বা একালই হউক না কেন। আমাদের দেশে ছিল। সুরাপান গ্রীস দেশে বেশ প্রচলিত ছিল। ধনীরা তাহাদের খাবার টেবিলে সুগন্ধি মদ্যের ব্যবহার করিতেন।

খাবার টেবিলে আসিয়া তাহারা আসনের উপর বেশ সোজা হইয়া বসিয়া খাইতেন। তবে খাবার জিনিষ আসিলে পর একটু শুইয়া খাদ্য দ্রব্যাদি গ্রহণ করিতেন। যেমন দিনের পর দিন যাইতে লাগিল তেমনি তাহাদের মধ্যে অলসতা ও বিলাসিতা আসিয়া দেখা দিল। ফলে তাহারা



বিছানায় হেলান দিয়া ভোজন

গরীবেরা যেমন অনেক সময় অভাবের দরুণ বনের ঘাস পাতা খাইয়া জীবন ধারণ করে, তেমনি সেকালের গ্রীসদেশের দুঃখী দরিদ্রেরাও পোকা-মাকড় এবং বন্য গাছের লতাপাতা খাইয়া ক্ষুধা দূর করিত। পরে কিন্তু গ্রীকেরা অত্যন্ত মাংস-প্রিয় হইয়াছিল। তাহাদের মাংস না হইলে খাওয়া চলিত না। সাধারণ ও মধ্যবিত্ত অবস্থার লোকেরা সচরাচর জল পান করিত, ঠাণ্ডা ও গরম উভয় প্রকার জলই তাদের পানীয় ছিল। জলে বরফ ঢালিয়া বরফজল পান করাও তাহাদের অভ্যাস প্রাচ্য রীতি নীতি অর্থাৎ এশিয়াবাসীদের অনুকরণ করিতে সুরু করিল। তাহারা তখন বিছানায় হেলান দিয়া বসিয়া বা শুইয়া আরাম করিয়া খাওয়া-দাওয়া করিত।

অতিথিদের প্রতি গ্রীকেরা অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করিত। কোনও অতিথি আসিলে অতিথি সর্ব্বাগ্রে আহার করিতে আরম্ভ না করিলে কেহই খাদ্য গ্রহণ করিত না। তোমরা লক্ষ্য করিয়া থাকিবে, আমাদের দেশে হিন্দু মুসলমান ও খৃষ্টানেরা আহার্য্য গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে দেবতার

উদ্দেশ্যে খাদ্যদ্রব্য নিবেদন করেন। গ্রীকদের মধ্যেও এই রীতি ছিল। তাহারা খাবার আগে দেবতার উদ্দেশ্যে খাদ্যদ্রব্য নিবেদন না করিয়া ভোজন করিতেন না। খাওয়া শেষ হইয়া গেলে তাহারা উপস্থিত বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়স্বজনদের লক্ষ্য করিয়া এমন কি যে সকল বন্ধু-বান্ধব উপস্থিত হন নাই তাহাদের উদ্দেশেও স্বাস্থ্যপান বিধির রীতি পালন করিতেন। (Drinking one's health) প্রত্যেক অতিথি ও অভ্যাগতের নামে অল্প একটু মদ্য মাটিতে ফেলিয়া দিতেন ইহাকে বলিত লিবেসান্ (Libation)।

কুঁড়েঘরে বাস করিত। সেই সকল ঘরগুলি পাথর-দিয়া তৈরী হইত। শিল্পের দিক দিয়া গ্রীকেরা যে অপূর্ব্ব নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, যে বিরাট প্রাসাদ এবং সুন্দর সুন্দর প্রস্তর মূর্ত্তি তাহারা গড়িয়া গিয়াছেন, সে-বিষয়ে 'শিশু-ভারতীতে' তোমরা অনেক কথাই পড়িয়াছ। সাধারণতঃ লোকে মনে করে যে গ্রীক্-ধনী সম্প্রদায় অত্যন্ত বিলাসী ছিলেন। তাঁহারা শ্রমজনক কোন কাজই করিতেন না। অফুরন্ত ছিল তাঁদের অবসর। ক্রীতদাসেরাই তাহাদের হইয়া নানারূপ কাজকর্ম্ম করিয়া দিত। যেমন চাষবাস, বাড়ীঘর তৈয়ারী, অর্থাৎ স্থপতির



গ্রীক্-রমণীদের বিলাস দ্রব্য

ভোজন-শেষে—প্রথমে যে দেবতার কৃপায় তাহাদের বেশ নিরাপদে কাটিয়া গেল, যাঁহার কৃপায় ভোজন সুসম্পন্ন হইল সে দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া পুরুষ ও নারী মহিমা-গীতি আরম্ভ করিত। তারপর গান-বাজনা, নাচ, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, প্রভৃতি আনন্দজনক ক্রীড়া-কৌতুকের ভিতর দিয়া অনেকটা সময় অতিবাহিত হইলে পর সকলে ঘুমাইতে যাইতেন।

সেকালের গ্রীক্‌দের বাড়ীঘর পাথরে তৈয়ারী হইত। ধনীদের গৃহ প্রস্তরনির্ম্মিত এবং বিবিধ কারুকার্য্যে ভূষিত হইত। সাধারণ লোকেরা

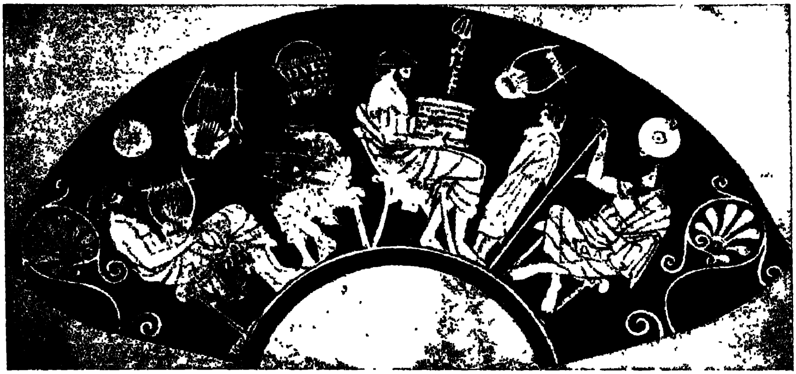
কাজ, দোকানের কাজ, পশুচারণের কাজ সকলই ক্রীতদাসেরা করিয়া দিত, আর ধনীরা নিশ্চিন্ত আরামে শারীরিক ব্যায়ামচর্চ্চা, রাজনীতির আলোচনা এবং যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকিয়া বা উত্তেজনা-মূলক গালগল্পে সময় অতিবাহিত করিতেন। এ-কথা একেবারে অসত্য তাহা নহে কিন্তু কোন দেশের উন্নতি কেবলমাত্র নিরক্ষর ক্রীতদাসদের উপর নির্ভর করিয়া যে হইতে পারে না, তাহা তোমরা সহজেই বুঝিতে পার। পর্ব্বতময় গ্রীসে কৃষিকার্য্য করা যে কিরূপ কঠিন তাহা সহজেই

অনুমান করা যায়। তবে ক্রীতদাসের উপর গ্রীকেরা যে কিরূপ ভীষণ অত্যাচার করিতেন, সে ইতিহাস আমাদের কাছে অতি সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

গ্রীকেরা শিল্পানুরাগী জাতি ছিলেন। শিল্পের উন্নতির জন্য রাজসরকার হইতে বিশেষভাবে সাহায্য করা হইত। শিল্পীরা উপযুক্ত পরিশ্রমিক পাইতেন। যাহাতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অভাব না হয় সে জন্য গ্রীক ষ্টেট হইতে কাঁচা মাল সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা ছিল। খনিজ দ্রব্য বিশেষ রৌপ্য খনিতে কাজ করিবার জন্য ক্রীতদাসদিগকে বেশীর ভাগ লাগানো হইত।

এইরূপ যুদ্ধ যে কিরকম ভীষণ তাহা তোমরা সহজেই কল্পনা করিতে পার। যে শক্তিশালী নয়, যে কৌশলী নয়, তাঁহার পক্ষে এইরূপ সম্মুখ যুদ্ধে জয়ী হইয়া বীরত্ব প্রদর্শন করা বড় সহজ ছিল না। সাহসিকতা এবং নির্ভীকতা এইরূপ দ্বন্দ্ব যুদ্ধের প্রাণস্বরূপ ছিল।

তোমরা পৃথিবীর ইতিহাস পড়িয়া এই একটা সত্য উপলব্ধি করিতেছ যে, প্রত্যেক দেশ ও প্রত্যেক জাতির মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ লাগিয়াই আছে, সেকালে যেমন ছিল একালেও তেমনি আছে। তাই আমরা দেখিতে পাই, শুধু প্রাচীন গ্রীসে নয় সেকালের প্রায় প্রত্যেক দেশের লোকেরাই আত্ম-



এ্যাথেন্সের একটি বিদ্যালয়

গ্রীকজাতি যুদ্ধে যে সকল অস্ত্র-শস্ত্রের ব্যবহার করিতেন, তাহার প্রায় সব কয়টিই নিজের দেশে তৈয়ারী হইত। গ্রীক সৈন্যেরা নানা ভাগে বিভক্ত ছিল। কেহ ছিল তীরন্দাজ। তাহারা কেবল তীর ধনুক লইয়া যুদ্ধ করিত, কেহ ছিল বর্শাধারী কেবল বর্শার ব্যবহার করিত এবং কেহ বা তরোয়াল লইয়া যুদ্ধ করিত। ঢালের ব্যবহার সকলেই করিত।

তোমরা একটা কথা ভুলিয়া যাইও না। সেকালের গ্রীকেরা কামান বন্দুকের সন্ধান জানিত না। তখন পর্য্যন্ত বারুদের আবিষ্কার হয় নাই। এইজন্য সামনা সামনি অর্থাৎ বুকে বুকে বাহুতে বাহুতে মিলিত হইয়া সম্মুখ সমর করিতে হইত।

রক্ষা বা নগর রক্ষার জন্য নগরী বা পল্লীর চারিদিক বেড়িয়া উচ্চ প্রাচীর গড়িয়া তুলিতেন। গ্রীকেরা সেইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তোমরা গ্রীস দেশের সামাজিক জীবন সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিবার তাহা সকলই জানিতে পারিলে। ছবি হইতে প্রাচীন গ্রীসের মেয়েরা কিরূপ ভাবে চলাফেরা করিতেন কি পোষাক পরিচ্ছদ পরিতেন, কি ভাবে দোকানে গিয়া ক্রয়-বিক্রয় করিতেন তাহার সব চিত্র দেখিতে পাইবে। সেকালের গ্রীকেরা অর্থ অপেক্ষাও বলবীর্য্য, বীরত্ব, মহত্ত্বেরই সম্মান করিত বেশী।



ভারতের আদিম-নিবাসী 'কালো' মানুষের' কথা

৩০৭২ পৃষ্ঠার পর

"ভারতের মানুষের কথা" প্রবন্ধে তোমরা পড়িয়াছ যে ভারতের ছয়টি মূলজাতির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা আদিম অধিবাসী ছিল কৃষ্ণবর্ণ খর্ব্ব-কায নেগ্রিটো জাতীয় মানুস। বর্ত্তমান কালে আসল নেগ্রিটো জাতির নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায় আণ্ডামান দ্বীপপুঞ্জের মিনকোপি জাতিতে, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের আইটা জাতিতে, এবং মালয় উপদ্বীপ ও পূর্ব্ব সুমাত্রায় সেমং জাতিতে। আফ্রিকা মহাদেশের আকা, ওগোঙ্গো প্রভৃতি 'নেগ্রিলো' জাতির পূর্ব্বোক্ত "নেগ্রিটো" জাতিদের নিকটতম জাতি। কিন্তু ভারতে নেগ্রিটো জাতীয় 'কালোমানুষ' অধুনা একপ্রকার বিলুপ্ত হইয়াছে বলা যাইতে পারে। সম্ভবতঃ বহু যুগ পূর্ব্বে উহারা উহাদের অব্যবহিত পরবর্ত্তী 'মুণ্ডা' ও দ্রাবিড়-ভাষা-ভাষী জাতিদের মধ্যে ক্রমে বিলীন হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানকালে ভারতে কেবল ত্রিবাঙ্কুর Travan-core) ও কোচিন প্রভৃতি কোনও কোনও প্রদেশের বা স্বাধীন রাজ্যের বনে-জঙ্গলে ও পাহাড়-পর্ব্বতে অপেক্ষাকৃত খর্ব্বকায় কাডাব, উরুল বা উয়ালি, মালাসার প্রভৃতি দুই চারিটি আদিম জাতির মধ্যে এখন পর্য্যন্তও ব্যক্তি-বিশেষের পশমাক্বক (Wooly) বা কোঁকড়া (Curly) চুল, গোলাকার (Round) কিংবা মধ্যবিধ (Medium) মস্তিষ্ক-করোটী (Skull) প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ দৈহিক প্রকৃতিতে (Physical charactersএ) তাহাদের নেগ্রিটো পূর্ব্বজদের বৈশিষ্ট্যের সামান্য নিদর্শন মধ্যে মধ্যে দৃষ্টি-গোচর হয়। ভারতের দক্ষিণ প্রান্তরে এইরূপ নেগ্রিটো-নিদর্শন-বিশিষ্ট জাতিদের সামান্য পরিচয় এখানে তোমাদের দিতেছি।

পৃথিবীর নানা দেশের মানুষ



নিউবিয়া, ইবান-বোর্নিয়ো, সালোমান দ্বীপের মানুষ, মলয় নারী, বর্মী, [illegible] সর্দার, চীন [illegible]
গোল্ডকোস্টের অধিবাসী, তামিল মেয়ে, উগাণ্ডার পুরুষ, নিউবিয়ার মুসলমান, [illegible] মানুষ
[illegible], বেদুইন, [illegible]

এই সমস্ত আদিম অসভ্য জাতিদের আচার-ব্যবহার ও সামাজিক ব্যবস্থা ও বিধি নিয়মের কোনও কোনও অংশ আমাদের নিকট অদ্ভুত বা অস্বাভাবিক মনে হইতে পারে। কিন্তু আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে বিভিন্ন জাতির বিশেষতঃ অসভ্য-জাতিদের আচার ব্যবহার ও রীতি-নীতি তাহাদের দেশকাল বা ভৌগলিক ও সমাজিক আবেষ্টনীর (Geographical and social environment এর) উপর বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। আর প্রত্যেক জাতির সংস্কৃতির বা সভ্যতার ক্রম-বিকাশের প্রধান সহায়ক সভ্যতর জাতিদের সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ (Contact of cultures)। উরলি, কাডার প্রভৃতি এই সমস্ত জাতিগুলি বহুকাল হইতে পার্ব্বত্য প্রদেশে বা বনে জঙ্গলে অননুকূল আবেষ্টনীর মধ্যে জীবন-যাপন করিতেছে। প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থার নিষ্পেষণে উদর-পূর্ত্তি ও আত্ম-রক্ষার প্রচেষ্টায় ইহাদিগকে নিরন্তর ব্যাপৃত থাকিতে হয়। আর সভ্যতর জাতিদের সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিবার সুযোগও ইহাদের অল্পই ঘটে। এই সমস্ত কারণে ইহাদের সভ্যতার গতি সম্ভবতঃ এতাবৎকাল রুদ্ধ থাকায় ইহারা এখনও সভ্যতা সোপানের অতি নিম্নস্তরে "মূঢ়ম্লান মূক মুখে" অবস্থান করিতেছে। ইহাদের পক্ষে ইহা বিশেষ দুর্দ্দশার কারণ হইলেও, ইহাদের রূঢ় অমার্জ্জিত জীবন-ধারা ও আচার-ব্যবহার পর্য্যালোচনা করিলে নব প্রস্তর যুগের আদিম অবস্থার মানব-সভ্যতার কিঞ্চিৎ আভাষ পাওয়া যাইতে পারে। তবে ইহাও অসম্ভব নহে যে হয়তো এক-কালে ইহারা সভ্যতা সোপানের আরও দুই এক ধাপ উপরে উঠিয়াছিল; কিন্তু পরে প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে সভ্যতাস্রোত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অবনতি প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রাকৃতিক আবেষ্টনীর পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে উপযোগী দৈহিক ও মানসিক পরিবর্ত্তন হাসিল করিতে কৃতকার্য্য হইয়া যেমন জীব উন্নতির পথে অগ্রসর হয় তেমনই তাহাতে অকৃতকার্য্য জীব অবনতি কিংবা কখনও কখনও লয় প্রাপ্ত হয়।

জীবিকা অর্জ্জন

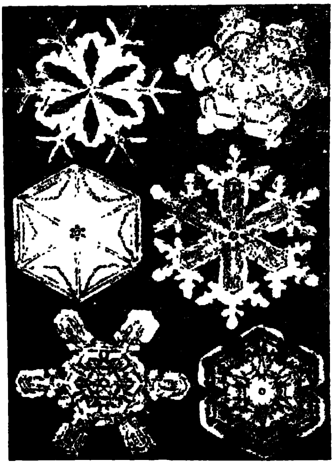
এই আদিম জাতিগুলি সভ্যতর জাতি-দের আগমনে জঙ্গল বহুল অনুর্ব্বর পার্ব্বত্য-প্রদেশে অপসারিত ও অবরুদ্ধ হওয়ায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলবদ্ধ হইয়া খাদ্যান্বেষণের জন্য বনে-জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইতে বাধ্য হয়। চুঁচালো কাষ্ঠ-দণ্ড-কিম্বা লৌহ-ফলক-যুক্ত খোন্তাদ্বারা বন্য কন্দমূলাদি খুঁড়িয়া বাহির করে; তীর-ধনুক বা লগুড়াদি ও ফাঁদের সাহায্যে পশুপক্ষী শিকার করে; বাঁধ বাঁধিয়া ও জল-সেচন করিয়া বা আবদ্ধ জলে বিষ প্রয়োগ করিয়া মাছ ধরে, এবং সুকৌশলে বৃক্ষ বা পাহাড় গাত্র হইতে মৌ-মাছির চাক ভাঙ্গিয়া মধু-সংগ্রহ করে। এই সমস্ত উপায়ে ইহারা কায়-ক্লেশে কোনও মতে জীবিকা-অর্জ্জন করে, এবং কখনও কখনও বা খাদ্যাভাবে অর্দ্ধ অনশনে ও কচিৎ অনশনে দিন যাপন করিতে বাধ্য হয়। ভবিষ্যতের চিন্তা ইহারা সাধারণতঃ মনে স্থান দেয় না বা দিতে পারে না। আর ভবিষ্যতের জন্য খাদ্য-সঞ্চয় করিবার সুযোগ ও ইহাদের পক্ষে বিরল। সাধারণতঃ ইহারা কৃষিকার্য্যে অনভিজ্ঞ বা অপটু। এমন কি কুকুর ভিন্ন অন্য কোনও পশুপালনে ও ইহারা সাধাণতঃ অনভ্যস্ত। তবে কাডার জাতি পশুপালন করিতে জানে।



বরফ কি শাদা?

৩১২০ পৃষ্ঠার পর

বল দেখি বরফ দেখিতে কি রকম, তোমরা বলিবে শাদা। কথায় বলে—শাদা যেন বরফ! কবি গাহিয়াছেন—"তুষার-শুভ্র-কিরীটিনী"! কিন্তু সত্য কথা বলিতে



বরফখণ্ড

কি বরফে বা তুষারে কোন রং নাই, বৈজ্ঞানিকেরা বলেন—Snow is colourless অর্থাৎ তুষার বা বরফ বর্ণবিহীন। তবে আমরা শাদা দেখি কেন? ইহার উত্তর বরফগুলি স্বচ্ছ জমাট জলকণা দ্বারা গঠিত। সূর্য্যের কিরণ এই স্বচ্ছ জমাট জলকণার মধ্যে পড়িয়া এবং বাতাসের মধ্যে ভাসমান বায়ুকণার মধ্যে প্রতিফলিত হওয়ায় বরফ বা তুষারকে শাদা দেখায়। তুষারখণ্ডগুলি দেখিতে ছয়টি কোণবিশিষ্ট হয়। এই বরফ বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডের সমবায়ে উৎপন্ন হইয়া থাকে। বরফখণ্ড দেখিতে অতি সুন্দর ও সকলগুলিই ষড়ভুজ ও সমানাকার। বরফ দেখিতে আমরা কেন শ্বেতবর্ণ দেখি সেকথা আগেই বলিয়াছি, কিন্তু যদি এক এক খণ্ড বরফ স্বতন্ত্রভাবে পরীক্ষা করি তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যায় উহা উহাতে সূর্য্য কিরণের সম্পাতে নানাবিধ বর্ণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। সকল প্রকার বর্ণের একত্র প্রতিফলনে বরফরাশির বর্ণ শুভ্র দেখায়।

কোন পাখীর পাখা নেই এবং কোন দেশে উহাদের বাস?

নিউজিল্যাণ্ডে এ্যপটেরিক্স (Apteryx) নামে একজাতীয় অদ্ভুত পাখী আছে, তাহাদের শরীরের কোথাও পাখার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না।

এক সময়ে নিউজিল্যাণ্ডের সর্ব্বত্রই এই পাখী দেখা যাইত। এখন আর তেমন দেখা যায় না। ইহাদের লম্বা ঠোঁট, ঠোঁটের পরেই দুইটি ছিদ্র আছে উহাকেই নাক বলা যাইতে পারে। এই পাখীকে নিউজিল্যাণ্ডের লোকেরা বলে কিউই (Kiwi)। ইহারা মাটির নীচ হইতে ঠোক্‌রাইয়া ঠোক্‌রাইয়া পোকামাকড় খায়। রাত্রিকালেই সচরাচর এই পাখী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের পায়ের নখ পর্য্যন্ত তীক্ষ্ণ, যদি কেহ ইহাদিগকে আক্রমণ করে, তাহা হইলে তীক্ষ্ণ নখ দিয়া আক্রমণকারীকে ভীষণ ভাবে আঘাত করিতে থাকে।

হাতী কেমন করিয়া জল পান করে?

তোমরা কি কখনও হাতীকে জলপান করিতে দেখিয়াছ? যদি দেখিয়া থাক তাহা হইলে, হাতী



শুঁড় দিয়া জল শুষিয়া লইতেছে

কি ভাবে জলপান করে বলিতে পারিবে আর যদি না দেখিয়া থাক তাহা হইলে উহা বলিতে পারিবে না। অনেকের বিশ্বাস হস্তী শুঁড় দিয়া জলপান করে কিন্তু কথাটা তা নয়। হাতী শুঁড় দিয়া জল লইয়া মুখের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দেয় এইভাবে তাহারা জলের তৃষ্ণা নিবারণ করে, এখানে দুইটা ছবি



হাতীর জলপান

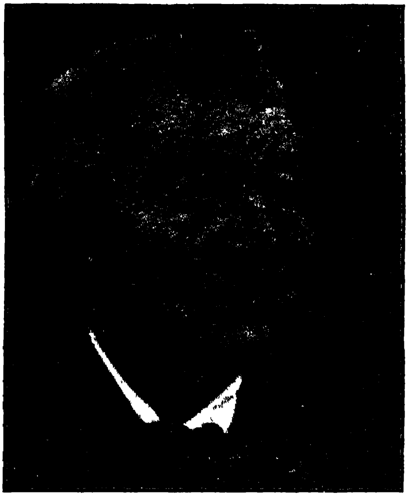
দেওয়া হইল। প্রথম ছবিতে দেখ হাতী শুঁড় দিয়া জল শুষিয়া লইতেছে, আর অন্য ছবিটীতে দেখ হাতী শুঁড় দ্বারা যে জল শুষিয়া লইয়াছে তাহা মুখের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিতেছে।

হাতীর শুঁড় একটী অদ্ভুত পদার্থ। এমন কাজ নাই যাহা সে শুঁড়ের সাহায্যে করিতে না পারে। চল্লিশ হাজার মাংসপেশীর দ্বারা হস্তীর শুঁড় গঠিত। তোমরা যদি লক্ষ্য কর তাহা হইলে দেখিতে পাইবে হস্তী তাহার শুঁড়ের সাহায্যে যেমন একটা বোতলের ছিপি খুলিতে পারে মাটী হইতে একটী আলপিন তুলিতে পারে তেমনি সে তাহার শুঁড়ের সাহায্যে আবার একটী বাঘকে জড়াইয়া ধরিয়া শূন্যে ছুড়িয়া ফেলিতে পারে, আবার সে

তাহার খাদ্যদ্রব্য ও এই শুঁড়ের সাহায্যে মুখের ভিতর পুরিয়া বড় বড় গাছপালাও অনায়াসে উপড়াইয়া ফেলে।

আমাদের কপালে বলি পড়ে কেন ?

তোমরা প্রাচীনদের কপালের দিকে তাকাইলে দেখিতে পাইবে যে ললাটের চর্ম্ম কুঞ্চিত হইয়া পড়িয়াছে। এই রেখার ইংরাজী নাম wrinkle।



বৃদ্ধের কপালে বলের চিহ্ন

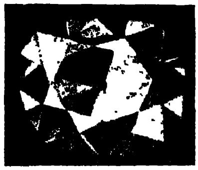
আমরা বাঙ্গলায় বলিয়া থাকি—বলি, কোঁচ, চর্ম্মরেখা, বলিপলিত, বার্দ্ধক্যরেখা, বা চর্ম্মরেখা। কেন কপালের চাম কুঞ্চিত হইয়া এইরূপ হয়? কেন হয় শোন। আমাদের চম্মের নীচে স্নিগ্ধ জাতীয় অর্থাৎ তেলজাতীয় পদার্থ আছে। যখন এই তেলজাতীয় পদার্থের অভাব হয়, তখনই আমাদের কপালে বলি পড়িয়া থাকে। এই বলি-রেখা আমরা দূর করিতে পারি, যদি এমন কোন ঔষধ খাই বা মালিস করি, যাহাতে পুনরায় চর্ম্মের নিম্নস্থ তন্তুগুলিতে তৈলজাতীয় পদার্থের উদ্ভব হয় তাহা হইলে আবার বলি রেখা দূর হইয়া মুখের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইতে পারে।

চওড়া কপাল হইলে কি লোক বুদ্ধিমান হয় ?

সাধারণতঃ লোকের মনে এইরূপ একটা বিশ্বাস আছে যে যাহার কপাল খুব চওড়া সে খুব বুদ্ধিমান হইয়া থাকে। আমেরিকার বড় বড় মস্তিষ্ক-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা মানুষের কপালের মাপ লইয়া দেখিতে পাইয়াছেন যে ইহার মধ্যে কোন সত্য নাই। চওড়া-কপালের লোক বুদ্ধিমানও হইতে পারে না ও হইতে পারে ইহাতে কিছুই আসে যায় না অর্থাৎ বিদ্যা, বুদ্ধি ও জ্ঞানের সঙ্গে কপালের ছোট বড় বলিয়া কোন প্রভেদ নাই।

হীরক কি দেখিতে কেবলি শাদা হয় ?

হীরা দেখিতে বেশীর ভাগই শাদা। কিন্তু সময় সময় কালো, সবুজ, গোলাপী, পীত, ধূসর প্রভৃতি রংয়ের হীরাও দেখা যায়। রঙীন হীরা কিন্তু বিশুদ্ধ নয়। রঙীন হীরকের উপাদান 'কার্বণ' (Carbon) বিশুদ্ধ না হইলেই বর্ণ-বৈষম্য হইয়া থাকে। পীত বর্ণের হীরক Carbon ও Fluoride of aluminium এর মিশ্রণ। সবুজ অতি দুর্লভ জিনিষ। ঔজ্জ্বল্যে ইহা মরকতমণি (Emerald) কেও হার মানাইয়া দেয়। লাল এবং গোলাপী আভাযুক্ত হীরক সব যায়গায় পাওয়া যায়। একেবারে কৃষ্ণবর্ণের হীরক অতি দুর্লভ।



ব্লুহোপ্ হীরক

একটা গাভী কত দুধ দিতে পারে ?

সব গাভী সমান দুধ দেয় না। গাভীর বংশ, গাভীর খাদ্য এবং যত্নের উপরও দুধের পরিমাণ অনেকটা নির্ভর করে। উইল্টসায়ারের Wiltshire) একটি গাভী ৩২, ১১৫২ পাউণ্ড পর্য্যন্ত দুধ দিয়াছে। প্রায় ১৫ টন। প্রতিদিন এই পরিমাণে ৩৫৭ দিন পর্য্যন্ত দুধ দিয়াছিল। আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর কোন গাভীই এত অধিক পরিমাণে দুধ দিতে সক্ষম হয় নাই। তবে অনেকে কাছাকাছি গিয়াছে।